উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা—৩

৬১তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা
মাঘ, ১৩৬৫

বার্ষিক মূল্য ৫৲
প্রতি সংখ্যা ॥৹

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বর্ষারম্ভ। বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইতে হয়। **বার্ষিক মূল্য সডাক ৫৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ।৴৹ আনা।

বিশেষ কারণ না থাকিলে প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইয়া থাকে।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, ইতিহাস, সামাজিক উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। **পত্রোত্তর ও প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত পাঠানো হয় না। সাধারণতঃ ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। ঠিকানাসহ স্বাক্ষরিত প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 'উদ্বোধনে' **সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক** পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপন ঃ—বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু মনোনয়নের সম্পূর্ণ অধিকার কার্যাধ্যক্ষের উপর থাকিবে। বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের পর পরবর্তী মাসে প্রকাশের জন্য কোন বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না। বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। "উদ্বোধনে"র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।**

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৬১তম বর্ষ

(১৩৬৫-মাঘ হইতে ১৩৬৬-পৌষ)

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

সম্পাদক

স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৫০ ন.প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ-১৩৬৫ হইতে পৌষ-১৩৬৬)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা

উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৬৫

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কাশি!
তাড়াতাড়ি আরাম
আর
নিরাময়ের জন্য
COUGH
SYRUP
বি. আই. কফ সিরাপ
বেঙ্গল ইমিউনিটি

বিষয়-সূচী

বিখ্যাত স্বর্ণশিল্পী ও
জহুরত্নকার
ফোন: ৩৪-৪৫৪২
অন্নপূর্ণা জুয়েলারী হাউস
৮৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২
গ্যারান্টী যুক্ত গিনি সোনার গহনার
প্রতিষ্ঠান। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য
৸৹ টাকার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রম্

শ্রীমৎস্বামি-বিবেকানন্দ-বিরচিতম্

সামাখ্যাদ্যৈর্গীতিসুমধুরৈর্মেঘগম্ভীরঘোষৈ-
র্যজ্ঞধ্বান-ধ্বনিতগগনৈর্ব্রাহ্মণৈর্জ্ঞাতবেদৈঃ।
বেদান্তাখ্যৈঃ সুবিহিত-মখোদ্ভিন্ন-মোহান্ধকারৈঃ
স্তুতো গীতো য ইহ সততং তং ভজে রামকৃষ্ণম্॥

বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা আকাশ বাতাস মুখরিত করিতেন,
বিধিপূর্বক যজ্ঞ সম্পাদন করার ফলে তাঁহাদের শুদ্ধ হৃদয় হইতে বেদান্তবাক্যদ্বারা ভ্রম ও
অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল;
তাঁহারা মেঘের মতো গম্ভীর সুমধুর স্বরে সামবেদ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহার স্তব করিয়াছেন,
—যাঁহার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন,
আমি সর্বদা সেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভজনা করি।

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষ

দেখিতে দেখিতে 'উদ্বোধনে'র ৬০তম বর্ষটি কাটিয়া গেল। এই সংখ্যা হইতে উদ্বোধনের ৬১তম বর্ষের শুভারম্ভ। শ্রীভগবানের আশীর্বাদ—সুধী লেখক-লেখিকার, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের প্রীতি ও সহযোগিতা সম্বল করিয়া আমরা নূতন বৎসরের যাত্রাপথে অগ্রসর হইতেছি।

৬০তম বৎসর অনেক ক্ষেত্রে হীরকজয়ন্তী-রূপে পালিত হয়; সে ভাবে না হইলেও বিশেষ পূজা-সংখ্যায় 'উদ্বোধনের ষাট বৎসর' প্রবন্ধে আমরা উদ্বোধনের ধারাবাহিক একটি ইতিহাস সংকলন করিয়াছি, তাহাতে পাইয়াছি স্বামীজী কেন—কবে 'উদ্বোধন' পত্রিকা শুরু করিলেন; 'উদ্বোধনের উদ্দেশ্য' নামে স্বামীজী-লিখিত উদ্বোধনের প্রথম প্রবন্ধের বা 'প্রস্তাবনা'র অংশ-বিশেষ পুনর্মুদ্রিত করিয়া আমরা স্মরণ করিয়াছি স্বামীজী কি চাহিয়াছিলেন এই পত্রিকার মাধ্যমে।

প্রতি বৎসরের যাত্রারম্ভে ইহার স্মরণই আমাদের পাথেয়, ইহারই সহায়ে আমরা অনুসরণ করি সেই পথ, যে পথ দেবলোকে বিস্তৃত—যে জ্যোতির্ময় পথ দিয়া মানব সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমের দিকে যাত্রা করে, সংকীর্ণতার গণ্ডি ভাঙিয়া অনন্ত বিস্তারের মাঝে আত্মহারা হয়। ইহার সহায়ে আমরা ইঙ্গিত পাই কোন্ পথ অবলম্বন করিতে পারিলে মনুষ্যাকার অ-মানুষ 'মানুষ' হয়, আর মানব ধীরে ধীরে মহামানবে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের সাধনাই অন্তরের জাগরণের সাধনা—ইহাই উদ্বোধনের সাধনা।

দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে ইহার রূপ নিত্য নূতন। কোথাও বা ঘোর তমোগুণ মানুষকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে ভ্রান্তি ও আলস্যের মাঝে; সেখানে প্রয়োজন প্রবল কর্মচঞ্চল রজোগুণ, যাহার সহায়ে মৃত্যুতুল্য মোহনিদ্রা বিদূরিত করিয়া মানব জাগিয়া উঠিবে—প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার স্বাভাবিক সংগ্রাম-মুখর জিগীষু জীবনের স্বাধিকারে। আবার যেখানে মানুষ রজোগুণের যৌবন-চাঞ্চল্যে জলে স্থলে আকাশে—কোথাও বিরাম বিশ্রাম খুঁজিয়া পাইতেছে না, প্রচণ্ড গতি তাহার দুর্গতিরই কারণ হইতেছে, সেখানে প্রয়োজন শান্ত সত্ত্বগুন, যাহা জীবনে আনিয়া দিবে সৌম্য শান্তি, সাম্যের পরিপূর্তি, প্রৌঢ় অভিজ্ঞতার পরিপক্কতা!

এ সমস্যা তো শুধু আজিকার সমস্যা নয়, শুধু এই যুগেরই সমস্যা নয়। সৃষ্টির প্রথম বেদনাই শুরু হইয়াছে সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণের খেলায়। যুগে যুগে, দেশে দেশে, সৃষ্টির ও কৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখা দেয় এক এক গুণের প্রাবল্যে; তাহারই চিহ্ন পড়িয়া থাকে ইতিহাসের পাতায়—পুরাতত্ত্বের প্রস্তরে।

ভারত সত্ত্বের ধুয়া ধরিয়া তমঃসমুদ্রে ডুবিতে বসিয়াছিল—উচ্চ আদর্শের বড়াই করিয়া অবনতির পঙ্কে ডুবিতেছিল। সেখানে আজ দেখা দিয়াছে রজোগুণের প্রবল জোয়ার,—যে কোন উপায়ে শুধুমাত্র ঐহিক উন্নতির প্রচেষ্টা।

ইওরোপ ও আমেরিকায় রজোগুণের আধিক্য, তাহাদের তীব্র তড়িৎসঞ্চারে চন্দ্রমণ্ডল সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত বিপর্যস্ত! কোথায় শান্তি, কোথায় সুখ, কোথায় জ্ঞানবিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মার সর্বপ্রাপ্তির পূর্ণতা?

সঙ্কুচিত বিশ্বে আজ একান্ত প্রয়োজন সাম্য ও সামঞ্জস্য; তাহা আসিতে পারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক অভাব পরিপূরণের দ্বারা। এই ইঙ্গিতই দিয়া গিয়াছেন স্বামীজী আজ হইতে ষাট বৎসর পূর্বে। 'উদ্বোধন' তাঁহার সেই নির্দেশিত পথেই চলিয়াছে, এবং চলিতে থাকিবে।

বৈজ্ঞানিক মানবতা

আজকাল দুটি কথা প্রায়ই শোনা যায় 'হিউম্যানিজ্‌ম্' ও 'হিউম্যানিটিজ্'। সম্প্রতি আবার আর একটি কথার সৃষ্টি হইয়াছে সায়েন্টিফিক্ হিউম্যানিজ্‌ম্ (Scientific Humanism); আমরা তাহারই বাংলা করিতেছি বৈজ্ঞানিক মানবতা বা মানবিকতা। কথাটির মধ্যে Scientific materialism বা বৈজ্ঞানিক জড়বাদের গন্ধ না থাকিলেও ছায়া আছে! আমরা বিচার করিয়া বুঝিতে চাই কথাটির প্রকৃত অর্থ কি।

তৎপূর্বে দেখা উচিত: শব্দটির উৎপত্তি কোথায় ও কবে? অনেকে বলিয়া থাকেন ইওরোপে যে রেনেসাঁ বা সর্বতোমুখী জাগরণ আসিয়াছিল ১৫শ শতাব্দীতে, ভারতে এখনও তাহা আসে নাই; সেদিক দিয়া ভারত এখনও ইওরোপের পাঁচ শতাব্দী পিছনে! ভারতে যে সামান্য জীবন-চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে তাহা একান্তই পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা এবং ঐ সভ্যতারই শক্তি-সান্নিধ্যে! ভারতের বিরাট জনতা এখনও সেইখানে পড়িয়া রহিয়াছে, যেখানে আসিয়া তাহার স্বাধীন চিন্তা স্তব্ধ হইয়াছিল, স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছিল, জাতি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অতএব 'প্রকৃত' বিষয় বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা ভারতকে বাদ দিয়া ইওরোপের নব জাগরণ হইতেই শুরু করিতেছি।

ইওরোপও একদিন তমোগুণের প্রভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। স্বধর্ম ভুলিয়া, না বুঝিয়া সে বিশ্বাস করিয়াছিল 'স্বর্গরাজ্য' 'মুক্তি' প্রভৃতির বার্তা। গ্রীকো-রোমান সভ্যতা ভাসিয়া গিয়াছিল উন্নততর নীতি-বিশিষ্ট বৌদ্ধ ও ইহুদীধর্ম-সমুদ্ভূত খৃষ্ট-বাণীর প্রবাহে।

ইওরোপের ঘুম ভাঙিল সহস্র বৎসর পরে। তাহার প্রথম লক্ষণ মানুষের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায়—অলৌকিক দৈব শক্তি অস্বীকার করিয়া। মানুষের স্বার্থ-সংরক্ষণ, মানুষের ঐহিক কল্যাণ, মানুষের মহিমাপ্রচার—ইহাই বড় করিয়া দেখা দিল। জাগিয়া উঠিল গ্রীক মনীষা, রোমক মহিমা—নূতন বেশে, নূতন ভাষায়। জাগিয়া উঠিল ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইংলণ্ড। ধর্মীয় শাসন অস্বীকার করিয়া প্রচারিত হইতে লাগিল প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-সহায়ে লব্ধ বিজ্ঞানের নব নব সত্য—দেখা দিল যুক্তিপরায়ণ নূতন দার্শনিক চিন্তাধারা। দেশ বা রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া নব নব ভাব-প্রবাহ ছড়াইয়া পড়িল। ইহাই মানবতা-বাদের সূত্রপাত!

হল্যাণ্ডের হিউম্যানিষ্ট ইরাস্মাস্ গোঁড়ামির মহাশত্রু—প্রচার করিলেন সমাজ-কল্যাণেই আদর্শ চরিত্রের পরীক্ষা। ধর্মের নামে ভণ্ডামির তিনি কঠোর নিষ্ঠুর সমালোচক। তাঁহার ভাবে প্রভাবিত ইংলণ্ডের টমাস মূর লিখিলেন 'ইউ-টোপিয়া' (Utopia)—অর্থাৎ আদর্শ কল্যাণরাষ্ট্র; সামাজিক আর্থনীতিক সাম্যের এক কল্পনা-চিত্র তিনি আঁকিলেন। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের পত্তন হওয়ায় শুধুমাত্র ভাবপ্রবণতার উপর রচিত এই উদার মানবতাবাদ বাধাপ্রাপ্ত হইল।

ইওরোপের রঙ্গমঞ্চে ইহার পরবর্তী বিশেষ ঘটনা বিজ্ঞানের অপ্রতিহত জয়যাত্রা এবং তাহার অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব সাফল্যের পর সাফল্য। মানুষের চিন্তা, কৃষ্টি—সব কিছু বিজ্ঞানের পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। দর্শনও বিজ্ঞানের ছায়ায় তাহার মতবাদ রচনা করিতে শুরু করিল। এখন আর ধর্ম নয়, বিজ্ঞানই আন্তর্জাতিক মিলনের মঞ্চ। ক্রমে বিজ্ঞান-বলে পুষ্ট ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি নব নব মারণাস্ত্র আবিষ্কার করিয়া দেশে বিদেশে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করিয়া শিল্পবাণিজ্যের সহিত নিজ নিজ সাম্রাজ্যের বিস্তার করিল।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পের উপর খাড়া করিল অর্থ-নীতির কাঠামো; তারপর শুরু হইল প্রতি-দ্বন্দ্বিতা। তাহারই ভয়াবহ পরিণতি বার্লিনের শ্মশানে! এইখানে আসিয়া যেন বর্তমান পৃথিবী থামিয়া গিয়াছে—পৃথিবীর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যেন মুখোমুখি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

প্রথম শক্তি নিজেকে গণতন্ত্রের সমর্থক বলিয়া দাবি করে, মুক্ত মানবের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা সহায়ে সকলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি—তাহার লক্ষ্য। অপর দ্বিতীয় যে মহাশক্তিটির আবির্ভাব হইয়াছে—তাহার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক জড়বাদ, উদ্দেশ্য মানব-সমাজে সাম্য স্থাপন; প্রয়োজন হইলে, জনগণ না বুঝিলে—তাহাদের কল্যাণের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে তাহাদের সহযোগিতা আদায় করিতে হইবে।

সাম্যবাদ বা জড়বাদ নূতন কিছু নয়; ভারতের কথা বাদ দিয়াও বলা যায় গ্রীক দার্শনিক প্লেটো সাম্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; ডিমোক্রিটাস বলিয়াছিলেন, মন বা অন্য কিছু নয়—জড়বস্তুই সব কিছুর পরম কারণ। মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি সহায়ে বৈজ্ঞানিক জড়বাদ (Scientific materialism) মত স্থাপন করেন; তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া জীবন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন জনগণের পক্ষে সর্বাধিক কল্যাণকর—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। লেনিনই উহার কতকাংশ কার্যে পরিণত করেন।

কিন্তু ইতোমধ্যে বিজ্ঞানের নদীতে অনেক জল গড়াইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান তো একটা মতবাদ নয়—বিজ্ঞান একটা পদ্ধতি। পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত—ইহাই তাহার সোপান-পরম্পরা। যে কোন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে—তাহাকেই অবশ্য বৈজ্ঞানিক আখ্যা দিতে কাহারও আপত্তি থাকা উচিত নয়।

বৈজ্ঞানিক এই পদ্ধতি, এই যুক্তি-শৃঙ্খলা, এই চিন্তা অবশ্যই বৈজ্ঞানিকের মনে রহিয়াছে। মনের চিন্তা কি কোন জড় বস্তুর উপর নির্ভরশীল না চেতন ব্যক্তির অন্তঃস্ফুরণ? একথার শেষ নিষ্পত্তি কি হইয়াছে? বৈজ্ঞানিকের কোনও যন্ত্রে কি ইহার রহস্য ধরা পড়িয়াছে? বিজ্ঞানের সীমা দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে—জড়-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান পর্যন্ত আমরা আসিয়াছি; তবে শুধু জড়-বিজ্ঞান দিয়া কেন আমরা জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা করিব? আরও উপরে, আরও ভিতরে কেন আমরা যাইব না? বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে জড়বাদী হইতেই হইবে, জড়বিজ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান নয়। জীব-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের যুগে 'বৈজ্ঞানিক জড়বাদ' কথাটি বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিক মনে আবার যেন সেই মধ্যযুগের ধর্মীয় গোঁড়ামি (যাহা একেবারে মরে নাই) আসিয়া না হাজির হয়, সে যেন না বলিয়া বসে: যা বলিতেছি বিশ্বাস কর।

বিচারের এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয় বৈজ্ঞানিক মানবতা। আমরা বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিকতা ছাড়িতে পারি না, আবার মানবতাও আমাদের জন্মগত অধিকার। এই দুইএর মধ্যে তাই একটা সেতুরচনার প্রচেষ্টা চলিয়াছে—যাহার ফলে বিজ্ঞানের বস্তুমাত্রনির্ভর যান্ত্রিকতা হ্রাস পাইবে, ও মানব-সাধারণের মধ্যে দেখা দিবে একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী।

সেদিনের মানবতা ছিল ভাবপ্রবণতার উপর ভাসমান, আজিকার মানবতা যুক্তির উপর—বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেদিনের মানবতা ছিল রোম্যাণ্টিক, আজিকার মানবতা প্র্যাগ্-ম্যাটিক। সেদিন ভাবের আতিশয্যে কবি ও সাহিত্যিকরাই মানবের মহিমা ও একত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন, আজ প্রয়োজনের খাতিরে রাজ-

নীতিকরাও মানবাধিকারের ঐক্য ঘোষণা করিতেছেন। হয়তো সেদিন ভাবের উচ্চতা বেশী ছিল, কিন্তু আজ ভিত্তি দৃঢ় ও প্রশস্ত।

বৈজ্ঞানিক মানবতা বস্তুকে স্বীকার করিলেও তাহার প্রাধান্য স্বীকার করে না, ব্যক্তির জন্যই বস্তু, মানুষের জন্যই বিজ্ঞান। মনকে বাদ দিয়া মনোবিজ্ঞান অসম্ভব, ব্যক্তিকে বাদ দিয়া চিন্তা কল্পনা বা দর্শন অসম্ভব। ব্যক্তিই সব দর্শন-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, সমাজ-সংসার, রাষ্ট্র, ধর্ম—সব কিছুর মূল্য নিরূপণের মাপকাঠি। ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারও করে মানুষ—তাহার ব্যক্তিগত বুদ্ধি দ্বারা। প্রত্যেক সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া উপস্থাপিত হয়। কিন্তু কে বিচার করিবে—ইহা সত্য কিনা? এইখানেই বৈজ্ঞানিক বা প্রত্যক্ষবাদী যুক্তিশীল মানব-মন বিপন্ন।

এই জাতীয় চিন্তায়ঃ সত্যের কোন নিরপেক্ষ সত্তা নাই; দেশকালের অতীত, ইন্দ্রিয়ানুভূতির উর্ধ্বে কিছু নাই বা থাকিতে পারে না। সত্য মানবিক, সত্য মানুষের উপর নির্ভরশীল। এই মানবতা মানুষকে বিশ্ব জগৎ বা সংসারের কেন্দ্রে বসাইয়াছে! এইখানেই মানবতাবাদের দুর্বলতা!

মানবতাকে যদি বিশ্বের কেন্দ্রেই বসাইতে হয় তবে অবশ্যই বলিতে হইবে, এই কেন্দ্র এক না বহু? যদি এক হয় তবে এই মানবতা ভাবমূলক, যদি বহু হয় তবে ইহা সংঘর্ষমূলক!

সমস্যা সমাধানের জন্য এইখানেই প্রয়োজন মানব মনেরই আর একটি উর্ধ্বতর অভিব্যক্তি, যাহা দ্বারা মানব খণ্ডজ্ঞানের নয়, এক সমগ্র-ভাবের—অখণ্ডজ্ঞানের অধিকারী হয়। এই অনুভূতি অতীন্দ্রিয়! এই অনুভূতিতে মানুষ উপলব্ধি করেঃ সকলের হৃদয়ে আমার নাড়ী স্পন্দিত হইতেছে, সকলের মুখে আমি খাইতেছি, প্রত্যেকের দুঃখে আমি কষ্ট পাইতেছি, প্রত্যেকের সুখে আমি আনন্দিত! এইরূপ অনুভূতিশীল মানুষই বলিতে পারেঃ যতদিন পৃথিবীতে একটি তৃণকণা রহিয়াছে, ততদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব। এই বিশ্বাত্মবোধই মানুষকে অমর করে, জ্ঞানী করে, শোক-দুঃখের অতীত করে।

এই মানবতাকে আমরা 'আধ্যাত্মিক মানবতা' (Spiritual humanism) বলিতে পারি। ইহা অপর দুই মানবতাবোধেরই ক্রম-পরিণতি। ইহারই প্রায়োগিক রূপ যখন সমাজে সংসারে প্রতিফলিত হইবে, তখনই রাষ্ট্রে যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—তৎপূর্বে নয়।

Look at the 'ocean' and not the 'wave'; see no difference between ant and angel. Every worm is the brother of the Nazarene. How say one is greater and one less? Each is great in his own place. We are in the sun and in the stars as much as here. Spirit is beyond space and time, and is everywhere. Every mouth praising the Lord is my mouth, every eye seeing is my eye. We are confined no-where; we are not body, the Universe is our body.

* * *

Know you are the Infinite, then fear must die. Say ever, 'I and my Father are one.'

—*Inspired Talks*, **Swami Vivekananda**

চলার পথে

'যাত্রী'

সম্পূর্ণরূপে পরিপাক করাই খাদ্য গ্রহণের সার্থকতা। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম সেইখানেই ব্যাধি, সেইখানেই পূতিগন্ধময় উদ্গার। অন্ন গ্রহণের এই কার্যকরী রীতিটি উদর সম্বন্ধে যতদূর প্রযোজ্য, মহাজনের বাক্য বা বাণীসম্বন্ধে আমাদের মনের গ্রহণ-ক্ষমতাও ততদূরই প্রয়োগযোগ্য। সেই কারণেই আমাদের অজীর্ণগ্রস্ত মন, অগ্নিগর্ভ বাণীকে যথার্থরূপে গ্রহণ করিতেই পারে না, তাহাকে সঠিক পরিপাক করিয়া স্বাস্থ্যবান হওয়া তো দূরের কথা। ফলে, স্বামীজীকে যখন বলিতে শুনি: আজ জগতে কিসের অভাব জান? জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী যারা নির্ভীকভাবে ঐ রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, আমাদের ঈশ্বর ভিন্ন আপনার বল্‌তে কিছুই নেই। কে কে যেতে প্রস্তুত?—তখন তাঁহার ঐ অগ্নিময় বাণীতে প্রবুদ্ধ হই বটে, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করিতে সদা-বর্জনীয় 'ভয়'ই আমাদের অভিভূত করে বেশী! অথচ আজিকার জগতে, বিশেষতঃ এই হানাহানি কাটাকাটির দিনে, ঐ জাগরণী বাণী অপেক্ষা পরিপূর্ণ পথনির্দেশক আর কি থাকিতে পারে?

মনের গভীরে যে বাণীকে অবারিত সত্য বলিয়া বুঝি, তাহা পালন করিতে এত ভীত হই কেন? ইহার উত্তর খুঁজিতে গিয়া বর্তমান সমাজের এক কুৎসিত ব্যাধির—সামাজিক চরিত্র-হীনতার—জঘন্য স্বরূপই উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে, এবং ঐ ব্যাধি নিরাময় করিতে হইলে স্বামীজীর 'ঈশ্বর'বাদে পূর্ণাহুতি দিয়াই আমাদের প্রাণ-প্রাচুর্য লাভ করিতে হইবে—এ কথা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। স্বামীজীর এই 'ঈশ্বর' অবশ্য ব্যক্তিগত জীবনের পলায়নী মনের আত্মকেন্দ্রিক পূজার প্রতীক নয়; এই 'ঈশ্বর' স্বার্থসংঘাতশূন্য সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের প্রতিভূ। এই 'ঈশ্বর'কে পূজা করিতে পুষ্পপাত্র সাজাইবার বা প্রতিমা আনয়ন করিবার প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য প্রয়োজন জীবন্ত চরিত্র। এবং ইহা সেই প্রাণবন্ত চরিত্র যাহা মানুষকে স্থির থাকিতে দেয় না; আপন স্বার্থের কথা ক্ষণমাত্রও চিন্তা করিতে দেয় না, বরং ইহা সেই চরিত্র যাহা অন্ধকারে রক্ষিত নিস্তেজ সবুজ-কণাহীন লতাগুল্মকে সূর্যালোকস্পর্শে প্রাণোচ্ছলতায় উজ্জীবিত করিয়া তোলে। এই শক্তি থাকিলে সর্বনিম্নে থাকিয়াও সর্বোচ্চ শিখরে উঠা যায়, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াও সর্বসম্পদের অধিকারী হওয়া যায়, নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিয়াও সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ হওয়া চলে। এই প্রসঙ্গেই স্বামীজী বলিয়াছিলেন: জগৎ আজ চরিত্রবলকেই চায়। জগৎ এমন সব মানবদের চাচ্ছে যাদের জীবন প্রেম-তপস্যার হোমাগ্নিতে উদ্দীপিত। ঐ স্বার্থহীন প্রেমের অমোঘ শক্তিতে উৎসারিত প্রতি কথাটি বজ্রের সুদৃঢ় শক্তিতে রূপায়িত হয়ে কার্য করবে। জগৎ যে আজ দুঃখ জ্বালায় দগ্ধ হতে চলেছে। জাগো জাগো, ওগো মহাপ্রাণ! তোমাদের ঘুমের আর কি অবসর আছে?

কেবলমাত্র স্বামীজী নহেন, সে-যুগের যীশুও একদিন উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন: যে নিজের জীবন রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইবে, সে তাহার জীবনকেই হারাইবে, কিন্তু…যে-মানুষ জীবন উৎসর্গ করিবে সে প্রকৃত জীবনকেই রক্ষা করিবে।

যশোলিপ্সু বা প্রতিদানাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই কাজ করিতে অগ্রসর হইলে চলিবে না। ইহা হইবে স্বতঃস্ফূর্ত। ধূপের মত জ্বলিলেও ইহা গন্ধ বিকীরণ করিতে থাকিবে, পুষ্পের মত বিচ্ছিন্ন হইলেও সুগন্ধ ছড়াইতে থাকিবে, এসেন্সের শিশির মত ভাঙিয়া যাইলেও সৌরভে সকল দিক আমোদিত করিয়া তুলিবে। সর্বমানবের সুকৃতির জন্য এই সর্বগ্রাসী প্রেমই বলিতে পারে—'এমনকি কোন অপরাধ করিয়াও যদি একটি মাত্র মানব-সন্তানের উপকার করিতে পারি তাহা হইলে আমি ঐরূপ অপরাধ করিয়া অনন্ত নরক ভোগ করিতেও প্রস্তুত।' স্বামীজীর এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় ছিল বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে নিবেদিতাকে বলিতে শুনি: ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে যে কোন কাতরধ্বনিই উঠুক না কেন তাহা তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিরূপে উত্তর পাইত। ভারতের প্রত্যেক ভয়ার্ত চীৎকার, প্রতিটি দুর্বলতাপ্রসূত শিহরণ ও অপমানজনিত সঙ্কোচবোধ তিনি জানিতেন এবং বুঝিতেন।

আজিকার পৃথিবীতে নব বিশ্বামিত্রের গ্রহ-সৃজনের যুগে মানব ঐ মহাজাগতিক প্রেমের পূজারীকেই 'জাগৃহি'-মন্ত্রের উদ্গাতারূপে গ্রহণ করুক; তাঁহার ঋতবচনের প্রসন্ন আশীর্বাদে উদ্বেলিত হইয়া উঠুক—ইহাই প্রার্থনা। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ**!

আবির্ভাব

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

বিভেদ-পূর্ণ এ মহাভুবনে সাধিতে সমন্বয়,
　　হে মহাসূর্য, তোমার অভ্যুদয়!
মানুষে মানুষে হেথা গরমিল, দিকে দিকে হানাহানি,
হৃদয়ের প্রেম হেথা লাঞ্ছিত, জাগে হিংসার গ্লানি!
ধাতার আসনে হেথায় অসুর বসিয়াছে দৃঢ় বলে,
ধরণীর প্রাণ হ'ল বিগলিত আর্ত-অশ্রু-জলে!
এ মহাযুগের সব ভেদাভেদ করিবারে অবসান,
আসিয়াছ তুমি হে যুগপুরুষ, হে মহাবিশ্বপ্রাণ!

তব প্রদীপ্ত কিরণ প্রসারি' এ বিশ্বে চারিধারে,—
　উদিয়াছ তুমি যুগের সিংহদ্বারে!
এসেছিলে যবে, কেহ ত' জানেনি কিছু তব পরিচয়,
আড়ালে আড়ালে ক'রে গেলে লীলা, দিয়া গেলে বরাভয়!

যতদিন যায় প্রকাশ তোমার হতেছে সমুজ্জ্বল,
চির চেতনার দ্যোতনা জাগিছে বিথারি' গগনতল!
সকল আড়াল দূর ক'রি আজ হয়েছ দীপ্তিমান্,
আসিয়াছ তুমি হে যুগপুরুষ, হে মহাবিশ্বপ্রাণ!

আজিকার এই লক্ষ্যবিহীন শ্রীহীন বিশ্বমাঝে
তব উদাত্ত আহ্বান-ধ্বনি বাজে!
ভ্রান্তি-মায়ায় মুগ্ধ মানব মরীচিকা-পিছে ছুটে,
অমৃত ভুলিয়া কালকূট-বিষ ভরিছে হৃদয়-পুটে
আলোক ত্যজিয়া তিমিরের মাঝে হয় তারা পথ-হারা,
প্রসারতা-হীন কীর্ণ জীবনে সতত বন্দী তারা!
সত্যেরে ভুলি' মিথ্যার মোহে করে তারা অভিযান,
আসিয়াছ তুমি তাহাদের লাগি' হে মহাবিশ্বপ্রাণ!

বক্ষে বহিয়া এ মহাযুগের সকল বেদনা-ভার,
জাগিয়াছ তুমি করুণার অবতার!
যেথা যত ব্যথা আছে সঞ্চিত, আছে যত হা-হুতাশ,
তার নিরসনে তোমার মাঝারে জাগে মহা আশ্বাস!
অসতের মাঝে সত্য জাগিছে, তমসার মাঝে আলো,
অমৃত জাগিছে মৃত্যুর মাঝে—তুলি' যবনিকা কালো!
মহাজীবনের নভ-অঙ্গনে আজি নব উত্থান!
আসিয়াছ তাই হে যুগপুরুষ, হে মহাবিশ্বপ্রাণ!

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগ

নৃত্যগোপাল রায়

কথিত আছে—১৯২১ খৃঃ যখন অসহযোগ আন্দোলনের বন্যা সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিতে-ছিল তখন একদল মুক্তিকামী বিপ্লবী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য শ্রীঅরবিন্দের পানে তাকাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'না, এ আমার যুগ নয়—এ গান্ধীর যুগ।'

১৯২১ খৃঃ ভারতবর্ষে গান্ধীজীর যুগই শুরু হইয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজীর যুগ ইতিমধ্যেই অতীতের ইতিহাসে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে। এই রূপ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা অনেক গুলি যুগের পরিচয় পাই—যেমন বৈদিক যুগ, উপনিষদের যুগ, রামায়ণ-মহাভারতের—তথা রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের যুগ, বুদ্ধের যুগ, শঙ্করের যুগ ও শ্রীচৈতন্যের যুগ। পৃথিবীর অন্যত্রও এইরূপ কত যুগ চলিয়া গিয়াছে। মিশরীয়, গ্রীক্ ও রোমীয় সভ্যতার পর ইওরোপে যে যুগ আসিল তাহার কেন্দ্রে রহিয়াছেন যীশুখৃষ্ট। তারপর সেখানে আসিল রেনেসাঁ যুগ। আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞানের যুগকে অনেকে কার্লমার্কসের যুগও বলিয়া থাকেন। কথাটা উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

ডায়ালেকটিক্স-এর ব্যাখ্যায় ইতিহাসের জড়-বাদমূলক বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া একদল পণ্ডিত যাহাই বলুন, একথা অনস্বীকার্য যে এক-একজন মহামানবকে কেন্দ্র করিয়াই এক-একটা যুগ চলিয়াছে এবং তাঁহারা মানুষের ভাবরাজ্যে বিপ্লব আনিয়া সভ্যতার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। রাজা বা রাষ্ট্রের প্রভাবই বলি, অর্থনীতি বা বিজ্ঞানের প্রভাবই বলি—সবই সত্য হইলেও সেই ভাব বিপ্লবকে কেন্দ্র করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধকে বাদ দিলে মহারাজ অশোক কোথায় বিলীন হইয়া যান—কোথায়ই বা থাকে তাঁহার সাম্রাজ্য বা বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব? যীশুখৃষ্টকে বাদ দিয়া ইওরোপীয় সভ্যতার যাহা বাকী থাকে তাহার মূল্য কতটুকু? বস্তুতঃ মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস বুদ্ধ ও খৃষ্টকে বাদ দিয়া রচিত হয় নাই। হজরত মহম্মদ না আসিলে ইস্‌লাম-কৃষ্টি কোথায় থাকিত? পরিশেষে—কার্লমার্কস্ না আসিলে রাশিয়ার বর্তমান রূপান্তর ঘটিত কি?

বুদ্ধ হইতে মার্কস্ পর্যন্ত পৃথিবীতে অনেক মহামানবের অভ্যুদয় হইল—সভ্যতার অগ্রগতিতে অনেকগুলি যুগ আসিয়াছে ও গিয়াছে, কিন্তু এখনও তো মানুষের সমস্যার সমাধান হইল না। যে দেশেই হউক, বা যে ধর্মেই হউক—মহামানব যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকেই চাহিয়াছেন মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি দূর করিতে; তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রেমের এবং সাম্যের বাণী শুনাইয়াছেন। কিন্তু তবু তো আজও মানব সমাজে প্রেম ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল না। প্রকৃত পক্ষে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বই আজ পর্যন্ত মানব জাতির প্রধানতম সমস্যা। ভগবান বুদ্ধ অহিংসার কথা বলিলেন, তাঁহার প্রভাবে মনে হয় যেন অহিংসানীতি হিংসাবৃত্তিকে জয় করিল;

কিন্তু তাহাও কালের স্রোতে ভাসিয়া গেল। কেন? হয়তো বা ভগবান বুদ্ধের নেতিবাচক (negative) দর্শনের জন্য। বুদ্ধ যে মুক্তির সন্ধান দিলেন তাহার পরিণতি নির্বাণে, নেতিবাচক শূন্যতায়। কিন্তু মানুষের মন শূন্যতায় তৃপ্ত হয় না। সে চায় পূর্ণতার সন্ধান। সে চায় রূপের আশ্রয়—'পজিটিভ' কিছু। তাই বোধ হয় নিরাকার ব্রহ্মও মানুষের কল্পনায় রূপের সীমানায় ধরা পড়িয়াছেন; এবং উপনিষদ্ দিয়াছেন সেই পূর্ণতার সন্ধান—সচ্চিদানন্দের পূর্ণতা। তারপর—বুদ্ধ অহিংসার কথা ও মানব-দরদের কথা বলিলেন সত্য, কিন্তু কেন আমি অপরের প্রতি দরদী হইব, কেন হিংসা করিব না—এই প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন নাই। মানুষ যখন এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, তখন আর সে ঐ অহিংসা-মন্ত্রে নিষ্ঠা রাখিতে পারিল না।

আসিলেন যীশুখৃষ্ট। খৃষ্টধর্মের মূলমন্ত্র তিনি দিলেন: প্রতিবেশীকে ভালবাসো, শত্রুকেও ভালবাসো। কিন্তু তিনিও ঐ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। কেন আমি আমার প্রতিবেশীকে এবং আমার শত্রুকে ভালবাসিব? তাহাদের সঙ্গে আমার কোথায় প্রেমের সম্পর্ক? তাই খৃষ্টধর্ম অর্ধেক পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িলেও সেই ধর্মের কাঠামো-টুকুই শুধু আজ বজায় রহিয়াছে। যীশুখৃষ্ট সত্য-সত্যই আজ ইওরোপ হইতে নির্বাসিত। অন্যান্য মহামানব—যাঁহারা অতীতে প্রেমের কথা বলিয়াছিলেন তাঁহারাও ঐ 'কেন' প্রশ্নের উত্তর দেন নাই।

কার্ল মার্কস্ সাম্যের বাণী শুনাইলেন। তিনি জড়বাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাঁহার নীতি—বৈজ্ঞানিক জড়বাদ। কিন্তু তথা-কথিত বৈজ্ঞানিক জড়বাদীয় বিশ্লেষণে মানুষের পরিচয় কি? জড় বিজ্ঞান বলে, মানুষে আর পশুতে প্রবৃত্তিগত কোনও পার্থক্য নাই। কি মানুষ, কি পশু—যে আদিম প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত তাহা হইল: জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধি। সবাই বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে এবং বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সংগ্রাম করিতেই হইবে, যোগ্যতমই টিকিয়া থাকিবে—(Survival of the fittest). তাই যদি হয় তবে এই বৈজ্ঞানিক জড়বাদ-ভিত্তিক সাম্য কোথায় থাকে? মানুষকে যদি বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সংগ্রাম করিতেই হইবে এবং যদি একমাত্র যোগ্যতমই বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী হয়, তবে মানুষ অপর মানুষকে ভালবাসিবে কেন? সে প্রতিবেশীর সঙ্গে বাঁচিয়া থাকার সংগ্রামে লিপ্ত থাকিবে না কেন—যেমন পশুরা করিয়া থাকে? পশুপ্রবৃত্তিই যদি মানুষের প্রধানতম দুর্দমনীয় প্রেরণা হয়, তবে মানুষও পশুর মতোই বাঁচিবার জন্য পরস্পারের সহিত সংগ্রাম করিবে না কেন? এই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মত অনুসরণ করিলে বলিতে হয়: প্রেম ও সাম্য কখনও মানুষের ধর্ম হইতে পারে না; হিংসাত্মক দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম।

মার্কস্ এই সংগ্রামের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছেন। তাঁহার সাম্যবাদের মূলকথা সংগ্রাম, শ্রেণীসংগ্রাম (struggle and class struggle). আবার বিশেষভাবে প্রণিধান করিবার বিষয় এই যে মার্কস্ নিজেই স্পষ্ট বলিয়াছেন যে সত্যিকার সাম্য হয়তো পৃথিবীতে কোনদিনই আসিবে না—কিন্তু সংগ্রাম চিরকালই চলিবে। তাঁহার মতে মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম করিতে করিতে মনুষ্য-সমাজ সাম্যের দিকে গতিবেগ অর্জন করিবে; কিন্তু পথিমধ্যে যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব হইবে তাহার সংঘাতে তাহার গতির নিশানা ক্রমাগতই পরিবর্তিত হইতে থাকিবে। কথাটিকে

তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন হেগেল (Hegel)-এর ডায়ালেকটিক মতবাদের সহায়ে,—অর্থাৎ থিসিস এণ্টিথিসিস ও সিন্থেসিস (Thesis, Antithesis and Synthesis) নামক ফরমুলার সহায়ে।

মতবাদটি এইরূপ : একটি অবস্থার (বা Thesis-এর) সঙ্গে সংঘর্ষ হইবে তাহার প্রতিকূল অবস্থার (বা Antithesis-এর), এবং এই সংঘাতের ফলে সংশ্লেষণ বা Synthesis আসিবে ; কিন্তু সেই সমন্বয় (Synthesis)ই তখন হইয়া দাঁড়াইবে নূতন অবস্থা—Thesis. আসিবে আবার তাহার প্রতিকূল বা বিপরীত—Antithesis ; পরস্পর সংঘর্ষ-ফলে দেখা দিবে আবার নূতন সমন্বয় (Synthesis)। ক্রমাগতই এইরূপ সংঘাত ও সমন্বয় চলিতে থাকিবে। কাজেই আজ যে সাম্য বা Synthesis লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য হইতে সমাজ ক্রমাগতই দূরে সরিয়া যাইতে থাকিবে সংগ্রাম ও সংঘাতের মধ্য দিয়া।

এইতো সংগ্রামের চিত্র। সংগ্রাম যদি অনিবার্য সত্য হয়, তবে এই মতবাদ অনুসারেই সাম্য আসিতে পারে না। সংগ্রাম যদি সত্য হয় তবে প্রেম থাকিতে পারে না—যেমন থাকিতে পারে না একই সময়ে দিন ও রাত্রি। পশুপ্রবৃত্তি যদি মানুষের মূল প্রেরণা হয়, তবে মানুষকে অহিংস হইতে বলা আর হিংস্র ব্যাঘ্রকে হিংসা বর্জন করিতে বলা—একই কথা। মার্কসীয় সাম্যবাদের মূলে যে দর্শন রহিয়াছে সেই দর্শন সংগ্রামের—তথা হিংসার দর্শন। সেই দার্শনিক তত্ত্ব অনুযায়ী প্রেরণার ক্ষেত্রে মানুষে আর পশুতে কোনও তফাৎ নাই। তাই মার্কস্-পন্থী সাম্যবাদের দেশ রাশিয়ায় ৪০ বৎসরেও প্রেম আসে নাই—হিংসা বর্জিত হয় নাই। রুশদেশে সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে (সরকারী স্বীকৃতি) সহস্র সহস্র লোকের জীবন বলি দেওয়া হইয়াছে। কাহাদের জীবন লওয়া হইয়াছে?—একদিন যাহারা ছিল কর্মের সাথী, দুর্দিনের বন্ধু, সংগ্রামের সহচর—একদিন যাহারা প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া, হাতে হাত মিলাইয়া, পাশে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিয়াছিল। আবার দেখি সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিবেশী রাজ্যের অসহায় নরনারীর প্রাণ তোপের মুখে উড়াইয়া দিতেও দ্বিধা করিল না। তোপের খাদ্য এই হতভাগ্য কাহারা?—আদরের 'জনগণ'ই।

এখন প্রশ্ন জাগে যুগ যুগ ধরিয়া এত প্রেম ও সাম্যের বাণী বিঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও আজও কেন সাম্য আসিল না—প্রেম আসিল না—হিংসা বর্জিত হইল না? উত্তরে বলা যায় বুদ্ধ ও খৃষ্ট হইতে মার্কস্ পর্যন্ত অনেকে অহিংসা বা প্রেম বা সাম্যের মন্ত্র দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কেহই এই প্রশ্নের উত্তর দেন নাই যে কেন মানুষ হিংসা বর্জন করিবে—প্রেম বিলাইবে, সাম্য স্থাপন করিবে, কেন একে অপরকে ভালবাসিবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন উপনিষৎ—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্' —এই সকলই ব্রহ্ম, সকলই আত্মস্বরূপ। তারপর আবার কত যুগ পরে এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। সহজ সরল ভাষায় রামকৃষ্ণ বলিলেন : জীব যে শিব, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। ঠাকুরের কাছে এই শাশ্বত সত্য চাক্ষুষ হইয়া ধরা দিল। তাই তিনি বলিতেছেন : দেখি কি ঐ মানুষ, গরু, ঘাস, জল, সব খোলগুলির ভিতরেই সেই এক সচ্চিদানন্দ রয়েছেন। ঠিক ঠিক দেখতে পাই—মা যেন নানা রকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানা রকম সেজে ভেতর থেকে উঁকি মারছেন। কালীঘরে পূজা করতাম—হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়—কোশাকুশী, বেদী, ঘরের চৌকাঠ—সব চিন্ময়। মানুষ, জীবজন্তু—সব চিন্ময়। তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দিকে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলাম।

এতদিনে প্রশ্নের উত্তর মিলিল—কেন আমি প্রতিবেশীকে ভালবাসিব—কেন আমি শত্রুকে ভালবাসিব?—সকলেই যে আত্মস্বরূপ। তুমি ও আমি যে এক। সকলেই যে একই মহাসাগরের ঊর্মি-মালা। "Christs and Buddhas are waves on the boundless ocean, which *I am*" ('আমি' সেই অসীম সমুদ্র, খৃষ্ট বুদ্ধ যাহার তরঙ্গমাত্র)—বলিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যে সত্য উপনিষদের ঋষিদের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল—সেই সত্য আবার ধরা দিল শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে, সেই সত্যই মন্ত্রাকারে ধ্বনিত হইল স্বামীজীর কণ্ঠে:

ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।

রচিত হইল নূতন করিয়া মানবজাতির জীবনবেদ—বিরাটের উপাসনার মহামন্ত্র। স্বামীজীর এই জীবনবেদের মূলমন্ত্র নেতিবাচক অহিংসা নয়—তাঁহার মূলমন্ত্র অস্তিবাচক প্রেম। স্বামীজী বলিলেন, "তিনি সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ। অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুইই এক।" তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'; স্বামীজী বলিলেন, 'দরিদ্র-দেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। এইরূপে উদ্গীত হইল নরনারায়ণ-গীতা।

মানুষের পশুবৃত্তিকে স্বামীজী একেবারে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাহাই মানুষের চরম পরিচয় নয়। স্বামীজী বলিলেন, প্রত্যেকের মধ্যে অনন্ত দেবত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে—"Each soul is potentially divine."

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—উপনিষদের এই বাণী পুনরাবৃত্তি করিয়া মানুষের দেবত্বের যে জীবনবেদ, যে দর্শন স্বামীজী ঘোষণা করিলেন তাহাই স্বামীজীর মতে সাম্যবাদের ভিত্তি। যতদিন না মানুষ এই জীবনবেদ গ্রহণ করিতে পারিবে ততদিন পৃথিবীতে প্রকৃত সাম্য আসিবে না। কিন্তু প্রশ্ন হইল—এই জীবনবেদ কি মানুষ কখনও গ্রহণ করিতে পারিবে? আজিকার পরিস্থিতি দেখিয়া ইহা অসম্ভব মনে হইলেও একথা নিশ্চিত যে মনুষ্যজাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সাম্যের এই দার্শনিক ভিত্তি গ্রহণ করিতেই হইবে। বিজ্ঞান একা মনুষ্যজাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না, বরং ধ্বংসের মুখেই ঠেলিয়া দেয়, তাহা বারে-বারেই প্রমাণিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই ধ্বংসলীলা রোধ করিতে পারে একমাত্র বৈদান্তিক সাম্যদৃষ্টিমূলক জীবনদর্শন এবং জগৎকে সেই জীবনবেদ দান করিতেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব। মনুষ্যজাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই জীবনবেদ গ্রহণ করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর নাই। একথা কল্পনা করিতে কোনও দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন হয় না যে মানুষ একদিন হিংসা দ্বেষ ও দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠিবেই; এবং আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণীও খুব সহজেই করা যায় যে বিবর্তনের পথে মানুষ নিশ্চিতই এতখানি অগ্রসর হইবে যে একদিন—হয়তো হাজার বৎসর পরে—আমাদের বর্তমানের গর্বের বৈজ্ঞানিক যুগ, এই বিংশ শতাব্দী ইতিহাসের পাতায় 'প্রধানতম বর্বর যুগ' বলিয়া অভিহিত হইবে, এবং সেদিনের বিচারে হিরোসিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসলীলার এই বিজ্ঞানাভিমানী যুগ 'বর্বর যুগ' বলিয়া ইতিহাসের পাতায় কলঙ্কের অক্ষরে অঙ্কিত হইবে। মনুষ্যজাতি যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া হিংসার পথে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না, একথা অবধারিত সত্য। মানবজাতি অবশ্যই বাঁচিয়া থাকিবে এবং বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়াই স্বামীজীর বৈদান্তিক সাম্যের বাণী এই আণবিক যুগের অব্যবহিত পূর্বেই বিজ্ঞানাভিমানী দেশেই ধ্বনিত হইয়াছে। এই বাণী মানুষকে শুনিতেই হইবে,

'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব শুধু ভারতের কল্যাণের জন্যই নয়, সমগ্র মানবজাতির মুক্তির জন্য; তাই স্বামীজীকে জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিতে হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহাকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই ইঙ্গিতে —ইঙ্গিতে কেন, অমোঘ নির্দেশে স্বামীজীকে আমেরিকা ও ইওরোপ যাইতে হইয়াছিল। পাশ্চাত্যে চৈতন্যের বাণী—বৈদান্তিক সাম্যের বাণী বহন করিয়া তিনি নূতন যুগের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের যুগ অতীতের ইতিহাস নয়, পিছনে নয়—সম্মুখে রহিয়াছে; তাহার সূচনামাত্র হইয়াছে। সম্মুখে আগতপ্রায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগ ঝুটা সাম্যের যুগ নয়, জগতে প্রকৃত সাম্যের যুগ। আমাদের নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে যে কার্ল মার্কসের যুগ অস্তমিতপ্রায় এবং সারা পৃথিবীতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগ সমাসন্ন। স্বামীজী ঘোষণা করিয়াছিলেন: "জগৎ রামকৃষ্ণের হইয়া গিয়াছে"—একথা স্তুতিবাচক উক্তি নয়। জগৎকে বাঁচিতে হইলে রামকৃষ্ণকে ধরিতেই হইবে এবং মানুষ বাঁচিবে বলিয়াই রামকৃষ্ণকে ধরিবে।

এই অনাগত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগের মূলমন্ত্র 'প্রেম ও সাম্য'। এই সাম্য জড়বাদভিত্তিক নয়—চৈতন্যবাদভিত্তিক। মানুষ যে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে তাহার মাপকাঠি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নয়, চৈতন্যের আবিষ্কার। "জড়ের মধ্যেও তিলে তিলে চৈতন্যের আবিষ্কারই সভ্যতার ইতিহাস"—স্বামীজীর এই কথাই সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা।

জগতে নবযুগের প্রবর্তন করিতে স্বামীজী যে সাম্যের মন্ত্র দিলেন, তাহার ভিত্তি আধ্যাত্মিক হইলেও তাহার বাস্তব দিক রহিয়াছে। আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হইয়াও স্বামীজী ছিলেন বাস্তববাদী এবং তাঁহার ধ্যানের সাম্যবাদে জীবনের বাস্তব দিকও ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাই তিনি চাহিয়াছিলেন ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই যে স্বামী বিবেকানন্দই ভারতের সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রী। তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন: I am a socialist—(আমি একজন সমাজতন্ত্রী)। তখন এদেশে কেহ সমাজতন্ত্রের নামও শোনে নাই। স্বামীজীর এই ঘোষণা শুধু কথার কথা নয়। তিনি শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থানকে কলকণ্ঠে স্বাগত জানাইয়াছিলেন। তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য-যুগ চলিয়া গিয়াছে, এখন চলিতেছে বৈশ্যের বা capitalist ব্যবসায়ীদের যুগ; এই যুগও শেষ হইতে চলিয়াছে। ইহার পরে অনিবার্যরূপে আসিতেছে শূদ্রের বা শ্রমিকদের (proletariat) যুগ। সেই যুগকে তিনি অভিনন্দিত করিতেছেন। কেন? এই কারণে যে সেই ব্যবস্থায় ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও অনেকখানি অর্থনৈতিক সাম্য আসিবে। বহুর কল্যাণের জন্যই তিনি শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয় ও সমাজতন্ত্র চাহিয়াছেন। তিনি যে বিরাটের উপাসনা করিতে দেশবাসীকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহাতেও এই সাম্যের কথা স্পষ্ট ধ্বনিত হইয়াছে।

এই সাম্যবাদের মূলে যে জীবনবেদ রহিয়াছে তাহা ভারতের শাশ্বত বাণী। ভারতের এই শাশ্বত বাণী পুনরাবিষ্কার করিয়া স্বামীজী যেদিন গাহিলেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?'—সেইদিন হইতেই ভারতের বুকে স্বামীজীর যুগ আসিয়াছে এবং সেই যুগই চলিতেছে। গান্ধীজীর যুগ সেই যুগেরই অন্তর্যুগ, একটি ঢেউ-বিশেষ। জাতীয় জাগরণ—রাজ-

নৈতিক চেতনা, জনকল্যাণ-আন্দোলন এ-সবও স্বামীজীর যুগেরই বিভিন্ন স্রোতোধারা। ভারতের প্রাণ-বহ্নি স্তিমিতপ্রায় হইয়াছিল; সেই বহ্নি-শিখা স্বামীজী আবার প্রদীপ্ত করিলেন; পূর্ণ-দ্যুতিতে সেই প্রাণবহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল। তাহারই ফলে দেখা দিল ভারতের সর্বক্ষেত্রে নব-জাগরণ।

ভারত আবিষ্কার করিয়াছিল মানুষের দেবত্ব, পাশ্চাত্য আবিষ্কার করিয়াছে মানুষের পশুত্ব। পাশ্চাত্যের আবিষ্কারের বিভ্রম ভারতমানসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেই মেঘাচ্ছন্ন মোহাচ্ছন্ন ভারতমানসকে মুক্ত করিলেন, ভারত তাহার অন্তরের আলোক ফিরিয়া পাইল। তারপর যেদিন স্বামীজী ভারতের জীবনবেদের বাণী লইয়া প্রতীচ্য অভিযানে বাহির হইলেন সেইদিন হইতে জগতে নূতন যুগের—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগের সূচনা। কেননা, সেইদিন হইতে ভারতবর্ষ সমগ্র জগৎকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিতে শুরু করিয়াছে।

আজ যুগসন্ধিক্ষণে চলিয়াছে ভারতের ও প্রতীচ্যের মধ্যে আদর্শের প্রচণ্ড সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে জয় হইবে মানুষের, জয় হইবে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের। প্রেমের উদয় হইবেই—সত্যিকার সাম্যও আসিবে,কেননা মানুষের বিবর্তন বন্ধ হইতে পারে না। একদিন সে উপলব্ধি করিবেই যে সকলেই আত্মস্বরূপ—মানুষে মানুষে কোনও ভেদ নাই, প্রেম তাহার শাশ্বত ধর্ম, সাম্য তাহার অনাদিকালের জীবনদর্শন।*

এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্তভাব—যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়া এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে। এই নব যুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান…।

—স্বামী বিবেকানন্দ

*[বালককাল হইতেই স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত নৃত্যগোপাল ১৯২১ খৃঃ অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন, ১৯২২ খৃঃ নিজ গ্রামে সমাজ-সেবার উদ্দেশ্যে 'বিবেকানন্দ কর্মমন্দির' স্থাপন করেন। ১৯৩০খৃঃ এম.এ. পড়ার সময় তিনি বেঙ্গল অর্ডিনান্সে ধৃত হন, এবং ছয় বৎসর বিভিন্ন বন্দী-নিবাসে আটক থাকার পর মুক্তি পান। নৃত্যগোপাল মেধাবী ছাত্র ও শক্তিমান্ লেখক ছিলেন, বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও উদ্বোধনে তাঁহার বহু প্রবন্ধ ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫৭ খৃঃ আগষ্ট মাসে ছয় বৎসর কঠিন রোগভোগের পর মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে এই অমূল্য জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধটি দুই বৎসর পূর্বে স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত ও লেখক কর্তৃক পঠিত।—উঃ সঃ]

গীতায় জীবন-সাধনা

শ্রীমতী ঋতা চক্রবর্তী

অগ্রহায়ণের শুক্লা একাদশী তিথি ভারতের ইতিহাসে এক বড় শুভদিন। প্রায় তিন হাজার বৎসর আগে আমাদের এই ভারতভূমিতে এক মহাসমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে পাণ্ডব এ কৌরববাহিনীর সিংহনাদ ও কলরবে দিগন্ত মুখরিত হইতেছিল, এমন সময়ে অর্জুন-সারথি কৃষ্ণ উভয় সেনার মাঝখানে রথখানি রাখিলে স্বজনদিগকে বধ করিতে হইবে ভাবিয়া অর্জুন যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইতে চাহিলেন। এমন সময়ে সারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে গীতায় বর্ণিত চরম জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন।

নানাদিক দিয়া গীতাগ্রন্থের নূতনত্ব দেখা যায়। শ্রীভগবান স্বয়ং উপদেষ্টা—ইহা নূতন, শ্রীভগবান স্বয়ং সারথি—ইহাও নূতন। বস্তুতঃ গীতায় অর্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধ দেখানো হইয়াছে, তাহাই মানুষের সহিত ভগবানের সম্পর্কের আদর্শ। কিন্তু একথা পূর্বে কেহ জানিত না। ইহাতে দেখানো হইয়াছে যে ভগবান বিশ্বব্যাপী, বিশ্বাতীত, অনাদি, অনন্ত হইয়াও মানুষের সহিত সরল সম্বন্ধ স্থাপন করেন, মানুষ সাজিয়া মানুষের মত ব্যবহার করেন। গীতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী। নানা মতের সমন্বয়ের চেষ্টা অন্যত্রও দেখা যায়, কিন্তু গীতার সমন্বয় স্বাভাবিক, যৌক্তিক এবং হৃদয়স্পর্শী। ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বাণীই ভারতের মর্মবাণী। ইহার আলোকেই ভারত চিরদিন সকল সমস্যার সমাধান করিয়া আসিতেছে।

একদিন ছিল, যখন যজ্ঞই ছিল ধর্ম। কিন্তু যখন উপনিষদের ঋষি জ্ঞানের আদর্শ উপস্থাপিত করিলেন, তখন অনেকেরই মনে হইল যে জ্ঞানের পথই পথ, কর্মের পথ পথ নহে। তারপর প্রশ্ন উঠিল: ব্রহ্ম কি নির্গুণ না সগুণ? অনেকে নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা কঠিন মনে করিয়া সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাকেই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া বরণ করিলেন। আর এক মতানুসারে ভক্তিপথই ঈশ্বরলাভের পথ।

এইরূপ ভাব-সংকটে শ্রীভগবান ছাড়া আর কে পথ নির্দেশ করিবেন? ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সংকট উপস্থিত হইলে যতবার প্রয়োজন ততবারই তিনি অবতীর্ণ হইবেন। বস্তুতঃ তাঁহার গীতার বাণীতেই এই সকল সমস্যার চিরন্তন সমাধান সম্ভব হইয়াছে। গীতা মীমাংসকের কর্মবাদ গ্রহণ করেন নাই, উপনিষদের কর্মত্যাগ-নীতিও গ্রহণ করিতে বলেন নাই। গীতা মতে কর্মের ফলত্যাগই ত্যাগ। গীতা বহুদেবতাবাদী নহেন, কিন্তু পুরাণে যে সকল দেবদেবীর কথা বলা হইয়াছে তাহাদিগকেও অস্বীকার করেন নাই—সকল দেবদেবীই এক ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র।

গীতা উপনিষদের সার। গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায় একটি যোগ, গীতার সার কথা 'যোগ': 'হে অর্জুন তুমি যোগী হও'। কিন্তু এই যোগ পতঞ্জলির যোগ নহে। ইহা সকল যোগের সমন্বয়—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগের সমন্বয়। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরমাত্মার সহিত যুক্ত হওয়া আত্মকেন্দ্রিক জীবনকে শ্রীকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক জীবনে পরিণত করা, মানবজীবনকে ভাগবত জীবনে পরিণত করার চেষ্টাই সাধনা। ইহাই গীতার শিক্ষার সার। গীতার ভক্তিযোগে যে গুণাতীত সগুণ ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরবাদ। শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যিনি যে ভাবেই যাহা কিছুর উপাসনা করুন না কেন, তাহার আরাধনার বস্তু আমিই

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।

—শ্রীমুখের এই মহাবাক্য সর্বকালের ও সর্বযুগের মহাবাক্য। জগতের কোন ধর্মাবলম্বীর সহিত ইহার বিরোধ নাই। একমাত্র গীতাশ্রয়েই সর্বধর্মের সমন্বয় হইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখেও এই বাণীই পুনরায় ধ্বনিত হইয়াছে।

পরমহংসদেবের ভাষা সহজ বাংলা, ঘরোয়া কথা: একই পুকুরের চার ঘাটে চারজন স্নান করে, জল তোলে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে। সকলের একই জল; কিন্তু কেউ বলে 'জল', কেউ বলে ওয়াটার, কেউ 'আপ', কেউ 'পানি'—যার যেমন ভাষা। এ যেন বেদের ঋষিরই কথা—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। আর সেই বহুরূপী গিরগিটির কথা: গিরগিটির রং কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও বা হলুদ, কখনও বা কোন রঙই নেই—কিন্তু একই গিরগিটি। উপনিষদের অরূপ ব্রহ্মের নানারূপ ধারণের এমন সহজ দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে। উপনিষদ বলিয়াছেন, 'যো একো হবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি' এ যেন সেই অরূপের রূপ দর্শনেরই কথা। ঠাকুরের উপদেশের মধ্যে সগুণ নির্গুণের সমন্বয়ের বাণীরও অভাব নাই। যিনি সাকার তিনিই নিরাকার। সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের জল ভক্তিহিমে জমিয়া বরফ হয়। ভক্ত ভগবানকে সগুণ এবং সাকার দেখেন।

ঠাকুর বলিতেন, বারবার গীতা কথাটি উচ্চারণ করিলে গীতার অর্থ বোঝা যায়—ত্যাগী, ত্যাগী। সাধনার দিক দিয়া দেখিতে গেলে আসক্তি ত্যাগের সাধনাই গীতার সাধনা। ঠাকুর অবশ্য সাত্ত্বিক ত্যাগের কথাই বারবার বলিয়াছেন। আগে ঈশ্বর, তারপর সংসারের কাজ। যে বুড়ি ছুঁইয়াছে, তাহার আর ভয় নাই। যাহার ঘাড় ঠিক হইয়া গিয়াছে, সে কলসী মাথায় নিয়াও নাচিতে পারে। আর এক সঙ্গে পাঁচ সাতটা কাজ করিলেও মনটি রাখিতে হয় ঈশ্বরে। আসক্তির শেষ রাখিতে নাই, যদি নাচিতেই হয়, তাহা হইলে দুই হাত তুলিয়া নাচাই ভাল। এক বগলে অহংকারের রেশমী সুতো লুকাইয়া রাখিয়া আর এক হাত তুলিয়া নাচিলে তেমন আনন্দ হয় না। ঠাকুর বলিতেন, 'কলিতে নারদীয়া ভক্তি'। বানর-ছানার মত মাকে আঁকড়াইয়া থাকার শক্তি সকলের নাই, কিন্তু বিড়াল-ছানার মত মায়ের উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকার চেয়ে সহজ স্বাভাবিক পথ আর কি হইতে পারে? ইহাই গীতার শরণাগতি বা প্রপত্তির কথা।

জীবনের সকল রকম সমস্যা—সে সব সমস্যা সর্বদাই মানব সমাজে দেখা দিয়াছে, কেবল সমাজে নয়—আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেও যে সব সমস্যার উদয় হয়, তাহাদের সমাধান আমরা গীতার ভিতর পাই। মোহগ্রস্ত অবস্থাতে অর্জুন যে ধর্মসংকটের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, সেইরূপ সংকটের সম্মুখীন আমাদেরও হইতে হয়।

আমাদের জীবনেও অনেক সময় আমরা কর্তব্যকে মোহবশে উপেক্ষা করিতে চাই, বুঝিতে পারি না। নির্ধারিত কর্মের ফলাফল বিবেচনা করিতে গেলে প্রকৃত কর্তব্য সাধন করা চলে না। নিরভিমান কর্মীর কর্মফলের বাসনা ত্যাগের নামই যথার্থ ত্যাগ। এই ভাব কি করিয়া লাভ করা যায়, সংসারভয়ে ভীত ব্যক্তি কি করিয়া সংসারের কঠোর কর্তব্যের সম্মুখীন হইবেন, তাহারই সমাধান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে আত্মীয়-নিধনে কাতর অর্জুনকে উপদেশ দিবার ছলে জগৎকে শুনাইলেন:

যাহা কিছু করিবে সমস্তই আমাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে অর্পণ করিবে। আরও বলিলেন:

তোমার কেবল কর্তব্য সম্পাদন করিবার অধিকার আছে। কিন্তু ফল প্রত্যাশা করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই, কর্মের ফল-কামনায় তোমার যেন প্রবৃত্তি না জন্মে এবং কর্ম ত্যাগ করিতেও যেন তোমার আগ্রহ না হয়। এইরূপে গীতার মাধ্যমে আমরা কর্মময় জীবনের সমস্যার মূল সমাধান খুঁজিয়া পাই। দুঃখ দৈন্য দুর্বলতা দূর করিয়া সুখ শান্তির সন্ধান পাই। সমগ্র জীবন হইয়া ওঠে এক অবিরাম সাধনা।*

* বোলপুর গীতা-জয়ন্তী-উৎসবে পঠিত।

স্বামী তুরীয়ানন্দের কথাসংগ্রহ

স্বামী রাঘবানন্দ-লিপিবদ্ধ

[পূর্বানুবৃত্তি]

আলমোড়া, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯১৫

স্বামী তুরীয়ানন্দ : স্বামীজী বলতেন, 'মনটাকে একেবারে কাদার মত করতে হবে।' কাদা যেমন যেখানে মারবে সেখানে থেকে যাবে, মনটা তেমনি যে বিষয়ে দেবে সে বিষয়ে লেগে থাকবে, উঠাবার কি জো আছে ?

কারো শরীর কাজের জন্য তৈরী, কারো বা ভজনের জন্য। কাজের জন্য একটা hankering (বাসনা) না হ'লে কাজ হবে না, তামসিকতা যাবে না, স্বামীজীর কাজ এলে তাতে পেছ্-পা হবে না, খুব করবে। আবার যখন ধ্যানে বসবে, তখন কাজের কথা ভুলে যাবে। শরৎ প্রভৃতি খুব কাজ করতে পারে, আবার ধ্যান-ধারণাও পারে। আমারও ঐ রকম ছিল।

মনে কিছু গ্রহণ করাও পরিগহ। যেমন তুমি বলছ, এখন ছ'মাস তো চলুক এ টাকায়; এটা পরিগ্রহ। মনে মনে একটা ঠিক ক'রে রেখেছ যে, এই রকম। এই পরিগ্রহ থেকেই জন্ম-টন্ম (দেহপরিগ্রহ) যা কিছু। তোমার মন যেখানে রয়েছে সেখানে তুমি রয়েছ।

পরিগ্রহ না করলে তোমায় কোথায় থাকতে হবে ? তোমাকে আত্মায় থাকতে হবে। একটা practice (অভ্যাস) তোমায় highest (সর্বোচ্চ) স্তরে নিয়ে যাবে। মহাপুরুষরা মনে কিছু মতলব রাখেন না। যেখানে রয়েছেন সেখানেই থাকেন। কেউ নিয়ে গেল তো গেলেন। তাঁদের কোন আঁট থাকে না, তাঁদের মন যেন এলিয়ে গেছে।

এই ঝগড়া হ'ল তো এই ভাব, মহাপুরুষদের যেন ছোট ছেলের স্বভাব। সাংসারিক লোকের কারো সঙ্গে ঝগড়া হ'ল তো জন্মে আর তার সঙ্গে কথা হবে না, সে দিক দিয়ে যাবে না।

আমার কতগুলো সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। শরীর ভাল পেয়েছিলাম, মনও তিনি দিয়েছিলেন ভাল এবং সহ্যও হয়ে গিয়েছিল। পরিগ্রহ করতাম না। ঠাকুর বলতেন, 'খুব সরল উদার হবে'। মন open (খোলা) হবে। যত গোপন করবে, চাপবে—যত প্যাঁচ মারবে তত প্যাঁচ লেগে যাবে, তত বসে যাবে। অনেক তপস্যার ফলে মন সরল উদার হয়। যদি মনে করলাম, বাড়ী না গেলে নয়, তবে আমার যেতেই হবে—এ পরিগ্রহ।

আমি টাকাকড়ি লোকের কাছে চাইতে পারি না, আর চাইতে কখনও হয়নি। কারণ এ সাহস মা সব সময় রেখেছেন যে, 'নারায়ণ হরি' বলে লোকের বাড়ী ভিক্ষা ক'রে খেতে পারি। এ সাহস এখনও আছে, এখনও ভিক্ষা ক'রে খেতে পারি। তবে তা হ'লে পাতাল-দেবীতে* থাকতে হবে। যার যেটা শোভা পায়। তা না ক'রে ট্রাঙ্ক সঙ্গে রাখা ও রেঁধে বেড়ে খাওয়া—এ সব সাধুর ঠিক নয়। সর্বদা হুঁশিয়ার থাকতে হয়। উপনিষদে আছে, 'যুক্তেন মনসা সদা সমনস্ক সদশ্বা ইব সারথেঃ।' তা কি সোজা ব্যাপার ? তোমরা ভাল আশ্রয়ে এসে পড়েছ। তোমাদের সাত খুন মাপ। তবে

* আলমোড়া শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত মন্দির

অকপট হতে হবে। যীশু বলেছিলেন: যে মুখে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে সে নয়, যে প্রভুর ইচ্ছানুসারে কাজ করে—সেই তাঁকে পাবে।

ঠাকুর কামিনী কাঞ্চন স্পর্শ করতে পারতেন না। এ দুটো থেকে বাঁচতে হবে। আমরা কত দিন পয়সা ছুঁইনি। রসনার, জিভের সেবা করেই কি দিন যাবে? জিভকে চোখ রাঙিয়ে রাখতে হবে। এই দিচ্ছি, খুব। পাঁচ ব্যঞ্জন খাওয়া ভারি রাজসিক। ডাল চচ্চড়ি অম্বল, যথেষ্ট। আমার শরীর খুব ভাল ছিল, কিছুতেই পেছ-পা নয়। মনটা খুব strong (শক্ত) ছিল; শরীর তাই সব মেনে নিত। আর একটু একটু ক'রে করতে পারতাম না। করতে হবে তো একেবারে। এমন মনে হ'ত না যে, এত করলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে কিনা। ঐ ভাব মনে পড়তই না। আমার বন্ধুরা বলত, তুই মরে যাবি। আমি বলতাম, যা শালারা, তোরা বড় বেঁচে যাবি। পাঁচ-শ বৈঠক ও এক-শ ডন দিতাম। সাধু হয়ে বেশী হিসাব বুদ্ধি ভাল নয়, দু আনার জন্য মিনমিন করা ঠিক নয়।

১২ই নভেম্বর

ঠাকুর বলতেন, সংসারটা খালি কামের ব্যাপার। সংসার থেকে চলে আসা চারটিখানি কথা নাকি? কটা লোক আছে যারা স্ত্রী-সঙ্গ করেনি। ঠাকুর excited (উত্তেজিত) হয়ে বলতেন, 'কি বলছ? মা এই কটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাই বেঁচে আছি।'

সংসারকে ঠাকুর বলতেন কূপ। এতে পড়লে আর উঠবার জো নেই। চৈতন্যদেব রঘুনাথকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, তুমি সংসার-কূপ হ'তে বেঁচে গেলে।

১৩ই নভেম্বর

একবার বুড়ী ছুঁতে হবে। বুড়ী না ছুঁলে বড় ভয়ের কারণ; নাম যশ, বিষয় ইত্যাদি এসে পড়বে। শেষকালে চোর হয়ে বাড়ী ফিরতে না হয়। বুড়ীর কাছে থাকবো—বলাতে ঠাকুরের ধমক। জগৎটাকে মিথ্যা বোধ হওয়া চাই। তা না হ'লে অত ধ্যান-ভজনে কি হ'ল?

কিছুদিন কোমর বেঁধে লেগে বুড়ীটা ছুঁয়ে ফেল না? খালি আশীর্বাদে কিছু হবে না।

* * *

লোককে জব্দ করা মহা সংসারী বুদ্ধি। তুমি জব্দ করছ, কিন্তু তোমার উপর একজন আছেন। তিনি যখন তোমাকে জব্দ করবেন, তখন পালাবার পথ থাকবে না। দিনে যে সব ভ্রম হয়েছে, রোজ রাত্রে তা খতাবে। তবে তো ভ্রম সংশোধন হবে। যেখানেই যাও সেখানেই তুমি যা তাই। তোমার ভিতর যেমন, বাহিরটা সেই রকমই দেখবে—তা স্বর্গেই যাও না কেন! নতুন অবস্থায় পড়লে প্রথমে একটু উদ্বেগ হয়, যেমন জলে ঢিল ফেললে হয়। তারপর তুমি যে রকম তদনুরূপ অবস্থা হবে। তাঁর চরণ ছাড়া আর কোন গতি নেই। আমরা এখানে সেখানে comfort (স্বাচ্ছন্দ্য) খুঁজছি। কিন্তু তাঁর চরণ ছাড়া আর কোন জায়গায় শান্তি নেই। এক রাজা বলেছিল, চামড়া দিয়ে জগৎ মুড়ে দেবে, পায়ে ধুলো লাগবে না। মন্ত্রী এক জোড়া জুতো তৈরী ক'রে দিল, তাইতেই সমস্ত জগৎ চামড়া-মোড়া হয়ে গেল।

যতদিন তোমার আসক্তি রয়েছে—তুমি অনাসক্ত নও, ততদিন তুমি কুত্তা—খড়কুটো; তোমার কোন পদার্থ নেই। খুব ত্যাগ বৈরাগ্য, থাকা চাই, আর পাণ্ডিত্য। আজকাল যারা আসছে তাদের না আছে ত্যাগ, না বৈরাগ্য, না পাণ্ডিত্য;—হট্টগোল করছে, কোনও রকমে দিন গুজরান। দোষ-ত্রুটি খালি নিজের দেখতে হবে, পরের দিকে তাকালেই ভুল করবে। যাক

শালা শরীর। একটু পরিশ্রম ক'রে মনটাকে উপরে তুলে দাও। তারপর শরীর চুরমার হয়ে যাবে।

তাঁর উপর সব ছেড়ে দিতে হবে। একেবারে তাঁতে ঝাঁপ দিতে হবে। নইলে হবে না, হবে না। তারপর তিনি যেমন রাখেন। লোকে কেবল দেহের সুখ চাচ্ছে। কিসে ভাল থাকবে, ভাল খাবে—এই চিন্তা। কেউ কি তাঁকে চায়? এই তো সব এরা বি.এ. পাস ক'রে এসেছে; কেউ কিছু করছে না। তাঁর জন্য প্রাণ বার করতে হবে, তাঁকে দিতে হবে ষোল আনা মন; তারো উপর কিছু থাকে, 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' মনপ্রাণ তাঁতে অর্পণ করতে হবে। তিনি যখন যে কাজ দেবেন এই রকম 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' মন দিয়ে তা ক'রে ফেলতে হবে। সে কাজ ফুরুলে তিনি আবার অন্য কার্জ দেবেন। সেটিও প্রাণ দিয়ে করতে হবে। তা এইরূপে তাঁর কাজে প্রাণ বের করতে হবে। তা হলেই দু চারটা কাজ করলে তিনি ছুটি দেবেন। ফকির হতে হ'লে ফিকির ছাড়তে হবে, মতলব ছাড়তে হবে। সম্পূর্ণ তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে, তাঁতে ঝাঁপ দিতে হবে ঝুপ ক'রে। নিজের হাতে কিছু রাখলে চলবে না। দেহ মন প্রাণ আত্মা—সব তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে হবে, তিনি যা করেন—এই বলে। শরীরকে দেখতে হয় তিনি দেখবেন। লাঙ্গলে* যখন ছিলাম খুব অসুখ। গঙ্গারাম বললে, মঠে খবর দেব। আমি বললাম, 'খবরদার! চিঠি লিখেছ যদি শুনি তো এই অবস্থায় এখান থেকে চলে যাব। ঐখানেই বলেছিলাম, 'ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ'। সে কি ঢং ক'রে বলেছিলাম? তা নয়। ভিতর থেকে ঠিক ঠিক জানতাম।

*　　*　　*

প্রশ্ন—মনে অন্য চিন্তা আসে, কি ক'রে তাড়ানো যায়?

উত্তর—যতই তাঁর চিন্তা করবে ততই অন্য চিন্তা চলে যাবে।

ঠাকুর বলতেন, যতই পূব দিকে এগোবে ততই পশ্চিম দিক পেছিয়ে পড়বে। গঙ্গার স্রোত যেমন তরতর ক'রে বইছে তেমনি মনও তাঁর দিকে তরতর ক'রে বইবে। কিছু দিন এমনি চালাতে পারলেই ব্যস্! তারপর আপনি চলবে।

মনের উপর বড় বড় অক্ষরে লিখে দাও, 'NO ADMISSION'—(প্রবেশ নিষেধ)। তারপর এমন এক সময় আসবে যখন বলতে পারবে, Come one and all—(সকলে এসো)। আমি ঘরের দোয়ার খুলে রাখি বলেই তো লোক আসে; নতুবা বন্ধ ক'রে রাখলে লোক কি ক'রে আসবে? মনে কেন অন্য চিন্তা আসতে দেবে? তুমি দাও বলেই তো আসে।

প্রথম প্রথম শুধু ধ্যান জপ করতে পারবে না। তাই ঝালে ঝোলে অম্বলে খেতে হবে। মাছেরই ঝাল ঝোল অম্বল, অন্য কিছুর নয়। খানিকটা জপ, খানিকটা ধ্যান, খানিকটা পাঠ, খানিকটা গান—এই ভাবে নানা রকমে তাঁরই চিন্তা করতে হবে। কিছুদিন ঐরূপ করবার পর 'এক' চিন্তা করতে পারবে। শুধু জানলে হবে না, করা চাই। আমরা জানি সব, করি না কিছু। স্বামীজী বলতেন, 'আমরা এত বেশী জানি যে, আর একটু কম জানলে ভাল হ'ত।' কিছু কর, কর, কর। কেউ কিছু করে না। তোমাকেই খাটতে হবে, অপর কেউ তো তোমার হয়ে ক'রে দিতে পারবে না। একটা শ্লোকে আছে: তোমার বোঝা অপরে নামিয়ে নিতে পারে, কিন্তু খিদে পেলে তোমাকে নিজেই খেতে হবে, অপরে খেলে হবে না। ঠাকুর গাইতেন:

জলে কি রত্ন মিলে? মন কর প্রাণ অবধি,
ডুব দাও অগাধ জলে সহজ মানুষ ধরবে যদি।

* কনখলের নিকট গঙ্গাতীরে অবস্থিত।

আমরা এক সময়ে খুব করেছি। এখনও এমন অভ্যাস আছে যে, একটু মন দিলেই সেটা আবার ফিরে আসে।

১৭ই নভেম্বর

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়ের মোড় ফিরানো যায় কি ক'রে?

উত্তরে প্রথমে বললেন, আমি কি জানি? এই বলে চুপ ক'রে রইলেন। পরে এই তিনটি গান গাইলেন:

(১) নামেরি ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার

(২) শ্রীদুর্গা নাম ভুল না

(৩) কেন মন ভোল, শ্রীদুর্গা বল।

মালিশ শেষ হইলে স্বামী তুরীয়ানন্দ উঠিয়া বসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন:

কখনো কখনো কথাবার্তা বন্ধ ক'রে খুব তাঁর জপ করতে পার? দেখ কিছু না থাকলে কিছু জমে না। যে দিন আনে দিন খায়, সে কিছু জমাতে পারে না। কিন্তু একবার খেটেখুটে কিছু জমালে তারপর হু হু ক'রে বাড়তে থাকে। ধর্মজগতেও তাই। দিন কতক খুব খেটে কিছু জমিয়ে নাও। সদা সর্বদা খেতে শুতে বসতে তাঁর নাম কর। কথাবার্তা বন্ধ ক'রে এই নিয়ে লেগে থাক। ঠাকুর কম্পাসের কাঁটার কথা বলতেন। কাঁটা সর্বদাই উত্তর দিকে থাকে। কেউ যদি হাত দিয়ে সরিয়ে দেয়, তবে যাই ছেড়ে দেয় অমনি আবার উত্তরে গিয়ে দাঁড়ায়। তোমার মনও সেই রকম হবে। কেউ এসে যদি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়, তবে যাই সে ছেড়ে দেবে অমনি আবার তাঁর নাম জপ চলতে থাকবে। এই দেখ না, এতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। যাই চুপ করেছি অমনি মনে মনে গান চলছে—'কেন মন ভোল, শ্রীদুর্গা বল'—যা আগে চলছিল। তোমাকে বোঝাবার জন্যে নিজের একটা কথা বললাম। আর খুব গোপনে জপ করবে, যেন কেউ জানতে না পারে।

লোকে বলে তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে। আরে, তাঁর ইচ্ছা কি অমনি হয়? আগে তোমার খানিকটা ডানা ব্যথা হোক, তবে মাস্তুলে এসে বসবে।

প্রশ্ন—কিভাবে নাম করব?

উত্তর—ভাব আর কি? আমি ছেলে, তুমি মা। তাঁর নাম করছি; যেমন আমার সঙ্গে কথা কইছ, এমনিভাবে তাঁর সঙ্গে কথা কইবে। তিনি অন্তর্যামী ভিতরেই রয়েছেন।

প্রশ্ন—প্রার্থনাও কি করব?

উত্তর—হাঁ, প্রার্থনাও খুব করবে। প্রার্থনা আর তো কিছু নয়, শুধু তাঁতে যাতে মন থাকে, তাঁকে যাতে না ভুলি, এই প্রার্থনা। তা বলবে বই কি? খুব বলবে, কেন তোমাকে ভুলব? তোমাকে ডাকব বলেই তো সব ছেড়েছি। তুমি কৃপা ক'রে তোমাকে ভুলতে দিও না।

প্রশ্ন—ভজনও করব?

উত্তর—হাঁ, এই রকমের ভজন। নইলে এক-ঘেয়ে বোধ হতে পারে। তবে প্রথম জপটার দিকেই বেশী লক্ষ্য দিবে। এক-একটা ক'রে অভ্যাস করতে হবে।

খুব লেগে যাও। মনটাকে একবার বাগিয়ে নিতে পারলে আর ভাবনা কি? মন ব্যাটাই তো যত গোল করে। হাতে কাজ করবে, মনে সর্বদাই তাঁর নাম জপ করবে। শুধু জিহ্বা নাম উচ্চারণ করছে, কিন্তু মন বেগুন পাড়ছে, তা হ'লে হবে না। জিহ্বা ও মন একসঙ্গে তাঁর নাম করবে। এরি নাম—মন মুখ এক করা। মানস জপই ভাল।

প্রশ্ন—লোকসঙ্গে মিশলে সব গোল হয়ে যায়।

উত্তর—যতদিন ঠিক না হয় ততদিন লোকসঙ্গ করবে না। তারপর অভ্যাস হয়ে গেলে লোক-সঙ্গ করলেও ক্ষতি নেই।

আমরা যা করবার খুব করেছি; এখন তোমরা কর তো। আমরা আরও কিছুদিন বেঁচে

থেকে দেখি। তখন ঐ একভাবে ছিলাম। এখনও বেশ আছি; তোমাদের সঙ্গ হচ্ছে।

তাঁকে ডাকা তো একটা কাজ। পাঁচ সিকে পাঁচ আনা মন দিয়ে তাঁকে ডাকতে হবে। ডেকে ডেকে তাঁকে অস্থির ক'রে ফেল। ছেলে যখন একটু একটু কাঁদে, তখন মা আসে না। যখন চীৎকার ক'রে কাঁদতে থাকে, কিছুতেই থামে না তখন মা এসে কোলে নেয়।

সব তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে।

"যশ অপযশ সুযশ কুযশ সকলই মা তোমারি।
রসে থেকে রস ভঙ্গ কর কেন রসেশ্বরী॥"

আমার অসুখের কথায় রামদয়ালবাবু* বললেন, কর্মফল। তৎক্ষণাৎ আমি বললাম, 'তুমি কর্ম ধর্মাধর্ম…'। চণ্ডীতে আছে, 'কর্ম টর্ম যা কিছু সব তাঁ থেকেই হচ্ছে। তিনিই এক অনাদি অনন্ত। আর কিছু অনাদি আছে কি? লোককে বোঝাবার জন্য ও-সব বলতে হবে যে, কর্ম অনাদি—ইত্যাদি। অসুখ বিসুখ ভাল মন্দ—সব তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে যাচ্ছে। এই হ'ল সিদ্ধান্ত। তিনি যাকে বোঝান সেই বোঝে। তুমি 'না' করলে আমার সাধ্য নেই যে, বোঝাই।

কিছু ইচ্ছা করতে নেই। কিছুদিন থেকে দেখছি, যা ইচ্ছা করছি তাই হয়ে যাচ্ছে। তিন-বার scraping (ক্ষতস্থান চাঁচা) হয়েও কিছু ফল হ'ল না দেখে মনে হয়েছিল, সুরেশ ভট্টাচার্য এলে বেশ হয়। অমনি মন বললে, আসবে। তা দেখ, এসে গেল। আরও কয়টা কি কি দেখেছি। সব তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে। এটা একবার উপলব্ধি করা চাই। শুধু বিচারে কিছু হয় না। ঐটে হ'ল আমাদের resting place (বিশ্রামের স্থান)। কোন ধাক্কা টাক্কা খেলে আমরা ঐখানে গিয়ে শান্তি পাই।

সাধন ভজন আর কি? একটা জিনিস রয়েছে তার সঙ্গে নিজেকে identify (একাত্ম) ক'রে দেওয়া। দুটো তো নেই, একটাই রয়েছে। এক জানাই জ্ঞান, বহু জানাই অজ্ঞান। আমরা তাঁ থেকে নিজেকে আলাদা করেই যত গোলে পড়েছি। তাঁর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেই শান্তি। শান্তি আর কোথাও নেই। তাঁর দিকে যতই এগিয়ে যাবে ততই শান্তি। শেষে তাঁতেই rest (বিশ্রাম) করতে হবে। তুমি কি আর আলাদা? আলাদা ভাবলেই আলাদা। নইলে তুমি তো তিনিই। হার জিত সব তাঁর হাতে।

* * *

একজনের স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছিল। তাঁকে খুব সান্ত্বনা দিয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন:

তাঁকে চিন্তা করুন। ঠাকুরের একটা গল্প শুনুন। একজনের ছেলে কলেরায় মরে গেল, তখন সে রাত জাগার পর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। স্ত্রী এসে জাগালে। বললে 'তুমি কি নিষ্ঠুর! একটু কাঁদলে না? নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুলে?' ঘুমিয়ে সে একটা স্বপ্ন দেখছিল: সে রাজা হয়েছে, তার রাণী ও দশ ছেলে আছে ইত্যাদি। তাই সে বললে, 'একটু থামো ভেবে দেখি, কার জন্য কাঁদব—তোমার ঐ এক ছেলের জন্য, কি আমার এই দশ ছেলের জন্য?'

পরে মহারাজ বলছেন: শয়তান ও ভগবানের ঝগড়ার কথা শোন। ভক্তকে প্রলুব্ধ করতে ভগবান শয়তানকে পাঠালেন। শয়তান বড় বড়াই করছিল। শয়তান ভক্তের কাছে গিয়ে বললে, 'আমাকে ভজ। আমি তোমায় আরও ধন দৌলত দেবো।' ভক্তটি বললে 'শয়তান, এখান থেকে দূর হও।' তাতে শয়তান একে একে তার সব নষ্ট করলে। ছেলেগুলোকে মারলে। শেষে ভক্তের কুষ্ঠ হ'ল। তখনও শয়তান তাকে প্রলুব্ধ করতে লাগল। তাতে ভক্ত বললে, 'ভগ-

* 'উৎসব' পত্রিকার সম্পাদক রামদয়াল মজুমদার।

বানই দেন, আবার নিয়ে নেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।'

কারো অঙ্গুলি-নির্দেশের মধ্যে যেতে নাই। খুব গোপনে তাঁকে ডাকতে হয়, যেন কেউ জানতে না পারে। দশজন জানলেই তোমার পেছনে লেগে তোমাকে নষ্ট ক'রে দেবে। আর স্বাধীনতা চলে যায়।

২৭শে ডিসেম্বর

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিতেছেন:

'সন্ত ওহি হ্যায় যো রাম-রস চাখে।'

তুলসীদাস বলেছেন: জগতে চারটি জিনিস সার; 'সাধুসঙ্গ, হরিকথা, দয়া, দীন-উপকার।'

সঙ্গ থেকেইতো সব। 'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ' Tell me what company he keeps and I will tell you what he is! (আমাকে যদি বল তার সঙ্গী কারা, আমি বলে দেব সে কিরূপ লোক)। সাধু-সঙ্গে মন শুদ্ধ হয়। অবশ্য ঠিক ঠিক সাধু চাই; ভেকধারী হলেই সাধু হয় না। সাধু সেই যে ভগবানকে আপনার করেছে। ভগবান লাভ হ'লে 'জগদিদং নন্দনবনং সর্বেঽপি কল্প-দ্রুমাঃ'—(এই জগৎ নন্দনবন, সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ)।

স্বামী তুরীয়ানন্দ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বৈজ্ঞানিক জগৎ' বইখানি পড়িতেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে বলিতেছেন:

'Survival of the fittest' theory (যোগ্যতমের উদ্বর্তন মতবাদ) অনুসারে সকলে বৃদ্ধি পাচ্ছে—ইনি এইটি দেখিয়েছেন। হ্যাঁ amoeba (এমিবা) থেকে মানুষ হওয়া পর্যন্ত ঐ theory true (মত সত্য) বটে, কেননা এতদিন স্বার্থটাই ছিল প্রধান লক্ষ্য; কিন্তু মানুষ হওয়ার পর আর এক theory (মতবাদ) হয়; এখন লক্ষ্য ভগবান। এখন স্বার্থকে যে যত ভুলতে পারবে, সে তত তাঁর দিকে এগোবে।

স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, একে তো জগতের কিছু বুঝা যায় না। তাও যদি আজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে মনে হ'ল যেন কিছু বুঝেছি, এবং যাই জগৎকে সেটা দেব ভাবছি—অমনি বললেন, "চলে আয়, চলে আয়। আর দিতে হবে না।" খেলাটা ফুরিয়ে যায়, এটা বুড়ীর ইচ্ছে নয়।

সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীত) মঠ ছেড়ে বাড়ী যেতে চাইলে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তাকে বুঝাচ্ছেন, "কেন যাবি? নরেনকে ছেড়ে কোথায় যাবি? এত ভালবাসা আর কোথায় পেয়েছিস? আমিও তো ইচ্ছা করলে বাড়ী গিয়ে থাকতে পারি। আমি তবে কেন পড়ে রয়েছি? ঐ এক নরেনের ভালবাসার জন্যে।"

সাপ ডিম পেড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা ধরে বসে থাকে। কিন্তু যেই ডিম ফুটতে থাকে অমনি এক একটি ক'রে খেয়ে ফেলে। যেটি ছট্‌কে বেড়িয়ে যায় সেইটেই বেঁচে থাকে। সেইরূপ মহামায়াও জগৎপ্রসব ক'রে ফণা ধরে বসে আছেন। যে তার নিকট থেকে ছট্‌কে পালাতে পারে সেই বেঁচে যায়।

ব্রহ্মানন্দ-প্রেমানন্দ-স্মৃতি

অধ্যাপক শ্রীবাণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

প্রথম দর্শন

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনায় বিদগাঁ গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট জন্মোৎসব। ঐ গ্রামের কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন ও কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে এবং কলমা গ্রামের ভক্ত শ্রীভূপতি দাশগুপ্তের উদ্যোগে বিদগাঁর নীলখোলার মাঠে উক্ত উৎসব ১৩২০ সনের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ রবিবার (ইং ১৯১৩) মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই শুনিতে পাই যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে শুভাগমন করিয়া উৎসবের আনন্দ সহস্রগুণে বর্ধিত করিয়াছেন। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যের বিক্রমপুরে প্রথম শুভ পদার্পণ।

উৎসব-ক্ষেত্রটি নানাভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে কীর্তনমণ্ডপে পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ যথাস্থানে সমাসীন। কীর্তন শেষ হইলে সমবেত ভক্তমণ্ডলীর বিশেষ অনুরোধে স্বামী প্রেমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশামৃত ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মোহিত করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন ভক্তমণ্ডলী সব কিছু দেখিয়া ও শুনিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় অবাক্ হইয়া রহিলেন। সেই অতুলনীয় পুণ্যকথা উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতাদের মন অন্ততঃ কিছুকালের জন্য ধর্মের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করাইতে সমর্থ হইয়াছিল এবং মনে গভীর রেখাপাত করিয়া অনেককে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

দ্বিতীয় দর্শন

মার্চ, ১৯১৪—বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব। যথাসময়ে কলেজ হোষ্টেল হইতে কয়েক দিনের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলাম এবং উৎসবের পূর্বদিনই বেলুড় মঠে পৌঁছিয়া দেখিতে পাই বিরাট উৎসবের আয়োজন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। নানা দিক হইতে ভক্ত ও কর্মিগণ আসিয়া জুটিতেছে এবং বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হইতেছে। আমি মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া অন্য দিকে মন না দিয়া উৎসবের কাজে ব্যাপৃত হইলাম। সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর মধ্যে প্রসাদবিতরণের আয়োজন যে কি ব্যাপার—তাহা যাঁহারা একবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবে উপস্থিত থাকিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদকে সেদিন দর্শন করিতে না পারিলেও প্রেমমূর্তি স্বামী প্রেমানন্দকে দেখিলাম, তিনি তত্ত্বাবধানের কার্যে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সারা মঠপ্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমনি উপদেশ দ্বারা কর্মিগণকে খুব উৎসাহ দিতেছিলেন। উৎসবের কাজ ও রাত্রি-জাগরণ আমাদিগকে মোটেই ক্লিষ্ট করিতে পারে নাই এবং স্বামী প্রেমানন্দের বার বার উপস্থিতি,

সান্নিধ্য ও প্রেমবাক্য আমাদিগকে অসীম আনন্দ সাগরে ভাসাইতেছিল।

উৎসবের দিন সকাল হইতে ভক্ত-সমাগমে মঠ আনন্দমুখর হইল। প্রাতঃকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত সংখ্যাতীত ভক্ত মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দর্শন পাইয়া ধন্য হইল। আমিও শ্রীশ্রীরাজা মহারাজকে এই প্রথম দর্শন করিলাম। অপরাহ্নে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাও মঠে শুভাগমন করিলেন। মা শকটারোহণে মঠের দক্ষিণ প্রান্তের ফটক দিয়া মঠে প্রবেশ করিতেই তাঁহার সম্মানার্থে তোপধ্বনি করা হইল, আমরা শ্রীশ্রীমার পুণ্য শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিলাম।

তৃতীয় দর্শন

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কয়েক দিন অবকাশের মধ্যে বেলুড় মঠ দর্শনমানসে খুব আগ্রহান্বিত হইলাম। আমার এক বাল্যবন্ধু তখন মঠে আছেন জানিয়া আগ্রহ আরও বাড়িল। ফলে বেলুড় মঠে যাইয়া (ইং ১৯১৫) দর্শনাদি ও প্রসাদগ্রহণের পর বন্ধু ২।১ দিন মঠে থাকিয়া যাইতে বলায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং নিজকে পরম ভাগ্যবান মনে করিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইলে শুনিলাম, আজ ১লা বৈশাখ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন; ১০।১৫ জন সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্ত তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। কি করিয়া এই সুবর্ণ-সুযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র ও অন্য একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের সান্নিধ্যে থাকা যায় এবং তাঁহাদেরই সঙ্গে তপঃক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী দর্শন করিয়া নিজেকে ধন্য করা যায়—সে চিন্তায় মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। সে সময় মঠের নিজস্ব ২।১ খানা নৌকা ছিল। ঐ নৌকাযোগেই মহারাজদের যাওয়া হইবে এবং সেবকগণই নৌকা বাহিবেন, জানিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। কারণ পূর্ববঙ্গের ছেলে বলিয়া আমার নৌকাচালনার অভ্যাস ও দক্ষতার একটু গর্ব ছিল। অবশ্যই বন্ধুবরের উৎসাহ ব্যতীত উক্ত নৌকায় আরোহণ করিবার সাহস আমার কখনও হইত না। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ ও অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারিগণ নৌকারোহণ করিলে আমিও দাঁড় বাহিবার জায়গায় একটি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলাম।

আমরা গঙ্গার পশ্চিম উপকূল ধরিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলাম। একটু পরেই বেলুড় মঠের নিকটবর্তী গঙ্গার উপকূলে এক শিবমন্দিরের ঘাটে নৌকা লাগানো হইল। আমরা সকলেই নৌকা হইতে নামিয়া রাজা মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলাম। তাঁহারা ৺শিবের মস্তকে পুষ্প-বিল্বপত্র অর্পণ করিয়া, শিবকে ডাব-চিনি নিবেদন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। আমরাও সকলে দর্শন-প্রণামাদি করিয়া পুনরায় নৌকায় আরোহণ করিলাম। পরে শুনিলাম এই শিবই '৺কল্যাণেশ্বর শিব' নামে সুপরিচিত।

নৌকা উত্তরাভিমুখে চলিয়া কিছুকালের মধ্যেই দক্ষিণেশ্বর পৌঁছিল। ঘাটে অবতরণ করিয়া সকলে মন্দিরাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপর শ্রীশ্রীঠাকুরের বাসগৃহ, পঞ্চবটীমূল, বিল্ববৃক্ষ-তল, শ্রীশ্রীমার বাসস্থান, নহবৎখানা প্রভৃতি দর্শন করা হইল। অবশেষে কালীবাড়ীর অনতিদূরে লক্ষ্মীদিদির বাড়ী গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া জলযোগের পর সকলে নৌকায় উঠিলাম।

বেলুড় মঠে ফিরিয়া রাখাল মহারাজ ঠাকুরঘরের নীচে দক্ষিণের রোয়াকে বৃক্ষচ্ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে বসিলেন। আমরাও

তাঁহার খুব নিকটেই বসিয়া পড়িলাম। বৈশাখের মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রখরতায় মাঝে মাঝে গঙ্গাবক্ষ হইতে শীতল বাতাস ক্লান্ত দেহ স্পর্শ করিতেছিল। ইহাতে শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, "দেখছিস্, ভগবানের কি দয়া! সকলই পরমকারুণিক ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে।" পরে নীচের হল-ঘরে শ্রীশ্রীমহারাজের সেবার আয়োজন হইল। স্বামী প্রেমানন্দ স্বয়ং তাঁহার সেবার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন এবং একখানা বড় পাখা হাতে লইয়া মহারাজকে বাতাস করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দর্শনীয়। যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই সেই অপার্থিব প্রেম কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিতে পারিয়াছেন। মহারাজের সেবার পর আমরাও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিলাম।

চতুর্থ দর্শন

খৃঃ ১৯১৬ মার্চ-এপ্রিলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে ঢাকায় আগমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদ্বয় অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে লইয়া ঢাকার নিকটবর্তী কাশীমপুরের জমিদার-বাড়ীতে কিছুদিন এবং নারায়ণগঞ্জের ভক্ত নিবারণ চৌধুরীর বাড়ীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে অনেকবার তাঁহাদের পুণ্যদর্শন ও সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। একদিন ভক্ত যতীন্দ্র গুহের আগ্রহাতিশয্যে নারায়ণগঞ্জের শীতললক্ষ্যা পল্লীতে মহারাজদ্বয়ের সম্মানার্থে একটি অভ্যর্থনা-সভা আহূত হইয়াছিল। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী কিছু ধর্ম উপদেশ শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করায় স্বামী ব্রহ্মানন্দজী স্বামী মাধবানন্দকে (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক) কিছু বলিবার জন্য আদেশ করিলে তিনি সংক্ষেপে প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ বুঝাইয়া দিলেন।

এই সময়ের আর একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা—শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ গৃহী-ভক্ত সাধু নাগমহাশয়ের জন্মস্থান-দর্শন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ অন্যান্য সাধু ব্রহ্মচারি-গণ সহ দ্বিপ্রহরের পর নারায়ণগঞ্জের অতি নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রামে যাত্রা করিলেন। শকট হইতে নামিয়া তাঁহারা প্রায় এক মাইল গ্রাম্য পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া নাগমহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। আমরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। দেখিতে দেখিতে নাগ-মহাশয়ের বাড়ীতে কয়েক শত ভক্তের সমাগম হইল। বাড়ীর দক্ষিণ দিকের পুষ্করিণীর তীরে মহারাজগণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদ্বয় মাঝে মাঝে বলিতেছিলেন, "আহা! কি চৈতন্যময় স্থান! কি চৈতন্যময় স্থান!" ইতোমধ্যে বাড়ীর প্রাঙ্গণে উচ্চ কীর্তন শুরু হইল। বাবুরাম মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লইয়া কীর্তনে যোগদান করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে কীর্তন বেশ জমিয়া উঠিল। রাখাল মহারাজ নৃত্য করিতে করিতে ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। ইহাতে এক অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি হইল। যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই হরিনামের দিব্য মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইলেন।

পঞ্চম দর্শন

কিছুদিন কলিকাতায় আছি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বসুর গৃহে (বলরাম-মন্দিরে) অবস্থান করিতেছেন জানিয়া তাঁহার দর্শন-মানসে ১৯১৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে উপস্থিত হই। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ হরি মহারাজ তখন অসুস্থ হইয়া তথায় আছেন। অপ্রত্যাশিত-ভাবে এই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইল। রাখাল মহারাজের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উপরে গিয়া দেখিলাম তিনি দোতলার দক্ষিণের বারা-

ন্দায় পায়চারি করিতেছেন এবং কয়েকজন ভক্ত দর্শনের জন্য হল-ঘরে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংলগ্ন পশ্চিমের ঘরে গিয়া উপবেশন করিলে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী একে একে তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ইতোমধ্যে মঠের একজন সাধু রাজসাহী জেলায় নওগাঁ মহকুমার বন্যাক্লিষ্টদের সেবার জন্য মিশন হইতে কর্মী প্রেরণের কথা শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট নিবেদন করিলেন। মহারাজ সেবাকার্যে খুব উৎসাহ দিলেন। তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া আমিও মাসাধিক কাল নওগাঁ সেবাকেন্দ্রে স্বামী গঙ্গেশানন্দের তত্ত্বাবধানে সেবার কাজে যোগদান করিলাম।

ষষ্ঠ দর্শন

প্রায় এক বৎসর পরে বলরাম-মন্দিরে কয়েক দিন রাজা মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যার পর তথায় যাইয়া দেখি,মহারাজ তাঁহার নিদিষ্ট ঘরে আছেন এবং ভক্ত-সমাগমও একটু বেশী। ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবামাত্র হস্তস্থিত একটি বড় শিশি হইতে তিনি একটু জল দিলেন। তাঁহাকে ভাবে গর্গর মাতোয়ারা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি মাতালের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন এবং ঐ বোতল হইতে একটু একটু পবিত্র জল প্রত্যেক ভক্তকে দিতেছেন এবং বলিতেছেন, "তোমাদিগকে baptise (পবিত্র জল দ্বারা অভিষিক্ত বা দীক্ষিত) ক'রে দিচ্ছি।" পরে জানিলাম, সেদিন স্নানযাত্রার তিথি। ভারতের পুণ্য নদনদীর—গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, গোদাবরী প্রভৃতির পূত বারি সংগ্রহ করিয়া তিনি উক্ত বোতলে রাখিয়াছেন এবং যে আসিতেছে তাহাকেই একটু দিতেছেন। সেদিন তাঁহার আনন্দময় ভাবমূর্তি দর্শনে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইলাম। এবারে পূর্ববঙ্গে ঘূর্ণিবাত্যার (cyclone) হৃদয়বিদারক সংবাদ মহারাজকে জানাইয়া সেবাকার্যে মিশনের কর্মী পাঠানো হইল। সৌভাগ্যক্রমে আমিও রাজা মহারাজের আশীর্বাদ লইয়া স্বামী অরূপানন্দের তত্ত্বাবধানে বিক্রমপুরের এক পল্লীকেন্দ্রে সেবাকার্যে যোগ দিতে যাত্রা করিলাম। এই আমার শ্রীশ্রীমহারাজকে শেষ দর্শন।

* * *

বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কলিকাতায় বাগবাজার বলরাম-মন্দির প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের সান্নিধ্যে থাকিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। যাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তাঁহারা জানেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন একঘেয়ে ছিলেন না, তেমনি তাঁহার পার্ষদগণ।

স্বামী প্রেমানন্দ সত্যসত্যই প্রেমমূর্তি ছিলেন। কি বেলুড় মঠে, কি অন্য স্থানে ভক্তেরা তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা ও মধুর ব্যবহারে সর্বদাই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইতেন। তিনি ভক্তদের কোন কষ্ট বা অসুবিধা সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার অমায়িক আচরণে এবং প্রেমমূর্তি দর্শনে বহু ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণসংঘে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আগন্তুক ভক্তদিগকে তিনিই প্রথম আপ্যায়িত করিতেন। অনেক সময় জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দু'একটি সরল উপদেশের উপর ভিত্তি করিয়া সংক্ষেপে ও প্রাঞ্জল ভাষায় ধর্মের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিতেন এবং ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে নিজেই বিভোর হইয়া পড়িতেন। সংঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত থাকিলে অবসরমত ও অতি সাবধানে তাঁহার দর্শন করাইয়া দিতেন। স্বামী প্রেমানন্দ প্রায়

দীর্ঘ বিশ বৎসর বেলুড় মঠের যাবতীয় কর্মের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। মঠে তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভক্তেরা, এমনকি সাধু-ব্রহ্মচারীরাও একটা বিশেষ অভাব বোধ করিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, মুক্তি—সব আমার বাবুরাম-রূপে গঙ্গাতীর আলো ক'রে বেড়াত।'

পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বল্পভাষী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়া মানবজীবন ধন্য করিয়াছেন, তাঁহারা সেই দিব্যমূর্তি অপলক নেত্রে দর্শন করিয়াই পরিপূর্ণ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তথায় বাক্যালাপ বা ধর্মালোচনার বিশেষ অবকাশ থাকিত না। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করিতে সাহস পাইতেন না, হয়তো উহার কোন প্রয়োজন বোধ করিতেন না। রাজা মহারাজ সর্বদাই এক উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করিতেন এবং নিজের ভাবে ভরপুর হইয়া থাকিতেন। তাঁহার উপস্থিতি এবং সান্নিধ্যমাত্রই ভক্তহৃদয়ে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিতে যথেষ্ট ছিল। তিনি যে-স্থানে অবস্থান করিতেন সে-স্থান আনন্দোৎসবে ও ভক্ত-সমাগমে পূর্ণ হইত। মহারাজের অলৌকিক আকর্ষণ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে অচিরাৎ বিস্ময়ান্বিত করিত। অপর দিকে তিনি সদানন্দ, বালক-স্বভাব, অসীম ক্ষমাশীল, ও প্রেমময় পুরুষ ছিলেন। একদিকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্বাক নিস্পন্দ গভীর আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার, অপরদিকে স্বামী প্রেমানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও উপদেশের সরল অথচ উদ্দীপনাপূর্ণ আলোচনা সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে আরূঢ় করাইতে সমর্থ হইত। এই মহাপুরুষদ্বয়ের সংযুক্ত সফর পূর্ববঙ্গকে ধন্য করিয়াছিল, এবং যুবকদিগকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্থূল শরীরে দর্শন করিবার পরম সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল মহারাজ ও প্রেমমূর্তি স্বামী প্রেমানন্দকে দর্শন করিয়াছি। যতই দিন যাইতেছে ততই হৃদয়ে এই কথাটি বারংবার বাজিতেছে: I have not seen the Father but I have seen the Son. —অর্থাৎ আমি পিতাকে দেখি নাই, কিন্তু পুত্রকে দেখিয়াছি।

প্রার্থনা

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

দুখের বোঝা বইবো আমি সারা জীবন ভোর?
এমনি করেই কাটিবে বুঝি কঠিন মায়াডোর?
দুঃখ ব্যথা অপমানের গভীর অতলে
ডুবিয়ে আমায় দিচ্ছ প্রভু কতনা কৌশলে;
বিষিয়ে দিয়ে সারাটা মন, জীর্ণ ক'রে দেহ
তবেই লবে তোমার কাছে, তবেই পাব স্নেহ?

নিঠুর দয়াল! লীলা তোমার এ কী চমৎকার
আঘাত দিয়ে ভাঙতে কি চাও আমার অহংকার?
চরম ব্যথায় বিবশ মনে জানাই নিবেদন:
আঁধার মাঝে পাই যেন গো তোমার দরশন।
সকল আঘাত সইতে পারি, শক্তি যেন রয়;
তোমার মাঝে আমার "আমি" লভুক তবে লয়॥

গুরুগোবিন্দ সিংহ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বুদ্ধিমান কিন্তু ধর্মান্ধ ঔরঙ্গজেবের হঠকারিতা মোগল সাম্রাজ্যের মজ্জার মধ্যে তখন ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। আকবরের দূরদর্শিতার এবং উদারতার ফলে হিন্দু এবং মুসলমান অনেকটা কাছাকাছি এসেছিল। সন্দিগ্ধমনা ঔরঙ্গজেবের অনুদারতার ফলে হিন্দুরা তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলো। ধূমায়মান অসন্তোষের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন মহারাষ্ট্রের শিবাজী; হস্তে উড্ডীয়মান গৈরিক পতাকা, অন্তরে দুর্জয় সংকল্প: 'এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।'

মোগল সাম্রাজ্যের বিলীয়মান মহিমাকে চরম আঘাত হানবার জন্যে দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য প্রদেশে মহারাষ্ট্রকুলতিলক শিবাজী যখন গড়ে তুলছিলেন এক দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী উত্তর ভারতের আর এক বীর তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে যমুনার তীরে নিজেকে তৈরী করছিলেন একই কার্য সমাধা করবার জন্যে। এই পুরুষসিংহ শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ। গোবিন্দের বয়স যখন মাত্র পনেরো, তখন ধর্মান্ধ ঔরঙ্গজেব তাঁর পিতা তেগ বাহাদুরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলেন। দিল্লীর প্রকাশ্য রাজপথে গুরু তেগবাহাদুরের দেহ টাঙিয়ে রাখা হ'ল কাফের এবং বিদ্রোহীদের শিক্ষা দেবার জন্যে। দিল্লীর পথে পিতা কিশোর পুত্র গোবিন্দের হাতে অর্পণ ক'রে গেলেন গুরু হরগোবিন্দের তরবারি, আর তাকে অভিষিক্ত ক'রে গেলেন নূতন গুরুর আসনে। যাবার আগে পিতা পুত্রকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন—তাঁর মৃতদেহ যেন শৃগালকুকুরের ভক্ষ্য না হয় এবং পুত্র যেন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়।

পিতার এই অপমৃত্যুর এবং অন্তিম নির্দেশের কথা পুত্র কিছুতেই ভুলতে পারল না। কী ক'রে এর প্রতিশোধ নেবেন—দিন রাত্রি সেই কথাই ভাবতে লাগলেন। ভাবনার কোন কূল কিনারা নেই। শুধু প্রতিশোধ-কামনা নয়, কী ক'রে নিপীড়িত এবং ভগ্নোদ্যম হিন্দুদের মনে একটা নূতনতর ভবিষ্যৎ গড়বার প্রেরণা আনা যায়—এই চিন্তাও গুরুগোবিন্দের তরুণ চিত্তকে ব্যাকুল ক'রে তুলল। বাধার অন্ত নেই; বাধা—ভিতরে এবং বাহিরে উভয়তঃ। বাহিরে ভারত-সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের রক্তচক্ষু, ভিতরে শিখদের নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী দলাদলি। আর গোবিন্দের বয়সই বা তখন কত?

কিন্তু এই পর্বতপ্রমাণ বাধার সামনে গোবিন্দ একটুও দমলেন না। জীবনের পথ যখন বিঘ্ন বিপদে দুর্গম হয়ে ওঠে দুর্বলচেতা মানুষেরা তখন সহজেই ভেঙে পড়ে; বাধা-বিঘ্নকে পৌরুষের দ্বারা জয় করবার চেষ্টা না ক'রে জীবনযুদ্ধে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, আর পালাতে না পারলে ধূলায় গুঁড়িয়ে যায়। পুরুষসিংহদের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। বিপদ-বাধাকে তাঁরা গণনার মধ্যে আনেন না। চরম দুঃখের মধ্যেও মাথা তাঁদের উঁচুই থাকে, হৃদয় থাকে অকম্পিত। জীবন তো একটা বড়ো রকমের খেলা; আর এ খেলায় বাহাদুর সেই, যে দুঃখের অনলকুণ্ডের মধ্যে ব'সে আমাদিগকে নির্ভীক কণ্ঠে শোনাতে পারে আশার বাণী, যার দৃষ্টিতে প্রভাতের আলো। তার প্রাণের প্রদীপ্ত শিখায় জলে ওঠে বহু জীবনের আলোহীন দীপ, তার একার সঙ্কল্প আমাদের সকলের সঙ্কল্প হয়ে দাঁড়ায়, তার অন্তরের সাহস

এবং বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে যাদুমন্ত্রের কাজ করে।

পঞ্চদশ-বর্ষীয় গোবিন্দের চোখে হিন্দুজাতির জীবন-প্রভাতের স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন দেখা এবং স্বপ্নকে দুর্জয় সংকল্পের দ্বারা ফলবান করা—ঠিক এক কথা নয়। একটি বিশাল কল্পনাকে কার্যে পরিণত করতে হ'লে সর্বাগ্রে চাই প্রস্তুতি। নিজেকে তৈরী করতে হবে সমস্ত দিক দিয়ে। চরিত্রে থাকা চাই সততা, মগজে জ্ঞানের দীপ্তি, হৃদয়ে বিপুল সাহস, আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা। এইসব গুণ থাকলে তবেই ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে দুর্বার, আর সেই দুর্বার ব্যক্তিত্বের সম্মোহন শক্তি অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তোলে।

কিশোর গোবিন্দ মোগল সাম্রাজ্যের ঔদ্ধত্যকে ধূলিসাৎ করবার জন্যে তপস্যায় মগ্ন হলেন। হিমাচলের পার্বত্য অঞ্চলের নিভৃতে যমুনার তীরে নিজেকে সকল দিক দিয়ে তৈরী করতে লাগলেন তিনি। দিন কাটতে লাগল বন্যবরাহ এবং ব্যাঘ্র শিকারে। কষ্টসহিষ্ণু কর্মঠ দেহ না হ'লে একজন নেতা কেমন ক'রে একটা শক্তিমান জাতি গঠনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে? মোগল সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানো তো একটুখানি কথা নয়। উৎ-পীড়িত জনসাধারণ ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করে বলেই না অত্যাচারীদের এত স্পর্ধা! তাই ইতি-হাস খুললে দেখতে পাই সকল যুগে সকল দেশে গর্বান্ধ রাজশক্তিকে যাঁরা ধূলায় লুটিয়ে দিতে চেয়েছেন, নিপীড়িত মানবতার মুক্তির জন্যে তাঁদের সকলকেই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে; আর এই সমস্যা হ'ল ভয়ার্ত জন-সাধারণের মধ্যে শক্তির উদ্বোধন।

গুরুগোবিন্দকেও এই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হ'ল। হাজার হাজার মানুষকে একসূত্রে বাঁধা, তাদের শান্তিপ্রিয় মনকে বিপ্লবমুখী ক'রে তোলা এবং সেই বিপ্লবী জনসাধারণের হৃদয়ে এমন একটা উৎসাহের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া যাতে তারা উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারে। এর জন্যে কেবল মজবুত শরীরই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন—মজবুত শরীরের মধ্যে এমন একটা মনকে গড়ে তোলা যে-মন বুদ্ধিকে সহায় ক'রে জেনেছে কোন্ পথ সত্য পথ, বুঝেছে কি তার কর্তব্য, মুক্তি পেয়েছে সংশয়ের সমস্ত অন্ধকার থেকে। সত্য সম্পর্কে মন নিঃসংশয় হ'লে তবেই আসে অজানা সমুদ্রে তরী ভাসাবার দুর্জয় সাহস, সব পাওয়ার জন্যে সব হারাবার বজ্রকঠোর সংকল্প, শত ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও অদম্য উৎসাহে কাজ ক'রে যাওয়ার অপরাজেয় শক্তি। ভাবাবেগেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—কাজে প্রথম প্রেরণা দেবার জন্যে; কিন্তু হৃদয়ের আবেগ তো সারাক্ষণ প্রবল থাকতে পারে না, তাই আবেগের জোরে কর্তব্যে অবিচলিত থাকা কঠিন। কিন্তু বুদ্ধির প্রদীপ্ত আলোতে একটি আদর্শকে একবার সত্য ব'লে নিঃসন্দেহে বুঝলে তার জন্যে সহস্র জীবন যাপন করা যায়, সহস্র জীবন আনন্দে উৎসর্গও করা যায়। তখনই এ কথা জোরের সঙ্গে বলবার সাহস আসে:

> তোমরা সকলে এস মোর পিছে
> গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
> আমার জীবনে লভিয়া জীবন
> জাগো রে সকল দেশ।
> নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
> নাহি আর আগুপিছু।
> পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
> সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
> নাহি তার কাছে জীবন মরণ,
> নাই নাই আর কিছু।

তাই কর্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে গুরুগোবিন্দ তাঁর জীবন গড়ে তুলবার জন্যে

সাধনায় ব্রতী হলেন। পার্সী ভাষা শিখতে লাগলেন নিষ্ঠার সঙ্গে; হিন্দু শাস্ত্রের সমুদ্রে ডুব দিয়ে আহরণ করতে লাগলেন জ্ঞানের মণিমুক্তা। অরণ্যের নির্জনে গুরুগোবিন্দের এই মানসিক প্রস্তুতির কথা কী অনবদ্য ভাষায় বর্ণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'গুরুগোবিন্দ' কবিতায় :

এখনো বিহার কল্পজগতে
অরণ্য রাজধানী—
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী।
একা ফিরি তাই যমুনার তীরে
দুর্গম গিরিমাঝে।
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদী-কলরোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে,
যোগ্য হতেছি কাজে।
এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
আরো কত দিন হবে—
চারিদিক হ'তে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে?

অবশেষে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের নিভৃতে গুরুগোবিন্দের অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ একদিন ফুরালো। এবারে জীবন-রঙ্গভূমিতে কোলাহল-মুখর ভীষ্মপর্ব। যমুনার তীরে নির্জনে অরণ্যে পর্বতে কত দিন স্বপ্ন দেখেছেন তিনি :

হায়, সে কী সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে—
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।
তুরঙ্গসম অন্ধ নিয়তি—
বন্ধন করি তায়
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন ক'রে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

কিন্তু স্বপ্ন দেখার আর সময় কোথায়? এখন কাজের পালা। গোবিন্দের শরীর মজবুত; মনও প্রস্তুত। আর কেন? ঐ জীবন ডাকছে রুদ্রবীণা বাজিয়ে। গুরুগোবিন্দের মনশ্চক্ষে সে কী দীপ্ত মুক্ত মহাজীবনের জ্যোতির্ময় ছবি! শতেক যুগের জড়তাকে সুদূরে নিক্ষেপ ক'রে পরাজিত হিন্দুরা রূপান্তরিত হয়েছে একটা নূতন শক্তিমান জাতিতে; সামাজিক দুর্নীতির জালকে ছিন্ন ক'রে তারা বেরিয়ে পড়েছে নব জীবনের পথে; তার দুর্বার অভিযানের সম্মুখে ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে মোগল সাম্রাজ্যের আকাশস্পর্শী স্পর্ধা। লাঙ্গল আর তাঁত নিয়ে গার্হস্থ্যজীবনের ক্ষুদ্র শান্তিকে একান্ত ভাবে আঁকড়ে ছিল যারা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোকে যারা কোন দিন কর্তব্য বলে মনে করেনি, তারা এখন সুখ-সম্পদ মায়া-মমতার বন্ধন ছিন্ন ক'রে গুরুর আহ্বানে বেরিয়ে এসেছে বিপ্লবের মুক্ত পথে।

'আয়, আয়, আয়' ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখ-সম্পদ মায়া-মমতার
বন্ধন যায় টুটে।
সিন্ধু মাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চ নদীর জল—
আহ্বান শুনে কে কারে থামায়,
ভক্তহৃদয় মিলিছে আমায়,
পঞ্জাব জুড়ি উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল।

যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক,
ভরে যায় ঘাটবাট।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।

কত দিন কত রাত্রি এই বিশাল সুন্দর কল্পনায় নিমগ্ন থেকেছে গুরুগোবিন্দের মন। এখন স্বপ্নকে ফলবান করবার জন্যে দরকার আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা, দুর্জয় সাহস, চিত্তের অনমনীয় দৃঢ়তা, কঠিনতম দুঃখকে সহ্য করবার অনন্ত ধৈর্য। এসব গুণ গুরুগোবিন্দের চরিত্রে প্রচুর পরিমাণেই ছিল। দেখতে দেখতে ভেদ-বুদ্ধিতে যারা ছিল শতধাছিন্ন, তাদের মধ্যে এল একতা। সর্দার হবার যোগ্যতা সকলের থাকতে পারে না। সর্দারকে গড়ে পিঠে তৈরী করা যায় না। যাঁর নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ চলতে আরম্ভ করবে নবজীবনের পথে জন্ম থেকেই তিনি সর্দার, আর সর্দারের প্রধান গুণ হচ্ছে নানা মতের নানা রুচির মানুষকে এক সঙ্গে ধরে রাখা। গুরু গোবিন্দ নেতা হবার এই গুণটি জন্মের সঙ্গে নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

গুরুগোবিন্দ একদিকে যেমন শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতির জাঠদের রক্তের মধ্যে জ্বালিয়ে দিলেন ক্ষাত্রতেজের বহ্নিশিখা, আর একদিকে তাদের মধ্যে জাগিয়ে দিলেন ধর্মজীবন যাপনের প্রবল উদ্দীপনা। ডাক দিয়ে সবাইকে বললেন:

কেবল কোরাণ আর পুরাণ পাঠ নিরর্থক। শাস্ত্র অধ্যয়ন ঈশ্বর লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ঈশ্বর লাভ করতে হলে দরকার নম্রতা, সত্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতা। আরও বললেন, ঈশ্বরকে দেখা যায় শুধু বিশ্বাসের চোখ দিয়ে। সবাইকে পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যেতে হবে। ভুলতে হবে জাতির অভিমান। সমস্ত মানুষ সমান। কে ছোট, কে বড়ো?

গুরুগোবিন্দের কণ্ঠে সাম্যের বাণী শুনে ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, কিন্তু গুরুর কণ্ঠে শোনা গেল—ওঠাতে হবে তাদের, যারা তথাকথিত নিম্ন জাতি, যারা পড়ে আছে সকলের নীচে, সকলের পিছে—সেই অবহেলিত সম্প্রদায় এখন থেকে বসবে তাঁর দক্ষিণে, গণ্য হবে তাঁর প্রিয়তম ব'লে। গোবিন্দ এই ব'লে একটি পাত্রে ঢাললেন জল, তার মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন পবিত্র অসি; এবং সেই জল ছিটিয়ে দিলেন তাঁর বিশ্বস্ত পাঁচজন অনুচরের মাথায়। তারপর তাদের সম্বোধন করলেন, সিংহ ব'লে; ঘোষণা করলেন: আজ থেকে তোমরা হ'লে খালসা; তোমরা পরস্পরকে সম্বোধন করবে 'গুরুজীর জয়' ব'লে; তোমরা মাথায় রাখবে কেশ; অঙ্গে ধারণ করবে কৃপাণ; তোমরা লড়াই করবে শত্রুর বিরুদ্ধে; তোমাদের মধ্যে ধন্য সেই, যে বাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে।

গুরুর একটা স্বপ্ন সফল হ'ল। তাঁর অনুচরেরা তাঁকে হৃদয়-আসনে বরণ ক'রে নিল। কিন্তু আরও একটা কাজ বাকী আছে: অত্যাচারীর সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ ক'রে দেবার কঠিনতর কাজ। শুরু হ'ল মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গুরুর রণ-পর্ব। ঔরঙ্গজেব হুকুম করলেন লাহোরের শাসনকর্তাকে—গুরুকে সমুচিত শাস্তি দাও। আনন্দপুরে মোগল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা গুরু পরিবেষ্টিত হলেন। মাতা এবং স্ত্রী পালিয়ে কোন রকমে রক্ষা পেলেন। দুই পুত্র নিহত হ'ল মোগলের হস্তে। চল্লিশ জন মাত্র অনুচর সহ গুরু রাত্রির অন্ধকারে অন্যত্র আশ্রয় নিলেন। এর পরে চললো বিপ্লবীর বিঘ্নসঙ্কুল পথে দুঃখের জীবন। কিন্তু দুঃখ গুরুর সঙ্কল্পকে একটুও টলাতে পারল না। সিংহ যখন আহত হয় তখনই তার গর্জন হয় ভীষণতম। মাথায় আঘাত লাগলে বিষধর ফণা তুলে দাঁড়ায় আর গভীরতম দুঃখের অন্ধকারে পুরুষসিংহের আত্মা বিকীরণ করে তার মহিমা। গোবিন্দসিংহের সমস্ত সুখ যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেল তখনও তিনি পর্বতের মতো অটল এবং অচল। গোবিন্দ জীবদ্দশায় তাঁর সকল স্বপ্ন সফল দেখে যেতে পারেননি। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে পাঠানদের হাতে তিনি নিহত হন, পুত্রদের মধ্যেও কেউ জীবিত ছিল না। শিষ্যেরা অশ্রু-গদ্‌গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রল মৃত্যু-পথযাত্রী গুরুকে: এখন থেকে কে তাদের পরিচালিত করবে? কে তাদের প্রেরণা দেবে সত্যানুসরণে? গুরু উত্তর দিলেন: খালসাদের মধ্যে আমি বেঁচে থাকব। যেখানে পাঁচজন শিখ সমবেত হবে সেখানেই তোমরা আমাকে পাবে।

* আকাশবাণী (All India Radio)-র সৌজন্যে। (১৫ই নভেম্বর, ১৯৫৮ পঠিত)।

রাজধানী কলিকাতা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

"তখন কলিকাতার গঙ্গা ও গঙ্গার ধার বণিক-সভ্যতার লাভ-লোলুপ কুশ্রীতায় জলে স্থলে আক্রান্ত হইয়া তীরে রেলের লাইন ও নীরে ব্রিজের বেড়ি পরে নাই। তখনকার শীতসন্ধ্যায় নগরের নিশ্বাস-কালিমা আকাশকে এমন নিবিড় করিয়া আচ্ছন্ন করিত না। নদী তখন বহুদূর হিমালয়ের নির্জন গিরিশৃঙ্গ হইতে কলিকাতার ধূলিলিপ্ত ব্যস্ততার মাঝখানে শান্তির বার্তা বহন করিয়া আনিত।"

এই উদ্ধৃতিটি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' পুস্তক হইতে গৃহীত। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের—সম্ভবতঃ ১৮৮০-৮১ সালের কথা, কেননা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তখন বাঁচিয়া আছেন (মৃত্যু-১৮৮৪ সাল)। কবির চোখে সেই সময়-কার কলিকাতা ইঁট-সুরকি-পাথর-সিমেন্টের হর্ম্যরাজি দ্বারা বিকীর্ণ হইলেও একটি নিজস্ব সৌন্দর্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে। কিন্তু পঁচিশ বৎসর পরে ('গোরা' লিখিবার কাল—১৯০৭ সাল) 'বণিক-সভ্যতা'র অভিঘাত আসিয়া পৌছিয়াছে, তখন গঙ্গার ধারে রেলের লাইন এবং গঙ্গার জলে 'ব্রিজের বেড়ি'—শুধু এইটুকুই কবির চোখে রাজধানী কলিকাতার শ্রী হরণ করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত। ইহার পর কবি আরও প্রায় ৩৪ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন এবং বণিক-সভ্যতার পরবর্তী কীর্তিকলাপ আরও অনেক দেখিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার পরম সৌভাগ্য স্বাধীনতার পরবর্তী কলিকাতাকে দেখিতে হয় নাই! অনেক কারখানা, অনেক রাস্তা, অনেক বাড়ী ঘর দোকানপাট স্কুলকলেজ হাসপাতাল এই কলিকাতায় বাড়িয়াছে—আনন্দের কথা; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার বীভৎস 'কুশ্রীতা' আজ তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনকে কি পরিমাণে স্তম্ভিত এবং বেদনাহত করিত তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ যে 'বণিক-সভ্যতা'র উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তখনকার ইংরেজ বণিকের প্রতি প্রযুক্ত। সে বণিকদের অনেকেই এখন দেশে ফিরিয়া গিয়াছে—রাজধানী কলিকাতার প্রাণকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার কিন্তু বাঙালীরা পায় নাই (বা নেয় নাই)—পাইয়াছে অপর ধনিককুল। এখনকার কুশ্রীতার জন্যও দায়ী 'বণিক-সভ্যতা'ই। কিন্তু ইংরেজদের যেটুকু চোখের পর্দা ছিল এখনকার বণিকদের তাহা নাই। এখনকার বণিক-সভ্যতার মূলমন্ত্র—টাকা টাকা—যে কোন উপায়ে টাকা। নীতি, সত্য, স্বাদেশিকতা, সামাজিক দায়িত্ব, জনস্বাস্থ্য—এ সবই অবান্তর প্রসঙ্গ। মাটির উপর টান, মানুষের কল্যাণ, ন্যায়পরতা—এ সকল প্রশ্নের কোনও বালাই নাই। টাকা যখন চাইই তখন নিজের পরিবার এবং গোষ্ঠীর নিরাপত্তা এবং স্বার্থটুকু বজায় রাখিয়া বেপরোয়াভাবে টাকার আবাহন করিব—ইহাই এখনকার বণিক-সভ্যতার কর্ম-নীতি। যদি হাজার হাজার মানুষকে গৃহচ্যুত বা জীবিকাভ্রষ্ট হইতে হয়—উপায় নাই, যদি হাজার হাজার মানুষকে ছাগল ভেড়া গরুর মতো বাস করিতে হয়, খাদ্য এবং চিকিৎসার অভাবে শিয়াল কুকুরের মতো মরিতে হয়—আমাদের মাথা ব্যথা কিসের? 'লাভ' যেখানে একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে মানবিকতাকে ঘুম পাড়াইয়া না রাখিলে চলিবে কেন?

মাস ছয়েক আগে আমেরিকার 'টাইম' (Time) সাপ্তাহিক পত্রিকায় বর্তমান কলিকাতা শহরের একটি বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটির নাম 'ঠাসা মড়কপুরী' (Packed and

Pestilential Town)। কলিকাতাবাসী বাঙালী-দের—যাঁহারা প্রবন্ধটি পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের রাগ এবং মন খারাপ হইবার কথা, হইয়াও ছিল। ব্যক্তিগত সমষ্টিগত কিছু কিছু প্রতি-বাদের কথাও শোনা গিয়াছিল। কলিকাতার ভাগ্য বাঙালীদের হাতে না থাকিলেও ইহার নিন্দা-স্তুতি—বিশেষ করিয়া নিন্দা তো বাঙালী-দের প্রাপ্য। নিজের নিন্দা অপরের মুখে শুনিতে কাহার ভাল লাগে? ঐ প্রবন্ধে ঐতিহাসিক কয়েকটি ভুল তথ্য ছাড়া নিছক বানানো মিথ্যা কথা বোধ করি একটাও ছিল না, কিন্তু তথাপি 'ন বদেৎ সত্যমপ্রিয়ম্' নীতির দিক দিয়া স্বাধীন ভারতের বৃহত্তম শহরের কু দিকটা অমন ফলাও করিয়া সারা বিশ্ববাসীর কাছে বর্ণনা করা সমীচীন হয় নাই।

কিন্তু আজকালকার যুগে মানুষের মুখ চাপিয়া রাখাও মুস্কিল। মানুষের চোখই বা বন্ধ করিয়া রাখা যায় কি উপায়ে? আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের এখন একটা বিশিষ্ট স্থান হইয়াছে, ভারত সম্বন্ধে দেশ-বিদেশে কৌতূহল জাগিতেছে, বিদেশী মুসাফিররা দলে দলে সময়ে অসময়ে ভারত সফরে আসিতেছেন। তাঁহারা শুধু নয়াদিল্লীর রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থানে ফুল-মালা দিয়া এবং ভাকরা নাঙল ভিলাইয়া বাঁধ, চিত্ত-রঞ্জনের কারখানা বা সিন্দ্রী জামসেদপুরের কার-খানা দেখিয়া ভারতবর্ষের প্রগতির সার্টিফিকেট দিবেন—এমন কড়ার করিয়া তো আসেন না। দিল্লীর রাজপুরুষদের কলিকাতায় যখন নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয় তখন তাঁহাদের গতাগতির রাস্তা আগে হইতে ঠিক করিয়া রাখা চলে, তাঁহাদের চোখে যাহাতে কুদৃশ্য না পড়ে—সে ব্যবস্থা করা কঠিন হয় না। কিন্তু বিদেশী মুসা-ফিররা অনেক বেশী চতুর। তাঁহারা ভারতবর্ষের বৃহত্তম শহর না দেখিয়া ছাড়িবেন কেন? এবং এই শহরের 'স্বাভাবিক' রূপটি তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে ঢাকিয়া রাখাই বা কি করিয়া সম্ভবপর? তাই রাজধানী কলিকাতার প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যার অকল্পনীয় ঘনত্ব, রাস্তায় স্তূপীকৃত নোংরা, রাজপথে গো-জাতির অবাধ গতি, ফুটপাথের ধূলাবালির মধ্যে তেলেভাজা ও কাটা ফলের দোকান, সর্বত্র ভিখারীর ভিড়, মোটর-গাড়ীর সামনে ঠেলা-গাড়ীর অভিযান, অট্টা-লিকার পাশাপাশি দীর্ঘ বস্তির সারি এবং তুচ্ছ কারণে জনগণের হৈ-হুল্লড় হুজুগ ধর্মঘট এ সবই তাঁহাদের চোখে পড়িয়া যায়।

আরও একটি জিনিস অতি সহজেই তাঁহাদের চোখে ঠেকে—বাঙালী চরিত্র এবং বাঙালীর ভাগ্যের একটি সুস্পষ্ট দিক,—অপ্রিয় সত্য, কিন্তু অপ্রত্যাখ্যেয় সত্য। 'টাইম' পত্রিকার পূর্বোক্ত প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি লাইন:

"কলিকাতার বাসিন্দারা অধিকাংশই বাঙালী। যখন হৈ-হাঙ্গামা থাকে না তখন এরা অতি অমায়িক স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয় লোক। নিজেদের শহরের হুজুক হল্লোড় এরা পছন্দ করেন এবং খাওয়ার চেয়ে বরং আড্ডা দেওয়াটাই বেশী ভালবাসেন। অন্য যা কিছু এঁরা করতে রাজী, কিন্তু শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজের কথা এঁদের বোলো না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁরা ভিড় করেন, কিন্তু শিল্পাঞ্চলে অধিকাংশ কাজ বিহারীদের হাতে। শহরের প্রয়োজনীয় কায়িক পরিশ্রমের কাজের অনেক-টাই করে ওড়িশাবাসীরা। চতুর মাড়োয়াড়ীদের দখলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ব্যাঙ্ক। উচ্চশিক্ষিত বাঙালীদের কেউ কেউ সরকারী বড় বড় চাকরিতে আছেন বটে—এবং অনেকে আইন, ডাক্তারি প্রভৃতি পেশাও গ্রহণ করেন, কিন্তু অধিকাংশের ভাগ্যে সামান্য কেরাণীগিরি ও বেকার অবস্থা ছাড়া আর কিছু জুটে না।"

স্বয়ং পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁহার Discovery of India পুস্তকে (প্রথম প্রকাশ—১৯৪৬) লিখিয়াছিলেন:

"এমন এক সময় ছিল যখন বাঙালীরা সরকারী চাকরি এবং আরও অন্যান্য কাজ লইয়া তাঁদের প্রদেশের বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু শিল্প বাণিজ্য বাড়িবার সঙ্গে

এই ধারা উল্টাইয়া গেল। অন্যান্য প্রদেশ হইতে লোকেরা বাংলা দেশ চড়াও করিল ; এবং শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঢুকিয়া পড়িল। ব্রিটিশ মূলধন ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। এখনও তাই, তবে মারোয়াড়ী ও গুজরাটীরা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিতেছে। সামান্য সামান্য ব্যবসায়ও কলিকাতায় প্রায়শই অবাঙালীর হাতে। কলিকাতার হাজার হাজার ট্যাক্সিচালক শিখ।"

দুই বৎসর আগে জনৈক সাংবাদিক আমেরিকার একটি বিখ্যাত পত্রিকায় (Saturday Evening Post) তাঁহার কলিকাতা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছিলেন। বাঙালীদের তিনি অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারও চোখ এড়ায় নাই যে—

"কায়িক শ্রমের প্রতি বিরূপতার জন্যে বাঙালীরা তাদের নিজেদের জন্মভূমিতে পরদেশীর পর্যায়ে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে। কলিকাতায় বড় বড় ব্যবসায় ও শিল্পের মালিক হয় ব্রিটিশ, নয় মারোয়াড়ীরা। সমস্ত পার্ক ষ্ট্রীটে কিংবা বড়বাজারে একটিও বাঙালীর দোকান নেই বললেও চলে। পাটের কলের মজুর সব বিহারী, শহরের জল আলো প্রভৃতি ব্যবস্থার কাজ সবই প্রায় ওড়িয়াদের দখলে। কলকাতার সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশী বাংলার বাহির থেকে আগত অবাঙালীরা।

রাজধানী কলিকাতার কুশ্রীতা এবং বাংলা দেশের রাজধানীতে বাঙালীর অসহায়তার জন্য দায়ী যাহারা বা যে ঘটনাচক্র হউক, দুর্নাম সবটাই বাঙালীকে লইতে হইতেছে। এই দুর্নাম এবং দুর্ভাগ্য মোচনের দায়িত্বও বাঙালীর হইয়া অপর কেহ লইবে না। বাঙালীকেই বুকে বল বাঁধিয়া পর্বতপ্রমাণ বাধার সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে। রাজধানী জাতীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্র। সাহিত্য বল, সঙ্গীত বল, শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্ম সমাজ বল—জাতির এই সকল দিকের প্রসার রাজধানীর সুসংহতির উপর নির্ভর করে। এই সুসংহতির জন্যে তাহারাই ভাবে এবং কষ্ট স্বীকার করে—যাহাদের বাংলার মাটির উপর দরদ আছে, বাংলার সংস্কৃতির উপর ভালবাসা আছে। যাহারা শুধু টাকার জন্য রাজধানীতে বাস করিতেছে, রাজধানীর যশ নিন্দার দিকে তাহাদের মাথায় ভাবনা না থাকিবারই কথা। কলিকাতা তাহাদের নিকট বেওয়ারিশ কামধেনু। যতটা পারা যায়, যতক্ষণ পারা যায়, যে ভাবে পারা যায় দুহিয়া লইয়াই তাহারা খালাস!

কিন্তু বাঙালীর চিত্তে কলিকাতা নগরী অন্য ভাব বহন করিয়া আনে। কলিকাতার মাটি বাঙালীর কাছে অতি পবিত্র। এই কলিকাতায় বাঙালীর রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র পাদচারণ করিয়া গিয়াছেন, এই নগরীর সুখ-দুঃখের সহিত তাদাত্ম্য অনুভব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তা ও কর্ম এখানে বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার গৌরব, কলিকাতার ঐতিহ্য বাঙালী ভুলিতে পারে কি? কলিকাতার অপমান বাঙালীর বুকে শেলের মতো বাজা স্বাভাবিক নয় কি?

কলিকাতার প্রাণকেন্দ্র বাঙালীর হাতে—বাঙালীর পুরা দখলে লইয়া না আসিলে এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভবপর নয়। প্রশ্ন জাগে—রাজধানী কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠান, শান্তি-শৃঙ্খলা এবং শাসন প্রধানতঃ বাঙালীর হাতে তো এখনই রহিয়াছে, তবু প্রতিকার হয় না কেন? ইহার অতি বেদনাদায়ক উত্তর এই যে, কলিকাতার এবং তথায় বাঙালীর ভাগ্য পৌর প্রতিষ্ঠান, পুলিস-সংস্থা এবং শাসন-যন্ত্রের মুঠার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। অতি আশ্চর্য, কিন্তু অতি স্পষ্ট সত্য! কলিকাতার কলকাঠি নড়িতেছে বণিক-সভ্যতার অঙ্গুলি-হেলনে। উহারই স্বার্থে কলিকাতায় এত লোক-ঠাসাঠাসি, বাসগৃহের অপ্রাতুল্য, বস্তির বীভৎসতা, খাদ্যে

এবং ঔষধেও ভেজাল, বাঙালীর এত দীনতা, অসহায়তা, জীবন্মৃত অবস্থা। এই 'বণিক-সভ্যতা'র পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক বাঙালী ও অবাঙালী দুইই।

প্রতিকার করিতে পারে শুধু বাঙলা-দরদী, বাঙলার দুঃখ দূর করিতে বদ্ধপরিকর একলক্ষ্য একপ্রাণ একতাবদ্ধ আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রবান উৎসাহী বাঙালী;—হৈ-হুজুগ মাতাইয়া নয়, রাজদ্বারে প্রায়োবেশন করিয়া নয়; নিজেদের শক্তি সংহত করিয়া নিজেদের চিন্তা ও কর্মকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নিজেদের চরিত্রকে দৃঢ় ও নির্ভীক করিয়া, বাংলা ও বাঙালীর গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রভূত স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিয়া।

কলিকাতার কল কারখানা পরিবহণ, নাগরিক ব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্য বাহির হইতে শ্রমিক আমদানি করিতে হয় কেন? বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই, রাজস্থান, মহীশূর, মাদ্রাজ, অন্ধ্র কোথাও তো এরূপ দেখা যায় না। যে যে রাজ্য—সেই সেই রাজ্যের লোক রাজ্যের সব কাজ করিয়া আসিতেছে—মসনদের কাজ, স্কুল-কলেজের কাজ, দোকান-পাটের কাজ, আবার মিস্ত্রীগিরি মুটেগিরি ফিরিওয়ালার কাজ। সমস্ত পৃথিবী আজ মানুষের মর্যাদার নূতন মান নির্ণয় করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। কোনও মানুষই ছোট নয়, জীবিকার দ্বারা মানুষের সম্মান নিরূপিত হয় না। কোনও কাজই ছোট নয়—আমেরিকা বল, জাপান চীন বল, রাশিয়া বল, ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ বল সকল দেশের মানুষ এই সত্য বুঝিয়াছে ভারত-বর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও এই চেতনা পরিস্ফুট—শুধু বাংলা দেশেই দৃষ্টিভঙ্গী এখনও সেই সাবেক কালের ভ্রান্ত আত্মসম্মানকে ঘিরিয়া বাঙালী জাতিকে মরণের পথে আগাইয়া দিতেছে। এই অলস পচা মোহগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে এখনই, এই মুহূর্তেই চিরদিনের জন্য কবর দিতে হইবে। কায়িক শ্রমের প্রতি অবজ্ঞাসূচক সমস্ত শব্দ বাংলা ভাষা হইতে ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—ইহা না বাংলারই অমর কবির ঘোষণা? রিক্স টানিলে, মোট বহিলে, জলের কল সারিলে, রাজধানী কলিকাতা পথে পথে বাসন গামছা মনোহারী দ্রব্য ফিরি করিলে, মানুষের চুলদাড়ি কামাইলে, রাস্তা মেরামত করিলে, ফ্যাক্টরির মজুর মিস্ত্রী হইলে বাঙালীর মনুষ্যত্ব খর্ব হইবে না। কাজের সময় কাজ, বাড়ী ফিরিয়া যে সংস্কৃতিমান্ বাবু নিশীথ নাথ ভাদুড়ী—এই দ্বৈত-সমন্বয় তো অসম্ভব নয়। আমেরিকায় জাপানে চীনে দেখিয়া এস—কি করিয়া কাজের সহিত সংস্কৃতির সমন্বয় হয়।

কলিকাতার বাজারে সবজির দোকান, ডিমের দোকান, মিঠাইএর দোকান বাঙালীর হাতছাড়া হইয়া যাইবে কেন? মনোহারীর দোকান, ঔষধালয়, হোটেল, ডাইংক্লিনিং এগুলিও ক্রমান্বয়ে অবাঙালীর হাতে চলিয়া যাইবে কেন? কারণ যাহাই হউক সেই কারণকে বাঙালীর জাগ্রত সংহত শক্তি দ্বারা প্রতিরোধ করিতে হইবে। বাংলার রাজধানী কলিকাতা নগরীতে বাঙালীর প্রাণস্পন্দন দেখিবার জন্য শুধু বেলা ৯টা হইতে ১০টা এবং বিকাল ৫টা হইতে ৬টায় শুধু ট্রাম বাসের দিকে, আর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের প্রেক্ষা-গৃহগুলির দরজায় তাকাইয়া থাকিতে হইবে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

অবশ্য জীবন-সংগ্রামের নিষ্ঠুর চাপে বাঙালীর ছেলেরা কিছু কিছু আত্মসচেতন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কায়িক শ্রমের কাজে বাংলার নওজোয়ানরা ক্রমশঃ নামিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহা পর্যাপ্ত নয়। আরও চাই, ব্যাপক ভাবে চাই। সমগ্র বাঙালী-মানস হইতে ছোট কাজের প্রতি নাক সিঁটকানো মনোবৃত্তিটিকে একেবারেই বিসর্জন

দিতে হইবে। সেই নয়ন-জুড়ানো দৃশ্যটি কবে রাজধানী কলিকাতায় বাস্তব হইয়া উঠিবে—বাঙালী মোট বহন করিতেছে! হকার, মিস্ত্রী, ধোপা, নাপিত, পানওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, সবজিওয়ালা—এ সব পেশা কি বাঙালী সানন্দে সোৎসাহে গ্রহণ করিয়াছে?

মুষ্টিমেয়ের উৎসাহ ও সদিচ্ছা এই আকাঙ্ক্ষিত ছবিকে বাস্তব করিতে পারে না। সমগ্র বাঙালী জাতির মনে একটি বলিষ্ঠ সহানুভূতি, একটি নূতন জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। ইহা প্রাদেশিকতা নয়, আত্মবিশ্বাস—আত্মসম্বিৎ। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ঘর গুছাইতেছে, বাঙালীর ঘর কোন্ নিশ্চিন্তিপুরের পিসিমা আসিয়া গুছাইয়া দিয়া যাইবেন? ভাষাভিত্তিক রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্য কি? এক এক রাজ্যের লোক ভারতের বৃহৎ স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ না বাধাইয়া নিজ নিজ অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, জীবিকা, শিক্ষা-সংস্কৃতি নিজেদের মনীষা ও শক্তিতে সম্পন্ন করিয়া যাইবে—ইহাই নয় কি? কলিকাতা শহরের যদি বর্তমানের এই অবস্থাই হইবে—বাংলার রাজধানীতে বাঙালীকে যদি এত অসহায়তা, দীনতা ও দুর্বলতার মধ্যে বাস করিতে হইবে, তাহা হইলে বাঙালী বঙ্গ-বিহার-সংযুক্তির বিরুদ্ধে এত হাত-পা ছুঁড়িয়াছিল কেন? বাঙালী যদি বাংলার মাটি, বাংলা ভাষা, বাংলার জীবনধারা, বাংলার অনুভূতি-আবেগ, বাংলার সমাজ-পরিবার, বাংলার সংস্কৃতি ভালবাসে তাহা হইলে দুর্জয় সাহস, উৎসাহ, কর্মোদ্যম ও সর্বোপরি স্বার্থত্যাগের দ্বারা উহা প্রমাণ করিতে হইবে। বাঙালীর সামগ্রিক জীবনে বল সঞ্চার না হইলে উহাদের কোনটিকেই রক্ষা করা যায় কি?

এমন শত শত সহৃদয় বিত্তবান বাঙালী ভদ্রলোক চাই, যাঁহারা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সদর রাস্তার উপরে নিজেদের বাড়ীর একটি অংশ বাঙালীর ছেলেকে ছাড়িয়া দিবেন পানের দোকান করিতে, ড্রাই-ক্লিনিংএর দোকান করিতে। বাঙালীর ব্যবসাবাণিজ্যকে উৎসাহ দিতে ও দাঁড় করাইতে বাঙালী ক্রেতা-সাধারণের তরফে প্রচুর স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হইবে। বাঙালী মজুরের শারীরিক বল কম, বাঙালী কর্মীর দলাদলি-বুদ্ধি বেশী, এ সব তো জানা কথা। এ সব জানিয়াও বাঙালীকেই ডাকিতে হইবে। উৎসাহ দিয়া, ভালবাসিয়া তাহার কর্ম-দক্ষতা, নৈতিক বুদ্ধি বাড়াইতে হইবে। একই টাকা খরচ করিয়া অবাঙালী কর্মীর নিকট বেশী কাজ পাওয়া যায়, বেশী বাধ্যতা পাওয়া যায়, অনেক বেশী নিশ্চিন্ত থাকা যায়, ইহা হয়তো সত্য কথা—কিন্তু তবুও বাঙালীর এই সামগ্রিক বিপত্তির দিনে এই ধরনের বিচার-প্রণালী বাঙালীকে ত্যাগ করিতে হইবে। স্নেহময়ী জননী যেমন তাঁহার দুর্বল রুগ্‌ণ সন্তানকে বিরক্তির চোখে দেখেন না, অকুণ্ঠিত ভালবাসা, সহানুভূতি ও সেবা দিয়া তাহার স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন, আজ বাংলার ভাগ্যবান এবং সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ভাগ্য-বিড়ম্বিত দরিদ্র দেশবাসি-গণের প্রতি অনুরূপ মমতা বোধ আনিতে হইবে। 'আমি তো নিরাপদে আছি, আমি যদু মধু মালতী মাধবীর কথা ভাবিব কেন?' বাংলার সৌভাগ্যের দিনে এই চিন্তাকে সহ্য করিলেও করা যাইত, কিন্তু আজ বাংলার ব্যাপক সর্বনাশের দিনে এই চিন্তা সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

বাঙালীর ছেলেদের জন্য কায়িক পরিশ্রমের মান নূতনভাবে নির্ণীত হউক। ভূখন সিং এক-মণ বোঝা বহিতে পারে, সুজিত মিত্র তাহা পারে না। সুজিত মিত্র ১৫ সের মোট বহিতে পারে; বেশ, বাংলা দেশে সুজিত মিত্ররা যাহাতে ১৫ সের মোট বহিয়া অন্ন সংস্থান করিতে পারে এমন ব্যবস্থা কেন হইবে না? সুজিত মিত্ররা

কলিকাতার রাজপথে ছোট রিক্সায় একজন সওয়ারী টানিয়া কেন রুটি রোজগার করিতে পারিবে না? ভূখন সিংদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা তুলিও না। ভূখন সিংদের সহিত প্রতিযোগিতা হইতে বাংলার শ্রমিককে রক্ষা কর। কত রকমের 'সংরক্ষণ' ব্যবস্থা হইতেছে। বাঙালীর জন্য 'শ্রম-সংরক্ষণ' কি এমনই একটি অসম্ভব ও আজগুবী কল্পনা? বাংলায় ট্রামে বাসে ও প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান নিষিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে এই আইন প্রচলিত হয় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া ঐ অঞ্চলের লোক বাংলার এই আইনকে কটাক্ষ করে না, করিলেও বাংলার কিছু আসিয়া যায় না, কেননা বাংলাকে নিজস্ব প্রয়োজনে উহা করিতে হইয়াছে। বাঙালী শ্রমিকরা যাহাতে না মরিয়া, খাটিয়া খাইতে পারে, তাহার জন্য বাংলায় শ্রমের মান নূতনভাবে চালু করা কি অন্যায়?

ভূখন সিংদের কি হইবে? কেন, বিশাল ভারতবর্ষে একমণ মোট বহিবার কি অপর জায়গা নাই? 'ঠাসা মড়কপুরী' ছাড়া আর কি কোন আশ্রয় নাই? বাংলা তো বহু বৎসর ধরিয়া হাসিমুখে অতিথি সৎকার করিয়াছে, কিন্তু এখন যে তাহার নাভিশ্বাস উপস্থিত! এখন যদি সে একটু বাঁচিবার চেষ্টা করে, তাহা ভারতীয় সংবিধানে বাধা উচিত নয়, অপর রাজ্যবাসীদেরও মুখ ভার করা সঙ্গত নয়।

কিন্তু তথাপি একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন থাকিয়া যায়। বাংলা দেশের রাজধানীতে যদি বাঙালীর প্রাধান্য হয়, বাঙালীর হাসিমুখ দেখা যায়, বাঙালীর মেধা, বীর্য, শক্তি, সংহতি জাগিয়া ওঠে—তাহা হইলে বাংলার রাজনীতির কি হইবে? বাংলার কীটদষ্ট রাজনীতির স্বার্থ যে পুরাপুরিই হাজার হাজার বহিরাগতের উপর নির্ভর করে!

এই প্রশ্নের সহজ সরল সবল উত্তর এই—বাংলার রাজনীতি অপেক্ষা বাংলা ও বাঙালী অনেক বড় এবং বাংলার রাজধানী কলিকাতার কল্যাণও অনুরূপই বড়।

অঙ্গীকার

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

কী বলিব বলো আমি? জানো তো সকলি স্বামী!
চরণে লহ প্রণামী—তনু মন প্রাণ অন্তর।
ছায়া যত হৃদে রাজে, বাঁধা পড়ি মিছে কাজে,
সকলি তোমারি মাঝে লীন হোক, ওগো সুন্দর!

তোমার মধুর বাণী জীবনে অমৃত মানি,
তোমারেই শুধু জানি—অন্তরঙ্গ, বন্ধু!
তুমি ডাক দাও যারে কে তারে রুধিতে পারে?
ধায় নদী অভিসারে তোমারি পানে, হে সিন্ধু!

তোমার প্রেমের আলো উদিলে মিলায় কালো,
তোমারে যে বাসে ভালো পারানি পায় অপারে।
জনম-মরণ-সাথী! জপিয়া তব প্রভাতী
পোহায় বেদনা-রাতি বিধুর অন্ধকারে।

শিখাও গাহিতে নির্মল কীর্তন তব উছল,
ফুটাও প্রেমের উৎপল অপ্রেমের মৃণালে।
জানি না তো তব সাধনা—জপ তপ পূজারাধনা
জানি শুধু উন্মাদনা নূপুর-মুরলী-তালে।

রবীন্দ্রকাব্যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

রবীন্দ্রনাথের কাব্য যেমনই বিপুল তেমনই গভীর। প্রতিভার এত বৈচিত্র্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমপর্যায়ের আর কোন কবি জন্ম গ্রহণ করেছেন কি না—সন্দেহ। মানবহৃদয়-তন্ত্রীর অপরূপত্বের যত বিচিত্র ঝঙ্কার সবই তাঁর হৃদয়বীণায় নানা স্বরে, নানা মূর্ছনায়, নানা ব্যঞ্জনায় যে কাব্য-মাধুর্যে উৎসারিত তা অতুলনীয়। তাঁর কাব্য-প্রতিভার ব্যাপ্তি আমাদের হৃদয় মনকে আচ্ছন্ন করে, মহাসাগরের কূলে দাঁড়িয়ে তার সীমাহীন বিস্তৃতির বোধ যেমন আচ্ছন্ন করে আমাদের চিত্তকে।

ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথও কবি রবীন্দ্রনাথের মতই দুরবগাহী। মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বিচিত্র প্রকাশ। কবি রবীন্দ্রনাথ, ধর্মপ্রচারক রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ, সমাজ-সংস্কারক রবীন্দ্রনাথ, দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ, কর্মী রবীন্দ্রনাথ, জ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ,—রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের কত বিভিন্ন প্রকাশই না দেখা যায়। রবীন্দ্র-জীবনের এই উত্তুঙ্গতা আমাদের বিচারবুদ্ধিকে অতিক্রম করে এবং মনে জাগিয়ে তোলে বিস্ময়, স্তব্ধতা।

সেইজন্যই যখন রবীন্দ্রজীবনের আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে তখন তার সম্পূর্ণায়তন বিচার সম্ভব নয়। কেননা, অধ্যাত্মচেতনা মানুষের সমগ্র সত্তাকে বিধৃত করেই প্রকাশিত হয়। যে স্বর্গীয় সারমেয় পলায়মান মানবাত্মাকে চিররাত্রি, চিরদিন অতন্দ্রিত ধৈর্যে অনুসরণ ক'রে চলেছে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া তো অসম্ভব। 'এষাহস্য পরমা গতিরেষাহস্য পরমা সম্পদেষোহস্য পরমো লোক এষোহস্য পরম আনন্দঃ।' সুতরাং জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ মানুষের সমগ্র চেতনার গতিপথের সংক্রমণ চলেছে একটি বিশেষ কেন্দ্রকে ঘিরে। সেই কেন্দ্রই মানবজীবনের ধ্রুবতারা

'——যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে,
চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি।'

রবীন্দ্রজীবন এতই বহুমুখী যে তার মধ্যে ধর্মের প্রকাশ হয়েছে বহু বিচিত্র ভঙ্গীতে। ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্বমানবতা-প্রচারক রবীন্দ্রনাথের যে ব্যবধান, তা যে কেবল কালিক প্রভেদ মাত্র তা নয়—এ বিভিন্নতা যেন সমগ্র অনুভূতিরই রূপান্তর। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের পটভূমিকায় ধর্মানুভূতির ঐতিহাসিক আলোচনা একটি মাত্র সভায় সম্ভব নয়। তাই আমাদের আলোচনাকে সীমায়িত করা ছাড়া উপায় নাই।

রবীন্দ্রকাব্যে অধ্যাত্ম-অনুভূতির যে প্রকাশ আমরা দেখি—আজ সেইটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু প্রারম্ভেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসও একটি বিরাট মহাকাশ। তার মধ্যেও মানবহৃদয়ের বর্ণবৈচিত্র্যের ইন্দ্রধনুর দ্যুতিময় প্রকাশ-গরিমা আমাদের চিত্তাকাশকে রাঙিয়ে তোলে অনির্বচনীয় ভাবমাধুর্যে। তাই তার

মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলি— বিচারবুদ্ধি হয় পরাভূত।

তবু বিচারের প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রকাব্য অনুভূতির বেগ-প্রাখর্যে গতিময়; তাঁর বুদ্ধির এবং মননশীলতার বিস্তারই রবীন্দ্র কাব্যকে শান্তগম্ভীর-রসাস্পদ করেছে। উপনিষদে পরমপুরুষকে বলা হয়েছে 'কবি'—'মনীষী'। কবি রবীন্দ্রনাথে এই মনীষারও কিছু প্রতিফলিত হয়েছে। তাই এই মননধর্মী কবিকে কেবল ভাবালুতার সাহায্যে বোঝা সম্ভব নয়। বিচারের প্রয়োজন আছে—তাঁর যথার্থ পরিচিতি লাভ করতে হ'লে।

সাধারণতঃ মানুষের জীবন কক্ষীকৃত (Compartmentalised)। তাই সে কখনও ডক্টর জেকীল কখনও মিষ্টার হাইড হতে পারে। রবীন্দ্রজীবনে এবং কাব্যে অনুভূতির বিভিন্ন কক্ষের দর্শন খুবই মেলে। কিন্তু তা হলেও তাঁর অনুভূতির বিভিন্ন প্রকাশকে এক সূত্রে গ্রথিত করার একটি প্রচেষ্টা তাঁর কাব্যের মধ্যে দেখা যায়। সেই প্রকাশের আকৃতিকেই আমরা অধ্যাত্ম-চেতনা বলব। 'কড়ি ও কোমল' রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম। এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথের এমন কতকগুলি কবিতা আছে, যা মানবের ইন্দ্রিয়গত জীবনের অভিব্যক্তি। এইরূপ কবিতারই একটি—'পূর্ণমিলন'। এই কবিতায় কবি বলছেন :

'নিশিদিন কাঁদি সখী মিলনের তরে,
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।
লও লও বেঁধে লও, কেড়ে লও মোরে,
লও লজ্জা, লও বস্ত্র, লও আবরণ ॥

এই ভাব জৈব জীবনের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ব্যাপার—প্রাকৃত জীবনের ঐন্দ্রিয়িক লীলার কথাই এতে অভিব্যঞ্জিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনীষা এই ইন্দ্রিয়ানুগ জীবনের আহ্বানকে অতিক্রম করেছে এবং জৈব আকর্ষণের উর্ধ্বে যে মহাকর্ষ মানব-সত্তাকে চিরন্তন কাল ধরে ডাক দিয়েছে তার অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতার শেষ চরণে,

'একি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর!
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোনখানে?'

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সকল প্রচেষ্টার অন্তরালে এই মহাকর্ষের আকর্ষণ বিরাজিত। রবীন্দ্র-কাব্যের অখণ্ডতা ও একতানতা নিয়ে এসেছে এই মহাকর্ষই। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে এর কথা বলেছেন :

'যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।

'আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনী শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখ, দুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান, তাৎপর্যদান করিতেছে। আমার রূপ, রূপান্তর, জন্মজন্মান্তরকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিতেছে। যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছে, তাহাকেই জীবনদেবতা নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম, 'ওহে অন্তরতম'।'

রবীন্দ্রকাব্যে এই দেবতার প্রকাশ হয়েছে নানারসাশ্রয়ে। কাব্যের মূলকথাই অবশ্য রস। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' এবং পরমদেবতা—তিনি রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ'। এই রসকে লাভ করেই জীব আনন্দ পায়। এই আনন্দই পরমানন্দ থেকে উদ্ভূত। 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি'—এই আনন্দের অংশ গ্রহণ করেই জীবগণ দেহধারণ করে। 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'—কেই বা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিত, যদি এই আকাশ 'আনন্দ' না হ'ত

এই যে রস বা আনন্দের অনুভূতি, এই-ই রবীন্দ্র কাব্যের মূলাশ্রয়—পরম আনন্দের মাত্রার উপজীবন নানাভাব বৈচিত্র্যের মাঝে কবিচিত্ত এরই প্রকাশ করেছে :

'যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।'

এই বৈচিত্র্য রূপের প্রকাশ নয়, অরূপের প্রকাশ নয়—এ অপরূপের প্রকাশ।

'বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।'

—রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টি নয়—কবির দৃষ্টি। যিনি তত্ত্বজ্ঞ তিনি জানেন 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।' তিনি 'সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবতি'—তিনি স্বচ্ছ, এক, দ্রষ্টা ও অদ্বৈত হন। ভাব ঋষি যখন জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন 'কোঽয়মাত্মা নাম' তখন তিনি নিরুত্তর ছিলেন—কেননা 'উপশান্তোঽয়মাত্মা।' সমাধিমান্ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের যে অনুভূতি সে অনুভূতি কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতি থেকে পৃথক্। একটি জ্ঞান—বস্তু-তান্ত্রিক, অপরটি শিল্প—পুরুষতান্ত্রিক। একটি উদাহরণ দিলে এটি পরিস্ফুট হবে। শিশুর মৃত্যুতে মায়ের যে শোক সেটি কঠোর সত্য—কিন্তু সেই শোক কবির মনে যে অনুরণন তোলে তা পুরুষতান্ত্রিক—সেইটিই কাব্য, শিল্প।

ধর্ম সম্বন্ধেও সেই একই কথা। যে ভাবাবেগ মানুষের চিত্তে ধর্মবোধকে জাগ্রত করে তাই কবিচিত্তে কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বিচিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রকাব্যেও; তাই দেখি তাঁর সহজাত ধর্মভাব পরিবেশের শিক্ষাদীক্ষা তাঁর মননশক্তি যে ধর্মবোধকে তাঁর মাঝে জাগ্রত করেছে তাই শতধারে তাঁর কাব্যগোমুখী থেকে উৎসারিত হয়ে জীবনের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্যপর্যায়ে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তাঁর অধ্যাত্ম-অনুভূতি ধর্মরাজ্যের নায়কদের সমতুল্য। তাঁর ধর্মানুভূতি প্রকৃতির রাজ্যকে অতিক্রম করেনি। তাঁর অনুভূতি অধ্যাত্মচেতনা সম্বন্ধে মানসিক ও বৌদ্ধিক সমাচার মাত্র—report of the senses. তাঁর জীবনের প্রকাশ তিনি কবি, এবং কবির ধর্মই হচ্ছে জীবনের বিচিত্র রূপকে গ্রহণ করা এবং তা থেকে ভাবাদর্শের (idea) সৃষ্টি করা। এই কাজই তিনি করেছেন। এমন কি যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি কিশোর বয়সে তাঁর চৈতন্যকে একদিন আপ্লুত করেছিল তাও এসেছিল ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়েই এবং সেইজন্যই এই অনুভূতি তাঁকে 'সুন্ধী' করেনি। সেই অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল কাব্যের প্রবাহাকারে :

জীবন আজি মোর কেমনে খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

কিংবা—আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর ?

ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কবির জীবনে এইরূপই হয়। শেলীর কাব্যে দেখি বেদান্তের কথা আছে অতি অপূর্ব ভাষায় :

The one remains, the many change and pass
Heavens light forever shines,
Earths shadows fly;
Life like a dome of many-coloured glass,
Stains the white radiance Eternity.

শেলী এই ভাব পেয়েছিলেন Neo-Platonism থেকে—এ তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতি নয়। তবুও তাঁর সংবেদনশীল মন অতি অপূর্ব ভাবে এই চিন্তাধারাকে প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মাঝে অধ্যাত্ম-অনুভূতি যে বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাই তা শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত অপরোক্ষানুভূতি না হলেও—'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' তিনি এমন অপূর্ব ভাব সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা জগতের সাহিত্যে

বিরল। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতি বিশেষভাবে যে সকল কবিতার মধ্যে ধরা পড়েছে তাদের সংখ্যাও বিপুল। এর মাঝে উপনিষদের ভাব আছে, বৈষ্ণব কবির আকূতি আছে, কর্মীর কর্মপ্রেরণার উৎসের কথা আছে, ব্রাহ্মধর্মের সগুণ নিরাকারের ভজন আছে এবং পরিশেষে আছে 'মানুষের ধর্মে'র জয়গান। স্পর্শাতুর কবি-মনে মানবের সকল হর্ষশোক প্রেম বিরাগ, প্রভৃতি ধরা পড়েছে তেমনি ধরা পড়েছে বিভিন্ন মানুষের ধর্মের অনুভূতি এবং এই সকল ভাবই কবি-মনের মাধুরীর সঙ্গে মিশে সার্থক সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ একটি কবিতা গ্রহণ করছি। কবিতাটির নাম 'ধ্যান':

নিত্য তোমারে চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি,
তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি,
তোমার পাইনে কূল,
আপনার মাঝে আপনার প্রেম
তাহারও পাইনে তুল।
উদয়শিখরে সূর্যের মত সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত একটি নয়ন সম,
অগাধ অপার উদার দৃষ্টি
নাহিক তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম প'থার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ পূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন—
চঞ্চল অনিবার।
যতদুর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে ধ্যানতত্ত্বের যে রূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে তা সত্যই অতুলনীয়। যোগী যাকে চিত্তবৃত্তিনিরোধ বলে বর্ণনা করেই শেষ করেছেন কবি তারই রূপটি ভাষায়, ব্যঞ্জনায় একটি মূর্তির মত আমাদের সামনে সাজিয়ে ধরেছেন।

কবি যে তাঁর অধ্যাত্মচিন্তায় জীবনের সকল সমস্যার সমাধান পাননি, এটি আমরা তাঁর কাব্য পাঠে বুঝতে পারি। তিনি একদিন প্রশ্ন করেছিলেন:

এত বড় এ ধরণী মহাসিন্ধু ঘেরা
দুলিতেছে আকাশ সাগরে;
দিন দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
শুধু কি মা যাব খেলা ক'রে?

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি বলেছেন:

প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে,
কে তুমি? মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল—
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—কে তুমি?
পেল না উত্তর।

কবি-মনের এই যে প্রকাশ তা 'বেদাহমেতম্' এই ঔপনিষদিক বাণীর প্রকাশের মতো সুদৃঢ় ও বলশালী নয়। সর্বসংশয় ছিন্ন হ'লে মানব-কণ্ঠে তত্ত্ব যে অবিসংবাদিতার রূপ নেয় তা কবি-কণ্ঠে নেই। কিন্তু তা হলেও ধর্মজীবনের বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ-ভঙ্গীর মাধুর্যে এমন অপূর্ব হয়ে ফুটে উঠেছে যা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটা বিশিষ্ট রূপ ও মূর্তি রচনা করে।

এই প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে এইটুকুই বলতে চেয়েছি যে রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মন সকল মানুষের অধ্যাত্মচিন্তাকেই রূপ দিয়েছে তাঁর কাব্যের মাঝে। তাঁর অধ্যাত্ম-অনুভূতি হয় তো বুদ্ধ, যিশু প্রভৃতির সমগোত্রীয় নয়, কিন্তু তবুও তাঁর হৃদয়বীণায় এই সকলের অধ্যাত্ম-চিন্তা ভাষার এবং ভাবের মাধুর্যে অনবদ্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতি কি এবং কত গভীর—সেটা তাঁর কাব্য-বিচারে জানার প্রয়োজন ততটা নাই। তাঁর কাব্য যে সকলের অধ্যাত্ম-চিন্তার সার্থক রূপায়ণ এইটিই তাঁর কাব্য-প্রতিভার বিরাটত্বের এবং মহিমার প্রধান সাক্ষ্য।*

* গত ৭ই সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া রবীন্দ্র পরিষদে পঠিত।

সমাজ-শিক্ষা ও স্বামীজী

শ্রীসুবোধকুমার প্রামাণিক

বাংলাদেশের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ-জীবন যখন বিভিন্ন দিক থেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে, তখন তার প্রাচীন ঐতিহ্য অবলুপ্তির চরম সীমায় এসে একেবারে আত্মবিসর্জন করতে বসেছে, ঠিক সেই সময়েই ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব প্রয়োজন হয়েছিল। সমাজের যত সংকীর্ণতা, নীচতা, বিরোধ প্রভৃতির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার জন্য যেন আবির্ভূত হলেন মহান্ যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন নতুন আদর্শের, প্রচার ক'রে গেলেন যুগোপযোগী নতুন চিন্তা ও ভাবধারা। বিংশ শতকের প্রথমে সমাজ-জীবন সেই আদর্শ ও চিন্তাধারার আস্বাদ পেয়ে সমাজকে নতুন ভাবে গঠন করবার সংকল্প ও দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। সমাজগঠনের সংকল্প সেদিন যাঁরা নিলেন, তাঁরা চিন্তা করলেন, সমাজকে নতুনভাবে আদর্শের পথে গঠন করতে হ'লে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে শিক্ষার এবং এই শিক্ষার মর্যাদাকে সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত ক'রে দিতে হবে। সমাজের সকল মানুষ যখন উপযুক্ত শিক্ষার আলোক চোখের সামনে উপলব্ধি করতে পারবে, তখন তারা নিজেরাই সমাজ-গঠনের দায়িত্বকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে। অশিক্ষা কিংবা কুশিক্ষার মধ্য দিয়ে কখনই সুশিক্ষিত কিংবা সুসভ্য সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হ'তে পারে না।

শিক্ষাকে স্বামীজী এক বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জীবনে শিক্ষার একটি বিশিষ্ট মান নির্ধারণ করেছেন। প্রচলিত শিক্ষার ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে শিক্ষার মধ্যে কি ক'রে শাশ্বত আদর্শের অনুবর্তন করা যায়, সেই ইঙ্গিতই তিনি দিয়ে গেলেন শিক্ষাব্রতীদের সামনে এবং শিক্ষার্থী তরুণ সম্প্রদায়ের মনে।

আমাদের দেশে যে শিক্ষার প্রচলন রয়েছে, তা সমাজের সকল স্তরে গিয়ে প্রসার লাভ করতে পারেনি। কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তা দিয়ে কখনই দেশের সর্বজনীন মহৎ কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। তাই সর্বাগ্রে চাই ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকল শ্রেণীর মধ্যেই শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। এখানেই সমাজ-শিক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা। যেদিন সমাজের সকল মানুষ সমাজ-শিক্ষার সাহায্যে উপযুক্ত জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারবে, সেদিনই সূচিত হবে ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনের নতুন অধ্যায়। স্বামীজীর ধ্যানী দৃষ্টিতে ছিল সেই সমাজ-জীবনেরই কল্পনা।

স্বামীজী চেয়েছিলেন সমাজ-জীবনে পূর্ণতা, ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে প্রচুর পরিমাণেই এই পূর্ণতার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজ-জীবনে যখনই অসুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তখনই বিনষ্ট হয়েছে পূর্ণতা এবং তার স্থান অধিকার করেছে বিকৃতি ও অনাচার। সমাজ-জীবনকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ ক'রে গড়ে তুলতে হ'লে সমস্ত প্রকার বিকৃতির মূলোৎপাটন ক'রে সেখানে পূর্ণতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই পূর্ণতার প্রয়োজনেই সমাজ-শিক্ষা। অজ্ঞ,

দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে সমাজ-শিক্ষার প্রচলন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই সমাজ-শিক্ষার মধ্য দিয়ে সকল মানুষের আত্মোপলব্ধির বোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হবে এবং এইভাবে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। সমাজবোধের মাধ্যমে মানুষের মনে সূচিত হবে কল্যাণের পথে আত্ম-নিয়োগের প্রচেষ্টা—এই ছিল স্বামীজীর স্বপ্ন। স্বামীজীর মানব-কল্যাণের আদর্শের সঙ্গে সমাজ-শিক্ষার নিবিড় সম্পর্ক এইখানেই।

স্বামীজী স্পষ্টভাবেই বুঝেছিলেন যে ভারতের সমাজ-জীবনে অশিক্ষা ও দারিদ্র্য জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে রয়েছে। একদিকে অশিক্ষা যেমন মানুষের মনকে সংকীর্ণ ক'রে তোলে, অপরদিকে তেমনি দারিদ্র্যও মানুষের জীবনযাত্রাকে ব্যাহত ও পঙ্গু ক'রে দেয়। তাঁর একটি চিঠিতে একস্থানে লিখেছেন, "বিশেষ, দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না।" মানব-দরদী স্বামীজীর চোখের সামনে ঐ দুটি বিষয়ের চিত্র সব সময়ই যেন বিরাজমান ছিল। এই দুটি সমস্যাকে এক সঙ্গে নিয়ে দূরীকরণের উপায় অনুসন্ধান করতে হবে, এই ইঙ্গিত স্বামীজী তাঁর বিভিন্ন আলোচনায় প্রকাশ করেছেন। সমাজ-শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই দুটি জিনিসকে একসঙ্গে দূরীকরণ করা সম্ভব হতে পারে। প্রকৃত সমাজ-শিক্ষা কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাদান ক'রে ক্ষান্ত হবে না, সেই সঙ্গে আর্থনীতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সকল দিক দিয়ে আত্ম প্রতিষ্ঠার আদর্শের সন্ধান দেবে।

সমাজের যারা তথাকথিত নিম্নসম্প্রদায়ের, তাদিগকে চিরকালই বঞ্চিত রাখা হয়েছে। অথচ তাদের মধ্যে কতই না প্রতিভা সুপ্ত হয়ে রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় প্রেরণার অভাবে তা দিন দিন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যদি সমাজ-জীবনে পূর্ণতার প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে এই নিম্নশ্রেণীর লোকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না; উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা তাদিগকে আদর্শ নাগরিক ক'রে গড়ে তুলতে হবে। সমাজের উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকলেই যদি না শিক্ষার আলোক পায়, তবে সমাজ-জীবনের সর্বাত্মক উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। স্বামীজীর বিভিন্ন বক্তৃতায় এবং বিভিন্ন আলোচনায় এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর মনে সকল সময়েই ছিল বঞ্চিত সম্প্রদায়ের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি। তাই তিনি এদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একস্থানে বলেছেন, "এখন 'ইতর' জাতিদের ন্যায্য অধিকার পাইতে সাহায্য করিলেই 'ভদ্র'জাতির কল্যাণ। তাই তো বলি তোমরা এই জনসাধারণের (mass) ভিতর বিদ্যার উন্মেষ যাহাতে হয়, তাহাই কর।...এই সব নীচ জাতির ভিতর বিদ্যাদান, জ্ঞানদান করিয়া ইহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিতে যত্নশীল হও।"

নিম্ন সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে সমাজশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন, সে সম্বন্ধেও স্বামীজী বিশেষভাবে সজাগ ছিলেন। দেশের জনসাধারণ যতদিন অজ্ঞানতার অন্ধকারে রয়েছে, ততদিন আর কোন দিক দিয়েই এই দেশের উন্নতি সম্ভব নয়,—একথা তিনি স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন।

সাধারণ মানুষ তার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন। তাই প্রতিটি মানুষকে তার প্রকৃত অবস্থার কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে হবে। যখন সে তার প্রকৃত অবস্থার কথা উপলব্ধি করতে পারবে, তখনই সে অধীর আগ্রহে নিজের উন্নতির পথ অন্বেষণ করতে চাইবে এবং

তার ফলে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মাবে। স্বামীজীর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলছেন, "Your duty, at present, is to go from one part of the country to the other, from village to village, and make the people understand that mere sitting about idly won't do any more." আরও বলছেন :

উহাদের প্রকৃত দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া বলিতে হইবে, 'ভাই সব, উঠ জাগ, আর কতকাল ঘুমাইয়া থাকিবে? তারপর উহাদের নিজ নিজ ঐহিক অবস্থার উন্নতির উপায় বলিয়া দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের গভীর সত্যগুলি প্রাঞ্জল ভাষায় এমন ভাবে পরিবেশন করিতে হইবে যাহাতে ঐগুলির মর্ম তাহারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে

আমাদের সমাজের এই নিরক্ষর শ্রেণীর লোকদের মধ্যে শাস্ত্রের বিষয়সমূহ সহজভাবে আলোচনা করবার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ছোট ছোট গল্প, মহাপুরুষ-জীবনী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাদের সামনে আদর্শ জীবনের নীতি এবং প্রেরণা প্রভৃতি পরিস্ফুট ক'রে তুলতে হবে। তবেই তো তারা সমাজ-জীবনে আদর্শের সন্ধান পেতে পারবে। কথক-ঠাকুরগণ ঠিক এইভাবেই শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থান থেকে গল্পের মাধ্যমে আলোচনা ক'রে লোকশিক্ষার কাজ ক'রে থাকেন। সমাজের নিরক্ষর শ্রেণীর মানুষের কাছে এই ধরনের আলোচনার আবেদন যতখানি, অন্য ধরনের আলোচনার ততখানি নয়।

এই সম্পর্কে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন : We have to give them secular education. We have to follow the plan laid down by our ancestors; that is, to bring all the ideals slowly down among the masses. Raise them slowly up, raise them to equality. Impart even secular knowledge through religion.

সমাজ-শিক্ষায় এই বিষয়গুলি যে একেবারে অপরিহার্য এ সম্পর্কে স্বামীজী বারবার তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। সমাজের মানুষ যে স্তরে এসে পৌঁছেছে, তাকে শিক্ষার আলোক দিয়ে নতুন পথের সন্ধান দেবার জন্য এগুলির বিশেষ প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের জনসমাজে ধর্মের আবেদন চিরকালই একটু বেশী। তাই এই বিষয়ের সহায়তা গ্রহণ ক'রে তাদের মধ্যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হ'তে পারে এবং এই আদর্শের দ্বারাই আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি অনেকটা পরিমাণে পরিলক্ষিত হ'তে পারে স্বামীজী চেয়েছিলেন জাতির সর্বাত্মক উন্নতি সাধন—সমাজশিক্ষা তার প্রধানতম উপায়।

স্বামীজী সমাজ-শিক্ষার উপায়ের সম্বন্ধেও বিভিন্ন জায়গায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর একটি চিঠিতে বলেছেন, 'ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা। মনে কর কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিত-চিকীর্ষু যুবক গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ ক'রে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, ম্যাপ ক্যামেরা গ্লোব ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হ'তে পারে কিনা?' সমাজের নিরক্ষর মানুষদের মনে হয়তো শিক্ষার সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে ঔদাসীন্য থাকতে পারে; কিন্তু তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় বলা এবং পারিপার্শ্বিক জগতের বিভিন্ন ধারণা দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করা যেতে পারে। এইসব

কাজের জন্য আসলে চাই নিঃস্বার্থ কল্যাণব্রতী সমাজকর্মী। সমাজ-শিক্ষার মধ্যে স্বার্থের প্রয়োজন থাকলে তা যে কখনই সার্থক এবং সম্পূর্ণ হ'তে পারে না, একথা স্বামীজী তাঁর দূর-দৃষ্টিতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

এই মহান্ কর্মে ব্রতী হওয়ার জন্য তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন। বিশেষ ক'রে শিক্ষিত সম্প্রদায় যাঁরা শিক্ষার মর্যাদা উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা যদি অজ্ঞ নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষাদানের চেষ্টা করেন, তবে হয়তো এ বিষয়ে যথেষ্ট ফল আশা করা যায়। কিন্তু যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত এবং অজ্ঞ জনসাধারণের উন্নতির প্রতি একেবারে উদাসীন, তাঁদেরও লক্ষ্য ক'রে স্বামীজী তাঁর কঠোর মন্তব্যটি একাধিক বার প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্যে ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, ততদিন তাহাদের পয়সায় শিক্ষিত, অথচ তাহাদের দিকে চাহিয়াও দেখে না, এরূপ প্রত্যেককে আমি দেশদ্রোহী বলিয়া মনে করি।

যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের জন-সাধারণের অজ্ঞতা ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে নিজ নিজ স্বার্থ সাধনে তৎপর হয়ে রয়েছে এবং তার দ্বারা তারা দেশের কত অনিষ্ট সাধন ক'রে চলেছে! তাদেরকে দেশদ্রোহী (traitor) ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেওয়া চলে না।

সমাজ-শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজী বিভিন্ন স্থানে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ব্যাপকভাবে করতে হ'লে একদিকে যেমন সহজ শিক্ষা-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়, অপরদিকে তেমনি শিক্ষার্থীর প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি পোষণ করা একান্তই প্রয়োজন। সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তরিকতার প্রয়োজন বরং সর্বাগ্রে; কারণ, আন্তরিকতা ব্যতিরেকে কখনই কোন কাজ স্থায়ী এবং স্বাভাবিক হতে পারে না। স্বামীজী এই বিষয়ে সমাজ-শিক্ষকদের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ ক'রে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন।

স্বামীজী গভীর দরদ দিয়ে সমাজের মানুষের উন্নতি চেয়েছিলেন। তাঁর ধ্যানী দৃষ্টিতে ছিল মানব-কল্যাণের সুমহান্ আদর্শ। তিনি কল্পনা করেছিলেন নতুন এক সমাজের রূপকে—যে সমাজের মানুষ হবে আত্মনির্ভরশীল, নীতিপরায়ণ, সেবাধর্মে দীক্ষিত এবং আদর্শ সামাজিক। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে যদি এই দেশের সর্বাত্মক উন্নতি সাধন করতে হয়, যদি এই দেশে মানব-কল্যাণের আদর্শকে যথার্থভাবে রূপদান করতে হয়, তবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তার ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। তাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে পুনঃপুনঃ ঘোষণা ক'রে গিয়েছেন, "If we are to rise again, we shall have to do it by spreading education among the masses........."—যে জাতির জনসাধারণের ভিতর শিক্ষার বিস্তার এবং মনীষার বিকাশ যত বেশী সেই জাতি তত উন্নত।

প্রভাতের উদয়নে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সংসারের রঙ্গশালা কবে মোরে দিবে গো বিদায় ?
বহু ভূমিকায় মোর অভিনয় হ'ল নাক শেষ ;
পার্থিব-সম্পদ-মোহে প্রতিদিন মিথ্যা-মমতায়
নানা জনতার মাঝে রচিতেছে মায়া-পরিবেশ।
চিৎ-প্রকর্ষের লাগি তেজোরস করি নাই পান,
দেবতারে নিবেদন করি নাই হৃদয়ের গান।

কে যেন অলক্ষ্যে মোর ইন্দ্রধনু করিছে বয়ন !
কাম-মন্থ উর্মিদলে প্রতিবিম্ব পড়ে বুঝি তার :
কল্পনার তরী যত, আশা-পণ্য লয়ে অনুক্ষণ
অন্তরের ঘাটে ঘাটে ফেলে যায় আলো-অন্ধকার !
দৃষ্টির সম্মুখে মম রহস্যের জাল বুনে বুনে
প্রকৃতির একি লীলা ! চলিতেছে কাল গুনে গুনে ?

জীবন-করঙ্ক লয়ে যারা করে মুক্তি মাধুকরী,
তারা যে আমারে ডাকে নিঃশ্রেয়স্ লভিবার তরে।
বস্তু-বিশ্ব পিছে রেখে চিদানন্দ-রসে চিত্ত ভরি
তারা যেন নদী সম বহমান অসীম সাগরে।
তাদের পরশ পেয়ে শস্য ভরা হোলো বন্ধ্যা চর,
উর্বর করেছে তারা নিখিলের প্রাণের প্রান্তর।

পল্লব-স্তবকে হেরি প্রস্ফুটিত অসংখ্য কুসুম,
নিঃশ্বাস-স্ফুরিত রন্ধ্রে অনুভূত সুস্নিগ্ধ সৌরভ।
প্রভাতের উদয়নে প্রাণীদের ভাঙিল কি ঘুম !
বিহঙ্গেরা বনে বনে করে এবে স্তুতি-কলরব।
ভক্তের ভজন-গানে আনন্দের বহে সমীরণ,
বস্তুর বন্ধন-ডোরে কেন বন্দী রহে মোর মন ?

অতিথি

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

বিধাতার অলঙ্ঘ্য আদেশে
একদিন মৃত্যুদূত এসে
দুয়ারে দাঁড়াবে মোর আমন্ত্রণ জানায়ে প্রভুর
সেদিন হয়তো কাছে, হয়তো বা আছে কিছু দূর।
হোক কাছে, হোক দূরে,
কিছু লাভ নেই সে চিন্তায়,
'যেতে হবে' এইটুকু জানি সত্য ধ্রুবতারা প্রায়।

সেদিন মৃত্যুর তরে নিয়ে যাবো কোন উপহার?
মাটির মায়ায় ঘেরা নিরুপায় অশ্রুজল ভার?
অনিচ্ছুক দীর্ণ প্রাণে পশ্চাতের শত আকর্ষণে,
করুণ বিমর্ষ মুখে দাঁড়াবে কি উৎসব-প্রাঙ্গণে?

এমনি তো একদিন এসেছিনু পৃথিবীর দ্বারে,
বিস্মৃতির যবনিকা ঢাকা ছিল তার পূর্ব-পারে।
বিগত জন্মের ছায়া কোনদিন পড়েনি স্মরণে,
অস্পষ্ট স্বপ্নের রেশ বাজেনিকো অস্ফুট চেতনে।

পেয়েছি মাটির স্নেহ, পেয়েছি আকাশ-ভরা আলো,
সমস্ত জীবন দিয়ে এ ধরারে বাসিয়াছি ভালো।
তবু যে "অতিথি আমি" বিস্মরণ হয়নি সে কথা,
'ছেড়ে যেতে হবে' বলে কেন তবে রবে আকুলতা?

শেষ হয়ে যাবে যবে পৃথিবীর আতিথ্যের দিন,
'অতিথিবৎসল' বলি স্বীকার করিয়া যাবো ঋণ!
'এ মাটিরে ভালবেসে সার্থক হয়েছি বারে বারে',
এই বার্তা উপহার নিয়ে যাবো মৃত্যুর দুয়ারে।

সমালোচনা

The Soul of India—প্রণেতা ডাঃ মতিলাল দাস, এম্, এ; বি, এল; পি. এইচ. ডি। শ্রীযুক্তা প্রীতিরাণী দাস কর্তৃক প্রকাশিত, আলোক-তীর্থ, প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩। পৃঃ ৩৪১। মূল্য ১২৲ টাকা।

এই পুস্তকে গ্রন্থকারের কয়েকটি প্রবন্ধ ও বক্তৃতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভারতীয় কৃষ্টির ধারা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানির প্রথম খণ্ডে বৈদিক কৃষ্টি, দ্বিতীয়ে বুদ্ধ ও বৌদ্ধযুগ, তৃতীয়ে বৈষ্ণবধর্ম, চতুর্থে বর্তমান ভারত ও তাহার সমস্যানিচয় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই সকল বিষয়ে ধারাবাহিক ভারতীয় কৃষ্টির ইতিহাস বা তাহার ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করেন নাই। সারাজীবন ভারতীয় দর্শন ও কৃষ্টি আলোচনা করিয়া তাঁহার মনে যে সকল রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, তিনি তাহারই আভাস বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানির ভাষা প্রাঞ্জল এবং ইহাতে গ্রন্থকার দার্শনিক জটিলতা না আনিয়া সহজভাবে ও নিজের ভাবে ভারতীয় কৃষ্টির দিগ্দর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা ভারতীয় দর্শন ও কৃষ্টির গভীর অনুধ্যান করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তকখানি যথেষ্ট নয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টি বা চিন্তার ক্রমবিকাশ হিসাবে এই পুস্তকখানি রচিত হয় নাই। সাধারণ পাঠক ও পাঠিকা বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় গ্রন্থকারের নিজস্ব ধারণা ও অনুভূতির পরিচয় পাইবেন। পুস্তকখানি সুখপাঠ্য এবং সহজবোধ্য বলিয়া অনেকে উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

—মৈথিল্যানন্দ

অণুব্রতঃ (সংযম অঙ্ক)—শ্রীসত্যনারায়ণ মিশ্র কর্তৃক সম্পাদিত; শ্রীপ্রতাপসিংহ বৈদ কর্তৃক অণুব্রত সমিতির পক্ষ হইতে ৩, পোর্তুগীজ চার্চ স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত; পৃষ্ঠা—২৬৯।

বর্তমান হিন্দী সাময়িক পত্র হিসাবে 'অণুব্রত' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে। এই সংখ্যাটির 'সংযম অঙ্ক' নামকরণ সার্থক মনে করি। অণুব্রত-আন্দোলনের মহান্ লক্ষ্যের সঙ্গে ইহার বিভিন্ন রচনার সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। অহিন্দী ভাষীরাও সংস্কৃতাশ্রয়ী হিন্দী অল্পাধিক পড়িতে ও বুঝিতে পারেন। সরল হিন্দীর পরিচয় সর্বভারতীয় সংহতির পরিপোষক।

বর্তমান 'সংযম অঙ্কে' ১২০টি ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যমূলক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। অণুব্রত-আন্দোলনের উদ্দেশ্য মানুষকে উদার ধর্মাদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। এই আদর্শের রূপায়ণে সংযম অপরিহার্য। সংযম কেবল ব্যক্তির জীবনে আবশ্যক নয়, সমষ্টির জীবনেও ইহাকে স্পষ্ট রূপ দিতে হইবে। রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্প সংযমের সুদৃঢ় ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠে—সংযম অঙ্কের বিভিন্ন রচনার এই এক সুর। অসংখ্য মনীষীর উদ্ধৃতির সমাবেশ বর্তমান অঙ্কের একটি মনোরম বৈশিষ্ট্য। 'অণুব্রতে'র এই সুদৃশ্য, সযত্ন-প্রকাশিত এই সংখ্যা তথ্যবহুল অথচ অনুপ্রেরণা-পূর্ণ।

—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা (একাদশ বর্ষ, ১৩৬৯) সম্পাদক শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্তী। ১০৬, নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৮।

বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে ছাত্রগণের লেখা প্রবন্ধ গল্প ও কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। 'কবি মধুসূদন', 'প্রাচীন ভারতে নারীজাতির আদর্শ', 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সমাজগঠনে তাঁহার দান' প্রভৃতি প্রবন্ধে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'পরিক্রমা'য় এই বহুমুখী শিক্ষালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সারা বৎসরের আনন্দমুখর বিচিত্র কর্মসূচী প্রতিফলিত। ১৭খানি ছবি দ্বারা পত্রিকাখানি সৌন্দর্যমণ্ডিত।

মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ : (সটীক অনুবাদ)—অনুবাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ ; উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা—২৭১ ; মূল্য তিন টাকা।

শ্রীমদপ্পয়দীক্ষিত-বিরচিত 'সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহঃ' অদ্বৈত-মতবাদের একখানি অতি উপাদেয় সংস্কৃত সংগ্রহ-গ্রন্থ। ভগবান্ শঙ্করাচার্যের পরবর্তী আচার্যগণ মূল অদ্বৈত সিদ্ধান্তে একমত হইলেও বিবিধ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। মূল তত্ত্বের উপর আলোক সম্পাত করে বলিয়া ইহাদের বহুল আলোচনা হইয়া থাকে। দুর্লভ গ্রন্থাদি হইতে এই সকল মতবাদ সংগৃহীত, ও এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। বেদান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক নিবন্ধ-গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এই প্রথম।

পুস্তকখানি চারিটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে বিধিবাদ, ব্রহ্মলক্ষণ, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ, সাক্ষীর স্বরূপ, জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রভৃতি ; দ্বিতীয়ে—প্রত্যক্ষ ও অদ্বৈত শ্রুতির বিরোধ, বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ভেদ ও অভেদ, মূলাজ্ঞান উপাদান, স্বপ্ন-প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্মৃতি, সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ প্রভৃতি ; তৃতীয়ে—কর্ম ও জ্ঞানের ক্রমিক সমুচ্চয়, শাব্দাপরোক্ষতা, মহাবাক্য-জনিত জ্ঞান, মূলাজ্ঞানের নিবর্তক প্রভৃতি ; এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে অবিদ্যালেশ-নিরূপণ, মোক্ষের স্বতঃপুরুষার্থতা, মুক্তের স্বরূপ-বিচার প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচিত।

স্বামী প্রবোধানন্দজীর দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৪ঠা জানুআরি অপরাহ্ণ ৩টা ৩০মিঃ সময় মস্তিষ্ক হইতে রক্তক্ষরণ দরুন বেলুড় মঠে ৬৯ বৎসর বয়সে স্বামী প্রবোধানন্দ (সনৎ মহারাজ) দেহত্যাগ করিয়াছেন। বহুদিন যাবৎ তিনি বহুমূত্র ও হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন, কিন্তু কঠিন কোন রোগের লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। দেহত্যাগের দিনও সকালে তিনি বাহির হইয়াছিলেন, এবং ১-৪৫মিঃ সময় ফিরিয়া আসেন। বেলা ৩টার সময় হঠাৎ বমির পর ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু ডাক্তার আসিবার পূর্বেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য সনৎ মহারাজ ১৯১১ খৃঃ বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া ১৯২১ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের সেবকরূপে থাকিয়া দীর্ঘকাল তিনি অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন ; ১৯৩৫-৩৮ খৃঃ বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণকার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন, সেজন্য তাঁহাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়। ১৯৩১-৩২ খৃঃ তিনি রেঙ্গুন কেন্দ্রের কর্ম পরিচালনা করেন এবং ১৯৪২-৪৪ খৃঃ কনখল সেবাশ্রমের সম্পাদকরূপে কাজ করার পর হইতে তিনি বেলুড় মঠে ছিলেন। ১৯৩০ খৃঃ হইতে তিনি বেলুড় মঠের একজন ট্রাষ্টি ও মিশন গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে সভায় যোগদান করিতেন। স্বামী প্রবোধানন্দজীর দেহত্যাগে সংঘ একজন অভিজ্ঞ প্রাচীন সন্ন্যাসী হারাইল। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শ্রীগুরুপাদপদ্মে চির শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে : গত ১৬ই পৌষ, বৃহস্পতি-বার (১লা জানুআরি) শুভ কৃষ্ণাসপ্তমীতে জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১০৬তম জন্মতিথি উপলক্ষে সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইয়াছিল। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে ষোড়শোপচারে পূজাহোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৭ হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় শ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী জপানন্দ (সভাপতি), স্বামী তেজসানন্দ এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ। এই পুণ্য তিথিতে মঠে সারা দিনে বহু সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। এই উপলক্ষে শ্রীসারদা-মঠের সাতজন ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে : কলিকাতা বাগ-বাজার পল্লীর যে বাটীতে (১নং উদ্বোধন লেন) শ্রীশ্রীমা জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন সুদীর্ঘ কালের বহুপুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত সেই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব মহা উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতির পর সমবেতকণ্ঠে বেদপাঠ দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হইলে বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-পাঠ, ভোগরাগ, আরাত্রিক, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে দিবসব্যাপী উৎসব চলে। সহস্র সহস্র ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া ধন্য হন। ১১০০ নরনারী বসিয়া এবং সহস্রাধিক ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পরও বহু ভক্ত মাতৃসন্দর্শনে আসেন।

জয়রামবাটী : শ্রীশ্রীমায়ের জন্মস্থান জয়-রামবাটীতে গত ১লা জানুআরি মাতাঠাকুরাণীর ১০৬তম জন্মতিথি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

মঙ্গলারাত্রিক, পূজা, ভোগারতি, হোম এবং শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি পাঠ এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। দ্বিপ্রহরে প্রায় দুই হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এই দিন বেলা প্রায় ১১টার সময় মায়ের মন্দিরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত দীঘিতে 'মায়ের ঘাট' উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ।

সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর সমাগত ভক্তমণ্ডলীর নিকট শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতময়ী জীবনী পাঠ করা হয় ও ভজনান্তে উৎসব পরিসমাপ্ত হয়।

শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর : গত ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপ-লক্ষে শ্রীসারদা-মঠে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা হোম চণ্ডীপাঠ এবং প্রসাদ-বিতরণ হয়। ভোরে মঙ্গলারতির পর দেবীসূক্ত পাঠ এবং ভজনাদি দ্বারা উৎসবের সূচনা হয়, সকালে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা, চণ্ডীপাঠ এবং নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বালিকাগণ কর্তৃক ভজন একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে। বেলা ৭॥টা হইতে ভক্ত-সমাগম আরম্ভ হয়। মঠ-প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত চন্দ্রা-তপতলে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি পত্র-পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছিল। ব্রহ্মচারিণী ইলা এবং শ্রীমতী বীণা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন এবং 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' হইতে পাঠ করিয়া শোনান। প্রায় ১৮০০ ভক্ত মহিলাকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

কল্পতরু উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীঃ যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুআরি ভক্তবৃন্দকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া 'তোমাদের চৈতন্য হোক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেখানে সেই ঘটনার পুণ্যস্মৃতিতে গত ১লা জানুআরি 'কল্পতরু দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা হোম ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ১০ হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় স্বামী জীবানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'ভক্তিযোগ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। বক্তা ছিলেন স্বামী বিমুক্তানন্দ (সভাপতি), স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী কৈলাসানন্দ এবং অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী। রাত্রে প্রসিদ্ধ রামায়ণ-গায়ক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী 'নাগপাশ' পালা কথকতা করেন।

২রা জানুআরি অপরাহ্ণে স্বামী নিরাময়ানন্দ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ হইতে 'যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদ' ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যাকালে স্বামী সন্তোষানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা দেন স্বামী মহানন্দ, ডক্টর রমা চৌধুরী এবং স্বামী জীবানন্দ। রাত্রে শ্রীতারাপদ লাহিড়ীর পরিচালনায় 'বাংলার লোক-সঙ্গীত' অনুষ্ঠানটি সকলকে মুগ্ধ করে।

৪ঠা জানুআরি রবিবার অপরাহ্ণে স্বামী বোধাত্মানন্দ মহারাজের 'শ্রীমদ্ভাগবত' ব্যাখ্যার পর হাওড়া সমাজ কর্তৃক 'নদের নিমাই' (নদীয়া লীলা) অভিনীত হয়।

উৎসবের কয়েক দিন উদ্যানবাটী সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগমে আনন্দ-মুখর হইয়া উঠে।

কার্য-বিবরণী

জামসেদপুরঃ বিবেকানন্দ সোসাইটির ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের (৩৭তম) কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্র কর্তৃক ৪টি হাই স্কুল (২টি বালিকাদের), ৪টি মিডল স্কুল, ৩টি উচ্চ প্রাথমিক, ২টি নিম্ন প্রাথমিক—মোট ১৩টি বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে খেলাধূলা ও স্বাস্থ্যচর্চার সুব্যবস্থা আছে।

গত ৫ বৎসরের ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যার তালিকা:

বর্ষ	সংখ্যা
১৯৫৩	৩,৭০২
১৯৫৪	৪,০২০
১৯৫৫	৪,৩১৪
১৯৫৬	৪ ৬৩৯
১৯৫৭	৬,০২০

[বালক—৩,৩৭৫ ; বালিকা—২,৬৪৫]

গত বৎসর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা-বৃদ্ধি উল্লেখ-যোগ্য। ছাত্রাবাস দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে মোট ৩১ জন ছাত্র ছিল। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য প্রধান গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ২৮৭৮; পাঠাগারে ২টি দৈনিক, ১০টি মাসিক ও ৩টি সাপ্তাহিক পত্রিকা লওয়া হইয়াছে। ১১টি স্কুল-লাইব্রেরির মোট পুস্তক-সংখ্যা ১০,৪৭৪। সাপ্তাহিক ক্লাস এবং সভার মাধ্যমে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা করা হয়।

আলোচ্য বর্ষে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবনঃ সেবাশ্রমটি—ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০৭ খৃঃ হইতে আর্ত-নারায়ণের সেবারত। এই কেন্দ্র-কর্তৃক বর্তমানে ৫৫টি স্থায়ী শয্যা-সমন্বিত একটি অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতাল, একটি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয় এবং একটি চক্ষু-চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। ১৯৫৭

খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণীতে প্রকাশ: অন্তর্বিভাগে ২,৮০৯ জন (চক্ষু-রোগী সমেত) এবং বহির্বিভাগে নূতন ৪৯,২৩০ জন চিকিৎসিত হইয়াছেন; ১৬৬৬ জনের অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়, গড়ে দৈনিক রোগী-সংখ্যা ৩৮৩। হোমিও-প্যাথি ও এক্স-রে বিভাগের এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরির কাজও উল্লেখযোগ্য।

বৃন্দাবন সেবাশ্রম শীঘ্রই বৃন্দাবন-মথুরা রোডের পার্শ্বে ২৩ একর জমির উপর কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ নূতন ভবনে স্থানান্তরিত হইবে। গত আগস্ট মাসে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল এই ভবনের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন।

কনখল: হরিদ্বারের পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ১৯০১ খৃঃ মিশনের এই সেবা-কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই কেন্দ্র আর্তসেবায় নিরত। মঠের সাধু ব্রহ্মচারিগণ রোগীদের সেবা করেন এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

১৯৫৭ খৃঃ কার্য-বিবরণীতে প্রকাশ: আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে ও বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ১,৪৬০ ও ৮৫,৫০৭। অস্ত্র-চিকিৎসা লাভ করে ৬,১৮৯ জন। বহির্বিভাগে গড়ে দৈনিক রোগী-সংখ্যা ২০৭।

গত ১৩ই এপ্রিল '৫৭ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর সম্পূর্ণানন্দ নূতন এক্স-রে ব্লকের উদ্বোধন করেন।

আশ্রমের কর্মিবৃন্দ ও হাসপাতালের রোগীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারটিতে আলোচ্য বর্ষে ৬৭টি পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। ১৭ খানি সাময়িকী এবং ৬টি দৈনিক পত্রিকা লওয়া হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, পুরস্কার-বিতরণ এবং বক্তৃতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মালদহ: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৫৭ খৃঃ সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। মঠকেন্দ্র প্রথম স্থাপিত হয় ১৯২৪ খৃঃ, জনহিতকর কার্যের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪২ খৃঃ একটি মিশন-শাখাও খোলা হয়। মঠ-বিভাগে নিত্য পূজার্চনা, আরাত্রিক ও ধর্মালোচনার ব্যবস্থা আছে। প্রতি একাদশীতে শ্রীরামনাম কীর্তন এবং ধর্মাচার্যগণের জন্মতিথিতে উৎসবাদি হয়। গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে সৎশিক্ষা প্রচারিত হয়।

মিশন-বিভাগে শিক্ষাদানের কাজই এখানে প্রধান। আশ্রম-প্রাঙ্গণে (১) ৭৫টি শিশু লইয়া একটি নার্সারী বিদ্যালয় (২) ২১২ ছাত্রছাত্রী-সমন্বিত একটি প্রাথমিক বুনিয়াদী স্কুল, (৩) ৩৬০ ছাত্র-সমন্বিত একটি উচ্চ বিদ্যালয়, (৪) বয়স্কদের শিক্ষার জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয়, (৫) মিশন-প্রতিষ্ঠিত বাস্তুহারা কলোনীতে ১৯৮ ছাত্রছাত্রীযুক্ত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবং (৬) গ্রামে গ্রামে আদিবাসী সাঁওতাল ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের ২১২ ছাত্রছাত্রীর জন্য তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৭) বয়স্কদের জন্য ৪টি সামাজিক ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (৮) মহিলাদের জন্য কুটির-শিল্প—সেলাই, রেশমের ঝুট কাটা, ধূপকাটি তৈয়ারী, মেশিনে ফটো কাটা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য 'সারদা শিল্প নিকেতন' নামে শহরে দুইটি স্কুল আছে। (৯) বিবেকানন্দ শিশুসংঘ নামে ছোট ছেলেমেয়েদের শারীরিক মানসিক ও সর্ববিধ উন্নতির জন্য একটি সমিতি আছে, উহার সদস্য-সংখ্যা ২২৭। উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসে বর্তমানে ১৭ জন ছাত্র আছে।

মেধাবী দরিদ্র ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে এখানে আহার ও বাসস্থানের সুযোগ পাইয়া থাকে।

আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি এবং গ্রামে দুইটি, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণের কেন্দ্রে ১৯৫৭ খৃঃ মোট ৫১,৬৫৩ জনকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে ৮৩৭৬ জন নূতন রোগী। প্রত্যহ ১২টি বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সরকার-প্রদত্ত দুগ্ধ পান করানো হয়। এই বৎসর একটি শিক্ষা-শিল্প-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী এবং একটি শিশু-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

আশ্রমে গ্রন্থাগার হইতে পাঠকগণ আলোচ্য বর্ষে ১২২১ খানি বই বাড়ীতে লইয়া পড়িয়াছেন। পাঠাগারের পাঠক-সংখ্যা প্রত্যহ গড়ে ২৫ জন। এই বৎসর শীতকালে ১৫০ খানা কম্বল বিভিন্ন পল্লীতে দরিদ্র নরনারীদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেককে সাময়িক ভাবে চাউল সাহায্য দেওয়া হয়।

এই কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে শহরের এক সুদৃশ্য অঞ্চলে ১০৫টি মধ্যবিত্ত পরিবার-সমন্বিত একটি উদ্বাস্তু কলোনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কোয়েম্বাতুরঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১৯৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। মিশনের এই শিক্ষা-কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহঃ হাইস্কুল, বেসিক ট্রেনিং স্কুল, কলা-নিলয়, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, গবেষণা-ভবন, শারীর শিক্ষা কলেজ, গ্রামোন্নতি-ভবন, সমাজকর্মী শিক্ষণ-কেন্দ্র, প্রকাশন-বিভাগ, গ্রাম্য চিকিৎসালয়, গ্রাম-সেবা, গ্রন্থাগার, কর্মী-শিক্ষালয়।

হাইস্কুলে আলোচ্য বর্ষে ১৭৩ জন ছাত্র ছিল, স্কুলটি বহুমুখী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। বেসিক ট্রেনিং স্কুল হইতে ১২৩ জন ছাত্র ও ২৬ জন ছাত্রী শিক্ষা লাভ করিয়াছে। কলানিলয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৪৯১ (বালিকা ১৭৪)। অন্যান্য শিক্ষায়তন, সেবার কাজ এবং গ্রন্থাগার ও পাঠাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

সিংহলঃ রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৫৬ ও '৫৭ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। এই কেন্দ্রের কার্য প্রধানতঃ শিক্ষা-বিস্তার। বাট্টিকালোয়া, বাদুল্লা, জাফনা, ত্রিঙ্কোমালি ও ভাবুনিয়া জেলাতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৪টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-সমেত মোট ২৫টি বিদ্যালয়ে ২৬৭ জন শিক্ষাদানকার্যে নিযুক্ত আছেন। আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়গুলিতে সর্বসমেত প্রায় ৮ হাজার অধ্যয়ন-রত ছাত্র-ছাত্রী ছিল। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যচর্চা ও ধর্মানু-শীলনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ৩টি অনাথ-ভবন ও ২টি ছাত্রাবাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

কলম্বো আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য পূজা হয় এবং আশ্রমের বাহিরে নিয়মিত ধর্মালোচনার ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

ভগবান বুদ্ধের ২৫০০তম মহাপরিনির্বাণোৎ-সব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্বুদ্ধ-জয়ন্তীর সমাপ্তি-উৎসবে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ভাষণ প্রদান করেন; এই সভায় ২০ হাজারের অধিক লোক যোগ দান করে।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ডক্টর তারকনাথ দাস

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর তারকনাথ দাস গত ২২শে ডিসেম্বর হৃদ্‌রোগে নিউ ইয়র্কে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

অন্যদেশের নাগরিকতা অর্জন করিয়া যাঁহারা জন্মভূমির স্বাধীনতার ও উন্নতির জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তারকনাথ দাসের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১৮৮৪ খৃঃ কাঁচরাপাড়ার নিকট জন্মগ্রহণ করিয়া তারকনাথ প্রথমে কলিকাতায় (জেনারেল এসেম্বলি ইনষ্টিটিউশনে) পরে টাঙ্গাইলে লেখাপড়া শেখেন। সেখানেই অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসিয়া স্বদেশজননীর শৃঙ্খল-মুক্তির সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রচেষ্টায় ১৯০৫-৬ খৃঃ মাত্র ২২ বৎসর বয়সে তিনি জাপান হইয়া আমেরিকা যান। ১৯০৭ খৃঃ স্যানফ্রান্সিস্কো হইতে 'ফ্রী হিন্দুস্থান' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে তিনি ভারতের জন্য সামরিক সাহায্য প্রেরণের ষড়যন্ত্রে জড়িত হন।

১৯২৪ খৃঃ জনৈকা মার্কিন মহিলাকে বিবাহ করিয়া তিনি আমেরিকাতেই বসবাস করিতে থাকেন। ১৯০৫ খৃঃ বিশ্ববাসীর মধ্যে কৃষ্টিগত সহযোগিতা স্থাপনের জন্য 'তারকনাথ ফাউণ্ডেশন' নাম দিয়া তিনি একটি অর্থভাণ্ডার খোলেন। ১৯৫২ খৃঃ ৪৭ বৎসর পরে তারকনাথ পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত জন্মভূমি দর্শন করিয়া যান। ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্বন্ধে ডক্টর দাসের কয়েকখানি পুস্তক আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি ব্রিটিশ ভারতে নিষিদ্ধ ছিল।

ভারতে ও আমেরিকায় ডক্টর দাস রামকৃষ্ণ মিশনের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে তাঁহার দান উল্লেখযোগ্য: 'Mary K. Das and Tarak Das Foundation' হইতে বিদ্যামন্দিরের দুইটি মেধাবী ছাত্রকে নিয়মিত সাহায্য দিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়া গিয়াছেন।

সিন্ধি (শহরপুরা): শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পঞ্চম বার্ষিক (১৯৫৭-৫৮) কার্য-বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। ধর্মালোচনা, শিক্ষাবিস্তার ও জনসেবা—প্রধানতঃ এই তিন বিভাগেই আশ্রমের কাজকর্ম পরিচালিত হয়।

আশ্রমে প্রতিদিন বহু ভক্ত আসেন। আরতি ভজনের পর প্রতিদিন কিছু পাঠ করা হয়, মাঝে মাঝে কীর্তন ও বক্তৃতার ব্যবস্থাও হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে বেলুড় মঠের স্বামী প্রণবাত্মানন্দ চারদিন ছায়াচিত্র যোগে সমাজ, ধর্ম, পুরাণ ও শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী অচিন্ত্যানন্দ আসিয়া একদিন ইংরেজীতে ও একদিন বাংলায় বক্তৃতা দেন।

আশ্রমের পাঠাগারে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পাঠকের সংখ্যা বাড়িতেছে। ইংরেজী বাংলা ও হিন্দী পুস্তক ও পত্রিকা রাখা হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিভাগ হইতে প্রায় ১৪,৪০০ জনকে ঔষধ দেওয়া হয়। প্রয়োজন হইলে দুঃস্থ পরিবারের সৎকার-কার্যেও আশ্রমের যুবকগণ আগাইয়া যান।

কটকে কল্পতরু উৎসব

রামকৃষ্ণ কুটির, কটক: জানুআরির প্রথম দিবসে এখানে কল্পতরু উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বদিন সন্ধ্যায় অধিবাস কীর্তনের

পর হরির লুট হয়। ১লা জানুআরি প্রাতঃকালে কীর্তন,পূজাহোম এবং মধ্যাহ্নে ভোগারতির পর দরিদ্রনারায়ণদের ভোজন করানো হয়। সান্ধ্য সভায় ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অসঙ্গানন্দ সভাপতিত্ব করেন। সরকারী কর্মচারীদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণের জীবন ও বাণী বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচিত হইলে পর সভাপতি বলেন, শ্রীরাম-কৃষ্ণ কেবল এই একদিনের জন্যই কল্পতরু হন নাই, তিনি চিরদিনই কল্পতরু।

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

জব্বলপুরে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনদিন-ব্যাপী নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৩৪তম অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনের মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু; তাঁহার বক্তব্যের মূল সুর—সাহিত্যিকগণ অতি মাত্রায় কল্পনাপ্রবণ না হইয়া একটু বাস্তব-বাদী হইলে ভাল হয়। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিশিষ্ট চিন্তানায়কগণ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসত্যেশ্বর ঘোষ বলেন: আণবিক শক্তির ধ্বংসাত্মক প্রয়োগই বর্তমান জগৎকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। বিজ্ঞানের সাধনাকে আজ প্রকৃতির গূঢ় তত্ত্বসমূহ ও সৃষ্টির আদি রহস্য আবিষ্কারের জন্য নিয়োজিত করিতে হইবে।

অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী সমাজ ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতিরূপে নূতন যুগের নূতন সমাজের সংস্কৃতি রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য দেশ-প্রেমিকগণকে আহ্বান জানান।

সংস্থার সভাপতি শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস তাঁহার ভাষণে বলেন: নর্মদা উপত্যকায় যে রূপ কঠিন প্রস্তরে ফোটানো হয়েছে, গঙ্গার বুকে তাই রূপায়িত হয়েছে কোমল মৃত্তিকায়। আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সমন্বয়-সৃষ্টির অপূর্ব উদাহরণ আমরা পাই বাংলায় ও মধ্যপ্রদেশে। এই নর্মদা সভ্যতা আর গাঙ্গেয় সভ্যতা থেকেই দুই শ্রেষ্ঠ বিশ্বসাহিত্যিকের উদ্ভব; বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারত যে সম্মানের অধিকারী—তার কারণ কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ।

সম্মেলন বাংলার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলিকে তথাকার বাঙালী ছাত্রদের উপকারার্থ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্য শিক্ষার সর্ব স্তরে বাংলা ভাষার প্রবর্তন করিতে অনুরোধ জানান।

বিজ্ঞান-সংবাদ

আন্তর্জাতিক 'ভূ-বিজ্ঞান বর্ষে'র (International Geophysical Year) ১৮ মাস-ব্যাপী পর্যবেক্ষণ গত ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত হইয়াছে। সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে আগামী অক্টোবর পর্যন্ত লাগিবে।

৬৪টি দেশে ৪,০০০ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ১৪টি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের তথ্যসংগ্রহের এই বিরাট আয়োজনে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের বিজ্ঞানীরা সহযোগিতা করেন। মোট অর্থ কত ব্যয়িত হইয়াছে তাহা হিসাব করা এক প্রকার অসম্ভব, তবে মোটামুটি আন্দাজ করা হইতেছে, দশ কোটি পাউণ্ডের কাছাকাছি।

আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞান বর্ষ শেষ হইয়া গেলেও এই জাতীয় পর্যবেক্ষণ ও তথ্যসংগ্রহের কাজ চালাইয়া যাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞান সমবায় (International Geophysical Co-operation). I. G. Y. বৈজ্ঞানিকগণ এখন হইতে ইহারই মাধ্যমে কাজ করিবেন। তাঁহাদের মতে গত ১৮ মাসের কাজের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য:

(১) ১১টি জাতির সমবেত অভিযানে

দক্ষিণমেরু মহাদেশ আবিষ্কার ও মেরুর তুষার-গলা সম্বন্ধে নানা তথ্যসংগ্রহ।

(২) মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেট প্রেরণ, এবং এ পর্যন্ত অজ্ঞাত 'রেডিয়েশন বেষ্টনী' সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ।

(৩) ভূ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শতাব্দীব্যাপী গবেষণা চালাইবার মতো তথ্যসংগ্রহ; ভূ-কম্প ও আবহাওয়ার সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান।

(৪) প্রশান্ত মহাসমুদ্রে প্রবল অন্তঃস্রোতের ও তলদেশে ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ, তাম্র ও কোবাল্ট প্রভৃতি ধাতুর কর্দম-স্তরের সন্ধান; এবং ইওরোপের জলবায়ুর জন্য দায়ী উপসাগরীয় স্রোত (Gulf Stream) সম্বন্ধে পূর্ণতর জ্ঞান।

সমুদ্র হইতে মিষ্ট জল

তেল আভিভে রাশিয়ায় শিক্ষিত ইহুদী বৈজ্ঞানিক জারিন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা দ্বারা সমুদ্র-জল হইতে লবণ দূরীভূত করা যায়। ব্যাপকভাবে ইহার উৎপাদন লাভজনক হইলে ও পরীক্ষাটি সফল হইলে সমুদ্র-তীরে বা সমুদ্র-মধ্যে সুপেয় জলের অভাব হইবে না, সমুদ্রের নিকটবর্তী মরুভূমি-গুলিতেও শস্য উৎপন্ন করা সম্ভব হইবে এবং জাহাজে জল বহন করিবার প্রয়োজন হইবে না।

পৃথিবীর বহু বৈজ্ঞানিক এই বিষয়টি লইয়া বহুদিন অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন; রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক নানা পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু কোনটি দ্বারাই ব্যাপক উৎপাদন লাভজনক হয় নাই। ৬১ বৎসর বয়সের জারিনও এই পরীক্ষায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। জারিন-পদ্ধতির মূলসূত্র: জল যখন বরফ হয় তখন তাহাতে লবণ থাকে না, লবণ অবশিষ্ট জলে ঘনীভূত হইতে থাকে। বরফ আবার গলাইয়া লইলে শুদ্ধ জলই পাওয়া যায়। জল জমানো ও বরফ গলানোর জন্য জলেরই বাষ্পকে ব্যবহার করা হয়; কিভাবে হয় তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে যাঁহারা বাহির হইতে প্ল্যাণ্টটি দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যন্ত্রটি অনেকটা লণ্ড্রী (কাপড়-ধোলাই) যন্ত্রের মতো; একটি ব্যারেলের চারিধারে কতক-গুলি পাইপ আছে, ভিতরের ব্যাপার এখনও গোপন রাখা হইয়াছে।

অতিরিক্ত ফসল ও ক্ষুধার্ত মানব

ইংলণ্ডের জাতীয় কৃষক-সংঘের সভাপতি সার জেমস টার্নার বলেন: পৃথিবীর যে কোন স্থানের অতিরিক্ত ফসল অন্যত্র ক্ষুধার্ত মানবকে সরবরাহ করিতে হইবে, ব্যাপারটি আন্তর্জাতিক ভাবে সমাধান করিতে হইবে।

কোন বৎসর কোথাও বেশী ফসল হইবে, কোথাও বা কম হইবে। আর্থনীতিক সংকট না ঘটাইয়া ক্ষুধার্ত মানবের মুখের কাছে এই অন্ন পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। মানুষের প্রয়োজন মিটিলে তবেই উৎপাদনকে অতিরিক্ত বলা যায়; নতুবা অতিরিক্ত কিছু নাই। বর্তমানে যেভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য চলিতেছে, তাহাতে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়; কারণ খাদ্য যাহাদের যখন প্রয়োজন, তখন হয়তো খাদ্য কিনিবার মতো অর্থ তাহাদের হাতে নাই। [রয়টার হইতে]

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৭ই মাঘ (৩১.১.৫৯) শনিবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ৯৭তম জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইবে।

উৎসবে ও নিত্যপ্রয়োজনে
শতাব্দীর সুপরিচিত
লক্ষ্মীবিলাস
সর্ব্বঋতুর উপযোগী তৈল
এম, এল, বসু য্যাণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস • কলিকাতা-৯

Get more strength
out of your
FOOD
BE WISE TO PICK UP
Vanasda
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMIN A & D
BERAR OIL INDUSTRIES
AKOLA
BOMBAY
MADE FROM VEGETABLE OILS ONLY
Vanasda
F.P.S/BL2./57

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সরল রাজযোগ—৪র্থ সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি বুলের বাড়ীতে কয়েক জন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্ত্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ॥০ আনা।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। ১০২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামিজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজান হইয়াছে। পরিচয় এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবিসম্বলিত। মূল্য ১ম ভাগ ৫৲ ও ২য় ভাগ ৪॥০ আনা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪॥০ ও ৪।০।

ভারতে বিবেকানন্দ—১২শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামীজির ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৬৪৫ পৃষ্ঠা মূল্য ৫৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪৷৵০ আনা

দেববাণী—৭ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান' নামক স্থানে কয়েক জন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন তাহার একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ২২৭ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৸৵০ আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহিত অংশসমূহ বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সন্নিবেশিত। মূল্য ২।০ আনা।

বিবেক-বাণী—১৬শ সংস্করণ। আচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজীর উপদেশাবলী। স্বামীজির বাষ্টসম্বলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। মূল্য ।৵০ আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামীজির ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ আনা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

ভারতীয় নারী—১২শ সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান আদর্শ, পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজির মনোরম ছবি-সম্বলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান—৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৩ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদান্ত-মত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে আর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ—যে গুলি না বুঝিলে ধর্ম জিনিষটাকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ১॥০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৩শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়ভরতের-উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্য গণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট ও ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। মূল্য ১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

সন্ন্যাসীর গীতি—১৩শ সংস্করণ। স্বামীজি-রচিত 'Song of the Sannyasin' নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৵০ আনা।

পওহারী বাবা—৯ম সংস্করণ। গাজীপুরের বিখ্যাত মহাত্মা পওহারী বাবার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। স্বামীজির হাফটোন ছবিযুক্ত। মূল্য ॥০ আনা।

হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ—৫ম সংস্করণ, ৯০ পৃষ্ঠা। ইহাতে হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা, হিন্দুধর্মের ক্রমাভিব্যক্তি, ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর ও ডাঃ পল ডয়সেন সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মূল্য ৸০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ॥৵০ আনা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৪র্থ সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ।৵০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ।৴০ আনা।

অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৪র্থ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। এই পুস্তক পাঠে চরিত-কথার কল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। মূল্য ১৷০ আনা।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৪র্থ সংস্করণ; আচার্য্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲ মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা—১ম সংস্করণ। স্বামী অরূপানন্দ প্রণীত। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা পুস্তক হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা।

ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন কথা। মূল্য ২৲ টাকা।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—২য় সংস্করণ। স্বামী পূর্ব্বানন্দ প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৷০ আনা।

শিবানন্দ-বাণী—১ম ভাগ—৫র্থ সংস্করণ, ২য় ভাগ—২য় সংস্করণ স্বামী অপূর্ব্বানন্দ-সঙ্কলিত মূল্য প্রতি ভাগ ২৷০ আনা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। প্রথম ভাগ—(ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর) ৫ম সংস্করণ। দ্বিতীয় ভাগ—(ছান্দোগ্য) ৩য় সংস্করণ। তৃতীয় ভাগ—(বৃহদারণ্যক) ৩য় সংস্করণ। ইহাতে উপনিসদের মূল, সংস্কৃত, অন্বয়মুখে বাংলা প্রতিশব্দ, সরল বঙ্গানুবাদ এবং আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যানুযায়ী দুরূহ বাক্যসমূহের টীকা প্রভৃতি আছে। সুদৃশ্য ছাপা, কাপড়ের মনোরম বাঁধাই, ডবল ক্রাউন—১৬ পেজি, প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য—প্রতি ভাগ ৫৲ টাকা।

সাধু নাগ মহাশয়—৮ম সংস্করণ। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ১৷০ আনা মাত্র।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত) অতুলনীয় সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত 'গোপালের মা' এর সংক্ষিপ্ত আদর্শ জীবনের কাহিনী। মূল্য ৷০ আনা।

নিবেদিতা—১২শ সংস্করণ। শ্রীমতী সরলা বালা দাসী-প্রণীত। স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা। মূল্য ৸০ আনা।

সৎকথা—স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক সংগৃহীত—৩য় সংস্করণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ (শ্রীলাটু) মহারাজের উপদেশাবলীর সংকলন। মূল্য ২৲ টাকা।

যোগচতুষ্টয়—স্বামী সুন্দরানন্দ-প্রণীত। জ্ঞান; কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগের সংক্ষিপ্ত সরল বিবরণ। মূল্য ২৲ টাকা।

বেদান্তদর্শন—১ম খণ্ড—চতুঃসূত্রী। শাঙ্কর ভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ, রত্নপ্রভা টীকা, ভাব-দীপিকা ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্বলিত। প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ টাকা।

স্তবকুসুমাঞ্জলি—৫ম সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত—বৈদিক শান্তিবচন, সূক্ত, প্রার্থনা ইত্যাদি বিবিধ সংস্কৃত স্তোত্রাদির অপূর্ব্ব সঙ্কলন। সংবাদপত্রসমূহে উচ্চ প্রশংশিত। মূল সংস্কৃত, অন্বয়, অন্বয়মুখে সংস্কৃতের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং মূলের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৩৲ টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৫ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ৷৵০ আনা।

আগে চলো—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। কিশোরদের জন্য লেখা। তরুণমনে সুনীতি, দেশাত্মবোধ, সেবা, আদর্শনিষ্ঠা এবং ধর্মপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক যৌবনোন্মুখ ছেলেমেয়েকে এই বইখানি পড়িতে দেওয়া উচিত। মূল্য ১৷০।

হিন্দুধর্ম পরিচয়—১ম ও ২য় ভাগ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সরল কথায় হিন্দুধর্মের মুখ্য বিষয়গুলির সহিত পরিচিত চেষ্টা এই বই দুখানিতে করা হইয়াছে। মূল্য ১ম ভাগ ৷০ আনা, ২য় ভাগ ৸০ আনা।

দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য ও পূজা-পদ্ধতি—স্বামী কৈবল্যানন্দ-প্রণীত। মূল্য ১ম ভাগ (পরিবর্দ্ধিত ৪র্থ সংস্করণ ৸০, ২য় ভাগ (৩য় সংস্করণ) ১৷০।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী অভয়ানন্দ ; ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, এম. আই. প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

Udbodhan-Phone : 55-2447 : : January 1959 : : Regd. No. C. 295

সম্পাদক—স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা—৩

৬১তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৬৫

বার্ষিক মূল্য ৫৲
প্রতি সংখ্যা ॥৹

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিখ্যাত স্বর্ণশিল্পী ও
গ্রহরত্নকার
ফোন: ৩৪-৪৯৮২
অন্নপূর্ণা জুয়েলারী হাউস
৮৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২
গ্যারান্টী যুক্ত গিনি সোনার গহনার
প্রতিষ্ঠান। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য
১৷৷৹ টাকার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন।

ডায়া-পেপ্‌সিন্
হজমশক্তি বজায় রেখে স্বাস্থ্যের উন্নতি করে
ইউনিয়ন ড্রাগ • কলিকাতা

আবির্ভাব

স্বামী বিবেকানন্দ

'সত্য' দুই প্রকার। এক—যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য। দুই—যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়। 'বেদ'-নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যাহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন।

এই অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, তাহার নাম 'বেদ'।

সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র 'বেদ'।... এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফল মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে বলিয়া দেশ-কাল-পাত্রাদি-নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতিনীতিও এই কর্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবে।

জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্ত ভাগই—নিষ্কাম কর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায় মুক্তিপ্রদ এবং মায়া-পার নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশ-কাল-পাত্রাদির দ্বারা অপ্রতিহত বিধায়—সার্বলৌকিক, সার্বভৌম, সার্বকালিক ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা।

মন্বাদি তন্ত্র কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে অধিকভাবে সামাজিক কল্যাণকর কর্মের শিক্ষা দিয়াছেন। পুরাণাদি তন্ত্র বেদান্তনিহিত তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া অবতারাদির মহান্ চরিত-বর্ণনমুখে ঐ সকল তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যান করিতেছেন এবং অনন্তভাবময় প্রভু ভগবানের কোন কোন ভাবকে প্রধান করিয়া সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট বৈরাগ্যবিহীন একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ শিক্ষার জন্য আপাত-প্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—

তখন আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান বহুধা বিভক্ত, সর্বথা প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগ-যুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। —[**সঙ্কলিত**]

কথাপ্রসঙ্গে

'সমন্বয়'—কি ও কি নয়

শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য নামের সহিত 'সমন্বয়' কথাটি চিরতরে জড়িত হইয়া গিয়াছে। যদিচ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে একাধিক আধ্যাত্মিক আদর্শ পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যথা—ব্যাকুলতা-মাত্র সহায়ে ঈশ্বরদর্শন, শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবিধ সাধন ও তাহাতে সিদ্ধি, পরম অনুভূতি লাভের জন্য—উচ্চতম আধ্যাত্মিক আদর্শ স্থাপনের জন্য চরম ত্যাগ, তথাপি তাঁহার সমন্বয়ের শিক্ষাই সর্বত্র আলোচিত হইয়া থাকে; সমাজে তাহার প্রভাব বাড়িতেছে, এবং ভবিষ্যতে ধর্মজগতে ইহা যুগান্তর আনিবে—এইরূপই অনেকের বিশ্বাস।

ব্যাকুলতা ও বিশ্বাসের জলন্ত দৃষ্টান্ত—ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা পুরাণের পাতায় রহিয়াছে; দেবহিতে দধীচির তনুত্যাগ, বিশ্বহিতে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ চিরদিন ভারতবাসীর মনে উদ্দীপনা জাগাইবে। তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ব্যাকুলতার ও ত্যাগের বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে।

যে শিশু অনেকক্ষণ মা ছাড়া হইয়া আছে সে যেমন স্তন্য-পিপাসায় শুধু কাঁদিতেই থাকে, কাঁদিয়া কাঁদিয়াই সে মাকে কাছে ডাকিয়া আনে—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাধনা তাহারই অনুরূপ। 'মা, আমি শাস্ত্র জানি না, মন্ত্র জানি না, তোকে না দেখে আমি থাকতে পারছি না, দেখা দিবি কিনা বল্' এই তাঁহার আকুল ক্রন্দনের ভাষা! দেখিতে অতি সহজ অতি সরল—এই পথেই তিনি জগজ্জননীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সংশয়বাদী প্রত্যক্ষবাদী বর্তমান মানবের সম্মুখে এই সাক্ষ্যই দিলেন: ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে দেখা যায়; এবং ব্যাকুলতা সহায়ে দেখা যায়। সে ব্যাকুলতার পরিমাণ কি? পুত্রের উপর মাতার টান, পতির উপর সতীর টান, বিষয়ের উপর বিষয়ীর টান, এই তিন টান একত্র করিলে যতখানি হয় ততখানি আবেগ ও আগ্রহ চাই, তবে ঈশ্বরের দর্শন মিলিবে। এ পথ সরল হইলেও যত সহজ মনে করা গিয়াছিল, তত সহজ নয়। তথাকথিত যুক্তিবাদী প্রত্যক্ষবাদী বর্তমান মানবের জন্য স্বীয় জীবন দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ এই অভিজ্ঞানই রাখিয়া গিয়াছেন: ব্যাকুলতাই ঈশ্বরদর্শনের প্রথম ও প্রধান সাধন। সরল পবিত্র হৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা, সেইখানেই তিনি সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী ঈশ্বরের ঐশ্বর্য ছাড়িয়া একান্ত অন্তরঙ্গরূপে মাধুর্যের লীলা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করাও সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে অসম্ভব! সত্যই তো তিনি কি ত্যাগ করিয়াছিলেন? বাহ্যতঃ দেখিতে গেলে তিনি তো গৃহ পরিজন সহধর্মিণী—কিছুই ত্যাগ করেন নাই। সারা জীবন মন্দিরের পূজারীরূপে প্রাপ্য মাহিয়ানাও লইয়াছেন। দৈনিক বরাদ্দ প্রসাদের থালাটি ঘরে দিয়া যাইতে ভুল করিলে বা দেরী করিলে, খোঁজ করিয়া আনাইয়া লইতেন, জমানো টাকা দিয়া 'পরিবারে'র গহনাও গড়াইয়া দিয়াছেন। অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগিবে, এ আবার কোন্ দেশী ত্যাগ? আর স্বামী বিবেকানন্দই বা কেন বলিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগীর বাদশা!'?

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ বুঝিতে গেলে—শুধু ত্যাগ কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য, সাধনার প্রকৃত রহস্য বুঝিতে গেলে—মনকে তাহার জন্য কিছু পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং

যাঁহারা তাঁহার নিকটতম লীলাসহচর, তাঁহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিতে হইবে। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষ্য পূর্বেই আমরা পাইয়াছি। শ্রীশ্রীমা কি বলেন ?—"দেখ, তোমরা ঠাকুরের 'সমন্বয়, সমন্বয়' বল—তার ত্যাগই ছিল আসল !" তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা-বিহীনা একটি 'পল্লীবালা'র মুখের এত বড় কথার গভীর তাৎপর্য না বুঝিলে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেকটুকুই না-বোঝা থাকিয়া যাইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ স্তরে স্তরে সুউচ্চ শিখরে উঠিয়াছে; তাঁহার ত্যাগ—দেহসুখ-ত্যাগে, কামকাঞ্চন ত্যাগে, নামযশ-ত্যাগে, 'মতুয়ার বুদ্ধি'-ত্যাগে,—এ সকলই বর্তমান দেহসুখকাতর, কামকাঞ্চনাসক্ত, নামযশের কাঙাল, 'মতুয়ার বুদ্ধি'-সম্পন্ন (dogmatic) মানবের সম্মুখে এক পরিপূর্ণ আদর্শ দেখাইবার জন্য ! 'আমি ষোল টাং করেছি, তোরা এক টাং (ভাগ) কর্।'—লীলাসহচরদের প্রতি এই তাঁহার উক্তি। তিনি জানেন, সকলে এ কঠিন আদর্শ জীবনে রূপায়িত করিতে পারিবে না, তাহার প্রয়োজনও নাই। গীতায় কি শ্রীভগবান্ বলেন নাই—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' ? এই ত্যাগের ধর্ম অল্প এতটুকু আচরণ করিলে মহামৃত্যুভয় হইতে, ঘোরতর অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

আমরা 'মতুয়ার-বুদ্ধি'-ত্যাগের আলোচনা করিয়া দেখিব—শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় সাধনা ও ঐ আদর্শ-স্থাপন এই শেষোক্ত ত্যাগের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

সাধারণ সাধক যদি একটি কোন মতে বা পথে সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহার আর সাধনার প্রয়োজন হয় না; তিনি সিদ্ধপুরুষ—জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আমরা দেখি এক অপূর্ব ব্যাপার ! তাঁহার সাধনার পর সাধনা শুরু হইতেছে সিদ্ধিলাভের পর। ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে এই সকল সাধনার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভ ছাড়া অন্য কিছু ? প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ ইচ্ছায় বা কাহারও সহিত যুক্তি করিয়া একের পর এক সাধনা-সকল করেন নাই; তিনি করিয়াছিলেন জগন্মাতার ইচ্ছায়, তাঁহার নির্দেশে, তাঁহারই ব্যবস্থাপনায়—'লীলাপ্রসঙ্গ'-কার তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন 'সাধকভাবে'র পাতায় পাতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন মতে বা পথেই আসক্ত হন নাই, তবে মাতৃভাবে তাহার বিশেষ নিষ্ঠা—হয়তো যুগ-প্রয়োজনে। সংস্কারমুক্ত মনে প্রত্যেকটি মত পথ ও প্রচলিত সাধনা যখন তিনি করিয়াছেন, তখন একেবারে তাহাতে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন—একাগ্র মনে তাহাতেই ডুবিয়া গিয়াছেন; তাইতো প্রতিটি সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন অতি অল্পকালে। যাহার সুরজ্ঞান আয়ত্ত হইয়াছে—বিভিন্ন রাগরাগিণী রূপায়িত করিতে তাহার বিলম্ব হয় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে সাধনা দ্বারা জীবনে অনুভব করিয়াছেন, তারপর নানা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন, মত—পথ মাত্র, লক্ষ্য নয়। তাঁহার মুখের কথা: মত কিছু ঈশ্বর নয়। সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠা যায়। তা বলিয়া সিঁড়ি ছাদ নয়। মই দিয়াও ছাদে উঠা যায়, দড়ি দিয়া, বাঁশ দিয়া—আরও কত উপায়ে উঠা যায়। যে নানা উপায়ে ছাদে উঠিয়াছে—শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে, সে-ই জোর করিয়া বলিতে পারে: একই সত্য—নানা ভাবে প্রতিভাত, নানা উপায়ে লব্ধব্য !

অনন্ত সত্যে যাইবার শুধু একটি মাত্র পথ—এরূপ বলা ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যাঙের পক্ষে সমুদ্রের ধারণা করিতে যাওয়ার মতো। ঈশ্বর যখন

অনন্ত, তখন তাঁহাকে পাইবার পথও অনন্ত। অনন্ত দেশে কালে—কত পথ কত মত হইয়াছে ও হইবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? শ্রীভগবানের 'ইতি' করিতে যাওয়া শুধু মূর্খতা নয়—মহাপাপ।

প্রতিমা পূজা করিলেই ভগবানকে সীমাবদ্ধ করা হয় না; 'আমি যাহা বুঝিয়াছি, আমি যাহা বলিতেছি, আমার কাছে ভগবানের যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, ভগবান তাহাই; আর কিছু তিনি হইতে পারেন না, এখানেই শ্রীভগবানের বিকাশের শেষ হইয়া গেল'—এরূপ বলা বক্তার নিজ মস্তিষ্কের মধ্যে ভগবানকে আবদ্ধ করা ছাড়া আর কি? প্রতিমা পূজা করা অপেক্ষা ইহা অধিকতর পাপ। প্রতিমা-পূজকেরা শ্রীভগবানের অনন্ত বিকাশ স্বীকার করে, সর্বত্র তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান যুগকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা হইতে অনেকটা মুক্ত করিয়াছেন তাঁহার জীবনে সাধন সহায়ে রূপায়িত সমন্বয়ের আদর্শ দ্বারা।

পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন ধর্মের পাশাপাশি বাস করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে চিরকালই, এ সমস্যা আজিকার নূতন নয়। প্রাচীন ভারতে বৈদিক (ব্রাহ্মণ্য), বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বহুদিন পাশাপাশি বাস করিয়াছে। পরবর্তীকালেও হিন্দুধর্মের অন্তর্গত পঞ্চদেবতা-উপাসক শাক্ত শৈব বৈষ্ণবাদি সাধকদের মধ্যে বিদ্বেষ দেখা যায় না, আরও পরে হিন্দু ইসলাম ও শিখ ধর্ম নানা সংঘর্ষ ও সংগ্রাম সত্ত্বেও এই বিশাল ভারতবর্ষে বাড়িয়া উঠিয়াছে।

আরব ও ইওরোপের কথা একটু স্বতন্ত্র, ধর্ম সেখানে রাজনীতি-সম্পর্কিত: প্রাথমিক সংঘর্ষের পর, পরস্পরকে নিধন করিয়া নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টার পর একটা আপোস-রফা সেখানে হইয়াছে।

এখন আমাদের দ্রষ্টব্য—বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সমন্বয়ের আদর্শ কি ঐরূপ আপোস-রফা বা অধুনা-প্রচারিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মতো একটা কিছু; না ইহাতে অন্য কোন নূতনতা—পরিপূর্ণতা আছে?

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মূল মর্ম এই যে, তুমিও ভাল, আমিও ভাল; তোমারও বাঁচিয়া থাকা দরকার, আমারও বাঁচিয়া থাকা দরকার; আমি তোমাকে সম্মান করিব, সাহায্য করিব, তুমিও আমার সহিত অনুরূপ ব্যবহার করিও; আমি তোমার গায়ে হাত দিব না, তুমি আমার গায়ে হাত দিও না।

আপোস-রফা সংগ্রামেরই একটি নীতি: বর্তমানে তোমার সহিত আমি আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছি না, সাময়িক সন্ধি করিলাম, পরে সময় পাইলে শক্তি সঞ্চয় করিয়া আবার তোমাকে আঘাত হানিব, আপাততঃ তুমি চুক্তির শর্ত রক্ষা করিও।

প্রথম ভাবটির মধ্যে সম্মানজনক বাহ্য ব্যবহার থাকিলেও শ্রদ্ধার ভাব নাই, বরং আছে একটা প্রচ্ছন্ন ভীতির ভাব। আর দ্বিতীয় ভাবটির মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসেরই অভাব।

সমন্বয়—শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নয়, সমন্বয় আপোস-রফাও নয়। এই দুইটির কোনটিই সমন্বয়-ভাবের ধারে-কাছেও যায় না। এ-দুটির মধ্যে মিলনের বহিরাবরণ থাকিলেও পৃথকত্বের ভাবই পরিস্ফুট। সমন্বয় সদৃশ বা বিপরীত কয়েকটি ভাবের মিশ্রণ নয়; সমন্বয় প্রতীয়মান 'নানা'র মধ্যে অন্তর্নিহিত একত্ব দর্শন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য অনুভূতি। সমন্বয়-ভাবের মধ্যে আছে একটি শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব, আত্মীয়করণের একটি আকাঙ্ক্ষা। সমন্বয় দুর্বলের উদারতা নয়, শক্তিমানের আমন্ত্রণ! সমন্বয় শুধুমাত্র পর-মত-সহিষ্ণুতাও নয়, বরং তথাকথিত পরকে আপন করিয়া লওয়ার

মধ্যেই সমন্বয়ের ভাব ফুটিয়া উঠে; পর তো কেহ নাই, সবই আপন। বিভিন্ন প্রকৃতির ভ্রাতা যেভাবে একই মাতার কাছে মিলিত হয়, বিভিন্নমুখী নদী যেরূপে একই সমুদ্রে ধাবিত হয়, বিভিন্ন ধর্ম সেইরূপে এক সত্য সনাতন চিরন্তন মহান্ মানবধর্মে সদা বিধৃত—এই ভাব সমন্বয়ের ভাব।

এই ভাব আসে জ্ঞানের দৃষ্টিতে, প্রেমের অনুভূতিতে! যদি জানি আমারই প্রিয় নানা রূপ ধরিয়া বিভিন্ন ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেছে, তবে কি আমি তাহার নানা রূপ ও নানা নামের প্রত্যেকটিকেই ভালবাসিব না? যদি বুঝি ঈশ্বর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে আবির্ভূত হইয়া মানুষকে শিখাইয়া গিয়াছেন—তাঁহার কাছে যাইবার পথ, তবে কিভাবে সেগুলিকে অস্বীকার করিব? অনন্তলীলাময়কে একটি মাত্র লীলায়, একটি মাত্র নামে বা রূপে বা ভাবে আবদ্ধ করা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়, এই অজ্ঞতাই সাম্প্রদায়িকতার জননী। দ্বৈতবাদী একেশ্বর-বাদ যদি অদ্বৈতবাদে পূর্ণ বিকাশ লাভ না করে, তবে এই খণ্ড সাম্প্রদায়িক মনোভাব আসিতে বাধ্য।

একই নানারূপে প্রতীয়মান হন, এ-কথা তো বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। সেদিক দিয়া 'সমন্বয়-বাণী' বেদান্তেরই অনুসিদ্ধান্ত। চরম বা পরম সত্য 'এক' বা 'অদ্বিতীয়,' একথা অবশ্য স্বীকার্য। জগতে বা প্রকৃতিতে 'নানা' দেখা যায়, একথাও অস্বীকার করা যায় না, তবে? এইখানেই বেদান্তদর্শনের উত্তর: 'নানা' নামরূপ মাত্র, প্রকৃত পক্ষে একই আছে; 'নানা' সমুদ্রবক্ষে প্রতীয়মান তরঙ্গের মতো। নানা তরঙ্গ কি সমুদ্রের অদ্বিতীয়ত্ব ভঙ্গ করিতে পারে? নানা ধর্মের তরঙ্গ উঠিয়াছে, কত পড়িয়াছে, আরও কত উঠিবে, সবই সেই এক সত্যের মহাসমুদ্রে! যেখানে উদয় সেখানেই লয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে অদ্বৈত একটি মত নয়, তত্ত্ব। অদ্বৈত ভাবে অনুভূত সমন্বয় একটি মতবাদ নয়, ইহাও 'অদ্বৈতে'র মতো অবিরোধী তত্ত্ব, অবাধিত সত্য, অদ্বৈতভাবেরই একটি রূপ।

যুগ-মানবের মাধ্যমে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মের উদয় হয় যুগ-মনের চাহিদা অনুসারে, সে যুগের মানুষের মনের ধারণাশক্তি অনুযায়ী। যখন বহু মানবের মনে করুণার কণা জমিতেছিল, তাহাই যুগ-প্রয়োজনে রূপ ধারণ করিল করুণাঘন বুদ্ধমূর্তিতে। আবার যখন বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য নির্ধারণের একান্ত প্রয়োজন দেখা দিল—তখনই জ্ঞানঘন শঙ্করমূর্তির আবির্ভাব। জ্ঞান-সূর্যের প্রখরতাপে যখন হৃদয় শুষ্কপ্রায়, তখন প্রেমঘন শ্রীচৈতন্য বারিবর্ষণ করিয়া ভারত-ভুবন সিক্ত শীতল করিলেন। ভারতের বাহিরেও দেখা যায়—প্রবল প্রতাপান্বিত স্বেচ্ছাচারী সম্রাট্সদৃশ পক্ষপাতী 'ঈর্ষাপরায়ণ' জিহোবা যখন আর মানবকে শান্তি বা সাহস দিতে পারিতেছিলেন না, তখনই যীশু আনিলেন তাঁহার স্বর্গস্থ প্রেমময় পিতার বার্তা: স্বর্গরাজ্য তোমাদেরই শুদ্ধ হৃদয়ে।

নানা ধর্মের অভ্যুদয়ে ও বিবাদে যখন মানব-মন বিভ্রান্ত, যখন কোন্ ধর্ম সত্য, কোন্ ধর্ম ঈশ্বর-লাভের যথার্থ পথ—এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না পাইয়া মানুষ ধর্মেরই উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছিল, যখন বহু মানব-মন এমন একটি বিকাশের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল—যাহার ভিতর সকল ভাবই মূর্ত হইয়া উঠিবে, যাহাকে গ্রহণ করিলে সকলকেই গ্রহণ করা হইবে, কাহাকেও বর্জন করিতে হইবে না—তখনই সর্বভাবের ঘনীভূত মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। সমন্বয়ের ভাব—প্রেমের ভাব, প্রীতির ভাব, শান্তি সাম্য ও সামঞ্জস্যের ভাব। সমন্বয়ের ভাব ভবিষ্যৎ উন্নততর মানব-সমাজের বিশাল ভিত্তির আধার-শিলা।

চলার পথে

'যাত্রী'

কে তুমি ধর্মস্থাপক? বর্তমান শতাব্দীর পরম জড়বাদের যুগেও তোমার স্বীকৃতির আসন পেতে বসেছ? ভূগোলানন্দের চেয়ে ভূমানন্দ বড়—এ কথা বোঝালে তোমার ঐ সরল গ্রাম্য ভাষায়, গল্প-পুষ্পের কলি ফুটিয়ে! শুধু কি কথায়? জীবনে পরিণত ক'রে দেখালে সব কিছু এমন নির্ভুল ক'রে যে জড়বাদী বিজ্ঞান তার অণুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণ লাগিয়েও তোমার ভুল ধরে দিতে পারল না! সে যখন জিজ্ঞাসা ক'রল, তুমি যা বল তা আমাদের চোখে পড়ে না কেন? উত্তরে দিলেঃ দিনমানে 'তারা' দেখা যায় না, তা বোলে তারা কি তখন নেই? ওধারে আবার বিরাট জিজ্ঞাসার তলোয়ার উঁচিয়ে স্বামীজী এলেন তোমার কাছে, শুধু স্পর্শ করেই অত বড় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলে তাঁকে। আরও সব এল কত, তোমার দুর্গে কামান দাগতে, কিন্তু তাতে তোমার দুর্গ-প্রাচীরের একখানা ইঁটও খসল না।

কে তুমি সর্বধর্মস্বরূপ? সংসারী এসে তোমায় প্রশ্ন ক'রল, তুমি তাদের কাছে অপূর্ব রূপ ধরে দিলে দেখা। বললেঃ যে মা আমার গর্ভধারিণী, যে মা ঐ ভবতারিণী, তিনিই আর একরূপে এখন আমার পা টিপে দিচ্ছেন।' আর বললে তাদের—পাঁকাল মাছের মত থাকতে, নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে। বললে, তিনটে 'স' (শ-ষ-স)-এর কথা—শ,ষ,স। তাতেও যখন লোকে দুঃখের কথা তুলে অনুযোগ করতে লাগল তখন দিলে চরম বাণী—সাপ হয়ে খাই, রোজা হয়ে ঝাড়ি।...জ্ঞানীকে বোঝালে, মাকড়সা তার নিজের ভেতর থেকে জাল বের ক'রে আবার সেই জালেই থাকে, 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।' আর আশ্বাস দিলে এই বলে, বিচিটা পুঁতলেই কি ফল পাওয়া যায়? তাতেও যারা বুঝল না তাদের বোঝাতে গিয়ে বললে, চিলের নিজের মুখেই যে মাছ রয়েছে, মাছ ফেলে দিলে তবে তো কাকের তাড়া থামবে! ভিজে দেশলাই কেন জলছে না, তারও দিলে সন্ধান। সেই সাথে বুঝিয়ে দিলে, গুটিপোকা কেমন ক'রে নিজেদের নালেই জড়িয়ে পড়ছে। আবার পাছে এই সব কথা শুনে তমোগুণ তাদের পেয়ে বসে, তাই সাবধান ক'রে দিয়ে বললে, বিষ ঢেলো না, কিন্তু ফোঁস কোরো।...ভক্তকে বললে, বুড়ি ছুঁয়ে নিয়ে খেলা কর, জাঁতার খুঁটি ধরে পেষণ দেখ; হাঁসের মত দুধটুকু খেয়ে জলটুকু রেখে দাও, ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল হও। সেটুকু সামর্থ্যও যদি না থাকে তো বিড়ালছানা হয়ে যাও। শেষে দিলে চরম ভরসা, 'বকল্‌মা' দাও। এইখানেই বোধ হয় সব শেয়ালেরই এক 'রা'। তাই শুনি—শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। যীশু বলছেন, হে তৃষ্ণার্ত মানব আমার কাছে এসে তোমার পিপাসা মিটাও। ...সন্ন্যাসী এসে তোমাকে প্রশ্ন করলে। তাদের কথার উত্তর দেবার আগে দরজা পর্যন্ত দেখে এলে, অন্য ভাবের কেউ আছে কিনা; তারপর বললে, ত্যাগই এ পথের প্রথম সোপান; 'পন্‌ছি' আউর দরবেশ না করে সঞ্চয়। উপনিষদেও উচ্চারিত হয়েছে—ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ। মহাভারতেও গীত হয়েছে—ত্যাগ এবহি সর্বেষাং মোক্ষসাধন-মুত্তমম্। আর তপস্যার কথায় জানালে, সত্যকথাই কলির তপস্যা, বৈদিক যুগেও যা স্বীকার

করা হয়েছে—সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা। আর চাই, মোক্ষলাভের জন্য এক উদগ্র উদ্যোগ। 'সিদ্ধি, সিদ্ধি' মুখে বলা নয়, তাকে আনতে হবে, ঘুঁটতে হবে, খেতে হবে, তবে তো! পানা ঠেলে জল খাও; মন্থন ক'রে মাখন তোল; চার ফেলে মাছ ধর। খানদানী চাষা হও—বার বৎসর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ ছেড় না। বাইরেটা রাঙানোর আগে ভেতরটা রেঙেছে কিনা দেখ। তা না হলে সাধুর কমণ্ডলুর মত অবস্থা হবে, চারধাম ঘুরে এল, কিন্তু যে তেতো সেই তেতো। এই-সব ঠিক ক'রে বুঝে নিয়ে এগিয়ে চল। তবে মনে রেখো, একটি জিনিষ মাত্র জগতে উচ্ছিষ্ট হয়নি, সেইটিই ব্রহ্ম। সেখানে 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'

কে তুমি মহামানব? পুঁথি পড়ে নয়, সকল ধর্ম সাধন করেই বোঝালে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী। বোঝালে, জল নিতে এসেছ, তা নাও, কিন্তু জলের নাম নিয়ে মারামারি কোরো না; একে জল, পানি, 'একোয়া', 'ওয়াটার' প্রভৃতি বিভিন্ন নাম দেওয়া চলে। তাই তো এল কত সিদ্ধ সাধক তোমাকে বিভিন্ন ধর্মসাধন শেখাতে; আর শেষে এল, কত ধর্মের সাধক, তোমাকে গুরু বলে মানতে—কারণ তুমিই তো দেখেছ, গাছতলায় বাস ক'রে, বহুরূপীর বিভিন্ন রূপ। তাই তো তোমারই পক্ষে সম্ভব—ঠিক পথের সন্ধান দেওয়া। আজকের এই আসমুদ্রহিমাচল নয়, ভবিষ্যতের ঐ আমেরুপৃথিবী তোমাকে গুরু বলে মানবে।

কে তুমি অবতারবরিষ্ঠ? নানা ভাবে বোঝালে, যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা! প্রখর সূর্যের দিকে তাকানো যায় না, কিন্তু তাকেই আবার প্রত্যূষে দেখলে চোখের তৃপ্তি হয়—ঐ ভাবেই ভগবান আসেন অবতার হয়ে, সূর্যের ভোরের মত নরম হয়ে। আসেন তিনি, এক অচিন্ গাছের রূপ ধরে—তাকে তলিয়ে দেখলে বুঝি, গাছের আকার বটে, কিন্তু তা এক অচেনা গাছ। কারণ তুমি হচ্ছ গর্তওয়ালা পাচিল, তাই সাধারণের মত ঘরের ঘেরা-উঠানে থাকলেও বাহিরের ঐ অনন্ত মাঠের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে, ঐ ফাঁকটুকু আছে বলে। দুদিক তোমার জানা আছে বলেই তুমি বলতে পারলে, পিঁপড়ে হয়ে চিনির পাহাড়ের সবখানিই নিয়ে যেতে চেষ্টা কোরো না, দু'এক দানা নিলেই পেট ভরে যাবে। বোঝালে, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির অভিন্নতার কথা—সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, হেললে দুললেও সাপ; তাই লীলাকে ছেড়ে নিত্যকে ভাবা যায় না। দুধের সাদাটা দেখেছ? তাকে দুধ থেকে আলাদা ক'রে নিয়ে কি ভাবতে পারো? তবে আর অহঙ্কার রাখছ কেন? উঁচু জমিতে নয়, নীচু জমিতেই জল জমে যে। দীনহীন ভাবই ভাল। 'Blessed are the meek-natured for they shall see God.' অদ্বৈত জ্ঞান চাও তো, একটি একটি ক'রে দশটি জলপূর্ণ ঘটকে (যার উপর সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা সূর্য মনে হচ্ছে) ভাঙো, তাহলে শেষে সত্য-সূর্যই অবশিষ্ট থাকবে। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোল, তারপরে দুটোকেই দিও ফেলে। মনে রেখো, অজ্ঞান একটু একটু ক'রে যায় না, দপ্ ক'রে যায়, যেমন অন্ধকার ঘরে দেশলাই জ্বাললে হয়। বোঝালে, সবার পেছনেই সেই অদ্বৈতানুভূতি। এইটে আছে বলেই লীলা। আলু পটল যে গরমজলে লাফাচ্ছে, সে ঐ আগুনেরই জন্য। আগুন সরাও, আলুপটলের লাফানিও যাবে থেমে। সবার উপরে শেষ কথা—সত্যই কলির তপস্যা, যত মত তত পথ, মন মুখ এক করো, ভাবের ঘরের চুরিটি করো বন্ধ।

প্রশস্ত পথের পথিকৃৎ তিনি, পথও তিনি। সেই পথেই চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

ব্রহ্ম-বর্ণন

[শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা-গীতি]

শ্রীগৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্ম কী-রূপ বর্ণিবে কেবা ?
কে হেন ব্রহ্মলাভী !
ঠাকুর কহেন : নুনের পুতুল
তরতর যায় নাবি'
সাগরের জলে ; গভীরতা তা'র
মাপিয়া জানাবে ব'লে ;
কিন্তু খবর হ'ল নাক' দেওয়া,
গেল যে অম্‌নি গ'লে।
তেম্‌নি যাঁহারা ব্রহ্ম-সাগরে
গিয়েছেন একবার,
মাপের খবর পারেননি দিতে ;
হয়েছেন একাকার ॥

ঠাকুর তাঁহার অমৃত ভাষায়
ক'ন শাস্ত্রের সার ;
বলা যায় নাক' স্বরূপ যাঁহার
আভাস দেন যে তাঁর।
উপদেশ-ছলে বলেন ঠাকুর,
'কেউ যদি কভু পুছে,
কেমন ঘি খেলে ? কী বোঝাবে তা'রে ?
হদ্দ বল্‌বে বুঝে—
'ঘি আর কেমন, খেয়েছ যেমন' ;
রসিয়ে বলেন তিনি,
উপমার সাথে অপরূপ তাঁর
বাক্যের জাল বুনি :

সখীরে ডাকিয়া সঙ্গিনী মেয়ে
শুধালো গোপনে তা'রে,—
গতকাল রাতে স্বামী এলো তোর
আনন্দ খুব না রে ?
মেয়েটি কহিল, 'একথা কেমনে
বুঝায়ে তোমারে কই,
স্বামী যবে তোর আসিবে তখন
আপনি জানিবি সই।'

বেদ-পুরাণেতে ব্রহ্মের কথা
ব'লেছে কেমন জানো ?
উপমা গাঁথেন শ্রীরামকৃষ্ণ :
অপরূপ সে তো মানো ?
একজন গেল সাগর দেখতে—
ফিরিয়া আসার পরও,
জিজ্ঞাসা তা'রে করে যদি কেউ—
'সাগর কেমনতর ?'
তখন সে যদি বলে, 'দেখিলাম
কী বা হিল্লোল, আহা !!'
ব্রহ্মের কথা তেমনি শোনাবে ;
ভাষায় বলিলে তাহা ॥

কাঙালের ঠাকুর *

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

ঠাকুরের আবির্ভাব কাঙালের বেশে, জন্ম তাঁর ঢেঁকিশালে, কত অভিনয় তিনি ক'রে গেলেন—সব গোপনে। কোন বাহ্যাড়ম্বর নেই, কোন বিভূতিপ্রকাশ নেই, গেরুয়া নেই, মালা-তিলক নেই, এমন কিছু চিহ্ন নেই যাতে ক'রে চেনা যাবে যে তিনি সাধু মহাপুরুষ বা পরমহংস। অনেক বাইরের লোক দক্ষিণেশ্বর এসে তাঁকেই প্রশ্ন ক'রে বসেছে, 'হ্যাঁগা, পরমহংসঠাকুর কোথায় বলতে পারো?' কেউ তাঁকে চিনতেও পারত না। তিনিও নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিতেন, 'কে জানে বাপু! কেউ বলে ছোট ভট্চাজ, কেউ বলে পাগলা বামুন, আবার কেউ বলে পরমহংস—তা তোমরা খুঁজে নাও তাকে।'

কাঙাল-শরণ তিনি, তাই কাঙাল বেশে কাঙালের ঘরেই এসেছিলেন। পিতা ক্ষুদিরাম পূর্বে সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু দেরে গ্রামের জমিদারের কোপে পড়ে তাঁকে ভিটা ছাড়তে হয়। সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা তাঁকে জমিদারের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধা দেয়। এতে তাঁর সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ধর্মের প্রতি আকর্ষণই প্রকাশ পায়। স্ত্রীপুত্রকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে নতুন পথে যাত্রা করেন, তাঁর সহায় সত্য—ধর্ম—ভগবান। সর্বহারা হয়েও তিনি ধর্ম-সত্য-ভগবানকে ছাড়েননি, এই হ'ল ভারতীয় আদর্শ। মহাভারতের কুন্তী পঞ্চপুত্র নিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে বনবাস করছেন, কিন্তু মনে কোন ক্ষোভ নেই, কারণ সঙ্গে রয়েছেন অনন্যশরণ অভয় আশ্রয় ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ

কামারপুকুর গ্রামে এসে সামান্য কয়েক কাঠা জমি সম্বল ক'রে তিনি নতুন সংসার পাতলেন; রঘুবীরজীকে বুকে ক'রে এনে সেখানে বসালেন। সামান্য সংস্থান তাঁদের, কিন্তু মনে বড় তৃপ্তি। এই রকম সামান্য পরিবেশে ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। বাহ্য দৃষ্টিতে এঁরা বিত্তহীন হতে পারেন, কিন্তু অপার্থিব সত্য ও ধর্মসম্পদের এঁরা অধিকারী, এঁদের ঘরেই কাঙাল বেশে তিনি এলেন। চিরকাল রয়ে গেলেন এই কাঙাল বেশেই, আর কৃপাও করতেন এই কাঙালদের।

ভগবানকে পেতে হ'লে কাঙাল হতে হয়। ধনের অভিমান নিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায় না। মহাপুরুষরা বলতেন, 'প্রভুর দরজায় কুকুরের মতো পড়ে থাকতে হবে, তবে তাঁর কৃপা পাবে।' তিনি যে দীনবন্ধু দীনতারণ দীননাথ দীনদয়াল দীনশরণ; তিনি কাঙালের ঠাকুর। এই ভাব নিতে হবে। 'বড় হবি তো ছোট হ'—এই চিন্তা ক'রে মন গঠন করলে তবে তাঁর কাছে যাওয়া যাবে। অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী তিনি, কিন্তু কোন ঐশ্বর্যই কেউ তাঁর জানতে পারত না। কোন কোন ভাগ্যবান কদাচিৎ তাঁর শক্তির স্ফুরণ দেখে স্তম্ভিত হয়েছিল। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আরও বিচিত্র, ঠাকুরের তবু ঘন ঘন ভাব-সমাধি হ'ত, মায়ের সাধনার কথা কেউই জানতে পারেনি। কত গোপনে তিনি রেখেছেন তাঁর অমিত শক্তিকে। এঁরা যে সাক্ষাৎ ভগবৎ-শক্তি, একবার স্পর্শ ক'রে মানুষের মন বদলে দিতে পারতেন; ভগবান দর্শন করিয়ে দিতে পারতেন। কেউ বাইরে থেকে দেখে এঁদের কিছু টেরও পেত না। এত কাঙাল বেশে এঁরা থাকতেন!

---

* ১৩.১১.৫৭ তারিখে সন্ধ্যায় আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ:
—শ্রীআলোক চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত।

১৮৮৬, ১লা জানুআরি কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে ঠাকুর কল্পতরু হয়েছিলেন, সমবেত ভক্তবৃন্দকে একবার স্পর্শ ক'রে তিনি তাদের বহু-সাধনলভ্য চৈতন্য দান করছেন, কি অপূর্ব অদ্ভুত ব্যাপার! তাঁর মধ্যে যে এত অপার শক্তি রয়েছে—বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝতে পারত না। রাজা যেমন ছদ্মবেশে রাজ্য পরিদর্শনে বেরোন, সেই রকম সংগোপনে কাঙালবেশে তাঁর মর্ত্যে আগমন। ঠাকুরের কাছে যে সব ব্রাহ্ম ভক্ত আসতেন, তাঁরা মাথা নুইয়ে প্রণাম করতেন না। কিন্তু ঠাকুরই তাঁদের মাথা হেঁট করতে শিখিয়েছেন, নিজে মাথা নুইয়ে প্রণাম ক'রে। যে যত বেশী মাথা হেঁট করতে পারবে, সে তত তাড়াতাড়ি ভগবানকে পাবে। অহংকার ত্যাগ না হ'লে তাঁর কাছে যাওয়া যায় না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বলছেন, তৃণাদপি নীচু হতে হবে। ঠাকুরের ভক্ত নাগ-মশায়ের জীবনে এইটি দেখা যায়। বিনয়ের পরাকাষ্ঠা ছিলেন তিনি। যে সব উপাধি সম্মান প্রতিপত্তি সংসারে আনন্দ দিচ্ছে, প্রভুর দরজায় সেগুলি সব পরিত্যাগ ক'রে গিয়ে তাঁর শরণ নিলে তবেই পরম তৃপ্তি; তখন তিনি বুকে তুলে নেবেন। ঠাকুর নিজের জীবনে তাঁর প্রতিটি উপদেশ পালন ক'রে তাঁর উপদেশাবলীর Practical demonstration (কাজে ক'রে দেখিয়ে) দিয়েছেন জগতের লোককে, কত অপার আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী তিনি ছিলেন! স্বামীজীর মত উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় শিক্ষিত যুবককেও তিনি একবার স্পর্শদ্বারা অনন্ত আনন্দলোকের রসাস্বাদ করিয়ে দিলেন। চৈতন্যানুভূতি করালেন, আবার স্পর্শদ্বারা সেই দর্শন-অনুভব সংবরণ ক'রে দিলেন। কি অসীম ক্ষমতা থাকলে এটি সম্ভব, আমরা অনুভব করতে পারি না। এত বিভূতি—শক্তি থাকা সত্ত্বেও কিভাবে জীবন কাটিয়ে দিলেন! একেবারে দীনের মতো সাধারণ বেশে ও সেই ভাবে তিনি থাকতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র শুদ্ধসত্ত্ব স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একবার কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করতে গিয়েছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করছেন, তখনকার একটি ছোট ঘটনা মনে পড়ে, মন্দিরে ঢুকতেই মহারাজের চোখে পড়লো, সামনের ছোট উঠোনটিতে একটি ঝাড়ুদার ঝাঁটা দিয়ে বাসি বেলপাতা-ফুল সব পরিষ্কার করছে, এইটি দেখেই মহারাজের এক ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল, তিনি আস্তে আস্তে গিয়ে ঝাড়ুদারের হাত থেকে ঝাঁটাটি নিয়ে অল্পক্ষণ মন্দিরের চাতাল একটু পরিষ্কার ক'রে আবার সেটি ফেরত দিলেন। কি মহৎ শিক্ষা দিলেন তিনি ঐ ছোট ঘটনাটির মধ্য দিয়ে! মহাজন-বাণী আছে, 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'। 'মহারাজ' কি এই ভাব নিয়ে এটি করলেন? এখানে তিনি বহুজনপূজ্য ধর্মগুরু নন, তিনি জগৎগুরু বিশ্বনাথের দীন সেবকমাত্র—এই ভাব প্রকাশ করছেন। সঙ্ঘের সেবকদের তিনি শেখাচ্ছেন Practical demonstration দিয়ে—প্রভুর কাছে সর্ব উপাধি-বিযুক্ত হয়ে দীনতা ব্যাকুলতা নিয়ে উপস্থিত হ'লে তবে তাঁর দয়া হয়। তিনি যে 'অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য'।

মা কত সাধারণ ভাবে থাকতেন, কেউ জানতে পারত না যে ব্রহ্মময়ী স্বয়ং এই নররূপ ধারণ ক'রে অপূর্ব লীলা ক'রে যাচ্ছেন, এমনি মহামায়ার মায়া! মা-ঠাকরুন যখন দক্ষিণ ভারতে যান, সেই সময় গোলাপ-মাও সঙ্গে ছিলেন। তাঁর চেহারা ছিল সুন্দর আর বেশ রাসভারী। দক্ষিণী ভক্তরা এসে গোলাপ-মাকেই সবাই মা-ঠাকরুন মনে ক'রে প্রণাম করতে যেতেন। মায়ের অতি সাধারণ ভাব দেখে সকলেই অবাক্ হয়ে যেত।

ভগবান একবার তাঁর ভক্তদের তাঁর অনন্ত সম্পদের ভাণ্ডার দেখাচ্ছেন। সেখানে ভক্তদের সুখ দেওয়ার কত জিনিস তিনি রেখেছেন, পরিপূর্ণ রয়েছে তাঁর ভাণ্ডার অনন্ত ঐশ্বর্যরাশিতে, কিন্তু একটি জিনিস তিনি তাঁর ভাণ্ডারে রাখেননি, এটি তিনি চান ভিক্ষাপাত্র হাতে, এটি তিনি চাইছেন তাঁর ভক্তদের কাছে—এটি 'দীনতা'; এটি তোমরা অভ্যাস করো। আমিত্ব ত্যাগ করো। ঠাকুর বলছেন, 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'; এই অহংকার পরিত্যাগ করলেই তৃপ্তি আসবে। দীনবন্ধুকে পেতে হ'লে দীন সাজতে হবে! মীরাবাঈ দীনবেশে রণছোড়জীকে আশ্রয় ক'রেছিলেন। সমস্ত পার্থিব সুখভোগলাভেচ্ছা পরিত্যাগ ক'রে কাঙালিনীর বেশে তিনি গিরিধারীলালজীর শরণ নিয়েছিলেন বলেই তো শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিবানিশির সাথী হয়েছিলেন। ঠাকুরেরও এই ভাব—জগতের সব একদিকে পড়ে রইল, তাঁর শুধু মাকে নিয়ে লীলাবিলাস। মায়ের কাছে তিনি সন্তান, দীনতম সেবকমাত্র।

ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে। রাণী রাসমণির জামাই মথুরবাবুর এক বন্ধু এসেছে মন্দির দেখতে জুড়িগাড়ী ক'রে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে গঙ্গার ধারে তখন অপূর্ব ফুলের বাগান ছিল। বন্ধুবর সেই বাগানে ফুলের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে সেই বাগানের মধ্যে গায়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে একজন লোককে ঘুরে বেড়াতে দেখে তাকে নির্দেশ দিলেন, যেন সে তাঁকে একটি ফুলের তোড়া বানিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে সেই লোকটি একটি তোড়া নিয়ে এসে হাজির বন্ধুটির সামনে। তোড়ার গঠন-পারিপাট্য ও পুষ্পবিন্যাস দেখে তাঁর তো চক্ষুস্থির, কোন সাধারণ মালির পক্ষে তো এমন তোড়া করা সম্ভব নয়! এ মালি নিশ্চয়ই একজন শ্রেষ্ঠ কারিকর। বন্ধুটি তক্ষুনি চললো জানবাজারে—মথুরবাবুর কাছে। সেখানে উপস্থিত হয়ে বন্ধু মথুরকে অনুরোধ করলেন—ভাই এই যে তোড়াটি দেখছ—এটি তোমার দক্ষিণেশ্বর বাগানের মালির তৈরী। আমার ঐ মালিটিকে চাই, আমার বড় পছন্দ হয়েছে তাকে। সেই ফুলের তোড়ার লালিত্য ও মালির চেহারার বর্ণনা শুনে মথুরবাবুর তো বুঝতে কিছুই বাকী রইল না। তিনি তখনি ছুটলেন দক্ষিণেশ্বর—বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়ে। মন্দিরে পৌঁছে উত্তর পশ্চিম কোণের গোলবারান্দাযুক্ত ঘরে সোজা এসে উঠলেন, তারপর যা করলেন তাতে বন্ধুর আর একবার চক্ষুস্থির হবার উপক্রম। মথুরবাবু সেই বাগানের মালিটির পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে পড়ে বলছে, বাবা একে তুমি ক্ষমা করো, এ না জেনে তোমার সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার করেছে। ঠাকুরের ছিল সবই অদ্ভুত; যখন যে কাজ করতেন, তা সে যত সামান্যই হোক না, সেটি সর্বাঙ্গসুন্দর করতেন, নিখুঁত হত সেটি, তিনি যে সৌন্দর্যময়ী জগৎসৃষ্টিকারিণীর 'খাস তালুকের প্রজা'; তাই তাঁর হাতের কাজ ছিল এত সুন্দর! ঠাকুর মথুরবাবুর এই আচরণে সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, তাতে কি হয়েছে—তা আর কি। যেন কিছুই হয়নি এই ভাব। কি নিরভিমানতা!

গিরিশবাবুকে অবনমিত করছেন নিজে তাঁর কাছে নত হয়ে। নিজের জীবন দিয়ে তিনি জগৎকে শেখাচ্ছেন, কাকে বলে 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়া। এই দীনতা চাই, চাই এই নিরভিমানতা, চাই আত্মবিসর্জন—তবেই তাঁকে পাবে।

স্বামী তুরীয়ানন্দের কথাসংগ্রহ

[দ্বিতীয় পর্যায়]

ভক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-লিপিবদ্ধ

কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, ১৯১৯ খৃঃ ৯ই অক্টোবর, অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা। পূজনীয় কেদার বাবা, শ্রীচন্দ্রকান্ত ঘোষ এবং কয়েকজন ব্রহ্মচারী ও ভক্ত উপস্থিত।

মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের পর পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দ অম্বিকা-কুটীরের বারান্দায় আরাম-চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় বিরাজমান। সেবক সনৎ মহারাজ ছোট টানা-পাখাটি টানিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন। অনেক বৎসর কঠোর তপস্যায় মহারাজের স্বাস্থ্য ভগ্ন; তদুপরি বহুমূত্ররোগে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে; তাই বায়ুপরিবর্তনের জন্য কয়েক মাস পূর্বে কাশীধামে আসিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত বাবু প্রণামান্তর আসন গ্রহণপূর্বক কুশল প্রশ্ন করিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—এখন এক রকম ভালই চলে যাচ্ছে। এখানে এসেই উপর্যুপরি দুবার ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ায় শরীরটা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল। ভাগ্যিস্, এখন ডাঃ—যিনি আমাকে কলকাতায় চিকিৎসা করেছিলেন, কোন কার্যো-পলক্ষে এখানে এসেছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বলেছিলেন যে, আমার বোধ হয় এখানকার change (পরিবর্তন) কার্যকর হবে না। তখন আমার পূর্বের হাঁপানি রোগের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল।

ভক্ত—আপনাকে অষ্টমীপূজার দিন যেমন দেখেছিলাম, এখন তার চেয়ে অনেক ভাল দেখছি। বায়ুপরিবর্তনের ফল আসামাত্র না হয়ে ক্রমশঃ হলেই ভাল। দেওঘর গিয়ে প্রথমে বাবুরাম মহারাজের খুব উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু পরে তা টিকল না।

স্বামী—তারপর তাঁকে কলকাতা আনাই বোধ হয় খারাপ হয়েছিল। রাস্তায় ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে ডবল নিউমোনিয়াতে পরিণত হয়।

* * *

চন্দ্রকান্তবাবু—আপনি আমাদের তো দেখছেন, সংসার নিয়েই আমরা ব্যস্ত। কি করলে তাঁকে লাভ করা যায়, বলুন।

স্বামী—ঠিক এই করলে তাঁকে পাওয়া যায়, এমন কিছু নেই। ঠাকুর বলতেন, বহু জন্মের পুণ্যফলে লোক সরল হয়। স্বামীজী বেশ বলে-ছিলেন, 'একি শাক মাছ পেয়েছ যে, এত কড়ি দিয়ে কিনে নেবে?' অধ্যবসায় থাকা চাই। একটু ধ্যানজপ করেই কিছু হ'ল না বলে ছেড়ে দিলে চলবে না। তপস্যা করতে করতে রত্নাকরের উপর বল্মীকের স্তূপ জমে গিয়েছিল। ঋষিদের মধ্যে যিনি যে পথে তাঁকে পেয়েছেন, তিনি সেই পথের কথাই শাস্ত্রে লিখে গেছেন। কেউ বলছেন, এরূপ ভাবে পূজা করতে হবে; কেউ বলছেন, এরূপে জপ করতে হবে। নারদ বলেন, নদী যেমন সমুদ্রকে পাবার জন্য আর কোন দিকে না চেয়ে (যে পথে সম্ভব সেই পথে) এক লক্ষ্যে তার দিকে চলতে থাকে, তেমনি যে ভগবানকে চায় সে আর সব ফেলে দিয়ে একমনে তাঁর দিকেই চলতে থাকবে। গীতায় ভগবান্ বলেছেন:

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

ভক্তি দুরকম। প্রথমে বৈধী ভক্তি; এত

জপ, এরূপ পূজা করতে হবে। তারপর রাগানুগা ভক্তি, তখন ভক্ত ব্যাকুল হয়ে কেবল তাঁর কথাই চিন্তা করে, তাঁর বিষয় ভিন্ন আর কিছু ভাল লাগে না।

চন্দ্রকান্তবাবু—মহারাজ, জপ করা মানে কি?

স্বামী—জপ মানে মুখে তাঁর নাম করা, আর অন্তরে তাঁর রূপ চিন্তা করা, তাঁর কথা ভাবা, তাঁকে ভালবাসা। মন যদি অন্য জিনিসে আসক্ত থাকে, তাহলে শুধু মুখে নাম করলে কি হবে? আসল কথা যেমন করেই হোক তাঁকে ভালবেসে আপনার ক'রে ফেলা।

ভক্ত—ঠাকুর যেমন বলেছেন, যো সো ক'রে বাবুর সঙ্গে দেখা করা—তা দারোয়ানের ধাক্কা খেয়েই হ'ক, বা পাঁচিল ডিঙিয়েই হ'ক।

চন্দ্রকান্তবাবু—কেউ যদি ভাবে, ঠাকুরের বা শ্রীমার দর্শন পেয়েছি, আমার আর কিছু করবার দরকার নেই।

স্বামী—তাদের কথা আমি কি ক'রে বলবো? সে বিষয়ে তারাই ভাল জানে।

ভক্ত—এঁরা বোধ হয় বলতে চান, অনেকের বিশ্বাস—মা যখন আমাদের ভার নিয়েছেন, তখন আমাদের আর কিছু করবার দরকার নেই। মা যখন আমাদের এক হাত ধরে রেখেছেন, তখন অন্য হাতে আমরা যা খুশি করতে পারি। মুক্তি আমাদের করতলগত।

স্বামী—ঠিক ঠিক যদি সেরূপ বিশ্বাস কারো হয়, তাহলে তো তার হয়ে গেছে। কিন্তু ওরূপ হওয়া কি সোজা কথা? ওরূপ স্থলে যাতে self-deluded (আত্ম-প্রতারিত) না হয়, দেখতে হবে। ভগবানের উপর যারা সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে, তারা যদি পূর্বে মহাপাপও ক'রে থাকে, তা হলেও তাঁর কৃপায় এক মুহূর্তে সে পাপ দূর হয়ে যায়। পর্বত-প্রমাণ তুলার মধ্যে এক ফিন্‌কি আগুন ছেড়ে দাও দেখি! সমস্ত তুলা হুহু ক'রে জ্বলে পুড়ে যাবে। হাজার বছরের অন্ধকারের মধ্যে আলো জ্বাললে কি তা একটু একটু ক'রে দূর হয়, না তৎক্ষণাৎ চলে যায়? গীতায় ভগবান্ বলেছেন:

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

অত্যন্ত দুরাচারও যদি একমাত্র তাঁর শরণাগত হয়ে থাকে, তবে তাঁকে সাধু বলেই জানতে হবে। আর সে 'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা'। তাঁর কৃপায় সে আর দুরাচার থাকে না, ধার্মিক হয়ে যায়। নাচতে জানলে তার পা বেতালে পড়ে না। পূর্বে বহু পাপ ক'রে থাকলেও শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করার পরে কি আর তার দ্বারা পাপ কাজ সম্ভব হয়? গিরিশবাবু না করেছেন, এমন পাপ কাজ নেই। একবার আমাদের বলেছিলেন, 'আমি যত মদ খেয়েছি তার বোতলগুলি খাড়া ক'রে একটার উপর আর একটা রাখলে মাউণ্ট এভারেষ্ট (হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর)-এর সমান উঁচু হবে। কবি কিনা, তাই এভাবে বলেছিলেন। গিরিশবাবুকে ঠাকুর সকাল-সন্ধ্যায় ভগবানের নাম করতে বলায় তিনি বলেছিলেন, 'তা কথা দিতে পারি না। আমি তখন কোথায় কোন্ খেয়ালে থাকব, জানি না।' তারপর শুধু খাওয়ার সময় নাম নিতে বলায়ও বললেন, 'তাও আপনার কাছে বলতে পারি না। কত মোকদ্দমা, বাজে ভাবনা নিয়ে থাকি। এও পারব না।' তখন ঠাকুর বললেন, 'তবে বকল্‌মা দে।' পরে গিরিশবাবু বলেছিলেন, 'তখন তো বকল্‌মা দিয়ে এলুম। পরে বুঝেছি, বকল্‌মা দেওয়া কত শক্ত! দিনান্তে একবারও তাঁর নাম করতে পারব না বলেছিলাম। কিন্তু পরে দেখি, প্রতি মুহূর্তে এতটুকু কাজ তাঁকে স্মরণ না ক'রে করবার জো নেই।'

পনর বছরের আফিং খাওয়ার অভ্যাস একদিনে ছেড়ে দিলেন! বলেছিলেন, 'প্রথম তিন দিন বড় কষ্ট হয়েছিল, গা যেন আড়ষ্ট হয়ে আসত। চতুর্থ দিনেই সে ভাব কেটে গেল।' শেষে তামাকটুকু পর্যন্ত খেতেন না।

চন্দ্রকান্তবাবু—সাধক তাঁর কাছে এগোচ্ছে কিনা, তার প্রমাণ কি?

স্বামী—সে নিজেই মনে মনে বুঝতে পারবে, আর অন্যেও টের পাবে। তার কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগুলি কমে যাবে। বিষয়ের উপর আসক্তি হ্রাস পাবে, আর প্রাণে শান্তি আসবে।

ভক্ত—ভগবদ্দর্শনের আগে তো আর শান্তি আসে না?

স্বামী—শান্তি আসা অনেক দূরের কথা। কিন্তু তার ভোগ-বাসনাগুলি কমে আসছে, সর্বভূতে প্রীতি হচ্ছে দেখলে বুঝতে পারবে, সে অগ্রসর হচ্ছে। শুধু জপ করলে হবে না। হৃদয়ে বাসনার ঘোগ থাকলে সব জপের ফল সেখান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। একজন সমস্ত দিন ক্ষেতে জল সেচন ক'রে সন্ধ্যার সময় দেখলে এক বিন্দু জলও ক্ষেতে যায়নি, সব ঘোগ (ছিদ্র) দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এ বিষয়ে নাগমহাশয় বেশ একটি কথা বলেছিলেন। আমি তাঁর বাড়ী গিয়েছিলুম। তাঁর বাপ পাশে এক জায়গায় বসে জপ করছিলেন। নাগমহাশয় আমায় হাত জোড় ক'রে বললেন, 'আশীর্বাদ করুন যেন বাবার ভক্তি হয়।' আমি বললাম, 'ভক্তি তো তাঁর খুব আছে। সর্বদা ভগবানের নাম জপ করছেন, আর কি?' নাগমহাশয় বললেন, 'নোঙর ফেলে দাঁড় টানলে হবে কি? উনি আমাকে বড় ভালবাসেন। জপ করলে কি হবে?' আমি বললাম, 'আপনার মত ছেলেকে ভালবাসবেন না তো কাকে ভালবাসবেন?' নাগমহাশয় বললেন, 'ও-কথা কেন বলেন, ও-কথা কেন বলেন? আমার উপর ভালবাসা যাতে যায়, সেই আশীর্বাদ করুন।'

আহা! নাগমহাশয় কি লোকই ছিলেন! নোঙর ফেলে দাঁড় টানার গল্পটা কি জান? কতকগুলি মাতালের অন্ধকার রাত্রে নৌকায় বেড়াবার শখ হ'ল। নদীর ঘাটে গিয়ে নৌকায় উঠেই সকলে দাঁড় টানতে আরম্ভ করলে। সকাল হতে দেখলে নৌকা যে ঘাটে ছিল সেই ঘাটেই রয়েছে। রাত্রে নেশার ঝোঁকে নোঙরটা তুলতে ভুলে গিয়েছিল!

আজি ফাল্গুনে

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

আজি, আকাশ বাতাস পৃথিবী কাঁপায়ে
উঠিছে তোমার নামের রোল;
সারাটি ভারতে, সারাটি ধরায়,
সারাটি বিশ্বে লাগিছে দোল।

আজি, কোটি মানবের হৃদয়-কাননে
ফুটিছে তোমার নামের ফুল;
ভরিল মনের গঙ্গা জোয়ারে,
ভাসিল জীবন-তটিনীকূল!

আজি, ফাল্গুনে হেরি তোমার আলোক,
ধরণী ভরিয়া তোমার জয়,
ধন্য হে প্রভু, ধন্য আমি যে
হেরিয়া তোমারে নিখিলময়!

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পরমপুরুষ শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব-লগ্ন থেকে আমাদের ইতিহাসের স্বর্বর্ণযুগের অভ্যুদয়! যে সময়ে তিনি মর্ত্য-কায়া গ্রহণ ক'রে অবতরণ করেছিলেন, তার পূর্ব থেকেই আমাদের সমাজে সংসারে, জীবনে আচরণে ও চরিত্রে, আমাদের ভাবে ও ভাবনায় শ্রেয়োনীতি সম্যক্ ভাবে অনুসৃত হচ্ছিল—একথা বলা যায় না, বরং পরিলক্ষিত হচ্ছিল প্রেয়পরায়ণ মানুষের সংখ্যাধিক্য।

ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ষ করা গেল, মানুষের মধ্যে চিত্তবৃত্তি ও হৃদয়াবেগের সঙ্গে বিচার-বুদ্ধি জ্ঞান ও সঙ্গতিবোধের সংঘর্ষ। এ-কারণে সংশয়ের মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ভারতের শাশ্বত সত্য। দৈবীশক্তির নিশ্চিত প্রামাণ্য-স্বরূপ কাহিনীগুলিকে চিত্তবিভ্রম ও কাল্পনিক বলেই উপহাস করার মনোবৃত্তি সর্বত্র পরিস্ফুট হতে লাগলো।

চিরন্তন সত্যাশ্রয়ী সনাতন ধর্ম ও নীতি বর্জন ক'রে নিকৃষ্ট স্তরের অবাস্তব অপ্রাসঙ্গিক অনধিকার চর্চায় এক শ্রেণীর ব্যক্তি আসক্ত হওয়ায় আমাদের ভাব ও ভাবনা বিকৃত হতে শুরু করল। এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে বিভ্রান্ত এবং সাগরপারের শিক্ষা-দীক্ষায় পুষ্ট হয়ে সমাজে প্রাধান্য লাভ করলেন। মানুষের বিশ্বাস ও আদর্শের ধারাকে বিপথ-গামী ক'রে তুলল তদানীন্তন যুক্তিবাদীদের দুঃসাহসিক সমালোচনা।

এদিকে এদেশ ব্রিটিশ-শাসিত হওয়ার ফলে প্রতীচ্য সভ্যতার বিভিন্ন পণ্যসম্ভার বাংলার মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতির জীবনক্ষেত্রে আনন্দমেলা সৃষ্টি ক'রে তুলল এবং আমাদের মানসিক ভোজে গ্রহণ করা হ'ল যান্ত্রিক সভ্যতার নানা উপকরণ। তখন হয়তো অনেকে ভেবেছেন—যে দেশে ধর্মই মানুষের জীবনের মূল, সে দেশে জড়বিজ্ঞানের প্রমাণানুকূল তত্ত্ব ও তথ্যের নিদর্শনগুলি অযথা বিভ্রান্তি এনে দেবে, আর কণ্টকাকীর্ণ ক'রে তুলবে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রকে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় পুষ্ট বিশ্লেষণ-মুখী মন জড়বিজ্ঞানধর্মী; কিন্তু পাশ্চাত্য ভাববন্যার প্রবাহকে কেমন ক'রে বাঁধ দিয়ে প্রতিহত করবেন, তার পথ কেউ খুঁজে পেলেন না।

খৃষ্টান মিশনারীরা শিক্ষাপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ধর্মপ্রচারেই শুধু রত হলেন না, আমাদের ধর্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হনন করার উদ্দেশ্যে ও বহুধাবিস্তৃত অপকৌশলের বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভারতীয় জীবনবাদের বীজমন্ত্র অবলুপ্ত ক'রে এই সব মিশনারী আমাদের ধর্মের নিন্দা করাকেই তাঁদের প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করলেন।

একদা এদেশ প্রকৃতির অন্তহীন রহস্য শ্রান্তিহীন তপশ্চর্যার মাধ্যমে, সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেছিল এবং সান্ত ও অনন্তের মধ্যে মিলন-সেতু রচনা দ্বারা নূতন নূতন তথ্যও আবিষ্কার ক'রে জ্ঞানপ্রজ্ঞানের দীপালী উৎসব করেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার আত্মিক শক্তিকে দুর্বল করবার জন্যে, তার ক্ষীণ দীপাবলী নির্বাপিত করবার জন্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমল থেকে চলেছিল অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা; ফলে আমরা জাতীয়তা-ভ্রষ্ট, ধর্মাদর্শভ্রষ্ট, আত্ম-বিস্মৃত ও আত্মঘাতী হতে লাগলাম। নানা ধর্ম ও উপধর্মের সংঘাতে আমাদের রূঢ় বাস্তব জীবন কোনক্রমেই বিপন্মুক্ত হ'ল না, এর ওপর

কুসংস্কার ও কদাচার শৈবালের মত বৃদ্ধি পেয়ে জাতির জীবনের স্রোতোধারাকে রুদ্ধ ক'রে সঙ্কীর্ণ গণ্ডি রচনা ক'রে তুলল। স্বদেশের সমূহ ক্ষতি হ'ল। নারীনির্যাতন, বহু বিবাহ, পণ-প্রথা, কৌলিন্যপ্রথার ভয়াবহ দুর্গতি, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ এবং মাতৃজাতির প্রতি অসম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় দেবীনন্দন ঘটক, স্মার্ত রঘুনন্দন প্রভৃতির ওপর দেশবাসী অভিশাপ দিলেন। এই পটভূমিকার ওপর এসে দাঁড়াল উনবিংশ শতাব্দী।

পরমহংসদেবের আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত ক'রে গিয়েছিলেন ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা যুগপুরুষ রাজা রাম-মোহন রায়। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্র কর্ষণ ক'রে যে সব বীজ ছড়িয়ে গিয়ে-ছিলেন, তাতেই ফলেছিল সোনার ফসল, জন্মলাভ করেছিল বহু বিরাট মহীরুহ। এজন্যে আমরা তাঁর কাছে চিরঋণী।

এই মহামানবের উগ্র সাধনার ফলে আমাদের মাতৃভূমির বীজের বিশুদ্ধি সংরক্ষিত হতে পেরেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাব সংমিশ্রিত ক'রে রাজা তাঁর স্বজাতির নবজীবন ধর্মাদর্শে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে গেছেন এবং স্বদেশের সর্বপ্রকার ভেদ-বৈষম্য কুসংস্কার ও কুপ্রথা উচ্ছেদ-সাধনকল্পে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। তিনি সার্বভৌম উপাসনার জন্যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং প্রচলিত হিন্দুধর্মকে আবর্জনা-মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে বহু প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। প্রতীকপূজা, অবতারবাদ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে ছিল তাঁর নিজস্ব মত, তিনি বেদান্তের নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাকেই হিন্দুর প্রকৃত ধর্মরূপে গ্রহণ করে-ছিলেন; ব্রহ্মজ্ঞান-লাভই যে একমাত্র পারমার্থিক লক্ষ্য, এই সত্য তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল।

রাজা রামমোহনের পরবর্তী সাধকরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মহা-মানবকে দেখা গেল। নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজকে নবতর রূপ দিয়ে যে সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নববিধান সমাজ গঠন করেছিলেন, সে সময়ে তাঁরই আদর্শের ছত্রচ্ছায়ায় নরেন্দ্রনাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ভবিষ্যতের মহাপুরুষগণের ধর্মজীবন শুরু হয়। এঁরা সকলেই পরবর্তীকালে পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে নিজেদের অধ্যাত্ম-জীবন গঠন করেন। একদিকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে চলছিল ব্রাহ্মসমাজের প্রগতি-মূলক ভাবধারা, অপর দিকে গড়ে উঠেছিল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের আত্মরক্ষা-নীতি।

এই সময়েই রাজা রামমোহনের তিরো-ভাবের তিন বৎসর পরেই ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কামারপুকুরে গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁরই কথামৃত পান ক'রে স্বদেশের সারস্বত ও ভাগবত সম্প্রদায় যে ভাব ও প্রেরণা পেয়েছেন তা থেকেই আমাদের কাব্য সাহিত্য, দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের পথে নূতন আলোক সম্পাত হতে পেরেছে। আজ যে সব ধর্মকথা আমরা নানা সঙ্ঘ-সাধকের মুখে শুনি, সেগুলি তাঁরই কথামৃতের অনুকরণ বা অনুস্মরণ বলা যেতে পারে।

দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত পূজারী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম নিয়ে গদাধর চট্টোপাধ্যায় শেষে ১২৬২ সালে কলিকাতার উপকণ্ঠে—দক্ষিণেশ্বরের গাঙ্গেয় তটে ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হলে, সেখানেই মায়ের বেশকারীর কার্যে ব্রতী হয়ে কিছুকাল পরে পূজারী হলেন বটে, কিন্তু পুরোহিতের গতানুগতিক ক্রিয়াপদ্ধতি বা পূজার ক্রিয়ানুষ্ঠানের বাহ্যাড়ম্বর তিনি অনুসরণ করেননি, করেছিলেন দেবীর চরণে প্রাণমন নিঃশেষে সমর্পণ, আর শিশুর মতো সরল প্রাণে ডাকতে ডাকতে

পাষাণীর মুখে কথা ফুটিয়েছিলেন, অবশেষে যে দিন অদ্ভুতভাবে মায়ের দর্শন পেলেন এবং মৃন্ময়ী মূর্তি তাঁর কাছে চিন্ময়ী হ'য়ে কথা বললেন, সেদিন ভারতীয় দর্শনের বিরাট প্রদীপ অপূর্ব ভাবে দক্ষিণেশ্বরে জ্বলে উঠল। তিনি দেবীর অনুমতি নিয়ে সর্ব ধর্ম সাধনা করেছিলেন অধ্যাত্ম লোকের গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করবার জন্যে; এবং তাঁরই কাছে বিভিন্ন ধর্মের সিদ্ধ সাধক ও সাধিকা এসে তাঁকে তাঁদের সাধনপন্থাগুলি শিক্ষা দিয়েছেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রত্যেক ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে দিব্যানুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। সর্ব ধর্মশাস্ত্রের সব কথাই শুনিয়ে শেষে সার মর্ম ব্যক্ত ক'রে তিনি বলেছিলেন—'যত মত, তত পথ'।

প্রত্যেক ধর্মের সংরক্ষণশীল ব্যক্তির মনে যে সব সংকীর্ণতা ছিল, একে একে সে সব খণ্ডন ক'রে সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী শোনালেন, আর সেই বাণী বহন ক'রে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করেছিলেন। মার্কিন দেশে এই বীর সন্ন্যাসী 'ভাগোয়া ঝাণ্ডা' উড়িয়ে দিকে দিকে জ্ঞানের আলো বিকীর্ণ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের করুণায় উনবিংশ শতাব্দীতে সত্যযুগ দেখা দিয়েছিল এবং এই শতাব্দী স্বর্ণ যুগ নামেও কথিত হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু সব ধর্মের তত্ত্বকথা শোনাননি, যুক্তিবাদের প্রতিটি তত্ত্ব একে একে বিশ্লেষণ ক'রে দুর্জ্ঞেয় রহস্যগুলি তুলে ধরেছিলেন এবং যুক্তিবাদের সঙ্গে মুক্তি-বাদের ভাবধারার প্রয়াগ-তীর্থ রচনা করেছিলেন। তাঁরই দৈব দাক্ষিণ্যে আমাদের ভাব ও ভাবনার অগ্রগমন, এবং অধ্যাত্ম-সাধনার সহজ সরল পথের সন্ধান সম্ভব হয়েছে।

চরৈবেতি

[চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদু মুদুম্বরম্...]

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

সূর্য দেখেছ? সারাদিন ধরে আকাশের পথে চলছেই,
চলছেই, তার থামা নেই, যেন চোখে নেই ঘুম ক্লান্তি;
রাত্রির পথ নিমেষে ফুরোয়, উদয়ের চোখে জ্বলছেই
সূর্য দীপ্তি............অফুরন্তের অমেয় জীবন শান্তি।

পৌঁছনো নেই, আছে পথ চলা; সময়ের চলা থামে না,
চলো—চলে যাই যুগযুগান্তে, চলা—জীবনের অর্থ;
প্রাণের পূর্ণ অমৃত-দীপে জ্বলে সূর্যের কামনা;
অফুরান পথ ফুরায় না যার, পার হয় সে-ই মর্ত্য।

প্রাণতত্ত্ব ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদ

ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল

প্রশ্নোপনিষদে প্রাণ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং আধুনিক বিজ্ঞান প্রাণের উদ্ভব (Origin of Life) বিষয়ে যে মতবাদ প্রচার করে, এই প্রবন্ধে আমি সংক্ষেপে তাই আলোচনা করছি।

প্রশ্নোপনিষদের প্রথম প্রশ্নে শিষ্য আচার্যকে জিজ্ঞাসা করছেন: ভগবন্ কুতো হ বা ইমাঃ প্রজা প্রজায়ন্ত ইতি। উত্তরে আচার্য বলেছেন: প্রজাপতি তপস্যার দ্বারা 'রয়ি ও প্রাণ' এই মিথুন উৎপন্ন ক'রে বললেন, 'এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি।' আচার্য শঙ্কর ভাষ্যে লিখেছেন, প্রজাপতি তপস্যার দ্বারা পূর্ব কল্পের স্মৃতি উদ্বোধিত করলেন। তার ফলে তিনি সৃষ্টির সহায়ভূত 'রয়ি' (চন্দ্ররূপ অন্ন অর্থাৎ ভোজ্য বস্তু) এবং 'প্রাণ' (অগ্নিরূপ ভোক্তা) এই মিথুন সৃষ্টি করলেন।

ব্যাখ্যা: সূর্য, অগ্নি, প্রাণ—এই তিনই অন্নাদি আদান শোধন ও পরিপাকের কারণ, এই জন্য এদের ভোক্তৃশ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। আর যে হেতু জীবভোগ্য অন্ন চন্দ্রকিরণে পুষ্ট হয়, সে জন্য চন্দ্ররূপ রয়িকে ভোজ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। রয়ির মূল অর্থ ধন। ধনদ্বারাই অন্ন সংগৃহীত হয়। [ধন ধান্য সমার্থক]

এর পরের শ্লোকে মহর্ষি বলেছেন: আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমাঃ, রয়ির্বা এতৎ সর্বং যন্মূর্তং চামূর্তং চ, তস্মান্মূর্তিরেব রয়িঃ।—আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি। (এই জগতে) যা কিছু মূর্ত ও অমূর্ত, সবই রয়ি। তবে প্রধানতঃ মূর্ত সকল বস্তুই রয়ি। আচার্য শঙ্কর লিখেছেন, বায়ু অমূর্ত হয়েও জীবের ভোগ্য বস্তু বিধায় রয়িকে মূর্ত ও অমূর্ত বলতে হয় বটে, কিন্তু মুখ্যতঃ প্রায় সমুদয় সৃষ্ট অমূর্ত বস্তু 'প্রাণে'র পর্যায়েই পড়ে এবং সকল মূর্ত বস্তু 'রয়ি'র অন্তর্ভুক্ত।

প্রাণ যে কতদূর সর্বাত্মক ও ব্যাপক, তা পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে বলা হয়েছে। এই ভোক্তা প্রাণই বৈশ্বানর, বিশ্বরূপ এবং সর্বাত্মক বলে প্রাণ অগ্নিস্বরূপ এবং সূর্যকে প্রজাগণের প্রাণস্বরূপ বলা হয়েছে।

সর্বাত্মক সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ১৷৮ থেকে ১৷১২ এই ৫টি শ্লোকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি:

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
*　　*　　*
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥

ভোক্তা ও ভোগ্য, প্রাণ ও রয়িকে অক্ষর ও ক্ষর, অব্যক্ত ও ব্যক্ত, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্ররূপে শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে—চন্দ্রের ন্যায় আদিত্যও মূর্ত, তবে আদিত্যকে অমূর্ত প্রাণের প্রধান উৎস বলা হয় কেন? এই ত্রিভুবনের প্রসবিতা সুমহান্ আদিত্য প্রাণ-তরঙ্গে পরিপূর্ণ। ঋষি পরবর্তী (প্রশ্ন ১৷৬) শ্লোকে বলেছেন: রাত্রি শেষ হয়েছে, ঐ দেখ—আদিত্য উঠছে—প্রাচী, প্রতীচী, দক্ষিণ, উত্তর, ঊর্ধ্ব, অধঃ প্রভৃতি দশদিকে 'প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে'—প্রাণ রশ্মি ধারণ ক'রে আছেন। সৌর মণ্ডলের সমুদয় জড় ও চৈতন্য শক্তি ঐ 'ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে কর্মদায়িনে' সূর্যকে প্রণাম! সূর্যমণ্ডল থেকে বিরাট বিশ্বজগতের প্রতি অণুপরমাণুর অন্তরে প্রতিক্ষণে

স্পন্দিত ও প্রবাহিত হচ্ছে। যে জড় শক্তি পৃথিব্যাদি গ্রহমণ্ডলী ও তদন্তর্গত সমস্ত পদার্থকে স্থিত চালিত ও অনুপ্রাণিত ক'রে আছে আদিত্যদেবের স্থূল শরীরই তার উৎস, আর সূর্যদেবের সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর থেকে ইচ্ছা-ক্রিয়া-জ্ঞান এবং হ্লাদিনী শক্তি অবিরাম জীব-জগতে প্রবাহিত হচ্ছে। ঈশোপনিষদের ১৬ শ্লোকে ঋষি প্রার্থনাতে জানাচ্ছেন : হে পূষন্, একর্ষে, পরম জ্ঞানস্বরূপ সূর্য, আপনার তেজ ও রশ্মি সংযত করুন, যেন আমি আপনার কল্যাণতম রূপ দেখি। 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সো'হমস্মি'—আপনার মধ্যে যে পুরুষ আছেন আমি সেই, আমার মধ্যেও তিনি আছেন। গায়ত্রী-মন্ত্রে সবিতৃদেবের বরণীয় ভর্গকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতা বলা হয়েছে। অতএব 'আদিত্য হ বৈ প্রাণঃ' ঠিকই বলা হয়েছে।

প্রশ্নোপনিষদের দ্বিতীয় প্রশ্ন : ভগবন্, কতি এব দেবাঃ প্রজান্ বিধারয়ন্তে, কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে, কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠ ইতি? উত্তরে মহর্ষি বললেন : আকাশই প্রধান দেব। আকাশ থেকে বায়ু, অগ্নি, অপ্, পৃথিবী, বাক্য, মন, চক্ষু, শ্রোত্র; এই সব দেবতা এক সময়ে অভিমানপূর্বক আপন আপন শক্তি প্রকট ক'রে প্রত্যেকেই বলতে লাগলেন, 'এই শরীরকে আশ্রয় দিয়ে আমি ধারণ ক'রে রেখেছি।'

[আকাশাদি পঞ্চভূত কার্যস্বরূপ, আর ভোগসাধন ইন্দ্রিয়গণ করণস্বরূপ। অধিদেবতারা করণগুলিকে স্ফূর্তি প্রদান করেন এবং প্রকাশনে সাহায্য করেন। বুদ্ধির অধিদেবতা ব্রহ্মা. অহংকারের রুদ্র, মনের চন্দ্র, চক্ষুর সূর্য, শ্রোত্রের দিক, ত্বকের বায়ু, বাগিন্দ্রিয়ের অগ্নি, পাণির ইন্দ্র, পাদের বিষ্ণু, পায়ুর মৃত্যু এবং উপস্থের দেবতা প্রজাপতি।]

মহর্ষি পিপ্পলাদ এক রূপকের সাহায্যে এই এই দেবগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাই নির্মমভাবে প্রমাণ ক'রে দিলেন। পূর্বোক্ত অধিদেবগণ যখন বিবাদে প্রবৃত্ত, তখন বরিষ্ঠ প্রাণ তাঁদের বললেন, 'আপনারা অজ্ঞতাবশে বৃথাই কলহ করছেন। সত্য কথা এই : মহাশয়দের মধ্যে কেহ এই দেহকে ধারণ বা রক্ষা করেন না। আমি নিজেকে পঞ্চধা বিভক্ত ক'রে সারা দেহ ধারণ ও রক্ষা করি।' প্রাণের এই বাক্য শুনেও অধিদেবগণ তাঁকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে থাকেন এবং প্রাণের উক্তি তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। প্রাণ তখন নিজ প্রভাব দেখাবার জন্য যেন অভিমান-ভরে দেহ ছেড়ে উর্ধ্ব উৎক্রমণে উদ্যত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকল দেবতা ত্রস্ত উৎখাত হয়ে দেহের বাহিরে আসতে বাধ্য হলেন। অতঃপর প্রাণ দেহে পুনঃপ্রবেশ করলে তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রাণের মহিমা দেখে দেবতারা বিস্মিত হয়ে এইরূপে তাঁর গুণগান করতে লাগলেন :

এই প্রাণই অগ্নিরূপে প্রজ্জলিত হন ও তাপ প্রদান করেন, সূর্যরূপে প্রকাশিত আছেন, মেঘাকারে বর্ষণ করেন ও ইন্দ্ররূপে প্রজা পালন করেন। এই প্রাণই আবহ-প্রবাহস্বরূপ বায়ু; ইনিই পৃথিবীকে ধারণ ক'রে আছেন এবং রয়িরূপে সমস্ত জগৎকে পোষণ করেন। কেহ এখানে রয়ি শব্দে স্থূলভূত অর্থ করেছেন। এই প্রাণ সৎ (মূর্ত), অসৎ (অমূর্ত) ও অমৃত। কেহ প্রাণকে সদসৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অমৃত অর্থাৎ পরমাত্মা-স্বরূপ বলছেন। অধিক কি—'রথনাভৌ অরা (শলাকা) ইব' সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি সর্বাত্মক; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তোমার জন্য বলি (ভোগ্য বস্তু) আহরণ করেন। যজ্ঞীয় দ্রব্যাদির শ্রেষ্ঠ বাহকও তুমি। স্বীয় শক্তি-বলে তুমি জগৎ-সংহারক রুদ্র। হে প্রাণ, তোমার যে তনু বাক্যে শ্রোত্রে চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত, যা মনে ব্যাপ্ত (সন্তত) আছে তা কল্যাণময় কর। তুমি উৎক্রমণ ক'র না। শেষে ঋষি বলেছেন, দৃশ্যমান জগৎ, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত ও প্রাণের বশে আছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি প্রাণের সর্বাত্মক ও ব্যাপক অস্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আকাশাদি পঞ্চ মূলভূত ও পঞ্চীকৃত স্থূলভূত—সব কিছু প্রাণ-সমুদ্রে নিমজ্জিত, প্রাণ-তরঙ্গে লীলায়িত। সূর্য, বায়ু, গ্রহ, নক্ষত্র, স্থাবর, জঙ্গম—সারা বিশ্ব প্রাণে স্পন্দিত। বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার প্রকৃত পক্ষে প্রাণেরই ক্রিয়া। জগতের সকল শক্তির আধার এই প্রাণ। মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বক-শক্তি, বায়ুর গতি, সূর্যের রেডিয়েশন, মেঘের বর্ষণ, তড়িতের ঝিকিমিকি, তথা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ সমস্তই প্রাণের তরঙ্গ-ভঙ্গি, বিবিধ বিচিত্র বিকাশ মাত্র। রাজযোগে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন: যোগী জানেন, প্রাণকে জয় করিতে পারিলে জগতের সকল শক্তিই তাঁর আয়ত্তে আসে।

বিরাট প্রাণের স্তুতির পরে মহর্ষি উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য অক্ষর-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপন ক'রে এই প্রসঙ্গ শেষ করেছেন,—'বিজ্ঞানাত্মা সমস্ত ভূত, ইন্দ্রিয়, দেবতা, প্রাণ—সব কিছু অক্ষরে আশ্রিত: এই তত্ত্ব যিনি জানেন, হে সৌম্য! তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন।'

প্রশ্নোপনিষদের তৃতীয় প্রশ্ন: সমষ্টি-প্রাণের প্রসঙ্গ শেষ ক'রে এবার ব্যষ্টি-দেহে প্রাণের উৎপত্তি প্রবেশ ও অবস্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলছেন: হাত-পা-মাথাযুক্ত মানুষের যেমন দেহনিমিত্ত ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে এই প্রাণতত্ত্ব আতত। মানস সংকল্প (মনোকৃতেন) দ্বারা সম্পাদিত কর্মানুসারে ছায়ার ন্যায় ইহা জীবদেহে প্রবেশ করে। মুখ্যপ্রাণ নিজে পঞ্চধা বিভক্ত হয়ে দেহের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ কার্যে নিযুক্ত আছেন। চক্ষু-শ্রোত্র-মুখ-নাসিকাতে প্রাণ, পায়ু ও উপস্থে অপান, দেহের মধ্যস্থানে সমান (হুতং অন্নং সমং নয়তি), সমস্ত স্নায়ু-মণ্ডলীতে ব্যান এবং সুষুম্না-নাড়ীতে উদান-বায়ু বিচরণ করে। শ্বাসপ্রশ্বাস সঞ্চালন প্রাণের ক্রিয়া। মল-মূত্রাদি নিঃসরণ অপানের ক্রিয়া। অন্নরস এবং রক্তপ্রবাহ দেহমধ্যে সমভাবে সর্বত্র চালিত করাই সমান-বায়ুর ক্রিয়া। দেহের যাবতীয় স্নায়ুমণ্ডলীতে বিচরণশীল ব্যান-বায়ু স্নায়বিক ক্রিয়া নিয়মিত করে। উপনিষদের বহু মন্ত্রে হৃদয়গুহা মধ্যে জীবাত্মার অবস্থান বর্ণিত আছে। এই কেন্দ্র থেকে একশত এক (১০১) প্রধান নাড়ী নির্গত হয়েছে, তার মধ্যে সুষুম্না নামে একটি উর্ধ্বগামিনী নাড়ীমধ্যে উদান-বায়ু পদতল হতে মস্তক পর্যন্ত বিচরণ করে। এই বায়ুই সারা দেহের উষ্ণতা রক্ষা করে ও ঠাণ্ডা হতে দেয় না। শ্রুতি বলেন, প্রয়াণকালে উদান-বায়ু লিঙ্গশরীরকে শুভাশুভ কর্মানুসারে পুণ্য বা পাপলোকে অথবা মনুষ্যলোকে নিয়ে যায়। উদান-বায়ুর আর এক নিত্যক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রুতিতে উল্লেখ আছে যে ইহা জীব-মাত্রকেই সুষুপ্তিকালে অহরহ 'ব্রহ্ম গময়তি' অর্থাৎ ক্ষণেকের জন্য নিজ স্বরূপ দর্শন করায়।*

মহর্ষি অষ্টম শ্লোকে পঞ্চপ্রাণের অধিদেবতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন: আদিত্য প্রাণের অধি-দেবতা; পৃথ্বীদেবতা অপানকে নিয়ন্ত্রিত করেন; আকাশস্থ বায়ু সমানের অধিকর্তা; বহির্জগতের বায়ু ব্যানের কর্তা এবং তেজ উদান-বায়ুর অধিদেবতা।

ছান্দোগ্যোপনিষদের ৩৯।১০ শ্লোকে বলা হয়েছে: মরণকালে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি ক্ষীণ হয়, মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিই শেষ পর্যন্ত বর্তমান থাকে। মুখ্যপ্রাণ উদান-বায়ুর তেজের সহিত সংযুক্ত হয়ে জীবাত্মার সঙ্গে মিশে যায়। অবশেষে প্রশ্নোপনিষদের ৩।১২ শ্লোকের ভাষ্যানু-

* উদ্বোধন, পৌষ '৬৪ 'স্বপ্ন সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

বাদে পূর্বের সমস্ত উক্তির সংক্ষিপ্তসার লিখেছেন।—প্রাণের 'উৎপত্তি', অর্থাৎ পরমাত্মা থেকে জন্ম, 'আয়তি' অর্থাৎ মনঃসংকল্পিত দেহে আগমন, 'স্থান' অর্থাৎ দেহে পঞ্চধা বিভক্ত প্রাণের অবস্থান এবং 'অধ্যাত্ম' অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে আদিত্যাদি অধিদেবরূপে অবস্থান বর্ণনা করেছেন।

*   *   *

পাশ্চাত্য মনীষীরা প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে কি মত পোষণ করেন, এখন সংক্ষেপে তাই লিখছি।

Origin of Life (জীবনের উৎপত্তি) সম্বন্ধে Prof. J. B. S. Haldane (অধ্যাপক হ্যাল্ডেন) সকল মতবাদকে প্রধানতঃ চার শ্রেণীতে ভাগ ক'রে বলেছেন যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী একত্র বিচার করা চলে।

১। Life has no origin, Matter and Life have always existed. —প্রাণের উদ্ভবের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ প্রাণ এবং জড়বস্তু সর্বদাই বিদ্যমান আছে। অনন্ত খগোলমণ্ডলী মধ্যে যখন কোন গ্রহ জীবের বাসোপযোগী হয়, তখন আকাশ থেকে জীব-বীজ তার মধ্যে উপ্ত হয়। এই বীজ Spores (কীটাণুর বীজাঙ্কুর) দ্বারা আদিম লতাপাতার ক্ষুদ্রাংশ হতে পারে এবং তা মহাজাগতিক বিকীরণ চাপ (radiation pressure) দ্বারা অথবা কোন চেতন দিব্যপুরুষ (Intelligent Being) দ্বারা গ্রহে স্থাপিত হতেও পারে।

২। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহির্ভূত কোন অলৌকিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে।

৩। প্রাণের উদ্ভবের উৎস হ'ল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া; ক্রমবিকাশের পন্থায় অত্যন্ত ধীরে ধীরে তা সাধিত হয়েছে।

৪। যথেষ্ট সময়, সুযোগ, জড়বস্তু ও রাসায়নিক সংযোগের সম্ভাবনা যদি ঘটে, তাহলে প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব হতে পারে।

প্রথম মতবাদ সম্বন্ধে হ্যাল্ডেন বলেন যে উপস্থিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক থেকে তাঁর মনে হয়, এই অসীম অনন্ত বিশ্বের কোন আদি নেই। এই বিশ্বের কোন না কোন অংশে অনাদিকাল থেকে সৃষ্টিক্রিয়া চলেছে। অতএব নূতন কোন গ্রহে সৃজন-বিষয়ে কল্পনার অবকাশ নেই। অধ্যাপক Gold, Boyd, Hoc প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বলেছেন, প্রাণ ও জড়বস্তু অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। নূতন নূতন জড়বস্তুর সৃষ্টি এই শূন্য আকাশ থেকেই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দ্বিতীয় মতবাদ সম্বন্ধে হ্যাল্ডেন লিখেছেন যে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ মতবাদ যদি একেবারে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় তবেই বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে (Genesis) অথবা অন্যান্য দিব্যপ্রকাশে (Revelation) লিখিত—পরমেশ্বরের আজ্ঞায় সৃষ্টি বা তদ্রূপ ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া যেতে পারে।

তৃতীয় ও চতুর্থ মতবাদ সম্বন্ধে হ্যাল্ডেন লিখেছেন যে Bernal, Pringle, Pirie প্রভৃতি মনীষী মনে করেন যে এক সময় যন্ত্র-মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। যতদিন পণ্ডিতেরা এই অসাধ্য সাধন না করছেন, ততদিন তাঁরা ঐ কল্পনা নিয়ে থাকুন। তবে রাসায়নিকরা ও জীবতত্ত্ববিদেরা আজকাল এমন কতকগুলি নূতন তথ্য প্রকাশ করেছেন যা আমাদের ঋষিদের অনুভূতির সঙ্গে সুন্দর ভাবে মিলে যায়।

হ্যাল্ডেন লিখেছেন: প্রোটোজোয়ার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র প্রাণীও তার অভিজ্ঞতার দ্বারা আবশ্যক মতো ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তন করে। যাদের আমরা জড় বা অজৈব বস্তু বলি, হাল্ডেন তাদের মধ্যেও প্রাণ-চেষ্টা দেখেছেন। কেবল প্রাণ ক্রিয়া নয়, প্রজনন-লক্ষণও দেখেছেন এবং বলেছেন যে ভবিষ্যৎ প্রাণিতত্ত্ববিদেরা হয়তো

প্রতি অণু-পরমাণুকেই জীবন্ত প্রাণী ব'লে প্রমাণ করবেন। এ পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত প্রমাণ করেছি যে আবরণযুক্ত সমস্ত পরমাণুপুঞ্জে প্রাণ ও প্রজনন-শক্তি বিদ্যমান আছে।

সম্প্রতি রুশ বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে সূর্যকিরণে প্লাবিত আকাশ প্রাণ-তরঙ্গের উৎস। তাঁরা চতুর্থ কৃত্রিম উপগ্রহে কিছু প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (আদিম জৈব উপাদান) পাঠাচ্ছেন। উহা (cosmic rays bombardment) ব্যোমাকাশের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর অসংখ্য রশ্মিকণ অবিরাম বিস্ফোরণে উদ্ভূত প্রাণ-তরঙ্গ দ্বারা জীবন লাভ করবে। কৃত্রিম গ্রহটিতে রক্ষিত রাডার যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটোপ্লাজ্‌মে প্রাণপঙ্কের সংকেতধ্বনি শোনা যাবে। তাঁদের মতে প্রাণের origin (উদ্ভব) অন্যত্র সন্ধানের আর আবশ্যকতা থাকবে না। মেরুপ্রদেশের অরোরা বোরিয়েলিসই কস্‌মিক রে-তে পরিপূর্ণ।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন :
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥

যখন জড় ও অজড় বস্তু মাত্র উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে ঘটছে জানবে। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের ছায়াস্বরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে সর্বদাই সংযুক্ত আছে; ়ং প্রাণশক্তি ক্ষেত্রকে প্রকাশিত ও অনুপ্রাণিত ক'রে রেখেছে।

কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি অজৈব বস্তু প্রোটোপ্লাজ্‌মের উদরে গিয়া অহরহ জৈব বস্তুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এও প্রমাণিত হয়েছে যে সদ্যোমৃত দেহের কোষাণুসকল যদি সময় মত তাজা খাদ্য পায় তবে তারাও জীবনের লক্ষণ দেখায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলছেন : সৃষ্ট যাবতীয় বস্তুর আদিম অবস্থা অ্যাটম্। এই অচিন্তনীয় অ্যাটমের রূপ দেওয়া হয়েছে তিন রকমের তড়িৎ-কণা; প্রোটন-নিউট্রন-ইলেক্টন-যুক্ত আদিকণ। প্রোটন হ'ল পজিটিভ (ধনাত্মক), ইলেকট্রন নেগেটিভ (ঋণাত্মক) এবং নিউট্রন পজিটিভও নয়, নেগেটিভও নয়—নিউট্রাল। কল্পনা করা হয় যে এক জোড়া প্রোটন ও এক জোড়া নিউট্রন মিলে এক কেন্দ্রাণু (নিউক্লিয়াস) তৈরী হয়, যাকে ঘিরে বিদ্যুদ্‌গতিতে কতিপয় ইলেকট্রন পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে ঘূর্ণ্যমান। সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে গ্রহগুলি যেমন ঘুরছে, নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র ক'রে ইলেকট্রনরা সেই রকম বৃত্তাকারে নিয়ত ঘুরছে। অতএব প্রাণশক্তিই সকল সৃষ্টবস্তুতে বিদ্যমান। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শেষ কথা, নিছক matter (জড়বস্তু) বলিয়া কিছুই নাই, বিশ্লেষণে শেষ পর্যন্ত ইহা তড়িৎ-সমষ্টি মাত্র, force বা প্রাণ-তরঙ্গ।

আচর্য্য বিবেকানন্দ তাঁর রাজযোগ-গ্রন্থে—আকাশ, প্রাণ ও প্রাণায়াম সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি সরল ও মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করেছেন, কিছু উদ্ধৃত করলাম : আকাশ এই জগতের কারণীভূত অনন্ত সর্বব্যাপী মূল পদার্থ; প্রাণ জগৎ উৎপত্তির কারণীভূত অনন্ত সর্বব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি। ["তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।' (শ্বেতাশ্বতর ১।৩)] এই প্রাণ গতিরূপে, মাধ্যাকর্ষণরূপে, স্নায়বীয় শক্তির প্রবাহরূপে, চিন্তাশক্তি, দৈহিক মানসিক আত্মিক—সর্বশক্তির মূল-রূপে অবস্থিত যখন অস্তি-ভাব বা নাস্তি-ভাব কিছুই ছিল না, যখন তমর দ্বারা তম আবৃত ছিল, তখন এই আকাশ, গতিশূন্য অবস্থায় ছিল। তখন সমস্ত শক্তি শান্তভাব ধারণ করিয়া অব্যক্ত ভাবে বিরাজ করে। পরবর্তী কল্পে আকাশ হইতে পরিদৃশ্যমান সাকার সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হয়; এবং প্রাণ নানা

প্রকার শক্তিরূপে পরিণত ও প্রবাহিত হইয়া থাকে। সমুদয় প্রাণীর জীবনী শক্তি এই প্রাণ্। মনোবৃত্তি ইহার সূক্ষ্মতম ও উচ্চতম অভিব্যক্তি। অন্যত্র স্বামীজী বলেছেন : মনে কর কোন স্রোতস্বিনীতে লক্ষ লক্ষ আবর্ত রহিয়াছে। প্রত্যেক আবর্তে প্রতিমুহূর্তে নূতন জলস্রোত আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে। ইহাই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কাহিনী

ভক্ত কবি বিদ্যাপতি গেয়েছেন :

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা॥

প্রাণায়াম-প্রসঙ্গে স্বামীজী লিখেছেন যে শক্তি স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়ে বুকের খাঁচা ও মাংসপেশীদের আকুঞ্চন, প্রসারণ দ্বারা ফুস-ফুসদ্বয়কে কার্যে সঞ্চালিত করছে, তাই প্রাণ। সমষ্টি-জগতে যেমন প্রাণের ব্যক্ত ও অব্যক্তের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, ব্যষ্টি-জীবের মধ্যেও কতকগুলি প্রাণশক্তি অব্যক্ত ভাবে আছে। যোগ অভ্যাসের দ্বারা যোগী সেগুলিকে নিজের আয়ত্তে আনেন।

শারীর-বিজ্ঞানীরা মৃতবৎ দেহে প্রাণ কত সময় থাকতে পারে তার বিচারকালে—জলে-ডোবা বা সাপে-কাটা অথবা তাড়িতাহত,শকে অভিভূত মৃতবৎ শরীরে দুই তিন চার ঘণ্টা পরে প্রাণের সঞ্চার দেখে কার্য-কারণ নির্ণয় করতে পারেননি। এখনও হঠযোগীরা বায়ুহীন কাচের বা কাঠের ঘরে সপ্তাহের অধিক কাল অবস্থানের পর জীবিত অবস্থায় ফিরে আসেন, কি উপায়ে তাদের স্তম্ভিত দেহ-যন্ত্র অক্সিজেন না নিয়ে সুস্থাবস্থায় ফিরে আসে, এও এক প্রহেলিকা

দেহলী *

'বৈভব'

বাতাস যখন ক্লান্ত
সমুদ্র তখন শান্ত!
মন স্থির হয়—রিপুদল রণে ভঙ্গ দিলে!
বৃথা গর্ব, বৃথা মায়া অনিত্য বিষয়ে;
নিত্য শুধু—ধ্বংস অবসান!

মমতার মেঘমায়া আচ্ছন্ন করিয়াছিল যৌবনের মন,
লুকায়ে রাখিয়াছিল সংসারের বিরাট শূন্যতা;
আজ, এত দিনে দেখিতেছি তাই।

অন্ধকার বদ্ধ কারা এ দেহ-কুটির—
জীর্ণ ভগ্ন; আজ তাই অনন্তের আলোরেখা
পশিছে অন্তরে।
দুর্বলতা—সবল করিছে মোরে;
জ্ঞানবৃদ্ধ ধীরে ধীরে চলিতেছি আপন আলয়ে
পুরাতন বাসা ছাড়ি। নূতনের উন্মুক্ত দুয়ারে-
সমগ্র দৃষ্টিতে আজ উদ্ভাসিত দুখানি জগৎ।

* Waller-এর Threshold কবিতাটির ভাবানুবাদ।

‘সমানা হৃদয়ানি বঃ’

শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার

কিছুদিন আগে ঔরঙ্গাবাদে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় আচার্য বিনোবা ভাবে প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। গত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল দেখিলেই বোঝা যায়, ভারতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব ক্রমশঃ কমিতেছে। কিন্তু নানা ঘটনা দেখিয়া আশঙ্কা হয় প্রাদেশিকতা বাড়িতেছে, আন্তঃ-প্রাদেশিক সংহতি গড়িয়া উঠিতেছে না।

অতীত যুগের ভারতবর্ষে বহু স্ব-স্ব-প্রধান রাজ্য ছিল এবং ভারতীয় ঐক্যবোধ রাজনীতি-ক্ষেত্রে দানা বাঁধে নাই একথা সত্য, কিন্তু ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অখণ্ড ভারত-চেতনা ছিল অপূর্ব ও শাশ্বত। ভাষা ও আচার-ব্যবহারের বিচিত্রতা সত্ত্বেও বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী মহামানবের এই সাগরতীরে একদেহে বিলীন হইয়াছে। পরবর্তী যুগে সেমিটিক ভাবের প্রবলতা-হেতু পূর্বোক্ত জাতীয় ঐক্য ব্যাহত হইতে শুরু করিয়াছে, কিন্তু বিভেদের তলদেশে সমন্বয়ের ফল্গুধারা চিরকাল বহিয়া চলিয়াছে।

ভারতধর্ম সহিষ্ণু ও স্থিতিস্থাপক বলিয়াই ঘাতসহ ও মৃত্যুঞ্জয়। ইহা চিরপুরাতন ও চির-নূতন। যুগে যুগে তাহার বাহিরের গঠনের কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অন্তঃস্রাবী প্রাণরসের ধারা অপরিবর্তনীয়। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৩ই আষাঢ় তারিখের ‘দেশ’ পত্রিকায় ভারতধর্ম ও চীনধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: ভারতবর্ষের মূলমন্ত্র হচ্ছে—একধারে বিচারের পথ দিয়ে আর একদিকে অনুভূতির পথ দিয়ে এক অবাঙ্মনসো-গোচর শাশ্বত সত্তা সম্বন্ধে আস্থাশীলতা।

বর্তমান ভারতবর্ষের গণমানসের অবচেতন স্তরে ভারতের প্রাণধর্মের বিকার ঘটে নাই। বহু কারণের সমবায়ে সচেতন শিক্ষিত সমাজ আজ বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত। বর্তমান যুগের বস্তুতান্ত্রিকতা ভারতের তপস্যা ও ত্যাগের আদর্শকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। স্বার্থ-সংঘাত ও কোলাহলের ইহাই প্রধান কারণ। দেশের সম্পদের উপর বিপুল জনসংখ্যার কিন্তু সম্পদবৃদ্ধির উৎসাহ গতানু-গতিক ধারায় কাজ করিয়া গেলে দেশের দারিদ্র্য দূর হয় না, পরন্তু অভাবগ্রস্ত দেশে নিত্য কলহ ও অশান্তি লাগিয়া থাকে। এই মহাজাতি গঠনের জন্য সম্পদবৃদ্ধির বিরাট সমবেত উদ্যোগ ছিল অপরিহার্য, কিন্তু কোথায় সে উদ্যোগের প্রচণ্ড গতিবেগ?

পশ্চিমের মানুষের কর্মিষ্ঠতা না পাইলেও ভোগের অনুকরণে আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবী তাহাদের অগ্রগামী। তাঁহারা ভারতধর্মকে অস্বী-কার করেন অথবা ইহার উপযোগিতা চ্যালেঞ্জ করেন। কয়েক সহস্র বৎসরে ভারতধর্ম বহু চ্যালেঞ্জ সহ্য করিয়াও জাজ্বল্যমান, এবারের চ্যালেঞ্জেও ইহা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদের প্লাস্টারে জোড়াতালি দেওয়া আব্রহ্ম-বেলুচিস্থান অখণ্ড ভারত এবং শতেক শতাব্দীর প্রাণরসে পুষ্ট মহাভারত এক বস্তু নহে। প্লাস্টার-লাগানো অখণ্ড ভারত ইতোমধ্যেই ত্রিখণ্ডিত হইয়াছে। বৃহত্তম যে খণ্ডটি আমরা পাইয়াছি বিলাতী প্লাস্টারের মেরামতিতে তাহার অখণ্ডতা বহাল রাখার এবং শুধু বিলাতী গণতন্ত্রে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিলে বাস্তব পরিস্থিতির নির্মম আঘাতে একদিন জাগ্রত হইতে হইবে।

ভারতধর্মের অন্তঃস্রাবী অমৃতধারা আকুমারিকা-হিমাচল ভারতের সমস্ত শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হইবে; তবেই ভাবময় মহাভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে। তা বলিয়া আমরা চলমান জগতের পিছনে পড়িয়া থাকিব না; রক্ষণশীলতার প্রাচীর তুলিব না, কারণ সময়ানুযায়ী প্রগতির সাথে সাথে অগ্রসর হওয়াই ভারতধর্মের বৈশিষ্ট্য, তবে প্রগতিকে এই দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী রূপ দিতে হইবে।

ভারতের বিশাল জনতা মহাজাতি হিসাবে সচেতন নয়, কিন্তু ভারত ধর্মে অবিচল। এই কারণেই খণ্ডিত ভারত এখনও অখণ্ড আছে। বিজাতীয় ভাববিকার গণমানসে পরিব্যাপ্ত হইলে অবস্থা শোচনীয় হইত। ভারতীয় ধ্যানধারণার মূর্তবিগ্রহ কোনও মহাপুরুষের নেতৃত্বেই ভারতের জনতা কল্যাণচেতনা লাভ করিতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে বহু মহামানবের শুভ আবির্ভাবে সম্প্রতি এরূপ নেতৃত্বই জাতি পাইয়াছিল। সেবাধর্মী বহু কর্মী রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া বহুবিধ কর্মধারায় জাতির জীবনে রসসিঞ্চন করিয়া চলিয়াছেন। জাতিকে সুপথে পরিচালিত করিবার ক্ষমতা বর্তমানে তাঁহাদেরই বেশী। তাঁহাদের বর্তমান কর্মধারাই একার্যে সুপ্রশস্ত। জাতি যদি ইঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলে তবে সকল সমস্যা ও গণ্ডগোলের মীমাংসা হয়। কিন্তু হায়, একদিকে গতানুগতিকতা অপর দিকে উৎকেন্দ্রিকতা জাতিকে পাইয়া বসিয়াছে। সমাজের প্রায় সকল ক্ষেত্রে রাজনীতির অনু-প্রবেশ স্বার্থসংঘাত-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। অতীত যুগের ভারতে সর্বগ্রাসী প্রতিযোগিতা-পরায়ণ রাজনীতি ছিল না। ইহা এ যুগের রীতি। এরূপ অবস্থা হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তনীয়। 'একজাতি একপ্রাণ একতা'—শুধু গানে না থাকিয়া কিভাবে মনে সঞ্চারিত হয়—তাহারই উপায় চিন্তনীয়।

আন্তর্জাতিক চেতনাবৃদ্ধির আত্মপ্রসাদ আমাদের অনেকে অনুভব করেন এবং জাতীয়তার আতিশয্যকে সঙ্কীর্ণতা আখ্যা দেন। জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় না হইলে কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থায় আমাদের সম্মানের আসন থাকিতে পারে না। ভারত-মন্ত্র বিস্মৃত হইয়া বিশ্ব-মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেন: যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে, কখনই বিশ্ব তাহার দ্বারে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসে না। নিজের পদরক্ষার স্থানটুকু পরিত্যাগ করার দ্বারা যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায়, একথা কখনই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

এই মহাজাতি যেদিন আত্মস্থ হইবে এবং ভারতধর্মকে আপন অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, যেদিন সে যথার্থ ভারতবাসী হইবে সেদিন প্রাদেশিকতার অভিশাপ থাকিবে না। সেদিন সে যথার্থ আন্তর্জাতিক হইবারও অধিকার অর্জন করিবে।

সংজ্ঞানসূক্তম্

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

[ঋগ্বেদ, ১০।১৯১।২—৪]

মহাপ্রভু-চরণে সনাতন

শ্রীমতী সুধা সেন

পিতৃমাতৃহীন দুরন্ত কালো ছেলেটিকে বড় বেশী ভালোবাসেন সনাতন, এক মুহূর্ত ছাড়িয়া থাকিবার উপায় নাই। বহু দুঃখে, বহু সাধ্য-সাধনায় ঘরের ছেলেকে পর করিয়া পরের ছেলেটিকে ঘরে আনিয়া রাখিয়াছেন সনাতন! —আনিয়াছেন না নিজেই ধরা দিয়াছে ছেলে, সাধ্যসাধনায় কি সে আসে?

বৃন্দাবনে মথুর চৌবে ও তাঁহার পত্নী এতদিন যাহাকে পুত্রাধিক স্নেহে পালন করিলেন, তাঁহাদের ছাড়িয়া আসিতে এতটুকু কষ্ট হয় নাই ছেলের। ছেলের নাম মদনমোহন; সনাতন মাধুকরীতে যাইতেন, আর অপলক চোখে তাকাইয়া দেখিতেন, কালো ছেলের রূপের আলোয় চোখ ভরিয়া যাইত।

চৌবের স্ত্রীর নিয়ম ছিল না, আচার ছিল না, ছিল শুধু অগাধ অপ্রাকৃত মাতৃস্নেহ, বক্ষের পরম-ধনের সেবায় আবার আচার নিয়ম কি? এই আচারবিহীন সেবা সনাতনের ভালো লাগে নাই; তিনি আচার শিক্ষা দিতে গেলেন, কিন্তু দেখিলেন সেই আচারবিহীন নিবেদিত অন্নই চৌবের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিতেছেন তাঁহাদের বালগোপাল,—মদনমোহন।

চৌবে-গৃহিণীকে স্তুতি করিয়া সেই মহাপ্রসাদ অঞ্জলি ভরিয়া লইয়া সনাতন মাথায় মাখিলেন। কিন্তু চৌবে-দম্পতির এত স্নেহ, এত প্রেম—কিছুই গোপালকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না, রাত্রে সনাতনকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, 'আমাকে তুমি লইয়া যাও, শুধু জল-তুলসী দিয়াই সেবা করিও, আর কিছুই চাই না আমি!' চৌবের স্ত্রীর কাছে বায়না ধরিলেন—'আমাকে সনাতনের হাতে দিয়া দাও।'

পরদিন উজ্জ্বল মধুময় হইয়া সনাতনের প্রভাত উদিত হইল, কিন্তু চৌবে-গৃহিণীর দিগন্ত গভীর কালো অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। সনাতন আসিলে চৌবে-পত্নী বলিলেন—'লও, লও গোঁসাই, আমার জীবনসর্বস্ব ধনকে তুমিই লইয়া যাও। আমি তো জানি সে যাইবেই, তাহার যে এমনি স্বভাব! অভাগিনী যশোদা বুকের অমৃত দিয়া যাহাকে এত বড় করিলেন, যে নয়নের মণিকে না দেখিয়া তিনি একদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন না, মুহূর্তে তাঁহারই বুকে শেল বিঁধাইয়া সে যখন চলিয়া যাইতে পারিল, তখন আমাকে ছাড়িয়া যাইবে—সে আর বেশী কথা কি? সে যায় যাক্,—সহ্য করিতে না পারি, যমুনায় তো জলের অভাব নাই, আমি ডুবিয়া মরিব।

অঝোর-ঝরা অশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিয়া গোপালকে আনিয়া মাতা সনাতনের হাতে দিলেন, হৃষ্ট প্রফুল্ল মুখে চলিয়া গেলেন মদনমোহন। উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিয়া অচেতন হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন মাতা; গোপাল ফিরিয়াও চাহিলেন না একবার।

এখন আসিয়াছেন সনাতনের গৃহে, কিন্তু কি আছে আজ তাঁহার? অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী আজ পথের ভিখারী। না চাহিতে যেটুকু পান সনাতন—তাহাই সযত্নে আনিয়া ধরেন ছেলের সম্মুখে; অবশেষটুকু গ্রহণ করেন নিজে।

আজ মিলিয়াছে শুধু দুইটি শুষ্ক রুটি—ছেলের সম্মুখে লবণবিহীন রুটি দুইখানি ধরিয়া দিয়া বসিয়া রহিলেন ধ্যানস্থ সনাতন।

'গোঁসাই! গোঁসাই গো! ও সনাতন!' অভিমানে রুদ্ধ কিশোর-কণ্ঠ ডাকিয়া উঠিল,—

'দেখ তো, এই শুষ্ক দু'টি রুটি, একটু লবণ পর্যন্ত নাই, কেমন করিয়া খাই আমি ?'

চমকিত হইয়া সনাতন চোখ খুলিলেন—আহা রে! ক্ষীরসরননী-খাওয়া কোমল মুখখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে, শুষ্ক রুটি যেন গলায় আটকাইয়া যাইতেছে। সনাতনের চোখে আসিল অশ্রু।—না, কাল হইতে একটুখানি শুধু লবণ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দিবেন তিনি।

রুটির সঙ্গে লবণ যুক্ত হইল। কিন্তু আবার আরম্ভ হইল ছেলের দৌরাত্ম্য—একটু ভাজা তরকারি ছাড়া শুধু নুন-রুটি আর কয়দিন খাওয়া যায়, সনাতন কি এইটুকু চেষ্টা করিতে পারেন না ?

সনাতন রাগ করিলেন—না বাপু! আজ তরকারি, কাল দুধ, পরশু ক্ষীর—কোথায় পাইব আমি ? রাজভোগ খাইয়া তোমার অভ্যাস! তবে আসিয়াছ কেন দরিদ্রের ঘরে ? পার তো নিজে যোগাড় করিয়া খাও।

অভিমানে ঘা লাগিল ছেলের, যোগাড় কি আর করিতে পারি না ? তুমিই তো ছাড়িয়া দাও না, ঘরে রাখিয়াছ বাঁধিয়া ?

উপযুক্ত ছেলে! ঘরের ভাত কেনই বা খাইবেন ? রাজভোগের যোগাড় হইল। শেঠের লবণের নৌকা যমুনার চড়ায় তিনদিন যাবৎ ঠেকিয়া আছে—কত চেষ্টা, কত শ্রম, সবই ব্যর্থ—নৌকা চলে না। শেঠজী আসিয়া পড়িলেন সনাতনের পায়ে—উপায় বল গোঁসাই; দয়া কর! সনাতন বলিলেন—উপায়ের আমি কি জানি ? ঐ ঘরে আছেন মদনমোহন—তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর, ঠিক উপায় বলিয়া দিবেন তিনি।

শেঠজী দেখিলেন—কথা কন না, হাসিভরা উজ্জ্বল চোখে তাকাইয়া আছেন মদনমোহন—কালো ছেলে নয়, কালো পাথরের মূর্তি। লুটাইয়া পড়িলেন শেঠজী! আমাকে উদ্ধার কর এইবার—ফিরিবার পথে লাভের সমস্ত ধন দিয়া প্রতিষ্ঠা করিব তোমার মন্দির।

নৌকা চলিল, ব্যবসাতে লাভ হইল প্রচুর। ফিরিবার পথে সমস্ত উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেন শেঠজী। ভোগ-আরতির ঘণ্টা বাজে, দুই বেলা রাজভোগ খান মদনমোহন, কিন্তু তবু কি যেন ফাঁক থাকিয়া যায়।

সম্মুখে নিবেদিত রাজভোগের থালা,—দূরে বসিয়া সনাতন—আবার ডাকে ছেলে—"ও সনাতন! ও বুড়ো ?" "কি, আবার কি ?" বিরক্ত হইলেন সনাতন। কোমল দুইটি বাহু আসিয়া সনাতনের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল, "এই রাজভোগ ভালো লাগে না আমার! দাও না আমাকে দু'টি তোমার সেই রুটি ?"

হাসিয়া কাঁদিয়া সনাতন অস্থির হইলেন—হায় রে অবোধ! রাজভোগ ভালো লাগিল না তোমার, ভালো লাগিবে শুষ্ক রুটি ?

* * *

কিন্তু কোথায় চাহিয়া-লওয়া শুষ্ক রুটি, কোথায় বা সনাতন ? বৃন্দাবনের অখ্যাত কুটীরে বসিয়া নীলাচলের দিকে চাহিয়া আছেন মদনমোহন, কবে আসিবেন সনাতন ?—তারপর হইবে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা। —ঝারিখণ্ডের দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নীলাচলে হরিদাসের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সনাতন। কিছুক্ষণ পরেই প্রভু আসিলেন, সনাতন প্রভুর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

তৃষিত হৃদয়ে প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করেন, সনাতনের কণ্ডুর ক্লেদ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগে, কোনও বাধা প্রভু মানেন না। সনাতনের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়—প্রভুর পায়ে লোক দেয় চন্দন অগুরু ফুল; আর আমি দিই আমার অঙ্গের পূতিগন্ধময় ক্লেদ। সনাতন স্থির করিলেন

রথের চাকার নীচে প্রাণ বিসর্জন করিবেন, কি হইবে এই দেহ দিয়া, যাহা প্রভুর সেবায় লাগিবে না কোনও দিন ?

গোপন সঙ্কল্প মনের কোণেই রহিল, কেহ জানিবে না—ভাবিলেন সনাতন।

প্রভু আসিয়া ডাকিলেন, সনাতন! কেহ যদি কাহাকেও একটি জিনিস দান করে—সে কি তাহা আবার ফিরাইয়া লয়, না কি লওয়াই তাহার উচিত ?

সনাতন জানেন না এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি, বলিলেন, না, না প্রভু! সে কি হয় ?

'তবে ?'—করুণ ব্যাকুল স্বরে সনাতনের হাত দুইটি ধরিয়া প্রভু বলিলেন, 'আমাকে সমর্পিত তোমার এই দেহ তুমি ত্যাগ করিতে চাও কেমন করিয়া ?'

সনাতন চমকিত হইলেন। প্রভু বলিলেন, সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণলাভ হয় না, তাই যদি হইত তবে এইক্ষণে আমি কোটি দেহ ত্যাগ করিতাম

বিস্মিত হরিদাস-ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া প্রভু বলিলেন—দেখ তো হরিদাস। কি অন্যায়, আমার জিনিস নষ্ট করিবার অধিকার ইহার কোথা হইতে হইল ?

প্রভু সনাতনের হাত দুইটি নিয়া নিজের মাথায় রাখিলেন—বলো সনাতন, আমাকে কথা দাও, কৃষ্ণ-সেবার এই দেহ তুমি কিছুতেই নষ্ট করিবে না ? ভক্তের দেহ চিন্ময়, তাহাতে সতত কৃষ্ণের অধিষ্ঠান, পাছে তাহা ভুলিয়া যাই—পাছে ঘৃণা করি, তাই কৃষ্ণ তোমার দেহে এই কণ্ডূ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্যই কৃষ্ণ এই ছল পাতিয়াছেন।

রথের চাকার নীচে প্রাণ ত্যাগ করা হইল না। সনাতন পণ্ডিত জগদানন্দের পরামর্শ চাহিলেন। জগদানন্দ প্রভুর সেবক, প্রভুর সুখেই তাঁহার সুখ। সনাতনের অঙ্গের ক্লেদ প্রভুর অঙ্গে লাগে ইহা পণ্ডিতের ভালো লাগে না, তাই সনাতনকে তিনি বৃন্দাবন ফিরিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

সন্তুষ্ট মনে সনাতন যখন প্রভুকে এই কথা নিবেদন করিলেন, প্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'কালিকার বটুয়া জগা বয়সে নবীন'—সে তোমার মতো মান্য পণ্ডিতকেও উপদেশ দিতে সাহস করে!

সনাতন ক্ষুব্ধ হইলেন, বলিলেন, প্রভু! আজ বুঝিলাম জগদানন্দের সৌভাগ্যের সীমা নাই এবং আমার দুর্ভাগ্যের কথাও বুঝিলাম। জগদানন্দ তোমার অন্তরঙ্গ, তাই—

'জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা সুধাধারে,
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি নিম্বনিষিন্দা-সারে।'

প্রভু ধরা পড়িয়া লজ্জিত হইলেন, বলিলেন : —না, না সনাতন, তুমি কখনই আমার পর নও—তুমিও আমারই, কিন্তু মর্যাদা-লঙ্ঘন আমি সহ্য করিতে পারিব না।

সনাতনের আর তখন বৃন্দাবন যাওয়া হইল না।

জ্যৈষ্ঠ মাস। প্রখর রৌদ্রতপ্ত বেলা-ভূমির অগ্নিসম বালুকারাশির উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন সনাতন—প্রভুর আহ্বানে যজ্ঞেশ্বর টোটায়। পায়ে ব্রণ হইয়াছে—অঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণাময় কণ্ডূ, মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্য কিন্তু সনাতনের ভ্রূক্ষেপ নাই—আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রভুর দরজায়। কিছুক্ষণ সুস্থ হইবার অবকাশ দিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ পথে আসিলে সনাতন ?

—সমুদ্রপথে।

'কেন ?' প্রভু বলিলেন, সিংহ-দরজার ছায়া-শীতল পথ ছাড়িয়া তপ্ত বালুকাপথে কেন আসিলে ?

সঙ্কোচে সনাতন কহিলেন, যে পথে ভক্তেরা চলেন, ঠাকুরের সেবকেরা চলেন, সে পথে আমার মতো নীচের পদস্পর্শ লাগিবে কেমন করিয়া ?

প্রসন্ন আনন্দোজ্জ্বল মুখে প্রভু উঠিয়া গিয়া আলিঙ্গন করিলেন সনাতনকে—বলিলেন, তুমি নীচ নও, তোমার দেহ অপবিত্র নয়, তবুও যে তুমি ভক্তের মর্যাদা রক্ষা কর—সে কেবল তুমি ভক্তোত্তম বলিয়া।

সনাতনের হৃদয় ভরিয়া উঠিল আনন্দ-সুধা-রসে—দেহ হইয়া উঠিল ক্লেদমুক্ত সমুজ্জ্বল। বৎসর কাল সনাতনকে নিজের কাছে রাখিলেন প্রভু—তারপর বিদায় দিলেন—বৃন্দাবনে মদন-মোহন যে প্রতীক্ষা করিতেছেন সনাতনের।

'পরমধন সে পরশমণি যা চাবি তাই দিতে পারে,
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাছদুয়ারে।'

এই পরশমণির স্পর্শে সোনা হইয়া বৃন্দাবনে চলিলেন সনাতন—বৃন্দাবনের তরুলতা শাখা দোলাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল, কত ফুল ঝরিয়া পড়িল মাথায়। মদনমোহনের চোখের স্নিগ্ধ প্রসন্ন আলো আসিয়া ছুঁইয়া গেল সনাতনের ললাট।

যমুনাতীরে কুড়াইয়া-পাওয়া স্পর্শমণি গৌর-চিন্তামণির জ্যোতির কাছে ম্লান, তুচ্ছাতিতুচ্ছ হইয়া গেল—অবহেলায় ফেলিয়া রাখিলেন বালুর মধ্যে, অক্লেশে দান করিলেন ব্রাহ্মণ জীবনকে।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন—কী সেই পরমধন, যাহার কাছে স্পর্শমণিও তুচ্ছ ?

ধীরে ধীরে চিন্তিত ব্রাহ্মণ উঠিয়া গেলেন সনাতনের কাছে, প্রার্থনা করিলেন—

'যে ধনে হইয়া ধনী　মণিরে মান না মণি,
তাহারি খানিক,
মাগি আমি নতশিরে।'　এত বলি নদী-নীরে,
ফেলিল মাণিক।

ঐশ্বর্য এমনি করিয়াই বারে বারে তুচ্ছ হয়, বারে বারেই প্রেম তাহাকে এমনি করিয়াই লজ্জা দেয়।

নদীয়ার চাঁদ

বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

পূর্ণিমা চাঁদ আঁকা ধরণীর গায়,
প্রেমঘন গোরা রায় এল নদীয়ায়।
নিখিলের মাধুরী কি মূরতি ধরি'
ধরায় বাঁধিল এসে প্রেমের তরী ?
কলতানে বয়ে যেতে সাগরপানে
অহেতুক-করুণার ভরা-প্লাবনে
শঙ্খধবল-ধারা জাহ্নবী কি
নিশ্চল হ'ল, প্রেম-পরশ লভি' ?
শতেক চাঁদের আলো চরণে লোটে,
পাগল-করানো হাসি বদনে ফোটে।
পথ চলে হরি-প্রেমে আপনহারা,
ঝর ঝর ঝরে পড়ে নয়নে ধারা।

জীব-দুঃখে কেঁদে গোরা কূল নাহি পায়,
পতিত, কাঙালে ডেকে কোলে তুলে নেয়।
যেথা তার শ্রীচরণ পরশ করে
হরিনাম-সুধা যেন মূরতি ধরে ;
আনন্দ লুটে লুটে পড়ে চারিধার
নীরবে পরশ করে হৃদয় সবার ;
যত তাপ, চিরতরে যায় রে থেমে,
শীতল আলোক আসে পরাণে নেমে।
নদীয়ার পথে পথে বান ডেকে যায়,
লাজ-কুল ভুলে লোক সাথে সাথে ধায়।
তাহারে হেরিয়া ধরা ধন্য মানে
ধন্য ভকতদল তাঁহারি ধ্যানে।

ত্রয়ী

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

আমাদের প্রাচীন ঋষিরা আবেগ-ভরে এক দিন বলেছিলেন :

অতোঽপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভারত-ভূতলে।
সঞ্চিতুং সুমহৎ পুণ্যমক্ষয্যমমলং শুভম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত—৫-১৯)

অর্থাৎ স্বয়ং দেবতারাও সুমহৎ অক্ষয় অমল শুভ পুণ্য সঞ্চয় করার জন্য ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন।

সত্যই অপূর্ব পুণ্যভূমি আমাদের এই মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। এই পবিত্র দেশে যুগে যুগে অসংখ্য মুনি-ঋষি, জ্ঞানী-গুণী, ভক্ত-সাধকই যে কেবল আবির্ভূত হয়েছেন বিশ্ব-তমঃ দূর করবার জন্য, তাই নয়—সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং শ্রীভগবানই বারংবার ফিরে ফিরে এসেছেন এই পুণ্যভূমিতে ধরণীর ভার লঘু করবার জন্য। কিন্তু তিনি তো কোন দিন একাকী আসেননি, সর্বদাই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন শক্তিস্বরূপিণী জগজ্জননীকে, প্রাণ-প্রতিম লীলাসহচরগণকে। এরই একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ দেখে আমরা ধন্য হয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদামণি এবং শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের যুগপৎ আবির্ভাবের মধ্যে! শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃত জীবন-উৎস শতধারে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল তাঁর শত শত ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দের মধ্যে। এঁদেরই মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধারা স্বামীজী এবং শ্রীশ্রীমা তাঁদেরই সকলকে ধারণ ক'রে, সংহত ক'রে প্রবাহিত করিয়ে দিয়েছিলেন এক মহানদীরূপে, যা চিরকাল এই সংসার-মরুভূমিকে শীতল ও সরস ক'রে রাখবে, নিঃসন্দেহ। এরূপ ত্রয়ীর সম্মেলন জগতের ইতিহাসে নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের যে অনুপম সাধনা ও ভাবধারা এইভাবে স্বামীজীর মধ্যে বিকাশ ও শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে পূর্ণস্থিতি লাভ করেছিল, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা অতি দুরূহ কার্য; এবং প্রকৃতকল্পে নুনের পুতলীর সাগরের জল মাপতে যাওয়ার মতোই শ্রীশ্রীঠাকুরকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টাও আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের পক্ষে হাস্যকর। তা সত্ত্বেও দু'এক কথায় বলতে গেলে বলা চলে যে, পুণ্যভূমি ভারতের পুণ্যশ্লোক ঋষিদের ন্যায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—সাম্য, ঐক্য, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য।

একদিন মানব-সভ্যতার প্রথম উষাগমে, ভারতের তপোবন ধ্বনিত ক'রে উত্থিত হয়েছিল এক মহামিলন-গীতি 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এ সব কিছুই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জীবজগৎ; সেজন্য মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে কোন বিরোধ নেই। বর্তমান জড়বাদী যন্ত্র-সভ্যতার যুগের প্রারম্ভেও শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের এই শাশ্বত ঐক্য-মন্ত্রই পুনরায় ধ্বনিত করেছিলেন মধুরতম সুরে। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে উপনিষদ্ বা বেদান্তের সেই নিগূঢ়তম অদ্বৈতবাদকেও তিনি অতি সহজ সরল সুমিষ্ট ভাষায় সাধারণের উপযোগী ও মনোমত ক'রে, বহু সুবোধ্য উপমার সাহায্যে জনসমাজে প্রকাশিত করেন। যথা—তাঁর বিশ্ববিশ্রুত 'যত মত, তত পথ' এই মতবাদের একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছেন :

'যেমন ছাদে উঠতে গেলে মই, সিঁড়ি, বাঁশ, দড়ি প্রভৃতি নানা উপায়ে ওঠা যায়, ঠিক তেমনি

সেই একই ঈশ্বরের কাছে যাবার নানা উপায় আছে—প্রত্যেকটি ধর্ম সেই উপায়।'

আর একটি সহজতর উপমা দিয়ে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ সরস ভঙ্গীতে বলছেন:

'যেমন গৃহস্থের বাড়ী একটা বড় মাছ এলে কেউ ঝোল করে, কেউ ভাজে, কেউ তেল-হলুদ দিয়ে চচ্চড়ি করে, কেউ বা ভাতে দিয়ে বা অম্বল ক'রে খায়, ঠিক তেমনি সকলেই নিজের নিজের শক্তি ও রুচি অনুসারে সেই একই ঈশ্বরের পূজা করছে।'

এই ভাবে, সর্বসাধনসিদ্ধ, সর্বধর্মসমন্বয়-দ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্বোধন করেছিলেন এক উদার মধুর সমন্বয়-যুগের, এবং সত্যই হতে পেরেছিলেন মনীষী রোমা রোঁলার ভাষায়, 'The consummation of two thousand years of spiritual life of three hundred millions of people, great symphony composed of the thousand voices and the thousand faiths of mankind'.—তেত্রিশকোটি ভারতবাসীর দু'হাজার বৎসরের আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, বিশ্বমানবের কোটি কণ্ঠের ও সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। ভারতের—তথা জগতের ধর্মসাধনার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রথম দান: সর্বধর্মসমন্বয়ের মহাবাণী 'যত মত, তত পথে'র নির্দেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই নব সর্বসমন্বয়-ধর্মের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এর সর্বজনীনত্ব, অথবা উচ্চ-নীচ পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ—সকলকেই ক্রোড়ে স্থান দান। সাধারণতঃ দেখা যায় যে একটি বিশেষ ধর্মের তত্ত্বের দিক্ থেকে এবং সেই সঙ্গে ব্যবহার বা আচারানুষ্ঠান, ক্রিয়াকলাপের দিক থেকেও কয়েকটি স্থির অলঙ্ঘ্য নিয়ম থাকে। যাঁরা এই সকল তত্ত্ব গ্রহণ ও আচার পালন করেন না, তাঁদের সেই ধর্মেও স্থান নেই; তাঁরা ধর্মত্যাগী, ধর্ম-বহির্ভূত, পাপী, অবিশ্বাসী, নরক-যোগ্য জীবমাত্র; স্বর্গ বা মোক্ষ তাঁদের জন্য নয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের, ভারতীয় ধর্মের পরিধি এরূপ সঙ্কীর্ণ নয়, উপরন্তু সর্বব্যাপী; এই ধর্মে অধিকারিভেদানুসারে সকলেরই সমান স্থান, সমান গৌরব। যেমন, খৃষ্টান ইস্‌লাম প্রমুখ নিরাকার-বাদী ধর্মে সাকারোপাসকের কোনরূপ স্থানই নেই। কিন্তু ভারতীয় ধর্মানুসারে—যিনি গাছ পাথর প্রভৃতির পূজা করছেন, যিনি ভূত পূজা করছেন, যিনি সাকার প্রতিমার পূজা করছেন, যিনি নিরাকার ব্রহ্মের মানস পূজা করছেন, তাঁরা সকলেই ভক্ত, বিশ্বাসী ও ধার্মিক, যদি তাঁদের সত্যই ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে। এই তো হ'ল প্রকৃত ও একমাত্র সর্বজনীন ধর্ম, সমাজের উচ্চ থেকে নীচ পর্যন্ত এর মঙ্গলময় বিস্তৃতি, কেহই এর স্নেহাঞ্চলচ্ছায়া থেকে বঞ্চিত নন। একই ভাবে—করুণাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ আপামর জনসাধারণ সকলকেই সমান আদরে বুকে টেনে নিয়ে তাঁর নূতন সমন্বয়-ধর্মের, সর্বজনীন ধর্মের নূতন আশার বাণী শুনিয়ে বললেন:

'ঈশ্বর এক, কিন্তু তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাকতে ভাল লাগে, সে সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকলেই তাঁর দেখা পায়।'

ভারতীয় ধর্মসাধনার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ দান: ধর্মকে পণ্ডিতদের ও আচারানুরাগিগণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতেই আবদ্ধ না রেখে, তাকে সগৌরবে স্থাপন করা বিশ্বচিত্ত-শতদলের মর্মমূলে—বীজকোষে, অথবা জীবন-রাজপথের উন্মুক্ত অবাধ কেন্দ্রস্থলে।

ভারতীয় ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের তৃতীয় শ্রেষ্ঠ দান হ'ল—সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়ত্বের ভিত্তিতেই তাঁর এই সব সমন্বয়-ধর্মের, সর্বজনীন

ধর্মের স্থাপন। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভারতবর্ষে প্রথম আগমনের সেই যুগসন্ধিক্ষণে, দেশের জ্ঞানি-গুণী প্রায় সকলেই খৃষ্টানধর্ম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, ইস্‌লাম-ধর্মের প্রভাবও তখন অনেক ক্ষেত্রেই ছিল। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের সাধনা-প্রণালী অবলম্বনে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মর্মোত্থ সত্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করলেও শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব মূল সাধন ও সিদ্ধি ছিল সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয়। শ্রীঅরবিন্দের অনিন্দ্য ভাষায়, 'He was a self-illumined mystic and ecstatic, without a single trace or touch of the foreign thought or education upon him.'—তিনি ছিলেন স্বীয় আলোকে প্রদীপ্ত মরমী, ভাবোন্মত্ত সাধক, যাঁর মধ্যে বিদেশী ভাবধারা ও শিক্ষার কোন চিহ্নমাত্র ছিল না।

এরূপে ভারতের—তথা জগতের ধর্মসাধনার ইতিহাসে তত্ত্বের দিক্‌ থেকে, শ্রীরামকৃষ্ণের এই তিনটি মহাদান: সর্বধর্মসমন্বয়, সর্বজনীন ধর্মপ্রতিষ্ঠা ও সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ধর্ম প্রবর্তন—আমাদের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌রূপেই অনন্ত কাল বিরাজ করবে,—নিঃসন্দেহ।

ব্যবহারের দিক্‌ থেকে, এই তিন তত্ত্বের সমন্বয়ে আমরা পেয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অপূর্ব 'জীবশিব-বাদ'। বস্তুতঃ, আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রানুসারেই, তত্ত্বের দিক্‌ থেকে যা বিশ্বাত্মবাদ—ব্যবহারের দিক্‌ থেকে তাই বিশ্বমৈত্রীবাদ। কারণ, সর্বজীবই যদি ঈশ্বর হয় তবে জীব-সেবাই তো ঈশ্বর-সেবা; সেজন্যই আমাদের প্রাচীন ঋষিরা একদিন সগৌরবে ঘোষণা করে-ছিলেন: জীবঃ শিবঃ, শিবো জীবঃ, স জীবঃ কেবলং শিবঃ।—জীবই স্বয়ং শিব, শিবই স্বয়ং জীব, এই জীব শিব ব্যতীত আর কিছুই নন।

একই ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছিলেন, 'জীব শিব'। সাধারণতঃ আমাদের নীতি-গ্রন্থে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, জীবে দয়া করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দয়ার কোন প্রশ্নই এ-স্থলে নেই, যেহেতু প্রত্যেক জীবই ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্মকে কে দয়া করতে সাহসী হবেন? সেজন্য, জীবে দয়া নয়, জীবে সেবা, জীবে শ্রদ্ধা, জীবে প্রেম—এই তো সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি-তত্ত্ব।

ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতির মূর্ত প্রতিচ্ছবি, ভারতাত্মার পূর্ণ প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম জীবন-সাধনার তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক দিক্‌ সম্বন্ধে অতি সামান্য দু'এক কথা বলা হ'ল।

আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই অতুলনীয় সাধনা কেবল তাঁর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে ছিল না, পূর্ণতমভাবে বিকশিত হয়েছিল শ্রীশ্রীমা সারদামণি ও যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জীবনে। একের প্রকাশ তিনে, তিনের সমাহার একে। বস্তুতঃ তিন বিরাট ব্যক্তিত্বের এরূপ অপূর্ব সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই।

ভারতীয় সভ্যতার লীলাভূমি যজ্ঞক্ষেত্রে ঋগ্বেদের ছন্দোময় মন্ত্র, যজুর্বেদের কর্মমূলক বাক্য, ও সামবেদের মধুর গীতি—একই তত্ত্বের প্রপঞ্চনা ক'রে, একত্রে সম্মিলিত হয়ে উত্থিত হ'ত একই পরমদেবতার উদ্দেশ্যে। একই ভাবে—আধুনিক ভারতের ঋগ্‌মন্ত্ররূপী শ্রীরামকৃষ্ণ, যজুর্বাক্যরূপী স্বামী বিবেকানন্দ ও সামসঙ্গীতরূপিণী শ্রীসারদা-মণির সাধনাও একই তানে ও লয়ে ঝঙ্কৃত হয়ে বিশ্ববাসীকে ধন্য করেছে। পুনরায় রূপক অর্থে বলতে গেলে বলা চলে যে—জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি, সত্য-শিব-সুন্দর, সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ ধর্মের এই ত্রিবেণী-ধারার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন জ্ঞান, স্বামী বিবেকানন্দ কর্ম, শ্রীশ্রীমা ভক্তি; শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 'সত্য', স্বামী বিবেকানন্দ 'শিব', শ্রীশ্রীমা 'সুন্দর'; শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 'সৎ', স্বামী বিবেকানন্দ 'চিৎ' এবং শ্রীশ্রীমা 'আনন্দ'।

স্বামীজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ বার্তাবহ বা পরমদূত। এরূপে—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অপূর্ব 'জ্ঞান'কে তিনি 'কর্ম' বা অসংখ্য ব্যাখ্যা, আলোচনা, ভাষণ, রচনা প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে বিদেশে বিস্তৃত করেছিলেন জগদ্বাসীর অশেষ হিতের জন্য। একই ভাবে—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের পরম সত্যকেও তিনি 'শিব' বা শিবঙ্কর, ক্ষেমময় ও সেবামূলক নিষ্কাম কর্মের দ্বারা প্রমাণিত করেছিলেন। পরিশেষে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের 'সৎ' বা শাশ্বত সত্তাকে তিনি 'চিৎ' বা সাক্ষাৎ উপলব্ধির মাধ্যমে স্থায়িভাবে ধরে নিয়েছিলেন নিজের জীবনে, অন্যদের জীবনেও তা ধরে দিয়েছিলেন সমভাবে।

কিন্তু শ্রীশ্রীমার কার্য ছিল ভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের 'জ্ঞান,' 'সত্য', 'সৎ' বা সত্তার প্রচার বা প্রমাণের কোন প্রয়োজন তাঁর ছিল না, যেহেতু তিনি স্বয়ংই ছিলেন এ-সকলের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি, মূর্ত প্রতিচ্ছবি। তবে তিনি কি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়ামাত্র—পুনরাবৃত্তি মাত্র? না তা নয়—কেবলমাত্র ছায়ারূপে, কেবলমাত্র পুনরাবৃত্তিরূপে তিনি আবির্ভূতা হননি, কারণ তার তো বিশেষ প্রয়োজন নেই। তিনি আবির্ভূতা হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অচিন্তনীয় অনির্বচনীয় সত্তাকে সহজতম, কোমলতম করতে মধুরতমরূপে বিশ্বসমক্ষে, প্রকাশিত করতে, তাঁকে সকলের নিকট সহজবোধ্য করতে, আপামর জনসাধারণ সকলেরই নিকট তাঁকে এনে দিতে, বিশ্বের প্রত্যেকের ঘরে নিজস্ব প্রাণের নিধিরূপে তাঁকে স্থাপিত করতে। সেইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ 'জ্ঞান', শ্রীশ্রীমা 'ভক্তি'। জ্ঞান সকলের জন্য নয়, মুষ্টিমেয় প্রখরবুদ্ধি-সম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্যই কেবল। কিন্তু ভক্তি পণ্ডিত-মূর্খ উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলেরই জন্য—সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। শ্রীশ্রীমা এই ভাবে ছিলেন সকলেরই ঘরের জন, দূরের ঠাকুরকে তিনিই তো ঘরে ঘরে প্রিয়তম ক'রে দিয়েছিলেন। একই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ 'সত্য', শ্রীশ্রীমা 'সুন্দর'। 'কেবল' সত্যকে ধরা ছোঁয়া যায় না, 'কেবল' সত্যের রূপ নেই, 'কেবল' সত্য নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, নিরঞ্জন। কিন্তু সুন্দরের আবেদন সর্বজনীন; যা সুন্দর তা অতি সহজে, অতি মধুরভাবে, কোন বিশেষ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের অপেক্ষা না রেখে, অনায়াসে সকলের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ ক'রে স্থায়ী আসন লাভ করে। আমাদের জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের প্রবেশ তো এই একই ভাবে। নীরূপ ঠাকুরের সুন্দররূপ শ্রীশ্রীমা আমাদের আহ্বানের অপেক্ষা না রেখেই তো বিরাজ করছেন আমাদের চিত্তশতদলে বিশ্ব-সৌন্দর্যের অধীশ্বরী বিশ্বমনোহারিণী লক্ষ্মী-রূপে; আমরা তাঁকে জানি বা না জানি, চিনি বা না চিনি, তিনি তো সর্বদাই আছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তিকে সৌন্দর্যরূপে, সমস্ত ঐশ্বর্যকে মাধুর্যরূপে প্রকাশিত ক'রে। পরিশেষে সেই একই কারণে—শ্রীরামকৃষ্ণ 'সৎ', শ্রীশ্রীমা 'আনন্দ'। সৎ বা সত্তা কেবল জ্ঞানের বিষয়, ধারণার বস্তু; কিন্তু আনন্দ প্রাণের বিষয়, প্রেরণার বস্তু। সৎ নির্বিকার, সাধারণ সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে; কিন্তু আনন্দ আমাদের সাধারণ জীবনেরই শ্রেষ্ঠ ধন, পরমকাম্য প্রাণের তন্ত্রীতে আমাদের ঝঙ্কারই তো ধ্বনিত হয় মধুরতম, উদাত্ততম সুরে। বিশ্বের মনোবীণাতে এই মধুরমোহন, ললিতলোভন, কমল-কোমল ঝঙ্কারই তো শ্রীশ্রীমা; আনন্দস্বরূপ ঠাকুরের যে অন্তর্নিহিত আনন্দ আমাদের নিকটে আবৃত হয়েছিল তাঁর প্রখর তেজের আলোকে, তাকেই শ্রীশ্রীমা প্রকাশিত করেছিলেন সকলের জন্য—তাঁর নিজের রসঘন, অমৃতবর্ষী, আনন্দোজ্জ্বল জীবন দ্বারা।

এরূপে—শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্ত, অখণ্ড সত্তা, শাশ্বত, স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থিতি, পরম পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা। স্বামী বিবেকানন্দ সেই স্থিতিকে গতিশীল ক'রে তুললেন বাইরের বিস্তৃতিতে। প্রকাশ লীলায়িত হয়ে উঠল প্রচারে, প্রজ্ঞা প্রাণ পেল সেবাধর্মে—নিষ্কাম কর্মে, সাধন সার্থক হয়ে উঠল সাধক-সঙ্ঘের স্থাপনে। পরিশেষে শ্রীশ্রীমা স্থিতি ও গতিকে, প্রকাশ ও প্রচারকে, জ্ঞান ও কর্মকে, সত্য ও শিবকে, সৎ ও চিৎকে সমন্বিত ক'রে উদ্ভাসিতা হলেন এক অপরূপ ভক্তিনম্রা, ভাবঘনা, সৌন্দর্যময়ী, আনন্দময়ী মূর্তিতে—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমস্ত সাধনার আরম্ভ ও শেষ, মূল ও লক্ষ্য, শক্তি ও প্রেরণা, ঋদ্ধি ও সিদ্ধিরূপে।

দর্শনের দিক্ থেকে, তত্ত্বের দিক্ থেকে শক্তি ও শক্তিমান্ নিশ্চয়ই অভিন্ন। কিন্তু জীবনের দিক্ থেকে, অনুভূতির দিক্ থেকে শক্তি যদি শক্তিমান্‌কেও অতিক্রম ক'রে যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি? কারণ স্বয়ং ঠাকুরই কি বলেননি, "ও কি যে সে? ও সারদা, ও আমার শক্তি!!' সারদা সার-স্বরূপিণী—সার-দায়িনী!

মাধ্যাকর্ষণ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

পাখী উড়ে যায় আকাশে উর্ধ্বে, শাখীও উড়তে চায়,
মাটি টেনে রাখে, মর্মর-রবে করে তাই হায় হায়।
জল উড়ে যায় উপরে বাষ্পাকারে,
তপন শুধুই হাতছানি দেয় তারে।
ওঠে অম্বরে বহ্নির শিখা ধূমময় রূপ ধ'রে—
অথবা খধূপে স্ফোরকের রূপে। মানুষ বিমানে চ'ড়ে
যত দূর পারে মেঘের ওপারে ধায়।
ঝরা পাতা সেও ধরা ছেড়ে ওঠে বৈশাখী ঝঞ্ঝায়।

এই উত্থানে 'ওঠা' তো বলা না চলে,
সকলেই নেমে আসে পুন ধরাতলে।
অনিবার্য যে ধরণী মাতার টান,
পতনেরই তরে সকল সমুত্থান।

মানুষ তো ম'রে যায়,
জ্ঞানিগণ বলে, আত্মাটি তার উর্ধ্বের পানে ধায়।
হারায় তারে যে, সে কোন আশায় আকাশেরই দিকে চায়?
তারায় তারায় বৃথা খুঁজে তায়—আর করে হায় হায়।
'আত্মা' যদিই থাকে, আর যদি হয় পার্থিব ধন,
কেমনে এড়াবে এই ধরণীর নাড়ীর আকর্ষণ?

সপ্তবিধ অনুপপত্তি খণ্ডন

[অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্তৃক আক্ষিপ্ত অবিদ্যার সপ্তবিধ অনুপপত্তির পরিহার]

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

বহু প্রাচীন কাল হইতেই অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদিগণের আক্ষেপ যেমন চলিয়া আসিতেছে, অদ্বৈতমতেও বিরোধিপক্ষ খণ্ডন করিয়া সেইরূপ বহুলভাবে স্বমতস্থাপনের প্রচেষ্টা প্রচলিত। মহামতি আচার্য রামানুজ স্বকৃত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক শ্রীভাষ্যে অদ্বৈতবাদের তত্ত্বসিদ্ধির অনুকূল 'মায়া'র প্রবল প্রতিপক্ষরূপে উত্থিত হইয়া সপ্ত প্রকার অনুপপত্তি প্রদর্শন পূর্বক মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণও এই সপ্তবিধ অনুপপত্তির খণ্ডন কিভাবে করিয়াছেন তাহাই অতি সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম : বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পূর্বপক্ষ—অবিদ্যার আশ্রয়ত্ব-অনুপপত্তি

অবিদ্যার খণ্ডন-প্রসঙ্গে প্রথমে আচার্য রামানুজ বলিয়াছেন : ব্রহ্মস্বরূপ-তিরোধান-কারিণী বিবিধ-বিচিত্র-জগৎস্রষ্ট্রী সদসদনির্বচনীয় যে অবিদ্যার প্রভাবে নির্বিশেষ স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ কল্পিত, যে অবিদ্যা মোহময়ী মদিরার ন্যায় এই নিখিল জীবের বিষম অনর্থকরী ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া অঘটন ঘটন করিতেছে, সেই অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করিয়া এই বিভ্রম জন্মাইতেছে? —অবিদ্যা জীবে আশ্রিত? অথবা পরব্রহ্মে আশ্রিত হইয়া এই সমস্ত কাণ্ড করিতেছে?[১]

প্রথম পক্ষে অর্থাৎ অবিদ্যা জীবকে আশ্রয় করিয়া জগৎ সৃষ্টি করে—ইহা বলা যায় না। কারণ জীব অবিদ্যা-কল্পিত, অর্থাৎ অবিদ্যা যে জীবকে কল্পনা করিয়াছে সেই জীব—ফলতঃ অবিদ্যার কার্য বলিয়া কিরূপে অবিদ্যা তাহাকে আশ্রয় করিবে? কার্যই কারণকে আশ্রয় করে, কারণ (উপাদান) কখনও কার্য-আশ্রিত থাকে না। অবিদ্যা জীবের কারণ হইয়া কার্যস্বরূপ জীবকে কিরূপে আশ্রয় করিবে? সুতরাং অবিদ্যা জীবাশ্রিত নয়।

উহা ব্রহ্মাশ্রিতও নয়। ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ, জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার বিরোধী অজ্ঞান সেখানে কিরূপে থাকিবে? অন্ধকার কি কখনও আলোকে আশ্রিত হইয়া থাকিতে পারে? অদ্বৈতবাদিগণ তো অজ্ঞানকে জ্ঞানের দ্বারা বাধ্য (নিবর্ত্য, নিবারণীয়) বলিয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মাশ্রিতরূপেও অবিদ্যা দাঁড়াইতে পারে না। পরিশেষে স্থির হইল অবিদ্যার আশ্রয় অসম্ভব।

অদ্বৈতমতে অবিদ্যার আশ্রয়ত্বানুপপত্তির সমাধান

না। অদ্বৈতবাদে অজ্ঞানের আশ্রয় সম্বন্ধে অনুপপত্তি নাই। প্রথম পক্ষ অর্থাৎ অজ্ঞানের জীবাশ্রিতত্ব পক্ষ অসঙ্গত নয়।[২] যে মতে জীব অবিদ্যার আশ্রয় সেই মতে অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব। জীব অবিদ্যার কার্য নয়। যদিও জীবভাবটি (জীবত্ব) অবিদ্যা-কল্পিত তাহা হইলেও অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যাত্মক জীবের ধর্মী (ধর্ম যাহাতে আরোপিত সেই) চৈতন্যাংশটি নিত্য পদার্থ বলিয়া তাহাই অবিদ্যার আশ্রয়। চৈতন্যই সর্বত্র অধিষ্ঠান হইয়া থাকে।

১ যদপ্যুচ্যতে নির্বিশেষ……সা হি জ্ঞানবাধ্যাভিমতা। [ব্রঃ সূঃ—শ্রীভাষ্য ১।১।১]

২ বাচস্পতি-মতে কল্পতরুপরিমল-কার সমন্বয়সূত্রের শেষে অবচ্ছেদবাদই যে বাচস্পতির মত, তাহা বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর তাহার মতে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব নয়, পরন্তু জীব অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য।

অবিদ্যার অধিষ্ঠানরূপ (জীব-) চৈতন্য অবিদ্যার আশ্রয়।[৩] সুতরাং জীবের জীবত্বটি কল্পিত হইলেও জীবরূপধর্মি-চৈতন্যটি কল্পিত নয়। আর অবিদ্যা ঐ চৈতন্যাংশকে আশ্রয় করে বলিয়া প্রথম পক্ষে আশ্রয়ের অনুপপত্তি হইল না। যদি বলা যায় অবিদ্যার আশ্রয় যদি চৈতন্যাংশটিই হয় তাহা হইলে সেই চৈতন্য ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া ফলতঃ অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিতই হইল; জীবাশ্রিত তো হইল না! ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, জীব ব্রহ্মস্বরূপ—ইহা সিদ্ধান্ত হইলেও অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যই শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ, আর অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীবস্বরূপ। জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব পর্যন্ত জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেও অবিদ্যাবশতঃ অবচ্ছিন্ন বোধ হয়। অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারে না।

জীবের অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ভাবটি অবিদ্যা-কল্পিত। তথাপি জীব কার্য নয়। যেহেতু ভাব কার্যবিনাশী বলিয়া জীবেরও বিনাশ সম্ভাবিত হওয়ায় সংসার-মুক্তি কথাটি অলীক হইয়া পড়ে। যে জীব সংসার হইতে মুক্ত হইতে চায় সে নিজেই যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার আর মুক্তি কিরূপে হইবে? আর ইহাও বলা যায় না যে অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব, সেই জীব কার্য না হইলেও তার অবচ্ছেদটি অবিদ্যার অধীন হওয়ায় সেই অবিদ্যা আবার জীবকে আশ্রয় করিলে 'নিজেকে নিজে আশ্রয় করা' রূপ স্থিতিতে আত্মাশ্রয় দোষের আপত্তি হইবে। যেহেতু অবিদ্যা অংশটি জীবের বিশেষণ নয়, কিন্তু উপাধি বলিয়া, অবিদ্যা অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে আশ্রয় করিলেও আত্মাশ্রয় দোষ হয় না। লাল রং লাল ফুলকে আশ্রয় করে বলিলে আত্মাশ্রয়দোষ হয়। যেহেতু লাল রংটি ফুলে বিদ্যমান বলিয়া লাল রং লাল ফুলকে আশ্রয় করে বলিলে লালকেও আশ্রয় করে ইহা বুঝায়। কিন্তু ঘটাবাচ্ছিন্ন আকাশকে ঘট আশ্রয় করে বলিলে ঘট ঘটকে আশ্রয় করে—ইহা বলা হয় না; যেহেতু ঘটটি আকাশের বিশেষণ নয়, কিন্তু উপাধি। সেইরূপ প্রকৃতস্থলে, অবিদ্যা অবিদ্যাবচ্ছিন্নচৈতন্য-স্বরূপ জীবে আশ্রিত হইলেও আত্মাশ্রয় দোষ হয় না।[৪]

দ্বিতীয় পক্ষেও দোষ নাই—অর্থাৎ ব্রহ্ম অবিদ্যার আশ্রয় হইলে পূর্বপক্ষী যে দোষ দিয়াছেন, অদ্বৈতবাদে সেই দোষ নাই। 'ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অবিদ্যার বিরোধী, অবিদ্যা তাহা দ্বারা বাধিত (নিবারিত) হয়। সুতরাং সেই ব্রহ্ম কিরূপে অবিদ্যার আশ্রয় হইবে?'—পূর্বপক্ষীর এই আক্ষেপ ঠিক নয়। যেহেতু ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ হইলেও অবিদ্যার বিরোধী নয়। অবিদ্যা তাহা দ্বারা বাধিত হয় না। পরন্তু ব্রহ্ম অবিদ্যার অবিরোধী। যেহেতু 'অবিদ্যা'র অর্থ বিদ্যা বা প্রকাশের অভাব নয়—যাহার জন্য স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সহিত তাহার

৩ তদনেনান্তঃকরণাদ্যবচ্ছিন্নঃ প্রত্যগাত্মেদমনিদংরূপশ্চেতনঃ কর্তা ভোক্তাকার্যকারণাবিদ্যাদ্বয়াধারঃ।—ভামতী অধ্যাসভাষ্য

পূর্বপূর্বভ্রমজন্যসংস্কাররূপাঽবিদ্যা কার্যাবিদ্যা। অনাদিভাবরূপাঽবিদ্যা কারণাবিদ্যা, তদ্দ্বয়াধার ইত্যর্থঃ। অবিদ্যাধারত্বং চিদংশমাদায়।—অচিদংশস্য জড়স্য তদনাধারত্বাদিতি বোধ্যম্।—ঐ টীকা, ঋজু প্রকাশিকা

গৌড়ব্রহ্মানন্দী—'জীবস্য শুদ্ধচিদ্বৃত্তিত্বাৎ।' অদ্বৈতসিদ্ধি ১ম পঃ

৪ স্বেনৈব কল্পিতে দেশে ব্যোম্নি যদ্বদ্ ঘটাদিকম্। তথা জীবাশ্রয়া বিদ্যাং মন্যন্তে জ্ঞানকোবিদাঃ। [অদ্বৈত-সিদ্ধিধৃত শ্লোক—১ম পরিচ্ছেদ] ঐ টীকা গৌড়ব্রহ্মানন্দী—"স্বস্য স্বাশ্রয়ং প্রত্যুপাধিত্বেঽপি অবিশেষণত্বেন স্বাশ্রয়ত্বাস্বীকারাৎ।"

জীব ও অবিদ্যার অন্যোঽন্যাশ্রয়দোষ -বাচস্পতিমিশ্র, মধুসূদনসরস্বতী, বেদান্তসারের বালবোধিনী-টীকাকার, অদ্বৈতব্রহ্ম-সিদ্ধিকার প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন। এস্থলে তাহা অনাবশ্যক-বোধে উল্লিখিত হইল না।

বিরোধ হইবে। অদ্বৈতবাদে অবিদ্যাকে ভাব ও অভাব হইতে ভিন্ন বলা হয় বলিয়া অবিদ্যা জ্ঞান বা প্রকাশের অভাব-স্বরূপ নয়। বিদ্যা-বিরুদ্ধ অবিদ্যা—ইহাও স্বীকৃত নয়, কারণ অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম বিদ্যাস্বরূপ হইলেও অবিদ্যার বিরোধী—স্বীকার করা হয় না। আর যদি বল অবিদ্যা—চৈতন্য হইতে ভিন্ন বলিয়া চৈতন্যাশ্রিত নয় অর্থাৎ 'অবিদ্যা চৈতন্যাশ্রিত নয়, যেহেতু তাহা চৈতন্য হইতে ভিন্ন'—এইরূপ ব্যাপ্তির দ্বারা ব্রহ্মের অবিদ্যাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হইবে না। তাহা হইলে ইহার উত্তরে বলিব এই ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত নাই; কারণ অবিদ্যা-অতিরিক্ত সমস্ত (কার্য) বস্তু চৈতন্য হইতে ভিন্ন হইয়াও চৈতন্যাশ্রিত। সুতরাং স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম অবিদ্যার বিরোধী না হওয়ায় উহার আশ্রয় হইতে কোন বাধা নাই।[৫]

অদ্বৈতমতে বেদান্তবাক্য-জনিত অখণ্ড মনোবৃত্তি অথবা তাদৃশ অখণ্ডাকার মনোবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী। ঐ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর অজ্ঞান থাকিতে পারে না। উক্ত সিদ্ধান্তের উপর আচার্য (রামানুজ) আক্ষেপ করিয়াছেন যে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাকারবৃত্তি বা বৃত্ত্যুপহিত ব্রহ্ম উভয়ই স্বপ্রকাশ, অথচ ব্রহ্ম অজ্ঞানের অবিরোধী, কিন্তু বৃত্ত্যুপহিত ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিরোধী—ইহা কি করিয়া সম্ভব? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে স্বরূপ ব্রহ্ম এবং বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম এই উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে: স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম নিত্য। বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। ঘটরূপ উপাধির উৎপত্তি ও বিনাশে যেমন ঘট-উপহিত আকাশের উৎপত্তি বা বিনাশ স্বীকার করা হয়, সেইরূপ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন ব্রহ্মেরও উৎপত্তি বিনাশ কল্পিত হয়। আরও কথা এই যে বৃত্তি আবরণ ভঙ্গ করে অথবা চৈতন্যের অভিব্যক্তি করে বলিয়া তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও আবরণ-ভঞ্জকতারূপ বিশেষ স্বভাব সিদ্ধ হয়। শুদ্ধ ব্রহ্মের এই আবরণ-নাশকতা স্বভাব নাই। আর ঐ অখণ্ড মনোবৃত্তিটি অজ্ঞাত ব্রহ্মকে বিষয় করিয়া অজ্ঞানের বিরোধীরূপেই উৎপন্ন হয়। স্বপ্রকাশ শুদ্ধ ব্রহ্ম কিন্তু কাহারও বিরোধী নয়। যেহেতু স্বপ্রকাশ ব্রহ্মেই সমস্ত জগৎ অনুভূত হইতেছে।

রামানুজাচার্য বলিয়াছেন: ব্রহ্ম অন্য অনুভবের বিষয় হন না বলিয়া ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব জ্ঞান অজ্ঞানবিরোধী বলিলে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান নিজেই অজ্ঞানের বিরোধী, ইহাই বুঝায়। অতএব ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন: ব্রহ্ম অন্য অনুভবের বিষয় হইতে পারেন না, ইহার অর্থ এই নয় যে ব্রহ্মবিষয়ক কোন অনুভব হয় না, কিন্তু ঘটাদির অনুভব যেমন ঘট প্রভৃতিকে প্রকাশ করে ব্রহ্মানুভব সেরূপ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। তথাপি অদ্বৈত বেদান্তমতে বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণ-জন্য ব্রহ্মবিষয়ক অনুভব স্বীকৃত হয়; আর ঐ অনুভব অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করিয়া চরিতার্থ হয়। অন্যথা "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" [কঃ উঃ ১।৩।১২] "নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" [ঐ—১৫] "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ" [ঐ—২।১।১]। "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ" [শ্বেঃ উঃ ৫।১৩] ইত্যাদি শ্রুতি যে ব্রহ্ম বিষয় জ্ঞানের কথা বলিতেছেন তাহা অসঙ্গত হইয়া যায়। এইজন্য অদ্বৈতাচার্যগণ বলিয়াছেন:

ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিরাকৃতম্। ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা ॥ [পঞ্চদশী]

—অর্থাৎ ঘটাদি বাহ্য বস্তুর সহিত বহিরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধজনিত ঘটাকার-অন্তঃকরণবৃত্তি-অবচ্ছিন্ন-

৫ "নৈবং, বিকল্পাসহত্বাৎ। কিমপ্রকাশশব্দেন......তৃতীয়েঽপি।"—চিৎসুখী ৩৭৫পৃঃ, ৭—১১পঃ—নির্ণয়সাগর-মুদ্রিত

চৈতন্য জন্য ঘটাদি যেভাবে প্রকট হয়, স্বরূপচৈতন্য সেভাবে প্রকটতার আশ্রয় হন না, কিন্তু শব্দ-প্রমাণ জনিত-স্ববিষয়ক মনোবৃত্তিতে অভিব্যক্তরূপ বৃত্তিব্যাপ্য হন।

আর যে আচার্য (রামানুজ) বলিয়াছেন : জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মব্যতিরিক্তের মিথ্যাত্বজ্ঞান, ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী অথবা জগতের সত্যত্বরূপ অজ্ঞানের বিরোধী ? 'ব্রহ্ম ভিন্ন সব মিথ্যা'—এই প্রকার জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপের অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না, কারণ জ্ঞানটি যে-বিষয়ক হয় সেই-বিষয়ক অজ্ঞানটি তাহার দ্বারা নিবৃত্ত হয়। ঘটের জ্ঞান পটের অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করে না। প্রকৃত স্থলে জ্ঞান হইল—'ব্রহ্ম ভিন্ন সব মিথ্যা', আর অজ্ঞানটি ব্রহ্মবিষয়ক। সুতরাং উক্ত জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্ত হইতে পারে না।

'ব্রহ্ম ভিন্ন সব মিথ্যা' এই জ্ঞানের দ্বারা 'ব্রহ্ম ভিন্ন সব সত্য' এই অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও ব্রহ্মের স্বরূপ-অজ্ঞান থাকিয়া যাইবে।

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, যেমন শুক্তির অজ্ঞান (শুক্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যের অজ্ঞান) শুক্তিকে আবৃত করিয়া তাহার উপর রজত ও রজতের সত্যতা-আকার জ্ঞানের সৃষ্টি করে; সেইরূপ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানও ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া তাহার উপর সমস্ত জগৎ ও তাহার সত্যত্ব-বুদ্ধি সৃষ্টি করে। উভয়ত্র অজ্ঞান দুইটি নয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ আবরণকারী এবং জগৎ ও জগতের সত্যতাবুদ্ধি-সৃষ্টিকারী অজ্ঞান ভিন্ন নয়; অজ্ঞান একই। ঐরূপ শুক্তিরজত স্থলেও একই শুক্তির অজ্ঞান। একই অজ্ঞানের বিভিন্ন কার্যকারিণী শক্তি। এই দুইটির মধ্যে একটি আবরণ-শক্তি, অপরটি বিক্ষেপ-শক্তি। শুক্তিত্ব-জ্ঞানের দ্বারা শুক্তির অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে যেমন তাহার কার্য রজত ও রজতের সত্যতা-বুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেইরূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি মহাবাক্য-জনিত ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মস্বরূপের অজ্ঞান ও তাহার কার্য জগৎ বা জগতের সত্যত্ব-বুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া যাইবে।[৬] অতএব পূর্বোক্ত দোষের আপত্তি আর হইতে পারে না। আর ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক অজ্ঞানের অর্থ ব্রহ্ম সদ্বিতীয়—ইহাও অদ্বৈতবাদিগণের মত নয়। ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞান হইতেছে : 'ব্রহ্ম নাই', 'ব্রহ্ম প্রকাশিত হয় না' এই প্রকার অসত্তাপাদক ও অভাণাপাদক অজ্ঞান। 'ব্রহ্ম সদ্বিতীয়' এই জ্ঞান অজ্ঞানের কার্য। সুতরাং উক্ত আক্ষেপ অযৌক্তিক।

দ্বিতীয় : পূর্বপক্ষ—তিরোধান-অনুপপত্তি

তারপর বিশিষ্টাদ্বৈতাচার্য বলিয়াছেন : অবিদ্যার ব্রহ্ম-তিরোধান-কারিত্ব সম্ভব নয়। যেহেতু প্রকাশস্বভাব ব্রহ্মের তিরোধানের অর্থ হইতেছে, প্রকাশের উৎপত্তির বাধা অথবা বিদ্যমান প্রকাশের নাশ। প্রকাশের অনুৎপত্তি স্বীকার করিলে ফলতঃ প্রকাশের বিনাশই স্বীকার করা হয়। অথচ ব্রহ্ম অবিনাশী। সুতরাং অবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মের তিরোধান অসম্ভব।

অদ্বৈতমতে উত্তর

তিরোধানের অর্থ উৎপত্তির বাধা বা বিদ্যমানের বিনাশ নয়। ঘট, পট প্রভৃতি অন্ধকারে তিরোহিত হইয়া আছে বলিলে ঘট পটের উৎপত্তির বাধা বা বিদ্যমান বস্তুর বিনাশ বুঝায় না। যদি বল ঘট পট অপ্রকাশ বস্তু বলিয়া ঘট তিরোহিত আছে বলিলে ঘটের প্রকাশ হইতেছে না—

৬ তথা হ্যাত্মন্যধ্যস্যমানং ব্রহ্মজ্ঞানং পূর্বাধ্যস্তসর্বপ্রপঞ্চং নিবর্তয়ন্ স্বাত্মানমপি নিবর্তয়তীতি।—অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি

ইহাই সকলে বুঝে। অর্থাৎ ঘটের প্রকাশের উৎপত্তিতে বাধা হইতেছে, অথবা ঘটের প্রকাশ বর্তমানে নষ্ট হইয়াছে—ইহা বুঝা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম যখন সর্বদা স্বপ্রকাশ, তখন তাহার তিরোধান বলিলে তাহার স্বরূপের উৎপত্তির বাধা বা স্বরূপের বিনাশ ছাড়া আর কি বুঝাইবে? তাহার উত্তরে বলা যায় যে ব্রহ্মের তিরোধান বলিলে ব্রহ্ম-প্রকাশের অনুৎপত্তি বা বিনাশ বুঝায় না, কিন্তু ব্রহ্মের সত্তা বা চৈতন্যের প্রকাশ হইলেও বিশেষভাবে আনন্দ প্রভৃতি ধর্মের অভিব্যক্তির প্রাগভাব। এখানে অভিব্যক্তির অর্থ প্রকাশ নয়। প্রকাশ অর্থ হইলে পুনরায় পূর্বদোষের আপত্তি হয়। কিন্তু অভিব্যক্তির অর্থ চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হওয়া, অথবা চিত্তবৃত্তির সহিত বিশেষ সম্বন্ধ। যদিও সৎ, চিৎ ও আনন্দ এইগুলি ভিন্ন পদার্থ নয়, তথাপি ভিন্নের মতন প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ আমাদের চিত্তবৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা বা চৈতন্য অভিব্যক্ত হইলেও আনন্দটি বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে না। অভিব্যক্তির প্রাগভাব আছে। আর ঐ প্রাগভাবটি রক্ষা করিতেছে অবিদ্যা। সেইজন্য অবিদ্যাকে ব্রহ্ম-তিরোধায়ক বলা হয়। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই অবিদ্যা-কল্পিত বলিয়া প্রাগভাবও অবিদ্যা-কল্পিত; সুতরাং প্রাগভাবেরও কারণ অবিদ্যা। জ্ঞান হইলে অবিদ্যা নিবৃত্তি হইয়া প্রাগভাবও নষ্ট হইয়া যাইবে; তখন ব্রহ্মের আনন্দাংশ বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইবে।[৭] সুতরাং অবিদ্যার তিরোধায়কত্বের অনুপপত্তি নাই।

তৃতীয় : অনির্বচনীয়ত্ব-অনুপপত্তিরূপ আক্ষেপ

আচার্য (রামানুজ) বলেন : বস্তুমাত্রই অনুভবের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হয়। যে বস্তু যে ভাবে অনুভূত হয় সেই বস্তুর সেইরূপই স্বভাব। সকল লোকে জগতে কোন বস্তুকে সদ্রূপে কোন পদার্থকে বা অসদ্রূপে জানে। এই উভয় হইতে ভিন্নরূপে কেহ কিছু বুঝে না। অনুভবকে বাদ দিলে কোন কিছু প্রমাণ করা যায় না। এখন সদ্রূপে বা অসদ্রূপে যে অনুভব হয়, তাহার বিষয়কে যদি সদসদ্ভিন্ন অনির্বচনীয়রূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সব কিছু সব জ্ঞানের বিষয় হইয়া যায়। আর 'অবির্বচনীয়' কথাটি অসঙ্গত, নির্বচন করিয়াই বলা হইতেছে 'অনির্বচনীয়'। সুতরাং অবিদ্যার অনির্বচনীয়ত্ব অনুপপন্ন।

অদ্বৈতমতে উত্তর

সব অনুভব সব সময় বস্তুর যাথাত্ম্য-বোধক হয় না। প্রত্যক্ষের দ্বারা চন্দ্রকে প্রাদেশ-পরিমিত বলিয়া জানিলেও জ্যোতিঃশাস্ত্রের দ্বারা চন্দ্রের অধিক পরিমাণ জ্ঞানের পর প্রাদেশ-পরিমাণটি বাধিত হইয়া যায়। সেইরূপ সমস্ত বস্তু সদ্রূপে বা অসদ্রূপে প্রতীত হইলেও যুক্তির দ্বারা সর্বত্র তাহা সিদ্ধ হয় না বলিয়া অবিদ্যাকে সদসদনির্বচনীয় বলা ছাড়া উপায় নাই। কারণ অবিদ্যা যদি সৎ হইত, তাহা হইলে তাহার বাধ (নিবারণ) হইত না। অথচ "জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ" [গীতা ৩।১৬] ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ বলিয়াছেন, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বাধ হয়। যাহার বাধ হয় তাহাকে আর সৎ বলা যায় না। আর অসৎও বলা যায় না, যেহেতু 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদিরূপে অনুভব হয়। অসদ্ বস্তুর অনুভব হয় না। আর একই সঙ্গে সদসদ্বিরুদ্ধ ধর্ম, সুতরাং

৭ অতো ভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ ॥১১। অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ। ভানেঽপ্যভানং ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥১২। তস্য হেতুঃসমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ। ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্ ॥১৪। পঞ্চদশী। ব্রহ্মের আনন্দাংশ সামান্যভাবে প্রকাশিত হইলেও বিশেষভাবে প্রকাশের প্রতিবন্ধক হইতেছে অবিদ্যা।

অবিদ্যাকে সদসদনির্বচনীয় বলিতে হইবে।[৮] সুতরাং অবিদ্যা ভাবও নয়, অভাবও নয়, ভাবাভাবও নয়। তবে যে ভাবরূপ বলা হয় তাহা অভাব হইতে ভিন্ন বলিয়া গৌণ প্রয়োগ মাত্র।[৯] আর অনির্বচনীয়কে নির্বচন করা ব্যাঘাত দোষযুক্ত—এই কথাও বলা চলে না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ যে অবিদ্যাকে অনির্বচনীয় বলেন, তাহার অর্থ এ নয় যে, তাহাকে নির্বচন অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু উহা এক পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হয়। উহার লক্ষণ হইতেছে সদ্‌ভিন্ন, অসদ্‌ভিন্ন, সদসদ্‌ভিন্ন। এইরূপ অর্থে অনির্বচনীয় বলা হয়।[১০] সুতরাং অবিদ্যার অনির্বচনীয়ত্বের অনুপপত্তি নাই।

চতুর্থ: বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমতে অবিদ্যার প্রমাণ সম্বন্ধে অনুপপত্তি-আক্ষেপ। ৪(ক) প্রত্যক্ষে আপত্তি

আচার (রামানুজ) অবিদ্যার প্রমাণ সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রসঙ্গে প্রথমে অজ্ঞান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীরা 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভবকে অজ্ঞান বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলেন। তাঁহাদের মতে 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভবটি জ্ঞানাভাবের অনুভব নয়। কারণ অভাবের জ্ঞান হইতে গেলে অনুযোগী (অভাবের আশ্রয়) ও প্রতিযোগীর (যাহার অভাব) জ্ঞান থাকা আবশ্যক। জ্ঞানাভাবের প্রতিযোগী হইতেছে জ্ঞান, আর অনুযোগী আত্মা। এই উভয়ের কোনরূপ জ্ঞান যদি না থাকে তবে আর জ্ঞানাভাবের জ্ঞান কিরূপে হইবে? আর যদি প্রতিযোগী বা অনুযোগীর জ্ঞান থাকে তাহা হইলে ঐ জ্ঞান আত্মাতে থাকায় সামান্যভাবে জ্ঞানাভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভবকে ভাবরূপ অজ্ঞান-বিষয়ক বলিলে পূর্বোক্ত দোষ হয় না। যেহেতু অনুযোগী ও প্রতিযোগীর জ্ঞানের সহিত ভাবরূপ অজ্ঞানের বিরোধিতা নাই বলিয়া আত্মাতে অজ্ঞান অনায়াসে থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা অসঙ্গত। 'আমি অজ্ঞ' বা 'আমি নিজেকে বা অপরকে জানি না' এই অনুভবের দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধন করা যায় না, যেহেতু অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মা হইতেছে অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়। এখন অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে বা বিষয়রূপে আত্মার জ্ঞান আছে কিনা? যদি থাকে তাহা হইলে ঐ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বাধিত হইয়া যাওয়ায় অজ্ঞান অনুভূত হইতে পারে না। আর যদি আশ্রয় ও বিষয়ের জ্ঞান না থাকে তবে অজ্ঞান হইতে ভিন্নরূপে অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়ের জ্ঞান না থাকায় কিরূপে অজ্ঞানের জ্ঞান হইবে? যেমন 'আমি রামকে জানি না' বলিলে রামের সম্বন্ধে সামান্যভাবে জ্ঞান থাকা দরকার, নতুবা 'তাহাকে জানি না' বলা যায় না।

প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে উত্তর

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন: না, আমাদের মতে এই দোষ নাই। যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা যে প্রমারূপ অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহার দ্বারাই অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। কিন্তু সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না; অথচ অজ্ঞান সাক্ষিবেদ্য। আর ঐ সাক্ষি-

৮ অজ্ঞানস্য সত্ত্বে চিদাত্মবদ্‌বাধাভাবপ্রসঙ্গাৎ, অসত্ত্বে চ বন্ধ্যাসুতাদিবৎ অপরোক্ষপ্রতিভাসানুপপত্তেঃ। বাধপ্রতীত্যোশ্চাজ্ঞানে প্রসিদ্ধত্বাদ্ যুক্তং তস্য অনির্বচনীয়ত্বম্।— বিদ্বন্মনোরঞ্জনী টীকা

৯ ভাবাভাববিলক্ষণস্য অজ্ঞানস্য অভাববিলক্ষণত্বমাত্রেণ ভাবত্বোপচারাৎ" ইত্যাদি। —চিৎসুখী

১০ সদ্‌বিলক্ষণত্বে সতি অসদ্‌বিলক্ষণত্বে সতি সদসদ্‌বিলক্ষণত্বম্……ইত্যাদি লক্ষণে নিরবদ্যত্বসম্ভবাৎ — অদ্বৈতসিদ্ধি

চৈতন্যই অজ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয়ের গ্রাহক হওয়ায়, তাহার দ্বারা অজ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয়ের জ্ঞান হইলেও অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না।[১১] সুতরাং অজ্ঞানের প্রত্যক্ষে অনুপপত্তি নাই।

৪(খ) অজ্ঞানের অনুমানে আক্ষেপ

অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানের যে অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার উপর আচার্যের (রামানুজের) আক্ষেপ : অদ্বৈতবাদীরা বিবাদের বিষয় প্রমাণ-জ্ঞানটি নিজের প্রাগভাব ভিন্ন, নিজ বিষয়ের আবরক, নিজ কর্তৃক নিবর্ত্য, নিজের দেশস্থিত অন্য-বস্তু-পূর্বক ; যেহেতু তাহা অপ্রকাশিত অর্থের প্রকাশক। যেমন অন্ধকারে প্রথমে উৎপন্ন প্রদীপপ্রভা—ইত্যাদি রূপে যে অবিদ্যার অনুমান করিয়াছেন, তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ। যেহেতু উক্ত হেতুর দ্বারা যদি অজ্ঞান-বিষয়ক অজ্ঞান অনুমিত হয়, তাহা হইলে হেতুটি বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে; অর্থাৎ রামানুজাচার্যের অভিপ্রায় এই যে অজ্ঞান সাক্ষি-ভাস্য অর্থাৎ সাক্ষি-প্রত্যক্ষ বলিয়া অজ্ঞানের প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানের প্রকাশক সাক্ষী অপ্রকাশিত অজ্ঞানের প্রকাশক বলিয়া তাহাতে হেতু আছে। সেই অজ্ঞানের জ্ঞানের বিষয় হইল অজ্ঞান, অতএব অনুমানের দ্বারা যদি অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানের আবরক অন্য বস্তু অর্থাৎ দ্বিতীয় অজ্ঞান সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানের (প্রথম অজ্ঞানের) জ্ঞান হইতে পারিবে না। কারণ দ্বিতীয় অজ্ঞানই সাক্ষীকে আবৃত করিয়া থাকায় সাক্ষিচৈতন্য ঐ প্রথম অজ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারিবে না। এইরূপ দ্বিতীয় অজ্ঞান-সাক্ষী ও তৃতীয় অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিবে না। সাক্ষী যদি অজ্ঞানকে প্রকাশ না করে তাহা হইলে ঐ অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বরূপ হেতুটি কিরূপেই বা পক্ষে থাকিবে। সুতরাং হেতুটি যাহা সাধন করিল, তাহা সে নিজের বিরোধীকেই সাধন করিল। সে সাধ্যের ফলে হেতুটি পক্ষ হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য। অতএব হেতুটি সাধ্যের অসমানাধিকরণ হওয়ায় বিরুদ্ধ হইল। অথবা অবিদ্যা-সাধক অনুমিতিও যেহেতু প্রমাণ-জ্ঞান, সেইহেতু অপ্রকাশিত অর্থের প্রকাশক হওয়ায় আর একটি অজ্ঞান সাধন করুক। তাহাতে ফল হইবে এই যে, অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানের দ্বারা প্রথম অজ্ঞান-সাক্ষী আবৃত হওয়ায় অজ্ঞানের জ্ঞান আর হইবে না, অর্থাৎ অজ্ঞান সিদ্ধ হইবে না। ফলতঃ অজ্ঞান সাধন করিতে যাইয়া তাহার অসিদ্ধিরূপ অপসিদ্ধান্তই সিদ্ধ হইল। আর যদি অজ্ঞান-বিষয়ক অজ্ঞান অনুমিত না হয় তাহা হইলে ঐ অজ্ঞানের জ্ঞানে বা অনুমিতিরূপ জ্ঞানে অপ্রকাশিত অর্থপ্রকাশকত্ব-রূপ হেতু থাকিল, অথচ 'বস্ত্বন্তরপূর্বকত্ব'-রূপ সাধ্য না থাকায় হেতুটি ব্যভিচারী হইল। আরও কথা এই যে অজ্ঞান-বিষয়ক অজ্ঞান সাধিত হইলে অজ্ঞানের সাক্ষিত্ব অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। যেহেতু অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যই অজ্ঞানের সাক্ষী। অজ্ঞানই চৈতন্যের সাক্ষিত্ব-আপাদক। সেই অজ্ঞান-সাক্ষী যদি দ্বিতীয় অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া যায়, তাহাতে দ্বিতীয় অজ্ঞানই চৈতন্যের অজ্ঞান-সাক্ষিত্বকে নিবারিত করিয়া দিবে। সুতরাং অবিদ্যার অনুমান সম্ভব নয়। আরও কথা এই যে—দৃষ্টান্ত প্রদীপ-প্রভাটি চৈতন্যের তুলনায় জড় বলিয়া তাহাতে হেতু অসিদ্ধ।

অদ্বৈতমতে উত্তর

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন : যাহা আমাদের প্রকৃত স্থল (পক্ষ) নয়, তাহা লইয়া দোষ দেওয়া হাস্যজনক; অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীরা প্রমাণ-জ্ঞানকে পক্ষ করেন। প্রমাণ-জ্ঞান বলিতে

১১ প্রমাণবৃত্তিনিবর্ত্যস্যাপি ভাবরূপাজ্ঞানস্য সাক্ষিবেদ্যস্য বিরোধিনিরূপকজ্ঞান তদ্ব্যাবর্তকবিষয়কগ্রাহকেণ সাক্ষিণা তৎসাধকেন তদনাশাদ্ব্যাহত্যনুপপত্তেঃ।—অদ্বৈতসিদ্ধি—১ম পঃ

—অর্থাৎ ভাবরূপ অজ্ঞান প্রমাণবৃত্তির দ্বারা নিবর্ত্য হইলেও সাক্ষিবেদ্য হওয়ায় অজ্ঞানের বিরোধিনিরূপক জ্ঞানও অজ্ঞানের বিষয়গ্রাহক সাক্ষী অজ্ঞানের সাধক বলিয়া সাক্ষীর দ্বারা তাহার বিনাশ না হওয়ায় ব্যাঘাত নাই।

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণজনিত বিষয়াকার-বৃত্তি বা বৃত্তি-প্রতিফলিত চৈতন্যকে বুঝায়। অথবা বেদান্তবাক্য-প্রমাণজন্য অখণ্ডব্রহ্মাকারবৃত্তি-অভিব্যক্ত চৈতন্যকে প্রমাণ-জ্ঞান বলে। সাক্ষিচৈতন্যকে প্রমাণ-বৃত্তি বলা হয় না। যেহেতু সাক্ষি-বেদ্য বিষয়ের অন্তঃকরণবৃত্তি স্বীকার করা হয় না। সুতরাং আচার্যের (রামানুজের) অজ্ঞানের জ্ঞানকে ধরিয়া আক্ষেপ অস্থানে বারিবর্ষণ-স্বরূপ।[১২] আর অনুমিতিরূপ প্রমাণ-জ্ঞানটি অপ্রকাশিত অর্থের প্রকাশক হওয়ায়, দ্বিতীয় অজ্ঞানের অনুমান হইলে যে দোষ দেওয়া হইয়াছিল তাহাও অসঙ্গত ; কারণ প্রমাণ-জ্ঞান বলিতে প্রথম পক্ষটি ঘটজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায়, তাহাতে অনুমানের দ্বারা ঘটের অজ্ঞান বা ব্রহ্মের অজ্ঞান সিদ্ধ হয়। আর অনুমিতিকে পক্ষ করিলে অনুমিতির অজ্ঞান সিদ্ধ হইবে ; তাহার দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানান্তর সিদ্ধ হইবে না। প্রমাণ-জ্ঞানরূপ পক্ষটি সামান্যভাবে প্রমাণজনিত সকল জ্ঞানকে বুঝাইলেও সেই সেই প্রমাণ-জ্ঞানরূপ পক্ষে সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন অজ্ঞান সিদ্ধ হইবে। যেমন তত্তৎপর্বতে তত্তদ্‌বহ্নি অনুমিত হয়। ব্রহ্ম-জ্ঞানের দ্বারা মূল-অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। ঘটাদি জ্ঞানের দ্বারা ঘটাদির অজ্ঞান নিবৃত্ত। প্রথমোক্ত অজ্ঞানটিকে মূল-অজ্ঞান বলে। শেষোক্ত অজ্ঞানকে কার্য-অজ্ঞান বা অবস্থা-অজ্ঞান বলে ; ইহার দ্বারা প্রমাণ-জ্ঞানে একটি অজ্ঞান, অনুমিতিরূপ জ্ঞানে আর একটি অজ্ঞান—ইত্যাদিরূপ সাধিত হইলে অনবস্থা দোষ হয়, ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মতও খণ্ডিত হইল। কারণ ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে ভিন্নভিন্ন-বিষয়ক অজ্ঞান সিদ্ধ হয় বলিয়া পরস্পরের অপেক্ষা না থাকায় একই বিষয়ের নানা অজ্ঞান বা অজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞান, তদ্বিষয়ক অজ্ঞানসিদ্ধির কোন হেতু নাই। আর প্রদীপের দৃষ্টান্ত বিষয়ে যে আক্ষেপ করা হইয়াছিল, তাহার উত্তরে বলা যায় যে, এখানে অপ্রকাশিত-অর্থ-প্রকাশকত্বরূপ হেতুর অর্থ হইতেছে—যাহা অপ্রকাশিত-অর্থ-বিষয়ক হইয়া প্রকাশ-শব্দ-বাচ্য তাহাই হেতু।[১৩] সেইজন্য প্রদীপ-প্রভাতে হেতুটি অসিদ্ধ হয় না। অতএব অবিদ্যার অনুমানে কোন দোষ নাই।

অবিদ্যাবিষয়ে অর্থাপত্তি-প্রমাণ (সিদ্ধান্তমত)

অবিদ্যাবিষয়ে অর্থাপত্তি-প্রমাণও আছে। যথা : তোমার কথিত অর্থ জানি না,—এইরূপ ব্যবহার লোকে দেখা যায়। অথচ ঐ ব্যবহারকে জ্ঞানাভাবের ব্যবহার বলা যায় না। কারণ 'তোমার কথিত অর্থ জানি না'—এই জ্ঞানটিও একটি প্রমা বলিয়া তাহার বিষয়টি জ্ঞাত হওয়ায়, সেই জ্ঞানের নিষেধ করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এই হেতু উক্ত ব্যবহারের অন্যথা অনুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তি-প্রমাণ-বলেও ভাবরূপ অজ্ঞান সিদ্ধ হয়।[১৪]

শ্রুতি-প্রমাণ

ভাবরূপ অজ্ঞান বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ বহু আছে। দু'একটি দেখান হইতেছে। যথা : 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্' (শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৪।১০) 'ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ' [শ্বেতাশ্বঃ উঃ ১।১০]। 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' [ছাঃ উঃ ৭।১।৩] 'অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ' [ছাঃ উঃ ৮।৩।২]

১২ অত্র প্রমাণপদং প্রমাণবৃত্তেরেব পক্ষত্বেন সুখাদিপ্রমায়াং সাক্ষিচৈতন্যরূপায়ামজ্ঞানানিবর্তিকায়াং বাধবারণায়। [অদ্বৈতসিদ্ধি—১ম পঃ]—অর্থাৎ অনুমানের ঘটক প্রমাণ পদটি প্রমাণজনিত বৃত্তিকেই পক্ষ করায় অজ্ঞানের অনিবর্তক সাক্ষি-চৈতন্যরূপ সুখাদি-প্রমাতে যে বাধের প্রসঙ্গ হইত, তাহার বারণের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে।

১৩ "এবং চাপ্রকাশিতার্থগোচরত্বে সতি প্রকাশশব্দ বাচ্যত্বাৎ অপ্রকাশবিরোধিপ্রকাশত্বাদিতি বা হেতুঃ পর্যবসিতঃ"—ঐ

১৪ "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামীতি ব্যবহারান্যথানুপপত্তিরপি ভাবরূপাজ্ঞান সদ্ভাবে মানম্।" —চিৎসুখী।

এই সকল শ্রুতি যে ভাবরূপ অজ্ঞানের বোধক, তাহা অদ্বৈতচার্যগণ যুক্তি সহকারে দেখাইয়াছেন। বিস্তৃতি-ভয়ে এ-বিষয়ে নিবৃত্ত হইতে হইল। অতএব অবিদ্যার প্রমাণের অনুপপত্তি অসিদ্ধ।

পঞ্চম : স্বরূপের অনুপপত্তি-নিরাস

অবিদ্যার অনির্বচনীয়ত্ব অনুপপত্তির নিরাস দ্বারা ফলতঃ স্বরূপের অনুপপত্তিও খণ্ডিত হইয়াছে। সদসদনির্বচনীয় জ্ঞাননিবর্ত্য ভাবরূপত্বই অবিদ্যার স্বরূপ।

ষষ্ঠ : অবিদ্যার নিবর্তকত্ব-অনুপপত্তি-আক্ষেপ

রামানুজাচার্য বলেন : ব্রহ্ম নির্বিশেষ নয়। সকল শ্রুতিতেই ব্রহ্মকে সবিশেষ সগুণ বলা হইয়াছে। অতএব নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব বলিয়া সেই জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান-নিবৃত্তিও অনুপপন্ন : আরও যুক্তি এই যে সমস্ত জ্ঞানই সবিশেষ, নির্বিকল্প জ্ঞানও সবিশেষ-বিষয়ক। এইহেতু নির্বিশেষ জ্ঞান না থাকায় অদ্বৈতমতে অজ্ঞানের নিবর্তক জ্ঞান অসিদ্ধ।

অদ্বৈতমতে উত্তর

ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলেন : 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং' 'নেতি নেতি' 'অস্থূলমনণু' ইত্যাদি বহু শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে দেখা যায় ব্রহ্ম নির্বিশেষ। সবিশেষ বস্তুর ব্যয় বা বিনাশ দেখা যায় বলিয়া—ব্রহ্ম সবিশেষ হইলে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর নির্বিশেষ জ্ঞান অসম্ভব নয়। বালক মূক, বা জড়ের জ্ঞান সদৃশ এক প্রকার জ্ঞানই নির্বিকল্পক জ্ঞান। বাচস্পতি বলিয়াছেন, 'অস্তি হ্যালোচনং নাম প্রথমং নির্বিকল্পকং। বালমূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং শুদ্ধবস্তুজম্'। 'ইহা এই রূপ' এই প্রকার জ্ঞান নির্বিকল্পক নয়, কিন্তু সবিকল্পক। এই জ্ঞানের পূর্বেই 'ইদম্ ইদত্বের' নির্বিকল্পক জ্ঞান হইয়া যায়। প্রথম গো-পিণ্ড দর্শনে গোত্ব-বিশিষ্ট জ্ঞান হয় না, বা গোত্ব-প্রকারক জ্ঞান হয় না, কিন্তু 'গো' বা 'গো-ত্ব'এর বিশকলিতরূপে জ্ঞান হইয়া থাকে, জ্ঞানে সপ্রকারকত্বটিও ভাসমান হয় না। আরও কথা এই—যে ব্যক্তি পূর্বে চন্দ্রকে সামান্যভাবে দেখিয়াছে, পরে বিশেষভাবে যখন তাহার জানিবার ইচ্ছা হয়, তখন জিজ্ঞাসা করে, 'চন্দ্র কি বা কে ?' তাহার উত্তরে আপ্ত ব্যক্তি বলেন 'প্রকৃষ্ট প্রকাশশ্চন্দ্রঃ' তখন প্রশ্নকারী ব্যক্তি ঐ লক্ষণ-বাক্য শুনিয়া 'চন্দ্র ও চন্দ্রত্বে'র সংসর্গকে না বুঝিয়া অখণ্ড চন্দ্রকেই বুঝে।[১৫] সেইরূপ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের নির্বিকল্পক জ্ঞান অবশ্যই হয়। ব্রহ্মে বিকল্প নাই বলিয়া নির্বিকল্প জ্ঞান অবশ্যই হইবে সুতরাং অবিদ্যার নিবর্তক জ্ঞানের সদ্ভাব থাকায় নিবর্তকত্বের অনুপপত্তি নাই।

সপ্তম : অজ্ঞানের নিবৃত্তি-অনুপপত্তি আক্ষেপ

তারপর শ্রীভাষ্যকার বলিয়াছেন : যেহেতু বন্ধন পারমার্থিক সেইহেতু ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারা কখনও সত্য বস্তুর নিবৃত্তি হয় না। আরও

১৫ অপর্যায়শব্দানাং সংসর্গাগোচরপ্রমিতিজনকত্বমখণ্ডার্থতা। নচেদমসম্ভবিলক্ষণং, প্রকৃষ্টপ্রকাশাদিবাক্যেষু তৎসদ্ভাবাৎ —চিৎসুখী। 'সত্য, জ্ঞান, আনন্দ' প্রভৃতি অপর্যায় শব্দের যে সংসর্গবিষয়রহিত প্রমাজ্ঞান-উৎপাদকতা, তাহাই অখণ্ডার্থতা এই লক্ষণ অসম্ভব নয়। 'প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্র' ইত্যাদি বাক্যের অখণ্ডার্থবোধকত্ব দেখা যায়।

কথা—অদ্বৈতবাদিগণের অজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞানটি ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তিস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্ম ভিন্ন। ব্রহ্ম ভিন্ন সবই যখন মিথ্যা, তখন ঐ ব্রহ্মজ্ঞানও মিথ্যা হওয়ায়, মিথ্যামাত্রই নিবর্তনীয় বলিয়া মিথ্যা জ্ঞানের নিবর্তক কোন সত্য বস্তুর আবশ্যক হইবে। আর যদি বল ঐ অজ্ঞানের নিবর্তক জ্ঞানটি মিথ্যা হইলেও ক্ষণিক বলিয়া অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্যকে নিবৃত্ত করিয়া নিজেই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। ইহাতেও অদ্বৈতবাদে দোষ থাকিয়া যায়। যেহেতু ঐ জ্ঞানটি মিথ্যা বলিয়া উহার উৎপত্তি বা বিনাশটিও মিথ্যা হওয়ায় সকল মিথ্যার কল্পনা যখন অজ্ঞানের দ্বারাই প্রবৃত্ত হয়, তখন ঐ ব্রহ্ম জ্ঞানের বিনাশ-কল্পনাও অজ্ঞানের দ্বারাই করিতে হইবে। অতএব ঐ জ্ঞানের বিনাশ-কাল পর্যন্ত অন্ততঃ অজ্ঞানকে থাকিতে হইবে। তাহাই যদি হয় তবে আর ঐ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ না হওয়ায় অন্য কোন পদার্থকে অজ্ঞানের নাশকরূপে স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি বল ব্রহ্মই ঐ জ্ঞানের নাশস্বরূপ, তাহা হইলে নাশস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য বলিয়া ঐ জ্ঞান কখনও উৎপন্ন হইতে পারিবে না। অতএব নিবর্তকের অভাবে অজ্ঞানের নিবৃত্তি অনুপপন্ন। আর মিথ্যাজ্ঞান দ্বারাই বা কিরূপে অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব?

অদ্বৈতমতে উত্তর

বন্ধন সত্য নহে। যেহেতু 'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়' [শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৩।৮] ইত্যাদি যুক্তিসহকৃত শ্রুতির অন্যথা-অনুপপত্তি-বশতঃ সংসারবন্ধন জ্ঞান-নিবর্ত্য বলিয়া মিথ্যাস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে। আর মিথ্যা হইতে মিথ্যার নিবৃত্তিও হয়; অনেক সময় স্বপ্নের দ্বারাই স্বপ্নদৃশ্য নিবৃত্ত হয়। আর ব্রহ্মজ্ঞানটি মিথ্যা হইলেও তাহার পৃথক নিবর্তক স্বীকারের প্রয়োজন নাই। যেহেতু লোকে এমন দেখা যায় যে অরণি-কাষ্ঠ হইতে উদ্ভূত অগ্নি কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া আপনিও নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানও অজ্ঞান প্রভৃতিকে নিবৃত্ত করিয়া নিজেও কারণাভাব-নিবন্ধন নিবৃত্ত হইয়া যাইবে।[১৬]

আর ব্রহ্মজ্ঞানের নাশের কল্পনার জন্য অবিদ্যার অবস্থান স্বীকার করিতে হইবে না। যেহেতু অদ্বৈতিগণ (চরম) জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত ব্রহ্মকেই অবিদ্যার নাশস্বরূপ স্বীকার করেন। ইহাতে আর ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তিতে বাধা নাই, বরং উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার্য। কারণ জ্ঞান উৎপন্ন না হইলে ব্রহ্ম জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত হন না। আর ঐ জ্ঞান বর্তমান থাকিলেও ব্রহ্মকে জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত বলা যাইবে না। যাহা উপলক্ষণ তাহা উপলক্ষ্যের বোধকালে থাকে না। সুতরাং জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হইলে তবেই ব্রহ্ম জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত হন। অতএব জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব হওয়ায় নিবৃত্তির অনুপপত্তি নাই। সুতরাং অদ্বৈতমতে মোক্ষ নির্বিবাদে সিদ্ধ হয়, বরং বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদে পূর্ণমুক্তি নাই।

১৬ সজাতীয় স্বপরবিরোধিনাং ভাবানাং বহুলমুপলব্ধেঃ। যথা পয়ঃ পয়োঽন্তরং জরয়তি, স্বয়ং চ জীর্যতি; যথা বিষং বিষান্তরং শময়তি স্বয়ং চ শাম্যতি, যথা বা কতকরজো রজোঽন্তরাবিলে পাথসি প্রক্ষিপ্তং রজোঽন্তরাণি ভিন্দৎ স্বয়মপি ভিদ্যমানম্ অনাবিলং পাথঃ করোতি [ব্রঃ সূঃ ভামতী ১।১।১]

যদিও এই গ্রন্থ অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন তথাপি বৃত্তিরূপ জ্ঞান অবিদ্যাজাতীয় হইয়াও অবিদ্যা, তাহার কার্য এবং নিজেকে যে নিবৃত্ত করিবে—এই বিষয়েও দৃষ্টান্ত সম্ভব।

লণ্ডনের চিঠি

ডক্টর শ্রীশশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত শনিবার লীডস্ থেকে লণ্ডনে এসেছি। ভারতীয় ছাত্রবাসে আছি। ডাল ভাত রুটি খেতে পাচ্ছি, তরকারিতে বড় তেল দেয়। বাড়ীতে ইঁদুর আছে, আরস্থলাও আছে।

একজন সঙ্গী জুটেছে, ঘুরে বেড়াচ্ছি। রবিবার স্বামী ঘনানন্দজীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, ১লা জানুআরি আশ্রমে প্রসাদ পাব। শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজার দিন মহারাজ আসতে বললেন। এদেশে আসবার সময় ভেবেছিলাম, এবার বোধ হয় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি আমার নিরানন্দে কাটবে, কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় ঐ দিন—সারাটি দিন লণ্ডন আশ্রমেই কাটিয়েছি।

আশ্রমটি যদিও সাধারণ একটি বাড়ী—বেশ শান্ত জায়গাটি, নীচের তলায় চারটি ঘর—বসবার, খাবার, আপিস ও রান্নার। ওপরে ঠাকুরঘর, তার সামনে জপের ঘর; আর দুখানা শোবার। বাইরে পিছনে একটু খোলা জায়গা আছে, মহারাজ বললেন—শীতের পর গরমের সময় ফুল ফোটে, এখন আপেল দেখলাম।

একটি সাহেব ব্রহ্মচারী আছেন, মহারাজ নাম দিয়েছেন—'তারকনাথ'।

মায়ের জন্মতিথির দিন সকালে স্বামী ঘনানন্দজীই পূজা করলেন। বিকালে ৬টায় সময় (অবশ্য এখন সূর্য ডোবে বেলা ৪টায়) ব্রহ্মচারী তারকনাথ আরতি করলেন—শুধু কর্পূর দিয়ে। তারপর 'ওঁ হ্রীঁ ঋতং' এবং 'প্রকৃতিং পরমাম্' স্তব দুটি পাঠ হ'ল। মাটিতে কম্বলের উপর সকলের বসার ব্যবস্থা। তারপর খিচুড়ি পাঁপর ও পায়েস প্রসাদ পেলাম—আমরা ভারতীয় ৪জন, ডাচ ১জন ও ৭।৮ জন ইংরেজ মহিলা। ভারতীয়দের মধ্যে বেলুড় বিদ্যামন্দিরের একটি প্রাক্তন ছাত্রকে দেখলাম। আরতির পর মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত সভায় মায়ের জীবন আলোচনা হ'ল।

প্রথম বক্তা মিষ্টার সরকার (বাঙালী)। পরে দুজন ইংরেজ মহিলা—মায়ের জীবনের খুঁটিনাটি সব—তাৎপর্যসহ বেশ গুছিয়ে বললেন, তন্ন তন্ন ক'রে জীবনী পড়েছেন—বোঝা গেল।

বক্তৃতা শুনছিল প্রায় ৫০।৬০জন লোক—তার মধ্যে অর্ধেক এ-দেশীয়। সভার পর কেক বিস্কুট চা ও একটু প্রসাদ দেওয়া হ'ল সকলকে। আশ্রমটি শহরের মাঝখান থেকে ৮।৯ মাইল দূরে, তবে টিউব-ট্রেনে বেশী সময়ে লাগে না।

* * *

এখানকার Christmas (খৃষ্ট জন্ম) উৎসবের কথা কিছু লিখি।

এরা কিছুদিন আগে থেকেই নরওয়ে সুইডেন থেকে এক রকম গাছের ডাল আনে, যা বরফেও সবুজ থাকে। প্রায় সব বাড়ীতেই একটি গাছ বা ডাল টবে বসবে। দোকান বা চার্চেও একই রকম,—কোন গাছ বড়, কোনটি বা ছোট। গাছে কাঁচের বল ঝুলছে, আলো (ইলেক্ট্রিক বা মোমবাতির) ঝুলবে। জরির ফিতে দিয়ে ঘিরে সাজানো হবে, আবার পুতুল-পরীও একটি ঝুলবে। কোন কোন বাড়ীতে মোজা ঝুলবে—তাতে Santa Claus উপহার দেবে।

এ সবের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই, তবু সর্বত্র এই সব দেশাচারের প্রচলন। লণ্ডনে যে সব বড় গির্জা সেণ্টপলস্ ক্যাথিড্রাল, ওয়েস্ট মিনষ্টার চার্চ—সেখানেও তাই। দোকানগুলিও খুব সাজায়। লণ্ডনের রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে (একটি বড়

রাস্তা), পিকাডিলি সার্কাস থেকে অক্সফোর্ড সার্কাস—সব আলোর মালায় আর চীনা ফানুস (Chinese lamp) দিয়ে বরাবর সমান ভাবে সাজানো।

এই পরবের আর একটি অঙ্গ Christmas greeting (চিঠি) ও উপহার পাঠানো। সবাই ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন জামা কেনে, সকালে কেউ কেউ একবার গির্জায় যায়। এর পর উৎসবের বিশেষ অঙ্গ Christmas dinner (সান্ধ্য ভোজ)। টেবিলের মাঝখানে Christmas cake (ক্রীসম্যাস কেক) ভেতরে কিস্‌মিস্ বাদাম প্রভৃতি দেওয়া—খুব গুরুপাক। সাধারণতঃ দু'একজন বন্ধু বা আত্মীয়কে সব বাড়ীতেই নেমন্তন্ন করে। খাবার আগে পটকা ফাটাতে হবে, একটি কাগজের টুপি পরতে হবে। এর পর পানীয় —বড়দের রঙীন, ছোটদের লেবুর সরবৎ; আমি অবশ্য ছোটদের দলে।

অনেক বাড়ীতেই মেয়েরা এই ডিনারের খাবার ১৫।২০ দিন আগে থেকে করতে থাকে; কেকও নিজেরা করে। ভোজের পর পানের ব্যাপার অনেক রাত পর্যন্ত চলে।

পরদিন Boxing day (বক্সিং দিবস)—কেন যে এই নাম—কেউ বলতে পারলে না; এ দিন কেউ রাঁধে না, সব বাসি খায়। কতকটা আমাদের অরন্ধনের মতো।

উপহারের আদান-প্রদান খুব—আমিও এদের দিয়েছি, এরাও আমাকে দিয়েছে।

এবার এখানকার (শহরের বাইরের) বরফ পড়ার কথা একটু লিখছি। গত মঙ্গলবার দুপুর থেকে ক্রমাগত দুদিন—আকাশ থেকে শ্বেতপুষ্প বৃষ্টি (Snowfall) হয়ে ৪।৫ ইঞ্চি তুষার জমেছে, তারপরও রোজই মাঝে মাঝে তুষারপাত চলেছে। চারিদিক সাদা, রাত্রেও একটা যেন আলো দেখা যায়। বরফের ওপর দিয়েই চলাফেরা সব। একটা রবারের ওভার-সু (over shoe) কিনেছি—জুতোটাকে বাঁচাবার জন্যে; একটি রবারের Hot-water-bottle (গরম জলের পাত্র) কিনেছি বিছানা গরম করবার জন্যে, অবশ্য এখনও হাড়-কাঁপানো শীত পড়েনি। থার্মোমিটার মাঝে মাঝে—40°F এর নীচে যায়। আজ সকাল থেকে খুব blizzard—ঠাণ্ডা তুষার-ঝড় চলেছে—বেশ লাগে; একটা এদেশী সোয়েটারও কিনেছি।

বরফের কদর্য দিকটা হ'ল—গাড়ী চ'লে বরফের মণ্ড যখন ছিটিয়ে দিয়ে যায়—এটা অবশ্য আইন-বিরুদ্ধ। সকাল থেকেই রাস্তায় বালি ছড়িয়ে দিয়ে যায় করপোরেশন থেকে। পায়ের চাপে চাপে ফুটপাথের বরফ জমে শক্ত ইট হয়ে গেছে—পা পিছলায়; অবশ্য এখানেও বালি দিয়েছে।

চারদিক বরফে ঢাকা। সাতদিন হ'ল বরফ পড়েছে, গলতে চায় না। মাটির temperature (তাপমাত্রা) Freezing point (তুহিনাঙ্ক)-এর উপর ওঠে কম। Dry ice (শুকনো বরফ)—অসুবিধা নেই, গলতে আরম্ভ করলেই বিশ্রী।

লণ্ডনের বর্ণনা দিয়েই চিঠি শেষ করি। সারা লণ্ডন শহরটাই ম্যুজিয়ামে ভরা, তার মধ্যে বৃটিশ ম্যুজিয়াম (British Museum) একটি, এটির বাড়ীটাও বড়, সংগ্রহও অনেক; তার মধ্যে বেশীর ভাগ পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস-সংক্রান্ত।

কিছু দূরে Science Museum (বিজ্ঞান-সংগ্রহশালা), Natural History Museum (প্রাকৃতিক ইতিহাস-সংগ্রহশালা) এগুলি দেখলে ছেলেরা নিজে নিজেই শিখতে পারে। ছেলেরাও কাগজ-পেনসিল নিয়ে ছবি আঁকতে লেগে গেছে, বা সুইচ টিপে দেখছে—একটা যন্ত্র কেমন চলে। সব জিনিসের—যেমন প্রাণীর

তেমন যন্ত্রের—ক্রমবিকাশের অবস্থা দেখানো হয়েছে একটার পর একটা।

তারপর Commonwealth Institute (কমন-ওয়েলথ প্রতিষ্ঠান), এরোপ্লেন ম্যুজিয়াম; তারপর সব আর্ট গ্যালারি, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি, বিভিন্ন দেশের বড় বড় শিল্পীর আঁকা চিত্র; Portrait gallery—বৃটিশ জাতির মনীষীদের চিত্র; Tate gallery—এখানে ভাল ভাল চিত্র ও কারুশিল্পের নমুনা। Wax Museum-এ মোমের মানুষ সব, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোকদের প্রতিকৃতি—গান্ধী, নেহেরু, জিন্না, ক্রুশ্চেভেরও আছে।

একটি প্ল্যানেটেরিয়াম রয়েছে—এখানে কৃত্রিম উপায়ে আকাশের গ্রহতারা সব দেখানো হয়। তারপর London Tower (লণ্ডন টাওয়ার) এখানকার বিশেষত্ব রাজকীয় অলঙ্কার এখানে থাকে, রানী ভিক্টোরিয়ার মুকুটে আছে ভারতের কোহিনুর।

বৃটিশ পার্লামেণ্ট (বা Westminister Palace) দেখা হ'ল, সেখানে House of Lords আর House of Commons-এর (লর্ডস ও কমন্স সভার) দুটি ঘর—আমাদের বাংলাদেশের বিধান-সভার চেয়ে ছোট; যুদ্ধের সময় বোমা পড়ে হাউস সব কমন্স্ ভেঙে গিয়েছিল। তিন বছরে তৈরী ক'রে ফেলেছে—ঠিক আগের মতো।

সব থেকে আশ্চর্য কিন্তু লণ্ডন শহরের মাটির নীচে সুড়ঙ্গ পথে ইলেক্ট্রিক ট্রেন—এরা বলে টিউব।

ফুল ফোটে বনে

ডাঃ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

ফুল ফোটে বনে
নিরজনে;
কেবা জানে?

বিলাইয়া দেয়
আপনারে
অকাতরে।
নাহি ভাবে মনে
কিবা হবে
শুকাইবে
দিন শেষে যবে।

প্রসাধন মাঝে,
সযতনে,
তারে এনে
রেখে নানা সাজে—
বৃথা কেন
টেনে আনো
মরণ নীরবে?

সমালোচনা

মহাভারতে অনুশীলন-তত্ত্ব : শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। প্রকাশক—প্রেমানন্দ সাহানা, ৫০; পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা—২০। পৃষ্ঠা—১১০; মূল্যের উল্লেখ নাই।

মহাভারত ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের বিরাট স্তম্ভ। এত বড় গ্রন্থ জগতের কোথাও নাই। 'মহত্ত্বাৎ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে' —মহাভারত-পাঠে এই বাণীর যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়। ইহাতে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, উপনিষৎ; রাজনীতি, সমরনীতি, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ের যে আলোচনা আছে তাহার তুলনা অন্যত্র মেলে না। 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে'। বিশাল ভারতবর্ষের সমস্ত চিন্তাধারা মহাভারত-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, সেইজন্য ইহা আর্যকৃষ্টির বিশ্বকোষ। মহাভারত সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতীয় সাহিত্যে ও জীবনে শক্তি প্রদান করিতেছে।

আলোচ্য গ্রন্থে মহাভারতের প্রসিদ্ধ চরিত্রগুলির মধ্যে একাদশটি নির্বাচন করিয়া বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এই চরিত্রগুলি : যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, দুর্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ, বিদুর, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জুন। গ্রন্থকার সরল ভাষায় স্বাধীন ভাবে প্রতিটি চরিত্রের উপর যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ ধারণা হইতে তাহা পৃথক্ হইলেও তাঁহার চিন্তাশীলতা উপেক্ষণীয় নয়। যে চরিত্রের যেখানে মাধুর্য উদারতা মহত্ত্ব তাহা যেমন লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি দোষ-ত্রুটিগুলি তাঁহার দৃষ্টিতে যেরূপ ধরা পড়িয়াছে তাহাও বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশিত। অর্জুন, ভীষ্ম এবং শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রই সুন্দরভাবে আলোচিত, মনে হয় কর্ণের চরিত্র নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা হয় নাই, আবার কয়েকটি চরিত্র অতি সংক্ষিপ্ত। মহাভারতের কয়েকজন মহীয়সী মহিলার চরিত্র পুস্তকে স্থান পাইলে ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত।

কল্যাণ (হিন্দী পত্রিকা) (মানবতা অঙ্ক, ৩২তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)—গোরখপুর গীতা প্রেস হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৭০৪+সূচী ১৫; মূল্য ৭॥।

এই বিশেষাঙ্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে মানবতার বিচার ও বিশ্লেষণ আছে। ত্যাগী মহাত্মা, সাধুসন্ত ও বিচারশীল জননেতাদিগের অমূল্য চিন্তাধারা বহু প্রবন্ধে প্রতিফলিত। 'মানবতার স্বরূপ', 'মানবধর্ম'. 'মানবতা ও পশুত্বের ভেদ', 'বিভিন্ন ধর্মে মানবতার স্বরূপ', 'মানবতা-সংরক্ষক আদর্শ' প্রভৃতি প্রবন্ধে কিভাবে যথার্থ মানুষ হইতে পারা যায় তাহার দিগ্‌দর্শন পাওয়া যাইবে। কবিতা ও শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতিগুলিও সুন্দর। ৩৯খানি বহুরঙের সুদৃশ্য চিত্র সহ মোট ১৬০ চিত্রে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ পূর্ব পূর্ব বিশেষাঙ্কের ন্যায় পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইবে

—জীবানন্দ

এক যে ছিল রাজা—সুকমল দাসগুপ্ত। প্রকাশক ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী, ৬৪ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। মূল্য ২ টাকা; পৃঃ ৮০।

রামমোহন সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলিকে ছড়ার ছন্দে শিশুদের উপযোগী ক'রে প্রকাশ করার চেষ্টা রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত সব কয়টি কাহিনীর ঐতিহাসিকতা এখনো প্রমাণিত হয়নি। উদাহরণ-স্বরূপ বলা চলে বৌঠানের 'সহমরণে' রামমোহন উপস্থিত ছিলেন কিনা—এমনকি 'সহমরণ' হয়েছিল কিনা, সে বিষয়েও আধুনিক গবেষকেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাছাড়া ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম ঐতিহ্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে রামমোহনের ধর্মচিন্তাকে পূর্ণাঙ্গ বলা চলে কিনা সন্দেহ। সাকার-নিরাকারের দ্বন্দ্ব শিশুমনে প্রবেশ করিয়ে বিশেষ কোন লাভ নেই

ছড়া-জাতীয় কবিতার সহজ অথচ গভীর শব্দচয়নের সৌন্দর্য এ গ্রন্থে মাঝে মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থকারের উদ্যম নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়।

—শুভ গুপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ১৭ই মাঘ (৩১শে জানু-আরি) শনিবার স্বামী বিবেকানন্দের ৯৭তম জন্মোৎসব সারাদিনব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। ব্রাহ্ম মুহূর্তে মঙ্গলারতির পর বেদপাঠ দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হয়। অতঃপর যোড়শোপচারে পূজা, কঠোপনিষদ্-ব্যাখ্যা, কালী-কীর্তন, ভজনগান ও হোমমন্ত্রে মঠ-প্রাঙ্গণ উৎসব-মুখরিত হইয়া উঠে। স্বামীজীর মন্দির ও ঘরটি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ভোগারতির পর প্রায় ৬,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। সহস্রাধিক ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান।

অপরাহ্ণে আহূত সভায় হাওড়ার পৌরপ্রধান শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ সভাপতিত্ব করেন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দ বাংলায় বলেন: যুগাচার্য ও যুগাবতারগণের জীবনাদর্শ তত্তৎ যুগের জনসাধারণকে পথ দেখায় সত্য, কিন্তু তাঁহাদের জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ তখনই বুঝিতে পারে না। ইহা কালক্রমে বিকশিত হয়। রামায়ণে আমরা পাই রামচন্দ্রের জীবনকাব্য, অধ্যাত্ম-রামায়ণে পাই তাঁহার জীবন-দর্শন। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের একটি দিক পাওয়া যায়, শ্রীমদ্‌ভাগবতে আর একদিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দ ইংরেজীতে 'স্বামীজী কে, কেন আসিয়াছিলেন' প্রভৃতি প্রশ্ন তুলিয়া ঘটনার পর ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, স্বামীজী সেই সপ্তর্ষির ধ্যানমগ্ন ঋষি, শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে বর্তমান যুগের উপযোগী ধর্ম স্থাপনের জন্য আসিয়াছিলেন।

নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কেন্দ্রের পরিচালক স্বামী নিখিলানন্দ সুললিত ইংরেজীতে বলেন: আমরা বলিয়া থাকি, স্বামীজী—আমেরিকার কাছে ভারতের দান; একথাও সমান সত্য যে তিনি ভারতের কাছে আমেরিকার দান। এই দুই মহাজাতির আদান-প্রদানের উপর ভবিষ্যৎ সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে, তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। ভারত দিবে অধ্যাত্ম-জ্ঞান, আর আমেরিকা দিবে যন্ত্র-বিজ্ঞান,—স্বামীজীর এই স্বপ্ন আজ নানাভাবে সফল হইতেছে। সভাপতি মহাশয় স্বল্প কথায় স্বামীজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শ্রীসারদা মঠ—দক্ষিণেশ্বরে গত ১৭ই মাঘ, শনিবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীসারদা মঠে বিশেষ পূজা হোম হয়, চণ্ডী ও কঠোপনিষৎ পাঠ হয়, প্রসাদ-বিতরণাদির পর অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় মঠ-প্রাঙ্গণে ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি মহিলা সভায় স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে ব্রহ্মচারিণী বাসনা কর্তৃক মঙ্গল-গীতি আবৃত্তির পর প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা নারীজাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজীর বিশ্বাস, আশা এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। এই মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বের নারীকে আহ্বান জানান। এই মঠ তাহারই ভাব-কেন্দ্র।

শ্রীমতী সর্বাণী দেবী ইংরেজীতে 'স্বামীজীর বাণী—ত্যাগ ও সেবা' সম্বন্ধে এবং শ্রীমতী অনীতা দেবী বাংলায় নারীর শাশ্বত আদর্শও বর্তমান

শৈথিল্য ও ভবিষ্যৎ এবং দৈনন্দিন জীবনে কি ভাবে আদর্শের রূপায়ণ সম্ভব?'—স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিশদ্‌ভাবে এইগুলি আলোচনা করেন।

সভানেত্রীর ভাষণে শ্রীযুক্তা চৌধুরী স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, স্বামীজীর পরিকল্পিত স্ত্রীমঠ আজ স্থাপিত হইয়াছে, এখানে সন্ন্যাসিনী ব্রহ্মচারিণীরা ত্যাগ ও সেবার ব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন—ইহা বড় আনন্দের কথা। অতঃপর নারীর সনাতন আদর্শ এবং জীবনে তাহার প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা-কালে তিনি পরম শ্রদ্ধার সহিত শ্রীশ্রীমার আদর্শ জীবনের উল্লেখ করেন।

সারদানন্দ-জন্মোৎসব

উদ্বোধন ভবনে গত ১লা মাঘ (১৫ই আরি) বৃহস্পতিবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শুভ জন্মোৎসব পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় মহা উৎসাহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, পূজ্যপাদ মহারাজের পুণ্যজীবনী-পাঠ, ভজন এবং প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে তাঁহার প্রতিকৃতিটি পত্রপুষ্পমাল্যাদি দ্বারা মনোরমভাবে সাজানো হয়। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত শত শত ভক্তের সমাগমে উদ্বোধন-ভবন আনন্দমুখর ছিল। ৮০০ নরনারী বসিয়া এবং প্রায় সমসংখ্যক ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

নূতন গ্রন্থাগার উদ্বোধন

নাগপুর ঃ গত ৫ই জানুআরি স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মতিথি-দিবসে বোম্বাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচ্যবন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত দ্বিতল গ্রন্থাগার-ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে উদ্বোধন-ভাষণে শ্রীচ্যবন রামকৃষ্ণ মিশনের পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন সেবা-কার্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ শুধু ধর্মবিশ্বাসই পুনরুজ্জীবিত করেন নাই, আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং ঐতিহ্য-চেতনাও জাগ্রত করিয়াছেন। ভারতকৃষ্টির বাণী—মানব-সেবা ও মানব-মহিমা

এতদুপলক্ষে সমাগত বোম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসমন্বয়ের অপূর্ব উদ্‌গাতা। বিভিন্ন ধর্ম তিনি জীবনে সাধনা করিয়া দেখাইয়াছেন সকলের লক্ষ্য এক। একটিই সনাতন ধর্ম আছে, সেটি ঈশ্বরকে জীবনে অনুভব করা; বিভিন্ন ধর্ম নামে পরিচিত প্রচলিত সকল ধর্মই সেই সনাতন ধর্মের এক একটি দিক্ মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের সকল শিক্ষার সার ঃ সব মানুষ এক, সত্যানুভূতিই বিশ্ব-শান্তি আনিতে পারে।

গ্রন্থাগারে নানা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের সুনির্বাচিত বহু পুস্তক আছে; পাঠাগারে ভারতের এবং বিদেশের অসংখ্য সংবাদপত্র ও সাময়িকী টেবিলে সাজানো থাকে। নূতন গ্রন্থাগার স্থানীয় পাঠকসমাজে এক নূতন উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে।

সমাজ-শিক্ষা

[নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদের পরিচালনায়]

নরেন্দ্রপুর ঃ গোষ্ঠী-আলোচনা—বাংলাদেশে সমাজশিক্ষা-ক্ষেত্রে সাক্ষরোত্তর শ্রেণীর কাজ এক রকম হয়নি বললেই চলে। তাই এই ক্ষেত্রে যাঁরা নূতন কাজ শুরু করেছেন তাদের একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণমিশন আশ্রম, লোকশিক্ষা পরিষদ সেইজন্য গত দুই মাসে 'সাক্ষরোত্তর শ্রেণীর সমস্যা'র উপর দুইটি গোষ্ঠী-আলোচনার ব্যবস্থা করেন; ঐ আলোচনায় ২৪ পরগনাস্থিত লোকশিক্ষা

পরিষদের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রগুলির শিক্ষকেরা অংশ গ্রহণ করেন।

দেওয়াল-চিত্র—বয়স্কশিক্ষার্থীদের সমাজ-সচেতন ক'রে তোলার জন্য লোকশিক্ষা পরিষদের দেওয়াল-চিত্রের প্রকাশ একটি অভিনব পন্থা। এ পর্যন্ত যে দেওয়াল-চিত্রগুলি প্রকাশ করা হয়েছে তা হচ্ছে যথাক্রমে দেশ-পরিচিতি, দেশমানব-পরিচিতি, 'রোদনভরা এ বসন্ত', গৃহস্থের সাথী, ভৌগোলিক সীমানির্দেশ, সমাজের সাথী,বাংলার বৈজ্ঞানিক, বাংলার সাধক, ফলে-ভরা বাংলা দেশ, কবি-পুরাণ, বাংলার গীতকার।

আলোচনা-চক্র—গত ২৭শে ডিসেম্বর স্বামীজী সেবাসংঘের উদ্যোগে গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম লোক-শিক্ষা পরিষদের পরিচালনায় 'সমাজশিক্ষাসূচীতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা' এই বিষয় লইয়া দুইদিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেমিনারের উদ্বোধন করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব ডাঃ ডি. এম. সেন। সেমিনারে যোগদানকারী ছাত্র যুবক ও সমাজ-সেবীদিগকে জনশিক্ষার প্রকৃত পন্থা বাহির করিবার আবেদন জানান। আলোচনার বিষয়কে পাঁচটি ভাগে করা হয়। যোগদান-কারিগণ ৮টি ভাগে বিভক্ত হইয়া আলোচনা করেন এবং কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং কয়েকটি কর্মপন্থাও উদ্ভাবিত হয়। সেমিনার পরিচালনা করেন বাণীপুর স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীহিমাংশু-বিমল মজুমদার।

সারাদিন আলোচনার পরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল। ২৭শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় স্বামীজী সেবাসংঘের শিশুবিভাগের পরিচালনায় 'কুশধ্বজ' পুতুলের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে রাত্রিবেলা লোকশিক্ষা পরিষদের পরিচালনায় 'শয়তানের সুমতি' নামক সমাজ-শিক্ষামূলক একখানি গীতি-আলেখ্য অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজ-শিক্ষা দিবস—গত ৭ই ও ৮ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা মন্দিরের 'সমাজ-শিক্ষা দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে কৃষি, শিল্প, ব্যায়াম, সূতাকাটা, চলচ্চিত্র প্রভৃতির প্রদর্শনী হয়। ৮ই ডিসেম্বর নবপরিকল্পিত মাতৃ-সদন, শিশুপার্ক-এর ভিত্তিস্থাপন ও স্বামী বিরজানন্দ চ্যালেঞ্জ শীল্ড গাদি-প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়, প্রায় ৫।৬ হাজার লোকের সমাবেশে উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

কার্য-বিবরণী

বারাণসীঃ পুণ্যতীর্থ কাশীধামে মিশনের এই পুরাতন সেবাশ্রমটি ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০০ খৃঃ হইতে নিয়মিত ভাবে আর্তসেবায় রত। সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণীতে ইহার উল্লেখযোগ্য সেবাকার্য ঃ

১১৫ শয্যা-সমন্বিত সাধারণ হাসপাতালে সারা বৎসরে ৩,৩৯৬ রোগী ভরতি করা হয়; চিকিৎসা-লাভের পর ২,৭১৪ জন আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া যায়। অস্ত্র-চিকিৎসা করা হয় ৬৪৬ জনের।

বহির্বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ২৪৭,৫৭১ (নূতন ৬৮,৭৬৪)। গড়ে দৈনিক রোগী সংখ্যা ৮৭০। ইন্‌জেকশন সহ অস্ত্র-চিকিৎ-সিতের সংখ্যা ৪৩,৫৯১। গড়ে দৈনিক ৬০০ লোককে গুঁড়া দুধ দেওয়া হইয়াছে। অসহায় নারী ও দরিদ্র ছাত্রগণকে সাহায্য বাবদ মোট টাকা ৫,২২৭.৩৭ দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া দুঃস্থ-গণকে কাপড় কম্বল প্রভৃতি প্রদান করা হয়।

কর্মশক্তিহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণের আশ্রয়াগার দুইটিতে যথাক্রমে ৯ ও ২২ জন ছিলেন।

প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবেরেটরি ও এক্স-রে বিভাগের রোগনির্ণয়ের কাজও উল্লেখযোগ্য।

দেবাত্মানন্দ-স্মরণে

পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত-কেন্দ্র: গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগন রাজ্যে অবস্থিত পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত-সমিতিতে সভ্য-সভ্যা, ভক্ত ও বন্ধুগণের উপস্থিতিতে এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দেবাত্মানন্দজীর (বেলুড় মঠে দেহত্যাগ—৮ই আগষ্ট, ১৯৫৮ ; উদ্বোধন ভাদ্র, ১৩৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) স্মৃতি-তর্পণ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র-পরিচালক স্বামী অশেষানন্দ প্রারম্ভিক প্রার্থনার পর এই উপলক্ষে প্রাপ্ত পত্রসমূহের মধ্যে কয়েকখানি হইতে কিছু কিছু পাঠ করেন। প্রভিডেন্স বেদান্ত-কেন্দ্রের স্বামী অখিলানন্দ ও হলিউড বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ তাঁহাদের মর্মস্পর্শী পত্রে স্বামী দেবাত্মানন্দের দেহত্যাগ আদর্শ সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ বলিয়া বর্ণনা করেন। ভক্তদের হৃদয়ে শান্তির জন্য তাঁহারা প্রার্থনা জানান।

বেলুড় মঠ হইতে স্বামী নির্বাণানন্দ লেখেন: স্বামী দেবাত্মানন্দের শিক্ষার্থী ও ভক্তগণের নিকট তাঁহার অভাব যে মর্মন্তুদ মনে হইবে—ইহা তো স্বাভাবিকই। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য এবং পরিবর্তনশীল সংসারে সব কিছুই অনিত্য—এই চিন্তাই আমাদিগের শোকের উপশম করে। তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণ-লোকে স্থিতিলাভ করিয়াছেন, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

স্যান্ফান্সিস্কো হইতে স্বামী অশোকানন্দ পোর্টল্যাণ্ডের ভক্তদের সমবেদনা জানাইয়া লেখেন: অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি চলিয়া গেলেন, তাঁহার আত্মনিবেদিত কঠোর পরিশ্রমের নিদর্শন—পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত-সমিতি তাঁহার অমর স্মৃতি বহন করিবে। ভবিষ্যতের বেদান্তানুরাগিগণের নিকট তাঁহার জীবন বহুতর উদ্দীপনা আনিবে।

নিউইয়র্ক হইতে স্বামী নিখিলানন্দ লেখেন: স্বামী দেবাত্মানন্দ অদ্ভুত কর্মযোগী ছিলেন। তিনি যেন হৃদয়শোণিত দিয়া পোর্টল্যাণ্ডের কেন্দ্রটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ র্যাল্‌ফ্‌ টম বলেন, 'স্বামী দেবাত্মানন্দ ১৯৩২ খৃঃ যখন পোর্টল্যাণ্ডে আসেন, তখন তাঁহার প্রথম বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তখন এখানে বেদান্তানুরাগীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। নানাবিধ প্রচণ্ড বাধার সম্মুখে যৎসামান্য সঙ্গতি লইয়া তিনি ধীরে ধীরে যেভাবে এখানকার কাজ সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

মিসেস রাডার স্বামী দেবাত্মানন্দের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে বলেন, 'তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৩৪খৃঃ ভগবান বুদ্ধের জন্মদিনে। তিনি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। The Light of Asia বইটি আমার আগেই পড়া ছিল। যে গভীর শ্রদ্ধা লইয়া তিনি 'বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণী' সম্বন্ধে বলিতেছিলেন, তাহাতে আমি মুগ্ধ হইলাম। ইহার পর প্রায় নিয়মিত ভাবেই তাঁহার বক্তৃতাদি শুনিতে আসিতাম। বেদান্তদর্শন এবং তদনুষঙ্গী ধর্মাচরণ আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন হইলেও তিনি তাঁহার বিষয়বস্তু এমন স্বচ্ছ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করিতেন যে ক্রমশঃ উহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম। স্পষ্টই বুঝিতে পারিতাম যে তিনি যাহা বলিতেছেন তাঁহার জীবনও ঐ সত্যের সহিত এক সুরে বাঁধা। সময়ে সময়ে তিনি এমন একটি উচ্চ প্রেরণা লইয়া বলিতেন যে আমার মনে হইত—আরও বহু লোক কেন এই সব অমূল্য সত্য শুনিতে আসে না। একদিন তাঁহার নিকট এই ভাবটি প্রকাশ

করিলাম। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রশান্ত বিনীত এবং সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া কহিলেন—যখন তাদের সময় হবে, তখন আসবে বই কি।

'তিনি যাহা কিছু করিতেন তাহাতে তাঁহার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিতেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি এবং অপরের কল্যাণ ও সুবিধার দিকে মনোযোগ ছিল প্রখর। এই সমিতির স্থায়ী গৃহ অন্বেষণ ও ক্রয় ব্যাপারে প্রতিপদে তাঁহার ভিতর আশ্চর্য ভগবন্নির্ভরতা দেখিয়াছি। আদর্শনিষ্ঠা, দূরদৃষ্টি এবং আশাপূর্ণ মনোভাবের সহিত তাঁহার ভিতর ব্যাবহারিক জ্ঞানের একটি চমৎকার সমন্বয় ছিল। তাঁহার মিতব্যয়ও ছিল আশ্চর্য। ১৯৩২ খৃঃ এদেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় এই রক্ষণশীল পোর্টল্যাণ্ড শহরে বেদান্ত-সমিতিটিকে সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর স্থাপন করা একটি অসাধ্য সাধন বই কি! কিন্তু স্বামী দেবাত্মানন্দ এই অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।

'পোর্টল্যাণ্ড শহরের এই বেদান্তকেন্দ্রটি ছাড়া ভক্ত ও বন্ধুগণের নির্জনে ঈশ্বরচিন্তার জন্য শহরের বাহিরে এক 'আশ্রম' স্থাপনের সঙ্কল্প তাঁহার বহুদিন হইতেই ছিল। শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর জন্মশতবার্ষিকীর সময় এখানে একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার উদ্দেশ্যে ইহাই স্বামী দেবাত্মানন্দের শেষ সেবা-কৃত্য।'

পোর্টল্যাণ্ড বেদান্তসমিতির সেক্রেটারী মিসেস সোয়ানসন্ বলেন, 'স্বামী দেবাত্মানন্দের আশ্চর্য শান্তভাব, সম্ভ্রমবোধ এবং নির্মলতা আমার চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তাঁহার ক্লাসগুলির মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা তিনি আমাদের ভিতর সঞ্চারিত করিতেন, তাহা কখনও আমরা ভুলিতে পারিব না। শহরের বাহিরে আশ্রমটিতে গাছপালা ও লতাফুলফলের মধ্যে তাঁহার অপর এক মূর্তি যেন আমরা দেখিতে পাইতাম। ইহাদের সহিত তখন যেন তিনি সম্পূর্ণ তাদাত্ম্য বোধ করিতেন। এই পুণ্যচরিত্র সন্ন্যাসীর নিকট আমরা গভীর নিঃস্বার্থ পিতৃস্নেহ পাইয়াছি।'

সমিতির কোষাধ্যক্ষ মিস্ ওলসেন পোর্টল্যাণ্ডে স্বামী দেবাত্মানন্দের দীর্ঘ কর্মজীবনের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা প্রসঙ্গে বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কী অবিচলিত বিশ্বাস, স্থিরতা এবং সাহস-সহকারে শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ এই সন্ন্যাসী শ্রীভগবানের কার্য করিয়া গিয়াছেন তাহার অনেক উদাহরণ দেন।

সিয়াট্‌ল্ বেদান্তকেন্দ্রের পরিচালক স্বামী বিবিদিষানন্দ—মঠে যোগদান করিবার পূর্বে স্বামী দেবাত্মানন্দের শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের সান্নিধ্য ও আশীর্বাদ লাভের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে সিয়াট্‌ল্ কেন্দ্র পোর্টল্যাণ্ড হইতে বেশী দূরে নয় বলিয়া স্বামী দেবাত্মানন্দের উদার ও প্রাণময় সঙ্গ এই দুই কেন্দ্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করিয়াছিল। সিয়াট্‌লের ভক্ত ও বন্ধুগণ স্বামী দেবাত্মানন্দের বিয়োগব্যথা গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন।

সর্বশেষে স্বামী অশেষানন্দ স্বামী দেবাত্মানন্দের অনুসৃত আধ্যাত্মিক আদর্শের উল্লেখ করিয়া ভক্ত ও বন্ধুগণকে আশা ও উৎসাহের সহিত অকুণ্ঠিতভাবে নিজ নিজ ধর্মজীবনের সহিত সমিতির কার্যে অবহিত হইবার কথা বলেন।

মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা প্রণীত; রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৭৭, মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

১৯৫২ খৃঃ নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসরেই ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ভগিনী নিবেদিতার একখানি প্রামাণিক জীবনী প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতি সাবধানতা সহকারে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এই মূল্যবান জীবনীগ্রন্থ রচিত। ভগিনী-সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থগুলির এবং বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের অল্পবিস্তর সমালোচনাও এই গ্রন্থে আপনা হইতে আসিয়া গিয়াছে, কারণ ভগিনী-সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণা ও কল্পনা নানা মহলে প্রচলিত। এক, দুই ক্রমে একচল্লিশটি অধ্যায়ে গ্রন্থ সম্পূর্ণ; ভগিনী নিবেদিতার জীবনের ক্রমবিকাশ ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১১খানি চিত্র ও শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত দুইখানি নকসা পুস্তকটির অলঙ্কার। লেখিকা 'ব্রহ্মচারিণী আশা' নামে উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকার নিকট সুপরিচিতা।

বিবিধ সংবাদ

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা লিপিবদ্ধ করিতেছি যে গত ২১শে জানুআরি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দেশজননীর নীরব সেবক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ নিউ আলিপুরে তাঁহার নিজ বাসভবনে মাত্র ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হয়। প্রায় দুই মাস পূর্বে দিল্লীতে তাঁহার শরীরে একটি অস্ত্রোপচার করা হয়, এবং ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতায় আসিয়া অবধি তিনি শয্যাগতই ছিলেন।

১৮৯৪ খৃঃ পুরুলিয়ায় অভ্র-ব্যবসায়ী রামচন্দ্র ঘোষের তৃতীয় পুত্ররূপে জ্ঞানেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে গিরিডিতে পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি মেধাবী ছাত্ররূপে পরিচিত হন। শেষোক্ত স্থানেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে গবেষণা-কার্যে উৎসাহিত করেন। ১৯১৫ খৃঃ এম. এস-সি পাস করিবার পরই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। Abnormality of strong electrolytes বিষয়ক তাঁহার গবেষণা বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৯১৮ খৃঃ জ্ঞানেন্দ্র ইংলণ্ড যাত্রা করেন। প্রথমে সেখানে এবং পরে জার্মানিতে তিনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২১ খৃঃ ঢাকায় নবপ্রতিষ্ঠিত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে উহা গড়িয়া তুলিতে থাকেন।

ক্রমে ক্রমে ভারতের বিজ্ঞান-জগতে বিভিন্ন বিশিষ্ট ভূমিকায় তাঁহার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। ১৯২৪ খৃঃ ভারতের রসায়ন-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া পর বৎসর তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন-বিভাগের সভাপতি হন; অতঃপর ১৯৩৯ খৃঃ ঐ মহাসভার মূল সভাপতি নির্বাচিত হন।

বাঙ্গালোর বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের (১৯৩৭-৪৭)

ও খড়্গপুর টেকনোলজির পরিচালক (১৯৫০-৫৪), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৫৪-৫৫) এবং পরিশেষে ১৯৫৫ খৃঃ প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার তিনি কৃতিত্বের সহিত বহন করিয়াছেন।

তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে দেশ যে শুধু একজন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক হারাইল তাহা নয়—হারাইল একজন শিক্ষাবিদ্, কর্মবীর, কল্যাণ-ব্রতী ও আদর্শবাদী মানুষ। এতগুলি গুণের একত্র সমাবেশ যে কোন দেশে যে কোন কালে দুর্লভ। আমরা তাঁহার মহান্ আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

পরলোকে ভক্ত ভূপতিচন্দ্র দাশগুপ্ত

গত ১২ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার ভোরবেলা (২৮.১১.৫৮) ৮৫ বৎসর বয়সে ভক্ত ভূপতিচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় কলিকাতা বকুলবাগান রোড-স্থিত বাটীতে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

যৌবনে আইন পড়া ছাড়িয়া তিনি গ্রামসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। হাই স্কুল, প্রাইমারী স্কুল, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও পথ ঘাট দীঘি ইত্যাদি তাঁহার বহু লোকহিতকর কার্যের নিদর্শন এখনও গ্রামে গ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রতিও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল।

তাঁহার ধর্মপিপাসু মন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। ১৯১৫ খৃঃ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ বিক্রমপুর-কলমায় ভূপতিবাবুকে দেখিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য এই গৃহযোগী ধর্মচর্চা ও ভক্তসেবাদিতেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাঁহার প্রতি বরাবর বিশেষ প্রীতি পোষণ করিতেন। পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি কলমা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন। কোন দুঃখকষ্টই তাঁহার মনকে অবসন্ন করিতে পারে নাই। সংসারী হইয়াও চিরকাল সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘকাল রোগভোগ করিয়াও তাঁহার মুখে কষ্টের চিহ্নমাত্র দেখা যায় নাই। মাত্র ৮ মাস পূর্বে তাঁহার সাধ্বী সহধর্মিণী পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে শাশ্বত শান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

উৎসব-সংবাদ

বারাসতঃ গত ৫ই হইতে ১১ই জানুআরি সপ্তাহব্যাপী মহাপুরুষ মহারাজের ১০৩তম জন্মোৎসব তদীয় জন্মস্থান ২৪ পরগনা জেলার বারাসত-স্থিত শিবানন্দধামে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ষোড়-শোপচারে পূজা, শিবমহিম্নস্তোত্র ও চণ্ডীপাঠ, শিবানন্দবাণী-আলোচনা, ভজন, কীর্তন, কথকতা, শোভাযাত্রা, প্রসাদ-বিতরণ, জনসভায় বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিদিন বহুসংখ্যক নরনারী যোগদান করেন এবং অন্যূন ১৬,০০০ লোক বসিয়া প্রসাদ পান। বিভিন্ন দিনে বহু সাধু ও ভক্ত পাঠ আলোচনা ও কথকতায় অংশ গ্রহণ করেন।

হাফলং (আসাম): শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরুরূপে আবির্ভাব-দিনে—১লা জানুআরি জনসাধারণের পক্ষ হইতে সমিতির আবাসিক ছাত্রাবাসে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য জন্মতিথিও সারাদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠানের ভিতর উদ্‌যাপিত হয়। প্রভাতে মঙ্গলারতি, ভজন-সঙ্গীত, পূজার্চনা হোমাদি, কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, সর্বসাধারণে

প্রসাদ-বিতরণ, অপরাহ্নের জন-সভা সমগ্র হাফলং শহরকে আনন্দমুখর করিয়া তুলিয়াছিল।

তেজপুর : গত ১লা জানুআরি তেজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথি উৎসব ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব পূর্বাহ্ণে চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও শতাধিক ভক্তগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ দ্বারা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সায়াহ্নে আরতির পর এক মহতী ধর্মসভায় সভাপতি শ্রীচন্দ্রনাথ শর্মা ও শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা আলোচনা ও কল্পতরু উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

সংস্কৃতি-সংবাদ

প্রাচ্য-বাণী : গত ১০ই জানুআরি কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কার্যবিবরণীতে ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী বলেন গত ডিসেম্বর মাসের প্রাচ্যবাণী মন্দির হইতে 'শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্বম্' এবং 'ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্' নামক সংস্কৃত নাটক—এই দুইটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সর্বসমেত প্রাচ্যবাণী-প্রকাশিত গবেষণা-গ্রন্থের সংখ্যা ১৬০। প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত-সঙ্গীত-মহাবিদ্যালয়; সংস্কৃত-ভাষণ-পরিষদ এবং মহিলা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় বিশেষভাবে সংস্কৃত শিক্ষার সম্প্রসারণের কাজে রত রহিয়াছে। এই সভায় ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী-রচিত 'শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-হরিদাসম্' নামক সংস্কৃত নাটক বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৭শে ফাল্গুন (১১.৩.৫৯) বুধবার শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে বেলুড় মঠে ও সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার ১লা চৈত্র (১৫.৩.৫৯) এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী মহোৎসব হইবে।

উৎসবে ও নিত্যপ্রয়োজনে
শতাব্দীর সুপরিচিত
লক্ষ্মীবিলাস
সর্ব্বঋতুর উপযোগী তৈল
এম,এল,বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস • কলিকাতা-৯

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সরল রাজযোগ—৪র্থ সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি বুলের বাড়ীতে কয়েক জন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্ত্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ৷৷৹ আনা।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। ১০২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামিজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোযিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজান হইয়াছে। পরিচয় এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবিসম্বলিত। মূল্য ১ম ভাগ ৫৲ ও ২য় ভাগ ৪৷৷৹ আনা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪৷৷৹ ও ৪৷৹।

ভারতে বিবেকানন্দ—১২শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামীজির ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৬৩৫ পৃষ্ঠা মূল্য ৫৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪৷৷৶৹ আনা

দেববাণী—৭ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্রদ্বীপোদ্যান' নামক স্থানে কয়েক জন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন তাহার একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ২২৭ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৸৶৹ আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহিত অংশসমূহ বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সন্নিবেশিত। মূল্য ২৷৹ আনা।

বিবেক-বাণী—১৬শ সংস্করণ। আচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজীর উপদেশাবলী। স্বামীজির বাষ্টসম্বলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। মূল্য ।৶৹ আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামীজির ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷৹ আনা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৶৹ আনা।

ভারতীয় নারী—১২শ সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান আদর্শ, পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজির মনোরম ছবি-সম্বলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷৹ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৶৹ আনা।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান—৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৩ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদান্ত-মত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে আর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ—যে গুলি না বুঝিলে ধর্ম জিনিষটাকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ১৷৷৹ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৶৹ আনা।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৩শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়ভরতের-উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্য গণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট ও ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। মূল্য ১৷৹ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৶৹ আনা।

সন্ন্যাসীর গীতি—১৩শ সংস্করণ। স্বামীজি-রচিত 'Song of the Sannyasin' নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৶৹ আনা।

পওহারী বাবা—৯ম সংস্করণ। গাজীপুরের বিখ্যাত মহাত্মা পওহারী বাবার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। স্বামীজির হাফটোন ছবিযুক্ত। মূল্য ৷৷৹ আনা।

হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ—৫ম সংস্করণ, ৯০ পৃষ্ঠা। ইহাতে হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা, হিন্দুধর্মের ক্রমাভিব্যক্তি, ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর ও ডাঃ পল ডয়সেন সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মূল্য ৸৹ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৷৷৶৹ আনা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৪র্থ সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ।৶৹; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ।৴৹ আনা।

অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৪র্থ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। এই পুস্তক পাঠে চরিত-কথার কল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। মূল্য ১।০ আনা।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৪র্থ সংস্করণ; আচার্য্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲ মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা—১ম সংস্করণ। স্বামী অরূপানন্দ প্রণীত। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা পুস্তক হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা।

ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন কথা। মূল্য ২৲ টাকা।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—২য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩॥০ আনা।

শিবানন্দ-বাণী—১ম ভাগ—৫র্থ সংস্করণ, ২য় ভাগ—২য় সংস্করণ স্বামী অপূর্ব্বানন্দ-সঙ্কলিত মূল্য প্রতি ভাগ ২॥০ আনা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। প্রথম ভাগ—(ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর) ৫ম সংস্করণ। দ্বিতীয় ভাগ—(ছান্দোগ্য) ৩য় সংস্করণ। তৃতীয় ভাগ—(বৃহদারণ্যক) ৩য় সংস্করণ। ইহাতে উপনিসদের মুল, সংস্কৃত, অন্বয়মুখে বাংলা প্রতিশব্দ, সরল বঙ্গানুবাদ এবং আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যানুযায়ী দুরূহ বাক্যসমূহের টীকা প্রভৃতি আছে। সুদৃশ্য ছাপা, কাপড়ের মনোরম বাঁধাই, ডবল ক্রাউন—১৬ পেজি, প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য—প্রতি ভাগ ৫৲ টাকা।

সাধু নাগ মহাশয়—৮ম সংস্করণ। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ১॥০ আনা মাত্র।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত) অতুলনায় সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত 'গোপালের মা' এর সংক্ষিপ্ত আদর্শ জীবনের কাহিনী। মূল্য ॥০ আনা।

নিবেদিতা—১২শ সংস্করণ। শ্রীমতী সরলা বালা দাসী-প্রণীত। স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা। মূল্য ৸০ আনা।

সৎকথা—স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত—৩য় সংস্করণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ (শ্রীলাটু) মহারাজের উপদেশাবলীর সংকলন। মূল্য ২৲ টাকা।

যোগচতুষ্টয়—স্বামী সুন্দরানন্দ-প্রণীত। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগের সংক্ষিপ্ত সরল বিবরণ। মূল্য ২৲ টাকা।

বেদান্তদর্শন—১ম খণ্ড—চতুঃসূত্রী। শাঙ্কর ভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ, রত্নপ্রভা টীকা, ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্বলিত। প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ টাকা।

স্তবকুসুমাঞ্জলি—৫ম সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত—বৈদিক শান্তিবচন, সূক্ত, প্রার্থনা ইতাদি বিবিধ সংস্কৃত স্তোত্রাদির অপূর্ব্ব সঙ্কলন। সংবাদপত্রসমূহে উচ্চ প্রশংশিত। মূল সংস্কৃত, অন্বয়, অন্বয়মুখে সংস্কৃতের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং মূলের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৩৲ টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৫ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ॥৵০ আনা।

আগে চলো—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। কিশোরদের জন্য লেখা। তরুণমনে সুনীতি, দেশাত্মবোধ, সেবা, আদর্শনিষ্ঠা এবং ধর্মপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক যৌবনোমুখ ছেলেমেয়েকে এই বইখানি পড়িতে দেওয়া উচিত। মূল্য ১॥০।

হিন্দুধর্ম পরিচয়—১ম ও ২য় ভাগ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সরল কথায় হিন্দুধর্মের মুখ্য বিষয়গুলির সহিত পরিচিত চেষ্টা এই বই দুখানিতে করা হইয়াছে। মূল্য ১ম ভাগ ॥০ আনা, ২য় ভাগ ৸০ আনা।

দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য ও পূজা-পদ্ধতি—স্বামী কৈবল্যানন্দ-প্রণীত। মূল্য ১ম ভাগ (পরিবর্দ্ধিত ৪র্থ সংস্করণ ৸০, ২য় ভাগ (৩য় সংস্করণ) ১॥০।

ঠাকুর এবার এসেছেন

ধনী, নিধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। এবার বাঁশ ও ঘাস ছাড়া যার ভেতরে একটু সার আছে সেই চন্দন হবে। তোমাদের ভাবনা কি?...

সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ-মন ভাল থাকে।...কাজ করতেই হয়। কর্মেই কর্মপাশ কাটে। কাজ ছাড়া থাকা ঠিক নয়।............

—শ্রীমা

● ● ●

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী অন্বয়ানন্দ; ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, এম. আই. প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

Udbodhan-Phone : 55-2447 : : February 1959 : : Regd. No. C. 295

সম্পাদক—স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা—৩

৬১তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৬৫

বার্ষিক মূল্য ৫৲
প্রতি সংখ্যা ।৷০

উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৬৫

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

কাশি!
তাড়াতাড়ি আরাম
আর
নিরাময়ের জন্য
COUGH
SYRUP
বি. আই. কফ সিরাপ
বেঙ্গল ইমিউনিটি

ডায়া-পেপসিন্
হজমশক্তি
বজায় রেখে
স্বাস্থ্যের
উন্নতি করে
ইউনিয়ন ড্রাগ • কলিকাতা

শিক্ষান্তে উপদেশ

বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি—সত্যং বদ। ধর্মং চর।
স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ …সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্।
কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্।
স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্॥ দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।
মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব।
অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি।
নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি॥
নো ইতরাণি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্।
শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।…
এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ।
এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ১।১১।১—৪

বেদ অধ্যাপনান্তে আচার্য শিষ্যকে বেদার্থ গ্রহণ করাইতেন : সত্য বলিবে, ধর্ম আচরণ করিবে। অধ্যয়নে ভুল করিবে না।··সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না। ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না। আত্মরক্ষা-বিষয়ে অবহিত হইও। শ্রীবৃদ্ধিজনক শুভ কর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনাবিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত হইও না। দেবকার্য ও পিতৃকার্যে ভুল করিও না। মাতা, পিতা, আচার্য ও অতিথিকে দেবতা জ্ঞান করিবে। যে সকল কর্ম অনিন্দিত তাহাই অনুষ্ঠান কর, অপরগুলি নহে। আমাদের যাহা সদাচার তাহাই তোমার অনুষ্ঠেয়, অপরগুলি নহে। শ্রদ্ধাসহকারে বিনম্রভাবে শাস্ত্রভয়ে বন্ধুভাবে দান করিবে।···

ইহাই বিধি, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদের রহস্য, ইহাই ঈশ্বরাজ্ঞা। এই প্রকারেই সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান করিবে।

কথাপ্রসঙ্গে

শিক্ষায় ধর্ম

প্রতি বৎসরের মতো এবারও যথানিয়মে যথাসময়ে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। হয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, না হয় কোন রাজ্যের রাজ্যপাল সভাপতিরূপে সুচিন্তিত ভাষণের মাধ্যমে নূতন স্নাতকদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেশবাসীকে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, কোন কোন ভাষণে গঠনমূলক ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়াছে।

সমাবর্তন-উৎসব ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা-সংস্থার ও কয়েকটি শিক্ষক-প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সম্মেলনে বিশিষ্ট নেতারা আহূত হইয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তন্মধ্যে জানুআরির মাঝামাঝি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ-সমিতির (Central Advisory Board of Education) ২৬তম সভা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এইখানে আলোচিত হইয়াছে শিক্ষার ক্ষেত্রে আশু পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার ও আসন্ন পুনর্গঠনের কথা—যাহার ফল জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী

এতদ্ব্যতীত কয়েকটি কমিশনও শিক্ষক, ছাত্র এবং শিক্ষার ব্যাপার লইয়া অনেক তথ্য অনুসন্ধান করিয়াছেন ও তাঁহারা প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনার বিষয় প্রধানতঃ ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও শিক্ষকদের আর্থিক অসন্তোষ।

এইগুলি সব দেখিয়া শুনিয়া পড়িয়া মনে হয়, সকলেই বুঝিতেছেন শিক্ষা ঠিক পথে চলিতেছে না, কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক রহিয়া যাইতেছে—যাহা বক্তৃতা দিয়া, প্রবন্ধ লিখিয়া, এমন কি টাকা ঢালিয়াও পূর্ণ করা যাইতেছে না। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধান, ধনী-দরিদ্রের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান বিরাট দৈত্যের মতো মুখব্যাদান করিতেছে।

পরিতাপের বিষয় 'মেকলে'-প্রবর্তিত কেরানি-সৃষ্টিকারী শিক্ষাই এখনও চালু রহিয়াছে। প্রাণপণ পড়িয়া, মুখস্থ করিয়া, যথাসর্বস্ব খরচ করিয়া কেহ বা পরীক্ষায় সফল হইয়া এবং অধিকাংশই বিফল হইয়া জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, কিন্তু যুঝিতে পারিতেছে না। স্কুল বা কলেজ তাহাকে যে শিক্ষা দিয়াছে তাহাতে তথ্য হিসাবে বহু কিছু জানিবার (informations) থাকিলেও জীবন-সংগ্রামে কাজে লাগাইবার বিশেষ কিছু নাই। কেবল একটা ব্যর্থতা ও হতাশা জাতীয় জীবনকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে, বিকাশ-উন্মুখ মনকে পঙ্গু করিতেছে।

শিক্ষকদের অসন্তোষ, ছাত্রদের বিক্ষোভ ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না। সর্বোপরি দেখা দিয়াছে শিক্ষার ক্ষেত্রেও দুর্নীতি! সমাজে যখন দুর্নীতি দেখা দেয়, তখন তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করা হয় শিক্ষার স্তর হইতে। ইহাতে পরবর্তী পুরুষ (generation) দুর্নীতি-মুক্ত হয়। কিন্তু যখন শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই বীজাণু প্রবেশ করে, তখন কি উপায়?

মানুষ থাকিলেই সমাজ থাকিবে, রাষ্ট্রও থাকিবে; এবং সমাজ ও রাষ্ট্র থাকিলে চিরকাল তাহা সুষ্ঠুভাবে চলিবে, এমন কোন কথা নাই বা নিয়ম নাই। সমাজ বা রাষ্ট্র এক একটি যন্ত্রের মতো, তাহা চালায় মানুষ; অতএব তাহাদের সুপথে বা বিপথে চলা নির্ভর করে

চালক মানুষের উপর। যন্ত্র কালক্রমে যখন বিকল হইয়া যায়, তখন মানুষই তাহা সারাইয়া লয়, অথবা পুরাতনকে বাতিল করিয়া নূতন যন্ত্র সৃষ্টি করে। সে জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুশিক্ষিত মানুষ—সচেতন মানুষ।

সেই মানুষ দেখিবে সমাজের উত্থান ও পতন; লক্ষ্য করিবে রাষ্ট্রের উন্নতি ও অবনতি; উহাদের কারণ অনুসন্ধান করিবে, তাহার পর অবনতির কারণগুলি এবং উন্নতির বাধাগুলি অপসারিত করিয়া জাতিকে ও সমাজকে আবার অগ্রগতির পথ ধরাইয়া দিবে। এইরূপ মানুষ যে দেশে, যে সমাজে যত বেশী—সেই দেশ ও সমাজ তত সহজে সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে পারে। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষা—ব্যাপক শিক্ষা, গভীর শিক্ষা।

* * *

বর্তমানে আমাদের দেশে রাজনীতিক স্বাধীনতাসত্ত্বেও কেন সকলে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছে না, কেন বিক্ষোভ প্রশমিত হইতেছে না, কেন দুর্নীতি জাতীয় জীবনের সর্ব স্তরে বিষক্রিয়া করিতেছে—এগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার না করিয়া—এগুলির কারণ অনুসন্ধান আবশ্যক। কোন কোন স্বয়ংসন্তুষ্ট নেতার মতে এগুলি সাময়িক, এবং দীর্ঘ দিন পরাধীন থাকিবার পর স্বাধীনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ! —কতকটা চিররুগ্‌ণের সহসা স্বাস্থ্যলাভের মতো। এগুলির জন্য চিন্তার কিছু নাই।

আরও চিন্তাশীল লোক দেশে আছেন, তাঁহারা জিনিষটিকে অন্য ভাবে দেখেন। ঠিক কথা, দীর্ঘ দিনের পরাধীনতা জাতীয় জীবন জর্জরিত করে, কিন্তু ভারতের অধিকাংশই তো কয়েক শত বৎসর পরাধীনতায় পাথরচাপা ছিল, কিন্তু এরূপ নীচতা নিষ্ঠুরতা অসাধুতা দুর্নীতি স্বার্থপরতা—এত ব্যাপকভাবে কখন দেখা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, বরং ত্যাগ শৌর্য বীর্যের কাহিনীচ্ছটায় কলঙ্কিত-চন্দ্রও রাত্রির নীরবতা আলোকিত করিয়াছে। তবে আজ এই নব-যুগের উদিত-সূর্য রাহুগ্রস্ত কেন?

কোন কোন চিন্তাশীল মনীষীর মতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়াছে। আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে প্রবেশ করিব না। শুধু স্মরণ করিব সেই সময়কার অসহায় বিপন্ন অনিশ্চয়তার অবস্থা। মনোবিজ্ঞানের অভিমত: যে সকল শিশু শান্তিপূর্ণ সংসারের প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে কর্তব্যরত পিতামাতার স্নেহক্রোড়ে একটি নিশ্চিন্ত নিশ্চিত আশ্রয়ে লালিত পালিত হয়, তাহারাই শিক্ষায় দীক্ষায় ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। অপর পক্ষে যে গৃহে কেবল কলহ, পিতামাতায় মনান্তর, সন্তান-পালনে অবহেলা, সেখানে শিশু নিজেকে সর্বদা অবহেলিত অসহায় বিপন্ন অনুভব করে; সে ক্রমশঃ বড় হইয়া সকলকে অবিশ্বাস করে, অপরের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে, প্রতারণা করে, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সংসারে ও সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াই আনন্দ লাভ করে। এইরূপ অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে সমাজে তাহার অশুভ ফল অবশ্যই ব্যাপক হইয়া দেখা দিবে।

প্রাচীন কাল হইলে বলিতাম ত্রিকালদর্শী ঋষিরা সমাজ-নিয়ম রচনা করেন, এখন বলিতে হইবে বিশেষজ্ঞেরা পরিসংখ্যান রচনা করিয়া বলিয়া দেন: কি জন্য কি হইয়াছে; আবার কি করিলে কি হইবে।

সমাজ-শরীরকে পূর্বোক্ত ব্যাধিগুলি হইতে মুক্ত করিবার জন্য শুধু ঘরে বাইরে শান্তির বাণী প্রচার করিলেই চলিবে না, তাহা হইলেই যুদ্ধ ও তাহার আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলি দূরীভূত হইবে না, শান্তির জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করিলেও নয়, সর্বশেষ বলিতে পারি প্রবন্ধ লিখিয়াও নয়। তবে? তবে কি কোন উপায় নাই?

কেহ কেহ সমরায়োজন ব্যর্থ করিবার জন্য নৈতিক বর্ম-পরিধানের আন্দোলন (Moral re-armament movement) চালান। তাহাও শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে অহিংসাবাদীরাও যুদ্ধকে সমর্থন করে। শান্তিবাদীরাও ন্যায়ের পক্ষ বলিয়া এক পক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং আবার অশান্তির দাবানল জ্বলিয়া উঠে! এই অনিশ্চয়তা, এই অশান্তিই বর্তমানের ব্যাধি। ইহারই জন্য মানুষ দু-দিনে দু-বছরের ভোগ শেষ করিতে চাহিতেছে, ইহারই জন্য একজন পাঁচজনের ভোগ্য বস্তু কাড়িয়া হউক, প্রতারণা করিয়া হউক একা ভোগ করিতে চাহিতেছে। তদুপরি কথা এই, একজনের দেখিয়া আবার দশজন শিখিতেছে। সংক্রামক ব্যাধির মতো ইহা ছড়াইয়া পড়িতেছে। কে রোধ করিবে? সকলেই অল্পবিস্তর রোগাক্রান্ত!

তবে কি সবই ধ্বংসের পথে? না বাঁচিবার উপায় আছে? সংক্রামক রোগে মৃত্যুমুখে উপনীত পিতা সন্তানকে কোন নিরাপদ স্থানে সরাইয়া দেন, সেখানে গিয়া সে বাঁচিয়া থাকুক; নিমজ্জমানা জননীও শেষ পর্যন্ত সন্তানকে বক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া স্রোতের মুখে ছাড়িয়া দেন—যদি সে বাঁচিয়া যায়।

* * *

গত মহাযুদ্ধজনিত আতঙ্কের ও ঘোরতম দুর্নীতির সময়—কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, কি আর্থনীতিক ক্ষেত্রে আইন অমান্য করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, পরে আর কেহ ঐ বৃত্তিকে সংযত করিতে পারে নাই, আজ সমাজ তাহারই বিষময় ফল ভোগ করিতেছে। তার পর দেখা দিয়াছে দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গা; সমাজ ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। অবশেষে অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়াছে দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা—এ যেন ডানা ভাঙিয়া দিয়া পাখীকে পিঞ্জর হইতে মুক্তি দেওয়া হইল! দশটি বৎসরের মধ্যে এতগুলি বড় বড় ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করা সুদৃঢ়স্নায়ুর পক্ষেও দুঃসহ। দুর্বল জাতির জীবনের তন্তু ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্বের আঘাত-পরম্পরার পর কথঞ্চিৎ বিরাম ও বিশ্রাম পাইলে হয়তো নব নব পরিবর্তনের আবেগ দেশ সহ্য করিতে পারিত। যদি ধীরে ধীরে তলদেশ হইতে—প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হইতে, দরিদ্র শ্রমিক-কৃষকের স্তর হইতে দেশের উন্নতি-পরিকল্পনা শুরু করা হইত, তবে হয়তো এতদিনে সকল আঘাতের ব্যথা দূর হইয়া যাইত।

এ কর্তব্য এখনও পড়িয়া রহিয়াছে, এখান হইতেই কাজ শুরু করিতে হইবে। দেশবাসীর অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই প্রাথমিক কর্তব্য; আমদানী-রপ্তানী, বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও দেশ-বিদেশের প্রশংসা অর্জন তাহার পরবর্তী কর্তব্য। কিন্তু আমরা পরেরটিকে ধরিয়াছি আগে, দশ বৎসরের মধ্যে পঁচিশ বৎসরের কাজ করিয়া স্বীয় কীর্তি অর্জন করিতেই আমরা ব্যস্ত, কিন্তু কতগুলি জীবনের মূল্যে যে ইহা সম্ভব হইতেছে তাহা ভাবিবার সময় আমাদের নাই। এই সময়াভাবের ভাব, এই তাড়াতাড়ি কিছু করিবার ইচ্ছা—ইহাও বর্তমানের আর একটি ব্যাধি।

দশম শতাব্দীতে ঘুমাইয়া হঠাৎ আমরা বিংশ শতাব্দীতে জাগিয়া উঠিয়াছি; লিভায়াথানের ঘুম এখনও সম্পূর্ণ ভাঙে নাই। পরিকল্পনার সঙ্গীতে এ ঘুম ভাঙানো যায় না, এজন্য প্রয়োজন জনগণের প্রতি নেতাদের সহিষ্ণু সহানুভূতি ও প্রাত্যহিক সহযোগিতা। যাহা হইবার হইয়াছে, এখন যাঁহারা বিবিধ ক্ষেত্রে কার্যভার লইয়া আছেন, তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য যাহাতে ভবিষ্যৎ পুরুষ (generation) মানুষ হইয়া উঠে, তাহারাও যেন অবহেলিত না

হয়। তাহার জন্য প্রাথমিক স্তর হইতে এই মানুষ গঠনের শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষাকে শুধুমাত্র জীবিকার উপযোগী করিয়া চালু করা ঠিক নহে; কিন্তু আজ শিক্ষায় যে পরিবর্তন আসিতেছে, তাহার মূল লক্ষ্য এই দিকেই। পক্ষান্তরে বলিতে চাই, ছাত্রকে যদি একটি পরিপূর্ণ 'মানুষে' পরিণত করা যায়, তবে সে জীবনে যে কোন অবস্থাতেই পড়ুক না কেন, সে সদ্‌ভাবে জীবিকা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে। নতুবা আজিকার ছাত্র যেমন এম্. কম্ পাস করিয়া ক্ষুদ্র ব্যবসাও করিতে পারে না, ব্যবসায়ীর হিসাব রাখিয়াই সন্তুষ্ট হয়; এম. এস-সি পাস করিয়া ইলেকট্রিক লাইনে হাত দিতে ভয় পায় এবং অসন্তুষ্টচিত্তে মাষ্টারি খোঁজে—আগামী কালও দেখা যাইবে টেক্‌নিক্যাল্ পাস করিয়া যুবকেরা না করিবে ছুতারের কাজ, না করিবে কামারের কাজ, তাহারা চাহিবে টেবিল চেয়ার ও মাথার উপর বিজলী পাখা—তাহারা খুঁজিবে অফিসারের কাজ।

প্রকৃত মানুষের লক্ষণ আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা। জীবন্ত মানুষের লক্ষণ সংগ্রাম-শীলতা। শিক্ষিত মানুষের লক্ষণ সাধুতা ও কর্তব্য-পরায়ণতা। আগামী দিনের ছাত্রদিগকে যদি আমরা এগুলি শিখাইতে পারি, তবেই তাহাদের মানুষ হইবার শিক্ষা দেওয়া হইবে; তবেই তাহারা হাতের কাছে যে কাজ পাইবে তাহাই করিবে, কোন কাজ ঘৃণা করিবে না, কোন কাজ ছোট মনে করিবে না। একদিকে যেমন তাহারা ঐ সকল কাজ করিবে জীবন ও জীবিকার তাগিদায়, অন্য দিকে তেমনই করিবে আনন্দে ও কর্তব্যবোধে, দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথে আমিও কিছু করিতেছি—এই গৌরববোধে।

* * *

সম্প্রতিকালের ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা, কর্মচারীদের কর্তব্য-অবহেলা, সকলের—বিশেষত ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি সবই এক সূত্রে গাঁথা। কোন কোন মনীষীর মতে ধর্মভাব-বিলুপ্তিই ইহার কারণ; নীতি ও ধর্মমূলক শিক্ষা দিলেই এ সকল সমাজ-ব্যাধি বিদূরিত হইবে। ইহার উত্তরে দুইটি প্রশ্ন করিতে হয়।

(১) যে সব রাষ্ট্র তথাকথিত ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সেখানে কি দুর্নীতি নাই?

(২) ভারতের ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় কি যথেষ্ট পরিমাণে ধর্ম আচরণ করে না?

প্রশ্নদুইটির উত্তর সকলেরই জানা। অতএব সমস্যার সমাধানে আমাদের যাইতে হইবে আর একটু গভীরে।

প্রকৃত ধর্ম কাহাকে বলে? সাধারণতঃ ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হয় সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস, নয় কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান, অথবা এই দুই-এর সমাবেশ। ঐগুলি এক সময়ে অনেক কাজ করিয়াছে; আদিম মানবকে, বন্য বা বেদুইনকে কতকটা সংযত করিয়াছে, কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানযুগের জটিল মানব ঐসকল বিশ্বাস ও আচার হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেছে, ফলে অবশ্য তাহাকে নূতন কতকগুলি নিয়ম, আচার ও বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে হইতেছে; তাহার নাম সে 'ধর্ম' না দিক অন্য কিছু দিবে। কালক্রমে তাহাই আবার ধর্মের স্থান অধিকার করিবে ও নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবে।

সর্বসংস্কারমুক্ত অসাম্প্রদায়িক ধর্ম কিছু আছে কি—যাহা সর্বাবস্থায় সর্বদেশে সর্বকালে সকলকে শিক্ষা দেওয়া যায়—এবং সে শিক্ষা তাহার উপকারই করিবে, একটি মানুষকে একটি উৎকৃষ্টতর মানুষে পরিণত করিবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয়, হ্যাঁ—এরূপ ধর্ম আছে। চিরদিনই আছে, সূর্যের মতো

পুরাতন সেই মানব-ধর্ম! সূর্যেরই মতো উজ্জ্বল! তবে মাঝে মাঝে সূর্যেরই মতো উহা মেঘাচ্ছন্ন হয়, আবার মেঘ সরিয়া গেলে উহার আলোকে আকাশ উদ্‌ভাসিত হয়। ইহা সেই উপনিষদের আত্মতত্ত্ব—যাহার কথা পিতা পুত্রকে বলিয়াছেন, স্বামী স্ত্রীকে বলিয়াছেন, মাতা শিশুকে শুনাইয়াছেন; যাহার কথা রাজা প্রজাকে বলিয়াছেন, গুরু শিষ্যকে, বন্ধু বন্ধুকে বলিয়াছেন। এই আত্মতত্ত্ব বৃদ্ধ-যুবা-শিশু, স্ত্রী-পুরুষ সকলের জন্য, সকলের মঙ্গলের জন্য! আত্মবিজ্ঞান সকল শক্তির উৎস। এই জ্ঞানের আভাস মাত্র পাইলে হৃদয় হইতে সকল দুর্বলতা চলিয়া যায়, সেই সঙ্গে চলিয়া যায় সকল প্রকার ভয় ও নীচতা, স্বার্থ ও সংকীর্ণতা, সকল প্রকার অসংযম ও দুর্নীতি। তাহার স্থানে দেখা দেয় শান্ত সংযত নির্ভীক উদার প্রকৃতির এক মানুষ—এক নূতন মানুষ, যাহার প্রয়োজন আজ আমাদের ঘরে ঘরে।

শিক্ষা—কি ও কেন?

কেহ কতকগুলি পরীক্ষা পাস করিয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতে পারিলেই তোমরা তাহাকে শিক্ষিত মনে কর। যাহা জনসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের যোগ্য হইতে সহায়তা করে না, তাহাদের মধ্যে চরিত্রবল, লোকহিতৈষণা এবং সিংহের মতো সাহস উদ্‌বুদ্ধ করে না, তাহা কি শিক্ষা নামের যোগ্য?

শিক্ষা কি পুঁথিগত বিদ্যা?—না। নানা বিষয়ের জ্ঞান? না—তাহাও নহে। ইচ্ছাশক্তির প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাকে ফলপ্রসূ করিবার শক্তি অর্জন করাই প্রকৃত শিক্ষা। যথার্থ শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ-সংগ্রহ বুঝায় না, বুঝায় মেধা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলির পরিস্ফুরণ।—অথবা বলা যাইতে পারে যে মানুষের ব্যক্তিগত সংকল্পগুলিকে সৎ এবং কার্যকারী করিয়া গড়িয়া তুলিবার পদ্ধতিই প্রকৃত শিক্ষা।

মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা স্বতই বর্তমান, তাহারই বিকাশের নাম শিক্ষা।... শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি যথার্থ কার্যকারী জ্ঞান-অর্জন; বর্তমান পদ্ধতি যাহা পরিবেষণ করে, তাহা নহে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় চলিবে না। আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার, যাহা দ্বারা চরিত্র-গঠন হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয়, এবং মানুষ স্বাবলম্বী হইতে পারে। চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত বেদান্তের সমন্বয়—ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস হইবে যাহার মূলমন্ত্র।

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান করিবার সামর্থ্যলাভ।... আমি মনে করি ধর্মই শিক্ষার অন্তরতম অঙ্গ। জাতির সমগ্র লৌকিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভার আমাদের নিজেদের হাতে রাখিতে হইবে, এবং যতদূর সম্ভব উহা জাতীয় ধারায় এবং জাতীয় প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

—বিবেকানন্দ

চলার পথে

'যাত্রী'

আদেশ ও আদর্শ। কোন্‌টাকে ধরে পথ চলব? প্রশ্নটা আধুনিক নয়, আবহমান কালের।

যখন শিশু ছিলাম তখন কান্নাই ছিল চরম আবেদন পত্র, তখনকার সেই রিক্ত প্রাণের ঘরে সেইটেই ছিল সবার সেরা সম্পদ। নিজের বিচার বুদ্ধি তখন ছিল শুদ্ধ; ইজম্ (-ism)-এর বিচার ছিল না তখন। আর ছিল না 'আমার' উন্মেষ; যে-'আমার' পরবর্তী জীবনে প্রশ্ন তুলেছে—আদেশকে মানবো, না আদর্শকে?

শিশুকালের সেই যুগে যখন পথ-চলার জন্য দাঁড়ানোটুকুও পর্যন্ত শিক্ষা করা হয়নি, তখন নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল 'আদেশে'র। সে 'আদেশ' তখন ছিল একান্ত স্বাভাবিক, সম্পূর্ণরূপে চলধর্মী। বিকাশ, ব্যাপ্তি ও বিবর্তনের সমগোত্র সে। স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে সে আদেশকে তখন মেনেছি, স্বাভাবিক মনে ক'রে তাকে ধরেছি, স্বায়ত্তবোধে তাকে আঁকড়ে রেখেছি। সূর্যের আদেশ-ছোঁয়ায় পদ্মের পাপড়ি যেমন ক'রে খোলে তেমনি সহৃদয় ছিল সে আদেশ। সেই ছোট্ট জীবনের বোবা নিঃসঙ্গতায় সেই প্রাণদ আদেশকেই ভিখারীর মত পা জড়িয়ে ধরেছিলাম, তাতে তখন ভুল হ'লে মানবত্বের আকুল হাসিটুকুই নিভে যেত যে!

কিন্তু তারপরে এল প্রশ্নের জীবন। তুলনামূলক প্রশ্নের কাঠি ঘসে ঘসে তখনকার সেই তিনবছরের শিশু দেশলাই জ্বালতে লাগল—চলার পথে নিশ্চল আলো জালাবার জন্য। তখন "হীরা হবে, স্বপ্ন দেখে, কয়লা গো"। সেই থেকেই সুরু তার নূতন বোধি, নূতন চেতনায় পথচলার ইঙ্গিত-সংগ্রহ। আদর্শ ও আদেশের অনুসন্ধান তখন থেকেই হয় আরম্ভ। আর সেই সঙ্গে আসে বিচার বিশ্লেষণ, মানা-না-মানার প্রশ্ন-কণ্টকিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিশেষ রূপ। এই জীবনেই তখন সে, আদেশকে ছেড়ে, আদর্শকে ধরে। এ কেন হয়?

ঘরে বদ্ধ ছিল একটা পাখী; ডানা ঝাপ্‌টে মরছিল সে কাচের বদ্ধ জানলায়। শেষে ছাড়া পেয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঐ বাইরের আকাশে—ঐ নীলিমার অতল পারাবারে। তুমি, আমি হাঁফ্ ছেড়ে বললাম, আহা! মুক্ত হয়ে গেল, চলে গেল সে তার অবাধ বিচরণের অজস্র বৈচিত্র্যে! কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝি—পাখিটি ঘর ছেড়ে নীলাকাশে উন্মুক্ত হ'ল বটে, কিন্তু নীলাকাশের বন্ধনটুকু থেকে ছাড়া পেল কি? একটা খাঁচা থেকে আর একটা বৃহত্তর খাঁচায় শুধু বন্দী হ'ল সে। ঘর ছেড়ে এসেও, তেমনি ভাবে, পৃথিবীতে আট্‌কে পড়ে যায় মানুষ। তাই বলি, স্বাধীনতা কোথায়? আর যদি স্বাধীন হয়েছি 'ভেবে' কোন আদর্শকে না মানতে চাই তাহলে ঐ 'ভাবা'রূপ কার্যটিকেই কেন তবে আঁকড়ে ধরে পরাধীন হচ্ছি? হয়তো সকল সম্বন্ধকে অস্বীকার ক'রে ভাবছি, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোন আদেশকে মানি না, মানি না কোন আদর্শকে। তখনও কিন্তু আমি প্রকৃতির কার্য-কারণের অধীন; আমার নিজস্ব মনের চিন্তার অধীন; আমার বর্তমান চিন্তা তার পূর্ববর্তী চিন্তার অধীন। এক কথায়, তখনও আমি দেশ-কাল-নিমিত্তের (Space-Time-Causation) অধীন। এই ত্রয়ীর মধ্যে আমরা আমাদের প্রবলতম স্বাধীন ইচ্ছা নিয়েও বাঁধা পড়েছি—কেবল সেই বন্ধনটুকুকে নিজের খেয়ালের মধ্যে না টেনে এনে ভুল ক'রে ভাবছি, আমি স্বাধীন!

সহজভাবে এতে অভ্যস্ত বলেই এমনটি সম্ভব হচ্ছে। তাইতো বাতাসের নীচে বাস ক'রে শরীরের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় সাড়ে-সাত সের বায়ুর চাপ সহ্য করেও তাকে ভুলে রয়েছি। পৃথিবীর সঙ্গে

অলক্ষ্যে দড়ি-বাঁধা রয়েছি, তবুও বুঝতে পারছি না সেই বাঁধনকে। ঐ বাঁধন যদি না থাকত, তাহ'লে আধুনিক 'রকেটে' চড়ে নয়, নিজের ক্ষমতার জোরেই এক লাফ্ দিয়ে চন্দ্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহে, এমন কি তারায় তারায় ঘুরে বেড়াতে পারতাম। পৃথিবীর বুকে চড়ে, অমন বন্ বন্ ক'রে ঘুরেও কেমন ক'রে যে ভাবছি, আমার ছোট্ট চলার পথটুকুতেই আমি স্বাধীনভাবে হাঁটছি!

বাস্তব জীবনের কোথাও আদেশকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাই যদি হ'ল, তাহ'লে একটি সুন্দর, হৃদয়-প্রসারী, প্রকাশধর্মী আদর্শের সূর্যালোকের শপথ মেনে নিয়ে চলাই ভাল। এই রকম আদেশই পরে আমাদের সুমুখে আদর্শ হয়ে এসে দাঁড়াবে।

কথা উঠবে—আমরা কেন আদর্শের পূজারী হব? উত্তরে বলব, এ থেকে কোন মানুষেরই নিস্তার নেই বলে। আর যদি সত্যই নিস্তার থাকত, তাহ'লে আমি আমার 'মনের' বশে যে নিজেকে চালাচ্ছি, সেই 'মনের' আদর্শকেও তাহ'লে মেনে চলতাম না। তা ছাড়া, এই পৃথিবীতে, আমার জীবন-সাম্রাজ্যের চারদিকেই তো, মূর্তির তথা আদর্শের ছড়াছড়ি। আহার করছি, সেখানেও আমার আহার্যবস্তু আমার ভাল-লাগার আদর্শ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে। জামা কাপড় পড়ছি, সেখানেও একটা সৌখীনতা, একটা সৌষ্ঠব, আদর্শের রূপ ধরে এসে ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাড়ি গাঁথছি, সেখানেও স্থপতি-বিচার আদর্শ হ'য়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে। স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা, দয়া-মায়া-সেবা নিয়ে থাকতে চাইছি, কিন্তু সেখানেও কোন-না-কোন মূর্তি, কোন-না-কোন সম্পর্ক বা আদর্শকে পূজা করছি। মোট কথা—নাম, রূপ ও চিন্তার 'পূজা' আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রতিনিয়তই ক'রে চলেছি। এবং ঐ 'পূজা'—ঐ আদর্শকে ত্যাগ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়, হয়ত সুপ্তচেতন পাগল বা পূর্ণচেতন ব্রহ্মজ্ঞই তাকে অস্বীকার করতে পারেন।

এর পরে প্রশ্ন ওঠে, কাকে আমরা আদর্শ ব'লে ধরব? বৈজ্ঞানিককে! কেন? একটিমাত্র জড় নিয়ম আবিষ্কার করেছে বলে? সে তো প্রকৃতির অনুকরণকারী! প্রকৃতি চালাচ্ছে এই বিরাট জগৎ। কি অমোঘ তার নিয়ম! কি অনন্ত তার শক্তি! তাকেই প্রণাম ক'রে পূজা করি না কেন? আর প্রকৃতির অন্তর্গত অন্ন, যা না হ'লে আমাদের প্রবলতম চিন্তাও চুপ্‌সে যায়, তাকেই যদি উপাস্যরূপে গ্রহণ করি? কিংবা মৃত্যুকে? যে এসে আমার সীমায়িত আমিত্বকে মুছে দেয়! সেই অবারিত সত্য—সেই গোধূলির আলোমাখা মৃত্যুই—শেষ ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ হোক্!

কিন্তু ঐ সব আদর্শ আমার সহজ স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। আমার জীবনের ভাস্বর শ্রেয়-বোধ ক্রমবিকাশের সিঁড়ি বেয়ে আর উঠতে পারে না। তাই প্রকৃত আদর্শকে ধরার জন্য চাই আন্তর 'দৃষ্টি'—যে দৃষ্টির বিকাশে সকল বাধা, সকল বন্ধনকে ছাড়িয়ে আমি হ'তে পারব মুক্ত, স্বাধীন, অবারিত অবসিত। সেখানে পৌছলে দেখব, তাঁকে সূর্য প্রকাশ করে না, চন্দ্র-তারকা দেখিয়ে দেয় না, তিনি নিজে দীপ্তিমান বলেই সব কিছু প্রকাশ পায়, তাঁর আলোক পেয়েই সব কিছু ফুটে ওঠে। তাঁকে আদর্শ করেই তো বলতে পারি: তুমি তেজ, আমায় তেজস্বী কর; তুমি বীর্য, আমায় বীর্যবান কর; তুমি বল, আমায় বলবান কর; তুমি ওজঃ, আমায় ওজস্বী কর; তাই তো বলছি, 'কাঁদছ কেন, বন্ধু! তোমার মধ্যেই তো রয়েছে সকল শক্তি। ওগো শক্তিমান, তোমার অন্তরের সেই বজ্রশক্তিকে জাগাও, দেখবে প্রকৃতি তোমার পায়ের তলায় লুটোচ্ছে। আদর্শের এই দিশারীকে ধরেই এগিয়ে চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

বিবেকানন্দ

[ভারত তাঁকে একভাবে চায়, পাশ্চাত্য আর একভাবে]

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানব-জাতির ইতিহাসে দেখা যায় এক এক যুগে এক এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। এসব মহাপুরুষের এই সংসারে আগমন নিরর্থক বা অহেতুক নয়। মানুষের অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এঁরা বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্য আসেন এবং পৃথিবীর ও মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য অনেক কাজ ক'রে যান। সাধারণ মানুষের জীবন পশুবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত মনে হয়। তারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে কাম ক্রোধ ও লোভের বশে নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্য ব্যস্ত থাকে এবং নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাবার জন্য অপরের স্বার্থ বা সুখের কথা ভাবে না, অপর সব লে'কের স্বার্থহানি ও সুখশান্তি নষ্ট ক'রে শুধু নিজের সুখ ও ধনৈশ্বর্য প্রাপ্তির চেষ্টা করে। ফলে আমরা দেখি মানুষে মানুষে, পরিবারে পরিবারে, এক সমাজ ও অন্য সমাজের মধ্যে, এক জাতি ও অন্য জাতির মধ্যে অথবা এক রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও অন্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে হিংসা-দ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কলহ ও বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হয় এবং শেষে যুদ্ধবিগ্রহ, ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয় এবং একটা মহা বিপর্যয়ের বা প্রলয়ের কালাগ্নি জলে ওঠে। সাধারণ মানুষের এরূপ পশুভাব-প্রবণতা এবং ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টির প্রবৃত্তি সত্ত্বেও যে জগতে আজ কতকটা সুখশান্তি বা সুশৃঙ্খলা দেখা যায়, তার কারণ বোধ হয় মানব-ইতিহাসে মধ্যে মধ্যে দেবমানব বা মহা-পুরুষদের আবির্ভাব। এঁরাই মোহান্ধ মানুষকে জ্ঞানের আলোক দেন, স্বার্থান্ধকে নিঃস্বার্থ ও পরার্থ কল্যাণ-ব্রতে দীক্ষা দেন, পথহারা মনুষ্য-সমাজকে দিব্য পথের সন্ধান দেন এবং মানুষ পশুত্বের স্তর থেকে যে দেবত্বে উন্নীত হতে পারে ও কেমন ক'রে হয়ে থাকে তার চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়ে যান।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুআরি যে দেব-শিশু কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ ক'রে তাঁর বংশকে পবিত্র করেছেন, পিতামাতাকে কৃতার্থ করেছেন এবং ধরণীকে ধন্য করেছেন, উত্তরকালে যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা-দীক্ষায় লোকোত্তর জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য নিয়ে বিবেকানন্দ নামে সারা বিশ্বে পরিচিত ও পূজিত হয়েছেন, তিনি এমনই একজন মহাপুরুষ। কেহ তাঁকে বীর সন্ন্যাসী বলেন, কেহ অদ্বৈত ব্রহ্ম-জ্ঞানী বলেন, কেহ বা তেজস্বী স্বদেশপ্রেমিক বলেন, আবার কেহ কেহ তাঁকে অক্লান্ত কর্ম-যোগী অথবা ঝঞ্ঝারূপী পুরুষসিংহ (Cyclonic personality) বলেছেন। এসব বর্ণনা আংশিক-ভাবে সত্য বটে, কিন্তু এর কোন একটিতেই তাঁর দেবচরিত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। তাঁর জীবনী বাণী ও কর্ম-ধারা আলোচনা করলে মনে হয়, তিনি ছিলেন যুগ-প্রয়োজন-সাধক যুগাচার্য। অবশ্য তার মূলে ছিলেন তাঁর গুরু যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই তাঁকে যুগাচার্যের যোগ্য শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছিলেন, লোককল্যাণ-ব্রতে ব্রতী হতেও প্রেরণা দান করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'নরেন্দ্র খুব বড় আধার'। তিনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব-

সেবা',—এই আদর্শ। নরেন্দ্র এক সময় নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকতে চাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'তুই এত ছোট হবি কেন? লোকে যেমন বড় গাছের ছায়ায় বসে শ্রান্তি দূর করে, আর শান্তি পায়, তেমনি তোর কাছে বহু লোক এসে তাদের পাপতাপ জুড়োবে ও শান্তি পাবে।' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যেন অভেদ আত্মা, যুগ-প্রয়োজনে একই ভগবানের দুই রূপ—গুরু ও আচার্য। এ যুগের বিশেষ প্রয়োজন সাধন করতে তাঁদের আবির্ভাব। সেই প্রয়োজন কি এবং উহা ভারতের পক্ষে কিরূপ ও পাশ্চাত্য জগতের পক্ষেই বা কিরূপ, সেই আলোচনা-সূত্রে দেখতে পাব যে, ভারত বিবেকানন্দকে চায় একভাবে, পাশ্চাত্য জগৎ চায় আর একভাবে!

* * *

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি। এদেশে বেদ-বেদান্তের মূলে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তাতে ঐহিক সুখ অপেক্ষা পারমার্থিক নিঃশ্রেয়স লাভকেই মানব-জীবনের চরম আদর্শ বলে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভোগাসক্তি অপেক্ষা মুক্তিকেই কাম্য বস্তু বলে স্বীকার করা হয়েছে। এজন্য এ দেশে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের মহিমা স্বীকৃত হয়েছে, প্রবৃত্তি-মার্গ থেকে নিবৃত্তি-মার্গের অধিক মূল্য দেওয়া হয়েছে এবং আত্মা ঈশ্বর ও ব্রহ্মকে পরম সত্য ও তত্ত্ব বলে গ্রহণ ক'রে জীবজগৎকে কখনও বা অসত্য ও মায়াময় বলা হয়েছে, আর কখনও বা অনিত্য, অসার, দুঃখময় ও জীবের বন্ধনের কারণ বলে হেয় জ্ঞান করা হয়েছে। ফলে পার্থিব জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের সম্বন্ধ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে এবং কাল-ক্রমে দুইটির মধ্যে কোন সম্বন্ধই নেই এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ভারতবাসীরা পার্থিব জীবনকে অবহেলা ও অস্বীকার করতে লাগলেন এবং ঐহিক জীবন দুঃখ-দৈন্যে, অজ্ঞতা-মূর্খতায় ও ব্যাধি-বিষাদে ভরে উঠতে লাগল। অপর দিকে তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনও ক্রমশঃ শীর্ণ, বিশুষ্ক ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। জীব-জগতের প্রতি তাঁদের আর বিশেষ প্রীতি বা শ্রদ্ধা দেখা গেল না এবং সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া বা জীবজগতের কল্যাণের জন্য যত্ন বা প্রচেষ্টা করা তাঁদের কর্তব্য বলে মনে হ'ল না। অথবা তাঁরা সেটাকে অকর্তব্য বলেই ভাবতে লাগলেন, যেন পার্থিব জীবন আধ্যাত্মিকতার বিরোধী ও পরিপন্থী।

বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা ও তার কুফল মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন এবং তাকে পরিশুদ্ধ ক'রে জীবজগতের কল্যাণার্থে তার প্রয়োগ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার মূলে বোধ করি ছিল তাঁর গুরুর জীবন-বেদ। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেও ভক্তিভাব নিয়ে ছিলেন, শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা বলে-ছিলেন এবং জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ ও তাঁর লীলার রূপ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিত্য ও লীলা, সাকার ও নিরাকার, ব্রহ্ম ও শক্তি দুইই মেনে-ছিলেন, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে ভাবা যায় না—বলতেন। কাজেই তাঁর জীবনে সন্ন্যাসের সঙ্গে কর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির এবং আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বাস্তব জীবনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর যোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দ এই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই আমরা দেখতে পাই যে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ ক'রে ভারতের জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা দেখে ব্যথিত ও করুণাবিগলিত হয়েছেন এবং তার প্রতিকার

করবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। তাই আমরা তাঁর কাছে কার্যে পরিণত বা কার্যকরী বেদান্তের (Practical Vedanta) কথা শুনতে পেয়েছি। তিনি বনের বেদান্তকে ঘরে এনেছিলেন, শঙ্করের প্রখর জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধের করুণাবিগলিত চিত্ত পেয়েছিলেন, আর নিঃসঙ্কোচে বলতে পেরেছিলেন, 'জীবের কল্যাণের জন্য এই দুঃখময় সংসারে হাজার বার জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। এই রোগ-শোক-অজ্ঞতা-অনাহারক্লিষ্ট জীবগণই আমার একমাত্র উপাস্য দেবতা, অন্য ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি না।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' তিনি শুধু এই কথা বলেই ক্ষান্ত হননি; তাঁর সারা জীবনে, তাঁর ধ্যানে জ্ঞানে কর্মে এই মহতী বাণী প্রতিধ্বনিত ও প্রতিফলিত হয়েছে। তাই আজ আমরা দেখতে পাই ভারতে সন্ন্যাসীর জীবনাদর্শের একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বে সন্ন্যাসী বা সাধু বলতে লোকে বুঝত পর্বত-গুহাবাসী বা অরণ্য-সেবী নিঃসঙ্গ ও নির্মম সর্বত্যাগী ও নিষ্কর্মা পুরুষ। কিন্তু একালে আমরা দেখছি শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসীরা সব মায়িক বন্ধন ছিন্ন করলেও জীবজগতের প্রতি উদাসীন হননি, পরন্তু তাঁদের জীবনে ত্যাগের সঙ্গে সেবার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী সেবাকার্য শুধু সন্ন্যাস-আদর্শের নয়, জগতের ভাবধারারও পরিবর্তন ঘটাতে আরম্ভ করেছে।

আজ ভারতের একান্ত প্রয়োজন—স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতের আশা-ভরসা—স্বামী বিবেকানন্দ। ভারত তাঁর জীবনের এই দিকটা—আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ব্যাবহারিক জীবনের বলিষ্ঠ মিলনের দিকটা, বিশেষভাবে চায়। শুষ্ক আধ্যাত্মিকতার বশে বাস্তব জীবনকে হীন বা ক্ষীণ না ক'রে, তার বলে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রকে উর্বর করা ভারতবাসীর একান্ত কর্তব্য। ভারতবাসী তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে পারলে ভারতের পুনরভ্যুত্থান সুনিশ্চিত হবে, বিশ্বসভায় তার গৌরবের স্থান সংরক্ষিত থাকবে এবং কালে জগতের জ্ঞানগুরুর আসন ও মানবজাতির নায়কত্বের মর্যাদা লাভ করাও তার পক্ষে সম্ভব হবে।

* * * *

পাশ্চাত্য জগতের কাছেও বিবেকানন্দের প্রয়োজন কম নয়। পাশ্চাত্য তাঁকে সমভাবে চায়, অবশ্য সেটা একটু অন্যভাবে। পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে কোন কোন জাতি তাঁকে শুধু চায় না, তাঁকে নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। আমাদের কর্তব্য তাঁর ভাব যথাযথভাবে তাদের কাছে ধ'রে দেওয়া। ভারত বিবেকানন্দকে চায় তার আধ্যাত্মিকতাকে ব্যবহারমুখী করবার জন্য, তাকে কার্যে পরিণত করবার জন্য। অপরদিকে পাশ্চাত্য জগৎ তাঁকে চায় তার ব্যাবহারিক বা পার্থিব জীবনকে উন্নত করবার জন্য, তাকে পরিশুদ্ধ, সুসংস্কৃত ও ঊর্ধ্বগামী করবার জন্য।

আজ পাশ্চাত্য জগৎ সকল পার্থিব সম্পদের অধিকারী হয়েছে—মনে হয়। পাশ্চাত্য দেশ ধনকুবেরের দেশ, প্রকৃতির ঐশ্বর্যে ভরা দেশ, শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারে গৌরবান্বিত দেশ। কিন্তু এমন অপরিমেয় পার্থিব সম্পদের অধিকারী হয়েও ওদেশবাসীদের মনে প্রকৃত সুখশান্তির অভাব দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে সেখানকার ঐশ্বর্যের কিঞ্চিৎ

পরিচয় পেয়ে আমি যেমন বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি, তেমনি কোন কোন আমেরিকাবাসীর মুখে তাদের অতৃপ্ত ও অশান্ত হৃদয়ের বেদনা-বাণী শুনেও আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। তাঁদের কেহ কেহ আমাকে বলেছেন, 'আমরা পার্থিব ঐশ্বর্যের শিখরদেশে (climax of material prosperity) উঠেছি বটে, কিন্তু আমাদের হৃদয় অতৃপ্ত। আমাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসা (spiritual hunger) মিটে না; ভারতের কাছে আমরা এমন কিছু পাবার আশা করি, যাতে আমাদের এ পিপাসার শান্তি হবে—হৃদয়ে শান্তি পাব। পাশ্চাত্য দেশে অনেকের মনে যে শুধু একটা দিব্য অশান্তি (divine discontent) দেখা যায় তাই নয়, তাদের বাহিরেও শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই, নিরুদ্বেগের ভাব নেই। পাশ্চাত্য জগতে আজ হিংসা-দ্বেষ, অবিশ্বাস ও ভয়ের ভাব যেন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যে শিল্প-বিজ্ঞান তাকে এত বড় করেছে, আজ তারই আধুনিক আবিষ্কারগুলি তাকে গ্রাস করবার উদ্যোগ করছে, তার সমাধি-ক্ষেত্র রচনা করছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বহু বৎসর পূর্বেই পাশ্চাত্য জগৎকে সাবধান ক'রে বলেছিলেন, 'পাশ্চাত্য সভ্যতা একটা আগ্নেয়গিরির উপরে অবস্থিত, অকস্মাৎ একটা অগ্ন্যুদ্গার হলেই তার সব ধ্বংস হয়ে যাবে।' এ আসন্ন ধ্বংসের মুখ থেকে যদি পাশ্চাত্য জগৎকে বাঁচতে হয়, সে দেশের লোকের মনে যদি নিরাপত্তার ভাব ফিরিয়ে আনতে হয়, তাদের অশান্ত হৃদয়ে যদি স্থায়ী দিব্য শান্তি পেতে হয়, তবে তাদের পার্থিব ও ব্যাবহারিক জীবনকে ভারতের আধ্যাত্মিকতার আলোকে উদ্ভাসিত করতে হবে, তার পুণ্য কিরণে তাকে নির্মল ও উজ্জ্বল করতে হবে এবং সেই ভাব-ধারায় তাকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। সেই কাজ করবার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে ভারতের শাশ্বত বাণী প্রচার করেছেন, মরলোককে অজর, অমর ও অভয়ের কথা শুনিয়েছেন। পাশ্চাত্য দেশ তাঁকে চায়।

এদেশের এবং ওদেশের যুগপ্রয়োজনে তিনি এসেছিলেন, উভয় দেশই তাঁকে চায়। তাই বলি : যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দকে ভারত একভাবে চায়, পাশ্চাত্য জগৎ আর একভাবে চায়।

Message to India and West

Bold has been my message to the people of the West, bolder is my message to you, my beloved countrymen. The message of ancient India to new Western nations I have tried my best to voice—ill done or well done the future is sure to show, but the mighty voice of the same future is already sending forward soft but distinct murmurs, gaining strength as the days go by, the message of India that is to be to India as she is at present.

—*Vivekananda*

টয়েন্‌বীর দৃষ্টিতে ধর্ম

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

একজন প্রথিতযশা পণ্ডিতকে বলতে শুনেছি, গিবনের পরে টয়েন্‌বীর (Toynbee) মত এত বড়ো ঐতিহাসিক আর জন্মায়নি। এই কথায় তাঁর বইগুলি একবার নেড়েচেড়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। ইতিহাসের এক এক খণ্ড পড়ি, আর তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতায় বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে যাই। মানুষ এক জীবনে এত বই পড়তে পারে এবং এত লেখা লিখতে পারে!

কিছু দিন আগে কলকাতার এক হাসপাতালে যাই পরিচিত একজনকে দেখতে—বামুনের ছেলে, কিন্তু পরে গোঁড়া খ্রীষ্টান হয়ে যায়, হিন্দুধর্মকে সে একেবারে সইতে পারতো না। সেদিন রোগশয্যার পাশে যেতেই সে আমার হাতখানা দু-হাতে চেপে ধরল। তারপর আবেগকম্পিতকণ্ঠে ব'লল, 'আমার মতের পরিবর্তন হয়েছে। এই বইখানা প'ড়ে ধর্ম সম্পর্কে আমার ধারণা বদলে গেছে।' দেখলাম তার হাতের কাছে একখানি বই রয়েছে। বইখানার নাম 'An Historian's Approach to Religion.' লেখক আর কেউ নয়, টয়েন্‌বী।

ভারী কৌতূহল হ'ল বইখানা একবার পড়ে দেখতে। ওর মধ্যে কি এমন আছে যার ছোঁয়া লেগে অমন গোঁড়া খ্রীষ্টানের মন থেকে গোঁড়ামি মুছে গেল! বইখানা একটা লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ ক'রে তার মধ্যে ডুব দিলাম। পড়তে পড়তে এক জায়গায় দেখলাম লেখা রয়েছে, মানুষের আদিম পাপ (Original Sin) হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতা (self-centredness)। এই আত্মকেন্দ্রিকতা হচ্ছে মানবস্বভাবের একটা মজ্জাগত দুর্বলতা আর এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে না পারলে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যোগ কোনকালেই সম্ভব নয়। টয়েন্‌বীর মতে:

> Man's goal is to seek communion with the presence behind the phenomena, and to seek it with the aim of bringing his self into harmony with this absolute spiritual reality.

—এই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে যে সত্য রয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত হ'তে চাওয়াই মানুষের চরম লক্ষ্য। এই পরম আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে নিজের আত্মার যোগ-সাধনের উদ্দেশ্যে মানুষ চাইছে মিলতে—যে মিলের মধ্যে তার জীবনের সার্থকতা।

টয়েন্‌বী বলছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যোগের পথে আত্মকেন্দ্রিকতার মতো এমন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আর নেই। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক এই কথাই বলেছেন। সদরওয়ালাকে ঠাকুর বলছেন: 'এই অহঙ্কার আড়াল আছে ব'লে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।' টয়েন্‌বী বলছেন, অহঙ্কার ত্যাগ করবার সময়ে মানুষের মনে হয় তার জীবন বুঝি কোন্ অতলে হারিয়ে গেল। কিন্তু সত্যি সত্যি অহঙ্কার যখন চলে যায় তখন মানুষ অনুভব করে, সে প্রকৃতপক্ষে বেঁচে গেল। সে বেঁচে গেল—কারণ তার জীবন একটা নূতনতর কেন্দ্র খুঁজে পেয়েছে। এই নূতন কেন্দ্রটি হচ্ছে সেই পরম সত্য যা বস্তুজগতের অন্তরালে আধ্যাত্মিক সত্তারূপে নিত্য বিরাজমান।

অহঙ্কার-ত্যাগের পথে মানুষের নবজীবনের

আনন্দলাভের কথা বুঝাতে গিয়ে ঠাকুর বাছুরের উপমা দিয়েছেন: বাছুর 'হাম্বা হাম্বা, আমি আমি' করে। তার দুর্গতি দেখ। হয়তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাঙল টানতে হচ্ছে। রোদ নাই, বৃষ্টি নাই। হয়তো কসাই কেটে ফেল্লে। জুতো তৈরী হ'ল। অবশেষে কিনা নাড়িভুঁড়ি-গুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে; যখন ধুনুরীর তাঁত তোয়ের হয় তখন ধোনবার সময় 'তুঁহু তুঁহু' বলে। আর 'হাম্বা হাম্বা' বলে না, 'তুঁহু তুঁহু' বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। কর্মক্ষেত্রে আর আসতে হয় না

টয়েন্‌বী বলছেন: যেহেতু আত্মকেন্দ্রিকতা মানবস্বভাবের মজ্জাগত ব্যাধি, সেই হেতু আমাদের নিজেদের ধর্মকে একমাত্র খাঁটি এবং সত্য ব'লে অভিহিত করার দিকে একটা ঝোঁক অল্প-বিস্তর সকলের মধ্যেই দেখা যায়। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের নিজেদের ধর্মই সত্য এবং এই ধর্মের পথেই মুক্তি। কিন্তু টয়েন্‌বী বলছেন, আমাদের এই বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকে না—কারণ সমগ্র সত্যকে আমরা কেউ জানি না। আমরা সত্যকে শুধু আংশিক ভাবেই জানি এবং যা জানি তা কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখার মতো ধোঁয়াটে। টয়েন্‌বীর ভাষায়:

> We believe that our own religion is the way and the truth, and this belief may be justified, as far as it goes. But it does not go very far; for we do not know either the whole truth or nothing but the truth. 'We know in part' and 'we see through a glass, darkly'.

এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের অন্ধের হস্তী-দর্শনের উপমা সহজেই মনে আসে। টয়েন্‌বী তাঁর পুস্তকের উপসংহারে বলছেন: এখন আমরা যে জগতে বাস করছি সেখানে জীবন্ত ধর্মগুলির অনুসরণকারীদের উচিত পরস্পরের ধর্মমতকে সহ্য করা, সম্মান করা। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজের ধর্ম এবং প্রতিবেশীর ধর্ম উভয়কে পাশাপাশি রেখে কার আসন উঁচুতে—সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ রায় দিতে পারে? আশৈশব যে জেনে আসছে একটা ধর্মকে আপন গৃহের পরিবেশের মধ্যে—সে যদি বাইরে থেকে পরবর্তী কালে জানা অন্য ধর্মের সঙ্গে চিরপরিচিত নিজ ধর্মের তুলনা করে, তবে তার বিচারে ভুল হ'তে বাধ্য। পূর্বপুরুষের ধর্মের এমনই একটা প্রভাব আছে আমাদের অনুভূতির উপরে যে আমরা নিরপেক্ষ মন নিয়ে অন্য ধর্মের বিচার করতে পারি না একেবারে শেষের দিকে টয়েন্‌বী বলছেন:

> The missions of the higher religions are not competitive; they are complementary. We can believe in our own religion without having to feel that it is the sole repository of truth. We can love it without having to feel that it is the sole means of salvation.

—উচ্চতর ধর্মগুলির উদ্দেশ্য কখনও প্রতিযোগিতা-মূলক হতে পারে না। তারা হবে পরস্পরের পরিপূরক। আমাদের নিজেদের ধর্মই সত্যের একমাত্র আধার—একথা মনে না করেও স্বধর্মে আমরা আস্থা রাখতে পারি। আমাদের ধর্মকে ভালবাসতে হ'লে—ঐ ধর্মই মুক্তির একমাত্র পথ —এমন ধারণা পোষণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

'কথামৃতে' রয়েছে: যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালোবাসবে। মিশে যেন এক হয়ে যাবে—বিদ্বেষভাব আর রাখবে না। 'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রীষ্টান' এই বলে নাক

সিঁটকে ঘৃণা কোরো না তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন।

টয়েন্‌বীর লেখার মধ্যে ঠাকুরের উদার সুরের কি আশ্চর্য প্রতিধ্বনি!

টয়েন্‌বীর সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আত্মকেন্দ্রিকতা সব মানুষের এবং সম্প্রদায়ের মধ্যেই অল্পবিস্তর রয়েছে; তবে ভারতীয় ধর্মগুলির তুলনায় মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং ইহুদী ধর্মে আত্মকেন্দ্রিকতা অনেক বেশী। আর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা যখন আজ পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়ছে যন্ত্রযুগের কল্যাণে, তখন 'The spirit of the Indian religions, blowing where it listeth, may perhaps help to winnow a traditional Pharisaism out of Muslim, Christian and Jewish hearts' অর্থাৎ ভারতীয় ধর্মগুলির ভাবধারার স্পর্শে মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং ইহুদীদের হৃদয় থেকে চিরাচরিত আত্মকেন্দ্রিকতার অপসারণ খুবই সম্ভবপর।

টয়েন্‌বী মহামানবের মিলনের জন্যে চেয়ে আছেন ভারতবর্ষের দিকে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ কি হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীকে কল্যাণের পথরেখা দেখাবে না? স্বামী বিবেকানন্দ কোন্ প্রেরণায় সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেন একটা জ্বলন্ত সূর্যের মতো?—পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিলেন ঋষিদের তপোবনের মৃত্যুহীন উদার বাণী?—নিশ্চয়ই ভালোবাসার প্রেরণায়। বিদ্বেষে বিদীর্ণ পৃথিবীকে শান্তি দিতে পারে ভারতের ধর্ম, যার মূলকথা সকলের মধ্যে একই অনন্ত আত্মার অস্তিত্ব। এই আত্মার অস্তিত্বকে সকলের মধ্যে সমভাবে দেখতে পারলে তবেই মানুষের পক্ষে মানুষকে ভালবাসা সম্ভব। ভারতবর্ষ যুগযুগান্ত ধ'রে তার নানা সাধকের কণ্ঠকে আশ্রয় ক'রে এই ঐক্যের মন্ত্রই প্রচার ক'রে এসেছে এবং বহু শতাব্দীর ঝড়-ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম ক'রে সে আজও বেঁচে রয়েছে প্রেমের মহাধর্মের জগৎ-জোড়া প্লাবনে দুনিয়াকে একাকার ক'রে দেবার জন্যে—এই তো বিবেকানন্দের কথা। তিনি চেয়েছিলেন একটা আত্মবিস্মৃত প্রাচীন জাতির মর্মের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করতে, একটা আধ্যাত্মিক মহাজাগরণের মধ্যে তার ক্লৈব্যের অবসান ঘটাতে।

টয়েন্‌বীও ধর্মের মধ্যেই মানুষের নবজীবনের সম্ভাবনা দেখেছেন। টেকনলজির মধ্যে মানুষ এতদিন খুঁজছিল তার নূতন দিনের স্বর্গকে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে মানুষ ভাবতে আরম্ভ করেছে, পরমাণবিক শক্তিকে মুক্ত ক'রে সে হয়তো পৃথিবীকে একটা সামাজিক এবং নৈতিক সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক আরও দেখেছেন, গত ২৫০ বছর ধরে যে বৌদ্ধিক স্বাধীনতা (intellectual freedom) তিনি ভোগ ক'রে আসছিলেন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এসে সেই স্বাধীনতা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের আবিষ্কার নিয়ে পরস্পরের মধ্যে এখন আর আলোচনা করতে পারেন না। গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে যখন পদার্থবিজ্ঞানের এই সব পরমাণবিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে, তখন লৌহযবনিকার অন্তরালে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত সত্যকে প্রচ্ছন্ন রাখবার অধিকার একমাত্র গবর্ণমেণ্টেরই আছে।

মানুষের স্বাধীনতা যখন সকল দিক থেকে এই ভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, তখন টয়েন্‌বী আধ্যাত্মিকতার মধ্যে দেখতে পেয়েছেন স্বাধীনতার দুর্গ।—তাঁর ভাষায়: In a regimented world, the realm of the Spirit may be freedom's citadel, কিন্তু এই আধ্যাত্মিক

স্বাধীনতা কেবল রাষ্ট্রের চেষ্টায় সম্ভব নয়। জনসাধারণের হৃদয়ে পরস্পরের ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত থাকলে তবেই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা সত্য হ'য়ে উঠতে পারবে। টয়েন্‌বী বলছেন :

> True spiritual freedom is attained when each member of society has learnt to reconcile a sincere conviction of the truth of his own religious beliefs and the rightness of his own religious practices with a voluntary toleration of the different beliefs and practices of his neighbours.

সমাজের প্রতিটি মানুষ যখন শিখবে—কেমন ক'রে নিজের ধর্মবিশ্বাসে এবং ধর্ম-আচরণে আস্থা অক্ষুণ্ণ রেখেও স্বেচ্ছায় প্রতিবেশীর স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস এবং স্বতন্ত্র ধর্ম-আচরণের প্রতি সহনশীল মনোভাব পোষণ করা যায়, তখন সত্যিকারের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা আমরা অর্জন করতে পারব।

টয়েন্‌বীর মতে এই সহনশীলতার পিছনে থাকা চাই এই সত্যের স্বীকৃতি যে—ধর্ম নিয়ে কলহ পাপ, কেননা এই কলহ মানুষের স্বভাবের মধ্যে যে বন্য পশু আছে তাকেই খুঁচিয়ে জাগিয়ে দেয়। মানুষের আত্মার এবং ভগবানের মাঝখানে কারও দাঁড়াবার চেষ্টা করা উচিত নয়। টয়েন্‌বী বলছেন : ঈশ্বরের সঙ্গে কোন আত্মার কি রকমের সম্পর্ক হবে তা নিয়ে আর কারও হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নেই। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ধর্মবিশ্বাস তো ভিন্ন ভিন্ন হবেই, 'because Absolute Reality is a mystery of which no more than a fraction has ever yet been penetrated by or been revealed to any human mind.' টয়েন্‌বী বলছেন : সকলের ধর্মমত কখনও এক হ'তে পারে না, কারণ পরম সত্য হচ্ছে এমন একটা রহস্য যার অংশ ছাড়া সমগ্র রূপ আজ পর্যন্ত কোন মানুষের মনের কাছে ধরা পড়েনি। টয়েন্‌বীর এই ভাবটি শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বহুরূপীর উপমায় কী সুন্দর ফুটে উঠেছে! যে গাছতলায় থাকে সে জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখনো কখনো কোন রঙই থাকে না। অন্য লোক কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়।

টয়েন্‌বীর মতে যারা ভগবানের ইচ্ছাকে নিজেদের জীবনের মধ্যে পূর্ণ করবার জন্যে সেই মহা অজানার পানে চলতে চায় তারা একই বস্তুর অন্বেষণে ব্রতী। তার পরেই বলছেন :

> They should recognize that they are spiritually brethren and should feel towards one another, and treat one another, as such. Toleration does not become perfect, until it has been transfigured into love.

—'তাদের জানা উচিত, যারা ঈশ্বরকে খুঁজতে বেরিয়েছে তারা পরস্পরের সগোত্র। ভাই ভাইকে যেমন দেখে, ভাই ভায়ের প্রতি যেমন আচরণ করে, তাদের পরস্পরের প্রতি মনোভাব এবং আচরণ সেই রকম হওয়া উচিত। সহনশীলতা যখন প্রেমে রূপান্তরিত হয় তখনই তো তার মধ্যে পরিপূর্ণতা আসে।'

টয়েন্‌বীর বইখানি পড়তে পড়তে ঠাকুরের কথাগুলি কেবলই মনে পড়ছিল। আর মনে পড়ছিল হাসপাতালের মৃত্যুপথযাত্রী সেই রোম্যান ক্যাথলিক ভাইটির কথা যার অন্তিম জীবনে ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে একটা আমূল পরিবর্তন এসেছিল টয়েন্‌বীর 'An Historian's Approach to Religion' পড়ে।

মনের মায়া

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

বিপত্নীক রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘরের দাওয় বসিয়া আত্মচিন্তা করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়াছে, রাত্রির প্রথম প্রহর ক্রমশই গাঢ় হইয়া আসিতেছে। ছেলেমেয়েরা তাদের বিধবা পিসিমার সহিত ওপাড়ায় কথকতা শুনিতে গিয়াছে। বাড়ির নির্জনতা রামজীবনের ভারী ভাল লাগিতেছিল। সচরাচর এমন তো হয় না।

রামজীবন বিগত জীবনের কথা ভাবিতেছিলেন। পঞ্চাশটা বৎসরে অনেক দেখিলেন, অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিলেন, কত লোকের নিন্দা ভালবাসা কুড়াইলেন। অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াছে, অনেক মিটে নাই; অনেক বন্ধু লাভ করিয়াছেন, অনেক শত্রুও। কত ছবিই না চোখে ভাসে, কত নরনারীর কত কথা নূতন করিয়া কানে বাজে। নারায়ণ! নারায়ণ! আশ্চর্য এই মানুষের জীবন। দিনের পর দিন তীব্রবেগে অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়া যায়—আবার দিনের পর দিন ঘটনাগুলির ছাপ মনের কোঠায় জমা হইতে থাকে। ভুলিতে চাহিলে ভোলা যায় না, দূর করিয়া দিতে চাহিলে আরও জটিলভাবে জড়াইয়া যায়।

আচ্ছা, পঞ্চাশ বৎসর আগে তিনি কোথায় ছিলেন? অথবা আদৌ ছিলেন না? পিছনে তাকাইলে বড় জোর চার বৎসর বয়সের কথা রামজীবন আবছায়া কিছু মনে করিতে পারেন, কিন্তু তাহার পূর্বে ভাবিতে গেলে সব একেবারে অন্ধকার। যখন কেবল হামাগুড়ি ছাড়িয়া হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়া হাঁটিতে শিখিতেছেন—মা, বাবা, মামারা, খুড়ী, জেঠী এমন কি বড়দিদি, মেজদা ইহারা সবাই পাশে দাঁড়াইয়া উৎসাহ দিতেছেন—মনে পড়ে কি সে কথা? না। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথম যখন পৃথিবীর আলোক দেখিয়াছিলেন, স্মরণে আছে কি সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত? না। পৃথিবীতে আসিবার আগেও তো একটা জীবন ছিল—অন্ততঃ মাতৃগর্ভে দশমাস। মনে পড়ে কি? না—কিছুই মনে পড়ে না। কিন্তু মনে পড়ে না বলিয়াই যে তাহা নস্যাৎ, তাহা তো নয়। মাতৃগর্ভে আসিবার পূর্বেও হয়তো কোনও এক ধরনের অস্তিত্ব ছিল—হয়তো অন্য এক জন্ম—এই জন্মেরই মতো আশা-নিরাশা-হাসি-কান্না-সার্থকতা-ব্যর্থতায় বেষ্টিত একটি জন্ম। হয়তো সেই জন্মে রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মনোহর বসু অথবা মহারাষ্ট্রের ভালেরাও ডাণ্ডেকার। কে জানে? রামজীবন আপন মনে হাসিয়া উঠিলেন।

আর কয় বৎসর বাঁচিবেন? কুড়ি? পনর? দশ? এই কয় বৎসরে আরও কিছু অভিজ্ঞতা জমিবে—স্মৃতির পুঁটলিটি আরও কিছু ভারী হইবে। তাহার পর? ভাবিয়া কিছুই কূল পাওয়া যায় না। ভাবিতে গেলে মনে হয় সব অন্ধকার। জন্মের আগেও অন্ধকার, মৃত্যুর পরেও অন্ধকার। মাঝখানে শুধু একটু আলো—বর্তমান জীবনের পঞ্চাশ বা ষাট বা আশি বৎসরের আলো। এই পঞ্চাশ বা ষাট বা আশি বৎসরের প্রত্যেকটি মুহূর্ত ছুটিতে ছুটিতে আসে,—ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া যায়। একটিকেও ধরিয়া রাখা যায় না। কিন্তু তাহারা রাখিয়া যায় মনে এক একটি দাগ। সব দাগগুলি মিলিয়া একটা

জমাট মূর্তি সৃষ্টি করে—অসংখ্য রূপ, অসংখ্য শব্দ, অসংখ্য গন্ধ স্পর্শ আবেগ অনুভূতি উল্লাস ব্যথায় পরিপূর্ণ স্মৃতির সঞ্চয়। রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন বা ব্যক্তিত্ব এই সঞ্চয়েরই সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। এই স্মৃতিসম্ভারকে তিনি তুচ্ছ করিতে পারেন না—তুচ্ছ করিলে তাঁহার জীবনের অনেক গভীর ভালবাসা, অনেক মূল্যবান আদর্শ অর্থহীন হইয়া যায়। পিতা আজ স্থূল দেহে নাই, মাতৃদেবীও নাই, সতীসাধ্বী কল্যাণময়ী সহধর্মিণীও আজ জীবনের পরপারে। কিন্তু তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি তো রহিয়াছে। রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনের মধ্যে তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন।

রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া যে মনটি গড়িয়া তুলিয়াছেন, উহার ভিতর তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব আছে, তিনি এ যাবৎ যাহা কিছু করিয়াছেন, ভাবিয়াছেন—উহাদের ছাপ আছে, আবার ভবিষ্যতে তিনি যাহা আশা ও আকাঙ্ক্ষা করেন তাহাদেরও সূক্ষ্ম রেখাগুলি রহিয়াছে। বড় আশ্চর্য রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন! আজ যদি হঠাৎ তাঁহার নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লওয়া হয় তাহা হইলে রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহে প্রাণ থাকিলেও তিনি মৃতকল্প, কেননা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের সকল মূল্যই তাঁহার নিকট হইতে তিরোহিত হইয়া যাইবে। রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনুষ্যত্ব তাঁহার মনেই ওতপ্রোত। বাঁচিয়া থাকার যত প্রেরণা, এই পৃথিবীর প্রতি যত আকর্ষণ—সবই তাঁহার মনের জন্য। জীবনের মায়া—আখেরে মনেরই মায়া। দেহের মায়া অপেক্ষা মনের মায়া অনেক বেশী দৃঢ়মূল। আজ যদি অকস্মাৎ মৃত্যু আসে রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় শিহরিয়া উঠিবেন প্রধানতঃ কিসের জন্য? তাঁহার দেহের জন্য, না তাঁহার মনের জন্য?

এই পঞ্চাশ বৎসরে দেহের পরিণাম তিনি তো কম দেখেন নাই। শরীরের কত ব্যাধি, কত যন্ত্রণা, কত পরিবর্তন, তাঁহার নিজের এবং আরও শত শত ব্যক্তির জীবনে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কত লোককে মরিতে দেখিয়াছেন, কত পরিচিত প্রিয়জনের মৃতদেহ নিজের চোখে পুড়িতে দেখিয়াছেন। দেহের মায়া অতএব একান্তই অযৌক্তিক। দেহ যাইবে, যাক্—এই অবশ্যম্ভাবী ঘটনার জন্য রামজীবন পরোয়া করে না? কিন্তু মন? তিলে তিলে সঞ্চিত, বর্ধিত, পরিপুষ্ট, অতি যত্নে রক্ষিত আশা-আকাঙ্ক্ষা আবেগ-উদ্দীপনা জ্ঞান-বিজ্ঞান উল্লাস-অনুভূতির পুঁটলিটি তিনি ছাড়িবেন কোন্ প্রাণে? উহা যদি যায় তাহা হইলে তো কিছুই আর রহিল না। একেবারে নীরন্ধ্র অন্ধকারে ডুবিয়া যাওয়া! উঃ, বড় ভয়াবহ! না, তিনি তাঁহার মনের মায়া ছাড়িতে পারেন না। রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘামিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ দম লইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় আত্মবিশ্লেষণে ব্যাপৃত হইয়াছেন। মনের মায়া বস্তুটি কি? কি করিয়া উহা এত শক্তিসঞ্চয় করে? পঞ্চাশ বৎসর আগে এই দেহ যে ছিল না, তাহা জানা কথা। কিন্তু মন ছিল কি না, তাহা জানা নাই। শাস্ত্রের প্রমাণ এখন নাই তুলিলাম। অতএব মনের যাহা কিছু বিস্তার তাহা এই পঞ্চাশ বৎসরেই ঘটিয়াছে, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তের নানা ছাপ একত্রিত হইয়া ঘটিয়াছে। যেভাবে ঘটিয়াছে, ঐভাবে না ঘটিয়া অন্য ভাবেও ঘটিতে পারিত, অর্থাৎ মনের সঞ্চয়টির কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে এখন যে আকর্ষণগুলি, ভালবাসাগুলি, আকাঙ্ক্ষাগুলি বর্তমান তাহারা একটা অপরিহার্য পথ

ধরিয়া আসে নাই, বরং এক প্রকার আকস্মিকভাবেই আসিয়াছে। নিস্তারিণী দেবীর সহিত বিবাহ না হইয়া সুহাসিনী দেবীর সহিতও তাঁহার পরিণয় ঘটিতে পারিত। এখনকার দুই পুত্র এক কন্যার বদলে এমনও হওয়া বিচিত্র ছিল না যে তিনি এক পুত্র ও তিন কন্যার পিতা। তাঁহার ভগিনী যে বিধবা হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে আসিবে এবং তাঁহার মাতৃহীন সন্তানদের ভার লইবে, ইহা নাও ঘটিতে পারিত। রামজীবনের বাড়ীতে দুইটি গাভী আছে। নিজের হাতে গাভীদের পরিচর্যা করিতে তাঁহার ভাল লাগে। তাঁহার মনের সঞ্চয়ে গাভী দুটির ছবিও স্পষ্ট ভাসিতে থাকে। যদি একটিও গাভী না থাকিত? গাভীর স্মৃতির সহিত জড়িত মনের ঐ অংশটাও তো থাকিত না। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র না হইয়া যদি কলার ছাত্র হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মনের গঠন নিশ্চয়ই অন্যরূপ হইত।

বাহিরে ঘটনা ঘটে, রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় দৈবাৎ ঘটনাগুলির সামনে পড়েন, কিন্তু নিষ্কৃতি পান না। ঘটনাগুলি তাঁহার মনে তাহাদের ছাপ ফেলিয়া যায়। উহারা তাঁহার মনের অংশ-বিশেষ হইয়া যায়, মনের ওজন ও পরিধিকে বাড়াইয়া যায়। কিন্তু ছাপগুলি সাদা কালীর ছাপ নয়, পাকা রঙের ছাপ। উহারা এলোমেলো ভাবে আসে না, আসিলেও ক্ষতি ছিল না, আসার রীতিটিও যে কোন রকম হইতে পারিত—এত ফাঁক, এত স্থিতিস্থাপকত্ব রহিয়াছে, তথাপি ছাপগুলি কী দৃঢ়, কী প্রখর! আজ এই মুহূর্তে যদি মৃত্যু আসে এক সঙ্গে কত ছবি চিত্তের দ্বারে শেষ বারের মতো ভিড় করিবে—জীবনসঙ্গিনী নিস্তারিণী দেবীর সেবাস্নিগ্ধ শান্ত মূর্তিটি, কমল ও শ্যামল ছেলে দুটির চেহারা, আদরিণী কন্যা রুবী, কানপুরে সহোদর অমিয়জীবন, জয়নগরে বড় দিদি চম্পকলতা, মামীমা, বৃদ্ধ জেঠা মহাশয়, এই তাঁহার নিজের উপার্জনে নির্মিত পরিচ্ছন্ন সুন্দর বাড়িটি, স্বর্গীয়া নিস্তারিণীর বহুযত্নে সজ্জিত আসবাবপত্রগুলি, গাভীদ্বয়, কেলো কুকুরটি, বিড়ালটি, ময়না পাখীটি, পাড়ার বন্ধুবান্ধব, অফিসের সহকর্মীরা, তাঁহার ঘরের ব্যক্তিগত লাইব্রেরির প্রায় হাজারখানি বই—হ্যাঁ, ইহাদের প্রত্যেকেরই ছবি শেষ বিদায় লইতে আসিবে, প্রত্যেকটি ছবি বলিবে,—যাইও না যাইও না, তুমি গেলে আমরা থাকিব কি করিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমাদের চোখ যে অন্ধ হইয়া যাইবে। আজ এই মুহূর্তে যদি মৃত্যু আসে উপরের এই স্বচ্ছ উদার আকাশ তো রামজীবন আর দেখিতে পাইবেন না; দুই ফার্লং দূরে ঐ নদী, ঐ শ্যামল শস্যক্ষেত্র, লতা ফুল ফল, এই মাটি, এই বায়ু, এই জল সবই তো মুছিয়া যাইবে। মৃত্যু, নিষ্ঠুর মৃত্যু, সর্বসংহারক মৃত্যু! পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া জমা এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত আশা, এত সাধ, এত তৃপ্তি সবই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে মৃত্যুর স্পর্শে? একটি মুহূর্তে? না, রামজীবন আর ভাবিতে পারেন না। ভাবিলে কূল পাওয়া যায় না।

আশ্চর্য! মনের ছাপগুলির এত শক্তি! আগে তো টের পান নাই রামজীবন। ভাল মানুষের মতো এই সংসারে মনকে তিনি যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিয়াছেন, মনও উল্লাসবেদনা হাসিকান্না কুড়াইয়া কুড়াইয়া জমা করিয়াছে,—কিন্তু প্রত্যেকটি সঞ্চয় তাঁহাকে এমন নিবিড়ভাবে বাঁধিবে, তাহা তো আগে নজরে পড়ে নাই এখন পরিত্রাণের উপায়? মনের মায়াকে তুচ্ছ করিবেন তিনি কোন্ সামর্থ্যে?

গীতার কথা কি সত্য?—অর্জুন, তুমি ও আমি এবং আমরা সকলেই এই জন্মের আগেও ছিলাম, পরেও থাকিব। এক একটি দেহ ধারণ

যেন এক একটি কাপড় পরিধান। একটি কাপড় পুরানো হইয়া গেলে উহা বাতিল করিয়া দিয়া আমরা নূতন একখানা কাপড় ব্যবহার করি। কই, পুরানো কাপড়টির জন্য তো কাঁদিতে বসি না। অথচ যখন সেই কাপড়টি নিত্যকার সঙ্গী ছিল, তখন তাহার উপর মমতাবোধ তো কম ছিল না। নূতন কাপড় আসিলে সেই মমতা স্বাভাবিক নিয়মে ম্লান হইয়া যায়, নূতন কাপড়ের জন্য নূতন মমতা সঞ্চিত হইতে থাকে।

দেহ ও মন দুই লইয়া জীবন। দেহ যেমন একটি কাপড়, মনও তেমনি একটি গাত্রাবরণ। দুই পরিচ্ছদই বার বার বদলাইতে হয়। এক জন্মের স্মৃতির পুঁটলি অন্য জন্মে নিরর্থক। অবশ্য মনের বাসনা এবং প্রবৃত্তি—একত্রে যাহার নাম 'সংস্কার' তাহা নষ্ট হয় না। গীতার বিচারে দেহের মায়া যদি অযৌক্তিক হয়, মনের মায়াই বা দাঁড়ায় কোন্ যুক্তিতে? রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মনোহর বসু বা ভালেরাও ডাণ্ডেকার ছিলেন, তখন সেই জন্মের নানা ব্যক্তি ও বস্তুকে লইয়া যে সকল আকর্ষণ ভালবাসা জড় করিয়াছিলেন সেই সঞ্চয়গুলি এখন কোথায়? পূর্বতন ঐ দেহদ্বয়ের ন্যায় সেই সেই জন্মের আগন্তুক স্মৃতিগুলিও তো এখন নাই। অসংখ্য অতীত জন্মে রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় অসংখ্য দেহ এবং অসংখ্য স্মৃতির পুঁটলির মালিকানা পাইয়াছিলেন। সব গিয়াছে, সব যাইবে। ইহাই জগৎ-রীতি। তাহা হইলে এই জন্মের আকর্ষণগুলির জন্যই বা রামজীবন কাঁদিতে বসিবেন কেন? এই দেহকে যেমন একটা নির্দিষ্ট কালের অতিরিক্ত সময় ধরিয়া রাখা যায় না, এই জন্মের নানা ব্যক্তি, বস্তু ও আবেগ-অনুভূতির দাগগুলি—এক কথায় যাহার নাম 'মনের মায়া' উহাকেও তেমনি বরাবর পুষিয়া রাখা চলে না। 'মনের মায়া'কে তলাইয়া দেখিলে উহার শক্তি নিস্তেজ হইয়া আসে।

দেহের মায়া ও মনের মায়া দুয়ে মিলিয়া জীবন-তৃষ্ণা। দুইকেই অতিক্রম করিতে হইবে। জীবন-তৃষ্ণা দূর করিতে পারিলে মানুষ নিজেকে খুঁজিয়া পায়—জন্মমৃত্যু এবং অজস্র পরিবর্তনের অতীত নিজের চিরশুদ্ধ স্বরূপকে। ঐ শাশ্বত আত্মসত্যে দাঁড়াইয়া রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় 'মনের মায়া'কে তুচ্ছ করিবেন,—ঠিক করিলেন।

অরূপ!

বিভা সরকার

রূপ নাই—তাই কি অরূপ?
ছবি নাই—তাই কি এ মোহ?
তোমারে দেখিনি তবু
আছ তুমি, তাই কি বিরহ?
তব অণু—হতে বিশ্বতনু
তবু হায়! ধরা নাহি যায়—
'ভুবন ভরিয়া আছ, তবুও অতনু
ছোটে মন—দূর অধরায়!

আড়ালে আড়ালে থাকো
না পাই সীমানা
জীবন রহস্য প্রিয়
যায় না তো জানা!
কে জানে ডুবুরী বিনা
কিবা আছে অতলের বুকে
ৗন নাহি জানে
জ্যোতির্ময় জাগিছে সম্মুখে!

শিক্ষা ও শিক্ষকসমস্যার একদিক

ডক্টর শ্রীসচ্চিদানন্দ ধর

আজকাল শিক্ষা ও শিক্ষকসমস্যার কথা অনেকেই ভাবছেন। এই সমস্যা সমাধানেরও নানা পন্থা অনেকে নির্দেশ করছেন। আজকাল দেশে বুনিয়াদী শিক্ষা, সমাজ-শিক্ষা, বয়স্ক-শিক্ষা, নারী-শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি নানা দিক্ থেকে শিক্ষার সমস্যাকে দেখা হচ্ছে। প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষ বিভাগ সৃষ্টি ক'রে সরকার মন্ত্রী উপমন্ত্রী, ডিরেক্টর ডেপুটি-ডিরেক্টর, ইন্স্পেক্টর সাব-ইন্স্পেক্টর সহ-ইন্সপেক্টর প্রভৃতি নানা পদের লোকদ্বারা শিক্ষাকে একটা বিশেষ রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন হচ্ছে—জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একটা বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার নানা কমিশন বসিয়েছেন, নানা আলোচনা-সভার আয়োজন করেছেন, ক্ষেত্র-বিশেষে উদারভাবে অর্থসাহায্য করছেন—শিক্ষাকে সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গসুন্দর করতে। কিন্তু সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কার ও নূতন পদ্ধতির প্রতি দেশের সকলের সমান বিশ্বাস বা সমর্থন নেই। তাই প্রচলিত নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধ সমালোচনাও দেশে প্রচুর,—শিক্ষার প্রতি স্তরেই। সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন, এমন যাঁরা বাইরে থেকে প্রচলিত বা পরিবর্তন-শীল শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা করছেন—তাঁরাও কোন একটা সুষ্ঠু কার্যকরী শিক্ষাপদ্ধতির নির্দেশ দিতে পারছেন না। ফলে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে—শিক্ষার ক্ষেত্রে। তবু শিক্ষা চলছেই—নিত্যনতুন পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে। শিক্ষার কারখানা ঠিকই চালু আছে! তার উৎপাদিত পণ্যের গুণ নির্বিচারে বাজারে চাহিদা এখনও আছে। পাড়ার স্কুল আর মাষ্টার-মশায়দের শোচনীয় ব্যবহারের জন্য আক্ষেপপূর্ণ সমালোচনা করেও সেই স্কুলেই—সেই মাষ্টার-মশায়দের কাছেই ছেলে পাঠাচ্ছি লেখাপড়া শেখবার জন্যে,—মানুষ হবার জন্যে।

সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি

সরকার শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে নিজেদের বিশেষজ্ঞ এবং বাইরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে একটা শিক্ষাপদ্ধতির খসড়া করেন। যখনই দেশব্যাপী একটা শিক্ষার পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে হয় তখনই সরকার এক একটা 'কমিশন' বা প্রতিনিধিমূলক সংস্থা সৃষ্টি করেন। এই জাতীয় সংস্থার প্রতিনিধিগণ তাঁদের মতামত সরকারকে জানান। তখন সরকার আইনের সাহায্যে বা অন্য ক্ষমতাবলে এই পরিবর্তনে হাত দেন। শিক্ষার খাতে ব্যয়ের যে পরিমাণ টাকা থাকে তার বিলিব্যবস্থা করেন। বৎসরের শেষে জন-সাধারণ হিসাব পায়—সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে কত টাকা খরচ করেছেন, কত নতুন স্কুল বা কলেজ হয়েছে, কত বেকার ব্যক্তি শিক্ষকতার কাজ পেয়েছেন, শিক্ষকদের কত ক'রে 'মাগ্‌গী ভাতা' দেওয়া হয়েছে, কোন্ শ্রেণীর শিক্ষকদের কত বেতন বৃদ্ধি হয়েছে, কয়টি বেসরকারী বিদ্যালয় কি পরিমাণ সাহায্য পেয়েছে, কতগুলি বৃত্তি বা বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হয়েছে—ইত্যাদি। বাজেটের

নির্ধারিত টাকা বৎসরের মধ্যে যথাযথ বিলি ক'রে দিয়ে—কি কি কাজ হ'ল তার একটা তালিকা প্রকাশ করলেই মোটামুটি সরকারী কর্তব্য শেষ হ'ল বলা চলে। গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে খুব স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্র থাকাও সম্ভব নয়! দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধি 'বিধান সভা' যে বিধান ক'রে দেবেন—কয়েকজন ব্যক্তি সেই বিধানকে কার্যকরী করবেন মাত্র। অবশ্য এই বিধানকে কার্যে রূপান্তরিত করার মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব, দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও চিন্তাশীলতার প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিকে কার্যে পরিণত করতে বিশেষ চরিত্রবল, ধীশক্তি ও মনীষার প্রয়োজন—একথা আমরা সকলেই অনুভব করি। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার জনসাধারণের টাকাকে নির্দিষ্ট শিক্ষার খাতে খরচ ক'রে এবং এই টাকায় কি কি কাজ হ'ল তার একটা সুন্দর পরিসংখ্যান দিয়েই কর্তব্য শেষ করতে পারেন কি ?

শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ

আমরা স্কুল-কলেজে যে বিদ্যা বা লেখাপড়া শিখি তার সঙ্গে জীবনের সংযোগ কতটুকু আছে—এই নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে থেকে। বিদ্যালয়ে অধীত বিদ্যা আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থানের পক্ষে পরবর্তী জীবনে কতটা কার্যকরী হবে ও কতটা অর্থকরী হবে—এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমরা শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগের কথা ভেবে আসছি। যার ফলে আমরা অনুভব করেছি ও করছি—সাহিত্য বা দর্শন-জাতীয় অধ্যয়ন অপেক্ষা—বিজ্ঞান, বাণিজ্য, চিকিৎসা বিদ্যা (ডাক্তারি, কবিরাজী নহে) বাস্তুবিদ্যা ও অন্যান্য কারিগরি বিদ্যা অধিকতর অর্থকরী; সুতরাং শ্রেয়স্করী। আজকাল অধিকাংশ বিদ্যার্থী এবং অভিভাবক—লেখাপড়ার এই বাস্তব কাঞ্চন-মূল্যের দিকে লক্ষ্য রেখে অধ্যয়নের ও অধ্যাপনার প্রয়াসী হন। এটা এক পক্ষে ভাল। নৃতত্ত্বে এম-এসসি পড়ে, তারপর ওকালতি পাশ ক'রে, সরকারের রাজস্ব-বিভাগে কাজ ক'রে, এখন উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন বিভাগে কাজ করছেন—আমার এরূপ একজন বন্ধু আছেন। অপর বন্ধু সংস্কৃতে 'অনার্স' পাশ ক'রে কমার্সে এম-এ পাশ করেছেন। জানিনা দ্বিতীয় বন্ধু এখন কোথায় আছেন এবং কি কাজ করছেন। বৃত্তি-নির্বাচনে আমরা সব সময় ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দকে কাজে লাগাতে পারি না। রূঢ় অর্থনৈতিক চিন্তা আমাদের অনেক সময় বাধ্য করে—নিজের প্রবণতাকে বিসর্জন দিয়ে—অন্যটিকে গ্রহণ করতে। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 'স্বধর্ম' ত্যাগ ক'রে পরবৃত্তি গ্রহণ করতে গিয়ে অনেক জীবন ব্যর্থ হয়। এতে ব্যক্তি ও সমাজ—উভয়েরই ক্ষতি। আমার ধারণা নিজের প্রবণতার বৃত্তিকে নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রাখলে আখেরে ঠকতে হয় না। বৃত্তির প্রতি নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা থাকলে আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়; সমাজ এবং রাষ্ট্র কালে মর্যাদা দেয়, অর্থও আসে। এখন রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় নিজের পছন্দমত বৃত্তিমূলক শিক্ষা বেছে নেওয়ার সুযোগ হয়েছে অনেক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগ উপবিভাগ নিয়ে এখন বিশেষ অধ্যয়ন করা যায়। পরে জীবিকার সংস্থানও হয়। তবে ব্যবস্থা এখনও সুপ্রচুর নয় এবং সকল বৃত্তির মূল্য এক নয় বলে পছন্দেরও ইতরবিশেষ আছে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক

শিক্ষাপ্রসার, অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান সাহিত্য ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাপনার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি শিক্ষার্থীর নৈতিক দুর্বলতা লক্ষ্য ক'রে নিরাশ হচ্ছেন। গুরুর শিষ্যের প্রতি স্নেহ নেই, শিষ্যের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নেই। এই অভিযোগ

পারস্পরিক। এখন প্রশ্ন এই : শিষ্য গুরুকে কেন শ্রদ্ধা করবে, আর গুরুই বা শিষ্যের প্রতি কেন পিতৃবৎ স্নেহশীল হবেন? আর কিভাবেই বা এই সম্পর্ককে মধুর ক'রে তোলা যায়? গুরু এবং শিষ্যের শ্রদ্ধা ও স্নেহহীন যান্ত্রিক উদাসীন সম্পর্কের জন্য দায়ী কি শিক্ষক, না ছাত্র, না আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি? এর সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া সহজ নয়। আমি নিজে একজন শিক্ষক। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এই ব্যাপারে প্রথম দায়ী শিক্ষক, দ্বিতীয়—বিদ্যালয়, তৃতীয়—ছাত্রের অভিভাবক ও চতুর্থ দায়ী ছাত্র. আর পঞ্চম দায়ীকে যদি দাঁড় করানো যায় সে হচ্ছে সমাজ—যে শিক্ষার মূল্যায়ন করে।

শিক্ষক জাতির জনক (?)

আমরা সভাসমিতির বক্তৃতায় শুনি শিক্ষক জাতির জনক। শিক্ষকরাই ভাবী নাগরিক তৈরী করেন। তাঁদের দায় পবিত্র, জীবিকা মহৎ—ইত্যাদি। এসব কথা যাঁরা বলেন—তাঁরা অন্তরে অন্তরে তা বিশ্বাস করেন কিনা এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর যাঁদের উদ্দেশ্য ক'রে বলা হয় সেই শিক্ষকমশায়রাও তা বিশ্বাস করেন না, মনে করেন—'এ হচ্ছে নৈবেদ্য না দিয়ে, শুধু মন্ত্র দিয়ে তুষ্ট করবার বৃথা ছলনা! শিক্ষকদের মাইনে বাড়ছে না, ভাতা বাড়ছে না—শুধু বড় বড় কথা শুনছি।' সমাজে শিক্ষকদের প্রতি একটু করুণামাখা, আপাত-দরদী স্তোক বাক্যের ছলনা আছে বৈকি! শিক্ষকরা বাহিরে একটু বোকা সেজে এসব কথা শুনে আসেন। কিন্তু ক্ষোভ সমানই থেকে যায়। এমনি একটা ছলনা চলেছে—শিক্ষকসমাজ ও বাইরের সমাজের সঙ্গে। যদি আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজ দক্ষিণার ভাল ব্যবস্থা না করেও অন্তর দিয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষকতাকে শ্রদ্ধা করতেন, তাহলে সমাজ হয়তো শিক্ষার আরও ভাল ফল আশা করতে পারত। 'মাষ্টার মশাই' মানেই পাড়ার সকলের কৃপার একটি পাত্র!

শিক্ষকতার যোগ্যতা—পাণ্ডিত্য?

শিক্ষকের কাছ থেকে আমরা যা আশা করি তার উপর নির্ভর করবে শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ণয়। আমাদের স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতগুলি ডিগ্রি (তার আবার শ্রেণীবিভাগ আছে)—শিক্ষকের যোগ্যতার মাপকাঠি ক'রে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে যোগ্যতা মাপের সহজ কোন যন্ত্র নেই—কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত যে শুধু ডিগ্রি দিয়ে শিক্ষক নিযুক্ত করার জন্যই বাঞ্ছিত শিক্ষার সামগ্রিক ফল আমরা পাচ্ছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রিধারী ব্যক্তিও শিক্ষক হিসাবে ব্যর্থ হতে পারেন, যদি তাঁর শিক্ষাদান বিষয়ে প্রবণতা না থাকে। আমার মতে শিক্ষকতার প্রথম গুণ হবে শিক্ষা-প্রবণতা। অনেকেই জীবনের অন্যক্ষেত্রে চেষ্টা ক'রে, ব্যর্থ হয়ে সর্বশেষে শিক্ষকতায় আসেন। এঁদের নিজের উপর শ্রদ্ধা নেই, নিজের বৃত্তির উপরও নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে ফল খুব ভাল আশা করা যায় না। অপর পক্ষে প্রবণতা-গুণে একজন সাধারণ ডিগ্রি-সম্পন্ন শিক্ষকও নিজের শিক্ষাদান-ক্ষমতাকে বাড়িয়ে নিতে পারেন এবং ছাত্রদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেন।

শিক্ষকের চরিত্র ছাত্রের শ্রদ্ধার কারণ

পাণ্ডিত্যকে মানুষ প্রশংসা করে, চরিত্রকে শ্রদ্ধা করে। ছাত্রেরা শিক্ষকদের প্রধান বিচারক। অবসর-বিনোদনের সময় বন্ধুমহলে ছাত্রেরা প্রায়ই অধ্যাপকদের চরিতকথা আলোচনা ক'রে থাকে। এই সত্যটি যে কোন কর্ণবান্ শিক্ষকই উপলব্ধি ক'রে থাকবেন। আর শিক্ষক-মশায়দের নিজ ছাত্রজীবনের স্মৃতিতে ফিরে যেতে

অনুরোধ করি। সেখানে দেখতে পাব আমরাও আমাদের মাষ্টারমশায়দের নিয়ে কি সব আলোচনা করছি। কোন্ শিক্ষক ফাঁকিবাজ, কে ঘণ্টা পড়ার অনেক পর ক্লাসে আসেন এবং ঘণ্টা শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে যান, কে পাঠ্য বিষয়বস্তু না পড়িয়ে বাজে গল্প ক'রে ঘণ্টা কাটিয়ে গেলেন, কে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ডিসেম্বর মাসে পাওনা আদায় ক'রে নিলেন—এ-সব আমাদের গোপন মনের কথা ভাল করেই জানতে পারি। ফলে শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের খুব একটা শ্রদ্ধা থাকে না। অপরপক্ষে যদি তাদের অন্তর দিয়ে ভালবাসা যায়, তাদের পড়াশুনা এবং অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির জন্য চেষ্টা করা যায় এবং সর্বোপরি তাদের সামনে একটা নির্লোভ, সংযত ও নিষ্ঠাপূর্ণ জীবন যাপন করা যায়—তাহলে ছাত্রেরা শিক্ষককে আপনা থেকেই শ্রদ্ধা করে। শিক্ষকতা ক'রে শিক্ষকের বৃত্তিকে হেয় জ্ঞান করলে ছাত্রদের মনের উপর তার প্রতিক্রিয়া ভাল হয় না।

শিক্ষা—জীবন দিয়ে জীবন জাগানো

দীপ দিয়ে দীপ জ্বালানোর মত শিক্ষা হচ্ছে জীবন দিয়ে জীবন জাগানো। লেখা-পড়ার বাইরে যদি কোন বস্তু শিক্ষকের কাছ থেকে আশা করা যায়—সেটা হচ্ছে ছাত্রের জীবনে শিক্ষকের চরিত্রের প্রতিফলন। সমাজকে আমরা যত দোষই দিই না কেন, সমাজ এখনও 'চরিত্র পূজা' করে। নিজে অসদুপায়ে অর্থোপার্জন করলেও বাবা মনে-প্রাণে আশা করেন—আমার ছেলে সৎ হোক, বীর হোক, সত্যনিষ্ঠ হোক। খুব উদ্ধত দম্ভী পিতামাতাকেও দেখি, ছেলেকে স্কুলে ভরতি করবার সময় শিক্ষকের নিকট জোড়হাতে বিনয়ের সঙ্গে বলেন, 'এ ছেলেকে আপনার হাতে সঁপে দিলাম। আজ হতে এ আপনার ছেলে। তাকে মানুষ করার ভার আপনার।' যদি শিক্ষক হিসাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকি তাহলে ভেবে দেখতে হবে অভিভাবক বা সমাজ আমাদের কাছ থেকে যা আশা করেন তার কতটুকু দেবার আমরা উপযুক্ত করেছি নিজেদের। শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হ'লে নিজেদের বেতালে পা পড়ার সম্ভাবনা কম। ছাত্রের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার দায়িত্ব শিক্ষকের। পন্থা—চরিত্র-বল, পাণ্ডিত্য নহে। ছাত্র একবার 'যেন তেন প্রকারেণ' শ্রদ্ধাবান্ হয়ে উঠলে শিক্ষক যা বলবেন তা তার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হবে—মরমে আঘাত দেবে, ফলে ছাত্রের বিদ্যা এবং শিক্ষা দুই-ই হবে। একদিকে যেমন সে শিক্ষকের কাছ থেকে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত শিখবে—তমনি সে শিক্ষকের চরিত্র দেখে উদ্বোধিত হবে বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের জন্য। তিনিই যথার্থ শিক্ষক যিনি চরিত্র দ্বারা ছাত্রকে প্রভাবিত করতে পারেন।

আচার্য বনাম অধ্যাপক

আমরা টাকার বিনিময়ে ছাত্রকে বিশেষ কোন বিষয় শেখাই। এখন শিক্ষকতা মুখ্যতঃ জীবিকা মাত্র। আমি মাষ্টারি না ক'রে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অন্য বৃত্তি নিলেও পারতাম। টাকার বিনিময়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে বা ছাত্রের বাড়ীতে গিয়ে বা ছাত্রকে নিজের বাড়ীতে এনে একটা বিষয় পড়িয়ে বুঝিয়ে দিলাম। মাসান্তে তার বাবা বা বিদ্যালয় আমার চুক্তিবদ্ধ বৃত্তিটা দিয়ে দিলেন। বাহ্যতঃ সম্পর্কটা অর্থ-কেন্দ্রিক। কিন্তু যেহেতু একটা বিকাশশীল মন তার জিজ্ঞাসা নিয়ে আমার মনের সান্নিধ্যে আসে এবং আমি আমার বুদ্ধি ও মনের বিশ্লেষণকে তার মধ্যে সঞ্চারিত করি সেই জন্য সম্পর্কটা স্বভাবতই যান্ত্রিক হতে পারে না। প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে একটা বৃত্তি থাকে—নিজের

চিন্তা এবং ভাবনাকে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করার। আমি গণিত পড়াতে পড়াতে হয়তো কখনও আমার ভালমন্দ রুচিপছন্দকে কথায় বা কাজে আমার ছাত্রের সামনে প্রকাশ ক'রে ফেলি। একেই বলা যায় শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব (ভাল বা মন্দ গুণ) ছাত্রকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করে—এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এজন্যই অধ্যাপককে হতে হয় আচার্য। 'আচার্য' তিনি, যাঁর আচরণ অনুকরণীয়। আগে গুরুকুল বাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আচার্য-সান্নিধ্য-লাভ—অধ্যয়ন গৌণ। আরুণি, ধৌম্য-প্রমুখ শিষ্যগণ গোপালন, আচার্যের ক্ষেত্র-সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুরু ও গুরুপত্নীর জীবন দেখে একটা সুষ্ঠু জীবনের ধারণা নিয়ে শিক্ষাকে পূর্ণ করতে পারতেন। শিক্ষায়—বুদ্ধি-চর্চা অপেক্ষা জীবনচর্যার মূল্য বেশী। জীবন-চর্যার মূর্ত উদাহরণ আচার্য। আমরা যারা শিক্ষক—তারা আচার্য হবার দাবি কতটা করতে পারি ?

ছাত্রাবাস –আধুনিক গুরুকুল

আজকাল দেশে ভাল ছাত্রাবাসের অভাব—এরূপ অভিযোগ অভিভাবকেরা ক'রে থাকেন। নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও জীবনের মহৎ প্রেরণা প্রভৃতির অনুকূল পরিবেশপূর্ণ স্থানে অভিভাবকেরা ছাত্রদের রাখতে চান। কিছুদিন আগে খৃষ্টান মিশনারী-পরিচালিত স্কুল কলেজ ও ছাত্রাবাসকে দেশের লোক এরূপ আদর্শপূর্ণ শিক্ষাস্থান বলে মনে ক'রত। কার্যতও তাই ছিল—অস্বীকার করা যায় না। অধুনা রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত স্কুল কলেজ ও ছাত্রাবাসের জনপ্রিয়তা এবং চাহিদা দেশে প্রচুর। ৩।৪ বৎসরের শিশু থেকে ১৮।২০ বৎসরের যুবক সকলের ক্ষেত্রেই এইরূপ ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয় আদর্শ শিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত স্থান বলে অভিভাবকেরা মনে করেন। কিন্তু এরূপ ছাত্রাবাস বা শিক্ষায়তন চাহিদার তুলনায় খুবই কম। এসব ছাত্রাবাসেরও প্রাণকেন্দ্র কয়েকজন নিষ্ঠাবান্ ত্যাগী শিক্ষাব্রতী। তাঁরাই যথার্থ আধুনিক গুরুকুলের আচার্য। এরূপ 'দীপ্ত জীবন' দেশের সর্বত্র আশা করা যায় না কি ? যাঁদের সান্নিধ্য থেকে আরও নবীন জীবন বিকশিত হয়ে উঠবে সৌন্দর্যে ও সৌরভে ? দেশের শিক্ষক-সমাজের কাছে জাতি এই-ই চায়।

গৃহ ও বিদ্যালয়ের সমবেত সাধনা

গৃহে মা-বাবার ও পরিবারের শিক্ষাই শিশুর সংস্কার গঠন করে। তারপর বিদ্যালয় ও তার শিক্ষক। সুতরাং শিক্ষক, শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসের দোষ দেখার আগে অভিভাবকের নিজের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে হবে। শিশুর সামনে 'আচার্য' হতে হবে, তারপর শিক্ষক। মা-বাবার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ, তাও নিজের সন্তানের মধ্যে। শিক্ষকের দায়িত্ব বৃহত্তর ক্ষেত্রে—সমাজের সকলকে নিয়ে গৃহ ও বিদ্যালয়ের যুগপৎ সমবেত সাধনায় আমাদের ভাবী পুরুষ অবশ্যই 'মানুষ' হবে।

আমেরিকায় ভারত-ধর্মের প্রভাব

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

স্বামীজীর কথা দিয়েই শুরু করি :

Many things strike me here (in America). It may be fairly said that there is poverty in this country. I have never seen women elsewhere as cultured and educated as they are here. Well educated men there are in our country, but you will scarcely find anywhere women like those here. It is indeed true that goddesses themselves live in the houses of virtuous men. I have seen thousands of women here whose hearts are as pure and as stainless as snow.

এ-থেকে এটুকু বোঝা যায় যে ধর্মীয় মনোভাব সকল দেশের লোকের মধ্যেই আছে; কোন বিশেষ দেশের তা একচেটিয়া নয়। হয়তো সব মানুষের মধ্যে এর খোঁজ পাওয়া যাবে না। কিন্তু একদল মানুষ সব জায়গাতেই আছেন যাঁদের মন ধর্মমুখী।

তবে দূর থেকে দেখে তো সব বোঝা যায় না। কাছ থেকে দেখলে অনেক ভুল ধারণারই অবসান হয়। অনেকেই মনে করেন ডলারই আমেরিকার একমাত্র ভগবান। আমেরিকাকে কাছ থেকে জানার আগে আমারও তাই ছিল ধারণা। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখেছি সে ধারণা ভুল। ঐহিক ঐশ্বর্যের জন্যে আমেরিকানরা প্রাণপাত পরিশ্রম করছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে ধর্মপ্রবণতাও বেশ চোখে পড়ে। ওয়াশিংটন ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টারের এক বক্তৃতায় শুনেছিলাম যে, ইদানীং চার্চের সভ্য-সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু এতে যতটা না বিস্মিত হয়েছি, তার চেয়েও বেশি হয়েছি আমেরিকানদের মধ্যে পরধর্মসহিষ্ণুতা দেখে। খ্রীষ্টান ধর্মেরই নানা শাখা প্রশাখা; এর প্রায় সবগুলিই আমেরিকানদের মধ্যে দেখা যায়। প্রোটেস্ট্যাণ্ট, ক্যাথলিক, প্রেসবিটেরিয়ান, মেথডিষ্ট—আরও কত কি! কিন্তু ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বিরোধ নেই।

এ-সম্পর্কে একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। শিকাগোয় পৌঁছবার পর একদিন শ্রীমতী হেলমেট মেয়ারের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। শহরের উপকণ্ঠে South Luellaতে বাড়ি। শ্রীমতী মেয়ার কথায় কথায় জানালেন যে, তাঁর এবং তাঁর পরলোকগত স্বামীর ধর্ম-বিশ্বাস ছিল পৃথক; তাঁরা পৃথক্ পৃথক্ গীর্জায় যেতেন। কিন্তু এই নিয়ে সংসারে তাঁদের মধ্যে কোন দিন কোন বিরোধ দেখা দেয়নি। তাঁর ছেলেমেয়েরা তাদের পিতার ধর্মে বিশ্বাসী। তিনি এ নিয়ে কোন দিন আপত্তি করেননি। শ্রীমতী মেয়ারের এই উদারতা আমাকে সেদিন বিশেষ বিস্মিত করেছিল।

আরও দেখেছি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রতি আমেরিকানদের প্রবল আগ্রহ। শুধু অধ্যাপক সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই আগ্রহ প্রচুর।

অবশ্য এই আগ্রহের মূলে প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে তাঁর বক্তৃতা এবং তারপর আমেরিকায় তাঁর কার্যাবলীর

ফলেই ভারত-ধর্ম সুষ্ঠুভাবে আমেরিকায় প্রচারিত হ'তে শুরু করে।

বিবেকানন্দের মধ্য দিয়েই আমেরিকা সেদিন পরিচয় পেয়েছিল ভারত-ধর্মের উদারতার, বিশ্ব-বোধের। সহিষ্ণুতা, সহযোগ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাই যে ভারতীয় ধর্মের মূলমন্ত্র—বহু প্রমাণ ও উদ্ধৃতি দিয়ে স্বামীজী সেদিন তা সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

শুধু তো শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে বক্তৃতা-দানই নয়, বলতে গেলে গোটা আমেরিকাতেই তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন ঝড়ের বেগে, বক্তৃতা দিয়েছেন অসংখ্য, ব্যাখ্যা করেছেন ভারতের ধর্ম ও দর্শন। আশ্চর্য নয় যে, সেদিন আমেরিকায় তিনি অভিহিত হয়েছেন Cyclonic Hindu এবং Lightning Orator নামে। স্বামীজীর সেই সব বক্তৃতায় ধর্মভাব আমেরিকার জীবনের মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ ইতিহাস অবশ্য অনেকেরই জানা।

স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্ম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা যাঁরা করছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্রের সংখ্যা এগারটি। ইচ্ছে ছিল এর সব কটিই দেখে যাব। অন্যান্য কাজ ও সময়ের স্বল্পতার জন্যে তা সম্ভব হয়নি। তবু অনেকগুলি কেন্দ্রেই আমি গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে বিশেষ প্রীত হয়েছি এবং কেন্দ্রগুলির কার্যকলাপ আমাকে বিশেষ মুগ্ধ করেছে। সে বিবরণে পরে আসছি।

তার আগে আমেরিকায় ভারত-ধর্ম প্রচারে একটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়; সে নাম স্বামী অভেদানন্দ। ১৮৯৭ খৃঃ আগষ্ট মাসে তিনি আমেরিকায় এসে পৌছান। এর আগে স্বামীজী তাঁকে নিয়ে আসেন লণ্ডনে। তাঁর জ্ঞান, মনীষা ও অভিজ্ঞতার ফলে শীঘ্রই তিনি ভক্তদের শ্রদ্ধা অর্জন করেন এবং নিউ ইয়র্কের কার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় আসেন, তখন তিনি স্বামী অভেদানন্দের সাফল্যে বিশেষ মুগ্ধ হন। অভেদানন্দের বন্ধু, অনুরাগী ও ছাত্রের সংখ্যা সেই সময় ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯০১ খৃঃ তাঁর বক্তৃতা এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে কোন কোন দিন শ্রোতার সংখ্যা ছয় শতে পৌছাত। স্বামী অভেদানন্দ সেই সময় যেসব পুস্তক রচনা করেন তার সংখ্যাও প্রচুর।

*　　*　　*

এবার আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। নিউ ইয়র্কের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারের স্বামী নিখিলানন্দ আমায় একদিন চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। সেদিন ঝিরঝির ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। আমরা গল্প করছিলাম সেণ্টারের গেস্ট রুমে বসে বসে।

নিখিলানন্দ এককালে কলকাতার 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সহ-সম্পাদক ছিলেন। তিনি তাঁর সাংবাদিক জীবনের গল্প শোনাচ্ছিলেন। তখন খবরের কাগজে রিপোর্টার খুব বেশি থাকত না। তাই সহ-সম্পাদক হয়েও তাঁকে একাধিক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অধিবেশনের 'রিপোর্ট' করতে হ'ত।

নিখিলানন্দ বললেন, তিনি যখন প্রথম আমেরিকায় আসেন তখন তিনি সাংবাদিকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতেই আমেরিকাকে দেখেছিলেন। তিনি তখনই লক্ষ্য করেছিলেন যে, আমেরি-কানদের মধ্যে একটা ধর্মভাব রয়েছে। কিন্তু সেটা রয়েছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। তিনি ভেবেছিলেন সেদিনই যে, যদি এই সুপ্ত ধর্মভাবকে জাগিয়ে তোলা যায়, তবে তা হবে একটা বিরাট কাজ।

নিখিলানন্দের কথা শুনে আমার স্বামী বিবেকানন্দের একটা কথা মনে পড়ল। স্বামীজী একবার বলেছিলেন: Education is the manifestation of perfection already in man. আমেরিকা সত্যই উচ্চশিক্ষিতের দেশ। তাদের মধ্যে যে নানা বিষয়ে perfection (সিদ্ধি) আসবে তা খুবই স্বাভাবিক। ধর্মভাবটাও শিক্ষিত মানুষের মধ্যে থাকার কথা এবং সেই ধর্মভাবকে জাগিয়ে তোলা সত্যই একটা মহৎ কাজ।

নিখিলানন্দ সেদিন আমাকে তাঁর সেণ্টারের সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি সেখানে ইতিপূর্বে এসেছেন তাঁদের কথা বললেন। আরও জানালেন যে, এই সেণ্টারে যে সব বক্তৃতা হয় তাতে বহু আমেরিকান যোগ দিয়ে থাকে এবং এদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে।

প্রায় পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় নিখিলানন্দ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে, ভারত-ধর্মের আদর্শ আমেরিকানরা ক্রমশঃ আরও বেশি ক'রে উপলব্ধি করছে। এর ফলে দু'দেশের মধ্যে বোঝাপাড়া উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বামী নিখিলানন্দ আমেরিকার বুদ্ধিজীবী-মহলে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন। তাঁর যে সকল রচনা বিশেষ আদৃত হয়েছে—তার মধ্যে The Gospel of Sri Ramakrishna, গীতা ও উপনিষদের অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। নিউ ইয়র্ক থেকে মাইল ৪০ দূরে একটা গ্রামে এক সংবাদপত্রগোষ্ঠীর মালিক Crowell Colliers-এর International Manager-এর বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছি। খাওয়া-দাওয়ার পর গৃহকর্ত্রী বললেন: আমার মা এখানে আছেন, আপনি আজ আসছেন শুনে তিনি বিশেষ উল্লসিত। যদি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করেন তবে তিনি খুব খুশি হবেন।

গৃহকর্তাও অনুরূপ অনুরোধ করলেন। রাজী হলাম। বললাম, নিশ্চয় দেখা ক'রব।

গৃহকর্ত্রী আমায় উপরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি ঘরে মৃদু আলোর নীচে খাটে শুয়ে আছেন অতি বৃদ্ধা এক মহিলা। উত্থানশক্তি-রহিত। আমি নমস্কার করার আগেই আমায় করজোড়ে নমস্কার করলেন।

সবিস্ময়ে দেখলাম তাঁর শয্যার নিকট দেওয়ালে তিনটি ছবি টাঙানো—যীশু, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। আমার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করার পরই তাঁর দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। বার বার 'সোয়ামীজী'র কথা বলতে লাগলেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন নিখিলানন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না?

জানালাম, হ্যাঁ।

—আবার কি দেখা হবে তাঁর সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

শুনে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন যে, আমি যেন নিখিলানন্দকে বলি—যাতে তিনি এসে এই বৃদ্ধাকে একবার দর্শন দিয়ে যান। আরও জানালেন স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর কাছেই তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা শোনেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এবং ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে অনেক বই পড়েছেন বলে জানালেন।

আমি যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দেশের মানুষ এবং আমার সঙ্গে তিনি যে আলাপ করতে পেরেছেন, এ-জন্য তিনি বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করছেন বলে জানালেন সেই বৃদ্ধা।

ভারতের প্রতি, ভারত-ধর্মের প্রতি সেই মার্কিন মহিলার অকৃত্রিম অনুরাগের কথা কোন দিন ভুলতে পারব না।

নিউ ইয়র্কে রামকৃষ্ণ মিশনের আর একটি কেন্দ্র আছে। বর্তমানে স্বামী পবিত্রানন্দের তত্ত্বাবধানে এই কেন্দ্রটি পরিচালিত। কেন্দ্রটির নাম—বেদান্ত সোসাইটি।

পবিত্রানন্দের আমন্ত্রণে এই কেন্দ্রে প্রায় পুরো একটি দিন কাটাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আশ্রমে গিয়েই দেখা পেলাম এক আমেরিকান আশ্রম-সেবিকার। তাঁর সেই শান্ত সৌম্য মূর্তি আজও চোখে ভাসছে। তাঁর মুখভাবই বলে দেয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে উৎসর্গীকৃত তাঁর জীবন

পবিত্রানন্দের সঙ্গে আমেরিকায় ভারতীয় ভাবাদর্শের প্রভাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হ'ল। স্বামীজী বললেন, আমেরিকা জড়বিজ্ঞানের দেশ, কিন্তু এখানে ধর্মবিশ্বাসী মানুষও কম নয়। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ বলে ভারতের প্রতি আমেরিকানদের গভীর শ্রদ্ধা।

পবিত্রানন্দ একটি আমেরিকান যুবকের কথা বললেন। ছেলেটি প্রায়ই আসত এই আশ্রমে বক্তৃতা শুনতে। হঠাৎ একদিন সে আসা বন্ধ ক'রল। কিছুদিন পরে স্বামীজীর সঙ্গে তার দেখা হতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে আর আসে না কেন আশ্রমে? ছেলেটি উত্তরে জানালে যে, বাবা-মায়ের বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে তার মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, তাই সে আসতে পারেনি।

পবিত্রানন্দ বললেন, এ-ঘটনা একটাই নয়। আমেরিকায় 'broken homes' (ভাঙা ঘর)-এর সমস্যা একটা বড় সমস্যা। এর ফলে আমেরিকান-দের জীবনে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। তাই শান্তি খুঁজতে এরা অনেকেই আসে আমাদের এই আশ্রমে।

এর পর লস্ এঞ্জেলেসের বেদান্ত মঠ। এই আশ্রমে যে বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

সন্ধ্যায় পৌছেই চোখে পড়ল—একদল নরনারী মা কালীর একটি মূর্তি তৈরী করছেন। তাঁদের সকলেই আমেরিকান। আমি আশ্চর্য হয়ে বহুক্ষণ ধরে দেখলাম মূর্তিনির্মাণে তাঁদের একাগ্রতা, তাঁদের চোখ-মুখের ভক্তিনম্রভাব।

আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ তখন সেখানে ছিলেন না। দুর্গাপূজা উপলক্ষে তিনি গিয়েছেন লস্ এঞ্জেলেস থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে—সাণ্টা বারবারায়। সেখানে পূজা হয়েছে স্বামীজীর সহকারী স্বামী বন্দনানন্দ তখন আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত।

মূর্তি গড়া রেখে সেই আমেরিকান নরনারীদের একজন আমাকে ভারপ্রাপ্ত সহকারীর কাছে নিয়ে গেলেন। স্বামীজীর সহকারীর বাংলা শুনে বুঝতেই পারিনি যে তিনি বাঙালী নন, মাদ্রাজী—এমন চমৎকার বাংলা বলেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যায় অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছিল।

পরের দিনই প্রভবানন্দ ফিরে এলেন আশ্রমে। আমায় খবর দেওয়া হ'ল যে তিনি এসেছেন এবং পরদিন আশ্রমে আমার মধ্যাহ্ন-ভোজের নিমন্ত্রণ।

পরদিন তাঁর সঙ্গে দেশের গল্পগুজব হ'ল অনেক। স্বামী প্রভবানন্দ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ করেছেন। সেই অনুবাদের ভূমিকা লিখেছেন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ সাহিত্যিক আলডুস্ হাক্সলি। আমাকে এক কপি উপহার দিলেন তিনি। বহু সংস্করণ হয়েছে বইটির—ভারত-ধর্মের প্রতি আমেরিকার মানুষের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের আর একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

মধ্যাহ্নভোজের সময় বহু আমেরিকানের

সঙ্গে একত্র মিলিত হলাম, ভোজে ভারতীয় আহার্যই পরিবেশিত হ'ল। সকলের গায়েই সাধারণ পোষাক। দেখলাম, ভারতের বাহুল্যহীন সরল জীবনযাত্রায় এরা বেশ অভ্যস্ত।

কথায় কথায় একটা বিষয়ের প্রতি স্বামী প্রভবানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। বললাম, রামকৃষ্ণ মিশন আমেরিকায় খুবই উল্লেখযোগ্য কাজ করছে। কিন্তু এই কাজ প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর দিকেই কেন্দ্রীভূত। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল এই দিক থেকে যেন অবহেলিত বলে মনে হয়। অথচ দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রোদের বিবিধ সমস্যা গুরুতর। সেখানে ধর্মের প্রচার আরও বেশি প্রয়োজন, সুতরাং দক্ষিণাঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের কতকগুলি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয় কি?

উত্তরে প্রভবানন্দ বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তো বটেই। কিন্তু এই প্রয়োজন মেটানো যাচ্ছে না উপযুক্ত সন্ন্যাসীর অভাবে। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের যাঁরা ভারপ্রাপ্ত হবেন তাঁদের শুধু ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকলেই চলবে না; জ্ঞান প্রচার করার, সেই ধর্ম ও দর্শন সকলকে উপলব্ধি করানোর কৌশলও তাঁদের জানতে হবে।

এরপর শিকাগোর বেদান্ত সোসাইটি। এই কেন্দ্রের প্রধান হলেন স্বামী বিশ্বানন্দ।

টেলিফোনে এনগেজমেণ্ট ক'রে এসেছিলাম। স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ ক'রে খুব আনন্দ পেলাম। তাঁর সদাহাস্যময় মুখটি সদা প্রশান্ত।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বিশ্বানন্দের খুব আগ্রহ। অনেক আলোচনা হ'ল। কথায় কথায় এল অচিন্ত্যকুমারের 'পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ' গ্রন্থের কথা। তিনি বললেন, বইটি অতি সুন্দর হয়েছে; তবে কোথাও কোথাও যেন তথ্যের বিকৃতি ঘটেছে। সেটুকু না থাকলেই ভালো হ'ত।

তারপর পর উঠল শিকাগোর সেই বিখ্যাত ধর্মমহাসম্মেলনের কথা। বিশ্বানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, যেখানে স্বামীজী বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই শিকাগো মিউজিয়ম-হলে গিয়েছিলেন নাকি?

বললাম, এখানে পৌছানোর পরই গিয়েছিলাম। শিকাগোকে তীর্থক্ষেত্র মনে করেই এখানে এসেছি। মিউজিয়াম-হলে না গিয়ে পারি?

ধর্মমহাসম্মেলনের অনেক গল্প বললেন বিশ্বানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা আমেরিকাবাসীর মনে কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল তা তো সকলেরই জানা।

বিশ্বানন্দ জানালেন, এই আশ্রমে প্রায়ই নতুন নতুন আমেরিকান দর্শক ও শ্রোতা আসেন। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে এঁদের আগ্রহ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। চূড়ান্ত ভোগবিল'সের মাঝেও তাঁদের মনে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, 'What next?'—ততঃ কিম্? ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের মধ্যেই যে প্রকৃত শান্তি নেই তা ধীরে ধীরে এঁরা বুঝতে পারছেন। তাই ভারত-ধর্মের প্রতি আগ্রহ।

বিশ্বানন্দের কথা শুনে আমার মনে পড়ল আমার এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা।

রাজধানী ওয়াশিংটনে আমন্ত্রণ পেয়ে নিডহাম* দম্পতির বাড়ি গিয়েছি। ঢুকেই থমকে দাঁড়াই। দু'দিকের দেওয়ালে বাঙলাদেশের শিল্পীদের ছবি। যামিনী রায়, গোপাল ঘোষ, সুনীলমাধব। ঘরের এক কোণে বাঁকুড়ার প্রকাণ্ড এক কাঠের ঘোড়া, শান্তিনিকেতনের শিল্পসম্ভার, দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি মূর্তি। মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটনে রীতিমত একটি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম।

* মিঃ নিডহাম, প্রাক্তন ডাইরেক্টর, USIS, United States Information Service, Calcutta.

মিঃ নিডহ্যামকে জিজ্ঞেস করলাম, মিসেস নিডহ্যাম কোথায়?

বললেন, আমার বাবা-মা তু'জনেই অসুস্থ। তাঁদের পরিচর্যার জন্যে স্ত্রী নিউ ইয়র্কে। আমাকেও মাঝে মাঝে যেতে হয়।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বাবার বয়স কত?

প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন মিঃ নিডহ্যাম। তারপর বললেন, জানেন মিঃ বোস, বাবার বয়সের কথা উঠতেই চট ক'রে আমার মনে পড়ে গেল আমাদের জীবন-নীতির সঙ্গে ভারতীয় জীবন-দর্শনের তফাতের কথা। আমার বাবার বয়েস সত্তরের ওপর। মার বয়েস তার কাছাকাছি। কিন্তু আমাদের তো আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। বয়েসের কথা তো আমরা কোন দিন ভাবি না। এ ব্যাপারে আপনাদের ব্যবস্থা কিন্তু সুন্দর। পঞ্চাশে পা দিয়েই মনকে ঈশ্বর-মুখী করবার উদ্যোগ। আমার সত্যি ভালো লাগে এই আইডিয়া।

কথায় কথায় গীতায় বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের কথা তোলেন নিডহ্যাম। জিজ্ঞেস করলেন সেই সংস্কৃত শ্লোকটি মনে আছে কি না আমার। ভাগ্যি মনে ছিল, তাই বললাম:

তুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

এ-শ্লোকের ব্যাখ্যায় আর একটি শ্লোকের উল্লেখ—যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে স্থিতধী মানুষের তুলনা:

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ॥
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

শ্লোক শুনে নিডহ্যাম উল্লসিত। ভারতের সঙ্গে যে তাঁর প্রাণের যোগ!

সবশেষে রামকৃষ্ণ মিশনের বোষ্টন কেন্দ্রের কথা বলি। বোষ্টনে ডঃ অমিয় চক্রবর্তী রয়েছেন। ইচ্ছে ছিল তাঁর সঙ্গেই বোষ্টন আশ্রমে যাব। ডঃ চক্রবর্তীর মুখেই বোষ্টনে অখিলানন্দের কার্যাবলীর কথা শুনেছিলাম। কিন্তু সেই সময় স্বামী অখিলানন্দ আশ্রমে ছিলেন না। তিনি প্রভিডেন্সে গিয়েছিলেন বক্তৃতা দিতে। বোষ্টন থেকে নিউ হ্যাম্পশায়ারে ডারহ্যাম যাই। যাবার সময় আশ্রমে জানিয়ে যাই যে, আবার বোষ্টনে ফিরে এলে জানাব।

বোষ্টনে ফেরার আগে আশ্রমে খবর দিয়েছিলাম। স্টেশনে পৌছে দেখি স্বয়ং স্বামী অখিলানন্দ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা হ'ল স্টেশনে বসে। তিনি আমাকে নিউ ইয়র্কের ট্রেনে তুলে দিলেন, এবং আর একবার বোষ্টনে আসতে বললেন।

দেশে ফেরার আগে স্বামীজীর কথায়ই একবার বোষ্টন কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। আশ্রমের ধর্মসভায় যোগদান করেছিলাম সেবার। দেখলাম, যোগদানকারী আমেরিকানের সংখ্যা মোটেই কম নয়।

কথায় কথায় বললেন স্বামী অখিলানন্দ, আমেরিকা উচ্চশিক্ষিতের দেশ হলেও তাদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলা আজও রয়েছে। তাদের অনেকের মন আজ ধর্মাভিমুখী হচ্ছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার ও ধর্মভাব জাগিয়ে তোলার সুযোগ এখনও যথেষ্ট রয়েছে। সেই কাজেই আমরা আত্মনিয়োগ করেছি।

বোষ্টনে স্বামী অখিলানন্দের প্রভাব অপরিসীম, দলে দলে লোক আসে তাঁর মুখে ভারতের কথা, ভারত-ধর্মের কথা শুনতে। তার মধ্যে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাও কম নয়।

বোষ্টনে থাকতে একথাও আমি জেনেছিলাম

যে, স্বামী অখিলানন্দ ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজীর উপদেষ্টা কমিটির অন্যতম সদস্য।

শুনে আনন্দিত এবং বিস্মিত হলাম। এই ইনস্টিটিউট বিশ্বের মধ্যে কারিগরিবিদ্যা-শিক্ষার সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। তাঁরা স্বামীজীকে তাঁদের অন্যতম উপদেষ্টা নির্বাচিত করেছেন। ভারতীয় সন্ন্যাসীদের প্রতি আমেরিকাবাসীর শ্রদ্ধার এ একটি বিশেষ নিদর্শন।

রামকৃষ্ণ মিশন ছাড়া যোগদা-সৎসঙ্গ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন প্রচারের জন্য কাজ করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। লস এঞ্জেলেসে এদের প্রধান কেন্দ্রের নাম Self Realisation Fellowship Centre. এর কার্য পরিচালনা করেন আমেরিকানরা। মনে হয়, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন প্রচারের কাজ ভারতীয়দের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হলেই ভালো।

শেষকালে আর একজনের নাম উল্লেখ করি: অধ্যাপক হরিদাস চৌধুরী। সানফ্রান্সিস-কোয় তাঁর আশ্রম। ভারতীয় ধর্ম প্রচারে অরবিন্দের দর্শনের ওপরই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

আমাদের দূতাবাসগুলির মাধ্যমে যে সব প্রচারকার্য চলে থাকে তা প্রধানতঃ রাজ-নৈতিক; তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু বে-সরকারীভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের দ্বারাও যে আমেরিকার মতো জড়বিজ্ঞানে উন্নত একটি দেশে ভারত-ধর্ম ও ভারত-সংস্কৃতির প্রচারে অনেক কাজ হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে ঘুরে বেড়িয়ে সে ধারণাই আমার হয়েছে।

আমার ঠাকুর

শ্রীশান্তশীল দাস

আমার ঠাকুর সহজ মানুষ ভারি,
গরিব ঘরের ছেলে,
আমার ঠাকুর নয় উপাধিধারী,
জ্ঞান যে কোথায় পেলে!
আমার ঠাকুর বৈরাগী নয় মোটে,
সবার মাঝেই থাকে,
আমার ঠাকুর—যেথায় সবাই জোটে,
সবাই যে পায় তাকে।
আমার ঠাকুর মাটির মা'কে ডাকে,
মাটিতে পায় সাড়া,
আমার ঠাকুর দেখতে যে পায় মাকে,
মায়ের মাঝেই হারা।
আমার ঠাকুর সহজ কথাই বলে,
সবই যে তার সোজা,

আমার ঠাকুর সহজ পথেই চলে,
সহজে যায় বোঝা।
আমার ঠাকুর সবার পূজা করে,
সব দেবতার প্রিয়,
আমার ঠাকুর মেলায় এসে ধরে,
—বিশ্বে বরণীয়।
আমার ঠাকুর যা বলে তাই বেদ,
জীবকে দেখে শিব,
আমার ঠাকুর ঘোচায় ভেদাভেদ,
দিব্য জ্ঞানের দীপ
আমার ঠাকুর অশরণের শরণ,
আতুর জনের ঠাঁই,
আমার ঠাকুর সকল কলুষ হরণ,
তুলনা তাঁর নাই।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল

॥ কাব্যপরিচয় ও সমালোচনা ॥

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমদনমোহন গোস্বামী

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। চৈতন্য-জীবনী কাব্য ব্যতীত এই শতাব্দীতে প্রাচীন ধারার 'পাণ্ডববিজয়' এবং 'চণ্ডীমঙ্গল' নামক দুইটি পাঁচালী কাব্য প্রথম পাওয়া গেল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের পূর্বে রচিত 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য পাওয়া যায় না।

বঙ্গদেশে সুপ্রাচীন কাল হইতেই চণ্ডীদেবীর (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী) মাহাত্মাবিষয়ক নানাবিধ কাহিনী প্রচলিত। এই কাহিনীগুলির মধ্যে দুইটি—'কালকেতু-ফুল্লরা' ও 'ধনপতি-খুল্লনা'—পঞ্চদশ শতক হইতেই 'চণ্ডীমঙ্গল' পাঁচালী কাব্যের বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 'অন্নদা-মঙ্গল' এর দেবীর মত সৌম্য না হইলেও 'চণ্ডী-মঙ্গল'-এর দেবী উগ্রা নহেন; তিনি পশুপালিকা, ব্যাধ ও পশুপালকাদির আরাধ্যা, এবং 'কান্তার-কামিনী'। অবশ্য এই পাঁচালী কাব্যের চণ্ডী-দেবীর আর্য-মূর্তির উপর লৌকিক ধর্মের বিবিধ প্রলেপ পড়িয়াছে, ইহা সর্বদাই স্বীকার্য। 'চণ্ডী মঙ্গল'-এর কাহিনীযুগলের উপাস্যা দেবীও সর্বতো-ভাবে অভিন্ন নহেন। গোধাবাহন বা গোধা-প্রতীক-যুক্তা দেবীর মূর্তি আর্যাবর্তের সর্বত্র পাওয়া যায়। ধনপতি-কাহিনীর উপাস্যা অষ্ট-তণ্ডুল-অষ্টদূর্বা উপচারে পূজিতা দেবী বনদুর্গা। অনুমান হয়, দুইটি কাহিনীই কোন অপভ্রংশে ছিল, অন্ততঃ 'ফুল্লরা', 'খুল্লনা' নামগুলি দেখিয়া তাহাই মনে হয়। ধনপতির কাহিনী মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ব্রতকথা হইতে আসাও বিচিত্র নহে। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' গ্রন্থে আদৌ উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশস্থিত 'মঙ্গলকোট'-এর অনুসরণে উত্তর-রাঢ়দেশে উজানী মঙ্গলকোটের উল্লেখ আছে এবং ইহাতে দেবীর 'গোধিকারূপ ধারণ', 'কমলে-কামিনী' ইত্যাদির কথা আছে—

> ত্বং কালকেতুবরদাচ্ছলগোধিকাসি
> যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
> শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজঃ সসূনো
> রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥

মঙ্গলচণ্ডীর নাম-সম্পৃক্ত কোন কোন অর্বাচীন পুরাণে যে মঙ্গল-দৈত্যের কাহিনী পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কল্পনা। ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত 'মঙ্গল চণ্ডিকা' ব্রতকথার সহিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কোন সম্পর্ক নাই। মঙ্গলচণ্ডীর নামের অর্থ দেবী মঙ্গলময়ী এবং তাঁহার পীঠস্থানের নাম মঙ্গলকোট। কালকেতুকে বরদানকারিণী দেবী পৌরাণিক মহিষমর্দিনী।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে মঙ্গলচণ্ডী-কাহিনীর লোকপ্রিয়তা বৃন্দাবন দাসের কাব্য হইতে জানা যাইতে পারে—

> ধর্ম কর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
> মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥

ইহার পূর্বেও যে কাহিনীটি বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের বাল্মীকি মাণিক দত্ত। মুকুন্দরামের কথা—'মাণিক দত্তের দাণ্ডা করিয়ে প্রকাশ', এই জনশ্রুতির স্বীকৃতি মাত্র—

> আদ্য কবি বন্দিলাঙ মহামুনি ব্যাস।
> মাণিক দত্তের আজ্ঞা করিয়ে প্রকাশ॥

কিন্তু মাণিক দত্তের যে পুঁথি পাওয়া যাইতেছে তাহা অত্যন্ত প্রাচীন নহে, যদিচ রচনাটি

প্রাচীন ছড়াবহুল এবং এই মাণিক দত্ত পূর্বতন অপর জনৈক মাণিক দত্তের নিকট ঋণী। এই ঋণের পরিমাণ নির্ণয় করাও সহজ নহে। কাব্যের উপক্রমণিকায় ধর্মমঙ্গল-কাব্যানুসারী সৃষ্টিকাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা অবশ্য কাব্যের প্রাচীনত্বের পরিপোষক—

অনাদ্যের উৎপত্তি জগত সংসারে।
হস্তপদ নাহি ধর্মের ভ্রমে নৈরাকারে॥
আপনে ধর্ম গোঁসাঞি গোলোক ধিয়াইল।
গোলোক ধেয়াইতে ধর্মের মুণ্ড সৃজিল॥

* * *

গান করে দেবীর ব্রত সুখী সর্বজয়া।
যে ঘটে অবতার করিবে মহামায়া॥
দেবীর চরণে মাণিক দত্তে গায়।
নায়কের তরে দুর্গা হবে বরদায়॥

অনুরূপ ভাবে সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল-কাব্যে চণ্ডীদেবতার উল্লেখ রহিয়াছে। মুকুন্দরামের কাব্যের কোন কোন মুদ্রিত সংস্করণের আদিতে ধর্মঠাকুর সম্বন্ধীয় শ্লোকাবলী প্রক্ষিপ্ত হইতে দেখা যায়। আসল কথা হইতেছে মনসা, ধর্ম, চণ্ডী, শিব ইত্যাদি অপৌরাণিক দেবতা-বিষয়ক ছড়া বা পাঁচালীগুলির মূলে আর্য ও আর্যেতর উপাদানের সংমিশ্রণ রহিয়াছে। বিবিধ পাঁচালীতে বিবৃত একই জাতীয় সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ইহারই ফল বলা যায়। পুনশ্চ—সহজিয়া ও বাউলদিগের রচনায় সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং এই উভয় বিবৃতির কোনটিই পৌরাণিক নহে। ইহাও লক্ষণীয় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেবের মহান্ আদর্শ ও তৎসম্পৃক্ত সাহিত্যের মধ্যেও লৌকিক, অপিচ বহু অংশে অমানবিক চণ্ডীকাব্য আপনার স্থান করিয়া লইয়াছিল।

মুকুন্দরামের কাব্যের সহিত ঐক্য বর্তমান মাধবাচার্য [=দ্বিজ মাধব, মাধবানন্দ]-প্রণীত চণ্ডীমঙ্গলকাব্য 'শারদাচরিত'-এর। কাব্যরচনা-কাল ১৫০১ শক=১৫৭৯–৮০ খ্রীঃ। উভয় চণ্ডীতে বহু অংশে মিল পাওয়া যায়। তবে এই মাধবাচার্য গঙ্গামঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য-রচয়িতা মাধবাচার্যের সহিত অভিন্ন কি না বলা শক্ত। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যকর্তা মাধব নামধেয় ব্যক্তির সংখ্যাও একাধিক। 'সারদাচরিত'-রচয়িতা মাধব ও 'গঙ্গামঙ্গল'-কাব্যপ্রণেতা মাধবও এক ব্যক্তি সম্ভবতঃ নহেন, যদিচ উভয়ের কাব্যে গণেশ-বন্দনা অংশে কিছু মিল আছে। মাধবের কাব্যে কাহিনী সংক্ষিপ্ত ও শিবায়ন অংশ বর্জিত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ-উপাধিক মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (খ্রীঃ ষোড়শ শতকের শেষ পাদ)। ইহার পূর্ববর্তী বলিয়া কথিত কবি বলরাম শ্রীকবিকঙ্কণ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুইটি ধারা। একটি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ, অপরটি লৌকিক কাহিনীমূলক শিবায়ন খণ্ড, গোধিকা খণ্ড ও কমলে-কামিনী খণ্ড—এই তিন উপভাগে বিভক্ত। মুকুন্দরামের কাব্যে মূলতঃ দ্বিতীয় ধারা-টিই পাইতেছি। সপ্তদশ শতক হইতে প্রথম ধারায় বহু কাব্য বিরচিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শত-কের শেষের দিকেও পূর্ববঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রণীত হইয়াছে; পুনশ্চ অনেক কবির কাব্যে দুই ধারা মিলিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত দিতেছি। জনার্দনের 'চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালীতে' কেবল ধনপতির আখ্যান আছে। দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীমঙ্গল-এ (১৭ শতক) উভয় কাহিনীই রহিয়াছে। কৃষ্ণ-রাম দাসের 'রায়মঙ্গল'-এ কমলে-কামিনীর অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের অধিকাংশ দেবী-মাহাত্ম্য কাব্য মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বনে রচিত। এই পর্যায়ে পড়ে কৃষ্ণজীবনের 'অম্বিকামঙ্গল' বা 'অভয়া-মঙ্গল' (পুঁথি-লিপিকাল ১২১৬ সাল), মুক্তারাম সেনের 'সারদামঙ্গল' (১৭৪৭ খ্রীঃ), ব্রজলাল-রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' (পুঁথি খণ্ডিত), ভবানীশঙ্কর

দাসের 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা' (১৭৭৯-৮০ খ্রীঃ), গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণের পাঁচালী, শিবচরণ সেনের 'গৌরীমঙ্গল', হরিশ্চন্দ্র বসুর 'চণ্ডীবিজয়', দ্বিজ কমললোচনের 'চণ্ডিকাবিজয়' (১৭ শতক ?), হরিনারায়ণ দাসের 'চণ্ডিকামঙ্গল', রামশঙ্কর দেবের 'অভয়ামঙ্গল', জয়নারায়ণ সেন [=রায়]-এর 'চণ্ডিকামঙ্গল' প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি ক্ষুদ্র পাঁচালীর পুঁথি চাটিগাঁ অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে; যেমন, 'ঘোর মঙ্গলচণ্ডী', দ্বিজ রঘুনাথ-বিরচিত 'নিত্যমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী', মদনদত্ত ও দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রের পাঁচালী, দেবীদাস সেনের 'শ্রীমন্তের চৌতিশা', শ্রীচাঁদ দাসের 'কালকেতুর চৌতিশা', ধনপতি-খুল্লনার কাহিনীযুক্ত 'চৈত্র-মাহাত্ম্য' পুঁথি প্রভৃতি।[১]

অষ্টাদশ শতকের পূর্বে দেবী-বিষয়ক কোন গীতি পাওয়া যায় না। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ছেলে-ভুলানো ছড়াটি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। অনেকে মুকুন্দরামকে ইংরেজ লেখক চসারের সহিত তুলিত করিয়াছেন; অবশ্য উভয়ের আবির্ভাব-কালের পার্থক্য দুই শত বৎসর। কাউয়েল সাহেব মুকুন্দরামের কিছু অংশ ইংরেজীতে কাব্যানুবাদ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য, মুকুন্দরামের প্রভাব পরবর্তী বহু কবির উপর পড়িয়াছে এবং ইহা একান্তই স্বাভাবিক। ক্ষমানন্দ, রামদাস আদক, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির নাম দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যে কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরাম ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র উভয়েরই উল্লেখ আছে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রথম মুদ্রণ হয় বটতলাতে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে; মুকুন্দরামের কাব্যের প্রথম সংস্করণ বটতলাতে প্রকাশিত হয় ইহার চারি বৎসর পরে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। এই কাব্য পরে বহু জন দ্বারা (অক্ষয় চন্দ্র সরকার, রামজয় বিদ্যাসাগর প্রভৃতি) এবং বহু প্রতিষ্ঠান হইতে (বঙ্গবাসী, বসুমতী ইত্যাদি) বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় টীকা-পাঠান্তর ইত্যাদি সহযোগে ইহার একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। সংস্করণটির আলোচনা প্রবন্ধের শেষাংশে করা হইয়াছে।

মুকুন্দরামের জন্ম-সন ও কাব্যরচনার কাল লইয়া মতান্তর বর্তমান।[২] এই বিষয়ে পরিগৃহীত মতানুসারে কবির জন্মভূমি বর্ধমান জেলার সেলিমাবাদ থানার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রাম (বর্তমান বর্ধমান রায়না থানার অন্তর্ভুক্ত)। কবির পিতামহ চক্রবর্তী-পদবিক কয়ড়ি গাঞি রাঢ়ী শ্রোত্রিয় জগন্নাথ, পিতা গুণিরাজ-উপাধিক হৃদয়, মাতা দেবকী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র, কনিষ্ঠ রমানাথ (রামানন্দ), পুত্র-পুত্রবধূ শিবরাম-চিত্রলেখা, কন্যা-জামাতা যশোদা-মহেশ। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে রচনা-কাল-জ্ঞাপক যে শ্লোকটি আছে ['শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা'], তাহা হইতে (রস=৬ নহে) ১৪৯৯শক=১৫৭৭-৭৮ খ্রীঃ পাওয়া যায়। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত 'কবিকঙ্কণের চৌতিশা' পুঁথিতে যে শ্লোক আছে ['চাপ্য ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিয়োজিত। পঞ্চবিংশ মেষ অংশে চৌতিশা পূর্ণিত॥'] তাহাতে পাওয়া যায় ১৫১৫ শক=১৫৯৩-৯৪ খ্রীঃ।[৩] মানসিংহ বাঙ্গালার সুবেদারি পান ১৫১১ শক=১৫৮৯ খ্রীঃ। কবিপুত্র শিবরাম কুতুব খাঁর নিকট কয়েক বিঘা জমির সনন্দ পাইয়াছিলেন। কুতুব বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন ১৬০৬খ্রীঃ। কবির পৃষ্ঠপোষক বাঁকুড়া রায়ের[৪] পুত্র রঘুনাথের রাজত্বকাল ১৪৯৫-১৫২৫শক= ১৫৭৩-১৬০৩ খ্রীঃ। সুতরাং কাব্যরচনার শেষ কাল সম্ভবতঃ ১৬০৩ খ্রীঃ। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। পাঠানরাজ দাউদ

খাঁ কাররানির রাজত্বকালে ডিহিদার মামুদ সরিপের [=গিয়াসুদ্দীন মামুদ শাহ (১৫৩৩ খ্রীঃ)] অত্যাচারে কবিকঙ্কণ বাস্তু ত্যাগ করিলেন। অবশেষে বাঁকুড়া রায়ের পোষকতা লাভ করিয়া তৎপুত্র রঘুনাথের আদেশে কবি কাব্য-রচনা করেন। আত্মকাহিনী অংশে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নির্ভরযোগ্য প্রাচীন পুঁথিও দুর্লভ। দামুন্যায় প্রাপ্ত পুঁথি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে আদর্শরূপে গৃহীত) অসম্পূর্ণ, ও পাঠ বহু অংশে ভ্রান্তিবহুল। কাইতি গ্রামে প্রাপ্ত পুঁথির লিপি-কাল ১১৮৩ সাল। এই পুঁথিতে যে স্বতন্ত্র আত্মপরিচিতি অংশ পাওয়া যাইতেছে, তাহা নিতান্তই পরবর্তী কালের জাল রচনা। 'দিগ্‌বন্দনা' সন্দর্ভটিও প্রক্ষিপ্ত, লৌকিক দেবাধিক্যে ও বিবিধ ধর্মের প্রলেপে অংশটি পরিপূর্ণ। সূর্য, সহদেব ও শুকদেব বন্দনা অংশগুলি সব পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণে পাওয়া যায় না।

মঙ্গলকাব্যগুলির সাধারণ কাঠামো যেইরূপ, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও অনুরূপভাবে গঠিত। স্বপ্নাদেশ, চৌতিশা, বারমাস্যা, দেবতার প্রয়োজনমত স্বর্গ-বাসীদিগের মর্ত্যে আগমন, দেবতার খেয়াল-খুশি, বিবিধ দেবদেবী বন্দনা, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, হরগৌরী-সংবাদাদি সমস্তই চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া যাইতেছে। কাহিনীটি উত্তর ভারতীয় প্রাপ্ত সম্পদ নয়, বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব এবং কবির গভীর রসবোধ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীলতা, বেদ-জ্যোতিষাদি বিদ্যার দ্বারা অনুশীলিত জ্ঞান, স্থানীয় রীতিনীতি ইত্যাদির সম্বন্ধে সচেতনতা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটিকে বঙ্গ সাহিত্যের একটি সম্পদ করিয়া রাখিয়াছে। কবি চিত্রকুশলী। ত্রিপদী ও পয়ারের দোতারা বাজাইয়া কবি আসর মাত্‌ করিয়াছেন। কাব্যে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখ, বিবিধ স্থান, নদ-নদী, শহর-গ্রামাদি বর্ণন ও নিখুঁত চরিত্রাঙ্কন কবিকঙ্কণের কাব্যকে মহা-কালের পাতায় অমর করিয়া রাখিয়াছে।

কাব্যের মানবিকতা অপর একটি বিশেষ লক্ষণীয় উপাদান। ফুল্লরা-কালকেতুর জীবনযাত্রায়, ভাঁড়ু দত্ত, যদু তেলি, মুরারি শীল প্রভৃতির চরিত্র-চিত্রণে, জমিদারী বন্দোবস্তে কালকেতুর প্রজাবিলির নমুনায়, পশুগণের গোহারিতে, বায়স-রূপিণী চণ্ডীর দৌত্যে, খুল্লনার অঙ্গীকারে এবং সমসাময়িক সমাজ-বর্ণনায় কবি মানবিকতার মানদণ্ডকে উন্নত রাখিয়াছেন। মঙ্গল-কবিরা স্বভাবতই যুগচিত্রশিল্পী হইয়া থাকেন। মুকুন্দ-রামের কাব্যেও এই যুগচিত্রশিল্পের অপ্রতুল নাই। ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রাকালে যে গ্রামগুলির নাম রহিয়াছে (হুসনপুর, গাঙ্গাড়া, বাকুল্যা প্রভৃতি), তৎসমূহের অনেকগুলি আজিও অস্তিত্বহীন নহে। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, প্রাপ্ত পুঁথিগুলির মধ্যে গ্রামের নামগত ঐক্য সাধারণতঃ লক্ষিত হয় না। কাব্য পাঠে জানা যায়, তৎকালে বঙ্গদেশের বহু স্থান জঙ্গলাকীর্ণ, জনসাধারণ পাঠানমোগলের অত্যাচারে বিপন্ন, সমাজে বর্ণশ্রেষ্ঠগণ অধঃপতিত, সৌভাগ্যসন্ধান-তৎপর বণিককুলের অভ্যুদয়, জমিদারগণের অত্যাচার, সুন্দরবনাঞ্চলে পর্তুগীজ জল-দস্যুদিগের উপদ্রব ('হার্মাদের ডর') এবং দেশে দেশে অবাধ বাণিজ্য ও দ্রব্যাদি বিনিময় ছিল।

ইহা ছাড়া সামাজিক রীতিনীতিরও একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ কাব্যটির মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু তিনটিরই চিত্র কবিকঙ্কণ অঙ্কিত করিয়াছেন। জন্মে হুলুধ্বনি, নাড়িচ্ছেদ, 'দৃষ্টি-নিবারণ', ষষ্ঠী পূজা, নামকরণ ও পঞ্চমবর্ষে কর্ণবেধ, দ্বাদশ বর্ষেই কন্যা অরক্ষণীয়া। বিবাহে পণপ্রথা, যৌতুক দান, উচ্চকোটিতে পুরুষের বহু বিবাহ ও স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী বা স্ত্রীসজ্যের সহমরণ। পুরুষের পরিধান পাগড়ি, অঙ্গরাখা ও ধনী হইলে 'নেত',

তসর ও দোছুটি। দরিদ্রের সম্বল 'খুঞা'। মেয়েদের পরিধানে শাড়ী, চিত্রিত কাঁচুলী, হাতে লৌহ ও 'কুলুপিয়া শঙ্খ'। শ্রাদ্ধাদিতে জ্ঞাতি-সম্বর্ধনা ও শ্রেষ্ঠ নির্বাচনে অনিবার্য গোলযোগ। স্বামীকে সবশে আনয়নার্থ বিবিধ অভিচার, ক্রিয়া-কলাপ ইত্যাদি তো ছিলই।

অসাধ্য সাধনের সময় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ডাক পড়ে বিশ্বকর্মা ও পবনসূনু হনূমানের। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও তাঁহারা যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া আত্মকর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। কাব্যে নানাবিধ প্রাণী, দ্রব্য, ফল, ফুল ইত্যাদির কথা পাওয়া যায়। তৎকালীন কবিকুলের লক্ষ্য ছিল সর্ববিষয়ে গ্রন্থকে বিশ্বব্ধর করিয়া তোলা। ইহার জন্য একটি বাঁধা-ধরা নিয়মও ছিল। নগর গ্রাম, নায়ক নায়িকা, বন যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা যাহার ফলে একজাতীয়ই হইয়া দাঁড়াইত।

কাব্যের ভাষায় কিছু পরিমাণে প্রাচীন শব্দ এবং রূপ (তথি, তেঁই, কাঁতি, কোঁঙর) সংরক্ষিত থাকেই। চণ্ডীমঙ্গলের ভাষায় মধ্যে মধ্যে অপভ্রংশ শব্দ প্রয়োগের বাহুল্য কাব্যটির প্রাঞ্জল হইবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। তৎকালীন উচ্চারণভঙ্গী ও লিপিকরের অজ্ঞতা পুঁথিগুলির বানান সম্বন্ধে অনবধানতার জন্য দায়ী। ধ্বনির দিক দিয়া বিপ্রকর্ষ করিয়া শব্দের সম্প্রসারণ করা হইয়াছে [পরণাম, মুকুতি, মরত (মর্ত্য), কিলিশ (ক্লেশ)]। পুরাপুরি অভিশ্রুতির প্রয়োগ সুবিরল [লোটায়্যা, লয়্যা, বাজায়্যা]। সন্ধি ও সমাস সাধারণ। কারক প্রয়োগ সবিভক্তিক ও অবিভক্তিক দুই ভাবেই পাওয়া যায়। বাক্যরীতি সাধারণ নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার সহিত সদৃশ। শব্দভাণ্ডার-বিচারে তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দ ব্যতীত মুসলমানী শব্দ (যথাযথ ও বিকৃত উভয় ভাবেই) প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। কুড়ি হাজার পঙ্‌ক্তিতে নাম সমেত ২০০-২১০ টি ফারসী শব্দ পাওয়া গিয়াছে। কাব্যে সুভাষিতের সন্ধানও কিছু মেলে ['এত অহঙ্কার গো তাবৎ শোভা করে। কৃপাময়ী লক্ষ্মী গো যাবৎ থাক ঘরে॥'] পুঁথির বিকৃত ও অশুদ্ধ পাঠের জন্য কাব্যের কোন-কোন অংশ দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

বিচার করিলে দেখা যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য নিখুঁত নহে। ছন্দের বৈচিত্র্যহীনতা কাব্যটির মধ্যে অনিবার্যভাবে একঘেয়েমি আনিয়া দিয়াছে। অত্যুক্তি ও অস্বাভাবিক বর্ণনাও যে নাই, এমন নহে। খুল্লনার সপত্নীর সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা, শ্রীমন্তের শ্যালিকাদিগের সহিত রঙ্গরস ইত্যাদি বর্ণনায় কিঞ্চিৎ আতিশয্য ঘটিয়াছে। কলিঙ্গ ও গুর্জর দেশ বর্ণনা কবির দুর্বল ভূগোল-জ্ঞানের পরিচয় দেয়। কলিঙ্গের অবস্থান যথাযথ হয় নাই। অপর একটি কথা। কবির জীবনের দুঃখ তাঁহার কাব্যে এমন ভাবে রেখাপাত করিয়াছে, যে তিনি পরবর্তী কবিদিগের জন্য অবিমিশ্র রসসম্পদ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই দিক দিয়া কবির আদৌ সংযম ছিল না বলিয়াই মনে হয়। উত্তর যুগের কবি ভারত-চন্দ্রের জীবনে উত্থান-পতন মুকুন্দরামের তুলনায় কিছুমাত্র কম ছিল না, তথাপি তাঁহার কাব্যে কবিকঙ্কণের অভ্যস্ত হা-হুতাশ কোথাও দেখি না। অনেকের মতে মুকুন্দরাম 'দুঃখের কথায় বড়'। মুকুন্দরাম যদি দুঃখের কবি হইতেন তবে কথা ছিল না। কিন্তু মুকুন্দরাম সমগ্র কাব্যে আপনাকে ভুলিতে পারেন নাই। তাই কাব্যে কবি মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

অপর একটি আলোচনাযোগ্য বিষয় হইল—চণ্ডীমঙ্গলের ধর্ম ও কবির ধর্ম। চণ্ডীমঙ্গলের আরাধ্য-দেবতার মধ্যে আর্য ও আর্যেতর সংমিশ্রণ দেখা গেলেও তাহাতে কাব্যটিকে মূলতঃ

শাক্ত কাব্য বলিতে বাধা হয় না। তবে কাব্যে চৈতন্য-বন্দনা আছে, বৈষ্ণব-পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টান্তও বিরল নহে, হরিনাম-মাহাত্ম্যও (কৃত্তিবাস-কথিত নাম-মহিমা) রহিয়াছে। জনশ্রুতি, কবির পিতামহ সম্ভবতঃ শৈব ছিলেন ও পরে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; আদৌ বৈষ্ণব কবিকে ভগবতী শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারিণী বনমালিনী মূর্তি প্রদর্শন করিয়া উক্ত বিশেষ মহিষ-মর্দিনী রূপেই তদ্‌গৃহে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। এইস্থানে একটি কথা কিন্তু সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় দর্শনে হরি ও হরে ভেদ নাই, শাক্ত ও বৈষ্ণবে যে বিরোধ তাহা নিতান্তই বাহ্য; কাজেই কবির উপাস্যা দেবীর মধ্যে যে দুই ধর্মের মৌলিক ঐক্য প্রদর্শিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি! চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গালী জাতির জীবনে ও সাহিত্যে যে পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল, তাহারই আভাস রহিয়াছে কাব্যে চৈতন্য-বন্দনায় ও মানবিকতায়। ভারতচন্দ্রে চৈতন্য-বন্দনা না থাকিলেও মানবিকতা আছে পূর্ণ মাত্রায়। আসল কথা, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য শাক্ত সঙ্গীত—শাক্তের কড়িতে বৈষ্ণবের কোমল মিলিয়া কাব্যটি সুমধুর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাঁহারা কাব্যের সর্বত্র বৈষ্ণব ধর্মের ছায়া দেখেন, তাঁহারা কবির ধর্মকেও দেখেন না, কাব্যের ধর্মকেও উপেক্ষা করিয়া চলেন। কবির ধর্ম ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ধর্মের উপরে; কাব্যের ধর্ম সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী রসের প্রতিষ্ঠায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, অনেকে 'জগন্নাথমাহাত্ম্য' [=জগন্নাথ-মঙ্গল, জগন্নাথ-চরিত্র, ব্রহ্মপুরাণ] কাব্য-প্রণেতা দ্বিজ মুকুন্দ [=মুকুন্দ ভারতী]-কে (১৭ শতক) মুকুন্দরামের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া তাঁহার বৈষ্ণবত্ব বিধান করেন। বলা বাহুল্য, দুই মুকুন্দ এক ব্যক্তি নহেন।

চণ্ডীমঙ্গল [=অভয়ামঙ্গল] কাব্য অতীত কালের অচলায়তন—প্রাণ না থাকিলেও ইহার যে একটি বিশিষ্ট জাতি আছে যাহার দ্বারা আজিও ইহা চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর (প্রথম ভাগ) যে নূতন সংস্করণটি প্রকাশ করিয়াছেন (১৯৫২ খ্রীঃ), তাহাতে তিনখানি পুঁথি [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি নং ১০৯০ (আদর্শীকৃত), ১০৯৩, ৪৪০০] এবং দুইটি মুদ্রিত সংস্করণ [বঙ্গবাসী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতির দ্বারা] ব্যবহৃত হইয়াছে। পুঁথিগুলির পাঠ যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রাখিয়া এবং পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠগুলি যথাস্থানে যুক্ত করিয়া গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় [শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী] অনুসন্ধিৎসু সুধীবর্গের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। ভূমিকাতে আখ্যান-ভাগের স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতা, বস্তু তথা বাস্তব রসের কবি মুকুন্দরামের পরিবেষণ-নৈপুণ্য, গ্রন্থের কিয়দংশে (যথা, চৌতিশা স্তবে) কাব্যপ্রথার দ্বারা আচ্ছন্ন বাস্তববোধ, সাম্প্রদায়িক মনোভাবহীনতা, কবির বর্ণনায় স্থানীয় প্রভাব (local colouring) ইত্যাদি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থটির সম্পাদনায় বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তথাপি ভূমিকাটি সুলিখিত হইলেও সর্বত্র সুপ্রকাশিত ও সুসমাপ্ত হয় নাই। পুঁথিগুলির সংখ্যা উল্লেখ ব্যতীত অন্যবিধ কোন পরিচয়ই প্রদত্ত হয় নাই এবং মূল কবি মুকুন্দরামকে উপলক্ষ্য করিয়া তাবৎ চণ্ডীমঙ্গল-কবিদিগের কথাই সমধিক বিবৃত হইয়াছে। কালকেতুর কাহিনীর পৌরাণিক পটভূমিকার আলোচনায় স্মার্ত রঘুনন্দনের চণ্ডীপূজার স্মৃতির ব্যবস্থায় ব্যাধোপাখ্যান-শ্রবণ

একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে ও চণ্ডীদেবীর ব্যাপারে সুধীভূষণ ভট্টাচার্য প্রণীত 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'-এর উপর বরাত দেওয়া হইয়াছে। কলিঙ্গ-প্লাবনে নদ-নদীদিগের শোভাযাত্রার ব্যাপারে ইংরেজ কবি স্পেন্সার প্রণীত 'ফেয়ারী কুইনী' কাব্যকে স্মরণ করা হইয়াছে।

মুকুন্দরাম দুঃখের কবি নহেন, দুঃখবাদীও নহেন, তাঁহার কাব্যের মনোভাব দুঃখজয়ী, অসঙ্গতির অনুযোগে তাঁহার কাব্যে অশ্রু শ্লেষে পরিণত হইয়াছে—এই মতবাদ 'ব্যাখ্যায় উলট্-পালট্' করার মতই। চণ্ডীকাব্যের দেবতা চণ্ডী ও আদ্যা উভয়েই শ্রীরাধার ভাবদ্যুতি, কাব্যের নায়িকার রূপায়ণে বৈষ্ণবাদর্শ বর্তমান। কালকেতুর পশুশিকারের ব্যর্থতায়, কোতোয়ালের ছদ্মবেশে ও খুল্লনার বনবাসে শ্রীরাধার প্রণয়-বিভ্রান্তি, কৃষ্ণের ছলনা-কুশলতা ও করুণরসের প্রকাশ দর্শনান্তর পুনশ্চ 'মুকুন্দরামে এই বৈষ্ণবভাব-প্রাধান্য অনেকটা ক্ষীণ' বলা হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের উপর বৈষ্ণব-সাহিত্যের ভাব ও রীতিগত প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের যত্র তত্র প্রতিফলন কষ্টসাধ্য তো বটেই, পরন্তু অবাঞ্ছিত ও অপ্রাসঙ্গিক। আলোচ্য গ্রন্থটিতে মুকুন্দরামের জীবন ইত্যাদি সম্পর্কিত পরিপূর্ণ আলোচনা, কাব্যের ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার, শব্দভাণ্ডার প্রভৃতির সুবিস্তৃত পরিচয়, বিবিধ 'খিল' অংশগুলির নির্ভর-যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা, পুঁথি-পরিচয় ও তৎসংক্রান্ত চিত্রাবলী সংযুক্ত হইলে ইহা অত্যন্ত উপাদেয় হইত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর দ্বিতীয় ভাগ আজিও মুদ্রিত হয় নাই বলিয়াই জানি। দ্বিতীয় ভাগের সম্পাদনা ও পরিচিতি প্রথম ভাগের সম্পূরক হইলে বলিবার কিছুই থাকিবে না।

---

১ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [প্রথম সং (প্রথম ভাগ)]।

২ কবির জন্মকাল: ১৫৩৭খ্রী: (দীনেশচন্দ্র সেন); ১৫৩৩খ্রী: [তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য); ১৫৪৭খ্রী: (বঙ্গভাষার লেখক); ১৫৪৪খ্রী: (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

কাব্যরচনাকাল: ১৫৯৪খ্রী: (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়); ১৫৭৩-১৬০৩ খ্রী: (রাজনারায়ণ বসু); ১৫৯০-১৬০৩ খ্রী: বঙ্কিমচন্দ্র); ১৫৯৪।৯৬খ্রী: (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব্ লেটার্স, ১৯২৭)। দামুন্যার চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি কবিকঙ্কণের বংশধর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। তবে ইঁহারা কবির গৃহদেবতা সিংহবাহিনীর পুরোহিত-বংশীয় কিনা বলা শক্ত। ইঁহারা সাবর্ণ শ্রোত্রিয়। —[বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'-র উপক্রমণিকা।]

৩ ডাঃ সুকুমার সেন তদীয় প্রবন্ধে ['মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল' (বিশ্বভারতী পত্রিকা। মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৩ সাল। পৃঃ ২৪৮-৫৫)] কবিকঙ্কণের দেশত্যাগকাল ও স্বপ্নাদেশ-প্রাপ্তির সময় অনুমান করিয়াছেন 'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা' অর্থাৎ ১৪৬৬ শক=১৫৪৪ খ্রী:। স্মরণীয়, তিনি 'রস' অর্থে পূর্বমত ৯ পরিত্যাগ করিয়া ৬ ধরিয়াছেন। এই সময়ের সহিত মানসিংহের বাঙ্গালা-অধিকার-কাল মেলে না। মানসিংহ বিহারের সিপাহশালার ছিলেন ১৫৮৭খ্রী:, আফগান-দমনে উড়িষ্যা অভিযান করেন ১৫৯০-৯১ খ্রী:, বাঙ্গালা-উড়িষ্যার অধিকর্তা ১৫৯৪-১৬০৫ খ্রী: এবং বঙ্গদেশে অনুপস্থিত ছিলেন ১৫৯৯ খ্রী: শেষ হইতে ১৬০০ খ্রী: শেষ পর্যন্ত। কাব্যে দেশের যে বিপর্যয়ের উল্লেখ আছে তাহা পাঠান সুলতান কিংবা মানসিংহের আমলে হয় নাই, ইহা ঘটিয়াছিল ১৫৩৭-৬৪ খ্রী: আফগান অধিকার-কালে। সম্ভবতঃ নূতন আফগান সুলতানের সময় কবির লিখিত দেশের দুর্দশা চরমে উঠিয়াছিল। অবশ্য—ডাঃ সেনের এই অনুমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অপেক্ষা রাখে।

৪ ব্রাহ্মণভূমির অন্তর্গত আরড়া গ্রামের [বর্তমান মেদিনীপুর জেলা, থানা ঘাটাল।] জমিদার পালধি গাঞি বাঁকুড়া রায়। ইঁহার পিতা বীরমাধব, শ্বশুর দুলাল সিংহ, ভার্যা দনা দেবী, পুত্র রঘুনাথ, পৌত্র চক্রধর (রাজত্বকাল ১৬০৪ খ্রী:)। বর্তমান বংশধরগণ মেদিনীপুরের অন্তর্গত সেনাপতি গ্রামে বাস করেন।

৫ ইহা সম্ভবতঃ চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য রচয়িতা বা গায়েনদিগের সাধারণ উপাধি।

চৈত্র-কুহু

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

চৈত্রদিনে হাওয়ার হাহাকারে
হঠাৎ শুনি
কোকিল ডাকে
শুক্‌নো গাছের ডালে।
বসন্ত তো চলেই গেছে,
কোথায় বা ফাল্‌গুন,
রোদে আগুন,
হাওয়ায় আগুন,
মাঠে আগুন ঝরে,
কেবল শুনি কোকিল ডাকে
চৈত্রদিনের ঝড়ে।
দ্বিপ্রহর
চৈত্রঝড়
কাঁপে রোদের ঢেউ,
শূন্য মাঠে
প্রহর কাটে
নেই কোথাও কেউ!
ঝরাপাতার পত্রসেনা
হাওয়ার যুদ্ধে মেতে
তেপান্তরের দিগ্বিজয়ে
চায় বুঝি বা যেতে।
এমন সময় আমের বনে
হঠাৎ অকারণে,
কোকিল কেন গান গেয়ে যায়
কাহার আমন্ত্রণে?
কোকিল ছিলে সুখের সখা,
হ'লে দুখের সাথী,
দীপকে আর পঞ্চমে আজ
তাই তো মাতামাতি।
দ্বিপ্রহরের অগ্নি-তাপে,
তোমার সুরের স্পর্শ কাঁপে,
চৈত্রদিনের একলা দুপুর
ভরলো তোমার গানে;
কোকিল, কালো কোকিল শোনো,
এই কথাটি রইলো আমার
চিরদিনের কানে।

আনন্দ

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

এলাম ভবে তোমার খোঁজে
দেখতে তোমার স্বরূপখানি,
হেরি হেথায় সবই তুমি
তোমার মাঝেই ভুবনখানি।
সব সেজে গো করছ খেলা
তুমিই বসাও তোমার মেলা,
দেখছ তুমি তোমার লীলা
একের বহু রূপ যে জানি।
মায়ার জালে বেঁধে আমায়
আর রেখ না জীবন-স্বামী,
ভক্তি-ফুলের মালা মম
চাই দিতে ওই কণ্ঠে আমি।
আমার 'আমি' দিছি তোমায়
ভেদ কি আছে তোমায় আমায়,
তোমার নিত্য লীলার পথে
কর আমায় অনুগামী!

অরবিন্দ-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

সম্প্রতি শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশে নূতন করিয়া আলোচনার সূত্রপাত হইতেছে; এই সন্ধিক্ষণে আমরা স্মরণ করি তাঁহার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব।

সাত বৎসর বয়সে শিক্ষার জন্য শ্রীঅরবিন্দ ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। তথায় চৌদ্দ বৎসর বাস করিয়া তিনি ১৮৯৩ খৃঃ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। যে বৎসর তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন, সেই বৎসরেই স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করেন।

এই চমকপ্রদ ঘটনা সম্পূর্ণ বিদেশী ভাব আদর্শ ও পরিবেশে লালিতপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক অরবিন্দের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনাবলী, বিশেষতঃ স্বামীজীর ভারতীয় তরুণদের নিকট 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'-রূপ অগ্নিগর্ভ বাণী এবং জন্মভূমির সর্বাঙ্গীণ পুনরুত্থানের কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার উদাত্ত আহ্বান অরবিন্দকে তাঁহার পরবর্তী তের বৎসর (১৮৯৩—১৯০৬) বরদায় অবস্থানকালে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। অরবিন্দ বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে মহৎ কার্যসকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও গভীর মনোনিবেশের সহিত অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন।

১৯০৯ খৃঃ 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন: বিবেকানন্দের বিদেশযাত্রা দ্বারা ইহাই সর্বপ্রথম সুস্পষ্টরূপে সূচিত হয় যে ভারত শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই জাগে নাই, পরন্তু আধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় করিবার জন্যও তাঁহাকে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।

অন্য এক সময়ে বিবেকানন্দের কথা বলিতে গিয়া অরবিন্দ বলিয়াছিলেন: 'শক্তিধর পুরুষ বলিতে যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ পুরুষসিংহ। আমরা অনুভব করি, বিবেকানন্দের শক্তি ও প্রভাব প্রচণ্ডভাবে কাজ করিতেছে, কিভাবে—তাহা আমরা ভালরূপে জানি না, কোথায়—তাহাও ভালভাবে জানি না; যাহা এখনও কোন আকার গ্রহণ করে নাই তাহার ভিতরে, এবং যাহা-কিছু মহৎ, সিংহসদৃশ বীর্যসম্পন্ন অথচ কমনীয়, স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি দ্বারা লব্ধ ও উজ্জীবক তাহার মধ্যে; ইহা ভারতের আত্মায় প্রবেশ করিয়াছে। আমরা বলি, ঐ দেখ! বিবেকানন্দ ভারতমাতা ও তাঁহার সন্তানদের অন্তরাত্মায় এখনও বাস করিতেছেন।'[১]

কারাগারে যে অপূর্ব আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অরবিন্দের পরবর্তী জীবনকে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন: ইহা সত্য ঘটনা যে, কারাগারে

১ Swami Vivekananda was a soul puissance, if ever there was one, a very lion among men. We perceive his influence still working gigantically—we know not well how, we know not well where—in something that is not yet formed, something leonine, grand, intuitive, upheaving, that has entered the soul of India, and we say, 'Behold! Vivekananda still lives in the soul of his Mother and in the soul of Her children.'

নির্জন ধ্যানে এক পক্ষকাল নিরন্তর বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর আমাকে উদ্দেশ করিয়া ধ্বনিত হইতেছিল। আমি তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিতি অনুভব করিতেছিলাম। আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটা বিশেষ, সীমাবদ্ধ অথচ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং সেই বিষয়ে যাহা বলিবার তাহা বলিয়াই কণ্ঠস্বর থামিয়া গিয়াছিল।[২]

১৯০২ খৃঃ বরদায় ভগিনী নিবেদিতার সহিত অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয় এবং এই বিদুষী মহিলার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন। অরবিন্দ যখন রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তখন ভগিনী নিবেদিতার ভারত-প্রীতি ও স্বাধীনতা-আন্দোলনে গভীর অনুরাগ তাঁহাকে কয়েক বৎসর অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনিয়াছিল।

ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে নিবেদিতার নির্ভীক মতের সহিত অরবিন্দের মতের অনেকাংশে মিল ছিল। ভগিনী নিবেদিতাই অরবিন্দকে বৃটিশ-শাসিত ভারতের বাহিরে থাকিয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে সময়োচিত উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রধানতঃ এই পরামর্শ অনুসারেই অরবিন্দ ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে আত্মগোপন করিতে সংকল্প করেন এবং পরে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর (১৯১০—১৯৫০) পণ্ডীচেরিতে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা ও যোগসাধনায় কালাতিপাত করেন। জনৈক অন্তরঙ্গ সহকর্মীকে অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, 'মা-কালী ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে আমাকে আত্মগোপন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।' নিবেদিতাই অরবিন্দকে বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' গ্রন্থখানি উপহার দিয়াছিলেন

অরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য অনুভূতি ও অমৃতময়ী বাণী অরবিন্দের জীবন ও চিন্তাধারাকে গঠন করিতে অল্প সাহায্য করে নাই।

আলিপুর জেলে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত তাঁহার নিত্য পাঠ্য ছিল এবং এই গ্রন্থ তাঁহার পরবর্তী জীবনের পথ নির্ণয়ে সহায়তা করিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত তদানীন্তন লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। অরবিন্দ মাঝে মাঝে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় ইংরেজীতে ও 'ধর্ম' পত্রিকায় বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া লোকদিগকে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইতে এবং জীবন গঠন করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন। যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘ দিন বাস ও সাধনা করিয়াছিলেন, সেই দক্ষিণেশ্বরের মৃত্তিকা অরবিন্দ পরম পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। অরবিন্দ নিজেই সেকথা লিখিয়াছেন—সেই দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মৃত্তিকা তিনি শক্ত কাগজে নির্মিত এক পেটিকায় সযত্নে রক্ষা করিয়া নিজের প্রকোষ্ঠে রাখিয়াছিলেন। যে পুলিশ কর্মচারী অরবিন্দকে সেই প্রকোষ্ঠে গ্রেপ্তার করেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরের মৃত্তিকা-সম্বলিত পেটিকায় কোন বিস্ফোরক দ্রব্য রহিয়াছে সন্দেহ করিয়া উহা লইয়া গিয়াছিলেন। অরবিন্দ এই প্রসঙ্গে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, "মোটের উপর, এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, পুলিশ কর্মচারীর সন্দেহকে ভিত্তিহীন বলা যাইতে পারে না, কারণ দক্ষিণেশ্বরের মৃত্তিকা

২ It is a fact that I was hearing constantly the voice of Vivekananda speaking to me for a fortnight in the jail in my solitary meditation and felt his presence. The voice spoke on a special and limited, but very important field of spiritual experience, and it ceased as soon as it had finished saying all that it had to say on the subject.

আমার আধ্যাত্মিক জীবনে বিস্ফোরক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল।"

'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন: যখন কলিকাতার শিক্ষিত যুবকদের মুকুটমণি বিবেকানন্দ একজন নিরক্ষর হিন্দু তাপসের, বিদেশী ভাব বা শিক্ষার লেশমাত্রের সহিত সম্পর্কহীন সমাধিমান্ অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন মহাযোগীর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন, তখনই সংগ্রামে জয়লাভ হইল।

বোম্বাই নগরে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে এক বক্তৃতায় অরবিন্দ বলিয়াছিলেন, ভগবান সেই মানুষকে বাংলাদেশে কলিকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পাঠাইয়াছিলেন; উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিদিক হইতে শিক্ষিত লোকগণ—বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবস্থল, যাঁহারা ইওরোপের নিকট হইতে যাহা কিছু শিক্ষা করা যায় তৎ-সমস্তই শিখিয়াছিলেন তাঁহারা—এই তাপসের পদতলে নিপতিত হইয়াছিলেন। ৩

১৯০৯ খৃঃ অরবিন্দ 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন: দক্ষিণেশ্বরে যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সমাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, বুঝিতেও পারা যায় নাই। ৪

৩ God sent that man to Bengal and sent him in the temple Dakshineswar in Calcutta, and from North and South, and East and West, the educated men, men who were the pride of the University, who had studied all that Europe can teach, came to fall at the feet of this ascetic.

৪ The work that was begun at Dakshineswar is far from finished, it is not even understood.

পাপিয়ায় যেন কোরো না চাতক

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

দৈন্য-দুঃখে পড়ে—
হরি-করুণায় ধন-গর্বিত
যাইনি ধনীর ঘরে।
ময়ূরাক্ষীর বালুচর-তীরে,
পল্লী-মায়ের পর্ণকুটীরে—
রৌদ্রে বাদলে গোঁয়াইনু আজ
ষাটটি বছর ধরে।

তাঁর ভরসায় থাকি,
সাধু-সন্তের আছে গতায়াত
আছে সাথে মাখামাখি।
অনুরাগ-ফাগে রাঙাইয়া মন,
শুনি দূর-বাঁশী-সুর অনুখন;
সব সংশয় এড়াতে পেরেছি
তাঁরে নিশি-দিন ডাকি

অঙ্গন-তরু মোর,
বৃন্দাবনের হাওয়ায় ডাকিয়া
আনে নিতি সাঁঝ ভোর।
বন-বিহগের অবিরাম গানে,
অভাবের কথা পৌঁছে না কানে;
তাঁর পথ চেয়ে সজল নয়নে
রয়েছি মত্ত ভোর।

গৃহ-জ্বালা হ'তে দূরে
থাকি না, তবুও তিনি রেখেছেন
মোরে আনন্দপুরে।
প্রভাতে রবির বন্দনা গাই,
ক্ষুব্ধ প্রাণের বেদনা জানাই;
ফুলে ফুলে অলি গুঞ্জন করি'
কাছে উড়ে ঘুরে ঘুরে।

আরতি-ঘণ্টা সাঁঝে,
বাজিলে দেউলে মন যায় ভুলে
কি নাই আর কি আছে।
ভাবের গোমুখী-নীরে ডুব দিয়ে,
দৈন্য-দুঃখে লই জুড়াইয়ে;
'পাপিয়ায় যেন কোরো না চাতক'
—এ মিনতি তাঁর কাছে।

নিজেদের সমস্যা-সমাধানে নারী

শ্রীমতী শান্তি ঘোষ

পুরাতন ও আধুনিকের মধ্যে বিবাদ চিরন্তন। প্রাচীনা বলেন যে তাঁহাদের আচার ব্যবহার সমাজ শিক্ষা সব কিছুই আধুনিকাদের চেয়ে ভাল, আবার আধুনিকারা একথা স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে—তাঁহাদের প্রথাগুলিই মার্জিত। কেহ যদি বিচারকের আসন গ্রহণ করেন, আর যদি তিনি ন্যায় বিচারক হন—তবে দুই পক্ষের মধ্যেই ভাল ও মন্দ দুইই দেখিতে পাইবেন। জগতে এক তরফা ভাল বা এক তরফা মন্দ কিছু নাই। একজনের কাছে যাহা সুখকর অন্যের কাছে তাহা কষ্টকর; আবার একের পক্ষে যাহা দুঃখের কারণ তাহাতে বহুর মঙ্গল দেখা যায়।

প্রাচীনাদের কাছে আমাদের অনেক কিছু জানিবার ও শিখিবার আছে। জীবনের পথে তাঁহারাই অগ্রণী; অভিজ্ঞতায় তাঁহারাই ধনী। প্রাচীনকালে বিজ্ঞানের এত প্রচলন ছিল না। তাঁহারা সহজ সরল জীবন যাপন করিতেন; তখনকার কালে ডাক্তার-বৈদ্যের এত প্রচলন ছিল না; আবার এত ভেজালের সৃষ্টিও হয় নাই। তাঁহারা ব্যবহার করিতেন খাঁটি খাদ্যসম্ভার। ঔষধ হিসাবে জানিতেন নানা রকম গাছের পাতা শিকড় বাকল ইত্যাদি। আজকাল লেবেল না থাকিলে আমরা ঔষধ ব্যবহার করিতে ভয় পাই, কিন্তু প্রাচীনাদের জানা ছিল বহু প্রকারের ভেষজ। প্রতি বাড়ীতেই ছোটখাটো একটি ডিস্‌পেনসারিতে কিছু কিছু ঘরে-প্রস্তুত ঔষধপত্র থাকিত।

প্রাচীনারা নবীনাদের মত স্কুল-কলেজে যাইবার সুযোগ পান নাই, রামায়ণ-মহাভারতই তাঁহাদের পাঠ্য পুস্তক ছিল। ঐ আদর্শেই তাঁহারা নিজেদের গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। নবীনারা রামায়ণ-মহাভারতের যুগে পিছাইয়া যাইতে রাজী নহেন, তাঁহাদের জানিবার আছে অন্য বহু তত্ত্ব। তাঁহারা জন্মিয়াছেন বিজ্ঞানের যুগে, এখন কেবলমাত্র পুরাতনের কাহিনী জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে মন রাজী নহে। সমস্ত পৃথিবীর—এমনকি তাহার বাহিরের খবরাখবর জানিবার জন্য সে উৎসুক। বহু কিছু জানিতেই সে ব্যস্ত, একটী লইয়া সাধনা করিবার মতো অবকাশ তাহার নাই।

আপন সংসারই ছিল প্রাচীনাদের গণ্ডি, তাহারা এই অল্প সীমানার মধ্যে রাজত্ব করিয়াই মহাখুশী থাকিতেন। সংসারটী থাকিত তাঁহাদের নখদর্পণে; কিন্তু সংসারের বাহিরের সব কিছুই অন্ধকারাবৃত।

বর্তমান যুগে আধুনিকাদের তেমন ভাবে সংসার করা হইয়া উঠে না। আজিকার নারীকে বহুপ্রকার বাহিরের কাজ করিতে হয়, অর্থোপার্জন তাহাদের মধ্যে একটী। মানুষের প্রয়োজন কালের গতিকে বাড়িয়াই চলিয়াছে; জীবন হইতেছে জটিলতর, সেই জটিলতার গ্রন্থি খুলিবার মানসে মানুষ ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু গ্রন্থি খুলিবার জন্য যে ধৈর্য প্রয়োজন, আজ তাহা নাই। চঞ্চলতায় কোন কার্য সুসম্পন্ন হয় না; মানুষকে হইতে হইবে ধীর স্থির। কিন্তু সে অবকাশ কোথায়? প্রতিদিনের প্রয়োজন মিটাইতেই মানুষ ব্যস্ত। পিছনে ফিরিবার, গতকল্য কি করিয়াছি তাহা চিন্তা করিবার অবকাশ তাহার নাই।

অতীতকালে মানবের প্রয়োজন ছিল অল্প, তখন শাক অন্ন ঘৃত দুগ্ধ পাইয়াই মানুষ সন্তুষ্ট

থাকিত। মোটা একখানি বস্ত্র হইলেই লজ্জা নিবারণ হইত, কিন্তু বর্তমানের প্রয়োজন শত সহস্রমুখী। শাক ভাতের স্থান লইয়াছে চপ-ফ্রাই, কাটলেট-কেক, পেষ্ট্রি ইত্যাদি; মোটা বস্ত্রের পরিবর্তে প্রয়োজন জর্জেট নাইলন প্রভৃতি। কালের চক্র ঘুরিতেছে, প্রতিদিনই নূতনের পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে মানুষের মন। অতীতের অপেক্ষা বর্তমানের সমস্যা অতীব জটিল, এই জটিলতাময় জীবনযুদ্ধে রত আধুনিক নারী-সমাজ।

প্রাচীনাদের সহজ সরল জীবন পথ এখনকার যুগে অকল্পনীয়, তবু এই জটিল জীবনের অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে নবীনাদের কর্তব্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া নিজেদের সমস্যার সমাধান করা।

নবীনারা আলোক-প্রাপ্তা, পৃথিবী-রহস্যে প্রাচীনাদের অপেক্ষা তাঁহাদের জ্ঞান বেশী, কিন্তু প্রাচীনাদের কাছে জীবন-রহস্যে তাঁহারা শিশু। অতি সুখের মনে করিয়া যাহার পিছনে তাঁহারা ছুটিয়া চলিয়াছেন, প্রাচীনাদের নিকট তাহা তুচ্ছ। ইঁহারা নিজেদের গতজীবনের দিনগুলি চিন্তা করিয়া মনে করেন, তখন কি ছেলে মানুষই না ছিলাম! আজিকার নবীনা সেই 'ছেলেমানুষি'র পিছনেই ছুটিয়া চলিয়াছেন। এই অবস্থাটা কাটাইয়া উঠিতে পারিলে তবেই তাঁহাদের জীবন সার্থক হইবে।

তাই মনে হয় একে অন্যের মতকে অবজ্ঞা না করিয়া যদি উভয়ে মিলিত চেষ্টায় যুগোপযোগী একটী সমাজ গঠিত করিতে অগ্রসর হন, তবেই বর্তমান সমস্যার সমাধান হইতে পারে। দুইজনা দুইজনের সহিত বিরোধ করিলে চলিবে না। যাহা কিছু জীবনকে নিশ্চয় মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। প্রাচীনারা দিবেন পুরাতনের ইতিহাস, আর নবীনারা দিবেন বর্তমানের বিজ্ঞান।

পাঠ্যপুস্তক ও সিনেমার ছবির মধ্য দিয়া দেশ-বিদেশের সভ্যতার কথা জানা আছে আজিকার বোনেদের। সকল সভ্যতার সারটুকু তাঁহারা অনায়াসেই নিজের জীবন-সমস্যার কাজে লাগাইতে পারেন।

আজিকার সমস্যা অতীব জটিল, তবে বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে বহু কিছু সুবিধাজনক ব্যাবহারিক বস্তু। বিজ্ঞানের কল্যাণকারী দানগুলি যদি আমরা দৈনন্দিন কাজে লাগাই তবে শারীরিক দুঃখকষ্ট অবশ্যই লাঘব হইবে, অবসর মিলিবে, তাহা আমাদের জীবনের কঠিনতর সমস্যা মিটাই-বার সহায়তা করিবে। যাহার যেটুকু ক্ষমতা আছে সেটুকু যদি অনেকের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারি—তবে দেখিব আপন আপন জীবনও সুখে ভরিয়া উঠিবে। প্রতি মানবের জীবন দোষ ও গুণের সমষ্টি। গুণহীন মানুষ হইতেই পারে না। নিজের জীবনে পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিলেই দেখিতে পাইব যে জগৎকে দিবার মতো কিছু না কিছু মিলিবেই।

শুধু সকলের কাছে লইবার আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া দিবার জন্য চেষ্টিত হইলেই দেখিব জীবনের ধারা অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে।

যে আমি আজ এতখানি লিখিবার সাহসী হইতেছি, স্বীকার না করিয়া পারি না যে প্রতি মুহূর্তেই সূত্র হারাইয়া যাইতেছে, প্রতি ক্ষণে স্বার্থপরতা আসিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে, মানুষের অকল্যাণকর কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, তবু এইটুকু আশা রাখি যে বার বার চেষ্টা করিতে করিতে হয়তো কিছুটা অগ্রসর হইতে পারিব। প্রতি ক্ষণে মনে রাখিতে হইবে আমার এ মুখ জগতের

কল্যাণকর কথাই বলিবে, আর আমার হাতও জগতের কল্যাণকর কাজেই রত থাকিবে।

যাঁহারা আজিকার যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা বিজ্ঞানের যুগে জন্মিয়াছেন বলা হয়। প্রাচীনাদের অপেক্ষা তাঁহাদের জানিবার ও জানাইবার স্থযোগ অনেক বেশী। আমাদের দেশের বহু শিল্প দর্শন গ্রামের জীর্ণ কুটীরের অন্তরালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগ দূরকে করিয়াছে নিকট, শব্দকে করিয়াছে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত। এক স্থানে বসিয়া একটী কথা বলিলে সারা পৃথিবীতে তাহা ধ্বনিত হইতে পারে।

আমাদের ভারতের যে সকল চিরস্মরণীয় নারী ছিলেন, সীতা সাবিত্রী, খনা লীলাবতী, গান্ধারী কুন্তী, "মাতা সারদা"—এঁদের কথা আজিকার শিক্ষিতা বোনেরা পৃথিবীর চারিদিকে তো ছড়াইয়া দিতে পারেন। প্রচার করিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় যাঁহারা উচ্চশিক্ষিতা তাঁহাদের তো স্থযোগ মিলিয়াছে, তাঁহারা এ স্থযোগ হারাইবেন কেন? যে যুগে রেডিও ছিল না, সিনেমা ছিল না, লাউড স্পীকার ছিলনা, ট্রেন ছিল না, হাওয়াই জাহাজ ছিল না, সে যুগেও পৌরাণিক কাহিনী যদি শুধু মুখে মুখেই প্রচারিত হইয়া আজ পর্যন্ত তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছে, তবে আজিকার দিনে পৃথিবীব্যাপী প্রচার অসম্ভব হইবে কেন? হয়তো সকলে শুনিবে না, তবু বলিতে দোষ কি? লক্ষ জনের মধ্যে তো একজনও শুনিতে পারে। তবে ভারত হইতে যাহা লুপ্ত হইতে বসিয়াছে তাহা আজ বিদেশিনীরা বিশ্বাস করিবেন কেন? তাই আজ সর্ব প্রথমে ভারতের ঘরে ঘরে ইহার প্রচার করা প্রয়োজন। আমরা প্রত্যেকে যতটুকু জানি ততটুকুই বিলাইতে অগ্রসর হইলে কাজ অনেকখানি সহজ হইয়া উঠিবে। যেখানে যে ভাবে বলার প্রয়োজন সেখানে সেই ভাবেই বলিতে হইবে। এমন কি ঘরে ঘরে আলোচনা-হইলেও অনেক কাজ হইবে। শুধু পুরাণের কথা, ইতিহাসের কথা বলিয়াই ইহার সমাপ্তি ঘটাইলে চলিবে না। আজিকার বর্তমান সমাজের কথা, শিশু পালন ও তাহাদের শিক্ষা, গৃহকর্মের শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি বহু সমস্যাই মায়েরা নিজেরা মিলিত হইয়া মিটাইতে পারেন। আমার বলিবার বা লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে পরস্পর পরস্পরের দোষানুসন্ধান না করিয়া আমরা মিলিত চেষ্টায় একটী নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারি। বর্তমানের দারুণ সমস্যার কিছুটা সমাধান আমরা নিজেরাই করিতে পারি। বিরোধ মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দেয়, কিন্তু একতা আনিয়া দেয় শক্তি। আজ সমাজের প্রয়োজন সেই মিলিত শক্তি—যাহা নীরবে লোকলোচনের অন্তরালে সংসারে ও সর্বত্র আনিয়া দিবে কল্যাণ ও শান্তি।

নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপের অধিকার তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত। নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে।

—বিবেকানন্দ

গীতা-রহস্য

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল

শিক্ষিত মনে প্রশ্ন জাগে, ভগবদ্‌গীতার বিভূতিযোগ ও বিশ্বরূপ-দর্শনের পরেই পুস্তকের সমাপ্তি সূচিত হয়েছে। পুনরায় ছয় অধ্যায়ের প্রয়োজনাভাব বলা যায়। কিন্তু যাঁরা এই গ্রন্থকে একাধারে কাব্য ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র মনে করেন, রণক্ষেত্রের পটভূমিতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে রচিত এই অপূর্ব গাথাকে তাঁরা বাস্তব-দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে বিচার করেন শাস্ত্র-হিসেবে,—তাই কোন অসঙ্গতি তাঁদের মনে আসে না। গীতায় বিরাট অসঙ্গতি এবং কল্পনার দৈন্য আছে বলে যাঁরা মনে করেন, একটা অনুভূতির কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই। দিনের বেলা তন্দ্রার ঘোরে ঘটনাবহুল বহু দৃশ্য-সমন্বিত সমগ্র একটা জীবনের স্বপ্নচিত্র অনেকেই দেখেছেন—অথচ হয়তো ঘড়িতে দেখা গেল মাত্র কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই সব সমাপ্ত হয়েছে। এটাকে আমরা আশ্চর্য মনে করি না, স্বীকার করি যে আমাদের চিত্তদর্পণের এই আলেখ্য বায়োস্কোপের ফিল্মের মত হু হু ক'রে চলে যায়,—রেখে যায় জাগ্রত মনে তার স্মৃতি। যদি আমরা বলি যে এই ভাবেই মহাযোগে শ্রীকৃষ্ণ শোকে মুহ্যমান সখা অর্জুনকে এইরূপ চিত্র দেখিয়ে প্রকৃতিস্থ করেছিলেন কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে, তবে শিক্ষিত ব্যক্তি কি বলতে বাধ্য হবেন না যে এর সম্ভাবনা স্বীকার্য?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলি, বিশ্বরূপ-দর্শনের পর সাধারণ কবি নিশ্চয়ই লিখতেন, 'অতঃপর অর্জুন নিমিত্তমাত্র হয়ে লক্ষ্মীছেলের মতো যুদ্ধে মন দিলেন।' কিন্তু পরম জ্ঞানী ও মন্ত্রদ্রষ্টা ব্যাসদেব যে অপূর্ব কাব্য-ইতিহাস-দর্শন লিখে গেছেন তা কালের অপ্রতিহত প্রভাবকে ছাড়িয়ে উঠেছে বহু ঊর্ধ্বে এই বস্তু-স্বাতন্ত্র্য-যুগেও। বিজ্ঞান ও দর্শনকে একসূত্রে গ্রথিত ক'রে যে গ্রন্থটি তিনি রচনা ক'রে গেছেন, যুগে যুগে সকল দেশের মনীষীদের মনে তা দিব্যজ্ঞানের চিত্র পূর্বে অঙ্কিত করেছে, আজও করছে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও করবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পটভূমিতে 'শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন-সংবাদ' স্মরণমাত্র একটি কথা তাঁর মনে হয়েছে বার বার—'Intense activity without, with intense rest within'! ভারতীয় মনীষার সুউচ্চ দিব্য-চিন্তা-প্রসূত চিত্র। কুরুক্ষেত্র-রণভূমির বিরাট কোলাহলের মধ্যে যোগিরাজ শ্রীকৃষ্ণ শান্ত-সমাহিত নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে শিষ্যকে কর্ম-ধ্যান-জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়-বাণী শুনিয়েছেন। তখন গুরু-শিষ্য উভয়েই যোগারূঢ়। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে তখন অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ আলাপ করেছেন সখারূপে। অর্জুন এইমাত্র জানেন যে তাঁর সখাটি মানবশ্রেষ্ঠ,—জ্ঞানে কর্মে সকল রকমে শ্রেষ্ঠ পুরুষ; কিন্তু তবু তখনও তিনি সখা, তাঁর সঙ্গে হাস্যপরিহাস চলে।

সখা যখন বললেন, বিষমে সমুপস্থিত যুদ্ধের প্রাক্‌কালে পাগলামি রাখ, লড়াই করতে এসেছ—কিন্তু তোমার যে ক্লীবত্ব এসে পড়ছে; ওঠ, জাগ। অর্জুন বললেন, 'না, না, ক্লীবত্ব আসবে কেন? আমি পূর্ণ জ্ঞানের কথা বলছি, আমার মন সত্ত্বগুণেই অবস্থিত—এই রাজ্য, সম্পদ আমি চাই না' ইত্যাদি। সখা বললেন—বটে, তুমি জ্ঞানের কথা বলছ, কিন্তু জান প্রকৃত জ্ঞানী জগৎকে কি চোখে দেখেন? তবে শোন……।

কিছুক্ষণ জ্ঞানের কথা বলে তিনি বুঝলেন যে অর্জুনের মুখের কথা ও মনের কথা এক নয়। তাই বললেন, ক্ষত্রিয়-সন্তান তুমি, যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম।

শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, অর্জুনের মনের অন্ধকার কিছুমাত্র যায়নি; তখন তিনি স্বরূপে প্রকাশিত হয়ে সখাকে শিষ্যের আসনে বসিয়ে পরম তত্ত্ব শোনাতে শুরু করলেন। ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল যুদ্ধ-বিগ্রহ, পাণ্ডব- বংশের স্মৃতি। যোগারূঢ় জগদ্‌গুরু নিজেকে প্রকাশ করতে লাগলেন, অপূর্ব ভাবে সহজ সরল ভঙ্গিতে জ্ঞান, কর্ম, যোগ —বেদ-উপনিষদের গূঢ়তত্ত্ব শিষ্যের চিত্তে দিলেন প্রস্ফুটিত ক'রে; গুরুমন্ত্র কানের ভেতর দিয়ে নয়, চিত্তপটে ফিল্মের পর ফিল্মের মতো হতে লাগল প্রকাশিত। ক্রমে এল বিভূতিযোগ, তখন শিষ্য তন্ময় হয়ে দেখছে পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বেদ-উপনিষদের মর্মবাণীরূপে তাঁর অন্তরের বিজ্ঞান-ভূমিতে প্রতিফলিত।

তারপর পরম্-সৃষ্টি-রহস্যের একটি কোণের মায়া-জাল সামান্য সরিয়ে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যতের চিত্র অর্জুনের দিব্যচেতনায় করলেন পরিপ্রকাশিত।......আর যুদ্ধের কথা নেই। জগদ্‌গুরুর সামনে—নারায়ণের পদতলে উপবিষ্ট শিষ্য তখন সাধনভূমির উচ্চ সোপানে। বিহ্বল হয়ে তিনি বলছেন—ঠাকুর! বল, বল, জ্ঞানী ও যোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?...চলল প্রশ্নের পর প্রশ্ন —এইভাবে ব্যাসদেব গুরু-শিষ্য-সংবাদ গ্রথিত করেছেন।

কিন্তু কাব্যের উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ করা চাই—তাই প্রয়োজন—অর্জুনকে যুদ্ধে নামানো। তখনও শিষ্য দিব্যভূমিতে আরূঢ়, ক্রমে ক্রমে ফিরে আসছে কর্ম-জগতের চেতনা। জগদ্‌গুরু শ্রীভগবান শিষ্যকে বললেন—এখন বুঝেছ, তোমাকে যে কর্মক্ষেত্রে পাঠিয়েছি, যে প্রকৃতি দিয়ে গড়েছি তোমায়—সেইরূপে এই কর্মভূমিতে তোমায় চলতে হবে। পাপপুণ্য আমাতে অর্পণ কর। তোমার সকল ভার আমার উপর।

যুক্তিবাদী বন্ধু বলবেন—সকল অবতারই বলেছেন, আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার পাপপুণ্যের ভার নেব, কথাটা কেমন একটু অযৌক্তিক নয় কি? অন্ততঃ ঔপনিষদিক জ্ঞানের পরিপন্থী মনে হয়।

বন্ধুকে কুরুক্ষেত্রের পটভূমি স্মরণ করতে বলি—বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে ভয়বিহ্বল হয়ে বলছেন, তোমাকে সখা ভেবে হাস্যপরিহাস করেছিলাম, এখন ভয় হচ্ছে। ঠাকুর, তোমার আসল রূপ দেখাও। তুমিই চতুর্ভুজ বিষ্ণুনারায়ণ, আমাদের ইষ্টদেবতা। অর্জুন সেইরূপেই দেখলেন তাঁর সখাকে। পরে আবার দেখেছেন তাঁকে সারথিরূপেও। তখন আর তিনি পাণ্ডব-অর্জুন নন · ইষ্টের সন্নিধানে যোগসাধনে প্রবৃত্ত সাধক, বলছেন—এই যোগের বিষয় আরও বল। 'হন্ত তে কথয়িষ্যামি'—গুরু শিষ্যকে ক্রমে ক্রমে পুরুষ-প্রকৃতি, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, গুণত্রয়-বিভাগ সব সংক্ষেপে বললেন; শোনালেন কেমনভাবে তিনি সমাজবন্ধন, জীবের প্রকৃতি অনুসারে কর্মবিভাগ ইত্যাদির সৃষ্টি করেছেন।

ক্রমে অর্জুনের চৈতন্য বিজ্ঞান-ভূমি থেকে এল মনোজগতে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—নরশ্রেষ্ঠ, তোমাকে সব কথা বললাম, এখন তুমি যা ভাল বোঝ করো। তবে শেষ কথাটি ভুলো না যে, যে স্বভাব বা প্রকৃতি নিয়ে তুমি সংসারে এসেছ, সেই মতো কাজ করলে সহজে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। আর এও জেনো, আমিই সকল জীবের অন্তরে বসে আছি, আমিই যজ্ঞের অধিপতি ও যজ্ঞের ফলদাতা এবং জীবকে ন্যূনতম বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে জীবনপথে এগিয়ে নিয়ে যাই ভূমার দিকে।

সমালোচনা

আলোক-তীর্থঃ (প্রথম খণ্ড শৈলেন্দ্র-নারায়ণ ঘোষাল। মূল্য ৭৲; পৃঃ ৪১২। প্রকাশক: ডাঃ বঙ্কিম চৌধুরী, 'সন্তধাম'—কর্ণেলগোলা, মেদিনীপুর।

মতামতের স্বাধীনতা ভারতবর্ষের সংবিধান-সম্মত; তবে ধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় এর নিরঙ্কুশ প্রয়োগ যতখানি, অতখানি অন্যত্র অসম্ভব। অনেক সময়ই আমরা বাচালতাকে যুক্তি এবং স্পর্ধাকে পৌরুষ বলে ভুল করি। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার মূল বক্তব্য হিসাবে নতুন কিছু উপস্থিত করেননি; ঈশ্বরানুভূতি করেছেন বা ঈশ্বরাদেশ পেয়েছেন, এমন কোন পরিচয় এ গ্রন্থে দেননি। কিন্তু অনায়াসে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিজের বুদ্ধির ঘটি নিয়ে মাপতে গেছেন। আপাতদৃষ্টিতে কিছু মুখ-রোচক মালমশলা তিনি হাজির করেছেন—যাদের প্রত্যেকটির স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে সহস্র কথা বলার আছে। কিন্তু আমরা তো শুনেছি, তর্কের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না, পি. এইচ-ডি. উপাধিধারীর সার্টিফিকেটেও নয়। গ্রন্থপাঠে চিন্তাশীল পাঠক শুধু হেসেই নিরস্ত হবেন—নয়তো বলবেন, 'যার পেটে যা সয়'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ কথাটির মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত ক'রে গেছেন অধ্যাত্মসাধনায় বিভিন্ন স্তরের অধিকারী আছে; যুগ যুগ ধরে ভারতের সাধকেরাও তাই ক'রে এসেছেন, এমন কি কবীর নানক দাদূ পর্যন্ত (লেখক যাঁদের একমাত্র প্রামাণ্য বলে মনে করেছেন)। কিন্তু এঁদের মতই যে ঠিক, এমন যুক্তি লেখককে কে দিয়েছেন, বোঝা গেল না; না কি—একমাত্র তিনি বলছেন, এটিই প্রমাণ। মহাপুরুষদের বা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের আলোচনায় যে গভীর ধ্যান ও মননের প্রয়োজন, তার কোন প্রমাণই এ প্রগল্‌ভ গ্রন্থে নেই; উপরন্তু এদের জীবন ও বাণীর কষ্টকল্পিত অপ-ব্যাখ্যার উদাহরণ অজস্র। একটি উদাহরণ দিই:

২৭০ পৃষ্ঠায় মহামনীষী মাইকেলের সঙ্গে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব যে প্রথমে কথা বলতে পারেননি, তার কারণ হিসাবে লেখক বলেছেন যে মাইকেলকে বিধর্মী বলেই 'ভারতীয় হিন্দু' শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি। অথচ একটু আগেই লেখক এ পুস্তকে নারায়ণ শাস্ত্রীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—'কি! এই দুই দিনের সংসারে পেটের দায়ে নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করা!' শাস্ত্রীমশায় ওই পেটের দায়ে যুক্তিকেই অস্বীকার করেছিলেন, খৃষ্টধর্মকে নয়। এর পর মধুসূদন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপদেশ চাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু বলতে পারলেন না; বলেছিলেন, আমার মুখ কে যেন চেপে ধরলে—কিছু বলতে দিলে না। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের এই আচরণটিই লেখক তাঁর পরধর্ম-মত-অসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত ধরে নিয়ে কটূক্তি করেছেন। কিন্তু এই ঘটনা বর্ণনার পর 'লীলা-প্রসঙ্গে' আরও যে একটু কথা ছিল, সে কথা লেখক কৌশলে বাদ দিয়ে গেছেন। হৃদয়ের সাক্ষ্য অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ পরে কয়েকটি আধ্যাত্মভাবের গান গেয়ে এবং উপদেশ দিয়ে মধুসূদনকে মুগ্ধ করেন।

মধুসূদন কেন পেটের দায়ে খৃষ্টান হবার কথা বলেছিলেন, সেকথা তিনি জানেন। পেটের দায়ে তাঁর খৃষ্টান হওয়ার কথা নয়, তিনি ধনীর সন্তান। কিন্তু খৃষ্টভক্তি তাঁকে পরধর্ম গ্রহণ করায়-নি, বিলাত যাবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় তিনি খৃষ্টান হয়েছিলেন। এই সামান্য কারণে স্বধর্মত্যাগ

কোন কালেই সমর্থনীয় নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে খৃষ্টান হওয়ার জন্যই মধুসূদনের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারেননি—এমন অভিযোগ অভিসন্ধি-প্রণোদিত। খৃষ্টভক্ত উইলিয়াম্‌সের সঙ্গে তাঁর সপ্রেম আচরণের তাহলে কী অর্থ হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই ধরনের স্বকপোল-কল্পনার কোন অধিকার লেখকের নেই, একথা মনে করিয়ে দিয়ে ভাগবত সম্বন্ধে লেখকের অশোভন অবিনয়ের একটি চরম দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি: "কথায় আছে, মূঢ় দাম্ভিক চপলমতি কোন মাতালের হাতে ধারালো তরবারি থাকলে তাতে যেমন অনর্থ ঘটে, তেমনি কৃষ্ণগুণানুবাদের রসকথায় রসোন্মত্ত ভাগবত-কারও 'mightier than the sword' লেখনীমুখে কী অনর্থ ঘটিয়েছে দেখুন।" (পৃঃ ১২৬)—উদ্ধৃতিটি এ গ্রন্থ সম্বন্ধেই সুপ্রযোজ্য।

লেখকের নিজস্ব অধ্যাত্মপন্থা সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। একথা ঠিক যে, শিশুর আধো আধো মুখের ডাকও পিতার কানে এবং প্রাণে পৌঁছায়, কিন্তু বয়স্ক 'শিশু'র অহম্মন্যতাকে মঙ্গল-কামী পিতা কী চোখে দেখেন, তা বলাই বাহুল্য।

কোন প্রবীণ সাধুর মুখে শুনেছিলাম পূজনীয় স্বামী তুরীয়ানন্দজী জনৈক অধ্যাত্মসাধককে বলেছিলেন অধ্যাত্মসত্য স্বয়ং উপলব্ধি করেননি, এমন কারও রচনা পড়তে যেও না—বিভ্রান্ত হবে। আলোচ্য গ্রন্থটির অহঙ্কৃত অত্যুক্তিগুলি মহাপুরুষের এই উক্তির সত্যতা আর একবার প্রমাণিত করেছে। —পুণ্য মিত্র

ভক্তিসাধন কুসুমাঞ্জলি: গ্রন্থকার ও প্রকাশক—পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীদামোদর মহাপাত্র সাং সুপকারসাহী, পুরী। পৃষ্ঠা ৯৬+৩২; মূল্যের উল্লেখ নাই।

কলিযুগে ক্ষীণস্বাস্থ্য, স্বল্পধী, স্বল্পায়ু, দুঃখ-দ্বন্দ্ব-সমস্যা-জর্জরিত মানুষের ঈশ্বরলাভের পথে ভক্তিযোগই সহজ সরল উপায়। মানবের হৃদয়ে আছে ভালবাসার অন্তঃসলিলা রস-নির্ঝরিণী। সেই রসধারা জাগতিক কোন বিষয় বা লোকের উপর সীমাবদ্ধ না থাকিয়া যখন ঈশ্বর বা পরমাত্মার উপর প্রযুক্ত হয় তখনই তাহা ভক্তি আখ্যা পাইবার যোগ্য। সকল বয়সের নরনারীর পক্ষেই ভক্তিপথ প্রশস্ত। ভক্তিপথে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন-মূলক তপশ্চর্যা ও জটিল যোগ-সাধনের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন—শ্রীভগবানের নামগুণগান ও প্রাণের ব্যাকুলতা। ভগবানের নামে শরীর মন পবিত্র হয়, নির্মল সত্ত্বগুণাশ্রিত হৃদয়ে ভগবানের রূপ প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

আলোচ্য গ্রন্থে বৈষ্ণব মতে সাধনোপযোগী যাহা করণীয় তাহা সন্ধ্যা-পূজা-ধ্যান-প্রকরণের মাধ্যমে এবং নিত্যক্রিয়ার ক্রম ও অনুশীলন-পদ্ধতিতে বিধিমুখে বিবৃত, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রার্থও সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। এতদ্ব্যতীত 'শ্রীশিক্ষাষ্টকম্', 'শ্রীজগন্নাথাষ্টকম্', 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্', প্রভৃতি অমূল্য স্তোত্রগুলি পুস্তকখানিকে একটি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করায় ইহা ভক্তমাত্রেরই আদরণীয় হইবে বলিয়া মনে হয়। —জীবানন্দ

মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

সারদা-রামকৃষ্ণ লীলাগীতি (কথিকা সহ)—স্বামী চণ্ডিকানন্দ প্রণীত; প্রকাশক স্বামী সৌম্যানন্দ, সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং। পৃষ্ঠা ৮৮; মূল্য এক টাকা চার আনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের লীলাবলম্বনে ভক্তিরসাত্মক ৫০ খানিরও অধিক গান স্বরতাল সহ সন্নিবেশিত। গানের মাঝে মাঝে তাঁহাদের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি সরলভাবে বর্ণিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বহুমুখী বিদ্যাভবন উদ্বোধন

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবনে বহুমুখী শিক্ষাদানের জন্য যে নূতন ভবনটি নির্মিত হইয়াছে, গত ২১শে ফেব্রুআরি তাহার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ। এই ভবনে বিজ্ঞানাগার এবং উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার ক্লাস-কক্ষগুলি স্থাপিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে সন্ধ্যায় বিদ্যাভবন-প্রাঙ্গণে প্রশস্ত চন্দ্রাতপের নীচে একটি বিরাট জনসভায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির ভাষণে স্বামী মাধবানন্দজী শিক্ষায় অসাম্প্রদায়িক ধর্মের স্থান এবং স্বামীজীর শিক্ষার আদর্শে স্থাপিত এই সব প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। ডক্টর মজুমদার শিক্ষার গুরুত্ব ও লক্ষ্য বিশ্লেষণ করেন।

পরদিন ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের পারিতোষিক-বিতরণী সভায় ভাষণ দেন। স্বামী মাধবানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পারিতোষিক বিতরণ করেন। পরে ছাত্রদের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

পুরস্কার-বিতরণী সভা

বিদ্যামন্দির, বেলুড়ঃ নবনির্মিত ব্যায়ামাগারের প্রশস্ত হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে গত ২২শে ফেব্রুআরি বেলুড় বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণোৎসবে নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া পুরস্কার বিতরণ করেন

বার্ষিক কার্য-বিবরণী পাঠ-প্রসঙ্গে বিদ্যামন্দিরের (কলেজের) অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ বলেনঃ বিদ্যামন্দিরের অগ্রগতি অপ্রতিহত। আবাসিক সাধু শিক্ষকদের সাহচর্যে নিয়মিত প্রার্থনা পড়াশুনা ও কাজকর্মের ভিতর দিয়া ছাত্রদের সুশৃঙ্খল জীবন গঠনের প্রচেষ্টা সাফল্যের পথে অগ্রসর। ১৯৫৮ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক।

	পরীক্ষার্থী	১ম (বিভাগে)	২য়	৩য়
আই. এস-সি.	৬	৪১	১৫	
আই. এ.	৩	২৭*	৪	১

* (১ম, ৩য় ও ৭ম স্থান অধিকৃত)

পরিশেষে অধ্যক্ষ মহারাজ বলেন যে শীঘ্রই বিদ্যামন্দির 'তিন বৎসরের ডিগ্রি কলেজে' রূপান্তরিত হইবে।

সভাপতির ভাষণে স্বামী নিখিলানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মন—'মানুষ কি ?' এই প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করেন ; এবং এই প্রতিষ্ঠানকে 'মানুষ' গঠন করিবার দুরূহ কার্যে ব্রতী দেখিয়া আশা ব্যক্ত করেন, স্বামীজীর স্বপ্ন সফল হইবে।

ছাত্রগণের সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী আবৃত্তি ও ভজনগান উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ৩৬ জন ছাত্র সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ গুণাবলী, প্রবন্ধরচনা, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য পারিতোষিক লাভ করে।

উৎসব-সংবাদ

তমলুক : গত ১৯শে ডিসেম্বর, পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, কীর্তন, আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পূজ্যপাদ মহারাজ ১৯১৫ খৃঃ তমলুকে আসিয়াছিলেন, সেই কথা স্মরণ করিয়াই এই অনুষ্ঠান।

গত ৫ই জানুআরি আশ্রমে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, জীবনী আলোচনা ও শ্রীশ্রীরামনাম সঙ্কীর্তন হইয়াছিল।

গত ১৫ই জানুআরি পূজ্য স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, ভোগরাগ ও আলোচনা হয়।

ফরিদপুর : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৩১শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। উক্ত দিবসে বিশেষ পূজা, মঙ্গলারতি, হোম ও চণ্ডীপাঠ হয় এবং সন্ধ্যায় ভজন সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীশিশিরকুমার আচার্য স্বামীজীর জীবনদর্শন আলোচনা করেন।

৬ই ফেব্রুআরি বৈকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্বামীজীর জন্মোৎসব ভাব-গম্ভীর পরিবেশে অতি সুশৃঙ্খলভাবে ফরিদপুরের সহকারী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা জজ সাহেবের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সর্বশ্রেণীর নরনারী ঐ উপলক্ষে আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমবেত হন। চারিদিকে স্বামীজীর অমূল্য বাণী টাঙাইয়া দেওয়া হয়, স্থানীয় মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ গুরুস্তব, ও স্বামীজীর বন্দনা-গীতি সুন্দরভাবে গান করিয়া সকলকে প্রীত করে।

পুরী : গত ৩১শে জানুআরি হইতে দিবসত্রয় পুরী রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিতে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পূজা, চণ্ডীপাঠ, ভজন, জনসভায় বক্তৃতা, প্রসাদ-বিতরণ,স্কুল ও কলেজের বালিকাদের মধ্যে বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নাটকাভিনয় প্রভৃতি উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রায় দুই শত বালক-বালিকা বিশটি বিভিন্ন ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ 'বিবেকানন্দ ও ভারতের নবজাগরণ' সম্বন্ধে ইংরেজী, ওড়িয়া ও বাংলা ভাষায় বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ ওড়িয়া ও বাংলা ভাষায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। স্বামী সদাশিবানন্দ মহারাজ প্রতি-যোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিবরণ করেন। এক বিরাট জনসভায় সভাপতি ওড়িস্যার উন্নয়নমন্ত্রী শ্রীরাধানাথ রথ, স্বামী সন্তোষানন্দ, অধ্যাপক শ্রীজয়কৃষ্ণ মিশ্র ও অধ্যাপক শ্রীসত্যবাদী মিশ্র স্বামীজী-প্রবর্তিত শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ওড়িয়া ভাষায় লিখিত 'কুরুক্ষেত্র' নামক একটি নাটিকা মিশন লাইব্রেরি ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ কর্তৃক অভিনীত হয়।

ভুবনেশ্বর : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ৯ই ফেব্রুআরি পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শুভ জন্মোৎসব বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, আরাত্রিক, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ ও জীবনী আলোচনার মাধ্যমে মহা আনন্দে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্বামী অসঙ্গানন্দ 'ধর্মপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ' পুস্তক হইতে পাঠ করেন। অপরাহ্ণে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় শ্রীদীনবন্ধু সাহু (সভাপতি), শ্রীনিত্যানন্দ দাস ও পণ্ডিত শ্রীঋষিরাম ধর্মের মূল কথা, সেবা-রহস্য ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের ধর্মজীবন আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তন এই উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল।

কার্য-বিবরণী

বিবেকানন্দ সমাজসেবা-কেন্দ্র: (১৭, নন্দলাল মল্লিক লেন এবং ৯।১, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬): স্বামীজীর শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের কয়েকজন বিদ্যার্থী দ্বারা রামবাগান বস্তিতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সেবাকল্পে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে।

১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণীতে প্রকাশিত ইহার বর্তমান চতুর্বিধ কর্মধারা—

(১) শিশুবিভাগ:

১। বিবেকানন্দ নার্সারি স্কুল (৩ হইতে ৬ বছরের শিশুদের জন্য): ছাত্রসংখ্যা ৩৪

২। বিবেকানন্দ বেসিক স্কুল: ছাত্রসংখ্যা ১৫৯; এখানে মৃৎশিল্প, খেলনা তৈরী, সেলাই, বুনন, অঙ্কন, বেত ও বাঁশের কাজ শেখানো হয়। লেখাপড়া ছাড়া গানবাজনা ও অভিনয় শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

৩। ছাত্রাবাস: বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ১০ হইতে ১৬ বছরের ১৫জন অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্র লইয়া এই বিদ্যার্থিভবন। ছাত্রদের থাকা-খাওয়া, স্কুলের বেতন, পোষাক ও শিক্ষার অন্যান্য খরচ সবই আশ্রম হইতে বহন করা হয়।

(২) বয়স্ক-বিভাগ:

১। বিবেকানন্দ নৈশ বিদ্যালয়: ইহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৬৭ জন লিখন-পঠনক্ষম হইয়াছে।

২। সারদামণি নৈশ বিদ্যালয়: ১৯৫৭ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত, এখানে মেয়েদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ হইতেছে।

৩। সমাজ-শিক্ষার ক্লাস: চলচ্চিত্র, কথকতা, বক্তৃতা, থিয়েটার ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষা-বিস্তার করা হয়। পাক্ষিক দেওয়াল-পত্রিকায় বস্তির উন্নয়ন কিভাবে হইতে পারে প্রবন্ধ ও চিত্রের সাহায্যে দেখানো হইয়া থাকে।

৪। গ্রন্থাগার ও পাঠাগার: গ্রন্থাগারে নির্বাচিত ৮০০ বই আছে, পাঠাগারে একটি দৈনিক পত্রিকা সহ কতকগুলি সাময়িকী রাখা হয়। দৈনিক উপস্থিতি গড়ে ১৫।

(৩) স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ:

বস্তি যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইতেছে। একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইয়াছে। এখানে অভিজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ৭,০০০ রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে। প্রতিদিন তিন শত হইতে চার শত শিশুকে দুধ দেওয়া হয়।

(৪) জীবিকার মান উন্নয়ন:

দরিদ্র জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য 'বিবেকানন্দ শ্রম-শ্রী' সমবায়-সমিতি খোলা হইয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

সানফ্রান্সিস্কো: বেদান্ত সোসাইটি

বিভিন্ন রবিবারে বেলা ১১টায় এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় সমিতির ভাষণ-গৃহে স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন:

নভেম্বর:—উন্নত মনের প্রকৃতি ও ক্রিয়া; ঈশ্বরের অনুসন্ধান কখন এবং কিরূপে? কোথা হইতে, কেন, কোথায়? যেখানে প্রেম ও যুক্তি মিলিত হয়; বাস্তব সত্তাই পরম পুরুষ; শক্তির রহস্য; সমস্ত অনর্থের মূল কি? চৈতন্যের ঊর্ধ্বগতি; আমি কি আমার ভ্রাতার রক্ষক?

ডিসেম্বর:—যথার্থভাবে কর্ম করিবার উপায়; ঈশ্বরকে পাওয়া যায় কিরূপে? ব্যক্তি-মানস ও বিশ্বমানস; আমি শরীর নই, আমি মন নই; অধ্যাত্ম-জীবন ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম; আমার জানা দেব-মানব; শাশ্বত খৃষ্ট।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে মেজর প্রভাত বর্ধন

আমরা গভীর দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি যে গত ২৫শে ফেব্রুআরি বুধবার রাত্রে মেজর প্রভাত বর্ধন ৬৯ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মেজর বর্ধন অকৃতদার ছিলেন।

১৮৯০ খৃঃ কলিকাতা বহুবাজারের বিখ্যাত বর্ধন বংশে প্রভাত বর্ধন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ বর্ধন ধর্মপরায়ণ ও সুপরিচিত শিক্ষাব্রতী ছিলেন; তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বয়েজ স্কুলে প্রভাতের প্রথম শিক্ষা শুরু হয় এবং পিতার ধর্মভাব ও লোকহিতৈষণা তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করে। বহুবাজারে স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি অনাথ ভাণ্ডারের উন্নতিকল্পে তাঁহার পরিশ্রম চিরস্মরণীয়। অকালে পিতৃ-বিয়োগের পর ১৯১৪ খৃঃ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম. বি. পাশ করিয়া তিনি সামরিক বিভাগে যোগদান করেন এবং এই কার্যে ভারতে ও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশে ৮ বৎসর কাটান। তিনি ১৯২২ খৃঃ ইংলণ্ডে গমন করিয়া এফ. আর. সি. এস ও এম. আর. সি. পি. পাস করিয়া আসেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পুনরায় ইওরোপে গিয়া সেখানকার হাসপাতালের কার্যপদ্ধতি দর্শনান্তর দেশে ফিরিয়া তিনি স্বদেশ ও স্বধর্মের উন্নতিকল্পে জনকল্যাণের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত—বিশেষতঃ 'কালচার ইনষ্টিট্যুটে'র সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

উৎসব-সংবাদ

শিকড়া ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ষষ্ঠনবতিতম জন্মতিথি-পূজা তদীয় পুণ্য জন্মস্থান শিকড়া-কুলীনগ্রামে গত ৯ই ফেব্রুআরি সোমবার মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে পূজা, ভজন, রামনাম-কীর্তন, চণ্ডী ও ভাগবত পাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ, ব্রহ্মানন্দ-জীবনী আলোচনা-ছায়াচিত্র-প্রদর্শন, ধর্মসভা প্রভৃতি কর্মসূচী লইয়া সপ্তাহব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিবস মধ্যাহ্নে ৬০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদলাভে ধন্য হন।

উৎসবের শেষ দিবস (রবিবার) গ্রামবাসী ও ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও মহারাজের প্রতিকৃতি মাথায় লইয়া শঙ্খধ্বনি ও কীর্তন সহযোগে তীর্থ-পরিক্রমা করেন। মধ্যাহ্নে অনুমান ৬,০০০ ভক্ত নরনারী, গ্রামবাসী ও নানাস্থান হইতে আগত পল্লীবাসিগণ প্রাসাদলাভে ধন্য হন।

সাধুসজ্জন-সমাগমে উৎসবের আনন্দ ও ভাবগাম্ভীর্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সালকিয়া ঃ ৮ই ফেব্রুআরি সালকিয়া তরুণদল কর্তৃক উষাঙ্গিণী বালিকা বিদ্যালয়-ভবনে স্বামী বিবেকানন্দের ৯৭তম জন্মোৎসব বিশেষ গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে উদ্যাপিত হয়।

উক্ত সভায় স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর পক্ষ হইতে স্বামীজীর জীবন আলোচিত হইলে বিধান সভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি স্বামী মিত্রানন্দ স্বামীজীর বাণী পর্যালোচনা করেন।

ফলতা (২৪ পরগনা) ঃ গত ২৫শে ডিসেম্বর চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডপের এই শাখা আশ্রমে বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব

সুসম্পন্ন হইয়াছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুদূর পল্লী অঞ্চল হইতে এবং কলিকাতা হইতে ভক্তগণ আশ্রমে সমবেত হইতে থাকেন। শ্রীমন্দিরে পূজা, পাঠ ও হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথির কথকতা এবং ভজন আশ্রমে নির্মল আনন্দের সঞ্চার করে। মাকড়-দহ শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়ের ভক্তগণের শ্রীরামকৃষ্ণ-নামকীর্তনে সমবেত জনগণ আনন্দ লাভ করেন, মধ্যাহ্নে পাঁচ সহস্রাধিক নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়।

জামনগর ঃ গত ১৭ই মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে স্থানীয় বালমনোবিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে কাশীবিশ্বনাথ-মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা, সপ্তশতী চণ্ডীপাঠ ও হোম হয়। সন্ধ্যা ৬টায় স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ত্র্যম্বকভাই জাবেরীর পৌরোহিত্যে এক সভায় অধ্যাপক মদনমোহন জানী স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ পাঠ করিয়া শুনান ও বুঝাইয়া দেন।

১৮ই মাঘ প্রাতে সীতা-মাহাত্ম্য, দেবর্ষিস্মরণ, দশাবতার, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং অন্যান্য দেব-দেবীর স্তব পাঠ করা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দের সভাপতিত্বে এক সভায় মনীষী কাকা কালেলকার, অধ্যাপক দুষ্মন্ত পাণ্ডিয়া, নবনগর হাইস্কুলের হেড মাষ্টার জে. ডি. মারু সাহেব, ডাঃ ওয়াই. জে. মারুভাই এবং সভাপতি গুজরাতী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন; সভাপতি ইংরেজীতেও কিছুক্ষণ বলেন। প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

পিপড়াডি কোলিয়ারী ঃ গত ১৭ই মাঘ শনিবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

প্রতিকৃতি পত্র-পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছিল। পূজা, গীতাপাঠ ও ভজন উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় ডাঃ ধনঞ্জয় দে গীতার ভক্তি-যোগ পাঠ করেন। অতঃপর স্বামীজীর বাণী আলোচিত হয়। ভক্তবৃন্দের সমাগমে উৎসব আনন্দমুখর হইয়া উঠে

কার্য-বিবরণী

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা ঃ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ জনকল্যাণে রূপায়িত করিবার জন্য যে সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ সোসাইটির নাম প্রাচীনতার দিক হইতে উল্লেখযোগ্য। ১৯০২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির চার বৎসরের (১৯৫৩-৫৬) কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কর্ম-ধারা প্রধানতঃ প্রচার, শিক্ষা ও সেবা-মূলক।

সাপ্তাহিক ও সাময়িক ধর্মসভায় গীতা, উপনিষৎ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রভৃতি আলোচিত হইয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, শংকরাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করা হয়।

প্রতি বৎসর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রচনা-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। সোসাইটির হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ১৯৫৬ খৃঃ ১৭,২২২ রোগীকে ঔষধ এবং ১২ জন দরিদ্র ছাত্রকে নিয়মিত সাহায্য বাবদ ৩৪১৲ টাকা দেওয়া হয়।

সমিতির গ্রন্থাগারে ধর্ম দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক ৪,০০০ নির্বাচিত পুস্তক আছে; পাঠাগারে বহু পত্র-পত্রিকা নিয়মিত আসে।

সোসাইটির বর্তমান সভ্য-সংখ্যা ৪২০।

আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা

গত ২২শে ফেব্রুআরি নতুন দিল্লী বিজ্ঞান-ভবনে শ্রীজওহরলাল নেহরু আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা-মালার উদ্বোধন-কালে 'বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারত' সম্বন্ধে একটি লিখিত ভাষণ একঘণ্টা পাঠ করেন, এবং পরদিন উহা শেষ করেন।

বক্তৃতার প্রারম্ভে মৌলানা আজাদের গুণাবলী বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, মৌলানা ভারতকৃষ্টির একটি সমন্বিত প্রতীক। যুগে যুগে ভারতের রূপবিবর্তন, শিল্পবিপ্লব, ভাবসংঘর্ষ এবং যন্ত্রবিজ্ঞানের অগ্রগতি—ইহাই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। ইসলাম ও পাশ্চাত্য চিন্তা কিভাবে ভারতজীবন প্রভাবিত করিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া বর্তমানে যে দুইটি শক্তি—জাতীয়তা ও সমাজসাম্যের দাবি প্রবল ভাবে কাজ করিতেছে, বক্তা তাহার উল্লেখ করেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

সমুদ্রজলের লবণ দূরীকরণঃ একটি মার্কিন ও একটি ব্রিটিশ কোম্পানি চুক্তিবদ্ধ ভাবে কাজ করিতেছে যাহাতে 'মেম্ব্রেন' পদ্ধতিতে জলের লবণতা দূরীকরণ-যন্ত্র জলাভাবের দেশসমূহে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

আওনিক্‌স্ কোম্পানি (Ionics Company) বহুদিন হইতেই মেম্ব্রেন পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক আয়ন স্থানান্তরিত করিয়া অল্প ব্যয়ে জলের লবণতা দূর করিতেছে। পদ্ধতিটির বৈজ্ঞানিক নাম ইলেকট্রো-ডায়ালিসিস্ (Electrodialysis, —membrane process for de-salting of sea-water), অন্যান্য—অধিকাংশ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত তাপ-শক্তির পরিবর্তে এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহৃত হয়। মধ্যসমুদ্রের, উপসাগরের বা নদীমোহানার জলকে এই পদ্ধতিদ্বারা অতি সহজে লবণমুক্ত করা যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকায়, পারস্য উপসাগরে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। অন্যান্য জলাভাবের দেশে—যথা ভারতে, অষ্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকার নানাস্থানে, এই যন্ত্রের চাহিদা বাড়িতেছে।

আণবিক বিদ্যুৎ-শক্তিঃ গত ১৬ই ফেব্রুআরি ডক্টর ভাবা (Chairman of Atomic Energy Commission) লোকসভার সদস্যদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, ১৯৬৪ খৃঃ শেষাশেষি ভারত আণবিক বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহারোপযোগী করিতে সক্ষম হইবে।

আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক খরচ অনেক, যথা এক মিলিয়ন কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্ল্যান্ট স্থাপন করিতে ২৫০ কোটি টাকা পড়িবে। প্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ হইতে ইহা বেশি, তবে পরবর্তী কালে ক্রমশঃ উৎপাদন-খরচ কমিয়া যাইবে এবং উৎপন্ন বিদ্যুৎ হইতে আয় হইবে।

উৎপাদনের জন্য প্রথমে ইউর্যানিয়ম ব্যবহৃত হইবে, পরে থোরিয়ম। ভারতে প্রায় ৩০,০০০ টন ইউর্যানিয়ম আছে, সম্প্রতি রাজস্থানেও ইহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ভ্রম-সংশোধনঃ ফাল্গুন-সংখ্যার ১০১ পৃষ্ঠায় 'লণ্ডনের চিঠি'র দ্বিতীয় কলমে ৪র্থ পঙ্‌ক্তি পড়িবেনঃ 'প্রথম বক্তা মিসেস্ সরকার'।
এই-সংখ্যার ১২৯ পৃষ্ঠায় 'মনের মায়া' প্রবন্ধে ২য় পঙ্‌ক্তি প্রথম শব্দ পড়িবেনঃ 'দাওয়ায়'।

Statement about ownership and other particulars of

UDBODHAN

FORM IV

According to Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956.

1. Place of Publication .. 1, Udbodhan Lane, Baghbazar, Calcutta-3.
2. Periodicity of its Publication Monthly
3. Printer's Name .. .. Swami Advayananda
   Nationality .. .. Indian
   Address .. .. 1, Udbodhan Lane, Calcutta-3
4. Publisher's Name .. .. Swami Advayananda
   Nationality .. .. Indian
   Address .. .. 1, Udbodhan Lane, Calcutta-3
5. Editor's Name .. .. Swami Niramayananda
   Nationality .. .. Indian
   Address .. .. 1, Udbodhan Lane, Calcutta-3
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper — Trustees of the Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah, West Bengal.

1. Swami Sankarananda, President -do-
2. „ Vishuddhananda, Vice-President -do-
3. „ Madhavananda, General Secretary -do-
4. „ Nirvanananda, Treasurer, -do-
5. „ Vireswarananda } Asst. Secretaries -do-
6. „ Saswatananda }
7. „ Asimananda, Accountant -do-
8. „ Santananda -do-
9. „ Abhayananda -do-
10. „ Prabodhananda -do-
11. „ Yatiswarananda, Sri R. K. Ashrama, Basavangudi, Bangalore City, S. India.
12. „ Atmabodhananda, Udbodhan Office, 1, Udbodhan Lane, Baghbazar, Cal.-3.
13. „ Dayananda, Ramakrishna Mission Seva Pratishthan, 99 Sarat Bose Rd. Cal.-26
14. „ Nirvedananda, Ramakrishna Mission Students' Home, Belghoria, 24-Parganas, West Bengal.
15. „ Sambuddhananda, Sri Ramakrishna Ashrama, Khar, Bombay.
16. „ Omkarananda, Sri Ramakrishna Math, Kankurgachi, Narkeldanga, Cal.-11.
17. „ Pavitrananda, The Vedanta Society, 34, West, 71st Street, New York-23, U.S.A.

I, Swami Advayananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date, 10th March, 1959. *Signature of Publisher* : Swami Advayananda.

জাতির
সেবায়
ইস্পাত
টাটা স্টীল

Get more strength
out of your
FOOD
BE WISE TO PICK UP
Vanasda
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMIN A & D
BERAR OIL INDUSTRIES
AKOLA BOMBAY
MADE FROM VEGETABLE OILS ONLY

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সরল রাজযোগ—৪র্থ সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি বুলের বাড়ীতে কয়েক জন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্ত্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ॥০ আনা।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। ১০২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামিজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোযিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজান হইয়াছে। পরিচয় এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবিসম্বলিত। মূল্য ১ম ভাগ ৫৲ ও ২য় ভাগ ৪॥০ আনা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪॥০ ও ৪।০।

ভারতে বিবেকানন্দ—১২শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামীজির ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৬৪৫ পৃষ্ঠা মূল্য ৫৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪॥৵০ আনা

দেববাণী—৭ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্রদ্বীপোদ্যান' নামক স্থানে কয়েক জন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন তাহার একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ২২৭ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৸৵০ আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহিত অংশসমূহ বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সন্নিবেশিত। মূল্য ২।০ আনা।

বিবেক-বাণী—১৬শ সংস্করণ। আচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজীর উপদেশাবলী। স্বামীজির বাষ্টসম্বলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। মূল্য।৵০ আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামীজির ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ আনা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

ভারতীয় নারী—১২শ সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান আদর্শ, পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজির মনোরম ছবি-সম্বলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান—৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৩ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদান্ত-মত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে আর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ—যে গুলি না বুঝিলে ধর্ম জিনিষটাকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ১॥০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৩শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়ভরতের-উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট ও ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। মূল্য ১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

সন্ন্যাসীর গীতি—১৩শ সংস্করণ। স্বামীজি-রচিত 'Song of the Sannyasin' নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৵০ আনা।

পওহারী বাবা—৯ম সংস্করণ। গাজীপুরের বিখ্যাত মহাত্মা পওহারী বাবার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। স্বামীজির হাফটোন ছবিযুক্ত। মূল্য ॥০ আনা।

হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ—৫ম সংস্করণ, ৯০ পৃষ্ঠা। ইহাতে হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা, হিন্দুধর্মের ক্রমাভিব্যক্তি, ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর ও ডাঃ পল ডয়সেন সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মূল্য ৸০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ॥৵০ আনা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৪র্থ সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ।৵০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ।৵০ আনা।

অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৪র্থ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। এই পুস্তক পাঠে চরিত-কথার কল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম্মতত্বের সন্ধান পাইলেন। মূল্য ১৷৹ আনা!

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৪র্থ সংস্করণ; আচার্য্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲ মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা—১ম সংস্করণ। স্বামী অরূপানন্দ প্রণীত। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা পুস্তক হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। মূল্য ।৵৹ আনা।

ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য ২৲ টাকা।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—২য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৷৹ আনা।

শিবানন্দ-বাণী—১ম ভাগ—৫র্থ সংস্করণ, ২য় ভাগ—২য় সংস্করণ স্বামী অপূর্ব্বানন্দ-সঙ্কলিত মূল্য প্রতি ভাগ ২৷৹ আনা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। প্রথম ভাগ—(ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর) ৫ম সংস্করণ। দ্বিতীয় ভাগ—(ছান্দোগ্য) ৩য় সংস্করণ। তৃতীয় ভাগ—(বৃহদারণ্যক) ৩য় সংস্করণ। ইহাতে উপনিষদের মূল, সংস্কৃত, অন্বয়মুখে বাংলা প্রতিশব্দ, সরল বঙ্গানুবাদ এবং আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যানুযায়ী দুরূহ বাক্যসমূহের টীকা প্রভৃতি আছে। সুদৃশ্য ছাপা, কাপড়ের মনোরম বাঁধাই, ডবল ক্রাউন—১৬ পেজি, প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য—প্রতি ভাগ ৫৲ টাকা।

সাধু নাগ মহাশয়—৮ম সংস্করণ। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ১৷৹ আনা মাত্র।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত) অতুলনীয় সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত 'গোপালের মা' এর সংক্ষিপ্ত আদর্শ জীবনের কাহিনী। মূল্য ৷৹ আনা।

নিবেদিতা—১২শ সংস্করণ। শ্রীমতী সরলা বালা দাসী-প্রণীত। স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা। মূল্য ৸৹ আনা।

সৎকথা—স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক সংগৃহীত—৩য় সংস্করণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ (শ্রীলাটু) মহারাজের উপদেশাবলীর সংকলন। মূল্য ২৲ টাকা।

যোগচতুষ্টয়—স্বামী সুন্দরানন্দ-প্রণীত। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তিও যোগের সংক্ষিপ্ত সরল বিবরণ। মূল্য ২৲ টাকা।

বেদান্তদর্শন—১ম খণ্ড—চতুঃসূত্রী। শাঙ্কর ভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ, রত্নপ্রভা টীকা, ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্বলিত। প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ টাকা।

স্তবকুসুমাঞ্জলি—৫ম সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত—বৈদিক শান্তিবচন, সূক্ত, প্রার্থনা ইত্যাদি বিবিধ সংস্কৃত স্তোত্রাদির অপূর্ব্ব সঙ্কলন। সংবাদপত্রসমূহে উচ্চ প্রশংশিত। মূল সংস্কৃত, অন্বয়, অন্বয়মুখে সংস্কৃতের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং মূলের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৩৲ টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৫ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ৷৵৹ আনা।

আগে চলো—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। কিশোরদের জন্য লেখা। তরুণমনে সুনীতি, দেশাত্মবোধ, সেবা, আদর্শনিষ্ঠা এবং ধর্মপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক যৌবনোন্মুখ ছেলেমেয়েকে এই বইখানি পড়িতে দেওয়া উচিত। মূল্য ১৷৹।

হিন্দুধর্ম পরিচয়—১ম ও ২য় ভাগ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সরল কথায় হিন্দুধর্মের মুখ্য বিষয়গুলির সহিত পরিচিত চেষ্টা এই বই দুখানিতে করা হইয়াছে। মূল্য ১ম ভাগ ৷৹ আনা, ২য় ভাগ ৸৹ আনা।

দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য ওপূজা-পদ্ধতি—স্বামী কৈবল্যানন্দ-প্রণীত। মূল্য ১ম ভাগ (পরিবর্দ্ধিত ৪র্থ সংস্করণ ৸৹, ২য় ভাগ (৩য় সংস্করণ) ১৷৹।

ঠাকুর এবার এসেছেন

ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। এবার বাঁশ ও ঘাস ছাড়া যার ভেতরে একটু সার আছে সেই চন্দন হবে। তোমাদের ভাবনা কি?

সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ-মন ভাল থাকে। ·কাজ করতেই হয়। কর্মেই কর্মপাশ কাটে। কাজ ছাড়া থাকা ঠিক নয়।...

শ্রীমা

● ● ●

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী অভয়ানন্দ, ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, এম. আই. প্রেস হইতে মুদ্রিত
এবং ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা—৩

৬১তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৬৬

বার্ষিক মূল্য ৫্

প্রতি সংখ্যা ॥০

উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৬৬

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিখ্যাত স্বর্ণশিল্পী ও
জহরতকার
ফোন ৩৪-৪৯৮২
অন্নপূর্ণা জুয়েলারী হাউস
৮৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২
গ্যারান্টী যুক্ত গিনি সোনার গহনার প্রতিষ্ঠান। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য ৷৷৹ টাকার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন।

কাশি!
তাড়াতাড়ি আরাম
আর
নিরাময়ের জন্য
বি. আই. কফ সিরাপ
বেঙ্গল ইমিউনিটি
COUGH
SYRUP

শংকরাচার্য-কৃত বুদ্ধ-স্তুতি

ধরাবদ্ধপদ্মাসনস্থাঙ্ঘ্রি-যষ্টি-
নিয়ম্যানিলং ন্যস্তনাসাগ্রদৃষ্টিঃ।
য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্তী
স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোঽস্তু নিশ্চিন্তবর্তী॥

[শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত দশাবতার-স্তোত্রান্তর্গত নবম শ্লোক]

যাঁহার পদযষ্টি বদ্ধ পদ্মাসনে অবস্থিত—যিনি পদ্মাসন বন্ধনপূর্বক ভূতলেই অবস্থান করিতেন, বায়ু সংযমপূর্বক প্রাণায়াম করিয়া, যিনি নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেন, যিনি কলিযুগে যোগিগণের শ্রেষ্ঠ—সেই বুদ্ধদেব আমাদের বাসনাশূন্য চিত্তমধ্যে সদা জাগ্রত থাকুন।

ধ্যানিশ্রেষ্ঠ শ্রীবুদ্ধের উদ্দেশ্যে রচিত জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ আচার্য শঙ্করের এই শ্লোকচন্দ্র ভারত-ভুবন আলোকিত করুক; চিত্তের মলিনতা ভাসাইয়া দিয়া বৈশাখী পূর্ণিমার শান্তি-সুধা আমাদের হৃদয় মন পরিপূর্ণ করুক।

কথাপ্রসঙ্গে

ভারাক্রান্তা ধরিত্রী

কি স্বদেশী, কি বিদেশী পুরাণে আমরা পড়ি—প্রথমে মানুষ ছিল না, তারপর মানুষে মানুষে পৃথিবী ভরিয়া গেল—আবার মহাপ্রলয়ের পর পৃথিবীতে আর জনমানব রহিল না। জলময় বিশ্বে প্রথম যখন একটু ডাঙ্গা দেখা দিল, সেই হইল আমাদের শত সাধের পৃথিবী—শত স্বপ্নের ধরিত্রী, যিনি আবার ধারণ করিবেন তৃণ গুল্ম বৃক্ষ লতা, ক্রমশঃ দেখা দিবে চলমান জীবন-স্পন্দন, সরীসৃপ-জীব-জন্তুর সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া অবশেষে বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের প্রধান নায়করূপে আবির্ভূত হইবে মানুষ। বিজ্ঞান-কল্পিত ক্রমবিকাশের পুরাণ-কাহিনীও বিশেষ কিছু অন্য প্রকার নয়।

সৃষ্টির প্রথমে যখন মানুষের সংখ্যা বেশি ছিল না, তখনও জীবন-সংগ্রাম ছিল প্রচণ্ড। মানুষের সংগ্রাম ছিল বহিঃপ্রকৃতির সহিত—প্রখর সূর্যতাপের সহিত, তুষার ঝড়বৃষ্টি প্লাবনের সহিত; মানুষের সংগ্রাম ছিল হিংস্র জন্তুর সহিত—সর্প ব্যাঘ্র বন্যহস্তীর সহিত; খাদ্যের জন্য, আশ্রয়ের জন্য, সঙ্গী নির্বাচনের জন্য মানুষের সহিত মানুষের সংগ্রামও সৃষ্টির সমবয়সী। মানবাবির্ভাবের প্রথম দিনেই না হউক নিশ্চয় দ্বিতীয় দিনে—শ্যামলা অথবা ধূসরা ধরিত্রী ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। সে দিন হইতে আজ পর্যন্ত ইহার বিরাম নাই। দুইটি সন্তানের একটিকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া প্রথমা জননী যখন প্রশ্ন করিলেন, 'ভাইকে কোথায় ফেলিয়া আসিলি?' উত্তর আসিয়াছিল, 'আমি কি আমার ভাইএর রক্ষক?'

তারপর কতদিন গিয়াছে, কত রাত্রি গিয়াছে—মাস বর্ষ যুগ অতিক্রান্ত হইয়া পৃথিবীর বয়স বাড়িয়াছে; কিন্তু মানুষের সংখ্যা কখনও বাড়িয়াছে, কখনও কমিয়াছে! পৌরাণিক কথা বাদ দিয়াও বৈজ্ঞানিক গ্লেশিয়াল যুগের কথাই চিন্তা করা যাক্। সূর্যের চারিদিকে চক্রপথে ঘূর্ণায়মানা পৃথিবীতে পর্যায়ক্রমে আসে হিমযুগ ও তাপযুগ, এক এক যুগের পরিমাণ লক্ষ বর্ষেরও অধিক! যখন হিমযুগ শুরু হয়, তখন সমুদ্রের জল শীতল মেরুপ্রদেশে জমিতে থাকে—অন্যত্র দেখা দেয় ভূমিভাগ; তাপযুগে তুষার গলিতে থাকে, সমুদ্রের জল বাড়িতে থাকে, ভূমিভাগ জলে ডুবিয়া যায়, মেরুপ্রদেশ তুষার-মরুর আকার ধারণ করে। বিজ্ঞানের হিসাব: ৫০০ ফুট জল বাড়িলে পৃথিবীর স্থলভাগ অর্ধেক হইয়া যাইবে; ৫০০ ফুট কমিলে উহা দ্বিগুণ হইবে। আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর মানচিত্রও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে!

এই পৃথিবী—নিত্যনবীনা, চিরযৌবনা পৃথিবী, যাহাকে লইয়া আমরা কত কাব্য রচনা করি, তাহাকে মাতৃ-মহিমায় মণ্ডিত করিয়া কত কল্পনা করি, সেই পৃথিবী—মহাপ্রকৃতির হাতে একটি অসহায় পুতুলের মতো,—বৈজ্ঞানিকের চক্ষে একটি লাটিমের মতো—যাহা বনবন করিয়া মহাশূন্যে অবশভাবে অনলসভাবে ঘুরিতেছে! প্রাকৃতিক নিয়মেই জাগে ভূমি-ভাগ, দেখা দেয় জীবকুল; প্রাকৃতিক নিয়মেই আসে মহাপ্লাবন—জলমগ্ন হয় মানুষ ও তাহার সভ্যতা; কোন্ শূন্যে মিলাইয়া যায় তাহার সকল স্বপ্ন! কে

জানে আবার কবে কোথায় জাগিয়া উঠিবে নূতন মানুষ, দেখা দিবে নূতন সভ্যতা?

এই তো মানুষের অলিখিত ইতিহাস! যেটুকু তাহার লিখিত ইতিহাস সেটুকু ইহার তুলনায় কত তুচ্ছ—যেন বাল-বাচালতা! সেখানে আছে কত পুরাতনের মায়া, বর্তমানের চিন্তা, আবার আছে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কখনও বা দেখা দেয় অনাগতের আতঙ্ক, ভবিষ্যৎ ভয়ের ছায়াপাত।

বর্তমানের পৃথিবীতে এই ছায়ার দৈর্ঘ্য বাড়িতেছে—তবে কি বিজ্ঞান-ভিত্তিক সভ্যতার সূর্য অস্তগামী? এই ভয় জাগিয়াছে বৈজ্ঞানিকের মনে, তাঁহারা বলিতেছেন: ক্ষেপণাস্ত্রই বর্তমান সভ্যতার মৃত্যুর পরোয়ানা। এই ভয় জাগিয়াছে সমাজবাদীর মনে, তাঁহারা বলিতেছেন: যে অর্থ ক্ষেপণাস্ত্র-নির্মাণে ব্যবহৃত হয়, তাহা দ্বারা কোটি কোটি অভুক্তের অন্ন-সংস্থান সম্ভব। এই ভয় জাগিয়াছে বিশেষ-ভাবে রাষ্ট্রচালকদের মনে। তাঁহাদের মধ্যে একদলের মত: পৃথিবীর লোকসংখ্যা যে ভাবে বাড়িতেছে—শীঘ্রই প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দিবে। পৃথিবীতে প্রতিদিন ১,৩০,০০০ নূতন শিশু জন্ম-গ্রহণ করিতেছে! এই ভাবে চলিতে থাকিলে এই শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বর্ত-মানের (২৭৩,৭০,০০,০০০) দ্বিগুণ হইবে।

একদিকে বিজ্ঞান রোগ জয় করিয়া মৃত্যুর হার কমাইতেছে, মানুষের জীবনাকাঙ্ক্ষা বাড়ি-তেছে; ইওরোপের নরনারীর গড় আয়ু ৭২ বৎসর, ভারতে ৩২ (গত ৩০ বৎসরে উহা ৯ বৎসর বাড়িয়াছে); অন্যদিকে সমুদ্রের তরঙ্গা-ঘাতে ও মরুভূমির বালুকণার আক্রমণে চাষের জমি কমিতেছে, এবং স্বাভাবিক নিয়মে জমির উর্বরতাও কমিতেছে; এই জন্যই দেখা দিয়াছে খাদ্যাভাব, তাইতো উঠিয়াছে লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। এ আজ ঘরোয়া প্রশ্ন নয়, শুধু জাতীয় সমস্যা নয়—সমগ্র মানবজাতির জীবন-মরণ সমস্যা!

একটি সমস্যা দেখা দিলে বিভিন্ন মানুষ নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন: ডাইক বাঁধিয়া সমুদ্রের ক্ষুধাকে বাধা দাও, বন বসাইয়া মরুভূমির অগ্রগতি বন্ধ কর, জমির উর্বরতা বাড়াইবার জন্য জমিতে রাসায়নিক সার দাও। শুধু তাই নয়—যদি পৃথিবীতে স্থানাভাব হয়—তবে চল রকেট সহায়ে পৃথিবীর আকর্ষণ জয় করিয়া গ্রহান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিতে। একদিন যখন মধ্য এশিয়ায় স্থান-সংকুলান হয় নাই, তখন তো এই ভাবেই আর্যেরা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই তো সেদিন ইওরোপীয়গণ একই কারণে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস স্থাপন করিয়াছে। সেদিনের তুলনায় আজ বিজ্ঞানের শক্তি কত বাড়িয়াছে! কেন আমরা পরাজয় স্বীকার করিব? চল, আমরা গ্রহান্তরেই ছড়াইয়া পড়িব।

কিন্তু সেখানেই যে আমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত আছে, তাহার কি প্রমাণ? তাই আর একদল বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন: পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব নাই, তবে খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্তন করিতে হইবে। মানুষ চিরদিন শস্য খাদ্য (cereal food) খাইত না। দুগ্ধ ঘৃত?—সে তো মানুষ সেদিন শিখিয়াছে; কৃষি নির্ভর জীবনের সহিত গো-পালন শুরু হইয়াছে! সর্বত্র প্রায় শস্য ও দুগ্ধ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা বাড়াতেই এই খাদ্যের অভাব। এই শতাব্দীর শেষেই বিজ্ঞান লেবরে-টরীতে উদ্ভিদ্ হইতে, জলজন্তু হইতে, এমনকি বাতাস হইতে সংশ্লেষিত (synthetic) ঘনীভূত খাদ্যসার (concentrated protein) প্রস্তুত

করিতে সমর্থ হইবে। তখন আর খাদ্যাভাবের সমস্যাই থাকিবে না।

আশা করা যাক্ বিজ্ঞানের সকল স্বপ্ন সফল হইবে। বৈজ্ঞানিকেরা এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময় চাহিয়াছেন, অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর। কিন্তু রাজনীতিকদের জীবন ক্ষণস্থায়ী; মাত্র পাঁচ বৎসর! তাড়াতাড়ি তাঁহাদের কীর্তির সাফল্য দেখাইয়া তাঁহারা পরবর্তী নির্বাচন জিতিতে চাহেন। তাই তাঁহারা তাঁহাদের বুদ্ধি অনুযায়ী লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী! তাঁহাদের ধারণা লোকসংখ্যা কমিলেই বাকী লোক কাজকর্মে লিপ্ত থাকিয়া সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে খাইয়া পরিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বাঁচিয়া থাকিবে, তাঁহারাও নির্বিঘ্নে নেতৃত্ব করিবেন। কিন্তু তাঁহারা একটা কথা ভুলিয়া যান, 'Figures are not always *facts*'—সংখ্যা দ্বারাই সর্বদা ঘটনার পরিমাপ হয় না। অনুকূল পরিবেশে দুইজন লোক দশজনের কাজ করিতে পারে। ইহার বিপরীতও সত্য, প্রতিকূল পরিবেশে দশজন লোকও দুইজনের সমান হয় না। রাজনীতিকগণের দৃষ্টি সাধারণতঃ নিজেদের রাষ্ট্রের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র যদি লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করে—তবে একদিন কি তাহারা নিজেদের চাপেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে না? জাপান ও জার্মানি কি এই কারণেই মহাযুদ্ধের সূচনা করে নাই?

পূর্বকালে দুর্ভিক্ষ মহামারী দেশের লোকসংখ্যা দশমাংশে পরিণত করিত। মহামারী যাহা পারিত না, মাঝে মাঝে ব্যাপক যুদ্ধ আসিয়া তাহা করিত, পৃথিবীর লোকভার কমাইয়া দিত। যাহারা বাঁচিয়া থাকিত তাহারা আবার নূতন আশায় জীবন আরম্ভ করিত। কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির হাত হইতে তাহারাও রক্ষা পায় নাই।

বর্তমানে আমরা সকল মহামারককে (great killer) না পারিলেও মহামারীকে (epidemic) নিয়ন্ত্রিত করিয়াছি, কিন্তু যুদ্ধকে আমরা ভয় করিলেও যুদ্ধ-সম্ভাবনা দূর করিতে পারি নাই। কেন?

প্রায়ই আমরা বলি, পৃথিবীর মানুষ আজ কাছাকাছি আসিয়াছে! হয়তো শুধু দেশ-কালের ব্যবধান কমিয়াছে, কিন্তু মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই ব্যবধান বাড়িয়াছে।

পরস্পরের মনের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের যে প্রাচীর উঠিয়াছে—তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার কোন বিমান এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই! জেট-প্লেনে করিয়া আমরা হয়তো ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী ঘুরিয়া আসিব, রকেটে করিয়া একদিন হয়তো চন্দ্রলোকেও যাইব, মহাকাশ-যানে (space-ship) চড়িয়া মঙ্গলগ্রহেও হয়তো পদার্পণ করিব; কিন্তু আমার পাশের মানুষটি, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশটি যে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে! সেখানে পাসপোর্টের কাঁটাবেড়া কেন? আপন পর হইয়া যাইতেছে, বন্ধু শত্রুতে রূপান্তরিত হইতেছে! ইহাই কি বর্তমান সভ্যতার চরম বিফলতা নয়? এবং এই মনোগত দূরত্ব জয় করিবার সাধনা কি মহাকাশ জয় করা অপেক্ষা বড় সাধনা নয়?

যদি আমরা এই সাধনায় জয়লাভ করিতে পারি, তবেই মানবজাতির সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, নতুবা অতীতের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।

পারস্পরিক প্রীতির দৃষ্টি লইয়া, মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে বিশ্বাসী হইয়া যদি এই সংকুচিত পৃথিবীতে নূতনতর নীতি ও নিয়ম রচিত হয়—তবেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

কয়েকজন মনীষী তাঁহাদের ভূয়োদর্শনের ফল এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:

কোন কোন দেশে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির চাপ বেশী হইলেও অনেক দেশ আছে যেখানে লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম। সকল দেশের সম্পদও এখন পর্যন্ত মানুষ সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে পারে নাই। অতএব সমগ্র পৃথিবীকে অখণ্ড মানবজাতির বাসভূমি মনে করিলে এই বৈজ্ঞানিক যুগে এখনও নূতন করিয়া পৃথিবী-দোহন সম্ভব। বসুমতীর বসু এখনও তাঁহার অনাগত কনিষ্ঠ সন্তানদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাঁহার গোপন ভাণ্ডারে।

সমস্যার প্রতিবিধানকল্পে তাঁহাদের প্রস্তাব: জাতিসংঘের মাধ্যমে যদি অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা ও কানাডায় প্রতি বৎসর কিছু কিছু অন্য দেশের লোকের প্রবেশ-ব্যবস্থা হয়, তবে অবশ্যই লোকসংখ্যাবৃদ্ধিজনিত চাপ চতুর্দিকে চারাইয়া যাইবে।

মনীষীদের দ্বিতীয় প্রস্তাব: যাঁহাদের দেশে অধিক ফসল উৎপন্ন হয় তাঁহারা কখনই তাহা নষ্ট করিতে পারিবেন না। জাতিসংঘের মাধ্যমে তাহা সেই দেশে পাঠাইতে হইবে—যেখানে ফসল হয় নাই! শুধু ফসল পাঠানো নয়, প্রয়োজন হইলে দরিদ্র দুর্বল দেশে উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রবর্তন, যন্ত্রপাতি এবং বীজ প্রেরণও করিতে হইবে।

তাঁহাদের শেষ প্রস্তাব: রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ; তৎপূর্বে প্রয়োজন অতি উচ্চস্তরের শিক্ষা। তদভাবে ইহার অপব্যবহারই হইবে, হিতে বিপরীত হইবে। উন্নততর মানুষের সংখ্যাই কমিতে থাকিবে, মনের দিক দিয়া নিম্নস্তরের মানুষেই দেশ ভরিয়া যাইবে। তাহাতে দেশের সমস্যা আর এক নূতন বিকট রূপ ধারণ করিবে, বর্তমান রাজনীতিকরা তাঁহাদের সৃষ্ট এই সমস্যার সমাধান করিতে জীবিত থাকিবেন না। যদি আমরা চাই—ভবিষ্যদ্-বংশীয়েরা উন্নততর মানুষ হইবে, তবে অবশ্যই আমাদেরই সেই উন্নতির সাধনা শুরু করিতে হইবে!

'লোক'সংখ্যা কমাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় 'মানুষে'র সংখ্যা বাড়ানো! সমাজে মানুষের সংখ্যা যত বাড়িবে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিজনিত ভয় ও ভাবনা ততই কমিতে থাকিবে!

এ তো শুধু আজ নয়, চিরদিন পৃথিবীর এই সমস্যা! এই সমস্যা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমস্যা, এই সমস্যা ভোগ ও ত্যাগের সমস্যা। দেবাসুর-সংগ্রামের প্রতীকে এই কথাই ব্যক্ত হইয়াছে প্রাচীন পুরাণে। সংসারে শান্ত সংযত মানুষ যত বাড়িতে থাকিবে, সমাজে রাষ্ট্রে সুখ ও শান্তি ততই অধিক পরিমাণে দেখা দিবে! দুর্বৃত্ত অহঙ্কারী লোকের সংখ্যা যত বাড়িবে, সংঘর্ষ মারামারি কাটাকাটি ও পারস্পরিক প্রবঞ্চনা ততই বাড়িতে থাকিবে।

উপসংহারে গীতার সেই কথা স্মরণ করি, 'দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।' দিব্যগুণ-সম্পন্ন মানুষ পৃথিবীর সুখশান্তির কারণ। অসুর-ভাবাপন্ন মানুষ অহঙ্কারে মত্ত ও ভোগাকাঙ্ক্ষায় স্বার্থপর; তাহারাই দুঃখ ও অশান্তির কারণ, তাহারাই পৃথিবীর ভার!

চলার পথে

'যাত্রী'

ভারতে বৈশাখ আসে নূতন বৎসরকে সঙ্গে নিয়ে। তাই তার জন্ম-লগ্নের প্রারম্ভেই বৈরাগ্যের বহ্নি-বীজ আমাদের সত্তার মাঝে অঙ্কুরিত করে সর্বস্বত্যাগের উদাত্ত আহ্বান। বৈশাখের ঐ তৃষ্ণাতপ্ত আবেদন শুধু এই নূতন বৎসরকেই সঙ্গে করে আনে, তা নয় যাদুর-ঝাঁপির সবকটি ঋতুর খেলাকেই একে একে আমাদের সুমুখে খুলে ধ'রে চমক লাগায়।

বৈশাখের ছোঁয়া-লাগা বৈরাগী-মন আমাদের অজ্ঞাতসারেই গেয়ে ওঠে, 'যা নড়ে তা দিক নেড়ে, যা যাবে তা যাক ঝরে, যা ভাঙা তাই ভাঙ্‌বে রে, যা রবে তাই থাক্ বাকি।' সেই সাথে ভারতের কবি-মনের প্রতি অণুতে অণুতে অনুরণন ওঠে, 'হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে, মন আজি মোর উদাস বিভোর কোন্ সে ভাবের বশে।' ভারতের এই বহু বিচিত্র পিপাসা তাই মহাজীবন-বোধ থেকে পৃথক নয়।

এর সঙ্গে যদি তুলনা করি ওদেশের 'জানুআরি'তে বৎসরারম্ভের কথা, তাহ'লে তার ঐ তুহিন-শীতল নিস্তব্ধতার তুলনায় আমাদের এই 'চির ব্যথার বনে খেপা হাওয়ার ঢেউ' অনেক বেশী বিস্ময় সংগ্রহ করে। আমাদের কালবৈশাখীকে দেখে স্বতঃই মনে পড়ে, 'ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়, মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়—অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে।' আর ওদেশের 'জানুয়ারি' সম্বন্ধে বলতে পারি,—'রিক্ত-পাতা শুষ্ক-শাখে, কোকিল তোমার কই গো ডাকে?'—সেথায় সভা শূন্য, বাণী মৌন, কিন্তু ত্যাগের তৃষা নেই।

তাছাড়া, বৈশাখ ও 'জানুয়ারি'র মধ্যেই ধরা যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের বিভিন্নতাকেও। 'জানুয়ারি'র জড়ত্বের মাঝে ওদেশের জড়বাদী মন কেবলমাত্র বাস্তবকেই আঁকড়ে রাখে। জীবনোত্তর কোন কিছুকে ভাব-সাধনার ইঙ্গিতরূপে গ্রহণ না ক'রে কেবলমাত্র জীবনের ভোগ-সর্বস্বতাকে নিঃশেষে পান করতে চায়। জীবন-পারের ঐ মহাজীবনের ডাকে তাই তারা সাড়া দেয় না। কিন্তু আমাদের দুর্ধর্ষ বৈশাখের ভীষণ, ভয়াল রূপের মধ্যে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের ত্রি সৌন্দর্য-বিধৃত রূপ আমাদিগকে নূতন এক ভাবে উদ্বেলিত ক'রে তোলে। তাই আসক্তির মাঝে নিরাসক্তির, অন্তর্জীবনের পাশে বহির্জীবনের এই কঠিন স্বাতন্ত্র্য-নিষ্ঠায় ভারতীয় দর্শনের একটা চিরন্তন তত্ত্ব-রূপ প্রকাশ পায়।

পুরাতনকে ঝরিয়ে ঐ যে গোপনে নূতনকেই আবার নিজের ধ্বংসের গৃহে সাদর আহ্বান তথা লালন পালন—তার মধ্যেই দেখি ভারতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি রয়েছে। মৃত্যুর পাশে এই যে জীবন, বিরহের মাঝে এই যে মিলনের স্বাক্ষর—তাদের জড়িয়েই মানব-মনের অচল-শ্রী রূপ নিয়েছে বকুলের হাসিতে ও তার দূরবেধী সৌরভে। ধ্বংসের মাঝে হৃদয়ের এই যে বিরাট বিস্তৃতি—এই যে নবোন্মেষের কোরকটিকে সম্পূর্ণ আগলে রেখে জীবন-মৃত্যুর নৃত্য-লীলায় স্বাধিকার-ঘোষণা তা একমাত্র ভারতই কল্পনা করতে পারে। ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত বলেই ভারত বলতে পারে—'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদাপরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা। চূর্ণ হোক্ স্বার্থ

সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।' এইখানেই ব্যক্তকে ছেড়ে অব্যক্তের ইশারা—গোচর পেরিয়ে গভীরের মধ্যে, ভূমিকে ছেড়ে ভূমার মাঝে ছন্দিত ও স্পন্দিত হয়ে ওঠে।

পুরাতন বৎসরের সমাধিও রচনা করে বৈশাখ। আবার অন্যদিকে তারই অনাসৃষ্টির মাঝে সে নূতনের ঘুম ভাঙায়। একদিকে যেমন নদী হ্রদ তড়াগকে শুকিয়ে শোষণ ক'রে, শীর্ণ ক'রে তোলে, অন্যদিকে তেমনি সেই জলকণা দিয়েই গড়ে তোলে মেঘের নীলাঞ্জন-সঞ্চারণ। বৈশাখ তার নিজের সৃষ্ট মরুভূ-মায়ার শুষ্ক-নীরস নৈরাশ্যের মাঝে মায়ের স্নেহমাখা মধু-ঢালা আহ্বান জাগিয়ে তোলে! তাই ত বৈশাখকে দেখি তপ্ত বনানীর পিপাসায় ক্ষীণ দগ্ধজীবন পৃথিবীর কথা স্মরণ ক'রে কালো মেঘকে ডাকতে, কদম ও কেতকী ফুটিয়ে নিরাভরণা ধরণীকে আবার পুষ্পিত করতে;—বৈশাখের এই রূপ সর্বত্যাগী সাধুর 'দীনবৎসল রূপ।' * * *

এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের জমাট-বাঁধা রূপ সত্যি এক আবির্ভাব। ভারতের এই একান্ত নিজস্ব রূপ কিন্তু মহাজীবন থেকে পৃথক্ নয়। মহাকালের বুকে মহাকালীর নৃত্য ছন্দের সবখানিই বৈশাখের ঐ শ্মশান-বুকে ধরা পড়েছে। নিজস্ব ধ্বংসের মাঝে ধরণীকে আবার শ্যামল ও সুন্দর করার প্রয়াসও তাই তার প্রাণশক্তির পরিচায়ক। এ যেন মহামায়ার এক মোহিনী রূপ—যে রূপে তিনি সন্তান প্রসব ক'রে, তাকে নিজ স্তন্যে লালন ক'রে আবার তারই রুধির পান করছেন; ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার সমগ্র রূপটি ধরা পড়েছে এরই মাঝে। বিশ্বাত্মার জন্য ব্যক্তি-সাধনার এ এক অপূর্ব আত্মবলি!

বৈশাখ কবি। তাই সৃষ্টি-নৈপুণ্যের ঐ জীবনীভূত চাতুর্য তার নিজস্ব স্বকীয়তায় স্বাভাবিক। তাই সে পারে তার নির্মেঘ রুক্ষ উষর আকাশে কালবৈশাখীর নিরবদ্য বৈচিত্র্য ফোটাতে। রৌদ্র-স্নাত ধূলার ধূসর-রাঙিমায় তাই সে রচনা করে উন্মাদ-মেঘ-তাণ্ডবের চপলাচকিত নয়ন-বিমোহন রূপ। তাই সে পারে তপন-তাপে তাপিত এবং পথিমধ্যে তপ্ত-ধূলিপটলে-দগ্ধপ্রায় সাপকে তার কুটিল স্বভাব ছাড়িয়ে ময়ূরের পেখমের ছায়ায় টেনে আনতে।

শুধু বহিঃসৌন্দর্য নয়, বৈশাখের এই তাণ্ডবঘন বাহ্য রূপের চাবিকাঠিতে আমাদের আন্তর-লোকের রত্ন-গুহার সকল সম্ভারকেও উৎসারিত ক'রে দেয়। তার এই ভাবাভিব্যক্তির সার্বভৌম রূপের ছোঁয়ায় আমাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত দৈন্য কোন্ এক যাদুকরের স্পর্শে কেমন এক প্রাণ-চাঞ্চল্যে উতরোল হয়ে ওঠে। তখনই আমাদের মন-আকাশের সকল দৈন্যের কুজ্ঝটিকা সরে গিয়ে অন্তরের সকল দেবভাব সুমুখে এসে দাঁড়ায়।

চল পথিক, বৈশাখের ঐ আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় রহস্যকে হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে তুলে ধ'রে চিরপ্রশান্তির পাথেয় সঞ্চয় ক'রে চল এগিয়ে। এই যন্ত্রযুগের জীবনে বৈশাখের ঐ ঐতিহ্যবাহী প্রদীপে তোমার ভাব-প্রদীপ প্রজ্বলিত ক'রে নির্বিরোধ উপলব্ধির পথে এগিয়ে চল।

শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

পঞ্চবটী-মূলে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ছায়াঘন বীথিকায় পাষাণের পাদপীঠে আমি
তোমার আসনখানি হেরিতেছি,—অশ্রু আসে নামি
নয়নের প্রান্ত হ'তে গাঢ় বেদনায়। মায়ামেঘে
ঢেকে আছে জীবন-আকাশ। বিজলীর রশ্মি মেখে
মৌন বিভাবরী মোর উঠিছে শিহরি। চিত্তনদী
বহে বেগে, ছল-ছল সুরে তার শুনি নিরবধি
কি যেন অব্যক্ত বাণী! তুমি কবে পঞ্চবটী-মূলে
আপনারে করেছ প্রকাশ সেই স্মৃতি ওঠে দুলে
অন্তরে আমার।

প্রাণদীপ হেথা রেখে নমি তব
লীলাভূমি, স্মরণের পুণ্য ধূলি লয়ে। অভিনব
তত্ত্বকথা শুনায়েছ সদা ব্রহ্ম-পরাশক্তি সাথে
আনন্দ-বিহার করি, অবিজ্ঞেয়! নম্র প্রণিপাতে
পরাণের অর্ঘ্য মম দিতেছি অঞ্জলি। হে দেবতা!
সংসারের সর্বক্ষেত্রে কান পেতে শুনি তব কথা।

তোমার করুণা ধারা মানবের মর্ম-মরুভূমি
দিনে দিনে করেছে শ্যামল। প্রত্যক্ষ হবে কি তুমি
অচিন্ত্য স্বরূপ ত্যজি সেই রূপে ব্রাহ্মণের বেশে ?
দেখা দাও হেথায় আবার। আদর্শ-বিহীন দেশে
মোরা প্রভু! অসহায় ধরিত্রীর রাত্রি দিন হ'তে
বিদায় নিয়েছে যেন আনন্দ-সঙ্গীত, দুঃখ-স্রোতে
ভেসে যায় হৃদয়-কুসুম আসন্ন প্রলয়-ক্ষণে,
মর্ত্ত্যকায়া ধরি' এসো, মুক্তি মোর তব দরশনে
হবে জানি, কৃপা করো দয়াময়! পড়ে আসে বেলা,
শেষ ক'রে দাও মোর সংসারের সতরঞ্চ খেলা।

রাগাত্মিকা ভক্তি *

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

মাকে যেমন শিশু ডাকে, তেমনি ক'রে ডাকতে হবে। চাই সেই রকম সরলতা। তবেই তো তাঁকে পাবে। ভক্তের প্রাণ ভগবানের প্রিয়। তিনি যে ভক্তাধীন। ভক্তিডোরে তিনি বাঁধা পড়েন। এই প্রেম-ভক্তি, এগুলি হ'ল রাগাত্মিকা ভাব, কিন্তু এমন ক'টি মেলে? প্রেম-ভক্তি-প্রীতির উপর সংসার চাপিয়ে রেখেছি বোঝার মত, এর চাপে সেগুলি তলিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর বলতেন, ভগবান হলেন চুম্বক আর ভক্ত হচ্ছে ছুঁচ। ভগবান নিত্যই ভক্তকে আকর্ষণ করছেন, চুম্বকের ধর্মই হচ্ছে লোহাকে আকর্ষণ করা। বরিশালের অশ্বিনীবাবু ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন, কি ক'রে ভগবানকে পাওয়া যায়? উত্তরে ঠাকুর বলছেন, ছুঁচগুলো কাদা-মাখানো থাকলে চুম্বক তো তাদের টানবে না। আমাদের মনের ওপর যে ময়লার স্তূপ চাপানো রয়েছে, তা সরিয়ে দিলেই ঝক্‌ঝকে ছুঁচ দেখা দেবে, তখন সেটি চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হবে। মনের ময়লা দূর হ'লে মন মুখ এক ক'রে, শিশুর সরলতা নিয়ে তাঁকে যে ডাকে সে অবশ্যই তাঁকে পায়।

ধ্রুব সকাম ভক্তি দিয়ে প্রেম ও সরলতার রজ্জু দিয়ে ভগবানকে বাঁধলেন। ইনি চেয়েছিলেন ভগবানের কাছে রাজ্যসম্পদ, কিন্তু কাঁচ খুঁজতে খুঁজতে হীরে পেয়ে গেলেন, রাজ্যসম্পদের পরিবর্তে সাক্ষাৎ ভগবানকে পেয়ে গেলেন। তাঁর সরলতা, তাঁর ব্যাকুলতাই এনে দিল তাঁকে পরমাতৃপ্তি পরাশান্তি।

আবার শিশু জটিলের কথাও আমরা জানি, মায়ের কথায় সরল বিশ্বাসে জঙ্গলের পথে সে যখন মধুসূদন-দাদাকে আহ্বান করেছিল, তখন মধুসূদন-দাদার রূপ পরিগ্রহ ক'রে এসে এই সরল বিশ্বাসী বালক-ভক্তকে পথ দেখানো ছাড়া স্বয়ং ভগবানের গত্যন্তর ছিল না। তিনি ভক্তাধীন। ভক্তের বিশ্বাস আর সরলতাই তাঁকে মর্ত্যে নামিয়ে আনে। এটি কম কথা নয়। যে সরল বিশ্বাসে তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তিনি অভয় দিয়ে তাকে আশ্রয় দেন। ভাবের ঘরে চুরি এতে নেই। এটি খাঁটি ভালবাসা।

ছোট্ট একটি ছেলে খেলাঘরে পুতুলখেলায় মত্ত হয়ে আছে; কোন দিকেই খেয়াল নেই, সব মন তার ডুবে গিয়েছে সেই পুতুলের সংসারে। -ঠাৎ কোথা থেকে শব্দ এল, 'খোকা, শীগগির খাবে এস।' শব্দটি কানে যাওয়া মাত্র কোথায় রইল পুতুল, আর তার সংসার! সব ফেলে সে ছুটে চ'লল সেই শব্দটি লক্ষ্য ক'রে। এই শব্দ যে তার চিরচেনা, বড় আপনার—তার মায়ের আহ্বান। এ কি সে উপেক্ষা করতে পারে? আমরাও ঐ ছেলের মত সংসারের খেলাঘরে নানান্ খেলা খেলছি, খেলায় মত্ত হয়ে আছি। কিন্তু মায়ের ডাক শুনে ঐ রকম সব ফেলে ছুটে যেতে পারা চাই। মা তো আমাদের চান, কিন্তু আমরা তাঁর দিকে যাচ্ছি কই? কৃপার বাতাস তো বইছেই, পাল তোলার পরিশ্রম তো আমাদের করতে হবে। এই পরিশ্রমই হচ্ছে ছুঁচের কাদা ধুয়ে মুছে সাফ্ করা। এটি সম্ভব বিশ্বাসে, সরলতায়, নির-

*১১.১১.৫৭ তারিখে আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ—শ্রীআলোক চট্টোপাধ্যায় অনুলিখিত।

ভিমানতায় আর ব্যাকুলতায়। ব্যাকুলতা এলে বোঝা যায় অরুণোদয় হ'ল, তার পরই জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান দেখা দেবেন, ধরা দেবেন। এই তো আকর্ষণ!

প্রহ্লাদের ছিল আর এক ভাব, তাঁর অহেতুকী ভক্তি। কোন কারণ নেই, কোন ভিক্ষা নেই, ভালো মন্দ কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু এক প্রার্থনা তোমায় চাই! তোমাকে ছাড়া আর সব আলুনী—এই ভাব। তুমি আনন্দের আধার, সৌন্দর্যের ঘনীভূত মূর্তি, শান্তির খনি, তোমার দর্শনেই আমার তৃপ্তি। এটি নিষ্কাম ভক্তি—ভক্তিরাজ্যের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। আমরা এটি জানি না, আমাদের ভক্তির পেছনে রয়েছে শত শত কামনা-বাসনা, বহু আকাঙ্ক্ষার রাশি। এতে কি তাঁকে পাওয়া যায়? যঁহা রাম তঁহা কাম নেহি, যঁহা কাম তঁহা নেহি রাম।

সংসারে নিঃস্বার্থ ভালবাসা বেশী নেই। এই নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া আমরা শিখিনি। আমাদের শুধু আদান-প্রদান। সংসারে সুখে থাকবার জন্য আমরা হয়েছি আর্ত ও অর্থার্থী ভক্ত। কিন্তু জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্ত ক-জন?

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।

আর্ত ও অর্থার্থী ভক্ত বেশী, সংসারে সুখে থাকবে, ভোগ করবে—এই সবাই চায়। কিন্তু সহস্র মনুষ্যের মধ্যে ক্বচিৎ দু'একজন তাঁকে চায়। আবার এদের মধ্যে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান দু'একজন তাঁকে পায়। এরাই জ্ঞানী বা প্রেমিক ভক্ত। এদের লক্ষণ হচ্ছে সব বিলিয়ে দেওয়া, প্রতিদানে এরা কিছুই আশা করে না। শুধু চায়, শুদ্ধা ভক্তি। ঠাকুরের এই ভাব; তিনি বলছেন মাকে—মা, এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ—আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। সব সমর্পণ করছেন তিনি মাকে, শুধু চাইছেন শুদ্ধা ভক্তি; এই ভাব ছিল প্রহ্লাদের।

গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের ভক্তিতে বাঁধা পড়লেন, তাদের অধীন হলেন। এদের হ'ল প্রেমাভক্তি, এই রাগাত্মিকা ভক্তি। এখানে ভক্ত চুম্বক, ভগবান ছুঁচ। তিনিই ছুটে যাচ্ছেন যমুনাপুলিনে রাধারাণীর দর্শন পাবেন ব'লে। কদম্বমূলে তিনি ছুঁচ। ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, গোপিনীদের আসার আশায়। এখানে তিনি হচ্ছেন ছুঁচ আর ভক্ত হচ্ছেন চুম্বক। ভক্তই আকর্ষণ করছেন ভগবানকে। প্রেমে তিনি ছুটে আসছেন। এই প্রেমা-ভক্তি বড়ই দুর্লভ। বহু সাধনার ধন এই প্রেমা-ভক্তি। তাই সাধক কবি গেয়েছেন:

আমি ভক্তি দিতে কাতর হই,
মুক্তি দিতে কাতর নই।

যিনি ত্রিকাল-মুক্ত, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ, তিনি কি সহজে বাঁধা পড়েন? তাঁকে বাঁধা যায় এই প্রেমা-ভক্তির ডোরে। এই আকর্ষণে তিনি আকৃষ্ট হন। ঠাকুর যেমন মায়ের চরণে সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন, মা বই আর তিনি কিছুই জানতেন না। মীরা যেমন রাজরাণী হয়েও সব ত্যাগ ক'রে গিরিধারীলালকে আশ্রয় করেছিলেন—এই রকম চাই, এই ভাব হ'লে জাগতিক সুখ—ভোগের বস্তু আলুনী লাগে।

'ডাকার মত ডাক দেখি মন। কেমন শ্যামা থাকতে পারে!' তিনিই ছুটে আসবেন, যদি এই ডাক অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত হয়। তিনি যে আপনার মা—পাতানো মা তো তিনি নন্! তাই ছেলের ডাক শুনে তিনি কি স্থির থাকতে পারেন? ছোট ছেলে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে যদি কোন বায়না করে, মা কি সেই আবদার না মিটিয়ে পারেন? ঐ কান্নাতেই ছুঁচের সব

কাদা ধুয়ে যায়, মুছে যায় মনের যতো কালিমা-গ্লানি। সাধুসঙ্গ বল, জপ পূজা প্রার্থনা তীর্থদর্শন যাই বল, সবই ঐ কাদাটুকু ধুয়ে ফেলবার জন্য। এই হ'ল উপায়। এটি শিশুর সরলতাতেই সম্ভব।

ঠাকুর বলতেন, এক ধনী জমিদার একবার এক দরিদ্র প্রজার কুটিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু প্রজা নিতান্তই অর্থহীন, তাই তার পক্ষে জমিদার প্রভুর সেবাযত্ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব—এটি বুঝতে পেরে, জমিদার নিজেই নিজের বাড়ী থেকে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করবার সমস্ত উপচার প্রজার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। কারণ তিনি তাঁর প্রজার সামর্থ্য বোঝেন। তাই নিজেই সব ভার নিলেন। ভগবান সত্যি এই রকমই করেন। চাই অনুরাগ, প্রীতি-মাখানো প্রেম। আমরা প্রভুর দীনাতিদীন সন্তান। আমাদের সাধ্য কি তাঁর যোগ্য আরাধনা করা, আমরা পারি শুধু প্রাণভরে ডাকতে—সরলতা নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে, আকুলতা নিয়ে। এই অনুরাগই আসল। এটিই তিনি চান। তখন তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে দেন। আমরা তাঁর দিকে এক পা এগোলে তিনি আমাদের দিকে একশ' পা এগিয়ে আসেন।

তাঁর পূজা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অগ্নির পূজা তাঁহারি তো পূজা
সেই তেজ সেই হুতাশন!
সলিল জীবন, জীবন-বন্ধু
ওতো সেই দ্রব নারায়ণ।

তিনি তরু-ফুল-গুল্ম-লতায়,
তিনি শিলা, মাটি—নাইকো কোথায়?
বহুরূপ তিনি বহুবল্লভ,
তিনি কি বটেন? কি বা নন?

কতটুকু মোর জ্ঞানের পরিধি?
ছোট ক'রে তাঁরে করি ধ্যান।
সাগর-শুক্তি কি ক'রে বুঝিবে
নীলাম্বুধির পরিমাণ?

রূপ নাই তাঁর—মিথ্যা তো নয়,
অচেনা তবুও সবচেয়ে চেনা
পরমাত্মীয় প্রিয়জন।

সাধু

(কবীর-চয়ন)

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ধরণী কেবল সহিছে খনন
তরুই ছেদন সয়,
কু-বচন শুধু সহে সাধুগণ—
অন্যেরা করে ভয়!
ইক্ষু যেমন পীড়নেও তার
সুধারস করে দান,
সন্ত তেমন শক্রজনেরে
আনন্দ দিয়ে যান।
মায়ার আগুনে নর-পতঙ্গ
কেবল পুড়িয়া মরে,
তাহাদের মাঝে সাধুসজ্জন
মায়া হ'তে যান ত'রে।
না চাহিলে তবু ভাস্কর করে
সবারে আলোক দান,
সাধুরা তেমন অযাচিতরূপে
করে জন-কল্যাণ।

চরিত্রোন্নতির সাধনা

অধ্যাপক রেজাউল করীম

রোমাণ্টিক যুগের বিখ্যাত কবি কোলরিজ একটি সুন্দর কথা বলেছেন: If a man is not rising upward to be an angel, depend upon it, he is sinking downwards to be a devil. He cannot stop at a beast. The most savage of men are not beasts, they are worse, a great deal worse. —মানুষ যদি দেবতা হবার চেষ্টা না করে, তবে তাকে শয়তান হয়ে যেতে হবে। পশুত্বের স্তরে থামা চলে না। বর্বরতম মানুষ পশু নয়, তার চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট।

কবির এই উক্তিটি খুব ঠিক। মানুষকে সব সময় প্রতি কাজে বড় হওয়ার সাধনা ক'রে যেতে হবে। আজ মানুষ যে অবস্থায় আছে, আগামীকাল যেন তার থেকেও বড় হতে পারে। সেইভাবে তাকে চেষ্টা করতে হবে—তাকে প্রতিনিয়ত মহৎ, উদার ও পবিত্র হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। এরই নাম মনুষ্যত্ব। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য নিযুক্ত করতে হবে। এমনভাবে পৃথিবীতে চলতে হবে যেন আমাদের জীবন সতত উন্নতির পথে, উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। তুমি আজ যা আছ, কাল যদি তার চেয়ে বড় হ'তে না পার, তবে তুমি নীচের দিকে পড়তে থাকবে; এবং নীচের দিকে পড়তে পড়তে তুমি শুধু পশুত্বের পর্যায়ে এসে থেমে যাবে না—সেখানে কোন মানুষই দীর্ঘকাল থাকতে পারে না, পশুত্বের পর্যায় থেকে মানুষ একেবারে শয়তানের পর্যায়ে গিয়ে ক্ষান্ত হবে। সবচেয়ে বর্বর মানুষ পশু নয়,—শয়তান।

আজকের যুগে কবির উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষকে ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে। মানুষ যদি তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে পৃথিবীর সুখভোগকে চরমপ্রাপ্তি বলে মনে করে, সে যদি পার্থিব সুখের আশায় মরীচিকার পশ্চাতে অবিরত ছুটে চলে, তবে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই সভ্যতা মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করতে পারবে না। এ-যুগের মানুষ যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার পথে চলে, যদি সে Positive Virtue—সক্রিয় গুণাবলীর উপর জোর না দিয়ে কেবল Negative Virtue—নিষ্ক্রিয় গুণাবলীর উপর গুরুত্ব দিতে থাকে, তবে তার শয়তান (devil) হতে বেশী বিলম্ব হবে না। এই জড়বাদী সভ্যতার সামনে মহামানুষগণ তুলে ধরেছেন মহত্তর জীবন-দর্শন, মানুষের কানে শুনিয়েছেন নূতনতর আশার বাণী। তাঁরা আমাদের নমস্য। ভারতে এমন বহু মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে। মানুষ কেমন ক'রে দেবত্বে উপনীত হ'তে পারে সেই আদর্শ তাঁরা স্থাপন করেছেন। তাঁদের সেই আদর্শের প্রতি মানুষ যতই আকৃষ্ট হবে, সেগুলিকে যতই অনুসরণ করবে, ততই তাদের চরিত্রের উন্নতি হতে থাকবে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে দেবত্বে উপনীত হবার সাধনা কেবল দু'একদিনের ব্যাপার নয়। এ সাধনা জীবনব্যাপী ক'রে যেতে হবে, যেন একটা মুহূর্তও বৃথা নষ্ট না হয়। আবেগের মুহূর্তে একটা ভাল কাজ

করলাম, আর অমনি আমার চরম মোক্ষলাভ হ'ল,—এ ধারণা অনেকের আছে। হয়তো কোন কোন লোকের জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে মানব-সমাজকে উন্নত করতে হ'লে এই ধরনের দৈব ঘটনার উপর নির্ভর করলে চলবে না। বড় বড় কাজ ক-টা করলাম, মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত কয়েকটা স্থাপন করলাম, শুধু এইগুলির উপর কোন লোকের সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে না। দৈনন্দিন জীবনে ছোট ছোট কাজে মানুষ কতটা মহত্ত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে তারও হিসাব দিতে হবে। মানুষের আসল পরীক্ষা তো ছোট ছোট কাজেই হয়ে থাকে। এমন বহু লোককে দেখেছি যাঁরা অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করেন, কিন্তু বাটীর চাকর-বাকরদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করতে তাঁদের বিবেকে এতটুকু বাধে না। প্রশ্ন এই, তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার ক'রব কোন্ কাজ দেখে? সামান্য ব্যাপারে যদি কেউ মহত্ত্বের পরিচয় দিতে না পারেন, তবে তাঁদের জীবনের বহু সাধনার মূল্য কমে যাবে।

সাধারণ মানুষ সংসার-জীবনের চাপে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য নানাপ্রকার অন্যায় আচরণও করে। আবার কেউ কেউ—অবশ্য তাদের সংখ্যা কম—তা করে না। তারা একটা আদর্শ অনুসরণ ক'রে চলে। তাতে স্বার্থ রক্ষা হয়, অথচ অন্যায় আচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। যারা সদ্‌ভাবে জীবন-যাপন করে, সংসারের পিচ্ছিল পথে চলাফেরা করে, তারা হয়তো মনে করে যে যখন ভাল হয়েই চলি, তখন আর বেশি কিছু করবার নেই। তারা যথাসময়ে পূজা-অর্চনা করে, দরিদ্রকে সাধ্যমত দান করে, পরচর্চা করে না, সহজে কারও ক্ষতি করে না। সংসার-জীবনে আর কতটুকু ক'রব? —এই হ'ল তাদের ধারণা। কিন্তু প্রকৃত আদর্শ এই যে, ধর্মের পথে যাদের যাত্রা তাদের এখানে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলে চলবে না। আরও অগ্রসর হতে হবে। আরও বড় হবার জন্য সাধনা করতে হবে। কোলরিজের উপরি-উক্ত কথাগুলি এই শ্রেণীর মানুষকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষ যদি নিত্য প্রয়োজনীয় কর্তব্যগুলি পালন ক'রে ভেবে থাকে যে তাদের আর কিছু করবার নেই, তবে তা নিতান্ত ভুল। সাধারণ কর্তব্যগুলি অনেক সময় অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ইচ্ছা থাক্ আর না থাক্, অভ্যাসবশে মানুষ অনেক সময় ভাল কাজ করে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে প্রত্যেক ভাল কাজের গোড়াতে থাকা চাই ইচ্ছাশক্তি ও সচেতন উৎসাহ। আমি ভাল কাজ করছি, ভাল কাজ করতে উদ্যত, এমন একটা সচেতন বুদ্ধি না থাকলে ভাল কাজটা অভ্যাসে পরিণত হয়। জীবনে অভ্যাসগত ধর্মকর্মের কোন প্রয়োজন নেই, একথা ব'লব না; কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজন—বুদ্ধি ও চেতনা-উদ্ভূত ধর্মের। সুতরাং অভ্যাসগত বা স্বভাবগত ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না,—সজ্ঞান ও সচেতন বুদ্ধি-প্রণোদিত ধর্মই মানুষকে উত্তরোত্তর উর্ধ্বপথে নিয়ে যায়। দেখা গেছে যে অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পড়ে অনেকে ধর্মকর্ম ও অন্যান্য সৎকার্য করে। আবার অবস্থার বিপাকে পড়ে তারাই অধর্ম এবং অপকর্ম করতেও কুণ্ঠিত হয় না, বা অনেক সময় করতে বাধ্য হয়। সেইজন্য সজ্ঞান ও সচেতন ধর্মবোধের একান্ত প্রয়োজন। বহু মানুষ পূজা-অর্চনা করে, আবার সেই সব মানুষই পাপকার্য করতে ছাড়ে না এর প্রধান কারণ—ধর্মকর্ম বা সৎকার্যটি তাদের নিকট এত অভ্যাসগত

হয়ে পড়ে যে অন্যায় কাজ করবার সময় তারা ভাবতেই পারে না যে তারা কোন অন্যায় কাজ করছে। সচেতন ধর্মবোধ এই সব অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে। সেইজন্য মানুষকে সৎ হবার জন্য সজ্ঞান ও সচেতনভাবে অহরহ সাধনা করতে হবে। মহৎ কাজের প্রেরণা আসা চাই শুভ বুদ্ধি থেকে, মুক্ত মন থেকে। তবেই মানুষ পারবে অহরহ চরিত্রোন্নতির সাধনা করতে। পূজা-অর্চনার দরকার নেই একথা ব'লব না—বরং ব'লব ওসবের খুবই দরকার আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আমার চরিত্রোন্নতির সাধনার পথে ঐগুলিই সব নয়, আমাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে—সারাজীবন ধরে সাধনা ক'রে যেতে হবে—তবেই আমি দেবত্বে উন্নীত হতে পারব।

মানুষের জীবন বহু জটিলতায় ভরা। সংসারে বহু ভাল লোক আছে, তেমনি আছে বহু মন্দ লোক। ভাল লোকের যেমন শ্রেণীভেদ আছে, তেমনি মন্দ লোকেরও শ্রেণীভেদ আছে। অবিমিশ্র ভাল লোক, অথবা অবিমিশ্র মন্দ লোক নেই বললেই চলে। খুব কম লোক আছেন যাঁরা সকল দিক দিয়ে এবং সকল প্রকার মানদণ্ড অনুসারে ভাল ও সৎ। বেশীর ভাগ লোকের মধ্যে কোন না কোন একটা সদ্‌গুণ আছে, কারও মধ্যে দু'একটা সদ্‌গুণের পরিমাণ বেশী ক'রে আছে। কারও মধ্যে দু'একটা দোষ বেশী ক'রে আছে। একজনের যেগুণ আছে। অপর জনের হয়তো সেগুণ নেই। বরং এই শেষোক্ত লোকের মধ্যে দোষের পরিমাণই বেশী ক'রে আছে। কিন্তু তার এই সব দোষ-ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হয় অন্য একটা মহৎগুণের দ্বারা। আমরা দেখি হয়তো কোন ব্যক্তি সত্য কথা বলে, কিন্তু সে মিষ্টভাষী নয়। যে পরোপকার করে, সে হয়তো সত্যবাদী নয়। যে নারীজাতিকে মায়ের মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করে, সে হয়তো অপরের টাকা পয়সার ব্যাপারে মোটেই সৎ নয়। এমন অনেক লোক দেখেছি যিনি বিনয়ী মিষ্টভাষী, কিন্তু পরোপকার করতে চান না; এমন কি সত্য কথা বলতেও তিনি কুণ্ঠিত। এইভাবে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী দোষগুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। আবার অপর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এমন বহু দুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে, যাদের মধ্যে দু'একটা সদ্‌গুণের চরম বিকাশ হয়েছে। কপট মানুষকে দেখছি পরোপকার করতে। দোষগুণের সমষ্টিতে গড়া এই যে মানুষ তাকে সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে অহরহ সাধন ক'রে যেতে হবে। দৈববল অপেক্ষা চরিত্রবল মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করতে অধিকতর সাহায্য করে।

যে সব দোষগুণ দিয়ে মানুষের চরিত্র গঠিত সেগুলি নানাভাবে ও নানাপথে এসে জীবনকে প্রভাবিত করে। আমরা সদ্‌গুণের কিছুটা পাই উত্তরাধিকার-সূত্রে, কিছুটা পাই জ্ঞান চর্চা ক'রে, কিছুটা শিখি শিক্ষক বা গুরুর নিকট, আর কিছুটা শিখি পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে। এই ভাবেই বিবিধ উপাদান দিয়ে মানুষের চরিত্র গঠিত হয়। কিন্তু তবু সকল প্রকার সদ্‌গুণ পাওয়া যায় না। উপরি-উক্ত পথ দিয়ে যে সব মহৎ গুণ আমরা লাভ করি, তা চরিত্র গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদি আমরা মনে করি যে ঐগুলিই যথেষ্ট এবং ঐগুলিতে থেমে গেলেই চলবে, তবে আমাদের চরিত্রের ক্রমবিকাশ হবে না। আরও বড় হবার জন্য, যদি আরও অধিক সজ্ঞান সাধনা না করি, তবে হয়তো কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে জীবাণুর মত পাপপ্রবৃত্তি মনটাকে আক্রমণ ক'রে বসবে। শরীরের শ্বেতকণিকাগুলি (Luco-

cytes) অহরহ বহিরাগত জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে চলে বলেই মানুষ সহজে ব্যাধিগ্রস্ত হয় না। সেইরূপ মানুষের সহজ স্বাভাবিক বোধ-শক্তিকেও পরিবেশের মন্দ প্রভাবের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম ক'রে যেতে হবে।

Positive বা সক্রিয় সচেতন সদ্‌গুণের অভাব ঘটলে মানুষের দেহমন পাপের সংক্রামক আক্রমণ সহ্য করতে পারবে না। বস্তুতঃ মানুষকে প্রলুব্ধ করবার জন্য জীবাণুর মত পাপের উপাদান-সমূহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখন কোন্ সময় কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে কোন্ অসদ্‌ভাব পুণ্যের বেশে কখন তার সামনে প্রলোভন দেখাবে, সে কথা কি কেউ বুঝতে পারে? সুতরাং সব সময় হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে। সজ্ঞানে ভাল হবার সাধনা করলে তবেই মানুষ উত্তরোত্তর দেবত্বের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সজ্ঞানে সৎকর্মের প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। এরূপ প্রচেষ্টার অভাবে অনেক ভাল লোক একেবারে মন্দ হয়ে যায়। দেখা গেছে কত ভাল লোক হঠাৎ বিষয় আশয় লাভ ক'রে অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে দুর্দান্ত হয়ে পড়েছে। কেন তা হয়? কারণ এই যে, তাদের মধ্যে যে সব ভাল গুণ ছিল সেগুলির আর বিকাশের চেষ্টা করা হয়নি। তাদের ভাল গুণ সজ্ঞান প্রচেষ্টার দ্বারা বিকশিত হয়নি, অসতর্ক মুহূর্তে প্রলোভনের সম্মুখে তারা তাল সামলাতে পারেনি। তারা আরও ভাল হবার সাধনা ক'রত না বলেই মন্দের প্রভাব এড়াতে পারেনি এবং মন্দের প্রভাবে চরিত্রও ঠিক রাখতে পারে নি। আবার অন্যদিকে দেখা গেছে যে মন্দ লোকও হঠাৎ ভাল হয়ে গেছে। যারা জীবন ধরে মন্দ কাজ ক'রে যাচ্ছিল, অবশেষে এমন এক স্থানে উপনীত হ'ল যে তখন তাদের মনে এল অতীতের দুষ্কৃতির জন্য অনুশোচনা। এই অনুশোচনা সচেতনতার লক্ষণ। মন্দলোক একবার ভালর দিকে অগ্রসর হ'লে সচরাচর মন্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। তাদের জীবনে আসে বিপ্লব ও পরিবর্তন। এইভাবে নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে চলতে চলতে তাদের জীবনের নীতিরও আমূল সংশোধন হয়ে যায়। তাদের পক্ষে তখন দেবত্বের পথে পাড়ি দেওয়া সহজ হয়ে পড়ে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে জগাইমাধাই-এর পরিবর্তনের কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হজরত ওমরের পরিবর্তন, মেরী ম্যাগডালেনের সংশোধন, এই ধরনের আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের জীবন থেকে আমরা অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিতে পারি। বিশ্বামিত্র দেবত্বে উন্নীত হবার জন্য কতবার কত সাধনা করেছিলেন। প্রলোভনের পর প্রলোভন এসে তাঁর সাধনাকে ব্যর্থ করেছে, কিন্তু তিনি সংকল্প ও সাধনা ছেড়ে দিলেন না। অবিরত সাধনা ক'রে যেতে লাগলেন, এবং অবশেষে দেবত্বে উন্নীত হতে পারলেন। সুতরাং অবিরত সাধনা করতে পারলে বড় হওয়া যে যায়—এ শিক্ষা আমরা তাঁর জীবন থেকে লাভ করি।

মানবচরিত্রে বিশেষজ্ঞ সার্থক শিল্পিগণ পূর্ণ মানব অথবা নিরেট শয়তানের চিত্র আঁকেন না। তাঁদের অঙ্কিত চিত্রগুলি ভাল-মন্দের মিশ্রণ। এইটাই স্বাভাবিক। বিচিত্র এ মানব-জীবন। বিচিত্র পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মধ্যে মানব-জীবনের অগ্রগতি হয়ে যাচ্ছে। শিল্পী ছবি আঁকেন ক্রমাগত এগিয়ে-যাওয়া মানুষের। তাঁদের গ্রন্থ পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারি যে মানুষকে ক্রমাগত সাধনা ক'রে যেতে হবে। কবি ব্রাউনিং তাঁর 'Rabbi Ben Ezra' কবিতায় মানুষের ক্রমবিকাশের একটি মহৎ আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন। লোভ, প্রলোভন,

হতাশা, ব্যর্থতা ও পরাজয় জীবনে বহু আসবে। তবু মানুষকে এ-সকলের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। হয়তো এ জীবনে সফলতা লাভ ক'রব না। কিন্তু এ জীবনই তো সব নয়, এ জীবন পরজীবনের একটা অংশ মাত্র। কি হতে পেরেছি এটা বড় কথা নয়। আমি কি হতে চেয়েছি, কতবার সাধনা করেছি, কত উচ্চ আশা পোষণ করেছি, এইটাই বড় কথা। জীবনে সফল হই বা না হই, তাতে কিছু আসে যায় না; সাফল্যের জন্য সাধনা করেছি ও বরাবর ক'রে যাচ্ছি, এইটাই মানুষের জীবনের সার কথা। মূল্যের দিক দিয়ে কোলরিজের কথার সঙ্গে ব্রাউনিং-এর আদর্শের বিশেষ পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন এই—আমরা কি এই মরজগতের জড়-বস্তুর শত বন্ধনের মধ্যে সাধনা ক'রে দেবত্বে উন্নীত হতে পারব? ব্রাউনিং বলেন, সাধনা করলে সবটা না পেতে পারি, কিন্তু বর্তমান অবস্থা থেকে একটু উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হতে পারব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই মরজগতে আমরা হয়তো কোনদিন দেবত্ব পাব না, কিন্তু তবু সাধনা করতে হবে। আজ আমি যা আছি, সাধনা ক'রে গেলে কাল তার চেয়ে নিশ্চয় কিছুটা উন্নতি লাভ করতে পারব, এ বিশ্বাস থাকা চাই। সাধনা করলে কিছুটা অগ্রসর হতে পারব, কিন্তু সাধনা না করলে প্রথমে পশুত্বের এবং পরে শয়তানের স্তরে নেমে যাব। সেইজন্য আমাদের অবিরত সজ্ঞানে সাধনা ক'রে যেতে হবে।

সাধারণ লোক কি উপায়ে মহৎ জীবন লাভ পারে সে বিষয়ে দু'একটা কথা ব'লব। প্রধান উপায় হচ্ছে—'সাধু-সঙ্গ ও সৎসঙ্গ'। যাঁরা সংসার ত্যাগ ক'রে কঠোর কৃচ্ছ সাধনার দ্বারা প্রচলিত অর্থে সাধু হয়েছেন, এখানে তাঁদের কথা বলছি না; বরং যাঁরা সংসারে বাস ক'রে সংসারের সমস্ত প্রকার প্রলোভনের উর্ধ্বে থেকে মহৎ ভাবে জীবন যাপন করেন, তাঁদের সঙ্গ অপরের জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। আমরা সাধারণ লোক, আমরা আমাদের মতই সাধারণ লোকের সঙ্গে নিত্য মেলামেশা করি। সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গ ততটা করি না। সাধুসঙ্গে বহু লোকের জীবনের মোড় ফিরে গেছে। সাধুসঙ্গের মতো মহৎ ব্যক্তির জীবনী পাঠ করাও একান্ত দরকার। তাঁদের প্রদত্ত উপদেশাবলীরও একটা মূল্য আছে। কিন্তু জীবনী-পাঠ আর উপদেশ পাঠ এক বস্তু নয়। একজন সাধারণ মানুষ কেমন ক'রে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নানা অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে বড় হয়েছেন, সে বিবরণ কোন উপন্যাস থেকে কম চাঞ্চল্যকর নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, কেশবচন্দ্র, গান্ধীজী প্রভৃতি মহামানবের জীবনী নিজেই এক একটা কাব্য। এই জীবনীরূপ কাব্য মানুষের মনের উপর অপার প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মহাপুরুষদের জীবনী থেকে আমরা নানা দিক দিয়ে উপকৃত হতে পারি। তাঁদের জীবনী আমাদের সম্মুখে একটা নূতন জগতের দ্বার খুলে দেয়। সৎচিন্তা, সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ, এ সবের দ্বারাও মানুষ মহৎ আদর্শ লাভ করে।

পবিত্রভাবে জীবন-যাপনের পশ্চাতে আছে একটা মহৎ যুক্তি। সে যুক্তিটা এই যে, পবিত্র জীবন স্থায়ী বস্তু দান করে। ভ্রান্ত ও অসৎ পন্থায় কখনও কোন স্থায়ী কাজ হয় না এবং স্থায়িভাবে কোন সুফলও পাওয়া যায় না, এই সত্যকে নানাদিক দিয়ে উপলব্ধি করতে পারলে এবং এই যুক্তি অনুসারে চললে মানুষ সজ্ঞান ও সচেতনভাবে সৎপথের দিকে চলতে উৎসাহ বোধ করবে। ব্যক্তিকে বাদ দিলে সমাজ চলে না,

রাষ্ট্রও চলে না। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, 'The worth of a state is the worth of the individual composing it.' ব্যক্তি-চরিত্রের কার্যকলাপের উপর সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে। সুতরাং সর্বদাই ব্যক্তিকে সতর্ক হয়ে চলতে হবে। জীবনে সরল আচরণ, মৃদু স্বভাব, নিঃস্বার্থ কার্য, মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন—এই সব মহৎ গুণ জীবনকে পবিত্র করে, সমাজকে ধারণ করে এবং রাষ্ট্রকে রক্ষা করে। স্বার্থপরতা বর্জন করা, হিংসা-বিদ্বেষ দূর করা, প্রতিপদে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সঞ্চয় করা, অপরকে সাধ্যমত এই সব দিয়ে সাহায্য করা—এবংবিধ উপায়ে আমরা দেবত্ব লাভ করতে পারব, এবং এই পন্থায় আমরা মরজগৎকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে পারব। মস্ত বড় পণ্ডিত হওয়া, বৈজ্ঞানিক বা লেখক হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু একটু চেষ্টা করলে ক্ষমাসুন্দর অন্তরে মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে মহৎ জীবন লাভ করা সম্ভব হতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই মহৎ জীবন লাভের সাধনা ক'রে যেতে হবে।

শ্রেষ্ঠ ত্যাগী

শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ

গভীর অরণ্য মাঝে সাধু মহাজন
শান্ত সমাহিতচিতে ভজনে মগন,
হেন কালে রাজা আসি প্রণমিয়া পায়
কহে—প্রভু, শ্রেষ্ঠ ত্যাগী তুমি এ ধরায়।

সাধু কন, সত্য নহে তোমার বচন,
মোর চেয়ে বড় ত্যাগী তুমি তো রাজন্!
লাজে নতশির নৃপ কহে জোড়পাণি,
কোন অপরাধে, প্রভু, পরিহাস-বাণী?

শান্ত স্বরে সাধু কন, নহে পরিহাস,
বিচার করিলে মনে, হইবে বিশ্বাস।
আমি তো পরম রত্ন ভগবানে নিয়া,
ভোগ সুখ তুচ্ছ কাচ—দিয়েছি ফেলিয়া।

আর তুমি,—কাচখণ্ড করিয়া গ্রহণ,
হেলায় সে সাররত্ন দেছ বিসর্জন!
এখন ভাবিয়া রাজা দেখ একবার—
কার ত্যাগ শ্রেষ্ঠ হ'ল—মোর, না তোমার?

মহাপ্রভু-চরণে রঘুনাথ

শ্রীমতী সুধা সেন

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভিক্ষাপাত্র হাতে সিদ্ধার্থও একদিন চলিয়াছিলেন—ভারতের দ্বারে দ্বারে।

আজ চলিয়াছেন দুর্গম পথের শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া—চৈতন্য-প্রেমে-পাগল রাজপুত্র-সম রঘুনাথ। 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, অপ্সরাসম স্ত্রী' কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না—বিশ দিনের পথ মাত্র বারো দিনে অতিক্রম করিয়া নীলাচলে প্রভুর পায়ে আসিয়া লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন রঘুনাথ। অনশনক্লিষ্ট, পথকষ্টে শীর্ণ—কিন্তু প্রভুদর্শনে আনন্দোদ্ভাসিত এই তরুণের মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহে করুণায় অভিভূত হইয়া গেলেন প্রভু! তাঁহারই জন্য গৃহত্যাগী রঘুনাথকে এইবার প্রভু বক্ষে তুলিয়া লইলেন। স্বরূপকে ডাকিয়া বলিলেন—স্বরূপ, আজ হইতে আমার 'তিন রঘুনাথ'। ইহাকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। পরম স্নেহে ও আগ্রহে স্বরূপ গ্রহণ করিলেন রঘুনাথকে। প্রভুর অকথিত বাণীর অর্থ বুঝিলেন স্বরূপ—রঘুনাথ গৌরের, রঘুনাথের গৌর। কিন্তু দাস রঘুনাথ 'স্বরূপের রঘু' বলিয়াই পরিচিত হইলেন।

প্রভুর আদেশে গোবিন্দ রঘুনাথকে স্নান করাইয়া উত্তম প্রসাদ গ্রহণ করাইলেন। মাত্র ছয় দিন ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন রঘুনাথ, সপ্তম দিবসেই গিয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইলেন। পশারী অথবা মন্দির-দর্শনার্থী অপর কেহ বৈষ্ণব দেখিয়া যাহা দিতেন তাহাই গৃহে লইয়া আহার করিতেন রঘুনাথ। গোবিন্দ প্রভুকে জানাইলেন—রঘুনাথ আর প্রসাদ গ্রহণ করে না, সিংহদ্বারে গিয়া ভিক্ষার জন্য দাঁড়ায়। প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন, ঠিকই করিতেছে রঘুনাথ। বৈষ্ণব হইয়া যে জিহ্বার লালসাকে পুষ্ট করে সে বৈষ্ণব নহে, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। ভিক্ষার অন্নই শুদ্ধ, বৈষ্ণবের গ্রাহ্য।

ভিক্ষার অন্নে পরমানন্দ লাভ করিলেন রঘুনাথ—বারো লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী! বর্ধিষ্ণু নগর সপ্তগ্রামের অধিপতি দুই ভাই—হিরণ্যদাস ও গোবর্ধন; আর দুই ভাই-এর একমাত্র বংশধর রঘুনাথ! ইঁহাদের সঙ্গে পূর্বাশ্রমে প্রভুর পরিচয় ছিল। প্রভুকে না দেখিয়া, কেবলমাত্র তাঁহার কথা শুনিয়াই রঘুনাথ প্রভুর প্রেমে মগ্ন হইয়াছিলেন। শৈশবে হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন কিছুদিন, গৌরপ্রেম তাহাতে আরও বর্ধিত হইয়াছিল।

সন্ন্যাস লওয়ার পর শ্রীনিত্যানন্দের ছলনায় প্রভু যখন বৃন্দাবন-ভ্রমে শান্তিপুর আসিয়া অদ্বৈত আচার্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন বহু সাধ্য সাধনায় পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতি লইয়া রঘুনাথ প্রভুদর্শনে আসিলেন। সেই নবারুণ-বহির্বাসধারী স্বর্ণোজ্জ্বলকান্তি দর্শনমাত্র রঘুনাথ দেহ-মন-প্রাণ প্রভুকে সমর্পণ করিলেন। প্রভু নীলাচলের পথে যাত্রা করিলে রঘুনাথও আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু পিতামাতা দেখিলেন—রঘুনাথের পদদ্বয় তাঁহার দেহটিকেই বহন করিয়া আনিয়াছে শুধু, রঘুনাথকে নয়।

সংসারে অনাসক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতা-জেঠার চিত্ত বিচলিত হইল, সুন্দরী লক্ষ্মীশ্রী-যুক্তা এক কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন, যদি রঘুনাথের মনের কিছু পরিবর্তন হয়। কিন্তু কিছুই হইল না, রঘুনাথ বার বার গৃহত্যাগ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং প্রতিবারই ধরা পড়িয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য

হইলেন। প্রহরীর উপরে প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল, মাতা ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন—বাঁধিয়া রাখ। সকরুণ হাসি হাসিয়া পিতা বলিলেন—'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, অপ্সরাসম স্ত্রী' যাহার মন বাঁধিতে পারিল না, সেই চৈতন্যের বাতুলকে তুচ্ছ দড়ির বাঁধনে কি করিবে?

মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পাঁচ বৎসর পরে বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া গৌড়ে একবার দর্শন দিয়া গেলেন, কিন্তু কানাইএর নাটশালা পর্যন্ত গিয়া যখন বৃন্দাবন না গিয়াই প্রত্যাবর্তনের নামে শান্তিপুরে আসিলেন, তখন বহু অনুনয়ে জেঠা-পিতার অনুমতি লইয়া রঘুনাথও শান্তিপুরে আসিলেন। গৃহত্যাগের গোপন সংকল্পের কথা প্রভুকে জানাইলে প্রভু বলিলেন:

'স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল,
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধুকূল,
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া,
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।'

মহাপ্রভুর আদেশ লইয়া গৃহে ফিরিলেন রঘুনাথ শান্ত সমাহিত চিত্তে। সংসারের সর্বব্যাপারে পুনরায় যোগ দিলেন, যথাকর্তব্য সুন্দররূপে নির্বাহ করিতে লাগিলেন। পিতা-মাতার মনে আশার সঞ্চার হইল, পুত্র কি তবে গৃহেই থাকিবে?

কিছুকাল পরে শ্রীনিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে আসিয়া হরিনাম—গৌরনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন একদিন রঘুনাথ গিয়া দয়াল নিতাইচাঁদের পায়ে পড়িলেন, নিতাই-এর কৃপা না হইলে গৌর-চরণ লাভ করা সুকঠিন। নিত্যানন্দ রঘুনাথকে বক্ষে ধারণ করিলেন, বলিলেন—চোর! তুমি বারবার পলাইয়া যাও, আজ ধরা পড়িয়াছ, তোমাকে দণ্ড দিতে হইবে। দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া রঘুনাথ আনন্দে আকুল হইলেন, সকল বৈষ্ণবকে 'চিড়াদধি' ভোজন করাইতে হইবে—ইহাই নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ।

'রাজপুত্র' রঘুনাথ পলকের মধ্যে সর্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন, ভারে ভারে খাদ্যদ্রব্যাদি আসিতে লাগিল। পরম মঙ্গলময় নাম-সঙ্কীর্তনের পরে সারি দিয়া সহস্র বৈষ্ণব ভক্ত ও গ্রামের লোক ভোজনে বসিলেন। মধ্যস্থলে শ্রীনিত্যানন্দ ও পার্শ্বে রক্ষিত মহাপ্রভুর জন্য আসন। নিত্যানন্দ ধ্যানে বসিলেন—গৌর ছাড়া এই উৎসবের প্রাণদান করিবেন কে?

ধ্যানভঙ্গে পরমোৎফুল্ল নিত্যানন্দকে দেখিয়া ভক্তেরা বুঝিলেন—মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে। হরিধ্বনি করিয়া তাঁহারা আহার আরম্ভ করিলেন; রঘুনাথ সকলকে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিয়া তুষ্ট করিলেন, প্রভুদ্বয়ের অবশেষ-পাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইল।

রাত্রিতে রাঘব পণ্ডিতের মাধ্যমে আপন অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন রঘুনাথ। নিতাইচাঁদ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার মাথায় অজস্র আশীষধারা বর্ষণ করিয়া বলিলেন—প্রভু তো তোমাকে আজ অঙ্গীকার করিয়াছেন, আর ভয় নাই, আর কোনও বাধা নাই, অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় উদ্ধার করিবেন।

আবার গৃহে ফিরিলেন রঘু—উন্মাদ, অশান্ত। অন্দরে যান না, বাহিরে শয়ন করিয়া থাকেন। চোখের জলে বুক ভাসাইলেন মাতা, পিতা করিলেন কড়া পাহারার ব্যবস্থা। কিন্তু প্রভুর বাক্য সফল হইল এবার। প্রভু বলিয়াছিলেন—গৃহত্যাগের সময় হইলে কৃষ্ণই কোনও ছলে তোমাকে বাহির করিবেন। সেই সুযোগই উপস্থিত হইল, গুরুর কার্য করিবার ছলে একাকী বাহির হইবার অনুমতি লাভ করিলেন রঘুনাথ—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন নীলাচলের পথে। দ্বাদশ দিন পথে কাটিল—মাত্র তিন দিন বুঝি আহার

জুটিয়াছিল, রঘুনাথ নীলাচলে পৌঁছিলেন।

বহু খোঁজ করিয়াও পিতা রঘুনাথের কোন খবর পাইলেন না। চার পাঁচ মাস পরে শ্রীশিবানন্দ সেন ও গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর দর্শনান্তে নীলাচল হইতে ফিরিয়া আসিলে খবর পাইলেন পিতা—রঘু প্রভুর কাছে নীলাচলে আছেন, উদাসীন—রাত্রে সিংহদ্বারে 'খাড়া' হইয়া থাকেন, ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতেছেন। অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ভিক্ষার অন্নে জীবন নির্বাহ করিতেছেন, আর গৃহে এত ঐশ্বর্য! পিতা-মাতা-জেঠার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য কয়েক জনের হাতে চারিশত মুদ্রা দিয়া পুত্রের কাছে নীলাচলে পাঠাইলেন, গৃহে না আসুক, তবু এই অর্থে জীবন ধারণ করুক রঘুনাথ।

রঘুনাথ অর্থ গ্রহণ করিলেন না, কেবল মাসে একবার ঐ অর্থের সামান্য অংশ দ্বারা ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন, প্রভুও তাহা গ্রহণ করিতেন। কয়েক মাস পরে নিমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া গেল, প্রভু স্বরূপকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্বরূপ বলিলেন—'আমার উপরোধে প্রভু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন মাত্র, কিন্তু ইহাতে তাঁহার মন প্রসন্ন হয় না' ইহাই ভাবিয়া রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়াছেন।

প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন—তিনি তো কিছু বলেন নাই, তবু তাঁহার ইচ্ছা অনুভব করিতেছেন রঘুনাথ। বলিলেন—'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন' এবং তাহাতে কৃষ্ণ-স্মরণে বিঘ্ন জন্মে।

প্রভু রঘুনাথের দিকে সজাগ দৃষ্টি মেলিয়া রাখিয়াছেন। কয়েকদিন পরে স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজকাল যেন সিংহদ্বারে রঘুকে দেখিতে পাই না? স্বরূপ জানাইলেন—সিংহদ্বারে আর দাঁড়ান না, ছত্রে মাগিয়া খান রঘু। প্রভু বলিলেন—সিংহদ্বারে ভিক্ষা করা পতিতার বৃত্তির সমান, ভালোই হইয়াছে, রঘুনাথ ইহা ত্যাগ করিয়াছেন।

বিপ্র ও ভৃত্যগণ অর্থ লইয়া হিরণ্যদাস-গোবর্ধনের কাছে ফিরিয়া গেল। হাহাকার করিয়া উঠিলেন আত্মীয়জন, শেষ যোগসূত্রটিও ছিন্ন করিয়া দিলেন রঘুনাথ। রঘুনাথ ইহার পরে ছত্রে মাগিয়া খাওয়াও বন্ধ করিলেন। স্বরূপ একদিন ঘরে গিয়া দেখেন—পূতিগন্ধময় যে অন্ন পশারীরা ফেলিয়া দেয়, গরুতে পর্যন্ত যাহা খায় না, সেই অন্ন—দুই মুষ্টি ঘরে আনিয়া অনেক জল দিয়া ধুইয়া ঘষিয়া ঘষিয়া ভিতরের সামান্য শাঁসটুকু মাত্র লইয়া রঘুনাথ গ্রহণ করিতেছেন। সংবাদ প্রভুর কর্ণগোচর হইল, রাত্রিতে হঠাৎ একদিন রঘুনাথের আহারের সময় প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথের সেই পর্যুষিত অন্ন হইতে একগ্রাস মুখে উঠাইয়া বলিলেন—এমন অমৃততুল্য বস্তু তুমি রোজ গ্রহণ কর, এ কি অপূর্ব প্রসাদ? প্রভু আর এক গ্রাসের জন্য হাত বাড়াইলে স্বরূপ বাধা দিলেন, আর নয় প্রভু!

প্রভু রঘুনাথের বৈরাগ্য-দর্শনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন, আপন-সেবিত গোবর্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা অর্পণ করিলেন রঘুনাথের হাতে। রঘুনাথ সেই শিলা প্রভুর প্রতিনিধি-রূপে বক্ষে ধরিলেন।

দীর্ঘকাল প্রভুর কাছে আছেন রঘুনাথ, কিন্তু প্রভুর সামনে কোনও কথা বলেন না, একদিন স্বরূপকে দিয়া প্রভুকে নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন—'আমি কেন আসিলাম, কি আমার কর্তব্য?'—প্রভু তাহা আপন শ্রীমুখে উপদেশ করুন। প্রভু রঘুনাথকে ডাকিয়া আনিলেন, বলিলেন—স্বরূপের হাতে তোমাকে দিয়াছি, তিনিই তোমাকে সব শিক্ষা দিবেন। তবু যদি আমার কথা শুনিতে

তোমার ইচ্ছা হয়, তবে দুই একটি কথা বলিয়া দিই, মনে রাখিও—

ভালো খাইবে না, ভালো পরিবে না। গ্রাম্য কথা কহিও না, শুনিও না। নিজে অমানী হইয়া সকলকে মান দিবে। তৃণের মতো সুনীচ ও তরুর মতো সহিষ্ণু হইয়া সর্বদা হরিসংকীর্তন করিবে।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

রঘুনাথ আপনার সমগ্র জীবন দিয়া প্রভুর শিক্ষা সার্থক করিয়া গিয়াছেন—কঠোর বৈরাগ্য পালন করিয়াছেন তিনি। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সান্নিধ্যে কিছু কাল ছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন, রঘুনাথ—

'আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন।'
'ছিণ্ডা কাঁথা কানি বিনু না পরে বসন।'

পাষাণের রেখার মতো ছিল তাঁহার নিয়ম, দিবস-রাত্রির সাড়ে সাত প্রহরকাল জপ-পূজা-ধ্যানে কাটাইতেন--অর্ধপ্রহর মাত্র আহার-নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তাহাও কতদিন জপধ্যানে কাটিয়া যাইত—হয়তো বা আহার হইত না।

নীলাচলে দীর্ঘ ষোড়শবর্ষ আপন অন্তরের অন্তরতমকে সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন রঘুনাথ। মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের গম্ভীরা-লীলা প্রতিদিন নিজের চোখে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার রচিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষে'; এবং কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া প্রভুর অশ্রুত-পূর্ব, অপ্রাকৃত লীলার অনেক চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে।

স্বরূপ প্রভুর অন্তরঙ্গ আর রঘুনাথ স্বরূপের অন্তরঙ্গ; স্বরূপের সঙ্গে প্রভুর বহু লীলার নীরব দর্শক হইয়াছিলেন রঘুনাথ

রাধারস-বিভাবিত গৌরসুন্দর যখন ভিত্তিতে মুখ ঘষিয়া, পাথরে মাথা ঠুকিয়া—রক্তধারা ও অশ্রুধারার মিলিত স্রোতে সিক্ত হইয়া আর্তনাদ করিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে থাকিতেন—তখন রায় রামানন্দ ও স্বরূপের সঙ্গে রঘুনাথেরও কি আকুল ব্যথায় বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পরমধনকে বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার ইচ্ছা জাগিত না?

দূর হইতে রঘুনাথ দেখিতেছেন—তাঁহার প্রিয়, তাঁহার দয়িত সিংহদ্বারের কাছে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন—এক এক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাত হইয়া গিয়াছে, অস্থি-সন্ধি সব বিচ্ছিন্ন, জীবনের তিলমাত্র আশা নাই—ব্যাকুল স্বরূপ প্রভুর মস্তক আপন ক্রোড়ে উঠাইয়া বেদনার্তস্বরে কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইতেছেন—তখন রঘুনাথের প্রাণও কি দেহ ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করে নাই?

প্রভুর বিরহ-ব্যথার শত শত তীব্র প্রকাশ রঘুনাথের হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিল —তাই 'শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষে' লিখিয়াছেন:

'কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথশ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠনভূমৌ কাক্বা বিকলবিকলং গদ্‌গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি॥'

—কোন একদিন কাশী মিশ্রের গৃহে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উৎকট বিরহে অঙ্গের শোভা ও সন্ধি-সকল শিথিল হওয়ায় যাঁহার হস্তপদ অধিক দীর্ঘ হইয়াছিল এবং তদবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হইতে হইতে অত্যন্ত কাতরতার সহিত যিনি গদ্‌গদ কাকু-বাক্যে রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

আর একদিন চটক-পর্বত দর্শনে গোবর্ধন-শৈলভ্রমে আবিষ্ট হইয়া ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভু বায়ুবেগে ছুটিলেন—

গোবিন্দ বা অপর কেহই তাঁহাকে ধরিতে সমর্থ হইলেন না, কিন্তু পথেই স্তম্ভভাব হইল, আর চলিতে পারেন না—

'প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার,
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার,
প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে, রুধিরের ধার,
কণ্ঠ ঘর্ঘর—নাহি বর্ণের উচ্চার,
বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ,
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ।'

কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন প্রভু, তাই পশ্চাদ্বর্তীরা এতক্ষণে তাঁহার নাগাল পাইলেন। সর্বাঙ্গে শীতল জলের ধারা সেচন ও কর্ণে কৃষ্ণনামামৃত বর্ষণ করিতে করিতে প্রভুর অর্ধচেতনা হইল—বলিলেন, এ কি আমাকে তোমরা কোথায় আনিয়াছ? আমি গোবর্ধন-পর্বতে গেলাম—সেখানে সব ধেনুগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ যেই বেণু বাজাইলেন অমনি—বেণুগান শুনিয়া রাধাঠাকুরাণী আসিলেন—তাঁহার রূপসুধামাধুরীর আমি কি বর্ণনা দিব? কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া লীলা করিতে করিতে পর্বত-গুহায় প্রবেশ করিলেন। সুন্দরী হাস্যময়ী সখীরা আমাকে ফুল তুলিবার জন্য বলিলেন। হায়, হায়, নিষ্ঠুর তোমরা কেন আমাকে এই সময় লইয়া আসিলে? শ্রীরাধাকৃষ্ণের অদর্শন-জনিত বেদনায় প্রভু আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ব্যাকুল রঘুনাথের ইচ্ছা হইল—প্রভুর নিছনি লইয়া মরিয়া যাই, কিন্তু কিছুই তো করিবার নাই।

প্রভুর গুরুস্থানীয় পুরী-গোঁসাই ও ভারতী ছুটিয়া আসিলেন, তাঁহাদের দেখিয়া প্রভুর কিছু বাহ্য জ্ঞান হইল, বলিলেন—শ্রীপাদ, আপনারা এতদূরে আসিলেন কেন? পুরী হাসিয়া বলিলেন 'তোমার (মধুর) নৃত্য দেখিবারে'। নিপট্ট বাহ্য পাইয়া প্রভু যেন লজ্জিত হইলেন—'হরি, হরি' বলিয়া সমুদ্রস্নানে গমন করিলেন।

রঘুনাথ আপন বক্ষের রক্ত দিয়া ইহাও লিখিয়া রাখিয়াছেন (অনুবাদ):

যিনি চটক-পর্বত দেখিয়া গিরি-গোবর্ধন-ভ্রমে প্রমত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়া স্বজনগণ কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন সেই—

'...প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো গণৈঃ
স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি'

—শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

এমনি করিয়া একদিন নয়, দুইদিন নয়, দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া প্রভুর বিরহ-ব্যথার যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন রঘুনাথ—দেখিয়াছেন শুধু প্রভুকে নয়—কৃষ্ণপ্রেমে সকল-হারা শ্রীমতী রাধিকাকে প্রভুর মধ্যে!

তাই প্রভুর অপ্রকটের পরে ভৃগুপাতে দেহ-ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প লইয়া যখন বৃন্দাবনে গেলেন—তখন অবশ্যই শ্রীরূপ-সনাতন ও অন্যান্য গোস্বামিগণের অনুরোধে দেহত্যাগ করিতে পারেন নাই, কিন্তু সারাদিন ব্রজের কুঞ্জ হইতে কুঞ্জে বিরহিণী রাধারাণীকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। যখন বার্ধক্যে আর চলিবার শক্তি ছিল না—তখনও হামাগুড়ি দিয়া—কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়াছেন—কোথায় গো ব্রজবধূ—কৃষ্ণময়ী রাধা! আর তুমি একলা কাঁদিও না, আমাকেও কাঁদাও গো কাঁদাও—তোমার কুঞ্জের ধূলিতলে লুণ্ঠিত হইয়া আমিও একবার ডাকি! হা কৃষ্ণ, হা প্রাণধন,—কোথায় গো তুমি?

'হা হা সখি, কি করি উপায়?
কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণবিনু প্রাণ মোর যায়!'

প্রজ্ঞা পারমিতা

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

"পারম্ (অন্ত, শেষ) ইতা (গতা)" প্রজ্ঞার নাম প্রজ্ঞা পারমিতা। জ্ঞানের যাহা চরম, বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাহাকে 'প্রজ্ঞা পারমিতা' বলা হয়। এই এই জ্ঞান সমাধি-লব্ধ। প্রজ্ঞাপারমিতাকে বৌদ্ধেরা দেবতার ন্যায় পূজা করেন। 'নমস্তস্যৈ ভগবত্যৈ প্রজ্ঞাপারমিতায়ৈ'—ইত্যাদিরূপ স্তুতি-মন্ত্রও আছে।

এই প্রজ্ঞা-পারমিতার স্বরূপ কি? 'যঃ সর্ব-ধর্মাণাম্ অনুপলম্ভঃ, সা প্রজ্ঞা পারমিতা ইত্যুচ্যতে'—সকল ধর্মের যাহা অনুপলব্ধি, তাহাকে প্রজ্ঞা পারমিতা বলে। বৌদ্ধশাস্ত্রে 'ধর্ম' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহা দুর্গতি হইতে প্রাণিগণকে ধারণ করে, তাহা ধর্ম (পুণ্য)। আবার বস্তুসকল যে রূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, তাহাও ধর্ম। যাবতীয় সমুৎপাদ (Phenomena) ধর্ম। যে জ্ঞানে জাগতিক কোনও সমুৎপাদের উপলব্ধি হয় না, তাহা প্রজ্ঞা পারমিতা।

প্রতীত্য-সমুৎপাদে বুদ্ধ যে ভবচক্রের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার প্রথমেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান (Consciousness), বিজ্ঞান হইতে নাম (সংজ্ঞাদি অরূপস্কন্ধ) ও রূপ (শব্দাদি রূপ-স্কন্ধ), নাম রূপ হইতে ষড়ায়তন (মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়), ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, স্পর্শ হইতে বেদনা (সুখ, দুঃখ), বেদনা হইতে তৃষ্ণা (বিষয়-লিপ্সা), তৃষ্ণা হইতে উপাদান (জাগতিক দ্রব্য আঁকড়িয়া থাকা), উপাদান হইতে ভব (জন্মের হেতু, কর্ম), ভব হইতে জাতি বা জন্ম, জন্ম হইতে জরা, মরণ, দুঃখ, শোক প্রভৃতি। বুদ্ধ অবিদ্যা বা অজ্ঞানকেই জরা, মরণাদির মূল কারণ বলিয়াছিলেন। অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতে যাহা উদ্ভূত, তাহাকে সত্য বলা যায় না। সুতরাং সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জন্ম, জরা, মরণ কিছুই সত্য নহে। অবিদ্যার নাশ হইলে এ সকলের কিছুই থাকে না।

বুদ্ধের উপদিষ্ট প্রতীত্য-সমুৎপাদের এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত নহে। কিন্তু সকলে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। বৈভাষিক মতে বাহ্য জগৎ ও মানসিক জগৎ—উভয়েরই অস্তিত্ব সত্য বলিয়া স্বীকৃত। সৌত্রান্তিক দর্শনেও উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত। বিজ্ঞানবাদ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। মাধ্যমিক দর্শনে বাহ্য ও আন্তর উভয় জগতের অস্তিত্বই অস্বীকৃত; ইহাই শূন্যবাদ। বাহ্য ও আন্তর সর্ববিধ পদার্থের শূন্যতা বা অনুপলব্ধিই 'প্রজ্ঞা পারমিতা'। সমাধিতে কোন পদার্থের অস্তিত্বই উপলব্ধ হয় না। সেই অনুপলব্ধিকে পরম জ্ঞান মনে করিয়া তাহাকে 'প্রজ্ঞা পারমিতা' বলা হইয়াছে। কিন্তু 'অনুপলম্ভ' অভাববাচক, তাহাকে ভাববাচক 'প্রজ্ঞা' বলা যায় কিনা সন্দেহ। তাই যুক্তি দ্বারাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে কোনও পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই। এই যুক্তি-লব্ধ জ্ঞান ভাবপদার্থ। শান্তিদেবের 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থে 'প্রজ্ঞা পারমিতা' (নবম) অধ্যায়ে যে সকল যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে সংকলিত হইল।

সত্য দ্বিবিধ—সংবৃতি সত্য ও পরমার্থ সত্য। যাহা বুদ্ধির বিষয় নহে, তাহা পরমার্থ সত্য;

যাহা বুদ্ধিগোচর তাহা সংবৃতি সত্য। যাহা নাই, সংবৃতি সত্যে তাহার অস্তিত্ব খ্যাপিত হয়। 'সংবৃতি' শব্দের অর্থ অবিদ্যা। যাহা কৃত্রিম, সংবৃতি সত্যে তাহাই সত্য বলিয়া খ্যাত হয়। এইজন্য ইন্দ্রিয়ে যাহার প্রতীতি হয়, তাহা সংবৃতি সত্য। পরমার্থ সত্য অধিগত হইলে সংবৃতি সত্য মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। সকল ধর্মের 'নিঃস্বভাবতা' বা শূন্যতাই পরমার্থ সত্য।

সাধারণ লোকে যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহাকে 'সৎ' মনে করে, কিন্তু তাহা যে মায়ার মতো, তাহা বুঝিতে পারে না। রূপাদি বিষয় যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহা প্রামাণিক নহে। সুভূতি বলিয়াছেন, 'হে দেবপুত্রগণ, সমস্ত প্রাণীই মায়োপম—স্বপ্নোপম (তাহাদের সত্য অস্তিত্ব নাই)। সমস্ত ধর্ম, এমনকি সম্যক্ সম্বুদ্ধত্ব এবং নির্বাণও স্বপ্নোপম।' বুদ্ধ যদি মায়োপম হন, তবে তাহা হইতে কিরূপে পুণ্য হইতে পারে? ইহার উত্তর—পুণ্যও মায়োপম। মায়োপম বুদ্ধ হইতে মায়োপম পুণ্য হইবার বাধা নাই। যতকাল প্রত্যয়-সামগ্রী (মায়ার হেতু; বৌদ্ধ সাহিত্যে 'প্রত্যয়' শব্দের অর্থ হেতু বা কারণ) থাকে, ততকাল মায়াও থাকে, প্রত্যয়সকলের উচ্ছেদ হইলে মায়ারও উচ্ছেদ হয়।

শরীরের কোনও অংশ (দন্ত, নখ, কেশ, শোণিত প্রভৃতি) 'আমি' নহে; বসা, মেদ, অন্ত্র প্রভৃতিও 'আমি' নহে; মাংস, স্নায়ু প্রভৃতি 'আমি' নহে। ছয় বিজ্ঞান (চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণ, রসনা, কায় ও মন হইতে জাত বিজ্ঞান) 'আমি' নহে; সুতরাং 'আমি'-প্রত্যয়ের কোনও বিষয় নাই, 'অহং'প্রত্যয় নির্বিষয় শূন্য মাত্র।

শব্দজ্ঞান, রূপজ্ঞান প্রভৃতি আত্মা নহে, বিষয় (রূপরসাদি) হইতে বিচ্যুত যদি কোনও আত্মা থাকিত, তাহা হইতে তাহার স্বরূপ হইত 'জ্ঞানতা' মাত্র; তাহা হইলে সকল পুরুষই 'জ্ঞানতা' বলিয়া সকল পুরুষই এক হইয়া যাইত, কিন্তু তাহা হয় না।

আবার চেতন ও অচেতন পদার্থের 'অস্তিতা' নামক সাধারণ ধর্ম থাকায় উভয় পদার্থ এক, তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই। বিশেষই সাদৃশ্যের আশ্রয়। চেতন ও অচেতনের মধ্যে যখন ভেদ নাই, তখন সাদৃশ্যও নাই; সুতরাং চেতন পদার্থের অস্তিত্বই নাই।

আত্মা-নামক পদার্থের অস্তিত্ব নাই। নৈয়ায়িকেরা যে বলেন আত্মা অচেতন, চেতনা-যোগে চেতন হয়, তাহা সত্য নহে। যাহাকে আত্মা বলা হয়, তাহা অবিকারী; অচেতন আত্মার বুদ্ধি-যোগে চেতনারূপে বিকার প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে মূর্ছাবস্থায় যখন চেতনার অভাব হয়, তখন আত্মা নষ্ট হইয়া যাইত। যদি বল আত্মা না থাকিলে কর্মের ফল ভোগ করিবে কে? ইহার উত্তর—কর্মফল সিদ্ধ হয় ভিন্ন আধারে অর্থাৎ অন্য দেহে। তোমাদের মতে আত্মা নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্যাপার। এইরূপ আত্মাদ্বারা কর্মফল সিদ্ধ হইতে পারে না। আত্মা না থাকিলে কৃত কর্মের বিপ্রণাশ ও অকৃতাভ্যাগম হয়—এই আপত্তি সঙ্গত নহে। কেন-না হেতুমান্ দ্রব্যই (কর্মকর্তা) যে কৃত কর্মের ফলভোগী হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। একজন মৃত হয়, অন্য একজন পরলোকে উৎপন্ন হইয়া তাহার কর্মের ফল ভোগ করে। কৃত কর্মের বিপ্রণাশ অর্থাৎ কৃত কর্মের প্রকৃষ্টরূপ বিনাশ—তাহার ফল ভোগ না হওয়া। অকৃতাভ্যাগম অর্থাৎ যে কর্ম যে করে নাই, তাহার সেই কর্মের ফল ভোগ করা। 'আমি' এক নহে। আজিকার 'আমি' আগামী কল্যের 'আমি' হইতে ভিন্ন। এক 'আমি' মৃত হয়, অন্য 'আমি' আবির্ভূত হয়, সেই পরবর্তী 'আমি' পূর্ববর্তী 'আমি'র কর্মের

ফল ভোগ করে। পঞ্চস্কন্ধরূপ ধর্মী-সকলের প্রবাহের একত্বই 'এক কর্তা', 'এক ভোক্তা'। প্রবাহের একত্ব আছে, কিন্তু প্রবাহের অন্তর্গত ধর্মদিগের কাহারও স্থায়িত্ব নাই। প্রতিক্ষণে লীয়মান ও উদয়শীল ধর্মদিগের প্রবাহই আত্মা। সেই প্রবাহের এক অংশে কর্ম কৃত হয়, অন্য অংশে ফলভোগ হয়। 'এক ব্যক্তি'র অর্থ ভিন্ন ভিন্ন উদীয়মান ও লীয়মান ক্রম-সমূহের সন্তান বা প্রবাহ।

চিত্ত অতীত, অনাগত ও বর্তমান—এই তিন রূপে থাকিতে পারে। অতীত চিত্তের অস্তিত্ব তো বর্তমানে নাই। অনাগত চিত্তও এখন পর্যন্ত আবির্ভূত হয় নাই। সুতরাং 'অহং' তাহা নহে। বর্তমান চিত্ত যদি 'অহং' হয়, তবে তাহাও নষ্ট হইয়া যাইবে। কদলীস্তম্ভের খোলা এক এক করিয়া সরাইয়া লইলে যেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি অহং-ভাবকে বিশ্লেষণ করিলেও কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

কোনও সত্ত্বের অস্তিত্ব যদি না থাকে তবে কাহার প্রতি বোধিসত্ত্ব কৃপা করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তর—কার্যের ও পুরুষার্থের জন্য স্বীকৃত ও মোহ বা সংবৃতি দ্বারা কল্পিত সত্ত্বের উপর কৃপা করা যায়। কিন্তু 'সত্ত্বই' যদি না থাকে, তবে যে পুরুষার্থ-রূপ কার্য (কৃপা করা) কাহার? উত্তর—কাহারও নহে। পুরুষার্থ সাধনে যে চেষ্টা, তাহা মোহবশেই হয়। কিন্তু কাহার মোহ এবং মোহহীন কে? এ প্রশ্নের উত্তর নাই।

কায় বলিয়া কোন বস্তুরও অস্তিত্ব নাই, শরীরের পাদ জঙ্ঘা কটি প্রভৃতি অঙ্গের কোনও একটি কায় নহে। এই সকল অংশের মধ্যে যে কায় আছে, তাহাও বলা যায় না। সকল অঙ্গের প্রত্যেকের মধ্যে কায় আছে বলিলে যত অঙ্গ তত কায় আছে বলিতে হয়। সুতরাং কায়-করাদি অঙ্গের মধ্যেও নাই, বাহিরেও নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, কায় বলিয়া কিছুই নাই।

ইহার পরে 'সুখ-দুঃখে'র কথা। সুখ-দুঃখ সত্য নহে। সুখ-দুঃখ যদি সত্য হইত, তাহা হইলে প্রহৃষ্ট ব্যক্তিদের সুখ-কালে দুঃখ হয় না কেন, এবং শোকার্ত ব্যক্তির অন্নপানাদি সুখকর দ্রব্য ভাল লাগে না কেন? অন্য ভাব দ্বারা অভিভূত থাকায় এই সকল অবস্থায় দুঃখ ও শোকের অনুভব হয় না যদি বল, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই—যাহার অনুভবাত্মতা নাই, তাহার বেদনাত্বও নাই। বিরুদ্ধ হেতুর অস্তিত্ববশতঃ সুখ-কালে দুঃখের অনুভব হয় না, এবং দুঃখ-কালে সুখের অনুভব হয় না—ইহাই যদি বলা যায় তাহা হইলে বলিতে হয় সুখ-দুঃখের বেদনা কেবল কল্পনার সৃষ্টি। দুঃখ উপস্থিত হইলে যদি তাহার বিরুদ্ধ হেতুতে অভিনিবিষ্ট হওয়া যায়, তবে দুঃখের বেদনাই হয় না, বেদনা অভিনিবেশাত্মক। সুখ ও দুঃখ অভিনিবেশের বিরুদ্ধ বিষয়ের ভাবনা করিলে তাহার নিরাস হয়।

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে বেদনার উৎপত্তি বলা হয়, কিন্তু এই সংযোগ অসম্ভব। কেন-না ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যে যদি ব্যবধান থাকে, তবে তাহাদের সংযোগ হইতে পারে না। আর ব্যবধান যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহারা অভিন্ন। কাহার সহিত কাহার সংযোগ হইবে? পরমাণুর অংশ নাই, তাহারা অচ্ছিদ্র ও সম (নিম্নতা ও উন্নততা-হীন)। সুতরাং অণুর মধ্যে অণুর প্রবেশ ঘটিতে পারে না, সংসক্তি হইতে পারে না। বিজ্ঞান অমূর্ত, তাহার সহিতও সংসর্গ অসম্ভব। সুতরাং বিষয়, ইন্দ্রিয় ও বিজ্ঞানের সংসর্গে বেদনা হয়, ইহা বলিতে পারা যায় না। স্পর্শ যেখানে অসম্ভব, সেখানে বেদনার অস্তিত্বও অসম্ভব।

যেখানে বেদক (বেদনার জ্ঞাতা) নাই, বেদনাও নাই, যেখানে তৃষ্ণারও অস্তিত্ব নাই। চিত্ত স্বপ্নোপম। চিত্ত দ্বারাই বিষয়ের দর্শন ও স্পর্শ হয়। চিত্তের সহিতই তাহা উৎপন্ন হয়। চিত্তই যখন নাই তখন বেদনাও নাই।

মন (চিত্ত) ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে নাই, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের অন্তরালে নাই, অন্তরে বাহিরে অথবা অন্য কোথাও মনকে পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহাও কোন বস্তু নহে। অতএব সত্ত্বগণ (প্রাণী) 'পরিনির্বৃত' (মুক্তস্বভাব)।

জ্ঞেয়ের পূর্বে জ্ঞান হইলে তাহার আলম্বন কি? জ্ঞেয়ের সঙ্গে যদি জ্ঞান হয়, তাহা হইলেই বা তাহার আলম্বন কি? জ্ঞেয়ের পশ্চাতেই বা জ্ঞান কিরূপে হইবে? এইরূপে সর্ব 'ধর্মে'র উৎপত্তি প্রতীত হয় না। উৎপত্তি না হইলে নিরোধও হয় না; অতএব 'ধর্ম'দিগের উৎপত্তিও নাই, নিরোধও নাই।

বিনা হেতুতে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। স্বভাবতঃ কিছুই উৎপন্ন হয় না। ঈশ্বর যদি জগতের হেতু হন, তবে সেই ঈশ্বর কে? পৃথিব্যাদি ভূতগণই কি ঈশ্বর? অনেক অনিত্য, নিশ্চেষ্ট, অতিক্রমণীয় ও অশুচি দ্রব্য আছে; তাহারাও তাহা হইলে ঈশ্বর হয়। তাহা হইতে পারে না। আকাশও ঈশ্বর নহে, কেন-না আকাশ অচেষ্ট। যদি বল ঈশ্বর অচিন্ত্য, তাহা হইলে তাহার (সৃষ্টি)-কর্তৃত্বও অচিন্ত্য; সুতরাং তাহা অবাচ্য। ঈশ্বরই যদি সৃষ্টিকর্তা হন, তিনি কি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন? আত্মা কি? আত্মাও তো ধ্রুব, অসৃষ্ট। পৃথিব্যাদি ভূতগণ, দিক্‌, কাল ও মনের স্বভাব, ঈশ্বর, জ্ঞেয়োৎপন্ন জ্ঞান—ইহারা সকলেই তো তোমাদের মতে অনাদি, আর কর্ম হইতেই সুখ-দুঃখ হয়। তবে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন কি? কিছুর অপেক্ষা যখন তাঁহার নাই, তখন তিনি সর্বদা সমস্ত সৃষ্টি করেন না কেন? যদি বল, ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ, তাহা ছাড়া সামগ্রী বা সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ আছে, তিনি তাহারই অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণ নহেন। তাঁহাকে সর্বশক্তিমান্‌ বল, সুতরাং তিনি সামগ্রী ও সমবায়ের অপেক্ষা করেন, ইহা বলিতে পার না। ঈশ্বর সমবায়ী কারণের অপেক্ষা করেন বলিলে বলিতে হয় তিনি পরায়ত্ত। স্বেচ্ছায় কার্য করিলেও তিনি ইচ্ছার আয়ত্ত। এতাদৃশ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কোথায়?

'প্রধানে'র (সাংখ্য) অস্তিত্ব নাই, কেন-না এক প্রধানের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন স্বভাব থাকা অসম্ভব। যদি বল ত্রিগুণাত্মক এক স্বভাব না থাকুক, ত্রিস্বভাব তিন গুণ আছে, তাহা বলিতে পার না, কেন-না ত্রিগুণের প্রত্যেকটি ত্রিধা—(ইহা সাংখ্যমতের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা)। কিন্তু এক বস্তুর ত্রি-স্বভাব অযুক্ত। প্রত্যেক বস্তুতে যদি তিন গুণ থাকে তবে অচেতন বস্ত্রাদিতেও তিন গুণ আছে। কিন্তু অচেতন বস্তুতে গুণের ধর্ম সুখ-দুঃখাদি অসম্ভব।

ফল যদি হেতুর মধ্যে থাকে ('সৎকার্য-বাদ' মতে) তাহা হইলে অন্নভোজীও অমেধ্যভোজী (কোন দেহের মধ্যে অন্নের যে পরিণাম হয়, যথা বিষ্ঠা-মূত্রাদি—তাহা অমেধ্য)। কারণের মধ্যে কার্যের অস্তিত্ব আছে যদি বল, তাহা হইলে বস্ত্র না কিনিয়া কার্পাস-বীজ কিনিয়া তাহাই পরিধান কর।

এক ভাব-পদার্থের কল্পনা করিয়া তাহার অভাব গৃহীত হয়। কিন্তু ভাব যখন কল্পনামাত্র তখন তাহার অভাবও মিথ্যা।

কোনও পদার্থ অন্য কিছু হইতে আসে না, তাহারা থাকেও না, যায়ও না; সকলই মায়া, মূঢ়েরাই ইহা সত্য মনে করে। যে বস্তু অন্যের (হেতুর) সন্নিধানবশতঃ দৃষ্ট হয়, এবং তাহার

অভাবে দৃষ্ট হয় না, তাহা পরাধীন-বৃত্তি বলিয়া প্রতিবিম্বের মত কৃত্রিম, তাহার সত্যতা নাই।

শতকোটি হেতু দ্বারাও অভাবের বিকার হয় না, অভাব অভাবই থাকে। অতএব অভাবের বিকার ভাবত্ব প্রাপ্ত হয় না। অন্য কিই বা ভাব হইবে? অভাবকালে যদি ভাব না থাকে, তবে যতক্ষণ ভাব না হয়, ততক্ষণ অভাব অপগত হয় না। আবার অভাব অপগত না হইলেও ভাব হয় না, ভাব কখনও অভাবত্ব প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং কিছুর বিনাশ নাই, কিছুর সত্তাও নাই। এই জগতের উৎপত্তি হয় নাই, সুতরাং বিনাশও নাই।

দেব-মনুষ্যাদি লোকে গতি স্বপ্নোপম। বিচারে তাহা কদলীকাণ্ডের মত নিঃসার প্রতিপন্ন হয়। মুক্ত পুরুষ ও বদ্ধপুরুষের মধ্যে ভেদ নাই।

এবং শূন্যেষু ধর্মেষু কিং লব্ধং কিং হৃতং ভবেৎ?
সৎকৃতঃ পরিভূতো বা কেন কঃ সম্ভবিষ্যতি?

কুতঃ সুখং বা দুঃখং বা কিং প্রিয়ং বা কিমপ্রিয়ম্?
কা তৃষ্ণা কুত্র সা তৃষ্ণা মৃগ্যমাণা স্বভাবতঃ?

বিচারে জীবলোকঃ কঃ, কো নামাত্র মরিষ্যতি?
কো ভবিষ্যতি কো ভূতঃ কো বন্ধুঃ কস্য কঃ সুহৃৎ?

—এইরূপে ধর্মসকল শূন্য প্রতিপন্ন হইলে কিই বা লব্ধ হয়, কিই বা হৃত হয়, কে কাহা কর্তৃক সৎকৃত বা পরিভূত হয়? সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয় কোথায়? স্বভাব ধরিয়া যদি তৃষ্ণার অন্বেষণ করা যায়, তাহা হইলে তৃষ্ণা কি বা কোথায় থাকে? বিচার করিয়া দেখিলে জীবলোক কি? এখানে কেই বা মরে? কে হইয়াছিল? কে হইবে? কেই বা কাহার বন্ধু? এ সমস্তই আকাশের মতো। আমাদের মতো মূঢ় ব্যক্তিরাই এই সকল সত্য মনে করে, এবং কলহে রুষ্ট ও উৎসবে হৃষ্ট হয়।

কিছুরই অস্তিত্ব নাই, দুঃখও নাই; দুঃখভোগীও নাই বলিয়া পরে আবার বলা হইয়াছে, 'অহো এই দুঃখস্রোতে নিমগ্ন প্রাণীদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহারা আপনাদের দুরবস্থা বুঝিতে পারে না, দুঃখের মধ্যে সুখের কামনা করে।'

সুখ নাই, দুঃখ নাই, সুখদুঃখ ভোগ করিবার কেহ নাই, দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব নাই—সকলই শূন্য, ইহাই যদি চরম প্রজ্ঞা হয়, তবে সে প্রজ্ঞার সাধন করিয়া তাহা লাভ করিবে কে? কাহার জন্য কে এই উপদেশ দিতেছে? এই প্রশ্ন স্বতই উত্থিত হয়। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণ (যাহারা কখনও ছিলেন না, এবং এখনও নাই) কাহাদের দুঃখমুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়া ছিলেন ও করেন? ইহার উত্তর—অসংখ্য লোককে নির্বাণলাভে সাহায্য করিতে বোধিসত্ত্ব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনও জীবেরই অস্তিত্ব নাই, বন্ধন-মুক্তিও নাই। বোধিসত্ত্ব ইহা বেশ জানেন। কিন্তু তিনি বিচলিত না হইয়া মায়িক ও অস্তিত্বহীন জীবের মায়িক বন্ধন হইতে মায়িক মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহার পারমিতাদিগের (অর্জিত গুণের) শক্তিতে তিনি কার্য করিয়া যান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুক্তি লাভ করিবার কেহ নাই, মুক্তিলাভে সাহায্য করিবারও কেহ নাই। ইহাই প্রজ্ঞা পারমিতা।

উপরি-উক্ত মতবাদের ভিত্তি বুদ্ধের প্রতীত্য-সমুৎপাদ, যাহাতে অবিদ্যাকেই সংসারের মূল কারণ বলা হইয়াছে। অবিদ্যা-কর্তৃক অভিভূত হইবার কেহ নাই, এবং অবিদ্যা হইতে ক্রমে ক্রমে যে সকল উদ্‌ভূত হইয়া পরিশেষে জরা মরণ শোক প্রভৃতির উৎপত্তি হয় বলা হইয়াছে, তাহারা সকলেই মায়োপম অস্তিত্বহীন শূন্য। যদি ইহাই পরমার্থদৃষ্টি এবং

এই অস্তিত্বহীনতার উপলব্ধিই পরমার্থ সিদ্ধি বা প্রজ্ঞা পারমিতা হয়, তাহা হইলে প্রজ্ঞা-পারমিতাও মায়োপম, তাহাও শূন্যমাত্র। আত্মা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব যদি না থাকে, তবে প্রজ্ঞা-পারমিতা লাভ করিবারও কেহ নাই। পরমার্থ সিদ্ধি যাহাকে বলা হয়, জীবের অস্তিত্ব যদি না থাকে, তবে সে সিদ্ধি লাভ করিবারও কেহ নাই, এবং 'প্রজ্ঞা পারমিতা' সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও বলা হয় নাই বলিতে হয়। অদ্ভুত অবস্থা!

কিন্তু এই সর্বব্যাপী শূন্যবাদ বুদ্ধের মত বলিয়া মনে হয় না। কেন-না তিনি বলিয়াছিলেন: অজাত, উৎপত্তিহীন অপিণ্ডীকৃত একজন (অথবা এক পদার্থ) আছেন। শ্রমণগণ! তাহা যদি না থাকিত—তাহা হইলে জাত, উৎপন্ন ও পিণ্ডীকৃত জগৎ হইতে পরিত্রাণ সম্ভব হইত না অনুভূয়মান জগৎ মিথ্যা, কিন্তু তাহার তলদেশে এক শাশ্বত জগৎ আছে। তাহা অজ্ঞাত, মানুষের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি-গ্রাহ্য নহে। তাহা অনুভূত হয় না, কিন্তু তাহাকে শূন্য বলা যায় না। সমাধি অবস্থায় জগৎ-প্রপঞ্চ অনুপলব্ধ হইলেও তাহার লয় হয় না। সাধকের ব্যক্তিগত সত্তার তখন বিলয় হয় বলিয়া সমাধির অপগমে তিনি তাহা স্মরণ করিতে পারেন না। তখন সাধকের কোন 'ধর্মে'রই উপলব্ধি হয় না। তখন তিনি নিজে শূন্যমাত্রে পর্যবসিত হন। কিন্তু অনুপলব্ধ হইলেও সেই অজাত অস্পষ্ট পদার্থ তখনও বর্তমান থাকে।

এই জ্ঞানই প্রজ্ঞা পারমিতা। ইহাই পরম জ্ঞান।

প্রজ্ঞা পারমিতা

[পরিচয়]

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বহু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ হইয়া যান, এবং তাঁহারা অনেকটা উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বৌদ্ধধর্ম ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্মে অন্ততঃ আঠারোটি সম্প্রদায় দেখা দেয়; তন্মধ্যে চারটি বিশিষ্ট দার্শনিক চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়, যথা বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। শেষোক্ত মাধ্যমিক দর্শনের ভিত্তি 'প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র'; নাগার্জুন (খৃঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতক?) তাহার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। নাগার্জুনের মতানুযায়ী বৌদ্ধদর্শনে জগতে কোন কিছুর সত্তা নাই, সব কিছু মায়িক। পূর্বপক্ষ দ্বারা উত্থাপিত যে কোন মত তিনি যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেন; তবে ব্যাবহারিক জগতে তিনি পুনর্জন্ম, নৈতিক জীবন ও কার্যকারণবাদ স্বীকার করিতেন।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে প্রজ্ঞা (শ্রেষ্ঠ জ্ঞান) লাভের জন্য পারমিতা (শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণরাশি)-র অনুশীলন প্রচারিত হয়। সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে ছয়টি 'পারমিতা' উল্লিখিত: (১) দান, (২) শীল, (৩) ক্ষান্তি, (৪) বীর্য, (৫) ধ্যান ও (৬) প্রজ্ঞা; পালিতে আরও চারটি প্রচলিত: (৭) প্রণিধান, (৮) উপায়-কৌশল্য, (৯) বল ও (১০) জ্ঞান।

বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব জন্মে বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া এই সকল গুণাবলীর অনুশীলন করিয়া শেষ জীবনে সকল গুণের অধিকারী হন। বজ্রযান মতে প্রজ্ঞাপারমিতা বজ্রধর বা বজ্রপাণি বুদ্ধের অভিন্না শক্তি। পরবর্তীকালে এই ভাব-প্রকাশক মূর্তি উদ্ভূত হইয়া উপাসিত হইয়াছিল। বজ্রধর শূন্যের প্রতীক, প্রজ্ঞাপারমিতা করুণার; নিবিড় আলিঙ্গনে করুণা 'শূন্যে'ই মিলাইয়া যায়, এবং শূন্যই চরম তত্ত্ব। বেদান্তের ব্রহ্মমায়া, সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষ ও তন্ত্রের শিবশক্তি-তত্ত্বের সহিত ইহার সাদৃশ্য ও বৈষম্য লক্ষণীয়।—উঃ সঃ।

গুরুমুখে 'বিল্বমঙ্গল'-ব্যাখ্যা

ডক্টর শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ

শিষ্য। গিরিশবাবুর নাটকগুলি আবার পড়ছি।

গুরু। বেশ তো, প্রবন্ধগুলিও পড়ছ তো?

শিষ্য। হ্যাঁ, 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব' সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পড়েছি।

গুরু। এছাড়া আরও কতকগুলি প্রবন্ধ আছে; যেমন 'প্রলাপ না সত্য', 'ধ্রুবতারা', 'দীননাথ,' নিশ্চেষ্ট অবস্থা', 'শান্তি', 'রামদাদা', 'পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ', 'তাও বটে, তাও বটে' ইত্যাদি।

শিষ্য। হ্যাঁ, এর সবগুলি বসুমতী সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে নেই; কিন্তু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে আছে। সবগুলিই পড়েছি। সবচেয়ে ভাল লেগেছে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'।

গুরু। কেন 'নসীরাম', 'কালাপাহাড়'? এ সব নাটকে ঠাকুরের চরিত্র কেমন ফোটানো হয়েছে!

শিষ্য। সে কথা সত্যি। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের চরিত্রে আসক্তির কী নগ্নরূপ! কি বৈরাগ্য! চোখ প্রলুব্ধ করছে, অতএব চোখে কাঁটা বেঁধাও! ঠাকুরকে হৃদয়ে থাকতেই হবে, একথা ঠাকুরকে জোর করে বলা—এর আর তুলনা নেই। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলেছেন, 'আমি এরূপ উচ্চ ভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।'

গুরু। জানো বাবা, 'বিল্বমঙ্গল' আমারও খুব ভাল লাগে। পাড়ার সখের থিয়েটারে 'বিল্বমঙ্গল' অভিনয় হ'ত। আমি 'বিল্বমঙ্গলের' ভূমিকায় অভিনয় করতাম।

শিষ্য। আপনার বেলা 'বিল্বমঙ্গল'-অভিনয় অভিনয় মাত্র নয়। আমার বেলা 'বিল্বমঙ্গল' পড়া শুধুই পড়া।

গুরু। এ কাতরতা কেন বাবা? বিল্বমঙ্গলের যে অনুতাপ, তাতে সব পাপ পুড়ে গিয়েছিল; একথার কি তুলনা আছে—

'ভেবে দ্যাখ্ মন,
কত তোরে নাচায় নয়ন!
ছিলি ব্রাহ্মণকুমার—
বেশ্যাদাস, নয়নের অনুরোধে।
পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে,
ধৈর্য নাহি প্রাণে—
ঘোর নিশা
মহা ঝঞ্ঝাবাতে,
তরঙ্গের সঙ্গে রণ,
রহিল জীবন,
শবদেহ আলিঙ্গনে।
সর্পে রজ্জুভ্রম
হেন অন্ধ করেছে নয়ন!
পুরস্কার—
বারাঙ্গনা তিরস্কার!'

শিষ্য। 'মন, হাসি পায়,—
হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয়,
চ'লে গেলি
এক বাসে গৃহবাস ত্যজি,
'কোথা কৃষ্ণ'? বলি'
হ'লি উতরোলি—
যেন তোর কত প্রেম।
আরে রে পাগল মন,
ধ্যানে মগ্ন বাপীতটে
সাধুর আকার,—

শুনি' কঙ্কণ-ঝঙ্কার
চাহিলি নয়ন মেলি ॥
ছ্যাখ্ পুন নয়নের ছলে
কি উন্মাদ দশা তোর।'

গুরু। বাঃ, তোমার যে সব মুখস্থ দেখছি।

শিষ্য। ঐ মুখস্থ পর্যন্তই।

গুরু। তা কেন, প্রতিটি কথাই তো তোমার বেলাতে খাটে। সকলের বেলাতেই খাটে।

'ভেবে ছ্যাখ্ মন,
কত তোরে নাচায় নয়ন!'

নয়নই তো আমাদের সকলকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। চোখই তো আমাদের নাচাচ্ছে।

'ছিলি ব্রাহ্মণকুমার'—

আমরা প্রত্যেকেই তো ব্রাহ্মণকুমার। কারণ যখনই গোত্রের পরিচয় দিই, তখনই ভরদ্বাজ বা কশ্যপ বা অন্য কোনও ঋষির নাম করি। ঋষি কে? যিনি ব্রহ্ম দর্শন করেছেন—। যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। অতএব আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলাম,—এখন নেই, কারণ

'বেশ্যাদাস, নয়নের অনুরোধে'—

সত্যিই তো বেশ্যাদাস। মনই তো বেশ্যা। একবার 'টাকা টাকা' করছে; একবার 'মান মান' করছে; সব সময়ই চঞ্চল। আর সেই মনের কথাতে উঠছি আর বসছি। সুতরাং বেশ্যাদাস বই কি!

'পিতৃশ্রাদ্ধদিনে,
ধৈর্য নাহি প্রাণে,—

পিতৃশ্রাদ্ধদিন কবে? যেদিন পিতৃপুরুষকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি, সেইদিন পিতৃশ্রাদ্ধদিন। সব দিনই পিতৃশ্রাদ্ধদিন হ'তে পারে। কি ক'রে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রব? পিতৃপুরুষেরা যা ভালবাসেন তাই ক'রে। ঋষিরা কত খাটতেন। সকালে উঠে দূরে বনে চলে যেতেন। ধ্যান ধারণা সারাদিন ক'রে তবে ফিরে আসতেন।

'ঘোর নিশা
মহা ঝঞ্ঝাবাতে'

সংসারে কেবলই ঝঞ্ঝা; কেবলই অন্ধকার। কেবলই বাধা-বিপত্তি; কেবলই সংশয়, অনিশ্চয়তা।

'তরঙ্গের সনে রণ'

সত্যিই তো সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। কূল যে পাওয়াই যায় না, অকূল পাথার!

'রহিল জীবন শবদেহ আলিঙ্গনে'—

শরীরই তো শব; সবই তো নশ্বর। ধন জন মান—যে সবকে আশ্রয় ক'রে বেঁচে আছি, সে সব তো অনিত্য।

'সর্পে রজ্জুভ্রম,
হেন অন্ধ করেছে নয়ন।'—

এও তো সত্যি কথা। যেগুলি অবলম্বন ক'রে আমরা সংসারের বাধা উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করছি—সেগুলি তো সবই বাসনার জিনিস। বাসনার বিষ তো আছেই সাপের মতো। কিন্তু আমরা সেটি কিছুতেই দেখছি না, সুতরাং নয়ন তো সত্যিই অন্ধ।

'পুরস্কার—
বারাঙ্গনা তিরস্কার।'

যে মন আমাকে জীবনভোর নাচিয়ে নিয়ে বেড়ালো, এ জিনিসে সে জিনিসে আসক্ত করালো, সেই মনই জীবনের শেষে হিত কথা বলে, 'কী করতে এসেছিলে ভবে, আর কী ক'রে গেলে!'

'মন হাসি পায়,
হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয়,
চ'লে গেলি
এক বাসে গৃহবাস ত্যজি;
'কোথা কৃষ্ণ'? বলি'
হ'লি উত্তরোলি—
যেন তোর কত প্রেম।'

বিল্বমঙ্গল যে ধিক্কার দিচ্ছেন আমরাও সে রকম ধিক্কার নিজেদের কত সময়ে দিই। এ বিষয়ে দেখবার একটু আছে। মনের বিভিন্ন স্তর আছে। আমরা মনের উপরকার স্তরটা মাত্র দেখে একটা সিদ্ধান্ত ক'রে বসি। নীচেকার স্তরে কী আছে, না আছে—সেটা ভেবে দেখি না। নীচের স্তর যখন উপরে উঠে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে, তখন—

'আরে রে পাগল মন,
ধ্যানে মগ্ন বাপীতটে
সাধুর আকার,—
শুনি' কঙ্কণ-ঝঙ্কার
চাহিলি নয়ন মেলি।
ছ্যাখ্‌ পুন নয়নের ছলে
কি উন্মাদ দশা তোর!'

বিল্বমঙ্গল কত দুঃখে যে একথা বলেছেন, তা আর কী ব'লব! প্রতি সাধক-জীবনেই এই উত্থান-পতন আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

শিষ্য। সাধুতে অসাধুতে তবে তফাৎ কি?

গুরু। খ্রীষ্টান প্রবচন আছে—সাধুর দিনে সাত-বার পতন ঘটে, কিন্তু সাধু আবার ওঠেন। অসাধু পড়েই থাকে। বিল্বমঙ্গল চোখ অন্ধ ক'রে ফেলছেন।

শিষ্য। আমাদের সে তেজ কই? সে পুরুষ-কার কই?

গুরু। কেন, তুমি তো জান তোমার দেহ-মন্দিরে ঠাকুর রয়েছেন। ঝড়ের ধূলো মন্দিরে ঢুকলে মন্দির নোংরা হবে ব'লে দরজা-জানালা যেমন বন্ধ করা হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের সময় কুদৃশ্য কুবাক্য প্রবেশ করলে তোমার হৃদয় অশুচি হবে ব'লে তুমি তো তেমনি চোখ-কান বন্ধ কর। তফাৎ কোথায় বলো?

শিষ্য। এমন ক'রে বলবেন না। আমার কী সেই মন, যে কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু দেখবই না? মনে পড়ে লাটু মহারাজের কথা, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে, চোখে হাত চাপা দিয়ে বলছেন, 'আপনি কুথায়?'—ঠাকুরের সাড়া পেলে তবে চোখ খুলবেন। যেমন বৈরাগ্য তেমনি প্রেম। আমার না আছে প্রেম, না আছে বৈরাগ্য।

গুরু। শোনো বাবা, একটা মজার কথা বলি, শোনো। এই প্রেম, এই বৈরাগ্য তো আমাদের নিজস্ব নয়। এগুলি ঠাকুর আমাদের কাজে লাগাবার জন্য দিয়েছেন। আমরা যদি সেগুলি ঠিকভাবে কাজে লাগাই, তখন মনের উপরকার স্তরের কাজ দেখা যায়। আর যদি না লাগাই, তাঁর জিনিস তিনি ফিরিয়ে নিতে পারেন। তখন মনের নীচেকার স্তরের কাজ দেখা যাবে। সুতরাং প্রেম বৈরাগ্য নেই—একথা শুধু এই হিসাবে সত্য যে এসব আমাদের নিজস্ব নয়। তবু আমরা প্রার্থনা চালাতে পারি, ঠাকুর এগুলি আমাকে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে দাও, এগুলি তুমি ফিরিয়ে নিও না। এটা আমাদের হাতে আছে, এবং এতে আর একটা সুফল এই যে যখন আমাদের প্রেম বৈরাগ্য আমাদের কাজে প্রকাশ পায় তখন অন্যের সে রকম নেই ব'লে আমাদের অহংকার আসে না। বরং কখন আমাদেরও থাকবে না—এই ভয়ে মনে দীনতা জাগে, প্রার্থনা নিরন্তর হয়। শ্রীভগবান মঙ্গলময়। তিনি মঙ্গলই করেন, কখনও সফলতা দিয়ে, আবার কখনও বা বিফলতা দিয়ে। সুতরাং সফলতা বিফল-তার কথা ভাবতে যাব কেন? আমাদের চাই শুধু প্রার্থনা আর নির্ভরতা।

আত্ম-কথা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আমার অন্তর-লোকে আমি মহারাজ—হৃদি সিংহাসনে,
সেথায় আনন্দে আছি শান্ত স্নিগ্ধ প্রীত তৃপ্ত মনে।
বিধাতা বিপুল দানে ব্রহ্মাণ্ড আমার পূর্ণ করিয়াছে,
পার্থিব সুখের মোহ—মনে হয় আজ তুচ্ছ তার কাছে।
কামনা বাসনা যত, আকাঙ্ক্ষা-পঙ্কিল পুঞ্জীভূত লোভ,
অবলুপ্ত আজি সব, মর্মে নাহি মোর অপ্রাপ্তির ক্ষোভ!

পরম সন্তোষে আছি। ভাসে চিত্ত সদা চিদানন্দ-সুখে,
যাচনা ছিল না কিছু, কাঁদি নাই তাই না-পাওয়ার দুখে।
অভাব তো আমাদেরই নিজ হাতে গড়া সাধের পসরা,
যা পেয়েছি তাই নিয়ে সুখে আছি আমি, পূর্ণ মোর ধরা।
আমার ভুবনে একা আমি রাজ্যেশ্বর! অর্থী প্রার্থী নহি;
ঔদাস্যের অট্টহাস্যে ভাগ্যবিড়ম্বনা অনায়াসে বহি।

অপরের দুঃখে আমি ব্যথা পাই বুকে, হাসি না গোপনে,
সৌভাগ্য হেরিলে কারো ঈর্ষা নাহি জাগে, সুখী হই মনে।
নাম, যশ, খ্যাতি, মান, ঐশ্বর্য লালসা মূঢ় অবিদ্যায়,
প্রলুব্ধ করিতে মোরে পারে নাই তার মোহিনী মায়ায়।
নাহি কেহ শত্রু মোর, কারো ভয়ে ভীত নহি কোন দিন;
বসুধা কুটুম্ব জানি, আত্মা অবিনাশী, আমি মৃত্যুহীন।

আমার সম্পদ শুধু জন্মগত পাওয়া জ্ঞান বুদ্ধি মন,
বিবেক সতত মোরে সত্যপথে করে সঞ্চালন;
গুরু কেহ নাহি মোর, নাহি তপোবল, ভক্ত শিষ্য কেহ,
তৃপ্তি নাই ভোগে জানি, ক্ষণিকের মোহ, নশ্বর এ দেহ।
কারো মনে ব্যথা দিয়ে করি না আঘাত অসম্মান আমি,
বিচার করি না কারো দোষ গুণ কিছু,—বিচারক-স্বামী?

এসেছি এ পৃথিবীতে কেন যে জানি না, পাঠালো কে মোরে?
জন্মেছি কোথায়—কবে—কতবার আমি—প্রদোষে না ভোরে?
লোকমুখে শুনি কিছু; জন্ম-ইতিহাস স্মরণে আসে না,
ভালোবাসি সবে তাই, বাসে যেবা ভালো, অথবা বাসে না।
দুদিনের খেলা শুধু খেলিতে এসেছি, যেতে হবে জানি,
আসিবে যে দিন ডাক, সে আদেশ লবো হাসি মুখে মানি।

ভূদেব-সাহিত্য-প্রসঙ্গে

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

সম্প্রতি কিছুকাল থেকে বাংলা দেশে লেখক ও পাঠকেরা প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। বাস্তবিক বিংশ শতাব্দীর বাঙালী ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা ও কবিতার প্রতি যতটা আকর্ষণ অনুভব করে, প্রবন্ধের প্রতি ততটা করে না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ ছিল প্রবন্ধ-সাহিত্য। আর এই প্রবন্ধ-সাহিত্য যাঁদের মনীষার দানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তাঁদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম অবশ্য-স্মরণীয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথনাথ বিশী-সম্পাদিত 'ভূদেব-রচনা-সম্ভারের'[১] পাতা উল্‌টাতে উল্‌টাতে এই বিস্মৃতপ্রায় মনীষীর অনেক কথাই মনে নূতন ক'রে জাগছিল। স্বল্প-পরিসরে সেই কথাগুলিই বলব।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ ভূদেবের দেহান্তের পর লিখেছিলেন : আমি রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের ধারায় বাংলার অত্যুজ্জ্বল ব্রাহ্মণপণ্ডিত-শ্রেণীর শেষ আদর্শ ভূদেববাবুতে দেখিয়াছি। এই ভূদেব হিন্দুকলেজে রাজনারায়ণ বসু ও মধুসূদন দত্তের সহপাঠী। আধুনিক কালের বাঙালী তরুণ ঐ দুজন সহপাঠী সম্বন্ধে অনেক বেশী সচেতন। কিন্তু বাঙালীর মননভূমি-গঠনে ভূদেবের দান যে এঁদের সমতুল্য—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ভূদেবের দৃষ্টি এঁদের চেয়ে স্বচ্ছ এবং প্রসারিত। নিবিষ্টচিত্তে যাঁরা ভূদেবের রচনাবলী পড়েছেন, তাঁরাই ভূদেবের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন যে, ভূদেবের চিন্তাধারা জাতীয় জীবনের সবদিকগুলি সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুসন্ধানী এবং দূরদৃষ্টি সহায়ে ভবিষ্যৎ ভারতবাসীর সমুজ্জ্বল সম্ভাবনা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত।

এই চিন্তাধারার স্পষ্টতঃ দুটি দিক রয়েছে : এক, তাঁর অতীতমুখী জীবনজিজ্ঞাসা। সেখানে তিনি অতীতের মধ্যেই চিরন্তন সত্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন। পিতা ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ এই অতীতের জীবন্ত প্রতিমূর্তি।[২] বলা বাহুল্য, সে দৃষ্টি আধুনিককালের জীবনধারায় অনেকাংশে বিস্মৃত। আর এক, তাঁর ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গী—যে দৃষ্টিতে তিনি ভারতবাসীর সমগ্র জীবন-যাপনকে একটি শৃঙ্খলাসূত্রে আবদ্ধ ক'রে শান্ত-চিত্তে ভবিষ্যৎ নেতার আর্বির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষারত। অতীতে-ভবিষ্যতে অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র স্থাপনাই ভূদেবের প্রতিভার পরিচায়ক।

* * *

মধুসূদনের ধর্মান্তর-গ্রহণ-সংবাদে বন্ধু ভূদেব স্বাভাবিকভাবেই মর্মাহত হয়েছিলেন। বোধ করি, এই ধর্মান্তরগ্রহণের মধ্যে ধর্মপিপাসার কোন পরিচয় না পেয়েই তিনি আহত হয়ে থাকবেন। রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম হয়েছিলেন, কিন্তু তখন অবধি ব্রাহ্মেরা মনে-প্রাণে হিন্দু। তাই রাজ-নারায়ণের সঙ্গে একবার ভূদেব 'পিতৃভূমি' কনৌজ ঘুরে এসেছিলেন। কিন্তু স্বধর্মত্যাগী মধুসূদনের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েও তাঁর প্রতি পূর্বপ্রসন্নতা ফিরে পাননি। এদিক থেকে রাজনারায়ণ আরও উদারচিত্তের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং একথা বুঝেছিলেন যে ধর্মান্তরিত হলেও মধু-

১। প্রকাশক—শ্রীপ্রবোধকুমার পাল। অমরসাহিত্য প্রকাশন।

২। দ্রষ্টব্য—'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের উৎসর্গপত্র।

সূদনের অন্তরের সংস্কার হিন্দু ঐতিহ্যেই পরিপূর্ণ।[৩] অবশ্য রাজনারায়ণ এবং ভূদেব সে ঐতিহ্যের সচেতন উত্তরাধিকারী। ভূদেবের ক্ষেত্রে এই ঐতিহ্যের অনুভব গভীরতর। নিজেকে তিনি সুপ্রাচীন বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ বলে গৌরব অনুভব করতেন। অথচ মুসলমান ধর্ম ও ধর্মগুরু মহম্মদ সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধাও আন্তরিক। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, এই হ'ল যথার্থ ভারতীয় ঐতিহ্য। আন্তরিক ধর্মপিপাসা আমাদের কাছে চিরকাল শ্রদ্ধেয়।

ভূদেব-মানসের একটি প্রধান সূত্র মেলে তাঁর ছাত্রজীবনের একটি ঘটনায়: "রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদের পড়াইতেন। আমি যেদিন প্রথম ভর্তি হইলাম, সেইদিন রামচন্দ্র বাবু ভূগোল পড়াইবার সময় পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজী-ওয়ালা মাত্রেই বিশেষতঃ ইংরাজী-শিক্ষকেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে বড় ভালবাসেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্রবাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল; কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করবেন না।' আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটির পর বাড়ী আসিলাম। কাপড়চোপড় ছাড়িতে দেরী সহিল না, একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা! পৃথিবীর আকার কি রকম! তিনি বলিলেন, 'কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল' এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুঁথি দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, 'ঐ গোলাধ্যায় পুঁথিখানির অমুক স্থানটি দেখ দেখি।' আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম, তথায় লেখা রহিয়াছে—'করতলকলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলম্।' বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে ঐটি টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্রবাবুকে বলিলাম, 'আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা তো পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন; এই দেখুন তিনি বরং এই শ্লোকটি আমাকে পুঁথিমধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।' রামচন্দ্রবাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, কথাটি বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল; তা তোমার বাবা বলবেন বৈ কি; তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।"[৪] এই ঘটনাটি ভূদেবের পরবর্তী জীবনের পথনির্দেশক। অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে গিয়ে ভূদেব কোথাও চরম রক্ষণশীল, আবার কোথাও কোথাও আশ্চর্য প্রগতিবাদী—এই মনোভাবের মূলও ঐ ঘটনায় নিহিত।

সংক্ষেপে ভূদেবের জীবনবৃত্তটি এই রকম: ১৮২৭ সালে ২২শে ফেব্রুআরি ভূদেবের জন্ম। প্রধান শিক্ষাস্থল—হিন্দু কলেজ, কিন্তু প্রধান শিক্ষাগুরু তাঁর বাবা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। ভূদেবের সত্যিকার শিক্ষা তাঁর কাছেই। দীক্ষাগুরু ভূদেবের আপন জননী; ছাত্রজীবনে বরাবর তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে অগ্রসর হন; কর্মজীবনে শিক্ষকতা অবলম্বন ক'রে ক্রমে ক্রমে স্কুল ইনস্পেক্টর হন। চাকরির পাশাপাশি সমান্তরালভাবে গ্রন্থ রচনা ও সাময়িক পত্র পরিচালনা চলতে থাকে। 'শিক্ষাদর্শন' ও 'সংবাদসার' এবং 'এডুকেশন

৩। আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু।

৪। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পত্র—যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত (৩য় সং) পৃ ৬৬৬।

গেজেট' ও 'সাপ্তাহিক বার্তাবহ' তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। 'এডুকেশন গেজেট' বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্মরণীয় পত্রিকা।

ভূদেব-সাহিত্যের প্রধান গুণ চিন্তাশীলতা এবং প্রধান কাজ চিন্তা-উদ্দীপন। একদিকে তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও অসাধারণ মনন-শক্তির নিদর্শন-স্বরূপ প্রবন্ধাবলী—'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ও ২য়) এবং রূপকাকারে লেখা 'পুষ্পাঞ্জলি'; আর একদিকে তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনার অভিনব প্রকাশ—'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' এবং ভাবী উপন্যাস-সাহিত্যের সূচনা 'সফলস্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'।

'পুষ্পাঞ্জলি'-তে কতিপয় তীর্থ-দর্শন উপলক্ষ্যে ব্যাস-মার্কেণ্ডেয়-সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্যকথন রয়েছে। বিভিন্ন তীর্থ দর্শনের মধ্য দিয়ে ভূদেব আমাদের জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। ব্যাসদেব একদিন ধ্যানে এক অপূর্বমূর্তি দর্শন ক'রে মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের কাছে সেই মূর্তির স্বরূপ জানতে চান। এ প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয় তাঁকে নানা তীর্থে নিয়ে গেলেন, কুরুক্ষেত্র থেকে দ্বারাবতী, সেখান থেকে কুমারিকা হয়ে কামাখ্যা। কামাখ্যায় এসে তিনি ব্যাস-দেবকে বললেন, 'এক্ষণে তোমার ধ্যানপ্রাপ্ত দেবীমূর্তির প্রদক্ষিণ সহকারে দর্শনলাভ হইল।' পাশ্চাত্য আদর্শের জাতীয়তা না থাকলেও সমগ্র ভারত যে সুপ্রাচীনকাল থেকেই সাংস্কৃতিক ঐক্যে বিধৃত—এ কথাটি ভূদেব বারংবার তাঁর পাঠকবর্গকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। ডিরোজিওর যুগের পর ভারতভূমির সামগ্রিক ধ্যানচেতনা আরও কত গভীর হয়েছে, ভূদেবের রচনাবলী তার উদাহরণ।

'পারিবারিক প্রবন্ধে'র সূচনায় ভূদেব লিখেছেন: "আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা আমার চক্ষে ভাল লাগিয়াছে। যেজন্য এবং যেরূপে ভাল লাগিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি প্রবন্ধগুলিতে মনের কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারিয়া থাকি, তবে স্বজাতীয় অন্য ব্যক্তির মনেও স্ব স্ব পারিবারিক অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হইতে পারিবে, এবং তাহা বোধ হইলে এই পরাধীন, হীনবীর্য, অবজ্ঞাত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ, উপাসনাপ্রণালীই বল, আর ধর্মপ্রণালীই বল, সামাজিক প্রণালীই বল, আর শাসনপ্রণালীই বল, এক পারিবারিক ব্যবস্থাই সকলের নিদানীভূত। আমাদের পারিবারিক সুখ অধিক—এটি নিতান্ত অল্প কথা নয়; যদি পারিবারিক সুখ অধিক, তবে ধর্মও অধিক এবং ধর্ম অধিক থাকিলে কখন না কখন অবশ্যই মহিমাশালিতাও জন্মিতে পারে।"

ভূদেব কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে এই পারি-বারিক জীবনসত্যকে দেখেছেন, তা লক্ষণীয়। বর্তমানে ভাঙনের মুখে পারিবারিক স্থিতি প্রায় অন্তর্হিত, অথচ ব্যক্তি ও সমাজ এই পরিবারের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। ভূদেব তাঁর 'পারিবারিক প্রবন্ধে' বাল্যবিবাহ থেকে আরম্ভ ক'রে বানপ্রস্থ অবধি সর্ববিষয়ে এদেশের পারি-বারিক জীবনের ঐতিহ্যের সঙ্গে বাস্তব জ্ঞানের সংমিশ্রণে একটি আদর্শ পারিবারিক বিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনা করেছেন। অবশ্য বাল্যবিবাহের স্বপক্ষে বা বিধবাবিবাহের বিপক্ষে তাঁর মত বিদ্যাসাগরের দ্বারাই ভালভাবে খণ্ডিত, তবু সংসারে সম্প্রীতি স্থাপনের যে সব পন্থা তিনি নির্দেশ ক'রে গেছেন, আজকের দিনেও তারা আমাদের অনুধাবনযোগ্য। মাঝে মাঝে প্রবন্ধ-প্রান্তে তিনি কাল্পনিক কথোপকথন দিয়ে তাঁর বক্তব্য মনোজ্ঞ ক'রে তুলেছেন। এই পরিবার-বন্ধনের গুরুত্বকে তিনি কতখানি মূল্য দিতেন

তার পরিচয় আছে 'ধর্মচর্চা' প্রবন্ধটিতে। গৃহস্থাশ্রমের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে ভূদেব আমাদের গৃহধর্ম সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছিলেন। তাই 'পারিবারিক প্রবন্ধে'র সৃষ্টি।

কিন্তু 'আচারপ্রবন্ধ' বর্তমান জীবনধারার সঙ্গে প্রায় অসম্পৃক্ত। বস্তুতঃ কৃষিপ্রধান মধ্যযুগের জীবনধারার সঙ্গে আধুনিক পরিবর্তনশীল যন্ত্রযুগের জীবনধারার পার্থক্য এত বেশী যে সনাতন আচার-পদ্ধতির অনেকাংশই এ যুগে অচল। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে আচারহীনতাই কোন উন্নতির মাপকাঠি নয়। ভূদেবের ভাষায়—'সদাচারের মূল ধর্ম। ধর্ম অর্থে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপালন।' সদাচারের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা আলোচনা ক'রে ভূদেব দেখিয়েছেন যে এর দ্বারা ব্যক্তির কর্মক্ষমতা বাড়ে, স্বভাব সংযত হয়, শরীর ও মনের উৎকর্ষ হয়, রিপুসংযম হয়। এক কথায় ভূদেবের দৃষ্টিতে আচার-সাধনের অর্থ মনুষ্যত্ব-সাধন। কিন্তু নবযুগের উপযোগী ক'রে আচার সৃষ্টি করার প্রয়োজন ভূদেব খুব কম ক্ষেত্রেই অনুভব করেছেন, তাই 'আচার প্রবন্ধ' অনেকটা ঐতিহাসিক কৌতূহল মেটায় মাত্র।

ব্যক্তিগত আচার-নিষ্ঠা, পারিবারিক সম্প্রীতি ও সামাজিক ঐক্যচেতনা—এ তিনের সম্মেলনে পূর্ণাঙ্গ জাতীয়তার সৃষ্টি। 'সামাজিক প্রবন্ধে' ভূদেব প্রাচীন সমাজব্যবস্থার অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ অনুসরণ করেছেন, আবার নূতন জাতিগঠনের উপযোগী দূরদৃষ্টিরও পরিচয় দিয়েছেন।

ভূদেবের দৃষ্টিতে হিন্দু সমাজব্যবস্থার উদ্দেশ্য সুখের অন্বেষণ নয়, 'শান্তি'-র অন্বেষণ। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য: "বস্তুতঃ আজিকালি ইংরাজদিগের হিতবাদ এবং জর্মনদিগের অনুশীলনবাদ শিখিয়া ইংরাজীশিক্ষিত নব্যদল বুঝিয়াছেন যে, সুখই জীবনের উদ্দেশ্য। সুতরাং শান্তিতে এবং সুখেতে আমি যে প্রভেদ আছে বলিলাম, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা বলিতে পারেন—শান্তি কিসের জন্য। উহাও সুখের জন্য। আমি বলি শান্তি শান্তির জন্য।"[৫] হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে ভূদেবের ধারণা কত উচ্চ ছিল তার নিদর্শন—"হিন্দুসমাজ বড়ই উচ্চ পদার্থ; যে ইহার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ। এই সমাজ পৃথিবীর অপর সকল সমাজ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক শক্তির অধীন, সুতরাং ইহাতে উপদেষ্টা যাজকবর্গের প্রাধান্য। উপদেষ্টার প্রাধান্য সংযম ও বিদ্যাবত্তার উৎকর্ষে; অতএব ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সংযমশীল ও বিদ্যাবান্ করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর, সকল শুভফল ফলিবে এবং হিন্দুসমাজের সম্যক্ বলবত্তা জন্মিবে।"[৬] উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটি সম্বন্ধে বলা যায় যে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের উন্নয়নের দ্বারা যদি জাতির উন্নতি হ'ত তাহলে ভারতবর্ষের এই অধঃপতন হ'ত না। বিদ্যা বা অর্থ কোন শ্রেণীবিশেষের করায়ত্ত হ'লেই পরিণামে অকল্যাণকর হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সমস্যা ব্রাহ্মণের উন্নতির সমস্যা নয়। সমগ্র জাতির উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। তবে ব্রাহ্মণের শ্রেয় আদর্শগুলি আজও জাতির পক্ষে সশ্রদ্ধচিত্তে বিবেচনার যোগ্য।

হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভূদেব কি বিরাট আশা পোষণ করতেন, তার প্রমাণ: "যদি সত্য অসত্য হইতে বলবান, অস্বার্থপরতা স্বার্থপরতা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবিশুদ্ধ ভাবমার্গ হইতে উৎকৃষ্ট হয়, তবে হিন্দুসমাজ অবশ্যই উহার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, ভারতবর্ষীয় অপরাপর সকল সমাজগুলিকে আত্মসাৎ করিবে এবং ইউরোপথণ্ডাদি পৃথিবীময় প্রকৃত জ্ঞানের এবং ধর্মের আলোকে বিকীর্ণ করিবে। বেকন,

। সুখ ও শান্তি—বিবিধ প্রবন্ধ (২য়)।

৬। সমাজ সংস্কার (বিবিধ প্রবন্ধ—২য় ভাগ)।

ডেকার্ট, কাণ্ট প্রভৃতিরা যে পর্যন্ত জ্ঞানমার্গ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্রের জ্যোতিঃ তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিবে এবং হিন্দু—চীন, জাপান প্রভৃতি এশিয়াখণ্ডকে যেমন ধর্মজ্যোতি দিয়াছে—তাহা অপেক্ষাও বিশুদ্ধতর, তীব্রতর, রমণীয়তর জ্যোতি ইউরোপে বিকীর্ণ করিবে।"[৭] এ যেন স্বামী বিবেকানন্দের ইউরোপ, আমেরিকা বিজয়ের পূর্বাভাষ। অবশ্য স্বামীজী আরও এগিয়ে বলেছেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" কিন্তু ভূদেব শাস্ত্র ও সমাজকে এক ক'রে ফেলেছেন। হিন্দুশাস্ত্রের উদারতা যদি হিন্দুসমাজে থাকত, তাহলে অনায়াসেই সে সমাজ পৃথিবীর আদর্শসমাজরূপে গণ্য হ'ত। অসংখ্য বিভেদের অর্থহীন জালে বিজড়িত সমাজ আজ অবধি অচল হয়ে আছে শাস্ত্রের উদার উপলব্ধিকে জীবনে প্রতিফলিত না করার অপরাধে। হিন্দুর অধ্যাত্ম-আদর্শ সম্বন্ধে ভূদেবের কল্পনা অবশ্য সত্য হতে চলেছে।

'সামাজিক প্রবন্ধে' ভূদেব ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ও জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। জাতীয়তাবোধের জায়গায় ভূদেব 'জাতীয়ভাব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কেমন ক'রে ভূদেবের অন্তরে জাতীয়ভাবের প্রেরণা জাগে সে ইতিহাস তিনি অন্যত্র বলেছেন, —"যখন হিন্দু কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতির মধ্যে স্বদেশানুরাগ নাই। কারণ, ঐ ভাবার্থপ্রকাশক কোন বাক্যই কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় নাই। তাঁহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাসনিবন্ধন মনে মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখানুভব করিয়াছিলাম। তখন 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থ হইতে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক বিবরণ জানিতাম। কিন্তু সেই বিবরণ জানিয়াও শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রকৃত উত্তর অথবা আপন মনকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়াছি যে, আর্যবংশীয়দিগের চক্ষুতে বায়ান্ন পীঠসমন্বিত সমুদয় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বরী-দেহ।"[৮]

ভারতবর্ষের এই মনোময়ী মূর্তি ধ্যান ক'রে ভূদেব হিন্দুসমাজ ও অন্যান্য সমাজের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন—হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজব্যবস্থায় মানব-প্রকৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে।[৯]

হিন্দুসমাজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে অপরাপর সমাজের সদ্‌গুণগুলি আমাদের গ্রহণীয়। 'জাতীয়ভাব' সম্বন্ধে ভূদেবের বিশ্লেষণের জন্য 'সামাজিক প্রবন্ধে'র উপসংহারটুকু লক্ষণীয়: "জাতীয়ভাবটি হৃদয়োন্নতি-সোপানের একটি প্রশস্ত ধাপ। (১) নিজের প্রতি অনুরাগ; (২) নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ; (৩) বন্ধু-বান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ; (৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ; (৫) নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ। এই পাঁচটি ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া তবে (৬) স্বজাতিবাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায় প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্যন্ত। আবার পর্যায়ক্রমে ইহার উপরে (৭) স্বজাতি হইতে অনধিকার ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ—অগষ্ট কোম্‌তের মতানুযায়ীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্যন্ত। (৮) মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ—সরলমনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা। (৯) জীবনমাত্রের

৭। সমাজ সংস্কার (বিবিধ প্রবন্ধ—২য় ভাগ)।

৮। অধিকারী-ভেদ ও স্বদেশানুরাগ—ঐ।

৯। সামাজিক প্রকৃতি—হিন্দু এবং অপরাপর সমাজ (সামাজিক প্রবন্ধ)।

প্রতি অনুরাগ—বৌদ্ধদিগের এই সীমা। (১০) সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ—ইহাই আর্যধর্মের সর্বোচ্চ আসন—আর্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচরে আত্মনিমজ্জন করিতে চাহেন।······ভারতবাসী 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরজাতিপীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটি মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন,—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।"

অন্তরে অন্তরে ভূদেব একজন জাতীয় নেতার আবির্ভাব-প্রতীক্ষায় ছিলেন—যে নেতার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ আপন স্বধর্মের বৈশিষ্ট্যে জগৎ-সভায় আসন ক'রে নেবে। অতীত ও বর্তমানের সামঞ্জস্যসাধক এবং ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা সেই নেতার প্রয়োজন যে কতখানি এবং সে নেতার আদর্শ কেমন হবে সেকথা ভূদেব 'সামাজিক প্রবন্ধে'র 'নেতৃপ্রতীক্ষা'-অধ্যায়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতিটি ভারতবাসীকেই এই নেতার আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বস্তুতঃ স্বামীজী ও গান্ধীজীর মধ্য দিয়ে এই নেতৃশক্তিরই প্রকাশ ঘটেছিল। সুভাষচন্দ্রে সেই নেতৃশক্তির সাম্প্রতিকতম প্রকাশ। ভারতবাসীর উন্নতি যে ভারতীয় নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে ভারতীয় আদর্শের দ্বারাই হবে—এ কথা 'নিমচাঁদে'র ট্র্যাজেডির পর ভূদেব ভাল করেই বুঝেছিলেন।

ইংরেজ রাজপুরুষদের নিকট-সান্নিধ্যে ভূদেবকে অনেকবার আসতে হয়েছে। কিন্তু ভূদেব ইংরেজের রাজমহিমায় কখনও অভিভূত না হয়ে আপন ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা এমন সৌম্যগাম্ভীর্যের সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন যে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা তাঁকে রীতিমত শ্রদ্ধা করতেন। ভূদেব মনে করতেন যে, ইংরেজের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান এবং উদ্যমশীলতা ছাড়া আর কিছুই আমাদের গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি মনে মনে বেশ জানতেন যে, আসলে ইংরেজেরা একটি 'যানে'র মধ্য থেকে ভারতভ্রমণ করে, "ঐ যান কাষ্ঠনির্মিত নয়, উহা অহঙ্কার দাম্ভিকতা পরজাতির প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষে বিনির্মিত, উহা চর্মচক্ষুর অগোচর পদার্থ—ইংরাজ উহারই ভিতরে বসিয়া সকল দেশে ভ্রমণ করেন এবং ভারতবর্ষে চাকুরি করিয়া ঘরে ফিরিয়া যান।"[১০] "ইংরাজকৃত যাবতীয় কার্যের হাড়ে হাড়ে যে স্বার্থপরতা মিশাইয়া থাকে তাহা তাঁহার অনুমোদিত স্বাধীন বা শুল্কবিহীন বাণিজ্য-প্রণালীর ইতিবৃত্ত এবং তদ্বিষয়ক বিচার-প্রণালীর পর্যালোচনার দ্বারা অতি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়।"[১১]

উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনগুলি উচ্চবর্ণের সমস্যা সমাধানেই নিয়োজিত। জাতিভেদের মত সর্বনাশা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন বা আলোচনা খুবই কম। ভূদেব জাতিভেদের পক্ষপাতীই ছিলেন। বিভিন্ন জাতির মধ্যে কর্মবিভাগের সুবিধা এবং বিদেশীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রাচীরের মত বাধাসৃষ্টি—এই দুদিক থেকে ভূদেব জাতিভেদের সুবিধার দিকটাই দেখেছেন। এ বিষয়ে রাজনারায়ণ, দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব প্রভৃতির চেয়ে স্বামী বিবেকানন্দ অগ্রগামী। জাতিভেদের অসঙ্গতির অবসান যে একান্ত প্রয়োজন এবং গণশক্তির অভ্যুত্থানেই যে জাতির মঙ্গল—একথা

১০। হিন্দুসমাজ ও কূপমণ্ডুকতা—বিবিধ প্রবন্ধ (২য়)

১১। স্বাধীন বা অবাধ বাণিজ্য—বিবিধ প্রবন্ধ (২য়)

বিবেকানন্দের মত স্থির প্রত্যয়ের সঙ্গে তখন আর কেউ উপলব্ধি করেন-নি।

জাতিভেদের সমর্থনে ভূদেব কোম্‌তের মতামত উদ্ধৃত করেছেন।[১২] কিন্তু কোম্‌ত ও ভূদেবের সমর্থন সত্ত্বেও জাতিভেদের দিন আজ অবসানপ্রায়। জন্মগত জাতিভেদ সর্ব অবস্থায় নিন্দনীয়। কিন্তু কর্মগত বিভাগ যে জাতির পক্ষে কল্যাণকর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে সে বিভাগ অনেকটা আপনা থেকেই হয়ে যায়! কোম্‌তের মতামত কিন্তু ভূদেব অন্যত্র বিশেষ গ্রাহ্য করেন-নি। বিশেষতঃ জাতীয়তা এবং মানবতাপূজা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা অন্যধরনের ছিল। এ বিষয়ে 'সামাজিক প্রবন্ধের' উপসংহার এবং কবি হেমচন্দ্রের সঙ্গে 'দশমহাবিদ্যা'-সম্পর্কে ভূদেবের পত্রালাপ দ্রষ্টব্য।

বাঙালী সংস্কৃতির পটভূমিতে যুগযুগান্ত থেকে তন্ত্রের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। উনিশ শতকের মনীষীদের মধ্যে ভূদেবই তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'রাজা রামমোহন রায় ও তন্ত্রশাস্ত্র' প্রবন্ধটি এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা। রামমোহন ও পরবর্তী ব্রাহ্মসমাজ মহানির্বাণতন্ত্রকে কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনার ইচ্ছা আছে। এ প্রবন্ধে শুধু ভূদেবের অনুসরণে রামমোহনের সাধনপ্রণালীতে মহানির্বাণতন্ত্রের আদর্শের প্রভাব দেখাবার জন্য একটু উদ্ধৃতি দিই:

পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জনে।
সর্বত্র সর্বকালেষু সাধয়েদ্‌ব্রহ্মসাধনম্‌॥
অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভুক্তো বাপি বুভুক্ষিতঃ।
পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্মলমানসঃ॥

রামমোহন-রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত পাঠক-মাত্রেই উদ্ধৃত অংশটির প্রতিফলন রামমোহনের রচনায় দেখতে পাবেন।

তন্ত্রসাধনার পরবর্তী ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গসমাজের বিবরণ'[১৪] প্রবন্ধে ভূদেব লিখেছেন: "রাজা রামমোহন রায়ের পর শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাবই প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। ইনি অতি সরল ভাষায় হিন্দু মতবাদের শাস্ত্রসম্মত সামঞ্জস্য করিয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহার প্রকৃত অর্থ তাঁহার নিজের জীবনচরিত হইতে বুঝিয়া যদি প্রকৃত তান্ত্রিক সাধনায় বাঙ্গালী ভক্তিপূর্বক রত হয়, তাহা হইলে আবার সমাজমধ্যে একাগ্রচিত্ত, উদ্যমশীল, নির্ভীক, কর্মঠ ও ধার্মিক লোকের বৃদ্ধি অবশ্যই হইবে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শের প্রতি ভূদেবের এই আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁর গভীর মনন-শক্তির পরিচায়ক।

এতক্ষণ আমরা ভূদেব-চিন্তাধারার বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। মৌলিক চিন্তাশক্তি, যুক্তিনিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী, বিস্তৃত অধ্যয়ন ও মনন—এই সব কয়টি গুণ প্রবন্ধকার ভূদেবের ছিল। সেইসঙ্গে তিনি যথার্থ সাহিত্য-রসিক। বাংলা উপন্যাসের সূচনায় তাঁর দান আছে এবং সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় ভূদেবের উত্তরসূরী বিদ্যাসাগর। 'এডুকেশন গেজেটে' ভূদেব 'উত্তরচরিত', 'রত্নাবলী' ও 'মৃচ্ছকটিক' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে 'বিবিধ-প্রবন্ধ (১ম)' নামে প্রবন্ধ কয়টি প্রকাশিত হয়। ভূদেবের সাহিত্য-সমালোচনায় সাহিত্যতত্ত্বের চেয়ে ভারতীয় আদর্শই বেশি ফুটেছে। নব্য হিন্দুয়ানির স্রোতে

১২। জাতিভেদ—ঐ।
১৩। বিবিধ প্রবন্ধ (২য়)।
১৪। বিবিধ প্রবন্ধ (২য়)।

'আর্যামি'র দিকে তখনকার দিনে যে ঝোঁক দেখা দিয়েছিল, ভূদেবের এই সমালোচনাগুলির মধ্যেও তার প্রভাব দেখি। এ দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তরালেও যে মৌলিক চিন্তা আছে তা 'মৃচ্ছকটিকে'র আলোচনার শেষাংশ উদ্ধৃত করলেই স্পষ্ট হবে। —"মৃচ্ছকটিক-নাটকে যে সকল পাত্রের উল্লেখ আছে তাহাদিগের মধ্যে প্রধান দুইজনের চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া সাত্ত্বিক এবং রাজস, হিন্দু আর্য এবং ইউরোপীয় আর্য, এতদুভয়ের মধ্যে যে চিন্তাদর্শ সম্বন্ধীয় লৌকিক ভেদ জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ইউরোপীয় পুরুষ সাহস, নির্ভীকতা এবং স্বৈরাচারকে বীরস্বভাবের প্রধান উপকরণ মনে করেন। তাঁহার মতে যুদ্ধবীরই বীর! সংস্কৃত গ্রন্থকার সাহস এবং নির্ভীকতার গৌরব করিয়াও উহাদিগকে বীরভাবের অতি গৌণ উপাদানই মনে করেন। তাঁহার চক্ষে বীর দেখিতে হইলে দানবীর, সত্যবীর, দয়াবীর, ক্ষমাবীর, ধৈর্যবীর প্রভৃতি প্রথমে উদিত হয়—যুদ্ধবীর সকলের পশ্চাদ্ভাগে আইসেন।" ভারতীয় Heroic Age (ক্ষাত্রযুগ) ও ইউরোপীয় Heroic Age-এর মূল পার্থক্য এখানে সুবিশ্লেষিত।

এই ভারত-গৌরবের অনুভূতিই ভূদেবকে কথাশিল্পের ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছিল। বাংলা উপন্যাসের সূচনার ইতিহাসে ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এর ভূমিকায় ভূদেব লিখেছেন: "গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার প্রথমটির সহিত দ্বিতীয়টির কোন সম্বন্ধই নাই। উভয় উপন্যাসেই রাজ্য সম্বন্ধীয় যে সকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাসমূলক। অপরাপর যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহার কোন কোন অংশমাত্র ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও সর্বতোভাবে প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য নহে।"

ভূদেবের 'সফলস্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাস হিসাবে খুব উঁচুদরের রচনা নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বঙ্কিমের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে পরিণত শিল্পরূপ আমরা দেখতে পাই ভূদেবের এ রচনা দুটি তার শুভসূচনা। কৌতূহলী পাঠক মূলগ্রন্থ পড়ে এর কাহিনীরস উপভোগ করতে পারেন। বর্তমান প্রবন্ধে আর স্থানবিস্তার অসম্ভব। 'সফলস্বপ্ন' অতি ছোট কাহিনী। সে তুলনায় 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' ছোট হলেও বীজাকারে উপন্যাস। ইতিহাসের সার্থক পটভূমি-রচনায়, চরিত্র-সৃষ্টির নৈপুণ্যে এবং ঘটনা সমাবেশের কৃতিত্বে ভূদেবের প্রতিভার স্বাক্ষর 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' সুস্পষ্ট। পরবর্তীকালে প্রবন্ধ সাহিত্যে বিশেষভাবে মন না দিলে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য তাঁর দ্বারা আরও সমৃদ্ধ হ'ত।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে ভূদেব-সাহিত্যের রূপরেখা দেবার চেষ্টা করলাম। এই প্রবন্ধে মনস্বী ভূদেবকে তাঁর নিজস্ব চিন্তার মধ্য দিয়েই দেখবার চেষ্টা করেছি। বর্তমান বাংলার সাহিত্যিকেরা মতামতের দিক থেকে যতই ভিন্নপন্থী হন না কেন, ভূদেবের মৌলিক চিন্তাশক্তি, অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও গভীরসন্ধানী বিচারশক্তির আদর্শ গ্রহণ করলে বাংলাসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধি পাবে—এই আমাদের বিশ্বাস।

প্রাচীন ভারতের শ্রমিক

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

[লেখক অবসরপ্রাপ্ত লেবার অফিসার, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছিল শ্রমিকদের পারিশ্রমিক, সুবিধা, অবসর, পারিবারিক আয়ব্যয়, সংরক্ষণ-তহবিল। উদ্বোধন, আষাঢ়, ১৩৬৪, পৃষ্ঠা ৩০২—৩ দ্রষ্টব্য। উঃ সঃ।]

শ্রমিকদের বাসগৃহ

আজকাল শ্রমিকদের বাসের জন্য যে সকল গৃহ নির্মাণ করা হইতেছে তাহাতে দুইটি জিনিসের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়: (ক) কত কম ব্যয়ে বাসগৃহ নির্মিত হইতে পারে। (খ) বৃষ্টি,ঠাণ্ডা ও রৌদ্র হইতে কিভাবে শ্রমিকগণ রক্ষা পাইতে পারে। অর্থাৎ অর্থ ও শরীরের দিকটাই কেবলমাত্র দেখা হয়। ইহা ছাড়া আরও যে অধিকতর আবশ্যকীয় একটি দিক আছে, সে সম্বন্ধে বিশেষরূপে নজর দেওয়া হয় না। ইহা পারিবারিক সুখশান্তি; এই সকল গৃহে বাস করিলে কি করিয়া তাহা অক্ষুন্ন থাকিবে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় না।

কৌটিল্য শ্রমিকদের বাসগৃহ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এরূপভাবে গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে যে শ্রমিকরা বৃষ্টি ও বাতাস হইতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা পায়, অর্থাৎ বৃষ্টির জল ভিতরে না পড়ে এবং বাতাসে ঘরের চাল যাহাতে ঝাঁকিয়া, ভাঙিয়া বা উড়িয়া না যায় তাহা দেখিতে হইবে ও দরমা-জাতীয় কোন বস্তু চালের উপর ঢাকা দিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থা না থাকা দণ্ডনীয়।

তিনি আরও বলিয়াছেন: একজন শ্রমিকের ঘরের জানালা বা দরজা অন্য জনের ঘরের সামনা-সামনি নির্মাণ করা দণ্ডনীয়। তবে দুইটি বাস-গৃহের মধ্য দিয়া যদি কোন রাস্তা থাকে, তবেই ঐরূপ নির্মাণ করা চলিতে পারে।

ইহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে পূর্বে পারিবারিক গোপনীয়তার (Privacy) ও সুখশান্তির দিকে যথেষ্ট নজর রাখা হইত। আজকাল এক লাইনে কতকগুলি ঘর নির্মাণ করা হয়, ও তাহাদের সামনে এক লম্বা বারান্দা থাকে। ইহার ফলে, অবাধে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাতায়াত করা যায়। শ্রমিকরা এখনও এত শিক্ষিত ও সঙ্কয়ী হয় নাই যে জানালা-দরজায় পরদা ব্যবহার করিবে। আজকালকার শ্রমিকদের বাসগৃহ-নির্মাণপ্রথায় অবাধ মেলামেশার সুযোগ ঘটায় অনেক সময়ই পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয়। শ্রমিকদের মধ্যে সুরাপান এখনও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই। সুরাপান একটি সংক্রামক জিনিস। নিকটে একজন সুরাপান করিলেই অন্যজন ঐ কার্যে আকৃষ্ট হয়। এইভাবে এক লাইনে বাসগৃহ নির্মাণ করার ফলে যদি পারিবারিক সুখশান্তির অভাব হয়, তাহা হইলে অর্থ উপার্জনের ফল কি ?

শ্রমিকদের মজুরী

শ্রমিক শব্দটি পূর্বকালে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত। কৃষিকার্যের মজুর, গো-পালক, তন্তুবায়, স্বর্ণকার, তাম্র-ও দস্তা-কারিকর, কাঁসারি, ফেরি-ওয়ালা, এমনকি গৃহভৃত্যগণও (Vide Indian Culture, 1937) ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহাদের কার্যানুযায়ী মজুরীর হার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্দিষ্ট ছিল। শুক্রাচার্য নিম্নলিখিত হার ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন:

(ক) স্বর্ণকারাদি: স্বর্ণকারের কার্যনৈপুণ্যের উপর মজুরী নির্ভর করিত। উচ্চ শ্রেণীর কার্য হইলে নির্মিত বস্তুর মূল্যের ১/৩০ অংশ মজুরী পাইবার নির্দেশ ছিল। যদি মধ্যম শ্রেণীর কার্য হইত তাহা হইলে ১/৬০ অংশ, নিম্ন শ্রেণীর কার্য হইলে ১/১২০ অংশ মজুরী পাইত। কটকী (Bracelet) তৈরী করিলে উহার অর্ধেক মজুরী

আর স্বর্ণ গলাইলে তাহারও অর্ধেক মজুরী পাইবার নিয়ম ছিল। রৌপ্যনির্মিত দ্রব্য—খুব উচ্চ শ্রেণীর কাজ হইলে মূল্যের অর্ধেক মজুরী পাইত। মধ্যম শ্রেণীর কার্য হইলে তাহার অর্ধেক এবং নিম্ন শ্রেণীর কার্য হইলে তাহারও অর্ধেক মজুরী দিবার নিয়ম ছিল। তামা, দস্তা, কাঁসার জিনিস প্রস্তুতের মজুরী মূল্যের অর্ধেক দিবার নির্দেশ ছিল এবং লৌহনির্মিত দ্রব্য প্রস্তুতের মূল্যের ১/৮ অংশ দেওয়া হইত। কৌটিল্য বলিয়া গিয়াছেন—যে স্থলে মজুরী দ্রব্যনির্মাণের পূর্বে নির্ধারিত হয় নাই, সে স্থলে কর্মনৈপুণ্য ও নির্মাণকার্য সমাধান করিতে কতটুকু সময় লাগিয়াছে বিবেচনা করিয়া মজুরী স্থিরীকৃত হইবে।

(খ) কৃষিকার্যের শ্রমিক ঃ কৃষিকার্যের জন্য শ্রমিক নিযুক্ত হইলে যদি নিয়োগের সময় মজুরী নির্ধারিত না হইয়া থাকিত, তাহা হইলে ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন ফসলমূল্যের ১/১০ অংশ মজুরী হিসাবে পাইবে।

(গ) গোপ ঃ গোপগণ যে মাখন তুলিবে সেই মাখনের মূল্যের ১/১০ অংশ পাইবে। নারদ বলিয়াছেন যে—১০০ গরু ১ বৎসর চরাইলে মজুরীস্বরূপ একটি বাছুর এবং ২০০ গরু চরাইলে একটি গাভী পাইবে।

(ঘ) ব্যবসাদার ঃ যে জিনিস বিক্রয় করিবে সে দ্রব্যমূল্যের ১/১০ অংশ পাইবে।

এই সকল হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে মজুরীর হার বেশ উচ্চই ছিল এবং শ্রমিকরা যাহাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবার লইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, এ বিষয়ে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখা হইত।

শ্রমিক-সঙ্ঘ

শ্রমিকগণ একত্র হইয়া নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘ (Guild) গঠন করিত। বৌদ্ধ জাতকে অনেক রকম সঙ্ঘের উল্লেখ আছে। রাজ-সরকার এই সঙ্ঘগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং রাজা তাহাদের দাবিদাওয়া সর্বদাই সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতেন। 'মুখাপাক্ষা' জাতকে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাজা যখন জাঁকজমকের সহিত রাস্তায় বাহির হইতেন, তখন তিনি চারজাতি ও কতকগুলি সঙ্ঘ একত্র করিতেন। কোন কোন জাতকে দেখা যায় যে সঙ্ঘের নেতারা রাজসরকারে উচ্চ পদ লাভ করিতেন ও রাজাদের খুব প্রিয় হইতেন। মন্ত্রীসভায় একজন ব্যক্তি শ্রমিকদের প্রতিনিধিরূপে স্থান পাইতেন। এই সঙ্ঘগুলিই সরকার ও শ্রমিকদের মধ্যে মধ্যস্থের কাজ করিত এবং শ্রমিকদের ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগও বিবেচনা করিত। বিনয়পিটকে (Vinaya Pitaka IV—p. 226) দেখা যায় যে, এই সঙ্ঘগুলি শ্রমিকদের পারিবারিক এমনকি স্বামী-স্ত্রীর কলহও মীমাংসা করিয়া দিত

উপসংহার

জাগতিক সকল বিষয়ই প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা। ঢেউয়ের গতির ন্যায় উত্থান ও পতন সকল বিষয়েই আমাদের চোখে পড়ে। হিন্দু-যুগে শ্রমিকদের অবস্থা উত্তম ছিল। রাজসরকার ও সমাজ তাহাদের সুখসুবিধার বিষয় সততই বিবেচনা করিতেন। মুসলমান-যুগে অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়া ইংরেজ-আমলে শ্রমিকদের অবস্থা অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইল। শ্রমিকদের এই দুরবস্থা মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দকে কিরূপ আঘাত করিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে এবার শূদ্রশক্তির জাগরণ হইবে। শ্রমিকদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত তিনি (পরিব্রাজকে) লিখিয়া গিয়াছেন : নূতন ভারত বেরুক; বেরুক লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটীর ভেদ ক'রে, জেলে-মূচী-মেথরের ঝুপড়ীর মধ্য হ'তে, বেরুক মুদীর দোকান থেকে। ভুনাওলার উনানের পাশ থেকে, বেরুক ঝোড় জঙ্গল পর্বত পাহাড় থেকে।'

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এখন শূদ্রশক্তির জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। এই শক্তি সকল শক্তিকে পরাভূত করিয়া আপন মহিমায় বিকশিত হইতেছে। কতদিনে এ-শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইবে ও কতদিন উহা উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে, তাহা কেবল যাঁহার শক্তি তিনিই জানেন।

অবতারবাদের শাস্ত্রপ্রমাণ

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

অনুশাসনার্থক শাস্-ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ষ্ট্রন্-প্রত্যয় করিয়া শাস্ত্র-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে,[১] যাহা মানুষকে হিত উপদেশ করে তাহা শাস্ত্র। একদেশীর মতে যে অপৌরুষেয় বা পৌরুষেয় বাক্য মানুষকে ইষ্টপ্রাপ্তির উপায়ে প্রবৃত্ত করে অথবা অনিষ্ট পদার্থের সাধন হইতে নিবৃত্ত করে তাহাই শাস্ত্র।[২] কিন্তু আচার্য শঙ্করের মতে—যাহা লোকে জানে না অথচ ইষ্ট, অনিষ্ট বা ইষ্টানিষ্ট-উপায়ের জ্ঞাপক তাহাই শাস্ত্র। এই শাস্ত্র প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত: শ্রুতি ও স্মৃতি। এখানে স্মৃতি বলিতে বেদমূলক পৌরুষেয় শাস্ত্রমাত্রকে বুঝিতে হইবে। এই শাস্ত্রকে মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি ১৮ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। রঘুনন্দনও প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে ১৮ প্রকার শাস্ত্রের কথা বলিয়াছেন, যথা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র।[৩] যাজ্ঞবল্ক্য শেষোক্ত চারিটিকে বাদ দিয়া ১৪ প্রকার শাস্ত্রের কথা বলিয়াছেন। ভামতীকার বেদকে পৃথক্ রাখিয়া উহার ছয় অঙ্গ, পুরাণ, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র ও মীমাংসা—এই ১০ প্রকার বিদ্যাস্থানের কথা বলিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকের আবার বহু ভেদ আছে।

যাহা হউক সমস্ত শাস্ত্রকে শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুই প্রকার বিভাগের মধ্যে রাখিয়া বিরোধের মীমাংসা করা যায়। মনু বলিয়াছেন বেদই শ্রুতি, আর ধর্মশাস্ত্রই স্মৃতি। ইহারা সমস্ত অর্থের প্রকাশক; প্রতিকূল তর্কের দ্বারা এই শ্রুতি ও স্মৃতির বিচার করিবে না, যেহেতু এই উভয় শাস্ত্রের দ্বারা ধর্ম পরিজ্ঞাত হয়।[৪] ন্যায় ও বৈশেষিক মতে বেদ পৌরুষেয় হইলেও সর্বজ্ঞ ঈশ্বর-রচিত বলিয়া প্রমাণ। সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত মতে, অপৌরুষেয়ত্ব নিবন্ধন বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। স্মৃতি অর্থাৎ পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র প্রভৃতি বেদমূলক। শিষ্টগণ কর্তৃক প্রমাণরূপে স্বীকৃত বলিয়া প্রমাণ, যেহেতু ভগবান্ গীতামুখে বলিয়াছেন, 'স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে' [গীঃ৩।২১]। কুমারিল ভট্টপাদও বলিয়াছেন শিষ্ট ব্যক্তিরা যাহাকে ধর্ম বা ধর্মের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা অবশ্যই ধর্ম বা ধর্মের প্রমাণ হইবে, তাঁহারা অবৈদিক কিছু আচরণ করেন না।[৫] শ্রীরামকৃষ্ণও পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতিকে প্রমাণ

১। সর্বধাতুভ্যষ্ট্রন্ [পাঃ উণাদিসূত্র]

২। প্রবৃত্তির্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা।
পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে॥ [ব্রঃ সূঃ ১।১।৪ ভামতীউদ্ধৃত বচন]

৩। অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ॥
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥ [প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব]

৪। শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্মো হি নির্বভৌ॥ [মনুসংহিতা ২।১০]

৫। ধর্মত্বেন প্রপন্নানি শিষ্টৈর্যানি তু কানিচিৎ।
বৈদিকৈঃ কর্তৃসামান্যাৎ তেষাং ধর্মত্বমিষ্যতে।" [মীমাংসা-দর্শন—তন্ত্রবার্তিক ১।৩।৩]

স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বাধূর্ল স্মৃতিতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই আমার অনুশাসন, যে আমার সেই আজ্ঞাকে উল্লঙ্ঘন করে, সে আমার আজ্ঞাভঙ্গকারী ও দ্রোহকারী। আমার ভক্তও যদি তাহা করে, তবে সে প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব নয়।[৬] অতএব সর্বত্র উপাখ্যানভাগগুলিতে প্রামাণ্য না থাকিলেও ঈশ্বর, আত্মা, বন্ধন, মুক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পুরাণের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। মীমাংসাদর্শনেও স্মৃতির প্রামাণ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।[৭]

ভগবান্ যে শরীরকে আশ্রয় করিয়া লীলা করেন সেই শরীরকে অবতার বলে। অব-পূর্বক তৃ-ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয় করিয়া অবতার-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।[৮]

নিখিল জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্তা এক পরমেশ্বরই কেবলমাত্র করুণা-বশতঃ জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত পৃথিবী, স্বর্গ প্রভৃতি লোকে, প্রত্যেক কল্পে ভিন্ন ভিন্ন যুগে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি পুরুষ-মূর্তি এবং দুর্গা, লক্ষ্মী, রাধা, সরস্বতী, সাবিত্রী, কালী প্রভৃতি স্ত্রী-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া দুষ্টদমন, শিষ্টপালন ও ধর্মস্থাপন পূর্বক ভক্তগণের সহিত লীলা-বিলাস সম্পাদন করেন। যে দেশে, যে কালে, যে ভাবে, যে মূর্তিতে অবতীর্ণ হইলে জীবকল্যাণ সাধিত হয়, সেই দেশে, সেই কালে, সেই ভাবে, সেই মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ কৃপা বিতরণ করেন।

এই অবতারবাদ চিরন্তন। বেদ, পুরাণ, উপপুরাণ, মহাপুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে এই অবতারের উল্লেখ আছে। বেদে অবতারের সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে; তাহার দুই একটি উল্লেখ করা হইতেছে।[৯]

শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে: ভগবান্ মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে মনুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জলাশয়ে স্থাপন করিতে বলিলেন। মনু সেইরূপ করিলে মৎস্য ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জলাশয়কে ব্যাপ্ত করিল।[১০] অন্যত্র আছে: তিনি কূর্ম হইলেন।[১১] দেবতা ও অসুরগণের বিবাদ উপস্থিত হইলে ভগবান বামনরূপ ধারণ করিয়া অসুরগণকে পরাভূত করিলেন।[১২]

কেনোপনিষদে আছে—ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও অসুরগণের সংগ্রামে পরমেশ্বর দেবতাদিগকে যুদ্ধে জয়ী করিয়াছিলেন; দেবতারা অহঙ্কার-বশতঃ নিজেদিগেরই জয়ের অভিমান করায় সেই পরমাত্মা অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের অভিমান খণ্ডনপূর্বক উমারূপ ধারণ করিয়া ইন্দ্রকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন।[১৩]

গীতাতে ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, আমি পূর্বে এই যোগ সূর্যকে বলিয়াছিলাম।[১৪]

৬। শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তামুল্লঙ্ঘ্য বর্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্রোহী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥ [বাধূর্ল স্মৃতি]

৭। মীমাংসা-দর্শন—১।৩।১।

৮। 'অবে তৃস্ত্রোর্ঘঞ্' [পাণিনি ৩।৩।১২০]

৯। স্থানাভাবে বেশী উল্লেখ করিতে পারা গেল না। প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে করা যাইতে পারে।

১০। স মৎস্য উপন্যাপুপ্লুবে [শতপথব্রাঃ ১।৮।৫]—সেই মৎস্যরূপী ভগবান জলরাশিকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। শশ্বদ্ধি ঝষ আস।—তিনি অতিশীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন।

১১। স কূর্ম আস। [শতপথব্রাহ্মণ]

১২। বামনো হ বিষ্ণুরাস। [শতপথ ব্রাঃ ১।২।৩।৫]

১৩। স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানা মুমাং হৈমবতীম্ [কেন উপনিষৎ ৩।১২]

১৪। ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্। [গীতা—৪।১]

তিনি যে-রূপে সূর্যকে যোগের উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সূর্যদেবতার অন্তর্যামী রূপের কথা ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যথাঃ 'য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আ প্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ [ছাঃ উঃ ১৷৬৷৬]—অর্থাৎ এই যে আদিত্য দেবতার মধ্যে জ্যোতির্ময় পুরুষ দেখা যাইতেছে, তাঁহার শ্মশ্রু সুবর্ণময়, কেশ সুবর্ণময়, নখ হইতে সমস্ত শরীরই সুবর্ণময়।

বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অধ্যায়ের ৭৷৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী ভগবানের মৎস্য-কূর্মাদি অবতার সম্বন্ধে শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন, যথাঃ 'সোঽপশ্যৎ পুষ্করপর্ণে তিষ্ঠন্, সোঽমন্যত অস্তি বৈতদ্ যস্মিন্নিদমধিতিষ্ঠতি', 'স চ বারাহং রূপং কৃত্বা উপন্যমজ্জৎ, স পৃথিবীমপ আচ্ছর্দ্'—সেই ভগবান্ পদ্মপত্রে অবস্থান করিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি মনে করিলেন—ইহা যাহাতে অবস্থান করে সেইরূপ অধিষ্ঠান আছে। তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলে নিমগ্ন হইলেন এবং পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিলেন।

আবার এই একই পরমেশ্বর নিজ উপাধিভূত মায়ার সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব রূপ ধারণ করেন। বেদে ব্রহ্মার কথা বহু স্থলে আছে। ব্রহ্মাকে বিধাতা, ধাতা, প্রজাপতি নামে বুঝানো হইয়াছে, যথাঃ 'ভূরিতি বৈ প্রজাপতিঃ। ইমামজনয়ত' [শতপথ ব্রাঃ ২৷১৷৪৷ ১১] 'ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ' [ঋগ্বেদ]।

'ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ' (নারায়ণ উপনিষদ্ ২৷১২)।—অর্থাৎ ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতার মধ্যে ভগবানের বিভূতির অংশস্বরূপ। অবশ্য হিরণ্যগর্ভ বা বিরাটরূপী ব্রহ্মা ঈশ্বর নহেন। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ জীব। ঈশ্বরকোটির ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভাদি হইতে ভিন্ন

শিবরূপে পরমেশ্বরের অবতারের কথাও বেদে বহুলভাবে কীর্তিত। ঋগ্বেদ প্রভৃতিতে শিবকে রুদ্র নামে প্রচার করা হইয়াছে। শিব এবং রুদ্র যে একই দেবতা—তাহা যজুর্বেদের রুদ্রসূক্তে 'নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ' মন্ত্রে স্পষ্টই প্রকটিত হইয়াছে। বেদে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং কালী, তারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা, সাবিত্রী প্রভৃতি স্ত্রী-দেবতার অবতারও কীর্তিত হইয়াছে।[১৫]

বিষ্ণুপুরাণে আছেঃ এক ভগবান বিষ্ণুই ব্রহ্মা, শিব, কৃষ্ণ আবার মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি মূর্তি ধারণ করেন।[১৬] দেবী ভাগবতে প্রথমে দেবীকেই সর্ব বিশ্বের এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও নিয়ন্ত্রী—এক অনাদি পরমা প্রকৃতিরূপে বলা হইয়াছে। আবার পরে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রী অবতারই এক পরমাত্মার অবতার। সুতরাং যোগিগণ তাঁহাদের ভেদজ্ঞান করেন না।[১৭]

ঐ গ্রন্থেই বলা হইয়াছে যে দুর্গা, কালী প্রভৃতি শক্তি অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় পরমব্রহ্মস্বরূপ শিব হইতে ভিন্ন নন।[১৮] সুতরাং বিষ্ণু-লক্ষ্মী, শ্রীরামচন্দ্র-সীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধা

১৫। কালী, তারা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যা সম্বন্ধে বেদ-প্রমাণ ভবিষ্যতে প্রদর্শিত হইতে পারে।

১৬। অকরোৎ স তনূমন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা। মৎস্যকূর্মাদিকাং তদ্বৎ বারাহং বপুরাস্থিতঃ॥ [বিষ্ণুপুঃ ৪৷৮] অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণু পূর্বকল্পের ন্যায় মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি শরীর অবলম্বন করিয়া অন্য মূর্তি পরিগ্রহ করেন।

১৭। স্বেচ্ছাময়স্যেচ্ছয়া চ শ্রীকৃষ্ণস্য সিসৃক্ষয়া। সাবির্বভূব সহসা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী॥ [দেবীভাঃ ৯৷১৷১২] ইচ্ছাময় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রে, সৃষ্টির ইচ্ছায় মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী সহসা আবির্ভূতা হইলেন। "অতএব হি যোগীন্দ্রৈঃ স্ত্রীপুংভেদো ন মন্যতে" [দেবীভাঃ ৯৷১৷১১] এই কারণে যোগীন্দ্রগণ ভগবানের স্ত্রীপুরুষভেদ জানেন না।

১৮। সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ নিত্যা সা চ সনাতনী। যথাত্মা চ যথাশক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্থিতা॥ (ঐ—৯৷১৷১০)

ইহারা এক, ভিন্ন নন। শিব ও শক্তি অভিন্ন বলিয়া পরমেশ্বর কখনও বা কেবল পুরুষ-মূর্তিতে, কখনও কেবল স্ত্রী-মূর্তিতে, কখনও বা স্ত্রীপুরুষ উভয় মূর্তিতে আবির্ভূত হন। দেবীপুরাণেও দেবীর সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত বিন্ধ্যপর্বতে অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে।[১৯]

যদিও পরমেশ্বরের বাস্তবিক অংশ নাই তথাপি স্বকীয় উপাধিভূত মায়াকে বশীভূত করিয়া সেই শক্তির দ্বারা কখনও পূর্ণরূপে, কখনও অংশরূপে, কখনও অংশকলা যুক্তরূপে, কখনও বা অঙ্গ উপাঙ্গ পার্ষদাদি সমভিব্যাহারে অবতীর্ণ হন। এই সম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য শেষে বলা হইবে।

দেবী-ভাগবতে দ্রৌপদীকে সীতাদেবীর ছায়া অবতার বলা হইয়াছে।[২০] মূল আদ্যা শক্তিই দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ও সাবিত্রীরূপে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হন। যথা:

'গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা॥
(দেবী ভাঃ ৯।১)

সুতরাং আমরা সংক্ষেপে এ পর্যন্ত যাহা পাইলাম, তাহাতে দেখা গেল যে এই অবতারবাদ বৈদিক যুগের পরবর্তী কালে উদ্ভূত হইয়াছে—এই সিদ্ধান্ত অপ্রামাণিক। তবে এমন হওয়া সম্ভব যে পৌরাণিক যুগে ইহার প্রচার সাধারণের মধ্যে বহুল ভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। অতএব এই অবতারবাদ শাশ্বত।

বিষ্ণুপুরাণের 'অকরোৎ স তনুমন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা' এই বচনের দ্বারা অবতারবাদ যে বেদের ন্যায় শাশ্বত তাহাই সুস্পষ্ট হইয়াছে।

শিবপুরাণে এবং শঙ্করদিগ্বিজয়ে শঙ্করাচার্যকে শিবের অবতার বলা হইয়াছে। বায়ুপুরাণে মধ্বাচার্যকে বায়ুর অবতাররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্য লক্ষ্মণের অবতাররূপে সমধিক প্রসিদ্ধ।

অবতার যে মাত্র দশজন এইরূপ বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে কোথাও নির্ধারণ করা হয় নাই। তবে পুরাণ প্রভৃতিতে দশ অবতারের বর্ণনা বহুল ভাবে বিদ্যমান থাকায়, সাধারণ লোকের ধারণা অবতার দশটি। শ্রীমদ্ভাগবতে ২৩ জন অবতারের উল্লেখ করিয়া অবতার যে অসংখ্য—তাহা স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে।[২১]

সাধুগণের পরিত্রাণ করা, অসাধুগণকে আপাততঃ নিগৃহীত করিয়া পরিণামে তাহাদেরও কল্যাণ করা এবং ধর্ম স্থাপন করা এই তিনটি অবতারের কার্য। মৎস্য কূর্ম প্রভৃতি অবতারেও ভগবান্ শঙ্খাসুর প্রভৃতিকে দমন করিয়া মনু প্রভৃতি শিষ্টগণকে পালন করিয়া বেদরক্ষাদি পূর্বক ধর্মস্থাপন করিয়াছেন।

মৎস্যরূপী ভগবান্ মনুকে ধর্মের উপদেশ দান করিয়া যে ধর্মস্থাপন করিয়াছেন তাহা মৎস্য-পুরাণে উক্ত হইয়াছে। যথা মৎস্য উবাচ:

মহাপ্রলয়কালান্ত এতদাসীত্তমোময়ম্।
প্রসুপ্তমিব চাতর্ক্যমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্॥
ইত্যাদি [২।২৫]

অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে সেই কারণীভূত

১৯। তদা তাঃ সর্বগা ভূত্বা সপ্তদ্বীপাঞ্চ মেদিনীম্। ব্যাপয়িত্বা স্থিতাস্তস্মিন্ বিন্ধ্যে ভূধরসত্তমে। (দেবীপুরাণ—৭।৯৭) তখন দেবীর সেই সকল শক্তি সর্বব্যাপিনী হইয়া সপ্তদ্বীপা মেদিনীকে ব্যাপ্ত করিয়া সেই বিন্ধ্যপর্বতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

২০। "তচ্ছায়া দ্রৌপদী দেবী দ্বাপরে দ্রুপদাত্মজা" (দেবীভাঃ ৯।১৬।৫৩)

২১। "অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।" [শ্রীমদ্ভাঃ ১।৩।২৬] পরাশরসংহিতাতেও দশের অধিক (ব্যাসদেব প্রভৃতিকে) অবতার বলা হইয়াছে। যথাঃ—দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী মহামুনে।
বেদমেকং সুবহুধা কুরুতে জগতো হিতম্॥

অতর্ক, দুর্জ্ঞেয়, এক ব্রহ্মই প্রসুপ্তের ন্যায় বর্তমান ছিলেন ইত্যাদি। এইরূপ কূর্মাদি অবতারেও বুঝিতে হইবে।

'মৎস্য হইয়া কথা বলা আজগুবি কল্পনা'—এরূপ বলা চলে না, কারণ ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া ফেলা যে আমাদের পক্ষে বাতুলতা মাত্র তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতই বলিয়াছেন, 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ' ইত্যাদি। কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন, 'নৈষা তর্কেণ মতি-রাপনেয়া' ইত্যাদি।

ভগবানের এই অবতার যে কেবল ভারতবর্ষেই হইয়াছে বা হইবে—ইহা যুক্তিসিদ্ধ নয়। ভগবান্ সমস্ত বিশ্বই সৃজন করিয়াছেন, সুতরাং সমস্ত বিশ্বের জীবের প্রতি তাঁহার করুণা সমান ভাবে অবস্থিত। অতএব জীবের উদ্ধারের জন্য সর্বদেশে যথোপযুক্ত কালে তাঁহার আবির্ভাব হওয়াই যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয়। নতুবা ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি দোষের এবং বেদাদি শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য-দোষের আপত্তি হয়। তবে যে অন্য দেশে স্বয়ং ভগবানের অবতার হওয়ার কথা শোনা যায় না, তাহা পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা। তাঁহার নিজের কোনরূপ প্রয়োজন নাই। তিনি যেখানে, যে কালে, যে ভাবে প্রখ্যাতরূপে বা ছদ্মরূপে আবির্ভূত হইলে লোকের কল্যাণ সাধিত হইবে—মনে করেন, সেখানে সেই ভাবেই অবতীর্ণ হন। আর তিনি স্বয়ং লোকসমক্ষে তাঁহার অবতার-বার্তা প্রকাশ না করিলে মানুষের কি সাধ্য আছে যে তাহা বুঝিতে পারে!

লোক-কল্যাণের নিমিত্ত নিজের মহিমা প্রকাশ করা বা না করা সম্বন্ধে তিনি যেমন শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন, সেইরূপই আচরণ করেন। সুতরাং অন্যান্য দেশবাসিগণ ঈশ্বরের অবতার স্বীকার না করিলেও, ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষরূপে বা তাঁহার পুত্ররূপে বুঝিলেও তাঁহাদের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে; আমাদেরও কোন ক্ষতি নাই। আমরা অবতার-রূপে মানিলেই আমাদের কল্যাণ। অতএব যীশু প্রভৃতিকেও শাস্ত্র-অনুসারে অবতার বলা যাইতে পারে। প্রমাণও আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যীশু, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতিকে ঈশ্বরাবতার-রূপে সাক্ষাৎকার করিয়া-ছিলেন, একথা আমরা 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে' পাই।[২২]

এখন ঈশ্বরের এই অবতাররূপে শরীর-ধারণ, জন্ম, বাল্য, কৌমার, যৌবনাদি অবস্থা, সুখ-দুঃখ অনুভব, কখন কখন অজ্ঞান মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার, আবার জ্ঞানের প্রকাশ, পূর্ণত্ব ও অপূর্ণত্ব, সাধনা ও সিদ্ধিলাভ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত, চৈতন্যঘন, পূর্ণকাম ঈশ্বরের জন্ম প্রভৃতি বা কিরূপে সম্ভব হয়—এই সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্য গীতামুখে ভগবানের বাণী ও তাহার ভাষ্য-টীকাকার প্রভৃতি আচার্যগণের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

গীতামুখে ভগবান বলিতেছেন: আমার জন্ম নাই, বিনাশ নাই, সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর আমি কাহারও অধীন নই, তথাপি আমি নিজের প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া মায়ার দ্বারা শরীর-বিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হই।[২৩]

অবতার সম্বন্ধে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের সিদ্ধান্ত এই যে—বাজীকর যেমন ভেল্কীর দ্বারা লোকের সমক্ষে আকাশারোহী পুরুষ, তাহার মস্তক ছেদন প্রভৃতি প্রদর্শন করে, অথচ সেই বাজীকর একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার কিছুই হয় না, সেইরূপ ভগবানও নিজের মায়ার

২২। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ২য় খণ্ড ৩৩৫ পৃঃ; ৪০০—৪০১ পৃঃ

২৩। অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ গীতা ৪।৬

সাহায্যে লোকসমক্ষে, জন্ম, বাল্য, যৌবনাদি লীলা প্রদর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে জীবের মতো তাঁহার ব্যাবহারিক জন্ম বা কর্মের অধীন শরীর ধারণ প্রভৃতি কিছুই সম্ভব নয়। আর সর্বদাই তাঁহার জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য, তেজ, প্রজ্ঞা প্রভৃতি পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে; কখনও অপূর্ণতা থাকে না।[২৪]

নীলকণ্ঠের মতে ঈশ্বরের শরীর মায়াময় হইলেও মায়ার দ্বারা চিন্ময় শরীর সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহার শরীর নিত্য।[২৫]

মধুসূদন সরস্বতীর মতে ঈশ্বরের শরীর বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান মায়াময় হইলেও যতকাল মায়া থাকে ততকাল শরীরও থাকে এবং মায়া অনাদি বলিয়া তাঁহার শরীরও নিত্য।[২৬]

শ্রীধর স্বামীর মতেও ঈশ্বরের শরীর বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময়, জীবের ন্যায় লিঙ্গশরীর বা ভৌতিক স্থূল শরীর সম্ভব নয় এবং তাঁহার জ্ঞান বল প্রভৃতি সর্বদাই অপ্রচ্যুত থাকে।[২৭]

এই সকল আচার্যের মতে কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও ঈশ্বরের শরীরধারণ যে জীবের মতো কর্মের অধীন নয়, এবং মনুষ্যাদি শরীরে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার জ্ঞান প্রভৃতি কখনও ক্ষীণ বা কিছুমাত্র অপূর্ণতা তাঁহার থাকে না—এই বিষয়ে উপরোক্ত সকল আচার্যেরই ঐকমত্য আছে।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজ কিন্তু 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে' বলিয়াছেন: অবতারগণ মনুষ্য-শরীরে লীলা প্রদর্শন করিলেও তাঁহাদিগকে মনুষ্যের মতই কোন কোন অংশে সাধনাদির দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিতে হয়, সর্বদাই তাঁহাদের জ্ঞান প্রভৃতি অনাবৃত থাকে না[২৮]

এই উভয় মতের আপাতবিরোধ-সমাধানে শুধু এইটুকুই স্মরণ করিব, ইহাও সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের লীলা বা ইচ্ছা।

২৪। "স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্ন" ইত্যাদি গীতা ভাষ্য উপক্রমণিকা
"তস্মাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ......শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ......স্বমায়য়া লীলাবিগ্রহং গৃহীত্বা জাত ইব বিগ্রহবানিব" ইত্যাদি [গীঃ ৪।৬ ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা]

২৫। "তস্মাৎ সিদ্ধং পরমেশ্বরস্য মায়াময়ং শরীরং নিত্যম্" [গীঃ ৪।৬—নীলকণ্ঠ]

২৬। "অনাদি মায়ৈব মদুপাধিভূতা যাবৎকালস্থায়িত্বেন নিত্যা...অতোঽনেন নিত্যেনৈব দেহেন" ইত্যাদি [গীঃ—মধুসূদন সরস্বতী]

২৭। "তথা ঈশ্বরোঽপি কর্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি...সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি। ননু তথাপি ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গদেহশূন্যস্য" ইত্যাদি (গীঃ—শ্রীধরস্বামী)

২৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ২য় খণ্ড—৪০, ৪১, ৪২, ৩৬, ৩০ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সমালোচনা

A Modern Incarnation of God—প্রণেতা শ্রীঅধরচন্দ্র দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক। কলিকাতা জেনারেল প্রিণ্টার্স কর্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই—৩১০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৫৲ টাকা।

বহু পুস্তক, পুস্তিকা ও মাসিক পত্রের ভাববস্তুকে নিজস্ব ভাবধারায় জারিত ক'রে সুধী লেখক এই পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও অবতার-তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই লেখকের এই লেখা মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী-আলোচনার পুরাতন পথে না হেঁটে, লেখক নূতন এক পথে চলবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই 'চলা' যে সব সময় সুগম হয়েছে তা নয়, তবে তাঁর এই পথ-চলা তাঁকে যে আদর্শালোকের উদারতায় ও যে শ্রম-নিষ্ঠার প্রসন্নতায় টেনে এনেছে, তা আস্বাদন করতে আমরা সকল পাঠককেই আহ্বান জানাচ্ছি।

আমগাছটার শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য তার ফলে; তাহলেও তার কাঠকে যদি কেউ সংসারের নানা প্রয়োজনে লাগান, কিংবা তার পাতাকে পূজার মাঙ্গলিক শোভনতার সহায়করূপে ব্যবহার করেন, তাহলে সেটা যে অন্যায়, তা নিশ্চয়ই নয়। তবে সেইটেই আমগাছটার শ্রেষ্ঠ ব্যবহার নয়। তবুও ঐ প্রকার ব্যবহার-নৈপুণ্যেরও একটি সত্যকার মূল্যায়ন আছে। সেই দৃষ্টিতে বিচার করলে, বইটি আমাদের সুমুখে একটি নূতন ইঙ্গিত এনেছে, এ কথা স্বীকার করি।

জগতে কোন কিছুই সম্পূর্ণ পবিত্রতা নিয়ে দেখা দেয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন—খাদ না হ'লে গড়ন হয় না। এই পুস্তকের 'খাদ' দেখেও তাই আমরা বিস্মিত হইনি। দু'চারটি মন্তব্য, দু'পাঁচটি ঘটনার বিবরণ-চ্যুতি এবং শ্রীঅরবিন্দ-ব্যবহৃত শব্দ-প্রয়োগে ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝানোর আধুনিকতাকে (যদিও বহুলাংশে তা শাস্ত্রসম্মত নয়) আশা করি সকল শ্রেণীর পাঠকই মার্জনা ক'রে নেবেন।

কথাপ্রসঙ্গে শুধু একটি বিষয়ে নির্দেশ দিতে ইচ্ছা করছে: লেখক যে বলেছেন, প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে 'অবতার' স্বীকৃত হয়নি, তার উত্তরে লেখককে শতপথ-ব্রাহ্মণের এবং কেনোপনিষদ প্রভৃতিতে ঐ বিষয়ের ইঙ্গিতগুলি লক্ষ্য করতে বলি; আর করি এই লেখকের ইংরাজী ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীলতার প্রশংসা। —**মহানন্দ**

সনাতন-ধর্ম ও মানব-জীবন: স্বামী যোগানন্দ প্রণীত। ৫৮ নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—২১০; মূল্য দুই টাকা।

সনাতন ধর্ম কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—ত্রিকালে সত্য, শাশ্বত। আদ্যন্তহীন ও প্রবর্তকহীন সনাতন ধর্ম সৃষ্টির আদি কাল হইতেই আপন গৌরবে উদ্ভাসিত। আর্যঋষিগণ জীবনে সত্য উপলব্ধি করিয়া জীবকল্যাণে তাঁহাদের অমৃত-বাণী শাস্ত্রাকারে নিবদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন।

মানব-জীবনে প্রথম মনুষ্যত্বলাভ, দ্বিতীয়—দেবত্ব, এবং পরিশেষে ব্রহ্মত্ব-অনুভূতি—এই অবস্থাগুলি পরস্পর ভিন্ন নয়, সোপনাবলীর মতো। কিরূপে চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পারা যায় আলোচ্য গ্রন্থে তাহা যম-নিয়ম, বৈরাগ্য-বিশ্বাস, অষ্টপাশ-ছেদন, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্ত করা হইয়াছে। বর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ পুস্তকটির জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। —**জীবানন্দ**

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী চিদানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী চিদানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে 'গোঁসাই' নামে পরিচিত) গত ২২শে মার্চ ৬৯ বৎসর বয়সে সিংভূমের অন্তর্গত ধলভূমগড়ের শ্যামসুন্দরপুরস্থ ঠাকুরবাড়ীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মঠে যোগদান করিয়া তিনি পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট ১৯১৭ খৃঃ সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তাঁহার সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। এই মধুরস্বভাব সন্ন্যাসী সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষতঃ তবলা-বাদনে পারদর্শী ছিলেন।

১৯২৪ খৃঃ লাহোরে যখন ভীষণ প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন মঠ হইতে প্রেরিত হইয়া স্বামী চিদানন্দ সেবাকার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি-লাভ করিয়াছে।

ও শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ : গত ২৭শে ফাল্গুন (১১.৩.৫৯) বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৪তম শুভ জন্মতিথি-উৎসব বিপুল আনন্দপূর্ণ ও শুচিসুন্দর অনুষ্ঠান-সহায়ে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ভোর ৪-৩০ মিঃ মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভ সূচনা হইলে একে একে উপনিষদ্-আবৃত্তি, চণ্ডীপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা ও হোম এবং দশাবতারের পূজা, 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, 'কথামৃত' পাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে সারাদিন ভক্তহৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামাধুরী সঞ্চিত হইতে থাকে। প্রায় ১০,০০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান।

অপরাহ্নে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের স্বামী নিখিলানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বৈশিষ্ট্য-গুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী অবতার-জীবনের সার মর্ম আলোচনা করিয়া বলেন, শ্রীভগবান মর্ত্যের ধূলিতে বৈকুণ্ঠ রচনা করিতে অবতীর্ণ হন। সভাপতির ভাষণে স্বামী নিখিলানন্দ ইংরেজীতে বলেন : সকলেই আজ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইতেছেন, ভারতের বাণী বেদান্তের বাণী—অধ্যাত্মবাদের বাণী আজ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সকাল হইতে বহু নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসেন। ভক্তবৃন্দ বিবিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া পবিত্র ভাবধারায় বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও হোমের পর রাত্রিশেষে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ২৩জনকে সন্ন্যাসব্রতে এবং ২৩ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

পরবর্তী রবিবার ১৫ই মার্চ সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন মন্দিরের পূর্বদিকে গঙ্গাতীরস্থ প্রাঙ্গণে নির্মিত মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুবৃহৎ তৈলচিত্র ও তাঁহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র সজ্জিত রাখা হয়। মণ্ডপে ও মঠের অঙ্গনে বিভিন্ন কীর্তনের দল ভজন দ্বারা উৎসব-ক্ষেত্র মুখরিত রাখেন। উষাকাল হইতে সারাদিন ধরিয়া বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সঙ্গীত বিদ্যুৎ-সহায়ে

প্রসারিত হয়। প্রধান মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মূর্তি দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিভিন্ন কার্যে বহু স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত থাকেন। সন্ধ্যারতির পর বাজি পোড়ানো হইলে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। মঠের প্রাঙ্গণে ও রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দোকানপাটের মেলা বসে। সারাদিনে বহু নর-নারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইদিন প্রায় চার লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

বোম্বাইঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৪ই মার্চ জাহাঙ্গীর-হলে উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন গভর্ণর স্যর এইচ. পি. মোদীর সভাপতিত্বে ধর্মসভায় বক্তৃতা দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী এস্. কে. পাতিল, ডক্টর ডি. জি. ব্যাস এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। ১৫ই মার্চ মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, বেদ-আবৃত্তি, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা প্রভৃতি হয়। সংগীতানুষ্ঠান উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল।

১১ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য তিথি পূজা-দিবসে সকাল ৭-৩০ মিঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশ-নের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ নূতন মন্দির ও উপাসনা-গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। এতদুপলক্ষে ভাষণ-প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম দেবমানব, যাঁহার প্রতিকৃতি (ফটোগ্রাফ) রাখা হইয়াছে এবং তাহা পূজা করা হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে বিভিন্ন স্থানে মানব-সেবার যে কার্য হইতেছে, বোম্বাই প্রদেশও যে তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতেছে—এজন্য তিনি আনন্দিত।

পাটনাঃ গত ১১ই হইতে ১৫ই মার্চ (রবিবার) পর্যন্ত পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৪তম জন্মোৎসব যথারীতি সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। তিথিপূজার দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ হয় এবং আনুমানিক ১,৫০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সভাপতিত্বে এক সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। নবনালন্দা মহাবিহারের পরিচালক ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের লিখিত এক সারগর্ভ ভাষণ পাঠের পর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-শাস্ত্র বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নর্মদেশ্বর প্রসাদ ও আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বীত-শোকানন্দ বক্তৃতা করেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সভাপতির ভাষণে বলেন যে, হিংসা-জর্জরিত বর্তমান অশান্ত বিশ্বে শান্তির জন্য আমাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের শিবজ্ঞানে জীবসেবা ও প্রেমের বাণী গ্রহণ করিতে হইবে।

১২ই, ১৩ই ও ১৪ই মার্চ আশ্রমের নাটমন্দিরে কীর্তনাচার্য শ্রীসূর্যনারায়ণ ঠাকুরের কথকতা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রভূত আনন্দ দান করে। উৎসব-সূচীর শেষ দিনে বিখ্যাত হিন্দী ঔপন্যাসিক শ্রীফণীশ্বর নাথ "রেণু" শ্রীরামকৃষ্ণ-বচনামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

কার্যবিবরণী

নাগপুর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই কেন্দ্রের ভিত্তি ১৯২৫ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ স্থাপন করেন এবং আশ্রমের কাজ শুরু হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। ১৯৫৮ খৃঃ প্রকাশিত ইহার কার্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপঃ

গ্রন্থাগার ও পাঠাগারঃ ইংরেজী, মারাঠী, হিন্দী, বাংলা, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সমাজশাস্ত্র, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের প্রায় ১৪ হাজার পুস্তক আছে সম্প্রতি নূতন গ্রন্থাগার-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করা হইয়াছে, এখানে ৫০ হাজার গ্রন্থ রাখিবার ব্যবস্থা

হইতেছে। পাঠাগারে ১০০ দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা রাখা হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়: আশ্রম কর্তৃক দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে, একটি আশ্রমের মধ্যে এবং অপরটি ইন্দোরায় অনুন্নত লোকেদের বস্তিতে।

বিবেকানন্দ বিদ্যার্থিভবন : দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণকে সুশিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যার্থিভবনে ৩৩ জন ছাত্র ছিল। ছাত্রদের জন্য একটি 'পাঠচক্র' (study circle) গঠন করা হইয়াছে।

প্রকাশন-বিভাগ : নাগপুর আশ্রমে হিন্দী ও মারাঠী প্রকাশন বিভাগ আছে। এখান হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৫৭ মার্চ হইতে 'জীবন-বিকাশ' নামক একটি মারাঠী মাসিক পত্র প্রকাশ করা হইতেছে।

আলোচনা ও বক্তৃতা: শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও অন্যান্য মহাপুরুষের জন্মতিথি যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। আশ্রমে ও বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও আলোচনা দ্বারা ভাব-প্রচারও এই আশ্রমের একটি নিয়মিত কার্য।

স্বামী নিখিলানন্দ-সংবর্ধনা

গত ২৯শে মার্চ রবিবার কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দকে রামকৃষ্ণ মিশন 'ইনষ্টিট্যুট অব কালচারে' বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। কলিকাতার পৌরপ্রধান শ্রীত্রিগুণা সেন অভিনন্দন-পত্র পাঠকালে দীর্ঘ ২৮ বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারে স্বামী নিখিলানন্দ যাহা করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীমনুভাই শাহ্ আশা করেন যে, আমেরিকায় ভারতীয় কৃষ্টি-ব্যাখ্যায় স্বামীজীরা আরও সাফল্য লাভ করিবেন। ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ ধন্যবাদ দেন এবং শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বক্তার পরিচয় প্রদান করেন।

অভিনন্দনের উত্তরে স্বামী নিখিলানন্দ 'আত্মার সন্ধানে মানুষ' এই বিষয়ে ভাষণ-প্রসঙ্গে বলেন: মানবের মধ্যে যে সার্বভৌম ঐক্য বর্তমান, তাহা রাজনীতিক বা বৌদ্ধিক স্তরে উপলব্ধ হয় না, আধ্যাত্মিক স্তরে ইহার উপলব্ধি হয়। ভারত যে সব দুঃখ ভোগ করি-তেছে তাহার অন্যতম কারণ আত্মবিস্মৃতি, এই জন্যই ভারত ভিক্ষাপাত্র হস্তে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়ের অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ রহিয়াছে। বিভিন্ন বিজ্ঞান মানুষকে বিভিন্ন ভাবে দেখিতেছে। বেদান্তই মানুষের অন্তরতম আত্মার সন্ধান দেয়।

আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেণ্টার

স্বামী নিখিলানন্দ এখন ভারতে; স্বামী ঋতজানন্দ প্রতি রবিবার বেলা ১১টার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ানুযায়ী আলোচনা করিয়াছেন:

জানুআরি—শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিনে: মাতৃত্ব ও পবিত্রতা, মানুষ: জানা ও অজানা, জড় ও চেতন, মনের শক্তি ও সম্ভাবনা।

ফেব্রুআরি—স্বামীজীর জন্মদিনে: বিবেকানন্দ ও এ যুগের ধর্ম, ধর্মচেতনা (অতিথিবক্তা —ডক্টর ইরাণী), প্রার্থনা ও তাহার উদ্দেশ্য, জীবনের লক্ষ্য—আধ্যাত্মিক মুক্তি।

মার্চ—ঈশ্বরানুভূতি কি সম্ভব? নীরবতার শক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মদিনে: শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরাধিকার, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনচেষ্টা (অতিথিবক্তা ডক্টর ইয়ুং), Good Friday : মৃত্যুর তাৎপর্য, Easter Service : অমৃতত্বের অর্থ।

প্রতি মঙ্গলবার রাত্রি ৮৷৷টায় ভক্তিসূত্র এবং প্রতি শুক্রবার উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে মুকুন্দরামরাও জয়াকর

বিখ্যাত উদারনৈতিক নেতা ডক্টর মুকুন্দরাম-রাও জয়াকর গত ১০ই মার্চ ৮৬ বৎসর বয়সে বোম্বাইয়ে মালাবার হিল-এ তাঁহার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে 'সপ্রু জয়াকর' এই যুগ্মনাম চিরস্মরণীয়। তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রতিভার সহায়তা কি বিদেশী সরকার, কি স্বদেশী নেতাগণ সমভাবে লইয়াছেন। অপরের মতকে শ্রদ্ধা করিয়া তাহার সহিত বোঝাপড়া করিবার শক্তির জন্য উভয় পক্ষেই তাঁহাদের সমাদর ছিল।

প্রথমে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরে বিলাতে শিক্ষিত ব্যারিষ্টার জয়াকর ১৯১৬ খৃঃ লখনউ কংগ্রেসে রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯২৩ খৃঃ বোম্বাই আইন-সভার সদস্য হইয়া পরে কেন্দ্রীয় সভায় স্বরাজ-পার্টির নেতা হন। ১৯৩০ খৃঃ আন্দোলনের সময় তিনি সরকারের সহিত কংগ্রেসের মিটমাট করিবার চেষ্টা করেন। গোলটেবিল বৈঠকে তাঁহার আলোচনা একদিকে তাঁহার দেশপ্রেমের, অন্যদিকে তাঁহার রাজনীতিক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। হোয়াইট পেপার প্রণয়নকালে পার্লামেণ্টারি কমিটিতে তিনি ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। ১৯৩৭ খৃঃ তিনি ভারতের ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া ১৯৩৯ খৃঃ প্রিভি কাউন্সিলের বিচারক-সমিতির সদস্য হন এবং ১৯৪২ খৃঃ তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন। ১৯৪৬ খৃঃ ভারতের সংবিধান-গঠনসমিতির সভ্য নিযুক্ত হন, কিন্তু কিছুদিন পরেই ঐ পদ ত্যাগ করিয়া রাজনীতি লইয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার শেষজীবন পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষরূপে (১৯৪৮-৫৬) শিক্ষার ক্ষেত্রেই ব্যয়িত হয়।

আইন ও রাজনীতি তাঁহার বিশেষ ক্ষেত্র হইলেও হিন্দুদর্শনে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁহার 'কমলা বক্তৃতা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত জয়াকর রামকৃষ্ণ মিশনের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, এবং উহার বোম্বাই কেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন।

এই উদারচেতা দেশপ্রেমিক মহান্ ভারত-বাসীর আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

পরলোকে ডক্টর ধীরেন্দ্রলাল দে

কলিকাতা উইমেন্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, অধ্যক্ষ ও সম্পাদক ডক্টর ধীরেন্দ্রলাল দে গত ১৬ই মার্চ রাত্রি ১০টার সময় ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি রক্তের চাপজনিত ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন।

ধীরেন্দ্রলাল চট্টগ্রাম জেলার খৈয়াছড়া গ্রামে ১৮৯৯ খৃঃ ২রা ফেব্রুআরি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রে যথাক্রমে ১৯২২ ও ১৯২৬ খৃঃ এম্. এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৩১ খৃঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ্.-ডি লাভ করেন। লণ্ডনে তাঁহাকে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়।

ডক্টর দে স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহা-রাজের সংস্পর্শেও আসেন। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি যুগপ্রয়োজনে নূতন ভাবে শিক্ষাদান-ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। স্বামীজী ভারতীয় নারীর যে আদর্শ সর্বসমক্ষে ধরিয়াছিলেন, তাহাকেই রূপ-

দান করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হন। কলেজের ছাত্রীগণ যাহাতে স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি কলেজ-ভবনে প্রতি বৎসর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করিতেন। এতদুপলক্ষে তিনি ছাত্রীদিগকে স্বামীজী সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিতে প্রেরণা দিতেন।

অকৃতদার ডক্টর দে রামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসিগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, অমায়িক ব্যবহার এবং অটুট আদর্শপ্রীতি সকলকে মুগ্ধ করিত। উইমেন্স কলেজের সেবাতেই তিনি তাঁহার মনপ্রাণ সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন। ঐহিক জীবনের সাফল্যের দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। আমরা এই ত্যাগী শিক্ষাব্রতীর লোকান্তরিত আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

উৎসব-সংবাদ

র (২৪-পরগণা) ঃ গত ১৩ই হইতে ১৫ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত লক্ষ্মীপুর সেবাসংঘে' স্বামী বিবেকানন্দ-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় ১৩ই ফেব্রুআরি উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। সভায় অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যায় সংঘের শিশু-বিভাগের পরিচালনায় 'হ-য-ব-র-ল' অভিনীত হয়।

১৪ই ফেব্রুআরি শিশুদের ব্রতচারী নৃত্যের পর অধ্যাপক শ্রীভাগবত দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে এক সভায় সংঘের ছাত্রগণ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করে। শ্রীভবানী চন্দ স্বামীজীর শিক্ষাপ্রসঙ্গ লইয়া সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সভাশেষে সংঘের বয়স্ক-শিক্ষা বিভাগের পরিচালনায় 'মাটির মা' যাত্রা অভিনীত হয়

১৫ই ফেব্রুআরি বিকালে বাণীপুর 'জনতা' কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্লকুমার হোড় রায় 'রামায়ণী কথা' আলোচনা করেন। পরে বাণীপুর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদারের সভাপতিত্বে পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত মজুমদার কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাশেষে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 'লোক-শিক্ষা পরিষদে'র পরিচালনায় '৪২' বইখানি ছায়াচিত্রে দেখানো হয়। এই উপলক্ষে হাবড়া উন্নয়ন সংস্থার (N.E.S. Block) পরিচালনায় এক কৃষি-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। কৃষিজাত শ্রেষ্ঠ ফসলের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। কুটীরশিল্প, জীবনী-চিত্র এবং সমাজশিক্ষামূলক প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বারাসত (২৪ পরগণা) ঃ গত ১১ই হইতে ১৫ই মার্চ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—পূজা, হোম, ভজন, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি-পাঠ, জনসভায় বক্তৃতা প্রভৃতি কর্মসূচীর মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। চতুর্থ দিবসে এক জনসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ (সভাপতি), মহকুমা-শাসক শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল, ডক্টর নৃপেন্দ্র রায়চৌধুরী ও শ্রীমতী উমা গাঙ্গুলী 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান যুগ' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। পঞ্চম দিবসে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে স্বামী শিবানন্দ' সম্বন্ধে বলেন এবং মোবারকপুর মিলন মন্দিরের সভ্যগণ মধুর শ্যামাসংগীত পরিবেশন করেন।

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলিকাতা) ঃ গত ২৯শে মার্চ রবিবার সায়াহ্নে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুট হলে উক্ত সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত স্বামীজীর ৯৭তম জন্মোৎসব-সভায় সভাপতি ডক্টর রাধাবিনোদ পাল বলেন : ধর্মকে আমরা জীবনের অঙ্গ হিসাবে লইতে পারি নাই, ধর্মকে আমরা যাদুঘরে তুলিয়া রাখিয়াছি। শান্তির জন্য ধর্মবোধ একান্ত দরকার।

প্রধান বক্তা স্বামী মহানন্দ বলেন: ধর্মের মূলবস্তুকে নিরূপণ করিতে হইলে প্রস্তুতি প্রয়োজন। এই প্রস্তুতির ভিত্তি বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। বর্তমান বিজ্ঞান, এমনকি অঙ্কশাস্ত্রের মূলানুসন্ধান করিলেও এই বিশ্বাস-স্বীকারের নিদর্শন মেলে। বিবেকানন্দের ধর্মব্যাখ্যা বিশেষ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি নিজে আত্মিক বিকাশের চরমে উঠিলেও এই মাটির পৃথিবীকে কোনদিনই ভুলিতে পারেন নাই। সেই কারণে পৃথিবীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। তাঁহার সেবাধর্ম সর্ব মানবের আত্মিক দৃষ্টির সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত—সেই কারণেই তাহা বড়ই উদার ও আদরের। বর্তমান বিশ্বের এই বিবাদের আলোড়নের দিনে বিবেকানন্দের বাণীই শান্তির সৌরভে উদ্ভাসিত।

এতদুপলক্ষে 'আণবিক যুগে বাণী' সম্বন্ধে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার পুরস্কারও প্রদত্ত হয়।

তেজপুর (আসাম): শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২৭শে ফাল্গুন বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৪তম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে চণ্ডীপাঠ, পূজা, হোম ও ভোগারতির পর প্রসাদ-বিতরণ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর এক সভায় প্রবীণ জননায়ক শ্রীমহাদেব শর্মার সভাপতিত্বে প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতা আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করে। পরিশেষে সভাপতি মহোদয়ের ভাষণে সকলে উৎসাহিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্র (কটক): ১৯৫৮ খৃঃ জুলাই মাসে বেলুড় মঠের স্বামী অসীমানন্দ মহারাজ কটকে আসিয়াছিলেন। কয়েকজন ভক্তের সহিত ধর্মালাপ করিবার সময় তিনি তাহাদিগকে সপ্তাহে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ করিবার জন্য উৎসাহিত করেন। সেই সময় হইতে কয়েকজন একত্র হইয়া প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে কথামৃত ও গীতা পাঠ করিতেছেন।

এই পাঠচক্রের একটি বিশেষ অধিবেশনে ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী অসঙ্গানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

গত ৪ঠা ফেব্রুআরি নিউইয়র্ক কেন্দ্রের স্বামী নিখিলানন্দ শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে কিছু বলেন।

প্রাচ্যবাণী: "শক্তি-সারদম্" অভিনয়

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে গত ১৫ই মার্চ, শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর পুণ্য জীবন অবলম্বনে ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী কর্তৃক রচিত বহু সঙ্গীত-সংবলিত সংস্কৃত নাটক "শক্তি-সারদম্" প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদস্য ও সদস্যাগণ কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল; অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরী প্রযোজনা করেন। মন্দিরের বিরাট চত্বরে এবং চতুষ্পার্শ্বে আর তিল মাত্র লোকধারণের স্থান ছিল না। কয়েক সহস্র লোক নীরবে নিবিষ্টচিত্তে এই নাটকাভিনয় আদ্যোপান্ত দর্শন ও শ্রবণ করেন। ফলহারিণী কালীপূজা, তেলো-ভেলো প্রান্তরে দস্যু ও লছমীনারায়ণ মারোয়াড়ী প্রভৃতির কাহিনী যেন চোখের সামনে সংঘটিত হইতেছিল; ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি ও হৃদয়ের চরিত্র সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মেদিনীপুর: স্বামী বিশোকাত্মানন্দজীর আহ্বানে এবার প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদস্য ও সদস্যাগণ গত ২২শে মার্চ আশ্রম-প্রাঙ্গণে সংস্কৃত নাটক "শক্তি-সারদম্" অভিনয় করেন। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ নাটকাভিনয়ের আরম্ভের পূর্ব হইতেই জনাকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং মেদিনীপুর, খড়্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত হন। অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় অভিনয় উপস্থিত সকলকেই মুগ্ধ করে।

ক্ষুদ্র শিল্প প্রদর্শনী ঃ

গত ১৫ই মার্চ কলিকাতায় ময়দানের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে একটি অভিনব মণ্ডপে মার্কিন ক্ষুদ্র শিল্প প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ভারতের আর্থনীতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র শিল্পের উপযোগিতা লক্ষ্য করেই মার্কিন যন্ত্রশিল্পীদের সহযোগে মার্কিন উদ্যোগেই প্রদর্শনীটি সংগঠিত। এমন সব যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম এখানে দেখানো হয়েছে, যেগুলি দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে। এসব যন্ত্রপাতি হাতেই চালানো যায়, সহজে স্থানান্তরে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া যায়, ছোট-খাটো ব্যবসায়ীরা সহজেই এগুলি ক্রয় করতে পারেন।

প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে সৌরশক্তি কাজে লাগানোর যন্ত্রগুলি ঃ সৌর চুল্লীতে (Solar Furnace) ৩০০০°C পর্যন্ত তাপ উৎপন্ন হয়, এতে ধাতু গলানো যায়। রান্নাবান্নার জন্য আছে সৌর উনান (Solar Oven) ও সৌর কুকার (Solar Cooker), রেডিও এবং টেলিফোন চালাবার জন্য আছে সোলার ব্যাটারি, দিনের বেলা এতে সৌর শক্তি সঞ্চয় ক'রে রাখা যায়।

শ্রমশিল্প-বিষয়ক বিরাট মণ্ডপে ২০টি ছোট-খাটো কারখানা আছে ঃ মেটাল স্পিনিং, গোল্ড প্লেটিং, মোটর বিল্ডিং, গ্রাইণ্ডার, বোরিং মেসিন প্রভৃতি; কাঠের কারখানা, স্বয়ংক্রিয় র‍্যাঁদা, কাচ বা হীরা কাটার জন্য এবং সূক্ষ্ম পাঞ্চিং বা ধাতুর ছাঁচ তৈরীর জন্য আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ-চালিত যন্ত্র—সবই বিস্ময়কর এবং কার্যকারী।

শিশুদের বিচিত্র খেলনা ও অভিনব পোষাক আসবাব-পত্র আকর্ষণের বস্তু।

পরলোকে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী

বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সাধক সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী তাঁহার গড়িয়াহাটা (কলিকাতা) স্থিত বাসভবনে গত ৪ঠা এপ্রিল রাত্রি ৯-৩৫ মিঃ ৮১ বৎসর বয়সে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে পরলোকগমন করেন।

তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা তথা ভারতের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সুধীর তিরোধান ঘটিল। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই মনীষী তাঁহার মধুর ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রসিদ্ধ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। কাশীতে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। শান্তিনিকেতনের প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই তিনি ইহার সহিত জড়িত ছিলেন এবং অধ্যাপকরূপে বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঃ

ন্যায়প্রকাশ, আগমশাস্ত্র, পালিপ্রকাশ, প্রাতিমোক্ষ, মিলিন্দপ্রশ্ন, যোগাচারভূমি, শতপথব্রাহ্মণ, চতুঃশতক, The Historical Introduction to the Indian Schools of Buddhism, The Basic Concept of Buddhism.

নানাস্থানে উৎসব

নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে আমরা উৎসবের সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি ঃ

ঢাকুরিয়া ও কলাইঘাটা (২৪ পরগনা), নীরদগড় (হুগলী), খেপুত (মেদিনীপুর)।

উৎসবে ও নিত্যপ্রয়োজনে
শতাব্দীর সুপরিচিত
লক্ষ্মীবিলাস
সর্ব্বঋতুর উপযোগী তৈল
এম,এল,বসু য্যাণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস • কলিকাতা-৯

Get more strength
out of your
FOOD
BE WISE TO PICK UP
Vanasda
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMIN A & D
BERAR OIL INDUSTRIES
AKOLA
BOMBAY
P.P.S/BL2-/69

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন)সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সরল রাজযোগ—৪র্থ সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি বুলের বাড়ীতে কয়েক জন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্ত্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ।৷৹ আনা।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। ১০২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামিজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোযিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজান হইয়াছে। পরিচয় এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবিসম্বলিত। মূল্য ১ম ভাগ ৫৲ ও ২য় ভাগ ৪৷৹ আনা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪৷৹ ও ৪।৹।

ভারতে বিবেকানন্দ—১২শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামীজির ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৬৪৫ পৃষ্ঠা মূল্য ৫৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪৷৶৹ আনা

দেববাণী—৭ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্রদ্বীপোদ্যান' নামক স্থানে কয়েক জন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন তাহার একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ২২৭ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৸৶৹ আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহিত অংশসমূহ বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সন্নিবেশিত। মূল্য ২।৹ আনা।

বিবেক-বাণী—১৬শ সংস্করণ। আচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজীর উপদেশাবলী। স্বামীজির বাষ্টসম্বলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। মূল্য ।৶৹ আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামীজির ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।৹ আনা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৶৹ আনা।

ভারতীয় নারী—১২শ সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান আদর্শ, পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজির মনোরম ছবি-সম্বলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।৹ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৶৹ আনা।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান—৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৩ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদান্ত-মত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে আর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ—যে গুলি না বুঝিলে ধর্ম জিনিষটাকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ১৷৹ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৶৹ আনা।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৩শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড় ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্য গণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট ও ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। মূল্য ১।৹ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৶৹ আনা।

সন্ন্যাসীর গীতি—১৩শ সংস্করণ। স্বামীজিরচিত 'Song of the Sannyasin' নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৶৹ আনা।

পওহারী বাবা—৯ম সংস্করণ। গাজীপুরের বিখ্যাত মহাত্মা পওহারী বাবার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। স্বামীজির হাফটোন ছবিযুক্ত। মূল্য ।৷৹ আনা।

হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ—৫ম সংস্করণ, ৯০ পৃষ্ঠা। ইহাতে হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা, হিন্দুধর্মের ক্রমাভিব্যক্তি, ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর ও ডাঃ পল ডয়সেন সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মূল্য ৸৹ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ।৷৶৹ আনা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৪র্থ সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ।৶৹; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ।/৹ আনা।

অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৪র্থ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। এই পুস্তক পাঠে চরিত-কথার কল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। মূল্য ১।০ আনা!

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৪র্থ সংস্করণ; আচার্য্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲ মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা—১ম সংস্করণ। স্বামী অরূপানন্দ প্রণীত। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা পুস্তক হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা।

ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন কথা। মূল্য ২৲ টাকা।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—২য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩॥০ আনা।

শিবানন্দ-বাণী—১ম ভাগ—৫র্থ সংস্করণ, ২য় ভাগ—২য় সংস্করণ স্বামী অপূর্ব্বানন্দ-সঙ্কলিত মূল্য প্রতি ভাগ ২॥০ আনা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। প্রথম ভাগ—(ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর) ৫ম সংস্করণ। দ্বিতীয় ভাগ—(ছান্দোগ্য) ৩য় সংস্করণ। তৃতীয় ভাগ—(বৃহদারণ্যক) ৩য় সংস্করণ। ইহাতে উপনিষদের মূল, সংস্কৃত, অন্বয়মুখে বাংলা প্রতিশব্দ, সরল বঙ্গানুবাদ এবং আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যানুযায়ী দুরূহ বাক্যসমূহের টীকা প্রভৃতি আছে। সুদৃশ্য ছাপা, কাপড়ের মনোরম বাঁধাই, ডবল ক্রাউন—১৬ পেজি, প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য—প্রতি ভাগ ৫৲ টাকা।

সাধু নাগ মহাশয়—৮ম সংস্করণ। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ১॥০ আনা মাত্র।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত) অতুলনীয় সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত 'গোপালের মা' এর সংক্ষিপ্ত আদর্শ জীবনের কাহিনী। মূল্য ॥০ আনা।

নিবেদিতা—১২শ সংস্করণ। শ্রীমতী সরলা বালা দাসী-প্রণীত। স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা। মূল্য ৷৹ আনা।

সৎকথা—স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত—৩য় সংস্করণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ (শ্রীলাটু) মহারাজের উপদেশাবলীর সংকলন। মূল্য ২৲ টাকা।

যোগচতুষ্টয়—স্বামী সুন্দরানন্দ-প্রণীত। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগের সংক্ষিপ্ত সরল বিবরণ। মূল্য ২৲ টাকা।

বেদান্তদর্শন—১ম খণ্ড—চতুঃসূত্রী। শাঙ্কর ভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ, রত্নপ্রভা টীকা, ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্বলিত। প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ টাকা।

স্তবকুসুমাঞ্জলি—৫ম সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত—বৈদিক শান্তিবচন, সূক্ত, প্রার্থনা ইত্যাদি বিবিধ সংস্কৃত স্তোত্রাদির অপূর্ব্ব সঙ্কলন। সংবাদপত্রসমূহে উচ্চ প্রশংশিত। মূল সংস্কৃত, অন্বয়, অন্বয়মুখে সংস্কৃতের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং মূলের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৩৲ টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৫ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ॥৵০ আনা।

আগে চলো—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। কিশোরদের জন্য লেখা। তরুণমনে সুনীতি, দেশাত্মবোধ, সেবা, আদর্শনিষ্ঠা এবং ধর্মপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক যৌবনোন্মুখ ছেলেমেয়েকে এই বইখানি পড়িতে দেওয়া উচিত। মূল্য ১॥০।

হিন্দুধর্ম পরিচয়—১ম ও ২য় ভাগ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সরল কথায় হিন্দুধর্মের মুখ্য বিষয়গুলির সহিত পরিচিত চেষ্টা এই বই দুখানিতে করা হইয়াছে। মূল্য ১ম ভাগ ॥০ আনা, ২য় ভাগ ৷৹ আনা।

দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য ও পূজা-পদ্ধতি—স্বামী কৈবল্যানন্দ-প্রণীত। মূল্য ১ম ভাগ (পরিবর্দ্ধিত ৪র্থ সংস্করণ ৷৵০, ২য় ভাগ (৩য় সংস্করণ) ১॥০।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী অদ্বয়ানন্দ : ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, এম. আই. প্রেস হইতে মুদ্রিত

Udbodhan-Phone : 55-2447 : April 1959 : Regd. No. C. 295

সম্পাদক—স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা—৩

৬১তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

বার্ষিক মূল্য ৫৲
প্রতি সংখ্যা ৷৹

উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বর্ষারম্ভ। বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইতে হয়। **বার্ষিক মূল্য সডাক ৫৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ৷৷০ আনা।

বিশেষ কারণ না থাকিলে প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইয়া থাকে। পত্রিকা না পাইলে সেই মাসের ২০ তারিখের মধ্যেই সংবাদ দিবেন।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, ইতিহাস, সামাজিক উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। **পত্রোত্তর ও প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত পাঠানো হয় না। সাধারণতঃ ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। ঠিকানাসহ স্বাক্ষরিত প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 'উদ্বোধনে' **সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক** পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপন ঃ—বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু মনোনয়নের সম্পূর্ণ অধিকার কার্যাধ্যক্ষের উপর থাকিবে। বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের পর পরবর্তী মাসে প্রকাশের জন্য কোন বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না। বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছান দরকার। "উদ্বোধনে"র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।**

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

ফোন ৩৪-৪৯৮২
বিখ্যাত স্বর্ণশিল্পী ও
প্রস্তরত্নকার
অন্নপূর্ণা জুয়েলারী হাউস
৮৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২
গ্যারান্টী যুক্ত গিনি সোনার গহনার
প্রতিষ্ঠান। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য
১৷৷ টাকার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন।

ডায়া-পেপ্‌সিন্
হজমশক্তি বজায় রেখে স্বাস্থ্যের উন্নতি করে
DIA-PEPSIN
ইউনিয়ন ড্রাগ • কলিকাতা

বুদ্ধ-ভাবনা

এবমাকাশনিষ্ঠস্য সত্ত্বধাতোরনেকধা।
ভবেয়মুপজীব্যোঽহং যাবৎ সর্বে ন নির্বৃতাঃ॥
*　　*　　*
পরান্তকোটিং স্থাস্যামি সত্ত্বস্যৈকস্য কারণাৎ॥

করুণাবতার শ্রীবুদ্ধের হৃদয় প্রতিটি প্রাণীর জন্য মৈত্রী-ভাবনায় পূর্ণ ছিল। জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তিনি সর্বদা সকলের কল্যাণচিন্তা করিতেন। নিজের সকল সাধনা ও সিদ্ধির বিনিময়ে সর্বপ্রাণীর নির্বাণ-প্রার্থনা বুদ্ধ-হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য।

তিনি বলিতেছেন: অনন্ত জগতে যত জীবলোক আছে, এবং তাহাতে যত জীব আছে, যতদিন পর্যন্ত তাহারা নির্বাণ-লাভ না করে--ততদিন নানারূপে নানাভাবে আমি তাহাদের আশ্রয় ও অবলম্বন হইব, সাহায্য করিব।

একটি মাত্র প্রাণীর জন্যও সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিব, দুঃখী দুর্গতদের পরিত্যাগ করিয়া আমি একা মুক্তি চাহি না।

কথাপ্রসঙ্গে

আমাদের ভাষা-সমস্যা

বহু বিচিত্র সমস্যার ভিড় ঠেলিয়া, ভাষা-সমস্যা আবার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—এবার একটু পরিবর্তিত আকারে। ভারতের বহু সমস্যার মতোই ভাষা-সমস্যাটিও জটিল। জোর করিয়া উহার জটিলতা দূর করিতে গেলে উহা আরও জড়াইয়া যাইবে। অনেক সমস্যার সমাধানই নির্ভর করে সময়ের উপর, মনে হয় ভাষা-সমস্যা তাহাদেরই একটি। এক্ষেত্রেও তাড়াহুড়া করিতে গেলে এমন জটিলতার সৃষ্টি হইবে যে জাতীয় জীবনে অন্য কঠিনতর সমস্যার উদ্ভব হইবে। অতএব ভাবিয়া চিন্তিয়া, অপেক্ষা করিয়া, চারিদিক দেখিয়া সমাধানের পথে প্রথম পদক্ষেপ করা উচিত।

ভাষা-সমস্যার সমাধান হয় নাই, তাই বলিয়া আমরা জলে পড়িয়া নাই—রাষ্ট্রযন্ত্রও অচল হইয়া যায় নাই। অতএব ব্যস্ত হইবার কি আছে? বরং দেখা যাইতেছে, যখনই পরিবর্তনের কথা উঠিতেছে তখনই দেশের কোন না কোন অঞ্চল হইতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিতেছে। ভাষার মতো একটি হৃদয়ের ব্যাপারে সামান্য সংখ্যাধিক্যের জোরে কিছু চালু করা হইলে ভবিষ্যৎ অসন্তোষের বীজই বপন করা হইবে।

ভাষা-সমস্যাটি চারিদিক দিয়া বুঝিতে গেলে (১) সর্বপ্রথম জানিতে হইবে—ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মোটামুটি তুলনামূলক সংখ্যা। (২) দ্বিতীয়তঃ জানিতে হইবে সংবিধানে (Constitution) ভাষা-সমস্যার কি ইঙ্গিত বা নির্দেশ পাওয়া যায়। (৩) সরকারী ভাষা-কমিশন (Official Language Commission) কি সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন? (৪) সর্বশেষ দেখিতে হইবে—এবিষয়ে লোকসভা কমিটি (Parliamentary Committee) কি সুপারিশ করিতেছেন।

শেষের পরেও অশেষ আছে। লোকসভার বাহিরেও চিন্তাশীল মানুষ আছেন, যাঁহারা দেশকে ভালবাসেন—ভাষাকে ভালবাসেন; বিভিন্ন কমিটি এবং কমিশনেও সকলে একমত হন নাই; যাঁহারা ভিন্ন মত পোষণ করেন তাঁহাদের চিন্তাও অবহেলা করা চলিবে না।

এবার সভা-সমিতি বা সম্মেলন করিয়া প্রতিবাদ বিজ্ঞাপিত হয় নাই; বরং দেখা যাইতেছে, দিনের পর দিন পত্র-পত্রিকায় ব্যক্তিগত মতামত প্রবল বন্যার মতো আসিতেছে। হইতে পারে বন্যার জল ঘোলা, কিন্তু উহাতেই আছে যথেষ্ট পলিমাটি, যাহা থিতাইয়া পড়িয়া আমাদের মানসভূমি উর্বর করিবে। ঝড় শান্ত হইলে আমরা সমাধানের ফসল কাটিতে পারিব।

(১) পরিসংখ্যান

১৯৫১ সেন্সাস অনুসারে ভারতে মোট ৮৪৫টি ভাষা ও উপভাষা আছে; তন্মধ্যে হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি ১৪টি প্রধান। শতকরা ৯১ বা ৩২.৩ কোটি লোক এই ভাষাগুলির অন্তর্গত। বাকীগুলি শতকরা ৯ জন অর্থাৎ ৩.২ কোটি লোকের ভাষা; তন্মধ্যে ২৩টি* উপজাতীয় সাঁওতালী (tribal) প্রভৃতি ভাষা বলে ১.১৫ কোটি, এবং ২৪টি* উপভাষা (dialect) মারোয়াড়ী প্রভৃতি ভাষা বলে ১.৭৭ কোটি জন। এতদ্ব্যতীত ৭২০টি বিভিন্ন ভারতীয় উপভাষায় কথা বলে মোট ২৮,৬১,০০০ জন। বাদ বাকী লোকে কথা বলে ইংরেজী* প্রভৃতি ১৩টি অভারতীয় ভাষায়।

*এই ভাষাগুলির প্রত্যেকটিতে কথা বলে লক্ষাধিক লোক।

১৪টি প্রধান ভাষার মধ্যে হিন্দী (হিন্দুস্থানী, উর্দু, পাঞ্জাবী সহ)-ভাষীর সংখ্যা ১৫ কোটি অর্থাৎ শতকরা ৪২ জন।

ভারতীয় সংবিধানের ১৪টি ভাষা

১। শুদ্ধ হিন্দী ভাষীর সংখ্যা		৯.০৬ কোটি অর্থাৎ		২৭ শতকরা	
২। তেলুগু	,,	৩.৩	,,	১০.২	
৩। মারাঠী	,,	২.৭	,,	৮.৩	
৪। তামিল	,,	২.৬৫	,,	৮.২	
৫। বাংলা	,,	২.৫	,,	৭.৮	
৬। গুজরাতী	,,	১.৬৩	,,	৫.১	
৭। কন্নাড়া	,,	১.৪৫	,,	৪.৫	
৮। উর্দু	,,	১.৩৬	,,	৪.২	
৯। মালায়ালাম্	,,	১.৩৪	,,	৪.১	
১০। ওড়িয়া	,,	১.৩১	,,	৪.০	
১১। আসামী	,,	.৫০	,,	১.৫	
১২। পাঞ্জাবী	,,	.০৮	,,	.২	
১৩। কাশ্মীরী	,,	.০৫	,,	.১৫	
১৪। সংস্কৃত	,,	.০১	,,	.০৩	

(২) সংবিধানে

সংখ্যাধিক্য জন্য দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দীকেই সরকারী ভাষা (official language) বলা হইয়াছে, কিন্তু ১৯৬৫ পর্যন্ত সরকারী কাজ-কর্মে ইংরেজী চলিবে; ইতিমধ্যে হিন্দীও ব্যবহৃত হইতে পারে। ১৫ বৎসর পরে যদি ইংরেজীর পরিবর্তে পরিপূর্ণভাবে হিন্দী ব্যবহার করা সম্ভব না হয়, তবে যতদিন এবং যে বিষয়ে প্রয়োজন বোধ হইবে ইংরেজী ব্যবহৃত হইবে। ১৪টি প্রধান ভাষা জাতীয় (National Languages) ভাষারূপে স্বীকৃত হইয়াছে; এগুলি বিভিন্ন রাজ্যে আঞ্চলিক ভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে। এগুলির মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য আছে।

উর্দু ব্যতীত সকল উত্তর-ভারতীয় ভাষার বর্ণমালাই ভারতীয় স্বর-পদ্ধতির অনুযায়ী, এবং দেবনাগরী লিপিতে লেখা সম্ভব। বার তেরটি স্থানীয় উপভাষায় রূপান্তরিত হইয়া হিন্দী প্রায় ১১টি রাজ্যে কথিত হয়। উনবিংশ শতাব্দী হইতে হিন্দীর রূপান্তর 'খরিবোলি' প্রামাণ্য ভাষারূপে গৃহীত, এবং অধিকাংশ লেখক এই ভাষাতেই লেখা পছন্দ করেন।

(৩) সরকারী ভাষা কমিশন

সর্বভারতীয় 'সরকারী ভাষা'প্রসঙ্গে এবার ভাষা কমিশনের বক্তব্য শোনা যাক। ১৯৫৭ আগষ্ট মাসে ইহা প্রকাশিত হয়। এই কমিশনে ২০ জনের মধ্যে ১৮ জনের মতঃ ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীকে সরকারী ভাষা করাই যুক্তিযুক্ত এবং সম্ভব। অপর দুইজন সদস্য—ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর সুব্বারাও ভিন্ন মত ব্যক্ত করেন। তবে অধিকাংশ সদস্যেরই মতঃ ১৯৬৫ খৃঃ মধ্যেই হিন্দীকে সরকারী ভাষা-রূপে চালু করা সম্ভবও নয়, প্রয়োজনও নাই। যত শীঘ্র সম্ভব এই পরিবর্তন আনয়ন করার জন্যই চেষ্টা করা উচিত। এই পরিবর্তনের পরেও বহির্বিশ্বের সহিত আদানপ্রদানের জন্য ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।

অধিকাংশ সদস্যের প্রধান প্রধান সুপারিশ:

১। অফিসে: সরকার সরকারী কর্মচারীদের হিন্দীভাষা শিখিতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

২। আদালতে: সুপ্রীম কোর্টে ও হাইকোর্টে হিন্দীতে এবং তন্নিম্ন কোর্টে আঞ্চলিক ভাষায় রায় দিতে হইবে।

৩। শিক্ষার ক্ষেত্রে: মাধ্যমিক স্তরে হিন্দী অবশ্য পাঠ্য। (হিন্দীভাষীদের অন্য একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করা বিষয়ে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের প্রস্তাব তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন)।

৪। বিশ্ববিদ্যালয় ও সর্বভারতীয় চাকরি-পরীক্ষায় ইংরেজী বা হিন্দী (বিকল্পরূপে) ব্যবহৃত হউক।

৫। হিন্দী ও আঞ্চলিক ভাষাসমূহের উন্নতির জন্য জাতীয় ভাষা পরিষদ গঠিত হউক।

রেলওয়ে, ডাক, শুল্ক প্রভৃতি সর্বভারতীয় বিভাগে হিন্দীর ব্যবহার বাড়ানো হউক; সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষাও থাকিবে—(should evolve a measure of permanent bilingualism).

সংখ্যাল্প সদস্যদের অভিমত :

১। সংবিধান সংশোধন করিয়া ইংরেজীর ব্যবহার সুদীর্ঘ দিনের জন্য বহাল রাখা হউক।

২। ভাষা লইয়া সাম্প্রতিক বিক্ষোভ লক্ষ্য করিয়া মনে হয় হিন্দী চালু হইলে জাতীয় একতা ক্ষুণ্ণ হইবে। হিন্দী ভারতের অন্যান্য অনেক ভাষা হইতে অপরিণত।

(৪) পার্লামেণ্টারি কমিটি

ভাষা-কমিশনের সুপারিশগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য ৩০ জন সদস্য লইয়া পার্লামেণ্টারি কমিটি (২০ জন লোকসভার, ১০ জন রাজ্যসভার) গঠিত হয়। গত ২২শে এপ্রিল এই কমিটি লোকসভায় তাঁহাদের সুদীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে যাহা সুপারিশ করা হইয়াছে তাহার সার মর্ম : ১৯৬৫ খৃঃ পর হইতে হিন্দীই প্রধান সরকারী ভাষা হউক, পার্লামেণ্টের নির্দেশানুসারে যেক্ষেত্রে যতদিন প্রয়োজন ইংরেজী চলিবে। আঞ্চলিক ভাষাগুলি নিজ নিজ রাজ্যে স্ব স্ব উন্নয়নে সমর্থ। ইংরেজী হইতে হিন্দীতে পরিবর্তন জোর করিয়া, সহসা না করিয়া ধীরে ধীরে করা হইবে।

উক্ত কমিটির ছয় জন ভিন্ন মত পোষণ করিয়া নিজ নিজ মন্তব্য পেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পাঁচ জনের মত--শীঘ্রই হিন্দী প্রবর্তিত হউক। ষষ্ঠ মিঃ ফ্রাঙ্ক এণ্টনি সমগ্র রিপোর্টটির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলেন : ভাষা-প্রশ্নে তাঁহার মৌলিক মত-পার্থক্য রহিয়াছে। তাঁহার মত—ইংরেজী একটি বিশিষ্ট সংখ্যালঘু ভারতীয় সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা; অতএব ইংরেজী ভাষাকে পঞ্চদশ জাতীয় ভাষারূপে স্বীকার করা হউক। ইংরেজী জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃত হইলে উহাকে আর বিদেশী ভাষা বলা চলিবে না। এখানে দ্রষ্টব্য—ইংরেজী যাহাদের শৈশবের ভাষা ভারতে এরূপ লোকের সংখ্যা মাত্র ১,৭২,০০০ হইলেও ভারতে শিক্ষিত শত করা ১৬ জনের মধ্যে ১ জন অর্থাৎ মোট প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক ইংরেজী বলিতে বা বুঝিতে পারেন, এবং তাঁহারাই বর্তমানে সর্বভারতীয় গঠনমূলক ব্যাপার-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতেছেন।

কমিটি সাধারণ ভাবে কমিশনের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন, দু'একটি বিষয়ে আংশিক মতানৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন। সরকারী ভাষা ইংরেজী হইতে হিন্দীতে পরিবর্তন ধীরে ধীরে এবং নিয়মিত ভাবে করিতে হইবে—যেন সকল পক্ষকে স্বল্পতম অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, অহিন্দী অঞ্চলের অধিবাসীরা কতটা হিন্দী আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রথম প্রথম ইংরেজীর সহিতই হিন্দী ব্যবহার করিতে হইবে। ক্রমশঃ স্বাভাবিকভাবে ইংরেজী উঠিয়া যাইবে।

ইংরেজীর সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা চলিবে না, উচ্চতর বিজ্ঞান-শিক্ষায় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ইংরেজী প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীকে এমনভাবে উন্নত করিতে হইবে—যেন উহা সর্বভারতীয় ভাবের ও কৃষ্টির বাহন হইতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে হিন্দীকে তাহার কিছু 'শুদ্ধতা' (purism) ত্যাগ করিতে হইবে, পরিবর্তে প্রয়োজন—স্বচ্ছতা ও সরলতা।

বিজ্ঞান ও আইনের পরিভাষা অনুবাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতীয় ভাষার সহিত হিন্দীকে একযোগে কাজ করিতে হইবে, তাহাতে জাতীয় ঐক্য সংহত হইবে। এতদুদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ লইয়া প্রতিনিধিমূলক একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হইতে পারে, ঐ কমিটি সময় সময় সমগ্র দেশের জন্য সাধারণ পরিভাষা (common terminology) প্রস্তুত করিবেন। বর্তমানে যথেচ্ছ অনুবাদে বহু দুর্বোধ্য ও হাস্যোদ্দীপক শব্দের আবির্ভাব ঘটিতেছে।

কমিটি কমিশনের সহিত একটি প্রধান বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই, কমিটির মতে উচ্চতর চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দী-ভাষাভাষীকে হিন্দী ছাড়া অন্য একটি ভারতীয় ভাষাতেও সমপর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে; তদুপরি ইংরেজীরও প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা চাই। পরীক্ষার বিকল্প ভাষা হিসাবে যথাশীঘ্র হিন্দী চালু করিতে হইবে।

কি কি ভাষা শিখিতে হইবে

'সরকারী ভাষা' সমাধানের এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়—সাধারণ ভারতবাসীকে তিনটি ভাষা শিখিতেই হইবে: (১) আঞ্চলিক বা মাতৃভাষা, (২) হিন্দী, (৩) ইংরেজী। হিন্দী-ভাষীদের দুইটি ভাষা শিখিলেই চলিবে—যদি তাঁহারা অপর একটি ভারতীয় ভাষা শিখিতে না চান। সংবিধানান্তর্গত সমানাধিকারের প্রশ্ন এখানে উঠিতেছে। সকলে সমান সুবিধা পাইতেছে না। হিন্দী-ভাষীদের অপর একটি (সর্বাগ্রে প্রতিবেশী অঞ্চলের) ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক করিয়া দিলে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাব আদানপ্রদানের পথ প্রশস্ত হইয়া সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়।

সংস্কৃত ভাষার প্রশ্ন

অতঃপর আর একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে: প্রাচীন (classical) ভাষা—বিশেষতঃ সংস্কৃতভাষা শিক্ষার স্থান কোথায়? নানা কারণে—প্রধানতঃ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্ম প্রভৃতির জন্য একটি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা প্রায় প্রত্যেক সভ্যদেশের বিশ্ববিদ্যালয়েই অনুমোদিত। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে একথা আরও বেশি প্রযোজ্য, কারণ সংস্কৃত এমনই একটি ভাষা—যাহা বায়ুর মতো অলক্ষ্যে থাকিয়াও (কথ্য ভাষা না হইয়াও) ভারতের প্রায় সকল ভাষায় প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং করিতেছে! সংস্কৃত ভাষার ভাব ও মর্যাদা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। এ সম্বন্ধে বহু মনীষী তাঁহাদের মত পৃথক্‌ভাবে 'সংস্কৃত কমিশন' মারফৎ সরকারকে জানাইয়াছেন। কেহ কেহ এমন মতও ব্যক্ত করিয়াছেন যে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ভারতের সরকারী ভাষা হইবার শক্তিও রহিয়াছে! এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে সংস্কৃত বহু দিন ধরিয়াই সর্বভারতীয় ভাষা; হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্র সর্বস্তরে না হউক, কোন না কোন স্তরে—কেহ না কেহ সংস্কৃত জানে ও বোঝে। ইংরেজী-প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে—কি ধর্মজগতে, কি দর্শনে, কি সাহিত্যে পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষাতেই ভাব বিনিময় করিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য ১৮শ শতাব্দীতে পর্যন্ত নূতন নূতন সংস্কৃত গ্রন্থ-রচনায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

লেখ্য 'সংস্কৃত' কখনও কথ্য ভাষা ছিল কি না, তাহা বিতর্কের বস্তু। কোন ভাষায় কথা বলা বা না বলা হইলেই যে ঐ ভাষা জীবিত বা মৃত হয়—এও কোন কথা নয়। মৃত ভাষাও যে উজ্জীবিত হইয়া রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে, তাহার সাম্প্রতিক প্রমাণ ইস্রায়েলের হিব্রু ভাষা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার মতো দুরাশা আমরা পোষণ করি না; তবে সংস্কৃতকে বর্জন করার, অবহেলা করার, অবনমিত করার যে প্রয়াস দেখা যায়, তাহাও আমরা সমর্থন করি না। সংস্কৃত চিরদিন সংস্কৃতির বাহন। যদি আমরা চাই জনসাধারণের ভাব ও ভাষা উন্নত হউক, জনগণ ভারতীয় ঐতিহ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী হউক, তবে অবশ্যই সাহিত্য ও দর্শনের অনুবাদগুলির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সম্মুখে মূল গ্রন্থগুলিও ধরিতে হইবে। রামায়ণ এবং মহাভারত—না হয় অনুবাদই

পড়িলাম, কিন্তু গীতা-উপনিষদের অনুবাদে কি মূলের শক্তি আছে? মানসিক অনুশীলনের জন্য সংস্কৃত ভাষা অপরিহার্য; ভাষা-বিজ্ঞানের বিচারেও সংস্কৃত একটি পরিপূর্ণ সার্থক ভাষা, যাহা চর্চা করিলে অপর ভাষার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয়। সর্বোপরি সংস্কৃত ভাষা দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীয় ঐক্যের প্রতীক! ইহাকে ক্ষুণ্ণ করা হইলে ভারতীয় ঐক্যের মূলেই কুঠারাঘাত করা হইবে।

চারটি না তিনটি ভাষা শিক্ষণীয়

শিক্ষাবিদ্‌গণের মতে বিদ্যালয়ে একসঙ্গে তিনটির বেশি আবশ্যিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া ঠিক নহে। সর্বপ্রথম মাতৃভাষা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবেই; তার পর সর্বভারতীয় ব্যবহারের উপযোগী কোন ভাষা। তাহা হিন্দী, না ইংরেজী, না সংস্কৃত? সে উদ্দেশ্যে যদি সর্বত্র জোর করিয়া হিন্দীকেই আবশ্যিকরূপে শেখানো হয়, তখন আসিবে বিজ্ঞানের ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজীর পালা। তারপর আর আবশ্যিক ভাষা হিসাবে সংস্কৃতের পালা আসিবে কি?

ইংরেজীর দ্বারাই যদি সর্বভারতীয় ভাষার কাজ হইয়া যায়, তবে পরবর্তী স্তরে ছাত্রেরা স্বেচ্ছায় হিন্দী শিখিয়া লইতে পারে। ভাল করিয়া প্রথমে মাতৃভাষা শিখিলে পরে হিন্দী শেখা নিশ্চয় শক্ত হইবে না। বিদ্যালয়ের নিম্নস্তরে ভাষাশিক্ষার অত্যধিক চাপ কমানো একান্ত প্রয়োজন।

সংস্কৃতকে বাদ দিয়া হিন্দী শিক্ষার বিরুদ্ধে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দৃঢ়ভাবে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, জোর করিয়া ভাষা-সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। নদী যেমন ধীরে ধীরে নিজেই তাহার পথ করিয়া লয় ভাষার ক্ষেত্রেও জাতীয় প্রতিভা কালক্রমে তাহাই করিয়া লইবে। এখন স্থিতাবস্থা রাখিয়া সরকারী ব্যাপারে ইংরেজী চালু রাখাই কর্তব্য। প্রাথমিক স্তরে আঞ্চলিক বা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা আবশ্যিক করিয়া শিক্ষার মান ও হার উন্নত করা উচিত। মাধ্যমিক স্তরে যেমন আছে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিখাইয়া উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে যখন মাতৃভাষা সম্যক আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে, তখন সরল হিন্দী শিক্ষা দিলেই—এবং প্রথমে হিন্দীভাষী অঞ্চলে হিন্দীকে সরকারী ভাষা-রূপে চালু করিয়া পরীক্ষা করিলে ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত হইবে; তবেই স্বল্পতম বাধার পথে জাতীয় জীবন অগ্রসর হইতে থাকিবে। নতুবা ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা যেমন দেশকে বিভক্ত করিয়াছে, তেমনই ভাষার নামে প্রাদেশিকতা আমাদিগকে আরও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে! এখনই তাহার পূর্বাভাস দিকে দিকে দৃশ্যমান! সাবধানতা অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ প্রস্তুতি!

A common language would be a great desideratum, but the same criticism applies to it—the destruction of the vitality of the various existing ones.

The only solution to be reached was the finding of a great sacred language of which all the others would be considered as manifestations, and that was found in Sanskrit.

—*Swami Vivekananda*

চলার পথে

'যাত্রী'

শিশু মায়ের কোলে উঠে আকাশের চাঁদকে মুঠোর ভেতরে ধরতে চায়, পারে না। আশা-নিরাশার বারিধি-দোলায় তখন তার ছোট্ট মনটি হয়ত ঢেউ-এর মতই ভাঙে আর গড়ে! কিন্তু বড় হয়েও যে আমরা চাঁদকে ধরতে ছুটি—তার নিদর্শন তো ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের কবিতায়, কাব্যে, গানে, এক কথায়, সাহিত্যের সর্বমানবিক আঙিনায়।

শুধু কি তাই? মানুষ তার জীবনের সবটুকু পরিসরকেই শশিকলার ক্ষয়-বৃদ্ধির গজকাটিতে মেপে নিতে চেয়েছে। তাইতো মানবের জীবনে পূর্ণিমা-অমাবস্যার জোয়ার জাগে; ধর্মাচরণের অনেক কিছুই চাঁদকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়,—রচিত হয় কত স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিকথা। এই রকম এক পূর্ণিমাকে ঘিরেই শ্রীবুদ্ধের অলৌকিক জীবন ও বাণী মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল। বুদ্ধ-পূর্ণিমার এই দিনটিতেই দেবদহের শালবনেতে শ্রীবুদ্ধের জন্ম, কুশীনারায় তাঁর মহাপ্রয়াণ ও বোধগয়ায় তাঁর নির্বাণ জড়িয়ে গিয়ে মানুষের মনের অনেক গ্রন্থিকেই খুলে দিয়ে গেছে।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগেকার কথা। কুশীনারার (বর্তমান কুশীনগরের) শালবনে পূর্ণচন্দ্রের আলোকবন্যা সেদিন বাঁধ ভেঙ্গে উপচে পড়ছে। সেই নির্জন বনানীতে পাচ শতাধিক ভিক্ষুর গৈরিক আভায় কেমন এক অপার্থিব করুণা পড়ছে ঝরে। গৈরিকের লাল আভা ও চাঁদের রূপালী আলোক সেই মহানির্বাণ-যাত্রীর নিঃসীম মৌনতায় জড়িয়ে করেছে এক অভূতপূর্ব আবেশের সৃষ্টি। বনের মাথার উপরের ঐ আলোক-বন্যা আর-এক বিশ্রুত-জ্ঞানের আলোক-ঝর্ণার সঙ্গে মিশে প্রবাহিত করেছে এক অপূর্ব ভাবস্রোতকে। আর তার মাঝে ঐ ভাব-উৎসের কেন্দ্রমণি শ্রীবুদ্ধ আজ মরজগতের দেনাপাওনা মিটিয়ে দিয়ে মহাপরিনির্বাণের জন্য প্রস্তুত।

রাত্রি শেষ হ'য়ে আসছে। চাপা কান্নার মর্মন্তুদ বেদনা নিয়ে শ্রীবুদ্ধের পাশে বসে রয়েছেন প্রিয় শিষ্য 'আনন্দ'। তথাগতের শায়িত দেহের দক্ষিণপার্শ্বমাত্র কাষায় বস্ত্রের উপর পরিলক্ষিত। পদযুগলের একটি অপরটির উপর পূর্ণ মিলনের অপূর্বতায় স্তম্ভিত। মুখে মনোরম হাসির প্রশান্ত দীপ্তি! এমন সময়ে তিনি আবার তাঁর অমৃতময় বাণী উচ্চারণ করলেন—বললেন, 'জেনে রাখ আনন্দ, এই পাচশত শিষ্যের মধ্যে সবাপেক্ষা শক্তিহীনেরও আসবে মহাজ্ঞানের নির্দেশ; এদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা জ্ঞানহীনও লাভ করবে নির্বাণকে।' আশীর্বাদের এই মহাসমতার আলোড়নে সকলেরই শোকার্ত মনে জাগল মহাজাগরণের প্রাণ-স্পন্দন। মহা-আশ্বাসের ঐ ওজস্বিতা বনানীর প্রতিটি শালগাছের তীক্ষ্ণ ঋজুতার সাথে মিশে একলক্ষ্য হ'য়ে উঠল।

বুদ্ধ আবার বললেন, 'মনে রেখো, এই মাটির পৃথিবীর সব কিছুকেই মৃত্যু এসে মুছে দেবে, শুধু চিরভাস্বর থাকবে সেই অমৃতের বাণী—সেই মহাজ্ঞানের দীপান্বিতা—যা মৃত্যুকে মুছে দিয়েও শাশ্বত আলোক-বর্তিকাকে ধ'রে রেখেছে।' মহাপরিনির্বাণের পূর্বমুহূর্তে শ্রীবুদ্ধের এই বাণী এই জগতের জন্য এক অনুপম অভী-মন্ত্র রেখে গেল।

এ কথা যিনি শুনালেন তিনি কি কখন শূন্যবাদী হ'তে পারেন? ঐ মহা-শাশ্বতকে ধ'রেও তিনি কি কখন নাস্তিকের মতো বলতে পারেন, আমি শূন্যকে ধরেছি? এ সব প্রশ্নের মীমাংসার জন্য এ যুগের মহাপরিনির্বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শোনা যাক্। তিনি বলেছেন, 'নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কি জান? বোধ-স্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে তাই হওয়া, বোধস্বরূপ হওয়া।' (কথামৃত, ৩।২৫।১)

প্রাচীন শাস্ত্রের দিকে তাকালেও একথা বুঝতে পারি। শ্রীবুদ্ধ নির্বাণকে 'সু-দুর্দর্শ' (মজ্ঝিম নিকায়, ১।১৬৭) বলেছেন, কঠোপনিষদেও (১।২।১২) ব্রহ্মকে 'দুর্দর্শম্' বলা হয়েছে। বুদ্ধদেব যাকে বললেন 'নির্বাণ নিষ্প্রপঞ্চ' (সংযুক্ত নিকায়, ১২), বেদান্তে তাকেই বলেছে 'প্রপঞ্চোপশমং শান্তম্'—(মাণ্ডূক্য, ৭)। তাছাড়া বুদ্ধদেবের 'মহাশূন্য'-উক্তি (ধম্মপদ, ৯২) উপনিষদের 'সঃ অয়ং শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ', কিংবা মৈত্রায়ণী উপনিষদের (২।৪) 'সঃ বৈ এষঃ শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তঃ'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই বৌদ্ধ 'নির্বাণ' ও বেদান্তের 'তুরীয়-ব্রহ্ম' সেই একই নিষ্পত্তিকে ধরেছে। এই স্বীকারোক্তি স্বামীজীর কথাতেও রয়েছে : It (Nirvana) is exactly the same as the Brahman of the Vedantists. (C W II, p. 194)

তবে এটা ঠিক—সেই মহানন্দের, মহাবিকাশের ও মহাসত্যের রাজত্বের সূর্যহীন, নিশ্চন্দ্র, তারকা-শূন্য বিদ্যুদ্-বিহীন অগ্নি-হারা মহা-আলোকের আনন্দোৎসবে সবারই জন্য সমান আহ্বান ভেসে আসছে। সেই আহ্বানে কি সাড়া দেবে না, পথিক ? সেই আলোকের রাজত্বে, সেই আনন্দের প্রশান্ত অতিশয়তায়, সেই চিরস্থিরের মৃত্যুহীন সীমাহীনতায় চল পথিক, এগিয়ে চল। সেখানে গেলে সত্যই দেখবে 'ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।' আজকের এই বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিনে চল, চল পথিক, সেই জ্যোতিঃস্নান ক'রতে চল। শ্রীবুদ্ধের আশীর্বাদে ভরে নাও তোমার জীবন। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ !**

সে আলো

শ্রীশান্তশীল দাশ

সে আলো মাঝে মাঝে জ্বলে দেখি উজল হ'য়ে
ঘুচিয়ে দিয়ে সকল কালো ;
সে আলোর তুলনা কই ? অনেক ঘন অন্ধকারে
জানি নাতো কে জ্বালালো !

সে আলো দেখি শুধু চেয়ে চেয়ে, আশ মেটে না,—
দেখি শুধু নয়ন ভরে ;
সে আলো অঙ্গে মাখি যতন ক'রে, মন ভ'রে নিই,
সব অবসাদ যায় যে সরে।

সে আলো কোন বারতা নিয়ে আসে দিব্যলোকের,
স্বর্গ রচে এই ধরাতে ;
সে আলো অমৃতময়, স্নিগ্ধ আরাম দুর্বিষহ
আধি-ব্যাধির যন্ত্রণাতে।

সে আলো হারিয়ে যে যায় ; রাখবো তারে আপন ক'রে,
সে-মন্ত্রটি কোথায় যে পাই—
সে আলো ধরা দিয়েও দেয় না ধরা, পলায় দূরে ;
পেয়েও তাকে আবার হারাই।

আমাদের মা

শ্রীমতী মৃন্ময়ী রায়

আকাশ ও পৃথিবী—কোথায় কেন তারা এক হয়েছে কেউ তা জানে না। তবু উভয়ে তারা উভয়ের পরিপূরক। একজন ছাড়া আর এক জনকে কল্পনা করা যায় না। মা ও মেয়ে—সন্তান যখন মায়ের নামে মায়ের কাছে ছুটে চলে, কোন বাধা কোন বিপত্তি সে মানে না। আবার নিত্যসম্বন্ধে মিলেছে নদী সমুদ্র। সমুদ্র অহরহ তার বিশাল উদাত্ত কণ্ঠে নদীকে ডাকছে—ওরে আয়, ওরে আয়! নদীও মুহূর্তের জন্য দ্বিধা না ক'রে নিজের অস্তিত্ব লুপ্ত ক'রে ছুটে চলেছে সমুদ্রের পানে। সমুদ্রের বুকে সে পাবে চরম ও পরম শান্তি। শুধু নদী তো অপূর্ণ—সমুদ্র ব্যতীত। সমুদ্রেরও প্রয়োজন আছে নদীতে।

যেমন আকাশ ও মাটি, যেমন নদী ও সমুদ্র, তেমনি একত্র বাঁধা আছে আমাদের হৃদয় জুড়ে দুটি নাম—শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদামণি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদামণি নাম দুটি মিলে সেই মিলনকেন্দ্র হতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—এক বিগ্রহমূর্তি, পরিপূর্ণ সার্থক। সে বিগ্রহে না আছে কোন অপূর্ণতা, না আছে কোন অভাব। সে মূর্তিতে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে—সত্য, শিব ও সুন্দর। ঠাকুর ও মায়ের যুগ্ম সাধনায় এক মঙ্গলময় সুন্দর সত্যের অভিব্যক্তি ঘটেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামণি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। শুধু যে শ্রীসারদাই শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া অপূর্ণ তা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণতার জন্যও শ্রীসারদামণি সমভাবেই প্রয়োজনীয়। শ্রীমাকে বাদ দিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের অঙ্গহানি ঘটবে। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন শক্তির পূজারী, পরমারাধ্যা শক্তিময়ীর উপাসনায় তিনি দেহমন সমর্পণ করেছিলেন, নিমগ্ন হয়েছিলেন কঠিন সাধনায়।

আর সেই সাধনার শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন মা সারদা। আমাদের এই আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান ভারতে যুগ-যুগান্ত ধরে নারীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। নারীর মধ্যে আছে সেই মহাশক্তি, যে শক্তির উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা এই পার্থিব জগৎ ছাড়িয়ে চলে যাব উচ্চতর লোকে। পুরুষ কর্তা, সে সম্পাদন করে কর্ম; নারী পুরুষের শক্তি—সে তাকে যোগায় প্রেরণা। এই সত্যের প্রকাশ ঘটেছে শ্রীমার জীবনে। তিনি যেন সৃষ্টির অমোঘ বিধানে শ্রীরামকৃষ্ণকে এই শক্তি ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্যই এই ধরণীতে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। এই যে তাঁর চিরকালের কর্তব্য। তাঁর ভাগ্য যে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অদৃশ্য সূত্রে গাঁথা আছে, তাঁর দেবী-মন সে কথা পূর্বাহ্নেই তাঁর মুখ দিয়ে বলিয়েছিল। তাঁর স্বয়ম্বরা হবার ঘটনাটি সুপ্রসিদ্ধ। শিশু সারদামণি যে সেদিন বরণ করেছিলেন, বেছে নিয়েছিলেন বহু লোকের মধ্য হতে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে। সে তাঁর বিচার-বিবেচনার ফল নয়, বিচার ক'রে কর্তব্য নির্ধারণের বয়স তখনও তাঁর হয়নি। তাঁর এই নির্বাচনের মূলে ছিল এক দৈবী শক্তি—যে শক্তি শিশু সারদার ক্ষুদ্র অঙ্গুলি নির্দেশের মাধ্যমে তাঁরই ভাগ্যকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করেছিল। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যুগাবতার

শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ত্যলীলাসহচরী, প্রেরণাদায়িনী সারদামণি তাঁর দৈব-নির্দেশিত পথে প্রথম পা বাড়ালেন; এই প্রেরণা যোগানোর কাজটি সহজসাধ্য ছিল না,—কারণ শ্রীমা শুধু প্রেরণা যোগানোর কাজটুকুই সম্পাদন করেননি; আপনার হাতে পথ নির্মাণ ক'রে, সেই পথ অতিক্রম ক'রে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রেরণাদানের উপযোগী হয়ে কাছে এসেছিলেন। এই শতলোকের মধ্য হতে পতি-নির্বাচনের শুভক্ষণ থেকে তার জন্য পথ প্রস্তুতের কাজে হাত দিয়েছিলেন শ্রীমা। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ সাহায্য করেছেন সর্বদা তাঁর প্রেরণাদাত্রীর এই আগমনের কাজে। অতি সাধারণ মানুষ আমরা, লীলাময় ঠাকুর কি ভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁর ঐশ্বরিক শক্তিরূপিণীকে পথ নির্মাণ ক'রে তাঁর শুভ আগমনে, তার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের ধারণার অতীত। তবে তার প্রথম বাহ্য প্রকাশ ঘটেছিল মনে হয় সেদিন, যেদিন চতুর্বিংশতি বর্ষে উপনীত ঠাকুর মাত্র পঞ্চমবর্ষীয়া ভাবী বধূর সম্বন্ধে বলেছিলেন: 'জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়ীতে দেখগে, ক'নে সেখানে কুটো-বাঁধা আছে।' সেই পূর্বনির্দিষ্ট ক'নের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহ হয়ে গেল—প্রেরণা যোগানোর পথ বেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরও নিকট সান্নিধ্যে এসে দাঁড়ালেন মা।

তারপর এল সেই শুভদিন! দুর্গম শৈল-পথের সকল বাধা কাটিয়ে তরঙ্গিণী এবার সহজ পথে ছুটল সমুদ্রের পানে—পথশ্রমে ক্লান্ত অসুস্থ সারদামণি বহুদিনের অদর্শনের পর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছলেন। সমাদরে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন ঠাকুর—ঔষধপথ্যের বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে, দেখাশুনা ক'রে যত্ন করলেন তাঁকে। সারদামণি সুস্থ হয়ে উঠলে দক্ষিণেশ্বরের নহবতে তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হ'ল শ্বশ্রূমাতা চন্দ্রাদেবীর সঙ্গে। একাদিক্রমে তিন-চার বছর শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন বা তাঁর কাছ থেকে কোন প্রকার আহ্বান না পেয়ে সারদা ভেবেছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ভুলেই গেছেন বুঝি বা। আজ তাঁর স্নেহপূর্ণ আন্তরিক ব্যবহারে তিনি বুঝলেন যে তাঁর দেবতা আগের মতই আছেন। সারদামণির প্রতি তাঁর ঐকান্তিক স্নেহ এতটুকুও হ্রাস পায়নি, তাঁদের অন্তরের যোগাযোগ ক্ষুণ্ণ হয়নি।

একদিন একান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি আমাকে সংসারের পথে টেনে নিতে এসেছ?' সারদামণি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'তোমাকে সংসারের ভেতর টানব কেন? তোমার জীবনের ব্রতে সহায় হ'তে এসেছি।' এই কথাবার্তার শুভ মুহূর্তে শক্তিরূপিণী মা সারদা শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরমধ্যে প্রবেশ করলেন। শুধু কি তিনি দক্ষিণেশ্বরেই এসেছিলেন রামকৃষ্ণের ব্রতে সহায়তা করতে? জগতে তাঁর আবির্ভাবই যে এই জন্য। উত্তরকালে অসুস্থ অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে বহুবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এর পর শ্রীমাকে আরও অনেক দায়িত্ব নিতে হবে, ভক্ত-জননী সঙ্ঘ-জননীরূপে অনেক কর্তব্য তাঁর জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা যে কঠিন ব্রতে ব্রতী হয়েছিলেন, তাতে উভয়ের জন্য নির্দিষ্ট সব কর্তব্যগুলি সমাপন করলে তবে না তাঁদের ব্রত সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হবে। সে কি সহজ ব্রত, সে কি সাধারণ সঙ্কল্প! একটা দেশ মানসিক অবনতির পথে ধাবমান, একটা জাতি তলিয়ে যাচ্ছে দুর্নীতির অতলান্ত পঙ্কে, বৈদেশিক-তার মোহে দলে দলে লোক দৃঢ় করে ছিন্ন করছে আপন সমাজ, সংস্কার, ধর্মনীতি—সব বন্ধন; সেই অবনতির বন্যাস্রোতের মুখে বাধা হয়ে দাঁড়ানো—সে কি মুখের কথা, সে কি সহজ কাজ?

তারই প্রস্তুতিতে আজ তাই নবজীবনের

আহ্বান শ্রীমা অতি সহজেই গ্রহণ করলেন। তাঁর অন্তর্মূর্তিটি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনমার্গে শক্তিময়ী হয়ে প্রকাশ পেল, আর সেই সঙ্গে তাঁর বহির্মূর্তিটি নিয়ত ব্যাপৃত রইল ঠাকুরের সর্ববিধ পরিচর্যায়। নহবতের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অসূর্যম্পশ্যা হয়ে থেকে স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। শুধু সাধনার ক্ষেত্রে প্রেরণারূপে নয়, শুধু সঙ্কল্পিত ব্রতে নীরব পার্শ্বচারিণীরূপে নয়, কঠোর ও অত্যুগ্র সাধনে জীর্ণ শীর্ণ শ্রীঠাকুরের নশ্বর দেহটিকে একটু সুস্থ রাখার জন্যেও শ্রীমায়ের সেবামূর্তিটি আবশ্যক ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীসারদামণিকে দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন সারদা প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা, আমি তোমার কে?' চিন্তামাত্র না ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন, জন্মদাত্রী যে মা সম্প্রতি নহবতে আছেন, তুমি আমার সেই মা আনন্দময়ী।' সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীসারদামণিকে জগন্মাতারই মানবী মূর্তি বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং সারদামণির প্রতি তাঁর আচার-ব্যবহারও তার প্রমাণ দিত। এই কথার তাৎপর্য যে তাঁর কাছে কত গভীর ছিল, কত নিগূঢ় ছিল তার চরম প্রকাশ ঘটেছিল জ্যৈষ্ঠের সেই শুভ অমাবস্যা তিথিতে, যেদিন ফলহারিণী কালিকা পূজা এক নবরূপ পরিগ্রহ করেছিল।

মন্দিরে সেদিন ফলহারিণী কালীপূজা। শ্রীরামকৃষ্ণের মনে এক নূতন ভাবের জোয়ার এল। হৃদয়কে ডেকে বললেন, তাঁর নিজের ঘরে দেবীপূজার ষোড়শোপচার আয়োজন প্রস্তুত করতে। শ্রীসারদামণিকে পূজাকালে উপস্থিত থাকবার জন্য খবর পাঠালেন। তারপর অমাবস্যা তিথির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হ'লে শ্রীসারদামণিকে ডাকিয়ে আনলেন ঠাকুর। পূজার আয়োজন তখন সুসম্পূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতে আলপনা দেওয়া পিঁড়ির উপর শ্রীসারদাদেবী পশ্চিমাস্যা হয়ে উপবেশন করলেন। তাঁর সম্মুখে পূজকের আসনে পূর্বাস্য হয়ে বসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে মন্ত্রপূত বারি দ্বারা অভিষিক্ত করলেন। তাঁর অন্তরস্থিত দিব্য শক্তিকে জাগ্রত করবার জন্য, উদ্বুদ্ধ করবার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন।

সারদাদেবী বাহ্যজ্ঞানশূন্যা, সমাধিস্থা! শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তাঁর পূজা করলেন। ভোগ নিবেদন ক'রে কিয়দংশ দেবীর মুখে দিলেন। মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তিনিও সমাধিমগ্ন হলেন। অপার্থিব উচ্চতর লোকে, দেহাতীত আত্মার জগতে উন্নীত হয়ে, কুসুম-পবিত্র দুটি হৃদয় আত্ম-স্বরূপে একীভূত হয়ে গেল। অর্ধবাহ্যদশায় প্রত্যাবর্তন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবীর চরণে আত্মনিবেদন করলেন—সুদীর্ঘ সাধনার ফলরাশির সঙ্গে জপের মালাও তাঁর পাদপদ্মে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়ে প্রণাম করলেন। —'মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে দেবী-উপাসনায় শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সাধনা শেষ, আর সারদাদেবীর শুদ্ধ দেহ ও মনের আধারে যুগধর্মপালনী মহাশক্তি শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আরম্ভ।'

প্রাত্যহিক ব্যবহারেও শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমার সঙ্গে অত্যন্ত সসম্মানে কথা বলতেন। শ্রীমা তাঁর জন্য যখন খাবার নিয়ে আসতেন 'মা ব্রহ্মময়ী, মা ব্রহ্মময়ী' বলে তিনি উঠে পড়তেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্রাম করছেন দেখে মা নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় লক্ষ্মী (ভ্রাতুষ্পুত্রী) মনে ক'রে ঠাকুর চোখ বুজেই বললেন, 'দোরটা ভেজিয়ে যাস্।' শ্রীমা বললেন, 'আচ্ছা'। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে ঠাকুর লজ্জিত ও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বারবার বলতে লাগলেন, 'আহা তুমি! আমি ভেবেছিলুম

লক্ষ্মী, কিছু মনে কোরোনি।' পরদিনও নহবতে গিয়ে বলছেন, 'ছাখ গো, সারা রাত ভেবে ভেবে আমার ঘুম হয়নি, কেন এমন কথা বলে ফেললুম!' মা ঠাকুরের পায়ে হাত বুলিয়ে দিলে তিনি শ্রীমাকে নমস্কার করতেন।

আবার শ্রীমার আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বপ্রকার দায়িত্ব ঠাকুর নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। যে আধ্যাত্মিকতা শ্রীমার অন্তরে সুপ্ত ছিল শ্রীঠাকুর তাকে জাগ্রত করলেন। তিনি তাঁকে উর্ধ্বতর লোকের মাধুর্য সম্বন্ধে বলতেন। তিনি শ্রীমাকে হাতে ধরে সর্বপ্রকার সাধনা শিখিয়েছিলেন। প্রথম থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল শ্রীসারদামণিকে আপনার দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনের সহকারিণীরূপে গড়ে তোলা। তারই প্রস্তুতিতে শ্রীমার সাধনা চলেছিল। প্রত্যহ প্রত্যূষে তিনি নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যান-জপ করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লক্ষ্য রাখতেন, শ্রীমা ধ্যানে বসেছেন কিনা। প্রতিদিন পঞ্চবটীতে যাবার পথে তিনি খোঁজ নিতেন। সেই যে উষাকালে শয্যা ত্যাগ ক'রে ধ্যানে বসা অভ্যাস হয়েছিল, শ্রীমা জীবনের শেষ পর্যন্ত সে অভ্যাস রক্ষা করেছিলেন। অসুস্থতার জন্যও কোনদিন কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণের সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সর্বপ্রকার অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ভাবসমাধি ছিল তাঁর করতলগত। কিন্তু নিজের উপর সংযমের বাঁধ শ্রীমার এত সুদৃঢ় ছিল যে, তাঁর ভাবসমাধি প্রায় কেউই কখনও দেখতে পেত না।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর শ্রীসারদামণি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়ে বহুকাল কাটান। একদিন ধ্যানকালে তাঁর যে আনন্দময় অনুভূতি হয়, তিনি তা সখীস্বরূপা যোগীনমার কাছে ব্যক্ত করেন: দেখলাম যেন কতদূরে চলে গেছি, সকলেই আমাকে ভালবাসছে, কি রূপ আমার! ঠাকুরও রয়েছেন। সকলে কি যত্নে আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দিলে। কি আনন্দ হচ্ছিল, সে আর ভাষায় বলতে পারি না। যখন মন নেমে এল, দেখলাম শরীরটা পড়ে রয়েছে, ভাবছি কি ক'রে ওটার ভেতর ঢুকব? খানিক পরে শরীরের চেতনা ফিরে এল।

শ্রীশ্রীমায়ের ওপর ঠাকুর অনেকখানি নির্ভর করতেন। নহবতের অতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে হৃদয়ের যে বিশাল দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়েছিল, যে কল্যাণ হস্ত-দুটি জগৎজনকে অঙ্কে নিতে প্রসারিত হয়েছিল, সেই বিশ্বজননীর ওপর বহু সুকঠিন দায়িত্ব দেবার আকাঙ্ক্ষা রাখতেন শ্রীঠাকুর। তাই পাছে তাঁর লীলাসংবরণের পর শ্রীশ্রীমায়েরও সেই ইচ্ছে হয়, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁকে বলেছিলেন: আমার শরীরটা চলে গেলে তুমিও যেন শরীর ছেড়ে চলে যেও না! শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়! এই যে লোকগুলো ঈশ্বরকে ভুলে অন্যায় কাজে লিপ্ত রয়েছে—পাপের অন্ধকারে পোকার মত কিল্ বিল্ করছে, কত দুঃখ ভোগ করছে! তুমি তাদের দেখবে, কেমন ক'রে ঈশ্বরকে ডাকতে হয় শেখাবে, শক্তি দেবে, ভক্তি দেবে। দুজনে এক কাজ করতে এসেছিলাম। আমি কিই বা করেছি? তোমাকে তার অনেক বেশী করতে হবে; তুমি আমার বাকী কাজ পূর্ণ কোরো।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেহরক্ষা করবার পর তাঁর অদর্শনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠল। ঠাকুরের সেবায় অমানুষিক পরিশ্রম করাটাই শ্রীমায়ের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এই দীর্ঘ দিনে। তাই ঠাকুর-হীন জীবন তাঁর বুকে পাথরের মতো ভারি বোধ হ'ল। তখন মাঝে মাঝে তাঁর মনে হ'ত—'কি হবে এত কষ্ট সহ্য ক'রে? চলে যাই তাঁর কাছে।' একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখা

দিয়ে বললেন, 'না তুমি থাক, অনেক কাজ বাকী আছে।'

শ্রীঠাকুরের কথা সার্থক করতে শ্রীমা এই ধরাধামে রইলেন। তাঁর অগণিত সন্তান-মধ্যে তিনি স্নেহময়ী জননীরূপে বিরাজ করতে লাগলেন। তাদের সংশয় করলেন দূর, তাদের শোনালেন শান্তির বাণী, যোগালেন শক্তি ও প্রেরণা। সেই মাতৃদেবীর স্নেহাঞ্চল-ছায়ায় সন্তানগণ পেলেন নির্ভয় নিশ্চিন্ত আশ্রয়, আর গড়ে তুললেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ।

শ্রীমায়ের আশীর্বাদের প্রেরণা নিয়ে পূজ্যপাদ স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা বহন ক'রে আমেরিকায় যান। তার আগেই একদিন মায়ের দর্শন হয়: শ্রীরামকৃষ্ণ ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গঙ্গায় মিশে গেলেন, আর নরেন্দ্রনাথ সেই জল দিকে দিকে ছিটিয়ে দিতে দিতে বলছেন, 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ'—অমনি অগণিত নর-নারী মুক্তি লাভ করছে, ধন্য হচ্ছে। নরেন্দ্রের জীবনের সুমহৎ ব্রত বুঝতে শ্রীমায়ের দেরি হ'ল না, দেখলেন ঠাকুর তাঁর শ্রীহস্তে স্বামীজীকে ধরে আছেন। তাই মাদ্রাজ থেকে মায়ের আশীর্বাদ ও অনুমতি প্রার্থনা ক'রে যখন তিনি চিঠি দিলেন, তখন স্নেহশীলা জননী প্রিয়তম পুত্রটিকে দূর বিদেশে যেতে অনুমতি দিয়ে অজস্র আশীর্বাদে তাঁর বিজয়-পথ সুগম ক'রে দিলেন। উত্তরকালে স্বামীজী বলেছেন: মায়ের আশীর্বাদেই এক লাফে হনুমানের মত সাগর ডিঙিয়েছি। মায়ের কৃপা আমার ওপর বাপের কৃপার লক্ষগুণ অধিক।

শ্রীমা আপনাকে গোপন রেখেছিলেন চিরদিন। তাঁর ধ্যান-ধারণা, তাঁর চিন্তার খুব অল্প অংশই তিনি প্রকাশ ক'রে বলেছেন। তবুও যেটুকু উপদেশ, যেটুকু কল্যাণবাণী তিনি শুনিয়েছেন, তার পরিমাণ করা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে অসম্ভব। মায়ের শেষ উপদেশ: যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখ না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার ক'রে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার। —এই শেষ বাণীর মাঝেই শ্রীমায়ের সমগ্র জীবন ও সাধনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

তিনি ছিলেন অদোষদর্শিনী, ক্ষমা-স্বরূপিণী। মাতা সন্তানের সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন। মাতৃত্বের এই মহাসাধনা বলেই মা সকলকে আপনার করেছিলেন। সকলেই ছিল তাঁর সন্তান। তিনি ছিলেন সকলের সত্যিকারের মা। শ্রীমায়ের অগণিত সন্তানের মধ্যে নিবেদিতা একজন। নূতন দেশের নূতন মাটিকে আপনার করবার মহান্ মন্ত্র নিয়ে তিনি এদেশে এসেছিলেন, আর এসে যে 'নতুন মা'টিকে পেয়েছিলেন তাঁর স্নেহ-পক্ষপুটে তিনি পেয়েছিলেন সুকোমল আশ্রয়। সে আশ্রয় তাঁর সামনে শান্তিময় আনন্দনিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিল।

সিষ্টার নিবেদিতা শ্রীমা সম্বন্ধে বলেছেন, 'নারীর আদর্শ সম্বন্ধে সারদাদেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা।' শ্রীমা ছিলেন পুরাতনের শেষ প্রতীক ও এক নূতনের সার্থক সূচনা। *

* ৬. ৪. ৫৯ তারিখে সারদাসংঘের বার্ষিক অধিবেশনে সংঘের সভানেত্রীর ভাষণ।

সম্যক্ স্মৃতি

[বৌদ্ধ সাধনা]

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী, বিদ্যাবিনোদ

বুদ্ধদেব নির্বাণ-প্রাপ্তির জন্য যে অষ্টাঙ্গ সাধন-মার্গের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সপ্তম সাধনটির নাম 'সম্যক্ স্মৃতি' (সম্মা সতি, Right Mindfulness)। 'স্মৃতি' বা 'সতি' কাহাকে বলে? যদ্দ্বারা কুশল আলম্বন স্মরণ করা যায় তাহাই 'স্মৃতি'। যাহার যেটি সাধ্য বস্তু তাহাকে নিয়ত স্মরণে রাখা, আদর্শকে সতত স্মৃতিপটে সমুজ্জ্বল রাখা এবং সেই আদর্শের পথে দৃঢ় পদবিক্ষেপে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হওয়া—ইহাই 'সম্যক্ স্মৃতি' সাধনার তাৎপর্য। ভগবদ্‌ভক্তের পক্ষে যেমন 'অবিস্মৃতিস্তচ্চরণারবিন্দয়োঃ' একান্ত আবশ্যক, তেমনি নির্বাণ-পথগামী বৌদ্ধ সাধককেও সতত বুদ্ধ ও ধর্মের কুশল আলম্বনে চিত্তকে যুক্ত রাখিতে হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে অভীষ্ট বস্তুতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আদর্শের প্রতি সতত জাগরূকতা, নিয়ত আলম্বন-অভিমুখিতা—ইহারই নাম 'সম্যক্ স্মৃতি'। কোনও অবস্থাতেই আদর্শকে পরিত্যাগ না করা, অবিস্মৃতিময় সতর্কতা সহকারে আদর্শানুগত হইয়া চলা এবং এই আদর্শ নিষ্ঠা দ্বারা যাবতীয় অকুশল ধর্ম হইতে চিত্তকে সতত সংরক্ষণ করা—ইহাই 'সম্যক্ স্মৃতি' সাধনার লক্ষ্য।

ভগবান্ তথাগত বলিয়াছেন, 'সতিং খাহং ভিক্খবে সব্বত্থিকং বদামীতি'।—হে ভিক্ষুগণ! আমি স্মৃতিকে সর্ববিধ কুশল উদ্দেশ্যের সিদ্ধি-দাত্রী বলিয়া থাকি। কর্ণধারহীন তরণী ও স্মৃতিহীন চিত্ত—একই প্রকারে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে। মহাকবি ও মহাদার্শনিক আচার্য অশ্বঘোষ বলেন :

দ্বারাধ্যক্ষ ইব দ্বারি যস্য প্রণিহিতা স্মৃতিঃ।
ধর্ষয়ন্তি ন তং দোষাঃ পুরং গুপ্তমিবারয়ঃ॥
(সৌন্দর-নন্দ-কাব্যং—১৪।৩৬)

—যেই রক্ষিত পুরের দ্বারে দ্বারাধ্যক্ষ নিযুক্ত রহিয়াছে, শত্রুগণ যেমন তাহা আক্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার চিত্তে 'স্মৃতি' অব্যাহত আছে তাহাকে দোষে অভিভূত করিতে পারে না।

শরব্যঃ স তু দোষাণাং যো হীনঃ স্মৃতি-বর্মণা।
রণস্থঃ প্রতিশত্রূণাং বিহীন ইব বর্মণা॥
(ঐ—১৪।৩৮)

—যেমন বর্মহীন সৈনিক সমরস্থিত হইয়া প্রতি-দ্বন্দ্বী শত্রুর শরের লক্ষ্য হয়, তেমনি স্মৃতিরূপ বর্মহীন হইলে সাধক সমস্ত দোষের লক্ষ্য হইয়া থাকে।

আচার্য শান্তিদেব 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থে স্মৃতির পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন : এই চিত্তরূপ মত্ত মাতঙ্গ যদি উন্মুক্ত থাকে তবে কখন কাহার কী সর্বনাশ করে, তাহার স্থিরতা নাই। যদি ইহাকে স্মৃতিরূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে আর কোনও ভয় ভাবনা থাকে না; তখন সর্ববিধ কল্যাণ করায়ত্ত হয়।

বদ্ধশ্চেৎ চিত্তমাতঙ্গঃ স্মৃতি-রজ্জ্বা সমন্ততঃ।
ভয়মস্তং গতং সর্বং কৃৎস্নং কল্যাণমাগতম্॥
(বোধিচর্যাবতার—৫।৩)

তস্মাৎ স্মৃতির্মনোদ্বারান্নাপনেয়া কদাচন।
গতাপি প্রত্যুপস্থাপ্যা সংস্মৃত্যাপায়িকীং ব্যথাম্॥
(ঐ—৫।২৯)

—অতএব স্মৃতিকে মনোদ্বার হইতে কদাপি অপ-

নীত করিবে না। স্মৃতি অপগত হইলে দুর্গতির ব্যথা স্মরণ করিয়া পুনশ্চ তাহাকে উপস্থাপিত করিবে।

স্মৃতির সাধনার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট সাধনান্তরের নাম 'সংপ্রজন্য'। মুহুর্মুহু কায় ও চিত্তের অবস্থা প্রত্যবেক্ষণ করার সাধনাই 'সংপ্রজন্য' নামে অভিহিত।

এতদেব সমাসেন সংপ্রজন্যস্য লক্ষণম্।
যৎ কায়-চিত্তাবস্থায়াঃ প্রত্যবেক্ষা মুহুর্মুহুঃ॥

(ঐ—৫।১০৮)

মদমত্ত মাতঙ্গ-সদৃশ দুর্জয় চিত্তকে বশীভূত করিতে হইলে 'স্মৃতি ও সংপ্রজন্য' এই দুইটি সাধনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সাধক-প্রবর শান্তিদেব বলেন:

চিত্তং রক্ষিতুকামানাং ময়ৈষ ক্রিয়তেঽঞ্জলিঃ।
স্মৃতিং চ সংপ্রজন্যং চ সর্বযত্নেন রক্ষত॥

(বোধিচর্যাবতার—৫।২৩)

—যাঁহারা চিত্ত রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আমি অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বলিতেছি যে, তাঁহারা যেন স্মৃতি ও সংপ্রজন্যকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করেন।

সংপ্রজন্যং তদায়াতি ন চ যাত্যাগতং পুনঃ।
স্মৃতির্যদা মনোদ্বারে রক্ষার্থমবতিষ্ঠতে॥

(ঐ—৫।৩৩)

—মনোগৃহের দ্বারে যখন রক্ষার নিমিত্ত 'স্মৃতি' দ্বারী হইয়া অবস্থান করে, তখনই 'সংপ্রজন্য' আসে এবং একবার আসিলে আর যায় না।

দীঘ-নিকায়ের 'মহাসতিপট্ঠান'-সুত্তে এবং মজ্ঝিম-নিকায়ের 'সতিপট্ঠান'-সুত্তে সম্যক স্মৃতির সাধনা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। মহা-সতিপট্ঠান-সুত্তের প্রারম্ভেই ভগবান তথাগত বলিতেছেন:

একায়নং ভিক্খবে মগ্গো সত্তানং বিসুদ্ধিয়া, সোকপরিদেবানং সমতিক্কমায়, দুক্খ-দোমনস্সানং অত্থঙ্গমায়।

—ভিক্ষুগণ! জীবগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-সন্তাপ হইতে মুক্তির জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্যের বিনাশের জন্য ইহাই 'একায়ন মার্গ' অর্থাৎ সম্যক্ স্মৃতির সাধনাই সংসার হইতে নির্বাণে যাইবার একমাত্র পথ। বস্তুতঃপক্ষে বুদ্ধদেব দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের জন্য যে সাধনমার্গের নির্দেশ দিয়াছেন, তাহার রহস্য 'স্মৃতি-প্রস্থানে'র (সতিপট্ঠান) ভিতর বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে। এই কারণে বৌদ্ধ সাধকসমাজে 'সতিপট্ঠান'-সুত্ত বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে।

'সতিপট্ঠান' স্মৃতি-প্রস্থান বা স্মৃতি-উপ-স্থান শব্দের অর্থ মনের দ্বারে 'স্মৃতিকে' প্রহরীরূপে স্থাপন করা। যেমন নিপুণ প্রহরী অপ্রমত্ত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান থাকে, অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে কখন প্রবেশ করিতে দেয় না, কে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং কে বাহির হইয়া গেল তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রয়োগে তাহা সর্বদা লক্ষ্য করিয়া থাকে, ঠিক তেমনি সাধককেও মনের দ্বারে 'স্মৃতি'কে প্রহরী-রূপে স্থাপন করিতে হইবে। চিত্তে কখন কি চিন্তা উদিত হইতেছে ও লয় পাইতেছে 'স্মৃতি' তাহা সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখিবে এবং তাহা-দিগকে নিয়ন্ত্রণ করিবে। উঠিতে বসিতে, আসিতে যাইতে, ভোজনে পানে—এমনকি নিদ্রাকালেও স্মৃতি জাগরূক থাকিয়া প্রহরীর কায চালাইয়া যাইবে। 'বোধিচর্যাবতার' গ্রন্থে আচার্য শান্তিদেব এই চিত্তপ্রত্যবেক্ষণ সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য:

কুত্র মে বর্তত ইতি প্রত্যবেক্ষ্যং তথা মনঃ।
সমাধানধুরং নৈব ক্ষণমপ্যুৎসৃজেদ্ যথা॥

(বোধিচর্যাবতার—৫।৪১)

—আমার মন কোথায় আছে, ইহা পুনঃ পুনঃ প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবে, এই সমাধান-পরায়ণতা যেন ক্ষণমাত্রও ত্যাগ না হয়।

নিরূপ্যঃ সর্বযত্নেন চিত্তমত্তদ্বিপস্তথা।
ধর্মচিন্তামহাস্তম্ভে যথা বদ্ধো ন মুচ্যতে ॥

—চিত্তরূপ মত্তহস্তী এরূপ ভাবে প্রত্যবেক্ষণীয় যে, তাহা যেন সতত ধর্মচিন্তারূপ মহাস্তম্ভে আবদ্ধ থাকে এবং কদাপি তাহা হইতে মুক্ত না হয়।

'সম্যক্ স্মৃতি'র সাধনা দ্বারা নিজ চিত্তকে জয় করিতে পারিলেই সাধক সর্বজয়ী হইতে পারেন।

কিয়তো মারয়িষ্যসি দুর্জনান্ গগনোপমান্।
মারিতে ক্রোধচিত্তে তু মারিতাঃ সর্বশত্রবঃ ॥
(ঐ—৫।১২)

—দুর্জন অসংখ্য, তাহাদের কয়জনকে মারিবে? নিজের ক্রোধচিত্তকে মারিতে পারিলে সমস্ত শত্রুকেই মারা হইয়া গেল।

ভূমিং ছাদয়িতুং সর্বাং কুতশ্চর্ম ভবিষ্যতি।
উপানচ্চর্মমাত্রেণ ছন্নং ভবতি মেদিনী ॥
বাহ্যা ভাবা ময়া তদ্বচ্ছক্যা ধারয়িতুং ন হি।
স্বচিত্তং ধারয়িষ্যামি কিং মমান্যৈর্নিবারিতৈঃ ॥
(ঐ—৫।১৩, ১৪)

—সমস্ত ভূমিকে ঢাকিবার মত চর্ম কোথায় পাওয়া যাইবে? জুতার চর্মমাত্র দ্বারাই পৃথিবী আচ্ছাদিত হয়। সেইরূপ বাহিরের প্রতিকূল ভাবসমূহকে নিবারণ করিতে আমার সামর্থ্য নাই। অতএব নিজের চিত্তকেই ধারণ করিব, অন্য সকলকে নিবারণ করিয়া আমার কাজ কি?

তুমি এস প্রাণে

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

হৃদয়ের যত অভাব মিটাতে
তোমারে হৃদয়ে নাহি চাই;
তাই তোমা হ'তে তিল তিল ক'রে
দূরে দূরে আমি সরে যাই!

অশান্তি মাঝে খুঁজি শান্তিরে,
সত্য ছাড়িয়া পূজি ভ্রান্তিরে,
মৃগ-তৃষ্ণিকা-মায়ায় অন্ধ,
নাহি জানি আমি কোথা ধাই!

হৃদয়ের যত অভাব মিটাতে
তোমারে হৃদয়ে নাহি চাই!

নাম ও রূপের মায়ায় ভুলেছি,
বহুত্বে মোর ডুবে মন,
বহির্মুখিনী গতি মোর হায়,
বুঝিনাক কভু কে আপন!

জীবন ভরিয়া কত কি চাহিনু,
অভাব দিয়াই হৃদয় ভরিনু,
অপূর্ণ মোর সকল কামনা,
কেঁদে মরে তাই সদা খ'ন!

তুমি এসে প্রাণে কর এইবার
সকল অভাব নিরসন!

মানসপুত্র

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

'মানসপুত্র'—বলেছিলেন জগন্মাতা, শুনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

মনে উঠেছিল ঠাকুরের: 'মা, ইচ্ছে করে, একটি শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী ভক্ত ছেলে, আমার কাছে সর্বক্ষণ থাকে'। তারই ফলে দেখেছিলেন দিব্য চক্ষে—মা একটি ছেলে এনে কোলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইটি তোমার ছেলে'।

সংসারী ভাবের ছেলে—ঠাকুরের কল্পনাতে কখনও ছিল না। তাই মায়ের কথা শুনে ঠাকুর শিউরে উঠেছিলেন। তাঁর ভাব দেখে মা হেসে বলেছিলেন, 'সাধারণ সংসারী ভাবের ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র'।

'মানসপুত্র' কথাটি মানুষের রচিত নয়, জগন্মাতার উচ্চারিত কথা। ঠাকুরের মন দিয়ে নিখুঁত ভাবে গড়া যেন এই ছেলে, তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন—ঠিক তেমনটি। তাই বুঝি মা বলেছিলেন, 'মানসপুত্র'।

পুত্র হয় পিতার সম্পদের অধিকারী। সাধারণ বিষয়ীদের সঙ্গে কথা ব'লে অস্থির হয়ে ঠাকুর চেয়েছিলেন এই পুত্র। কারণ বিষয়ীর মধ্যে নিজের ভাবের উত্তরাধিকারীর সন্ধান পাচ্ছিলেন না। যখন রাখাল এলেন তাঁর কাছে দক্ষিণেশ্বরে, তখন চিনতে পারলেন—'এই সেই'।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কোলে বসিয়ে দিয়েছিলেন জগন্মাতা মানসপুত্রকে, যেমন শিশুপুত্রকে বসিয়ে দেয়। ঠাকুরের কোলে বসা—এই ভাব, শিশুপুত্রের ভাব, চিরকাল ছিল রাখালচন্দ্রের। ঠাকুরের কাছে যখন যেতেন, তখন তাঁর ঠিক যেন চার বছরের ছেলের ভাব হ'ত। ঠাকুরকে মায়ের মতো দেখতেন। থেকে থেকে দৌড়ে গিয়ে তাঁর কোলে বসে পড়তেন। ঠাকুরকে পেলে, আত্মহারা হয়ে কি যে বালকভাবের আবেশ হ'ত, তা ব'লে বোঝাবার নয়। ঐ ভাব যে দেখত সেই অবাক্ হয়ে যেত। ঠাকুরও ভাবাবিষ্ট হয়ে তাঁকে ক্ষীর ননী খাওয়াতেন, খেলনা দিতেন, কখনও কখনও কাঁধে চড়াতেন। এসব সত্ত্বেও রাখালচন্দ্রের মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ হ'ত না। একবার মা ভবতারিণীর মন্দির থেকে প্রসাদী মাখন ঠাকুরের ঘরে এলে, ছোট ছেলের মতো, ব্রজের রাখালের মতো, রাখাল তুলে নিয়ে খেলেন। ঠাকুর তাতে বকলেন। বকুনি খেয়ে ছোট ছেলেরই মতো, তিনি ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলেন। চিরকালের জন্য ওরূপ করা ছাড়লেন। তা দেখে ঠাকুর বলতেন, 'ওকে কিছু বলো না, ও দুধের ছেলে'। ঠাকুর যদি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতেন, হিংসা হ'ত রাখালচন্দ্রের। তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না। অভিমানে মন ভরে যেত তাঁর। ঠাকুর তাঁর সে ভাব দূর ক'রে দিয়েছিলেন।

কোলের ছেলে যেমন নিশ্চিন্ত—মায়ের ওপর নির্ভরশীল থাকে, সেই রকমই নিশ্চিন্ত—ঠাকুরের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন রাখালচন্দ্র। পিতার বন্ধন, পারিবারিক বন্ধন, বিষয়ের বন্ধন, কত বন্ধনই না ছিল তাঁর। কিন্তু ঠাকুরকে দেখার পর থেকে, সে-সবের কোন চিন্তাই ছিল না তাঁর মনে। ঘুচে গেল ও-সব অতি সহজেই, ঠাকুরের কৃপায়।

'শুদ্ধসত্ত্ব' সংসারে থাকতে পারলেন না, তাই রাখাল চলে এলেন ঠাকুরের কাছে।

ঠাকুরের কাছেই কাটালেন চিরকাল। কোনও প্রকার বিষয়বুদ্ধি স্পর্শ করতে পারেনি তাঁকে কোন কালে। নিত্য মুক্ত—তাই পড়েননি মায়াজালে। ঈশ্বরকোটি—তাই সদাই বিচরণ করতেন এক ভাবের রাজ্যে। যদিই বা মন নামত সাধারণ ভূমিতে—ক্ষণেকের জন্য, পরক্ষণেই আবার উঠে যেত সেই উচ্চ ভূমিতে, স্বাভাবিক ভাবেই। তাই বুঝি অত বড় জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ, স্পর্শমাত্রে অন্যের মধ্যে জ্ঞানসঞ্চারে সক্ষম, শ্রীশ্রীঠাকুর যাঁকে সব দিয়ে ফকির হয়েছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত বলেছিলেন, 'আধ্যাত্মিকতায় রাখাল আমাদের সকলের চেয়ে বড়'।

শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে একদিন গঙ্গার দিকে চেয়ে দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন, গঙ্গায় একটি শতদল পদ্ম ফুটে উঠল। অপূর্ব শোভা তার! কমলের দলে দলে কিশোর কৃষ্ণের হাত ধ'রে কিশোর বালক নৃত্য করছেন। দেখে ঠাকুর ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন—কৃষ্ণসখা, ব্রজের রাখাল, রাখালরাজ দর্শন ক'রে। তারপর এলেন রাখাল-চন্দ্র, স্থূল দৃষ্টিতে দেখলেন ঠাকুর। ওদিকে দিব্য দৃষ্টির দর্শন, এদিকে স্থূল চোখের দেখা। ব্রজের রাখাল, রাখালচন্দ্র। দুইই এক, পূর্ণ সাদৃশ্য—অবিকল সেই কিশোর বালক।

তাই ছিল ব্রজের দিকে তাঁর টান। ভয়ে আকুল হতেন ঠাকুর এই টান দেখে। যাঁর সম্বন্ধে বলতেন, 'ওর মুখপানে চাও, দেখতে পাবে ঠোঁট নড়ছে, অন্তরে অন্তরে সদাই ঈশ্বরের নাম জপ করে'—যাঁকে দেখলে 'গোবিন্দ! গোবিন্দ!' বলে মহাভাবে মগ্ন হয়ে যেতেন—যাঁকে না দেখলে, 'মা, আমার রাখালরাজকে এনে দে!' ব'লে জগন্মাতার কাছে কেঁদে আকুল হতেন—সেই রাখালচন্দ্র, যেখান থেকে এসেছেন সেখানে—ব্রজধামে গেলে, পাছে আর না ফেরে, তাই ভেবে ভয় পেতেন ঠাকুর। মায়ের কাছে প্রার্থনা করতেন, 'যেতে চায় দুদিনের জন্য থাক্, কিন্তু চিরদিনের জন্য যেন না যায়'; বলতেন, 'রাখাল সত্যি ব্রজের রাখাল। যে যেখান থেকে এসেছে শরীর ধারণ ক'রে, সেখানে গেলে প্রায়ই তার শরীর থাকে না'। রাখালচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবনে গেলে ঠাকুর নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি। ভক্তদের একে তাকে বলতেন, খোঁজখবর নিতে, চিঠি লিখতে। কতই ভয়, পাছে তাঁকে ছেড়ে চলে যায়—নিজের ধামে; পাছে আর না ফেরে। সেখানে তাঁর অসুখ হয়েছে শুনে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মার কাছে বলতেন, 'মা কি হবে? তাকে ভাল ক'রে দে'।

কিছুকাল বাইরে কাটিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন রাখালচন্দ্র। তারপর কতবার ব্রজে গেছেন, কত তপস্যা করেছেন। কখনও বৃন্দাবনে, কখনও কুসুম-সরোবরে, কখনও শ্যাম-কুণ্ড-রাধাকুণ্ডে, কখনও গিরিগোবর্ধনে। আহারের, বস্ত্রের, বাসস্থানের, তীর্থভ্রমণের ও তপস্যার কঠোরতা স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন। এরই মধ্যে দিনের পর দিন ব্রজধামে ধ্যানে কাটিয়েছেন। ধ্যানের ভাবে উঠেছেন, বসেছেন, খেয়েছেন, শুয়েছেন, চলেছেন, ফিরেছেন।

সাধক রাখালচন্দ্র, কখনও কখনও ঠাকুরকে পর্যন্ত বলতেন, 'সময় সময় তোমাকেও আমার ভাল লাগে না'। তাই দূরে সরে গিয়ে, গভীর ধ্যানে ডুবে গিয়ে সব ভুলে যেতে চাইতেন। কিন্তু ঠাকুর সে রাজ্য থেকে ফিরিয়ে আনতেন তাঁকে। ছেলে যে—লোকে দেখবে; ছেলেকে দেখে তাঁকে দেখবে—স্থূল শরীরের অদর্শনের পর। কখনও ভুলতে পারতেন না, কখনও ছেড়ে যেতে পারতেন না ঠাকুরকে রাখালচন্দ্র। পিতাপুত্রে, আদর-আবদারের মধ্যে, মান-অভিমানের পালাও

চলত; কখনও কখনও চরমে উঠত। অভিমানে ফুলে তখন দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে, ঠাকুরকে ছেড়ে, চলে যেতে চাইতেন রাখালচন্দ্র। যেতেনও খানিক দূর। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, আর এগোতে পারতেন না। ফিরে আসতে হ'ত আবার সেই ঠাকুরের কোলে এমনি টান ছিল।

পিতার গুণ পুত্রে পায়, অন্ততঃ খানিকটা। ঠাকুরের গুণ পেয়েছিলেন রাখালচন্দ্র অনেকখানি। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব হ'ত মুহুর্মুহু, রাখালচন্দ্রও সর্বদা ভাবে মগ্ন থাকতেন। দক্ষিণেশ্বরে, বলরাম মন্দিরে, বেলুড়মঠে, কাশীতে, বৃন্দাবনে কখনও তা গভীর ভাবে পরিণত হয়েছে। একবার বেলুড় মঠে কালীকীর্তন শুনে এত দীর্ঘকাল-স্থায়ী গভীর ভাব হয়েছিল যে, মা-ঠাকরুণ এসে মাথায় হাত বুলালে তবে ভাবের উপশম হয়।

তাঁর কাছে যারা আসতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সকলকে এমন ভালবাসতেন যে প্রত্যেকেই ভাবতেন, ঠাকুর তাঁকে অন্যের চেয়ে বেশী ভালবাসেন। পুত্রও এই গুণ অনেকাংশে পেয়েছিলেন। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, সন্ন্যাসী-গৃহী, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, প্রত্যেকেই ভাবতেন মহারাজ তাঁকে যেমন ভালবাসেন, অন্যকে তেমন ভালবাসেন না।

ঠাকুরের ছিল মিষ্ট ব্যবহার, এত মিষ্ট যে সে ব্যবহার যিনি পেতেন, তিনিই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। (রাখাল) মহারাজেরও ছিল অতি ভদ্র বিনয়-নম্র ব্যবহার সে ব্যবহারে প্রাণ জুড়িয়ে যেত।

যেখানে যেখানে ঠাকুর যেতেন, সেখানকার আশে পাশের যত দেবস্থান তিনি দর্শন করতেন ও যথাসাধ্য পূজা দিতেন। মহারাজও কোথাও গেলে, সেখানকার দেবমন্দিরে দেবদর্শন ও পূজা নিবেদন ক'রে, তবে অন্য কাজ করতেন।

মন্ত্র-উচ্চারণ, সামগ্রী-নিবেদন ও যাবতীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা যাতে দেবপূজা নিখুঁত ভাবে হয়, সে দিকে ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। মহারাজও পূজার প্রত্যেক অঙ্গ ও খুঁটিনাটির দিকে বিশেষ নজর রাখতেন, এবং সেগুলি ঠিক ঠিক শাস্ত্রীয় ভাবে, শুদ্ধ আচারে, যাতে অনুষ্ঠিত হয়—তার ব্যবস্থা করতেন।

ঠাকুর ছিলেন ত্যাগী-রাজ, মহারাজও ছিলেন সর্বত্যাগী। ঠাকুরের মন অনুক্ষণ ভগবদ্‌রাজ্যে বিচরণ ক'রত; মহারাজ ঘন ঘন ভগবদ্‌ভাবে মগ্ন হতেন। সংসারের অনেক উর্ধ্বে ঠাকুর বিচরণ করতেন; মহারাজও ছিলেন সর্ব প্রকারে সংসারে নির্লিপ্ত।

ঠাকুর বলতেন, 'সত্যকথা কলির তপস্যা—' ভুলেও মিথ্যা বলতেন না। মহারাজ ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা বলতে নিষেধ করতেন এবং সেইরূপ আচরণ করতে উপদেশ দিতেন। অন্যের পীড়া হয়, কষ্ট হয়, উদ্বেগ হয়, এরূপ আচরণ বা কথাবার্তা ঠাকুর পরিহার করতেন। মহারাজও কারও মনে কখনও কষ্ট দেননি, কাউকে কখনও ব্যতিব্যস্ত করেননি। এ সব শিক্ষা তাঁর গুরুর কাছে।

একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, 'রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে!'—শুনেই স্বামীজী তাঁর নাম দিলেন 'রাজা' এবং এই নামেই তাঁকে ডাকতেন। এই জন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী তাঁকে 'রাজা মহারাজ' বলেন। 'মহারাজ' নামেই তিনি সুপরিচিত। স্বামীজী রাখালচন্দ্রকে শুধু 'রাজা' নাম দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ ক'রে সে নাম সার্থক করেছিলেন। এমনকি আমেরিকা থেকে ফিরে এসে, টাকাপয়সা

যা এনেছিলেন, সমস্ত মহারাজকে দিয়ে বলেছিলেন, 'রাজা, এ সমস্ত তোর, আমি কেউ নই'।

শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝেছিলেন, ভক্ত-হৃদয়ে তিনি যে রাজ্যের বিস্তার আরম্ভ ক'রে গেলেন, সে রাজ্য পরিচালনা করতে রাখালরাজাই সমর্থ। ঠাকুর জানতেন, তিনি যে 'শিবজ্ঞানে জীব-সেবা'র আদর্শ দিয়ে গেলেন, তাকে অবলম্বন ক'রে নানা স্থানে কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁর উপদেশ জীবনে অনুশীলন ক'রে দেখাবার জন্য স্থানে স্থানে সাধুদের মঠ হবে, সে উপদেশ বিস্তারিত ক'রে লোকের সামনে ধরবার জন্য দেশবিদেশে প্রচার-কেন্দ্র গড়ে উঠবে। এই ভাবে প্রসারিত তাঁর ভাব-সাম্রাজ্য নিয়মিত ও যথাযথভাবে পরিচালিত করতে রাখালরাজাই পারবেন। তাই ঠাকুর রাখাল-চন্দ্রকে সেই ভাবে শিক্ষিত করেছিলেন। শুধু নামেই 'রাজা' নয়, কাজেও রাজা হতে হবে রাখালচন্দ্রকে, তাই এই শিক্ষা।

তাই দেখা যায় কত ভক্ত—কেহ বা সাধু, কেহ বা গৃহী, স্ত্রী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ, নানা দেশের, নানা ভাষাভাষী, তাঁর কাছে এসেছেন ধর্মলাভ করতে। আর মহারাজও তাঁদের প্রত্যেকের অন্তরের কথা, এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব'লে দিয়েছেন যে তাতেই তাঁরা সন্ধান পেয়েছেন নিজের ভেতরে—যথার্থ ধর্মের। এরই ফলে চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হয়েছেন তাঁরা মহারাজের প্রতি, রাজার ন্যায় তাঁকে নিজেদের পরিচালক জ্ঞান করেছেন, রাজ-আদেশের ন্যায় তাঁর আদেশ পালন ক'রে গেছেন। মহারাজও তাঁদের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ ক'রে যাতে তাঁদের কল্যাণ হয়, উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়—তার জন্য চেষ্টা করেছেন।

বেলুড়ে, কাশীতে, আলমোড়ায়, মাদ্রাজে এবং আরও নানা স্থানে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মঠ প্রতিষ্ঠিত হ'লে, যাতে ঠাকুরের আদর্শে, ত্যাগ-তপস্যার ভাব নিয়ে সে সব মঠ চলে, সে দিকে দৃষ্টি রেখেছেন, সে বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছেন। মঠবাসী সাধুদের জীবন যাতে এই আদর্শ অবলম্বনে উন্নত-তর হয় তার জন্য অনেক উপদেশ দিয়েছেন। আবার নিজে ক'রে দেখিয়েছেন, কিভাবে সে আদর্শ কার্যে পরিণত করতে হয়।

যখন কাশীতে ও কনখলে কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন সেখানে বাস ক'রে অনুভব করেছেন—জীবরূপী শিবের সেবা সেখানে হচ্ছে। কর্মীদেরও সে সত্য অনুভব করতে বলেছেন। সে-সব কর্মও ভগবৎসাধনা, তাতেও ভগবান লাভ হয়. সবই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ—এই সত্য বারংবার প্রকাশ ক'রে, কর্মীদের মন থেকে সন্দেহ ও অবসাদ দূর ক'রে বিশ্বাস ও উদ্দীপনা এনে দিয়েছেন। যেখানে যেখানে কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে-সব জায়গাতেই এই আদর্শে কেন্দ্র-গুলি গড়িয়ে তুলেছেন, কর্মীদের জীবন গঠিত করিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে—ত্যাগ-তপস্যার, শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শে।

মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে, উদ্বোধনে, মাদ্রাজ মঠে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-প্রচারের উদ্দেশ্যে—স্বামী-জীর গ্রন্থাবলী ও 'উদ্বোধন' 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন যখন হয়েছে, তখন তিনি দেখেছেন ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণের বাণী এ যুগের বেদ; স্বামীজীর মধ্য দিয়ে তার ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে। ঠাকুরের শিষ্যদের অনেকের মধ্য দিয়ে সে বাণী প্রচারিত হবে বিভিন্ন ভাবে। অনেকে আলোচনা করবে, ব্যাখ্যা করবে সে বেদবাণী, সে ভাষ্য—সে বিভিন্ন ভাব—নানা দেশে, নানা দিক থেকে। সে-সব জেনে লোকের কল্যাণ হবে। এ যুগের বাণী ভগবান কি জন্য কি' ভাবে দিয়েছেন, বুঝে আলোর

সন্ধান পাবে। সে আলো জীবনের অন্ধকার দূর করবে, জীবন ধন্য করবে। এই ভাবে দেখে তিনি সে-সব পরিচালনা করার নির্দেশ দিতেন ও গড়ে তুলতেন

এই ভাবে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবরাজ্যের পরিচালনা এবং প্রসার অক্ষুণ্ণ রেখে ঠাকুরের আদর্শে, তাঁর ভাবে, সে রাজ্যকে সুগঠিত করে-ছিলেন। এই রাজ্যের মধ্যে ছিল প্রাণঢালা ভালবাসা, অকৃত্রিম স্নেহ। সে স্নেহ, সমস্ত বাধাবিঘ্নকে ভেঙে চূরে সরিয়ে, নিজের গতিকে অব্যাহত রেখে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে চলে যেত। ফলে দেখি তাঁর দিকে আকৃষ্ট সকল কর্মী, সন্ন্যাসী ও ভক্ত—শুধু বাংলায় নয়, ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে, ভারতের বাইরে—সিংহলে, ব্রহ্মদেশে, আমেরিকায়, ইংলণ্ডে, আরও কত দেশে। আনন্দে তাঁরা ছড়াতে লাগলেন এই ভাব মহারাজকে কেন্দ্র ক'রে। গড়ে উঠল এই ভাবে এক সাম্রাজ্য। যার সূচনা ক'রে গিয়েছিলেন পিতা, তাকে গড়ে তুললেন উপযুক্ত পুত্র—তাঁর 'মানসপুত্র' স্বামী ব্রহ্মানন্দ। পরিষ্কার ক'রে দিয়ে গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব সকলের সামনে। মেনে নিলেন সকলে অবনত মস্তকে সে-সব। দীর্ঘকাল নিকট সাহচর্যবশতঃ পুত্র পিতার ভাব জান-তেন। ঠাকুরের কাছে কাছে অনেকদিন থাকায় মহারাজ জানতেন তাঁর ভাব ভাল করেই। তাই মহারাজ দিতে পারলেন একটি ছাঁচ, ঠাকুরের ভাব-পরিচালনার, ভক্ত-পরিচালনার, কর্ম-পরিচালনার—শুধু পরিচালনার নয়, গঠনের। যে ছাঁচে ফেলে এখনও চলেছে কাজ চারিদিকে।

পুত্র তাঁরই কাজ করছেন—একথা স্থূল শরীরের অদর্শনের পরও শ্রীশ্রীঠাকুর জানিয়ে দিয়েছিলেন—দিব্য শরীরে দর্শন দিয়ে দিব্য বাণীতে কথা ব'লে, শুধু নিজের সন্ন্যাসী শিষ্যদের বাছা বাছা কাউকে নয়—অতি সাধারণ লোককেও। একবার এক বাল-বিধবা—জীবনে কিছুই হ'ল না, জীবন বুঝি বৃথা গেল ভেবে আকুল হয়ে কাঁদছিলেন কদিন ভগবানের কাছে। দেখলেন এই সময়, বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর রাত্রে দেখা দিয়ে, 'কাঁদছিস্ কেন? বাগবাজারে আমার ছেলে রাখাল আছে, সেখানে যা, শান্তি পাবি'। কে ঠাকুর? কে রাখাল? কিছুই জানা ছিল না তাঁর। নিজের মায়ের কাছে সন্ধান নিয়ে গেলেন বাগবাজারে—উদ্বোধন কার্যালয়ে স্বামী সারদানন্দের সমীপে, সেখান থেকে প্রেরিত হ'য়ে বলরাম-মন্দিরে মহারাজের কাছে গেলেন তিনি। দুপুরে খাওয়ার পরে বিশ্রামের সময় বালিকাটি হাজির। মহারাজ তাঁর সব কথা শুনে, উপদেশ ও দীক্ষাদি দিয়ে জীবনে শান্তি দান করলেন; সেদিন আর বিশ্রাম করা হ'ল না। চিনলেন বালিকা শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে; চিনলেন তাঁর ছেলে রাখাল—তাঁর মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দকে। এই ভাবে অনেকেই চিনেছিলেন তাঁদের।

শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে, এক সময় ভাবচক্ষে যে বালককে দেখেছিলেন, সেই বালক ভাবেই কাটিয়ে গেলেন মহারাজ চিরকাল। শ্রীমা মঠে এলে মহারাজ তাঁর কাছে কাছে ঘুরতেন। কাশীধামে শ্রীমা যেখানে থাকতেন, সেখানেও মহারাজ ঐ ভাব নিয়ে যেতেন। ছেলেকে শ্রীমাও ভাল কাপড় দিতেন। শ্রীমা জয়রামবাটী থেকে আসছেন শুনে শিশুর মতই মহারাজ দেখা করতে যেতেন। এই রকম শিশুভাবে এমন ডুবে থাকতেন যে, যিনি দেখতেন তিনিই ভাবতেন যেন ছোট্ট ছেলেটি। তখন তাঁর মধ্যে অধ্যক্ষ, মহারাজ, গুরু, রাজা—এদের কাউকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হ'ত। এই ভাব নিয়েই মানসপুত্র কাটিয়ে গেছেন সারাজীবন।

দালাই লামা

তিব্বতে ও মঙ্গোলিয়ায় প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের এক রূপান্তর লামাধর্ম। প্রথমে খৃঃ ষষ্ঠ শতকে পরে নবম শতাব্দীতে বিশেষভাবে ভারত হইতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়, ক্রমশঃ ইহাতে স্থানীয় নানা রীতিনীতি ও বিশ্বাসের সহিত তন্ত্রসাধনাও মিশ্রিত হইয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ৎসং-খা-পা লামা (বা সন্ন্যাসী)-দের নিয়মশৃঙ্খলা বাঁধিয়া দিয়া লামাধর্মকে একটি রূপ দেন। আত্মরক্ষার জন্য এই ধর্মকে দেশের ঐহিক ব্যাপারেও হাত দিতে হয়; এবং ক্রমে সর্বশক্তি লামাদের করতলগত হয়, গুরু শিষ্যানুক্রমে তাঁহাদের উত্তরাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়, সর্বোপরি দুইজন মহান্ লামার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়; লাসায় দালাই লামা 'মহান্ সমুদ্রস্বরূপ', শিগাৎসিতে পাঞ্চেন লামা 'উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ'। বৌদ্ধদের বিশ্বাস একজন মহান্ লামার দেহত্যাগ হইলে অন্যজন ইঙ্গিত দিতে পারেন, মৃত লামা কোথায় পুনরায় দেহধারণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দুই মহান্ লামাকেই রাজনীতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছিল, ১৯৫২ খৃঃ হইতে তাঁহারা চীনাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে শাসন-ব্যবস্থা চালাইতেছিলেন।

এই পৃথিবীতে সশরীরে বাস করিয়া দালাই লামার মতো সম্মান ও শ্রদ্ধা কেহই পান না; তিব্বত, লাদাক, নেপাল, ভুটান ও সিকিমের লামা ও গৃহস্থগণ তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করেন। বোধিসত্ত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেনঃ মানবকল্যাণে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি বারংবার জন্মগ্রহণ করিবেন। 'দালাই লামা' কথাটির অর্থ: ত্যাগী সন্ন্যাসী, যিনি সমুদ্রের মতো সকলকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন তাঁহার কল্যাণ-ভাবনা দ্বারা। পদবীটি পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। ইহা ঠিক উত্তরাধিকার নয়, নির্বাচনও নয়। বহু অনুসন্ধানের পর কতকগুলি নির্দিষ্ট ইঙ্গিত-সহায়ে দালাই লামা 'আবিষ্কৃত' হন। লামাধর্মীদের বিশ্বাস দেহত্যাগের পর দালাই লামার আত্মা কোন নবজাত শিশুর দেহ আশ্রয় করে।

দালাই লামার দেহত্যাগ তিব্বতের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যতদিন না নূতন দালাই লামা আবিষ্কৃত হন ততদিন দেশে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। অনেক সময় দেহত্যাগ-কালেই দালাই লামা ইঙ্গিত দিয়া যান কোথায় তিনি দেহধারণ করিবেন। দালাই লামার দেহ পোটালা পর্বতশিখরে সমাধিস্থ করার তিন চার বৎসর পরে বিভিন্ন মঠের লামারা, সম্ভ্রান্ত সদস্যেরা এবং শাসন-পরিচালকেরা মিলিত হইয়া প্রাপ্ত ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা করিয়া স্থির করেন—'দালাই লামা' কোন্ দিকে জন্মিয়াছেন।

প্রথমে লাসার দৈববাণীর বক্তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি ভাবস্থ অবস্থায় ইঙ্গিত দেন—কোন্ অঞ্চলে দালাই লামা আবির্ভূত হইয়াছেন। এই ইঙ্গিত-সহায়ে পাঞ্চেন-লামা ও অন্যান্য প্রতিনিধিগণ দালাই লামার সন্ধান শুরু করেন। যে সকল শিশুর শরীরের লক্ষণসমূহ দিব্যভাবাপন্ন—বিশেষতঃ ভ্রূ ও চক্ষু যাহাদের ঊর্ধ্বগামী, কর্ণ দীর্ঘ ও করতলে শঙ্খ-চিহ্ন আছে—তাহাদের নিকট অন্যান্য জিনিসের সহিত পূর্ববর্তী দালাই লামার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি রাখা হয়, যে শিশু নির্ভীকভাবে অবলীলাক্রমে দালাই লামার ব্যবহৃত

দ্রব্যাদি তুলিয়া লয়, তাহাকেই নূতন দালাই লামা বলিয়া স্বীকার করা হয়

মাতাপিতা ও ভ্রাতাভগ্নীর সহিত এই শিশুকে লাসায় আনা হয়। পরিবারের সকলকে রাজকীয় সম্মানে প্রাসাদে রাখা হয়, এবং পিতাকে 'কুং' এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। অতঃপর শুরু হয় দালাই লামার শিক্ষা, যাহাতে তিনি পরবর্তীকালে সাম্য ন্যায় ও কল্যাণবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া দেশ শাসন করিতে পারেন।

দালাই লামাকে ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিতে হইবে; মাদকদ্রব্য তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ, তবে অত্যধিক শীতের দেশ বলিয়া আমিষ আহার নিষিদ্ধ নয়। নির্জনে তিনি সরল জীবন যাপন করেন; এবং লামারা তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম, দর্শন, ধ্যানধারণা, রাজ্যপরিচালনা—সব শিক্ষা দেন। যতদিন না তিনি বয়স্ক হইতেছেন, ততদিন একজন প্রতিনিধি তাঁহার নামে দেশ শাসন করেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে লামাধর্মে দীক্ষিত করা হয়, তখন তাঁহার নামকরণ হয়—সে নামের অর্থ: পবিত্র আত্মা, শান্ত মহত্ত্ব, বাক্‌শক্তি-পরায়ণ, শুদ্ধমনা, দিব্যজ্ঞানী, ধর্মরক্ষক, সমুদ্রের মতো ব্যাপক।

* * *

বর্তমান দালাই লামা যেভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহা বিশেষ চমকপ্রদ। ১৯৩৩ খৃঃ যখন মহান্ ত্রয়োদশ দালাই লামা স্বর্গধামে গমন করেন, তখন সকলে তাঁহার শীঘ্র পুনরাবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকে। উত্তর-পূর্ব কোণে তিনি দেহধারণ করিবেন সে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সমাধিস্থ করিবার সময় মহান্ ত্রয়োদশ দালাই লামার মুখ ছিল দক্ষিণ দিকে, পরে সমাধি খুলিয়া নূতন আরক দিবার সময় দেখা যায় মুখ উত্তরপূর্ব কোণে, তাছাড়া মেঘের গতি এবং রামধনু ঐ দিকই নির্ণয় করিতেছিল।

প্রতিনিধি ঐ দিকে তীর্থভ্রমণে গিয়া হ্রদের স্থির নির্মল জলে যে দিব্য দৃশ্য দেখিলেন ও যে শব্দ শুনিলেন, তাহা দ্বারা চালিত হইয়া যথাস্থানের ইঙ্গিত পান। অনুসন্ধানকারীর দল পূর্ব তিব্বতের যে অংশ ১৯১০ খৃঃ চীনারা অধিকার করিয়া লয় সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। তদানীন্তন পাঞ্চেন-লামা তাহাদের তিনটি সম্ভাবিত নাম বলিয়া দিয়াছিলেন। দেখা গেল প্রথম নামের শিশুটি পূর্বেই মৃত। দ্বিতীয় শিশুটি দালাই লামার দ্রব্যাদি দেখামাত্র ছুটিয়া পলাইয়া যায়। অনেক অনুসন্ধানের পর ১৯৩৭ খৃঃ অক্টোবর মাসে কোকোনর প্রদেশে (চীনাদের দ্বারা অধিকৃত) তৃতীয় শিশুর সন্ধান পাওয়া গেল; তাহার মাতাপিতা চাষী, খাঁটি তিব্বতী। সকল লক্ষণ মিলাইয়া সন্ধানকারীরা সন্তুষ্ট হইলেন। একজন লামা ছদ্মবেশে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। দুই বৎসরের শিশু বলিয়া উঠিল, 'লামা, লামা'; যে মঠ হইতে ঐ লামা আসিয়াছিল তাহার নামও সে বলিয়া দিল, অবশেষে পূর্ববর্তী দালাই লামার ব্যবহৃত জিনিসপত্র হইতে অনেকগুলি সে বাছিয়া লয়।

অনুসন্ধানকারীরা নিশ্চিন্ত হইল, তাহারা যথার্থ দালাই লামাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। কিন্তু কিভাবে তাহাকে লাসায় আনা যায়? কোকোনরের কুয়োমিংটাং প্রদেশপাল ছাড়-পত্রের জন্য অনেক টাকা চাহিলেন। বাধ্য হইয়া তিব্বতকে তাহার দালাই লামার জন্য ঐ টাকা দিতে হইল ১৯৩৯ খৃঃ সেপ্টেম্বরে বোধিসত্ত্বের নবতম প্রকাশ। চার বৎসরের শিশু লাসায় আসিলেন, এবং তিব্বতের নববর্ষে

১৯৪০ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে চতুর্দশ দালাই লামা রূপে অভিষিক্ত হইলেন

সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরই বেশ গুরুগম্ভীর ভাবে সেই পঞ্চমবর্ষীয় শিশু লামা-দের সকলের প্রণাম গ্রহণ করেন এবং সকলকে বেশ সহজভাবেই আশীর্বাদ করেন। ১৯৫২ খৃঃ তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হন।

চতুর্দশ দালাই লামা মনোমুগ্ধকর ব্যক্তি, গাম্ভীর্যের সহিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি মিশিয়া তাঁহাকে অপূর্ব ব্যক্তিত্বে ভূষিত করিয়াছে। তাঁহার পূর্বগামীদের মতো তিনি গোঁড়া নন। অনেক পুরাতন রীতি তিনি লঙ্ঘন করিয়াছেন; তিনি নিজের ফটো তুলিতে দিয়াছেন, নিজেও ক্যামেরা ভালবাসেন। বর্তমান বিজ্ঞানের বিশেষতঃ বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের এবং মানুষের শ্রম-লাঘবকারী যন্ত্রপাতির তিনি অনুরাগী। তাঁহাকে উপহৃত একটি ক্যামেরা ও প্রজেক্টারের অংশগুলি পৃথক করিয়া সেগুলি তিনি আবার মিলিত করিতে পারিয়াছেন।

১৯৫৫-৫৭ : বুদ্ধদেবের দ্বি-সহস্র জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার ভারতে আগমন সকলের চিরকাল মনে থাকিবে। যুবকের উৎসাহ লইয়া তিনি ভারতের বিভিন্ন শহরে গিয়াছেন এবং সরল শিশুর আগ্রহ লইয়া তিনি সব কিছু দেখিয়াছেন ও জিনিসপত্র কিনিয়াছেন। বিশেষ অতিথি না হইয়া কলিকাতায় এক হোটেলেই তিনি ওঠেন; তাঁহার অনুচরেরা হোটেল-কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে: মাননীয় দালাই লামার বাসগৃহের উপরতলা খালি করিয়া দিতে হইবে, তাঁহার উপরে কেহ থাকিবে না। হোটেল-কর্তৃপক্ষ একটু মুস্কিলে পড়িলেন। বিষয়টি ক্রমশঃ দালাই লামার কানে পৌঁছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ অনুচরদের ঐ পুরাতন রীতি বর্জন করিতে বলিলেন। এইরূপে নানা কাজের ভিতর দিয়া সে-বার তিনি নিজেকে ভারতের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

১৯৫৭ খৃঃ ১৯শে জানুআরি এই প্রিয়দর্শন ধর্মগুরু—পাঞ্চেন-লামা ও অন্যান্য সহযাত্রী সহ বেলুড় মঠে আসেন; তাঁহার নম্র ব্যবহার ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা সকলকে মুগ্ধ করে। (এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ উদ্বোধন: ১৩৬৩ ফাল্গুন, ১৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বর্তমানে রাজনৈতিক কারণে তাঁহাকে লাসা ছাড়িয়া ৮০ জন অনুচরসহ দুর্গম পার্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতে আসিতে হইয়াছে। প্রথমে উত্তরপূর্বাঞ্চলের তোয়াং বৌদ্ধমঠে উঠিয়া সামান্য বিশ্রাম গ্রহণের পর তিনি তেজপুর হইয়া ভার-তের প্রধান মন্ত্রীর সহিত আলাপ-আলোচনার জন্য মুসৌরি গিয়াছেন ও সম্প্রতি তাঁহার অনুচর-গণসহ সেখানেই অবস্থান করিতেছেন।

সর্বনাম-বিশ্লেষণ

['আমি', 'তুমি', 'ইহা' প্রভৃতি সর্বনাম-পদের বিশ্লেষণ করিয়া এই প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রয়োজনীয়তা।]

অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী

ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ উন্মেষের মধ্যে জ্ঞাতৃরূপ ছাড়া আরও কিছু নির্দেশ আছে; আর সেটি হচ্ছে প্রেমের বা মূল্যবোধের দিক।

মানুষ জ্ঞাতা তো বটেই; আর জ্ঞাতা-রূপেই সে বিভিন্ন বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা। জ্ঞান মানেই বিষয়জ্ঞান, আর সুসংস্কৃত বিষয়জ্ঞানই বিজ্ঞান। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান—এমনকি গণিতও জ্ঞাতৃ-নিরপেক্ষ, জ্ঞাতা-অতিরিক্ত অর্থাৎ জ্ঞাতা-ভিন্ন যে বিষয়—তারই এক এক বিভাগের প্রকৃষ্ট, সুমার্জিত জ্ঞান। গণিত অবশ্য নিরীক্ষিত বিষয়ের জ্ঞান নয়; কিন্তু এও এমন বিষয়ের (সংখ্যা, পরিমাণ) জ্ঞান যা নিশ্চয়ই জ্ঞাতা নয়। এমনকি মনোবিজ্ঞানে যে জ্ঞান হয়, তাতেও জ্ঞাতা নিজের মানসিক ঘটনাগুলিকেই বিষয় করে; আর এই মানসিক বিষয়গুলি প্রকৃতিরই অংশ, অর্থাৎ জ্ঞাতা-ভিন্ন। সাংখ্য-দর্শনের ভাষায় জ্ঞাতাকে 'পুরুষ' বলা হয়েছে, আর জ্ঞেয় বিষয়কে বলা হয়েছে 'প্রকৃতি'। এই পুরুষ কখনই প্রকৃতির অংশ হয় না, আর তাই জ্ঞাতা কখনই বৈজ্ঞানিক অর্থে জ্ঞেয় বিষয় হতে পারে না। কিন্তু জ্ঞাতাকে না জানলেও তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হতে পারে না; কারণ জ্ঞাতাই যদি সন্দিগ্ধ হয়, তবে শুধু জ্ঞান আত্মলাভ করতে পারে না। জ্ঞান জ্ঞাতাকেও চায়, আবার জ্ঞেয়কেও আকাঙ্ক্ষা করে। অর্থাৎ 'ঘটজ্ঞানে' আমি যদি জ্ঞাতা হই, ঘট আমার জ্ঞেয় পদার্থ; আর এই জ্ঞানের মধ্যেই আমি ওই বিষয়ের (ঘটের) আমা-ভিন্নত্ব টের পাই। তাই বিষয়জ্ঞানে বিষয়ীর নির্দেশ থাকলেও তার সম্বন্ধে জ্ঞান নেই; কারণ জ্ঞাতার সম্বন্ধে জ্ঞান হ'লে জ্ঞাতা জ্ঞেয়ই হয়ে বসবে। তখন সব বিজ্ঞানই যদি বিষয়জ্ঞান হয়, তবে বিজ্ঞানমাত্রই জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ বিষয়ের জ্ঞানই দেবে—বিষয়ীর খবর বিজ্ঞান রাখতে পারে না। আমরা স্বভাবতই বিষয়াভিমুখে ধাবিত হই, প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধময় বিভিন্ন বিষয়ের খবর লই, আর মানুষের এই স্বভাবজ বিষয়মুখিতাই বিভিন্ন বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে। বিষয়ীর খবর বিজ্ঞান রাখে না ব'লে বিজ্ঞানে মানুষের পূর্ণ পরিচয় নেই; অর্থাৎ বলতে চাই যে সমস্ত বিজ্ঞানকে কুক্ষিগত করেও আমি আমার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকতে পারি। বিজ্ঞানের বহির্মুখিতা থেকে ভিন্ন এক ধরনের অন্তর্মুখিতা না হ'লে মানুষের পূর্ণ পরিচয় অসম্ভব।

বলদর্পী বিজ্ঞানের আধুনিকতম যুগে মানুষের আত্মিক মূল্যের প্রতি আমরা উদাসীন হয়ে পড়ছি। অধ্যাত্ম বিষয় এখন যেন বিদগ্ধসমাজের বিদ্রূপের স্থল হয়ে পড়েছে। বহু দার্শনিকও আজকাল বিজ্ঞানের ধ্বজাধারী; ঐন্দ্রিয়িক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাইরে কোন আধ্যাত্মিক জগতের খবর তাঁরা রাখতে চান না। জড়-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক মূল্যবোধের অভাব মানুষের এক চরমতম দুর্দিনের সূচনা করছে। বিজ্ঞান যতটা অগ্রসর হচ্ছে, ঠিক ততটাই আত্মিক দৈন্য হচ্ছে প্রকট।

নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মের মূল্য অবহেলিত হচ্ছে ব'লে মানুষ আজ দেউলে হয়ে যাচ্ছে। তাই আজ নতুনভাবে বিজ্ঞানের মূল্য কষে নেবার বিশেষ প্রয়োজন। জড়বিজ্ঞান মানুষের ব্যক্তিত্বকে দেহসর্বস্ব বলেই মনে করতে বাধ্য। মানুষের মনোবৃত্তিগুলিও দেহেরই ক্রিয়াকলাপ বা ব্যবহারে পর্যবসিত হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞান যে-হেতু বিষয়জ্ঞান সে-হেতু বৈজ্ঞানিক বর্ণনা খণ্ডিত হতে বাধ্য।

বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান বা বুদ্ধির মধ্য দিয়ে একটি সার্বিক আকার পাওয়া যায়, যার সংকেত দেখি 'আমি—ইহা' সম্বন্ধের মধ্যে। বিষয়জ্ঞানে যে 'আমি' জ্ঞাতা, তার বাইরে থাকে বিষয়; আর যে কোন বিষয়ই 'ইহা' বা 'ইদম্'-পদবাচ্য। অবশ্য জ্ঞাতারূপে আমি বা 'অহম্' বিষয় বা ইদম্-বিযুক্ত হয়ে থাকি না; কারণ জ্ঞাতা শুধু বিষয়েরই জ্ঞাতা, আর বিষয়ও জ্ঞাতার নিকট উপস্থিত কোন জ্ঞাতা ভিন্ন ইদম্-মাত্র। 'আমি —ইহা' বা 'অহম্-ইদম্'-এর একটি ছাড়া অন্যটি সম্ভব নয়; কিন্তু তবু 'ইদম্' 'অহম্' নয়, আর এমন বোধ বিষয়জ্ঞানের মধ্যেই নিহি জ্ঞানের স্তরে 'পুরুষ-প্রকৃতি' বা 'আমি-ইহা' পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিজাতীয় তত্ত্বের সমাবেশ। এই জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে 'ইহা' অনেক দূরে; আমার সঙ্গে বা 'অহম্'-পদবাচ্য তত্ত্বের সঙ্গে তার কোন আত্মীয়তা নেই। জ্ঞানের দৃষ্টিকোণটি জ্ঞাতাগ্রাহ্য বিষয়ের বা 'ইদমে'র দৃষ্টিকোণ; তাতে 'অহমে'র সংকেত থাকলেও তার খবর নেই।

এর প্রধান প্রমাণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বা সত্যগুলির নৈর্ব্যক্তিকতা। এ জ্ঞানে—এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে, কতকগুলি নৈর্ব্যক্তিক সর্বগত সত্যের সন্ধান পাই; আর এ সত্য—ব্যক্তির বিশেষ আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-নিরানন্দের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে চায়। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সত্য ব্যক্তিবিশেষের ওপর আশ্রিত না হয়ে বিষয়গত ও পক্ষপাতশূন্য হতে চায়; আর তা না হ'লে তার বৈজ্ঞানিক মূল্যই যায় উবে। এই কারণেই 'আমি-ইহা' সমাবেশে 'ইহা'র সঙ্গে আমার যোগাযোগ বা নিবিড় আত্মীয়তা নেই; এ যেন একটা নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক, বহুদূরস্থিত তথ্য। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে তাই ব্যক্তি, পুরুষ বা তার 'অস্মিতা' বাদ পড়ে। সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করলেও সকলেই সত্যকে বিষয়মুখী ব'লে স্বীকার করেন। আত্মমুখী হ'লে বা অস্মিতাকে আশ্রয় করলে বৈজ্ঞানিক সত্যের রূপহানি হয়। সকল বিজ্ঞানের বিষয়-মুখী দৃষ্টি তাই অস্মিতা বা ব্যক্তিকে আবরিত করে, আচ্ছন্ন করে। অথচ বিষয়ী যদি অসন্দিগ্ধ হয়, তবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পূর্ণ কি না—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে। বিষয়ী, 'আমি' বা অস্মিতার খবর পেতে হ'লে জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করতে হবে, আর অন্য কোন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের সাধারণ জীবনে ও ব্যবহারে এমন এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে যাকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক, এমনকি অবৈজ্ঞানিকও বটে। জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন 'আমি-ইহা' সমাবেশে সূচিত হয়, তেমনি 'আমি-তুমি' সমাবেশে আর এক প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া যায়। যখন অন্য কোন ব্যক্তিকে আমি 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করি, অথবা যখন কোন বিষয়ের প্রতি আমার 'তুমি' সম্বোধনে নির্দিষ্ট মনোভাব বর্তমান থাকে, তখন সেই ব্যক্তি বা বিষয়ের সঙ্গে আমার আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 'আমি-ইহা' ও 'আমি-তুমি'-রূপ দৃষ্টিভঙ্গী দুটি সম্পূর্ণ বিজাতীয়, আর এদের পার্থক্য বুঝতে

পারলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরও উর্ধ্বে এক আত্মিক জগতের খবর পাওয়া যায়। একজন ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তিকেই 'তুমি' ব'লে সম্বোধন বা নির্দেশ করতে পারে। 'আমি-তুমি' সমাবেশে 'তুমি'র সঙ্গে 'আমি'র ব্যবধান, 'আমি-ইহা' সমাবেশে 'ইহা'র সঙ্গে 'আমি'র ব্যবধানের মতো নয়। 'আমি-তুমি'তে আত্মার সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা হয়; 'আমি-ইহা'তে দূরস্থ 'ইদম্' আমার দ্বারা জ্ঞাত হয় মাত্র। 'আমি-ইহা' জ্ঞানের সমাবেশ, 'আমি-তুমি' প্রেমের বা ভালবাসার সমাবেশ। এর অর্থ 'তুমি'ও একপ্রকার 'আমি'। 'আমি-তুমি' সমাবেশে, 'আমি-আমি' বা 'তুমি-তুমি' সমাবেশেরই অধিকতর বাঙ্ময় ও স্ফুট রূপ। অথচ 'আমি-ইহা' শুধু আমি-ইহাই, এ সমাবেশ কখনও 'আমি-আমি' বা 'ইহা-ইহা' রূপ নিতে পারে না। 'আমি' কখনও আমার জ্ঞানের বিষয় হয় না। আর তাই 'আমি-আমি' জ্ঞানীয় সমাবেশ হতে পারে না। পরন্তু 'ইহা' কখনও 'ইহার' জ্ঞাতা হয় না ব'লে 'ইহা-ইহা'ও জ্ঞানের দিক থেকে অর্থহীন। জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে 'আমি-ইহা'কে ওলটপালট করা যায় না—'ইহা'র নৈর্ব্যক্তিকতা অস্মিতায় পর্যবসান করা যায় না। কিন্তু 'আমি-তুমি' সমাবেশটি—'আমি-আমি' বা 'তুমি-তুমি' সমাবেশের বিরুদ্ধ হয় না। 'তুমি' ব'লে যাকে সম্বোধন করি, তার সঙ্গে আমার জাতীয় মিল অনুভব না করলে 'তুমি' সম্বোধন অসম্ভব ও নিরর্থক হয়। যে ব্যক্তি আমার কাছে 'তুমি', সেই আবার বিপরীত দিক থেকে 'আমি' হয়ে আমাকে 'তুমি'তে পর্যবসান করতে পারবে। 'আমি' যদি এক ব্যক্তি হই, 'তুমি'ও এক ব্যক্তি হতে বাধ্য, আর 'আমি-তুমি'তে অস্মিতারই সমাবেশ। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য এ সমাবেশ অস্মিতা-দ্বয়ের সমাবেশ; কারণ এক অর্থে আমি 'তুমি' নই বা তুমিও 'আমি' নও। 'আমি-তুমি' সমাবেশেও যেন 'তুমি'র সঙ্গে 'আমি'র কিছুটা ব্যবধান থাকে; তবে এখানে 'আমি-ইহা' সমাবেশের মতো ব্যবধান থাকে না। 'ইহা' একেবারেই ইদম্, একান্তই দূর—'অহমে'র মতো একেবারেই নয়, ছিটেফোঁটাও নয়। 'তুমি', 'আমি' না হলেও আমারই মতো। তাই বোধ হয় অদ্বৈতবাদী শঙ্কর 'আমি-তুমি'কে 'আমি-আমি' রূপেই দেখতে চেয়েছেন; তাঁর মতে ব্রহ্ম আর জীবে কোন তফাৎই নেই। রামানুজাচার্য 'আমি-তুমি'র কিছুটা ব্যবধান মানলেও ঐ ব্যবধানকে অদ্বৈতেরই স্ফুরণ ব'লে স্বীকার করেছেন।

'আমি-তুমি' সমাবেশের ঐক্য 'আমি-ইহা' সমাবেশগত ঐক্যের উর্ধ্বে। এ ঐক্য জ্ঞানীয় ঐক্য নয়। প্রেমে, ভক্তিতে, সপ্রশংস মনোভাবে, শ্রদ্ধায় বা মূল্যগ্রহণের আঙ্গিকে কোনও ব্যক্তিকে 'তুমি'রূপে উপস্থিত করি 'আমি'; আমার সঙ্গে তোমার রয়েছে নিবিড়, চিন্ময় আত্মীয়তা; তুমি দূর নও, আপন। 'আমি-তুমি' সংকেত, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, পুরুষের সঙ্গে পুরুষের, আত্মার সঙ্গে আত্মার, জীবের সঙ্গে ভগবানের বিভিন্ন, ব্যক্তিগত ও ব্যক্তি-সাপেক্ষ সম্পর্কের নির্দেশ মাত্র। 'আমি-ইহার' 'ইহার' মতো নৈর্ব্যক্তিক, সর্বগত, অপক্ষপাত তথ্য 'আমি-তুমি'র 'তুমি' হতে পারে না। 'আমি-তুমি' সমাবেশে আমি এক স্বাধীন ব্যক্তি রূপ নিতে বাধ্য হই, আর এই 'তুমি' ঠিক আমার 'আমি'র মতোই স্বতোমূল্যবান। আমি যদি তোমাকে বা যে কোন 'তুমি'কে আমার স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে গ্রহণ করি, তবে সেইক্ষণেই আমি তোমাকে বা যে কোন 'তুমি'-কে 'ইহা'রূপে পরিবর্তিত ক'রে ফেলব। দাসপ্রথা ও দাসব্যবসায় পরিহার ক'রে আমরা

সভ্যতার উচ্চতর ভূমি লাভ করেছি; কারণ দাসপ্রথায় প্রভু দাসকে 'ইহা'রূপে গ্রহণ ক'রত, 'তুমি' রূপে নয়। দাস বা দাসী শুধু প্রভুর স্বার্থ-সিদ্ধির উপায়—তার নিজের কোন স্বতোগ্রাহ্য মূল্য নেই। নৈতিক চেতনায় কোন ব্যক্তিকেই উপায়রূপে গ্রহণ করা যায় না; নীতিবোধে ব্যক্তি, 'তুমি'রূপেই গৃহীত হবে। কিন্তু উপরের দৃষ্টান্ত থেকে এই প্রমাণ হয় যে, 'তুমি'কে 'ইহা'-রূপে গ্রহণ করাও সম্ভব। ছোট বড়, সম্ভব অসম্ভব, দূর নিকট, জড় প্রাণ, মন প্রত্যয়, আবেগ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, আত্মা ঈশ্বর প্রভৃতি প্রত্যেকেই 'আমি-ইহা'র 'ইহা' হতে পারে; অর্থাৎ জ্ঞানীয় সমাবেশে প্রবেশ করতে পারে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান প্রত্যেকেই 'ইহা'। কিন্তু যে মুহূর্তে 'আমি-তুমি'র 'তুমি' 'ইহা'রূপে উপ-স্থাপিত হয়, সেই মুহূর্তেই 'তুমি'র মূল্যহানি আর রূপহানি হয়। সে আর স্বতোমূল্যবান, স্বাধীন ব্যক্তি বা পুরুষ থাকে না; সে দূরস্থ হয়ে অস্মিতার নৈকট্য হারায়। মৃতব্যক্তি বা মৃত-দেহের প্রতি আমার মনোভাব 'আমি-ইহা' সমাবেশে প্রকাশিত হয়। সম্মোহিত, মোহাচ্ছন্ন, জড়বুদ্ধি, অজ্ঞান—এমনকি গভীর নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির প্রতি আমার মনোভাব 'আমি-ইহা'রই প্রকারভেদ। এইরূপ ব্যক্তির প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গীকে—একখণ্ড শিলার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু যে ক্ষণে নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি জাগরিত হয়ে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে, সেই পরমলগ্নে তার প্রতি আমার মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে, আমাকে 'আমি-তুমি'র স্তরে উন্নীত করে। নিদ্রাভিভূত, সম্মোহিত বা মৃত ব্যক্তির কাছে যে গোপন বাক্য আমি উচ্চারণ করতে পারি বা যে কর্ম অনুষ্ঠান করতে পারি, তা কোন বুদ্ধিমান, আমা-প্রতি অভিনিবিষ্ট ব্যক্তির কাছে আমি করতে পারি না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সজ্ঞানে তাই আমার সমপর্যায়ে আর তার সঙ্গে আমার 'আমি-তুমি' সম্বন্ধ। তাই 'আমি-তুমি'-রূপ অস্মিতার নৈকট্য—'আমি-ইহা'-রূপ জ্ঞানীয় সমাবেশের বিরোধী। 'আমি-তুমি' আত্মিক যোগাযোগের সমাবেশ; প্রেম, ভক্তি ও নৈতিক চেতনার সমাবেশ। 'আমি-তুমি'কে জ্ঞানীয় স্তরে বিধৃত করলে সে 'আমি-ইহা' রূপে বিনষ্ট হয়।

তাই একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 'আমি-তুমি' আর 'আমি-ইহা' নামক দুই দৃষ্টিভঙ্গীই বর্তমান। প্রথমটি আত্মিক ভূমি, দ্বিতীয়টি জড়ভূমি। প্রথমটি প্রেম, দ্বিতীয়টি বিষয়-জ্ঞান। কবিচিত্তে, মরমিয়ার প্রাণে—'তুমি' একটি রহস্যময় দিব্যপ্রকাশ; বৈজ্ঞানিকের ক্ষুরধার বিশ্লেষণের মুখে 'ইহা' একটি নৈর্ব্যক্তিক, মূল্যহীন পিণ্ডপ্রকাশ মাত্র। রবীন্দ্রকাব্যে সকলেই—এমনকি সমগ্র বিশ্বজগৎই 'তুমি' রূপে প্রকট; আর সেই জগদনুস্যূতা বিচিত্ররূপিণীই তো অযুত আলোকে দেদীপ্যমান জীবনদেবতা! এর অর্থ এই যে, 'তুমি'কে যেমন 'ইহা'রূপে দেখা যায়, তেমনি যে কোন 'ইহা'কেও 'তুমি'রূপে দেখা যায়। এটা শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ। জ্ঞাতৃচেতনায় যে 'ইহা' বা 'সে' সেই আবার নৈতিক চেতনায় বা মূল্যবোধে 'তুমি'। যে কোন মানুষ, যে কোন জীব, এমনকি যে কোন জড়বস্তুও 'তুমি'রূপে প্রকট হতে পারে। প্রেমিক, দয়িত বা বন্ধু যেমন 'তুমি', তেমনি পোষা পাখীটিও তো 'তুমি'; এমনকি উপাস্য দেবতার মূর্তিটিও উপাসকের কাছে 'তুমি' হয়ে যায়। মৃন্ময় মূর্তিটি যখন 'তুমি' হয়ে উপস্থিত হয়, তখন তার মৃৎসংজ্ঞার পেছনে এক অমর সংজ্ঞা ভাস্বর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ 'আমি-তুমি' চেতনায় যে কোন বিষয় বা অবস্থাই এক বিরাট, মহিমময় 'তুমি' বা ভগবানের প্রতীক। 'আমি-

তুমি'র আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ঈশ্বরের দিব্যাঙ্গুলি স্পর্শে সমগ্র বিশ্বজগতের বীণা কেঁদে কেঁদে ওঠে। আবার সবকিছুই যখন জ্ঞানীয় 'ইহা'রূপে আমার দৃষ্টি ব্যাহত করে, তখন সবকিছুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিন্ন হয়। 'আমি-তুমি' তাই আত্মিক চেতনার প্রতিলিপি, 'আমি-ইহা' জ্ঞেয় বা জড়চেতনার প্রতিলিপি। 'আমি-তুমি'র মনোভাবে আমরা 'আমি-ইহা' ছাড়িয়ে ঊর্ধ্ব-লোকে প্রয়াণ করি। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীকেই স্বীকার না ক'রে নিলে মানুষের অনুভূতির অপ-লাপ করা হয়। তাই শুধু বিজ্ঞানকেই আশ্রয় করলে মানুষ ইষ্টলাভ করবে কি ক'রে? তার বৈজ্ঞানিক চেতনার যেমন বিকাশ চাই, তেমনি তার আত্মিক চেতনারও চাই জাগরণ। বিজ্ঞানের দৃষ্টি ও ব্যাখ্যা খণ্ডিত চেতনার ফল। বিজ্ঞানের সুচিরস্থায়ী নৈর্ব্যক্তিক সত্যগুলিকে একমাত্র 'সৎ' ব'লে ভাবলে আত্মিক মূল্যজগতের গ্লানি হওয়া আশ্চর্য নয়। তাই বর্তমান পরমাণু-যুগে ধর্মের গ্লানি দেখা যাচ্ছে। মানুষ যতদিন না তার সামগ্রিক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যত-দিন না তার আত্মিক চেতনা জড়চেতনার সঙ্গে রফা ক'রে নিচ্ছে, ততদিন তার শান্তি নেই; ততদিন সে ভীত, সন্ত্রস্ত ও আত্মবোধের অভাবে পঙ্গু হয়ে থাকবে।

'সে', 'তিনি' প্রভৃতি শব্দও ব্যক্তিবাচক সর্বনাম। 'আমি-সে' বা 'আমি-তিনি' সমাবেশে 'আমি-ইহা' সমাবেশেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের অভাব আছে। ব্যক্তি যখন 'সে' বা 'তিনি', তখন ব্যক্তি দূরস্থ, জ্ঞানের বিষয়মাত্র। 'সে' বা 'তিনি', 'তুমি'রূপে উপস্থাপিত হ'লে আত্মিক জগতের দাবিদার হয়ে পড়ে। এক অর্থে 'আমি-ইহা' সমাবেশের সকল 'ইহা'ই জড়রূপী 'ইহা', কারণ 'ইহা' জ্ঞাতা-ভিন্ন বা জ্ঞাতা-অতিরিক্ত। জড়বস্তু একটা দৃষ্টিভঙ্গীর 'সন্তান'—জ্ঞানীয় বোধে তার উপস্থিতি। 'আমি-ইহা' দৃষ্টিভঙ্গী, 'আমি-তুমি' দৃষ্টিভঙ্গীতে রূপান্তরিত হ'লে, জড়ভূমি অতিক্রান্ত হয়ে অধ্যাত্মভূমিতে মানুষের পদপাত হয়। 'আমি-তুমি'র 'তুমি' অবিষয় ব'লে সে তার জড়ত্ব পরিহার করে, আর আমার আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের উপর নির্ভর করে। এটা কিছু একটা অদ্ভুত বা অযৌক্তিক কথা নয়।

মানুষের ব্যক্তিত্বে যেমন জ্ঞান রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রেম ও নৈতিক চেতনা। একটা মানুষের মতামতের জীবন, আর একটা ব্যবহার বা ভালমন্দ বোধের জীবন। প্রথমটি নিরপেক্ষ, দ্বিতীয়টি ব্যক্তিসাপেক্ষ। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গী, অন্ততঃ মানুষের পরিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে, পরস্পর বিরোধী ও বিজাতীয়। মহামতি ইম্যানুয়েল্ কান্ট্ এই জ্ঞানজীবন ও কর্মজীবনের মধ্যে বৈজাত্য স্বীকার করেছেন। জ্ঞানের বিষয়গত নৈর্ব্যক্তিক জগতে কোথাও কোন স্বাতন্ত্র্য নেই—সব কিছুই কার্যকারণের অমোঘ নিয়মে বাঁধা। 'আমি-ইহা' তাই শৃঙ্খলিত; কিন্তু 'আমি-তুমি' স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন। এখানে আত্মার সঙ্গে আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত মিলন, অস্মিতায় অস্মিতার প্রবেশ, বন্ধন থেকে গ্লানিহীন উদার মুক্তি বা কৈবল্য। এ দুটি বিজাতীয় ধারার মধ্যে শুধু একটির ওপর জোর দিয়ে বিজ্ঞানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এক রকমের অন্ধতারই সামিল। বিপথগামী বিজ্ঞানের সহিংস ডমরুর হুঙ্কার এখন প্রেমের বংশীধ্বনিতে কমনীয় ক'রে নেবার দিন এসেছে। নৈতিক চেতনায়, প্রেমে, ধর্মবোধে আর রসানুভূতিতে মানুষকে তার কঠোর, ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিজ্ঞানের মূল্যে কষে নিতেই হবে।

পরম শেষের অন্বেষণে

শ্রীমতী সংযুক্তা মিত্র

একদিকে মত্ত সিন্ধুর গর্জন, অন্যদিকে শ্যামলিম তটের আভাস। একদিকে শুধু ভেঙে যাওয়া, শুধু স্বপ্নের সমাধি; অপরদিকে বালুকা-বেলায় তাসের ঘরের স্বপ্নবাঁধা। এই তো জীবন! উত্তাল তরঙ্গের উত্থান পতন। সানাই-এর বিচিত্র রাগিণী—লহরীর পর লহরীর বিচিত্র তানে সে বাজে; আর তারই ভিতরে বাজে অচঞ্চল এক তান। কে যেন সানাই-এর 'পোঁ' ধ'রে থাকে। আর থাকে বলেই তো সুরের সঙ্গতি। নটুয়ার হাতের পুতুল আঁধারের পারে দূর দিগন্তের দিকে মেলে ধরে তার অসহায় দৃষ্টি। সেদিকে খোঁজে আলোর আশ্বাস। কে জানে ধ্রুবতারা কোন্ দিকে? তবু একথা সত্য যে ধ্রুবতারা আছে। সে আছে বলেই বেঁচে আছে অধ্রুব এই প্রাণ—মানুষ যার নাম। সত্তার গভীরে সে কান পেতে শোনে কিসের প্রেরণা! কে দেয় তাকে আশ্বাস, বরাভয়। এই বিধৃতিটুকু না থাকলে কবে ভেসে যেত তার বালির প্রাসাদ—এই জীবন। ভারতের প্রাণের শোণিতে নিত্য প্রবহমাণ এই সনাতন বিধৃতি। যাদের কান আছে তারা শোনে এর আহ্বান। তারা ভাষা দেয়, রূপ দেয় তাকে। নগর যাদের কলঙ্কিত করেনি, বিষিয়ে দেয়নি যাদের সভ্যতা—সেই অজ্ঞাত বাউল ফকীর তাদের ছড় টানে বীণায়, ঝঙ্কার তোলে একতারায়। কে রাজ্য পেল আর কে গেল—এরা তার খবরও রাখে না। এরা জানে শুধু প্রাণপাখীর খবর, জানে জীবন-নদীর জেলের আর তার জালের খবর।

যে প্রাসাদে বাস করি, তার ভিত্তির খবর রাখি কি? যে থাকে অন্তরালে, তাকে না জানলে ক্ষতি কি? কেই বা জানে! যারা জানে, আমরা তাদেরও জানতে চাই না। তাই যে বিধৃতিটুকুর উপর দাঁড়িয়ে থাকে জীবন, তাকে কত অবান্তরভাবে কল্পনা করি। না-বোঝার স্বল্পালোকে মন আঁকে কত কল্পনা ধর্ম সম্বন্ধে—যে বিধৃতির উপর জীবন দাঁড়িয়ে থাকে তারি সম্বন্ধে।

অনেকে বলেন দেবালয়ে অর্ঘ্য দাও, নিজের হাতে সাজাও পঞ্চপ্রদীপ, কামনা কর, প্রার্থনা কর—এই ধর্ম। কিন্তু ধর্ম কথাটির অর্থ কি এতই সংক্ষিপ্ত?—এতই সীমাবদ্ধ? অর্চনা তো উপাসনামাত্র—ধর্মোপলব্ধির অঙ্গ। পাতঞ্জল দর্শনে চরম উপলব্ধির জন্য সমাহিত চিত্তের প্রয়োজন। ঝড়ের দোলায় যদি তোমার চিত্ত কাঁপে, তবে কেমন ক'রে ধরবে সেই অকম্পিত প্রশান্তির সমুদ্রকে? তাই চিত্তশান্তির অন্যতম পন্থা ঈশ্বরের উপাসনা। পাঁজিপুঁথির নক্ষত্রের রাশি মিলিয়ে জীবনের ছক আঁকো। অতি সাবধানী পা ফেলে ফেলে চল। বিধি-নিষেধের কড়া পাচিল তুলে গড়ে তোল নিশ্চিন্ত তোমার অচলায়তন। অনেকে বলেন এই-ই ধর্ম। পল্লীর বহু সামাজিক ইতিহাসের পাতায় এর কলঙ্কিত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। অন্ধ চোখ দেখল না—পাচিলের তলায় মনুষ্যত্বটাই গেল তলিয়ে। 'ধর্ম কি আছে রে বাপু'—এ-কে উদ্দেশ্য করেই স্বামীজী বলেছিলেন: ধর্ম গিয়ে ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে। এক-মাত্র ধর্ম এখন ছুৎমার্গ। আর মন্ত্র—ছুঁয়ো না,

য়ো না। বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর দূর-সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে—

'যারে তুমি পিছে ফেল
সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে ফেলেছ যারে
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'

বিশ্বাস করিনি আমরা, তাই ইতিহাসও আমাদের ক্ষমা করেনি।

'ধর্ম বার্ধক্যের সাথী। এখনই তাকে চেয়ো না। এখন শুধু তোমার জীবনপাত্র সুধায় ঢেলে নাও। ভোগ কর তাকে। তারপর সন্ধ্যার ধূসর লগ্নে হরিনামের মালা হাতে অপেক্ষা কোরো অন্তিম ক্ষণের।'—এমন মতও আমরা অধিকাংশই পোষণ করি, অর্থাৎ যেন মালা ঘোরানোটাই ধর্ম। ভোগলিপ্স অপটু শিথিল মনকে অন্যমনা করিয়ে সান্ত্বনা দেওয়াই তার সার্থকতা। ধর্ম যেন অবাস্তব অলীকের স্বপ্ন। কোন কোন বিজ্ঞ জন বলেন: সভ্যতার কোন্ আদিম ঊষায় নিষ্ঠুর প্রকৃতির ক্রোড়ে অসহায় মানুষের মনের ভয় হতে সৃষ্টি হয়েছিল যে ধর্মের, আজকের বিংশ শতাব্দীর প্রখর বৈজ্ঞানিক আলোকে আর মৃত্যুই কাম্য। কিন্তু এ কথা কি তাঁরা বিস্মৃত হন যে দর্শনেতিহাস একে কোন দিন ধর্ম বলেনি। এটা দেশ-কালগত আদিম উপাসনামাত্র। ধর্মকে এ উপাসনা করায়ত্ত করেনি। ধর্ম একে অতিক্রম ক'রে বহু ঊর্ধ্বে উঠে গেছে।

নানা অস্পষ্ট এবং ভ্রান্ত ধারণার ফলশ্রুতি এই যে, আজকের দিনের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী মন কতকগুলি সংস্কারকে স্বীকার করতে নারাজ। এ যুগ পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। তাই সে মনে করে যার ব্যাবহারিক জীবনের সাথে কোন কার্যকারিতা নেই, সংযোগ নেই—তাকে মৃতবৎ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। সমাজের অগ্রগতির পথে সে অন্তরায়। আধুনিক অনেকের বিশ্বাস Religion is the opium of mankind.—ধর্ম আফিমের নেশা।

উপনিষদের জন্মস্থান ভারত-ভূমিতে এ ধারণা বেদনাদায়ক। ভারতীয় চিন্তাধারায় ধর্ম কোন দিনই একটি অবাস্তব অলৌকিক অদ্ভুত কোন অস্তিত্বরূপে স্বীকৃত হয়নি, সীমাবদ্ধ হয়নি এর গতি লোকাচার আর দেশাচারের গণ্ডিতে, পঙ্গু হয়নি অন্ধবিশ্বাসের শৃঙ্খলে। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অজ্ঞ সমাজই তাকে বিকৃত করেছে; পাঁচিল তুলেছে সে বার বার—আর বার বার সে পাঁচিলে মরেছে সে মাথা কুটে। শান্তির পথ দূরেই রয়ে গেছে চিরদিন।

ধারণাত্মক 'ধৃ' ধাতু হতে ধর্ম কথাটির উৎপত্তি। সমাজকে, জীবনকে—নিখিল মৈত্রী, বিশ্বপ্রেম, অনন্ত করুণা, সৌহার্দ্য ও একাত্মতার পাদপীঠে যে ধারণ ক'রে থাকে তাই ধর্ম। তাই প্রকৃত ধর্মের উপলব্ধি মানবকে মানবতার ক্ষুদ্র গণ্ডির ঊর্ধ্বে দেবত্বের পথে নিয়ে যায়। ধর্মের সঙ্গে অন্তরের আছে নিবিড় সম্বন্ধ—ব্যাবহারিক জীবনেও তার তেমনি আছে প্রকাশ। এ না হ'লে পৃথিবীর ক্ষুদ্র মাটির ঘরে মানুষের ঠাকুরালি কি কখনও সম্ভব হ'ত? এক কথায় স্বামীজীর ভাষায়: Religion is the manifestation of divinity that is already in man.—অর্থাৎ মানুষের অন্তরে দেবত্ব রয়েছে-ই, তার প্রকাশসাধন ধর্ম। ভারতের শাশ্বত চিন্তাধারা মানুষকে ছোট করেনি, খর্ব করেনি তার মনুষ্যত্ব। পরন্তু তারই ক্ষুদ্র হৃদয়ে দেবত্বের পূর্ণ অস্তিত্বকে সে স্বীকার করেছে। ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপে দেখেছে সে জ্যোতির্ময় প্রভার আভাস। এই চির-কালের বাণীটিকেই আবার নূতন ক'রে শুনিয়ে গেলেন স্বামীজী। তিনি বললেন: Each soul is potentially divine. The goal is

to manifest this divine within by controlling nature external and internal.… This is the whole of religion. Doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details. প্রতি আত্মা স্বরূপতঃ দিব্য। বাহ্য এবং আন্তর প্রকৃতিকে সংযত ক'রে এই দিব্য সত্তাকে প্রকাশ করাই লক্ষ্য। এইটিই ধর্মের মর্ম। নিয়ম বা নীতি, সংস্কার বা আচার, গ্রন্থাদি বা মন্দির গৌণ। অজ্ঞানের অন্ধকার এই দিব্য সত্তাকে আবৃত ক'রে রাখে। যে শক্তি এই আবরণ সরিয়ে সামান্য মানবকে বিশ্বমানবের বেদীতে নিয়ে যায়, তাকে মৃত বা 'নেশা' বলি কোন্ অর্থে?

ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারা ভগবত্তাকে সমাজের বহু ঊর্ধ্বে এমন এক দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ আসনে বসিয়ে রাখেনি—যেখানে প্রণাম পাঠানো যায়, কিন্তু দু'হাত বাড়িয়ে তাকে হৃদয়ে গ্রহণ করা যায় না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণুতে পরমাণুতে, প্রতি প্রাণীতে, স্থাবরে জঙ্গমে একই অনন্ত এবং অদ্বৈত বিশ্বসত্তার অবস্থিতি স্বীকার করেছে সে। সে বলেছে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন: 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।' ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়েই বিরাজ করেন। সকল প্রাণী তাঁরই বিভিন্ন প্রকাশ। বেদে আছে: 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী।' তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার অথবা কুমারী। এক কথায় সর্বজগৎ তোমাময়। এই বিশ্বাসে এই সর্বব্রহ্মময়ত্ব যিনি স্বীকার করেন, তাঁর কাছে কোন সঙ্কীর্ণতা—কোন ক্ষুদ্রতাই থাকতে পারে না। তাঁর উন্মুক্ত অবারিত হৃদয়ে তখন নিখিল জগৎ এসে কোলাকুলি করে। এত বড় সর্বজনীন সৌভ্রাত্রবোধ কখনও বস্তুতন্ত্রবাদের দ্বারা সম্ভব নয়। বস্তুতন্ত্রবাদ রুটির অভাব মেটাতে পারে। কিন্তু 'মানুষ তো শুধু রুটি খেয়েই বাঁচতে পারে না।'

গতিশীল মনোধর্ম সক্রিয় চেতন আদর্শের প্রয়াসী। তাই বিশ্বপ্রেম ও সৌভ্রাত্রবন্ধন একমাত্র সেই ধর্মের দ্বারাই সম্ভব যে ধর্ম শিক্ষা দেয় সর্বাত্মকত্ব; সৌভ্রাত্রবন্ধনকে মানবতার গণ্ডির মধ্যে না নামিয়ে ধর্ম তাকে তুলে ধরে এক ঊর্ধ্বগামী চেতনার বিস্তৃতিতে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু, পরিজন সকলেই আমার একান্ত আত্মীয়, কারণ যে আত্মা আমার হৃদয়ের গোপনে বিরাজিত তাকেই দেখি অপরের সত্তার অন্তঃস্থলে। এই বোধে তাই কোন স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসার স্থান নেই। ব্যাবহারিক জীবনে এর চেয়ে বড় মিত্র আর কাকে বলি?

এই বিশ্বমানবত্ব বোধ বা নিখিল চিত্তের সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা কল্পনামাত্র নয়। বারে বারে সমাজে এসেছেন সেইসব মহাপুরুষ, জীবনই যাঁদের বাণী। যাঁরা প্রচলিত অন্ধ সংস্কারের আবর্জনা সরিয়ে প্রকৃত ধর্মের স্বচ্ছ সুন্দর সত্য শিব রূপটি তুলে ধরেছেন লোকসমাজে। আমরা তাই দেখেছি শ্রীচৈতন্যকে—যবন হরিদাসের প্রতি তাঁর প্রেম—আচণ্ডাল দ্বিজে তাঁর ভালবাসা। দেখেছি সেই যুগাচার্যকে—সেই বিশ্ববিজয়ী বৈদান্তিক স্বামী বিবেকানন্দকে। কি বিপুল তাঁর মানবপ্রেম! একদিনের ইতিহাস—স্বামীজী তাঁর ঘরে বসে এক শিষ্যকে বেদবেদান্তের দুরূহ তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন। এমন সময়ে ঘরে ঢুকলেন নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ—তাঁর প্রিয় জি. সি.। তাঁকে দেখে পরিহাসপ্রিয় স্বামীজী বললেন, 'কিহে জি. সি., তোমার এ-সবে প্রয়োজন নেই? কি বল!' গিরিশচন্দ্র নিরুত্তর; কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললেন, 'বেদবেদান্ত তো অনেক পড়েছ। ক্ষুধিতের অন্নের জন্য হাহাকার, দরিদ্রের দুঃখ,

······আরো কত রকম অন্যায়, অবিচার ও দুঃখ—এর কোন প্রতিকার তোমার বেদবেদান্ত লেখে কি ?' এর পর একে একে বর্ণনা করতে লাগলেন বহু প্রত্যক্ষ ঘটনা—মর্মান্তিক, অসহ্য। স্তব্ধ, গম্ভীর হয়ে রইলেন স্বামীজী। বিশাল তাঁর দুটি চোখে এল অশ্রুর জোয়ার। তার-পর এক সময় উঠে গেলেন—ভাব সংযত রাখতে না পেরে। তখন গিরিশচন্দ্র শিষ্যকে বললেন, 'দেখলি কত বড় হৃদয়! ওকে আমি ওর যশ-পাণ্ডিত্যের জন্য ভালবাসি না। মানুষের দুঃখকষ্টের জন্য যে হৃদয় বেদনার্ত হয়, সেই উদার বিশাল হৃদয়ের জন্যই ভালবাসি। তোদের স্বামীজী একাধারে মহাজ্ঞানী ও মহাভক্ত।'

বিশুদ্ধ অদ্বৈত দৃষ্টিতে মানবপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসের নবীন মন্ত্র দিয়ে গেলেন স্বামীজী—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' আপনার মুক্তি এবং জগতের কল্যাণের জন্য সন্ন্যাস-গ্রহণ। এ যুগের নব 'কর্মযোগ' শোনালেন তিনি: So long as a single dog in my country remains without food, my whole religion will be to feed it. এই যে নিখিলপ্রাণের বেদনায় বেদনাবোধ—এইটিই ধার্মিকের প্রধান লক্ষণ।

ধর্মকে তাই ভারতীয় চিন্তাধারা পূজার ঘরের নিভৃতে লুকিয়ে রাখেনি, রাখেনি তাকে দেশা-চারের লোকাচারের গণ্ডির মধ্যে; তাকে এনে দিয়েছে প্রাত্যহিক জীবনের ছায়াতরুরূপে, দিক্-নির্দেশকরূপে। প্রকৃত ধর্মজ্ঞান প্রাত্যহিক জীবনে আনে তাই অনাবিল শান্তি ও নিঃস্বার্থ প্রেম, আনে নিষ্কাম কর্মের প্রেরণা। কাজ হয় তাই সেবা। ধর্ম সংসারেরই বহু পরিজনের মধ্যে ভগবৎসত্তার সন্ধান করতে শিখিয়েছে একদিকে; অন্যদিকে দেবতাকেই সন্তানরূপে, মাতারূপে, পিতারূপে, বন্ধুরূপে পাবার কামনা দিয়েছে। তাই তো কবির মুখে শুনি:

'তোরা শুনিস কি শুনিস নি তাঁর পায়ের ধ্বনি,
সে যে আসে—আসে—আসে।'

ভক্তের বাণীতে দাবি করেছেন:

'আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা
আমায় ঘিরে চলছে রসের খেলা;
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।'

অলীক, অলৌকিক নয়—সংসারের বহু-জনের মাঝেই পরিব্যক্ত তাঁর রসের লীলা। বহুর মাঝে সেই পরম একের প্রকাশের কথাই কবি বলেছেন:

জগতের মাঝে কত বিচিত্র রূপে হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

নিরন্ন, বুভুক্ষু, অতিথি শুধু নর মাত্র নয়, নররূপী নারায়ণ। এই দৃষ্টিটিই নতুন ক'রে আবার জাগিয়ে দিয়ে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। যে সেবাধর্ম তিনি প্রচার ক'রে গেলেন তার বীজ ছিল তাঁর গুরুদেবের কথায়—জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীব সেবা। তারই প্রতিধ্বনি শুনি স্বামীজীর কণ্ঠে: তোমরা শাস্ত্রে পড়েছ—মাতৃ-দেবো ভব, পিতৃদেবো ভব। আমি বলি—আর একটু সংযোগ কর—দরিদ্রদেবো ভব। দরিদ্র তোমার দেবতা হউন। —এই তো শিবজ্ঞানে জীবসেবার মূলকথা। পরবর্তী যুগে গান্ধীজীর হরিজন-আন্দোলনের অনুপ্রেরণার উৎসও এই-খানেই। স্বামী বিবেকানন্দ দৃপ্তস্বরে বলেছিলেন:

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

-এই বোধই প্রকৃত ধর্ম। তাই যিনি প্রকৃত মানবপ্রেমিক তিনি ঈশ্বরবাদী না হলেও ধার্মিক ব'লে স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়েছেন আমাদের

দেশে। উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-যুগের অগ্রণী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজ তাঁকে বলেছে বিদ্রোহী, জেহাদ্ তাঁর ধর্মের নামে প্রচলিত অধর্মের বিরুদ্ধে। শত শত নির্যাতিত গণদেবতার চোখের জলে লোনা হয়ে গিয়েছিল তাঁর জীবন-সমুদ্র। আর সেই সমুদ্রমন্থন ক'রে তিনি হয়েছিলেন করুণার অমৃত। তৃপ্ত হয়েছিল লাঞ্ছিত আত্মা। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ তাই বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন গীতা ভক্তের লক্ষণ নির্ণয় করেছেন :

'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।'

—সর্ব প্রাণীর প্রতি দ্বেষবিহীন, মৈত্রী এবং করুণাযুক্ত। মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘু-বংশের প্রস্তাবনাতে বলেছেন : তিনি এমন এক রাজবংশের মহিমা কীর্তন করবেন, যে রাজবংশের রাজন্যবৃন্দ আজন্ম শুদ্ধ, যথার্থ ভক্তি-মান্, প্রার্থীকে অভীষ্টদানকারী, ন্যায়নিষ্ঠ, সত্য-পরায়ণ, অনলস কর্মী, ত্যাগের জন্যই অর্থের সঞ্চয়কারী, মিত ও সত্যভাষী এবং প্রজার মঙ্গলের জন্যই সংসারাশ্রমী। ভারতের ব্যাব-হারিক জীবনের ঈপ্সিত ধর্মের রূপ এইটিই।

যে বোধ ভোগে আনে ত্যাগের প্রেরণা, বিলাসে আনে বিরতি, অহংকারকে বিস্তার করে বিশ্বজনীনতায়, কর্মে আনে সেবার আনন্দ, মানবত্বের লীলাভূমিকে করে দেবত্বের পাদপীঠ—তাই ধর্ম। আত্মচেতনায় এর জন্ম; সার্বভৌম উপলব্ধিতে এর পরিণতি। তাই আমাদের ধর্মবোধের প্রথমে ঋষিরা বলেছেন : আত্মানং বিদ্ধি—নিজেকে চেন। আপনার অন্তঃস্থলে আছে যে পরিপূর্ণ দেবত্ব, তাকে উপলব্ধির দ্বারা জাগ্রত কর। পূর্ণ শতদলে বিকশিত কর। জীবন হোক মধুময়। সমাজ হোক কল্যাণবর্ষী।

হে মহাশিল্পী !

কাজী নুরুল ইসলাম

হে মহাশিল্পী, সযতনে তব কালজয়ী তুলিকায়
স্থষ্টির এই অক্ষয় রূপ গড়েছিলে নিরালায়।
তোমার রচিত প্রদর্শনীর মাঝে
অগণিত ছবি সাজানো সুচারু সাজে,
মোরা দর্শক, যত দেখি তত আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়।
প্রভাতে সূর্য পবিত্র বেশে পূর্ব গগনে ওঠে,
নীরবে খুলিয়া শোভার কৌটা বনে বনে ফুল ফোটে।
পাহাড়ের গায়ে তুষারের আলোয়ান,
যায় রথে চড়ি মেঘেদের অভিযান,
ফেনিল উর্মি সাগর-উঠানে পাগলের মত ছোটে।
রাতে নীলাকাশে চন্দ্রের পাশে ভিড় জমে তারকার,
নীহার-কন্যা মনে হয় যেন ছিঁড়িয়াছে মণিহার।
রচনা তোমার চির-জীবন্ত প্রভু,
যুগ যুগ হেরি সাধ মিটিবে না প্রভু,
হে মহাশিল্পী, দিও বার বার দেখিবার অধিকার।

সাধু শ্রীআপ্পার্

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

দাক্ষিণাত্যের তেষট্টি জন নয়নার্-এর মধ্যে চারজন ছিলেন বিশেষ প্রসিদ্ধ। সাধু শ্রীআপ্পার্ এই চারজনের মধ্যে অন্যতম; ইনি 'কার্য' বা 'দাস' মার্গের আচার্য নামে খ্যাত। এঁর সুদীর্ঘ অশীতিবর্ষ জীবন ঘটনাবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে শ্রীআপ্পার্ মাদ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ আর্কট জেলার অন্তর্গত ত্রিভামুর গ্রামে এক ভেল্লালা (বিখ্যাত কৃষক) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল পুগালনার (বিখ্যাত ব্যক্তি) এবং মাতার নাম ছিল মাথিনীয়ার। আপ্পার্ ছিলেন এঁদের দ্বিতীয় সন্তান। পিতামাতা এঁর নাম রেখেছিলেন মারুনিকীয়ার অর্থাৎ অন্ধকার-বিদারক। তিরুনাভুকারসু বা 'বাগীশ' ছিল তাঁর ঈশ্বরপ্রদত্ত নাম; এর অর্থ জিহ্বার ঈশ্বর। তিনি যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে এবং যে কোনও অবস্থায় স্তবস্তুতি রচনা করতে পারতেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভক্তির গভীরতা ও উচ্ছ্বাস ঐ সব স্তবস্তুতির মাধ্যমে প্রকাশিত হ'ত এবং ঐগুলি 'তেবারম্' নামে প্রসিদ্ধ। ঐ সব তেবারম্ দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত শিবমন্দিরসমূহে প্রত্যহ অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা-সহকারে গীত হয়ে থাকে। দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক ধার্মিক মাতাপিতা—তাঁদের ছেলেপুলেরা যাতে শৈশবকাল হতেই তেবারমের অংশবিশেষ কণ্ঠস্থ করে ও প্রত্যহ পাঠ করে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

আপ্পার্-এর জ্যেষ্ঠা ভগিনী তিলকবতীয়ার্ কালীপাগাইয়ার নামে এক পল্লব-সেনাপতির সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। এর অল্পকাল পরেই আপ্পার্-এর স্নেহময় পিতা পরলোক গমন করেন এবং মাতা সহমরণে যান। আপ্পার্ তখন ছেলেমানুষ। তিলকবতী সমস্ত স্নেহ দিয়ে ছোট ভাইটিকে লালনপালন করেন। দুঃখের বিষয় অল্পকাল পরেই তিলকবতীর স্বামী যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অশেষ বীরত্ব প্রকাশপূর্বক শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জন করেন। পতিশোকে মুহ্যমানা তিলকবতী প্রথমে সহমরণে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু পরম আদরের অনাথ ছোট ভাইটির সজল নয়ন ও করুণ মুখের দিকে চেয়ে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। তাঁর অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বর-আরাধনায় এবং ছোট ভাই-এর রক্ষণাবেক্ষণে অতিবাহিত করবেন, এইরূপ স্থির করেন।

তখনকার দিনে জৈন ও বৌদ্ধদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। মন্ত্রোচ্চারণ, মারণ, উচাটন, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতির সাহায্যে তারা ক্রমশঃ জনসাধারণের চিত্ত জয় করতে থাকে, এমনকি অনেক রাজাও তাদের কবলে প'ড়ে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ ক'রে জৈনধর্মে দীক্ষিত হন। রাজার সহানুভূতি ও অনুমোদনক্রমে অনেক হিন্দু-মন্দির ভেঙে ফেলা হয় এবং বহু জৈনমন্দির নির্মিত হয়। কিশোর-বয়সে আপ্পার্ এদের হাতে পড়েন এবং পাটলিপুত্র নগরে জৈন আশ্রমে নীত হন ও জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। আপ্পার্-এর হৃদয় ছিল ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ এবং ধর্মাচরণে তাঁর আন্তরিকতা ছিল অতি গভীর। কাজেই জৈনধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি অন্তরের সহিত ঐ ধর্ম গ্রহণ করেন, অনেক পুস্তকাদিও রচনা করেন এবং অচিরেই সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়। জৈনরা তাঁকে

'ধর্মসেনা' নামে অভিহিত করেন। পল্লব-সম্রাট মহেন্দ্র বর্মা তাঁর পাণ্ডিত্য ও ভক্তিভাব দেখে মুগ্ধ হন এবং কথিত আছে—রাজকুমারীকে তাঁর হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু আপ্পার্-এর পারিবারিক জীবন সুখের হয়নি। কালক্রমে জৈন শ্রমণদের আন্তরিকতার অভাব দেখে তাঁর অন্তর অত্যন্ত ব্যথিত হয় এবং স্নেহময়ী ভগিনীর কথা মনে পড়ে। তিলকবতীও এদিকে ভ্রাতার মতির পরিবর্তনের জন্য নিয়মিত শিবমন্দিরে হৃদয়ের আকুতি জানাতে থাকেন। হঠাৎ আপ্পার্ পেটের ব্যথায় (colic pain) অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে জৈন শ্রমণরা নানারূপ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক তাঁকে সুস্থ করার বিফল প্রয়াস পান। এদিকে ভগিনীর সান্নিধ্য লাভ করার জন্য আপ্পার্-এর হৃদয় অস্থির হয়ে ওঠে এবং একদিন সুযোগ বুঝে তিনি পলায়ন করেন ও কোনও ক্রমে ভগিনীর কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁর পদতলে পতিত হয়ে স্বীয় দুষ্কৃতির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ক্ষমাশীলা ধর্মপরায়ণা ভগিনীও তাঁর সব দোষ ভুলে গিয়ে তাঁকে হৃদয়ে জড়িয়ে ধরেন। ভগিনীর আকুল প্রার্থনায় ও সেবা-শুশ্রূষায় কিছুদিনের মধ্যে আপ্পার্ সুস্থ হয়ে ওঠেন। অতঃপর তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে মগ্ন হন শিবের আরাধনায়। অনুতপ্ত চিত্তে অপরাধ ক্ষালনের জন্য ডুবে যান তিনি গভীর তপস্যায়। দীর্ঘ সাধনার পর শিবমাহাত্ম্য ও শৈবধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বাকী জীবন উৎসর্গ করবেন, এই সংকল্প গ্রহণ করেন।

জৈনরা কিন্তু এদিকে আপ্পার্-এর অনুসন্ধানে রত হন এবং তখনকার পল্লব-রাজা জৈনধর্মাবলম্বী কাডবের সহায়তায় আপ্পার্কে খুঁজে বের করেন এবং তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হয়। প্রথমে আপ্পার্কে হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় জ্বলন্ত ইঁটের পাঁজার উপর নিক্ষিপ্ত করা হয়। ভগবানের কৃপায় রক্ষা পাওয়ার পর তাঁকে খাওয়ানো হয় তীব্র বিষ। কিন্তু 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে'? যতই বিপদে পড়তে থাকেন, দেবাদিদেব শিবের প্রতি তাঁর ঐকান্তিকী ভক্তি, অটুট শ্রদ্ধা ও শিশুর মতো নির্ভরতা ততই বর্ধিত হতে থাকে। জৈন-ধর্ম-ধ্বজীরা এতেও ক্ষান্ত হয় না। অতঃপর তাঁকে মত্তহস্তীর পদতলে ফেলে দেওয়া হয় এবং শেষ-কালে তাঁর গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। এই অত্যাচারের কাহিনী স্বতই আমাদের ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যখনই আপ্পার্কে মারবার কোন না কোনও উপায় অবলম্বিত হয়, তখনই তিনি প্রশান্তচিত্তে তাঁর ইষ্টদেব মহাদেব সম্বন্ধে একটি স্তব রচনা করেন; এই সকল স্তব চেষ্টা ক'রে রচনা করা নয়, এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত।

ঘোর বিপৎকালীন ঐ সব রচনা অপূর্ব ও অতুলনীয়। ঈশ্বরের প্রতি অটুট অনুরাগ,গভীর ভালবাসা ও ঐকান্তিক আত্ম-সমর্পণের সুরে ঐ স্তবগুলি পরিপূর্ণ। ঐগুলি পাঠে অবিশ্বাসীর হৃদয় ভরে যায় জ্বলন্ত বিশ্বাসে, ঘোর নাস্তিক পরিণত হন আস্তিকে এবং অভক্তের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে পরম ভক্তিতে। তামিল সাহিত্যে ঐ গীতিকাব্যগুলি অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তিনি যা গেয়েছিলেন তাঁর অমর ছন্দে তার অর্থ:

যদি 'নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দ্বারা আমরা অহরহঃ সেই আদিদেবের আরাধনা ও পূজা করি, তবে গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলেও সেই পাথর শোলার মত আমাদের ভাসিয়ে তীরে নিয়ে আসবে।

সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়ার পর যে স্থানে তিনি প্রথম তীরে ওঠেন সেই স্থানটি শৈবদের একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে;

উহা বর্তমান কাডালোর শহরের অন্তর্গত কারায়েরাভিট্টনকুপ্পম্ (the hamlet of landing) নামে খ্যাত।

কূলে আসার পর তিনি ভগিনী তিলকবতীর নিকট গমন করেন এবং তাঁর ইষ্টদেব 'তিরুবট্টিগাই বিরাট্টনম্' নামক মহাদেবের সেবাপূজায় নিরত হন। পল্লব-সম্রাট আপ্পার্-এর জীবনরক্ষার কথা মুগ্ধবিস্ময়ে শুনে গভীর অনুশোচনাগ্রস্ত হন এবং তাঁর পদতলে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় শৈবধর্মে দীক্ষিত হন।

ভগবানের কৃপা লাভ ক'রে আপ্পার্ তীর্থভ্রমণে নির্গত হন এবং প্রধান প্রধান শিবমন্দিরসমূহ দর্শনে পরম পরিতোষ লাভ করেন। একদা ভ্রমণকালে তিনি শুনলেন যে সাধু জ্ঞানসম্বন্ধর্ সেদিকে আসছেন। বয়সে জ্যেষ্ঠ হলেও তিনি ছুটে গিয়ে বালসাধু জ্ঞানসম্বন্ধর্-এর পদতলে পতিত হন। জ্ঞানসম্বন্ধর্ তখনই তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে পরম স্নেহে উঠিয়ে সম্বোধন ক'রে বলেন, 'আপ্পার্'! তদবধি তিনি 'আপ্পার্' নামে খ্যাত হন এবং সেই নামেই সকলে তাঁকে সম্বোধন করতে থাকে। তামিল ভাষায় পিতাকে 'আপ্পা' বলা হয়। তিনি জ্ঞানসম্বন্ধর্-এর প্রায় পিতার বয়সী ছিলেন। গঙ্গাযমুনার মিলনস্বরূপ সেই দুই শ্রেষ্ঠ ভক্তের মিলন ছিল এক অপূর্ব দৃশ্য। উভয়ের অসংখ্য অনুরাগী ভক্ত সেই দৈব মিলন দর্শনে চক্ষু সার্থক করেন। তিরুপ্পুগালুর নামক স্থানে তাঁরা প্রথম মিলিত হন। অতঃপর উভয়ে কয়েকটি তীর্থক্ষেত্রে গমনপূর্বক তথাকার মাহাত্ম্য বর্ধিত করেন। সম্বন্ধর্ মাদুরায় গমন করেন এবং আপ্পার্ পালেয়ার, তিরুপ্পাইনিলি প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনপূর্বক ত্রিচিনাপল্লীর নিকট তিরুপুনাতুরুত্থিতে গ্রামের শিবমন্দিরে অবস্থান করতে থাকেন।

মাদুরায় জৈনদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ক'রে তথায় জ্ঞানসম্বন্ধর্ লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম তথা শৈবধর্মকে স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠাকরত আপ্পার্-এর সহিত মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তিরুপুনাতুরুত্থি অভিমুখে রওনা হন। জ্ঞানসম্বন্ধর্-এর আগমনবার্তা শুনে আপ্পার্ অতীব পুলকিত হন এবং তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে বহু ভক্ত ও শিষ্য সমভিব্যাহারে এগিয়ে যান। দূর থেকে জ্ঞানসম্বন্ধর্-এর পালকি দেখেই আপ্পার্ ছুটে গিয়ে সেই পালকি বইতে আরম্ভ করেন। বয়সে জ্যেষ্ঠ এবং ভক্তিতেও কিছুমাত্র ন্যূন না হলেও আপ্পার্-এর হৃদয়ে অভিমানের লেশমাত্র ছিল না। 'তৃণাদপি সুনীচ' এবং 'তরোরিব সহিষ্ণু' এই উভয়গুণে তিনি ভূষিত ছিলেন। এদিকে জ্ঞানসম্বন্ধর্ জানতেও পারলেন না যে স্বয়ং আপ্পার্ তাঁর পালকি বহন করছেন। গ্রামের কাছাকাছি এসে পালকির মধ্য থেকেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাপুরুষ আপ্পার্ এখানে কোথায় থাকেন?' আপ্পার্ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন, 'প্রভু, আমি অতীব আনন্দ ও গৌরবের সঙ্গে তোমার পালকিতে কাঁধ লাগিয়েছি।' এই কথা শোনামাত্র জ্ঞানসম্বন্ধর্ পালকি হতে লাফিয়ে নেমে পড়ে আপ্পারের পদতলে পতিত হলেন। কিন্তু তৎপূর্বেই আপ্পার্ ভূম্যবলুণ্ঠিত হয়েছেন। দুই মহাপুরুষের সেই দৈব মিলন এক অপার্থিব দৃশ্য! জ্ঞানসম্বন্ধর্ কিছুকাল আপ্পার্-এর সপ্রেম আতিথ্যে পরমানন্দে কাটিয়ে পুনরায় তীর্থভ্রমণে নির্গত হলেন।

আপুথি আডিগল্ নামে এক ব্রাহ্মণ আপ্পার্-এর নাম শুনে তাঁর প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হন এবং নিজের বাড়ীতে ছেলেপুলের ঐ নাম রাখেন, যাতে অহরহঃ তাঁর কথা স্মরণ হয়। যতই আপ্পার্-এর কথা চিন্তা করেন, ততই আডিগলের অন্তর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে

ওঠে। শেষ পর্যন্ত তাঁর দর্শনলাভের জন্য ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ব্যাকুল হন। অবশেষে একদিন খবর এল আপ্পার্ সেই দিকেই আসছেন। যাঁর মূর্তিকে এতদিন হৃদয়ে ধ্যান ক'রে এসেছেন, আজ তাঁকে সত্যই সশরীরে দেখবেন এই আশায় ব্রাহ্মণের অন্তর যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে ভরে ওঠে। সেই শুভ মুহূর্ত এসে পৌছল—ব্রাহ্মণের দরজায় আপ্পার্ উপস্থিত! পরম সমাদরে প্রাণপ্রিয় অতিথির অভ্যর্থনা ক'রে তাঁকে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। ছেলেপুলেদের পরিচয় করিয়ে দিলে তারাও সকলে ভক্তিভরে সাধুকে প্রণাম ক'রল। ব্রাহ্মণের মনে আজ আর অন্য কোনও চিন্তার অবকাশ নেই, কেবল কি ক'রে তাঁর আরাধ্য দেবতার আদর-আপ্যায়ন করবেন ও তাঁকে সুখী করবেন, এই তাঁর একমাত্র চিন্তা।

ভোজনের সময় উপস্থিত হ'লে পুত্রকে তিনি পাঠালেন কলাবাগানে—পাতা কেটে আনতে। দুঃখের বিষয় বাগানে এক বিষধর সর্প ছেলেটিকে দংশন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ দারুণ সংবাদ শ্রবণ করেও আডিগল্ বিচলিত হলেন না, কারণ অতিথিসেবার সময় সমাগত। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ গোপন ক'রে আপ্পার্‌কে আহারে বসবার জন্য আডিগল প্রার্থনা জানালেন। আহারে বসেই আপ্পার্ ছেলেটিকে ডাকতে বললেন। ব্যাপারটি আর গোপন রাখা সম্ভব হ'ল না। আপ্পার্ ব্রাহ্মণের সঙ্গে কলাবাগানে গিয়ে দেখলেন, মৃত অবস্থায় ছেলেটি পড়ে রয়েছে। তাঁর প্রতি আডিগলের ভক্তি-ভালবাসা দেখে আপ্পার্ অবাক্ হয়ে গেলেন এবং তাঁর আরাধ্য দেবতা শিবের উদ্দেশ্যে এক সকরুণ স্তব রচনা ক'রে প্রার্থনা করতে লাগলেন। ঈশ্বরের মহিমা বোঝা মানুষের সাধ্যাতীত! স্তব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তাধীন ভগবানের কৃপায় ছেলেটি বেঁচে উঠল। আডিগলকে প্রাণভরে আশীর্বাদ ক'রে আপ্পার্ বিদায় গ্রহণ করলেন। সত্যই আডিগলের ভক্তির কথা ভাবলে বিস্ময়ে মন অভিভূত হয়ে যায়।

আপ্পার্ হিমালয় হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রধান প্রধান শৈব তীর্থক্ষেত্রসমূহ দর্শন করেন। শেষ বয়সে তাঁর কৈলাসে গিয়ে কৈলাসপতি-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়। পদব্রজে তিনি যাত্রা শুরু করেন। শরীরের বার্ধক্য হেতু কিছুদিন চলার পরে তাঁর পায়ে ঘা হয়। কিন্তু হৃদয়ের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাকে দমন করতে না পেরে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করেন। অল্পকাল পরে তাঁর হাতেও ঘা হয়ে যায়। যতই বাধা আসতে থাকে, ইষ্টদেবের দর্শন-লালসা ততই তীব্রতর হতে থাকে। কথিত আছে, হাত-পা অপটু হয়ে পড়া সত্ত্বেও দমিত না হয়ে তিনি গড়াগড়ি দিতে দিতে অগ্রসর হন। তাঁর ভক্তির আতিশয্য ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে ভক্তের ভগবান আর স্থির থাকতে পারলেন না। এক সাধুর বেশে তাঁর সামনে এসে বললেন, 'ভাই, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। তুমি নিকটস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করলেই কৈলাসের—তথা কৈলাসপতির দর্শন পাবে।' সাধুর কথায় পূর্ণ আস্থা রেখে পুষ্করিণীতে স্নান করামাত্র আপ্পার্ তাঁর বহুদিনের ঈপ্সিত কৈলাস ও কৈলাসপতির দর্শনে ধন্য হলেন; তাঁর সংকল্প সার্থক হ'ল। যে স্থানে তাঁর এই দর্শনলাভ ঘটে সে স্থানের নাম তিরুবায়ার, তাঞ্জোর শহর হতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

আপ্পার্ ৮০ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং শেষ জীবন তিনি তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত তিরুপুগালুর নামক স্থানে অতিবাহিত করেন।

ঐ গ্রামের বিখ্যাত শিবমন্দিরেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত। তিনি হাতে একখানি নিড়ানি নিয়ে মন্দিরে যেতেন এবং তার দ্বারা ঘাস উঠিয়ে মন্দিরের অঙ্গন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন। মন্দির-প্রাঙ্গণ ঝাড়ু দেবার সময় কোনও মণিমুক্তা চোখে পড়লেও খোলামকুচির মতো তিনি তা ফেলে দিতেন; কাঞ্চনের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্রও আসক্তি ছিল না। কথিত আছে—সাধনকালে অপ্সরাগণ তাঁকে প্রলোভন দেখিয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য এবং তাঁর দর্শনই জীবনের একমাত্র ব্রত, এই দৃঢ় সংকল্পের ফলে ঈশ্বরকৃপায় তিনি সে প্রলোভন সহজেই জয় করেন। পরিশেষে তিরুপুগালুর মন্দিরেই তিনি ৬৮১ খৃষ্টাব্দে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হন।

আপ্পার্ ৩১২টি দশ-পঙ্ক্তির স্তব রচনা করেন। সেগুলি ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। স্তবের মাধ্যমে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, সাধনপন্থা প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে তিনি প্রচার ক'রে গেছেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, 'ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার দুই-ই। তিনি পরম জ্যোতি ও অন্তর্জ্যোতি—তিনি প্রত্যেকের ভিতরে আবার বাইরে। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর এবং তিনিই শিব—সমস্ত প্রাণীর পরিচালক, পশুপতি। শিবই সর্ববস্তুর সার—সঙ্গীতের তিনি মধুর ঝঙ্কার, ফলের তিনি সুমিষ্টত্ব ও পুষ্পের তিনি সৌরভ। এই শরীর তাঁর সচল মন্দির, মন ভক্তি, সত্যকথা পবিত্রতা এবং অন্তরের প্রেমই পূজা। বিচাররূপ ঘি দিয়ে অন্তরে জ্ঞানের আলো জ্বালালে সেই আলোকে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়।'

আপ্পার্ বলেন, 'যিনি কাঞ্চন এবং কামকে দূরে সরিয়ে ফেলে ইন্দ্রিয়গ্রামকে জয় করতে পারেন, তিনিই শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। মুক্তির পথে প্রধান অন্তরায় 'অহং'। এই অহংরূপ পাহাড়ে ধাক্কা লেগে আধ্যাত্মিকতারূপ জাহাজ নিমজ্জিত হয়। জীব যদি একাগ্রচিত্তে ও ভক্তিসহকারে 'নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করে, তবে শিবের করুণা নিশ্চয়ই লাভ করবে। ব্রহ্মরন্ধ্রে বিকশিত পদ্মোপরি অবস্থিত মহাদেবের রাতুল চরণে মন নিয়োজিত করতে পারলেই মুক্তি করতলগত।'

তিনি কৃষকের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব'লে অনেক স্তবে কৃষি-সম্পর্কিত উদাহরণ দিয়েছেন। একটি স্তবে তিনি বলেছেন, 'যদি কোন সাধক সত্যের চাষ ক'রে তাতে ভক্তিবীজ বপন করেন ও মিথ্যারূপ আগাছা উপড়ে ফেলে ধৈর্যবারি সিঞ্চন করেন এবং সততার বেড়া দিয়ে ফসলকে ঘিরে রাখেন, তবে তাঁর আত্মানুভূতি হয় ও তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হন।'

আপ্পার্ তাঁর ধর্মান্তরের কথা স্মরণ ক'রে বলতেন, 'অসত্য আচরণের ফলে পাপপঙ্কে পতিত হয়ে যখন সাপের মুখে ব্যাঙের ন্যায় অহরহঃ মৃত্যুযাতনায় ভুগছিলাম, সেই সময় কপালমোচন পবিত্র পঞ্চাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে তবে রক্ষা পাই।' তিনি বলেন, 'কেউ যদি তার দুষ্কার্যের জন্য সত্য সত্য অনুতপ্ত হয়ে আন্তরিক প্রার্থনা জানায় ও ভগবানের মহিমা কীর্তন করে, তবে সে তাঁর রাতুল চরণে স্থান পায়।'

নিজের অঙ্গকে সম্বোধন ক'রে তিনি বলছেন, 'হে আমার শির, তুমি ভক্তিভরে তাঁরই চরণে নত হও; হে আমার চক্ষু, তুমি প্রাণভরে তাঁরই মোহন রূপ দর্শন কর; হে আমার কর্ণ, তুমি নিবিষ্টচিত্তে তাঁরই গুণগান শ্রবণ কর; —কারণ তিনি আমাদের পরম প্রিয় ও পরম

আত্মীয়; যখন মৃত্যু এসে দরজায় করাঘাত করে, তখন কোথায় যায় সব জাগতিক আত্মীয়বৃন্দ। সেই সন্ধিক্ষণে সকলে যখন পরিত্যাগ করে, তখন সেই নটরাজ শিবই পরম আত্মীয়ের ন্যায় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান, সুতরাং সব ছেড়ে দিয়ে তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহলে তাঁকেই পাবে।' বার বার আপ্পার্ এই প্রার্থনাই করেছেন এবং ভগবানও তাঁর অন্তরের আকুতি শুনেছেন, তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন ও দর্শনদানে তাঁর জীবন ধন্য করেছেন।

উৎসর্গ

শ্রীমতী মালা রায়

ছড়ানো এ মন
হেথা হোথা জানো,
তোমার পায়েতে
করো তা জড়ো।

আমি ডাকি তোমা
তুমি শোন কানে,
সাড়া দাও, মোর
চিত্ত ভরো।

তুমি ডাকো প্রভু,—
পশে মোর কানে
সাড়া দিই, ধাই—
এমনই করো।

শুধু তোমা চাই
সব ভুলে যাই
আমারে তোমার
আপন করো।

প্রিয়তম হও,
মোরে প্রিয় করো,
হৃদয়ে কৃপার
প্রদীপ ধরো।

আলোকিত প্রাণ
পুলকিত মন
মনের মতন
তাহারে গড়ো।

বিশ্বভুবনে
তোমার মহিমা
হেরি যেন ছবি
মধুরতর।

ব্যর্থ না হয়
জনম আমার,
জীবন আমার
সত্য করো।

সার্থক হোক্
হেথা আগমন
গতানুগতিক
সকল হরো।

দেহ মন প্রাণ
করি সমর্পণ,
করো আকর্ষণ,
করুণা করো।

নিবেদিত হোক্
সকল আমার,
তুলসীর প্রায়
আমায় করো।

নিঃশেষে যেন
পারি আপনারে
তোমা দানিবারে,
গ্রহণ করো।

গ্রামীণ শিক্ষা

অধ্যাপক শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রামীণ শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলে প্রথমে হয়তো প্রশ্ন আসবে: এর কথা আবার পৃথক্ ক'রে কেন? যে শিক্ষাব্যবস্থা সারা দেশে চালু আছে, তাতেই কি চলে না? গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার কথা আবার বিশেষ ক'রে কেন?

তার উত্তরে বলতে হয় যে গণতন্ত্র-বিশ্বাসী স্বাধীন দেশে একটা জিনিস থাকা চাই—তা হ'ল সবার জন্য সুযোগ-সুবিধার সকল অধিকার। সুযোগ-সুবিধার মধ্যে শিক্ষা একটা মস্ত বড় সুযোগ। এ সুযোগ যাতে সবাই—সমস্ত নাগরিক, সহজে সমানভাবে পায়, সেটা একটা অবশ্য করণীয় বিষয়। কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার এই সুবিধা শহরের দিকেই রয়েছে, আর গ্রামের দিকে সে সুবিধা খুবই সামান্য। এতে দেশের এক বৃহৎ জনমণ্ডলী—গ্রামের লোকেরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, আর শহরের লোকেরাই শিক্ষার অধিকারী হচ্ছে বেশী। এর ফলে গ্রামের যুবশক্তির একটা বড় অংশ শহরের দিকে ছুটছে শিক্ষার জন্য। ফলে শহরে যে শিক্ষার ভিড় বেশী হচ্ছে ও শিক্ষা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তাই নয়, গ্রামাঞ্চলগুলিও ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। ক্ষীণ হবার কারণ—শিক্ষা নেই। তারপর শিক্ষার জন্য গ্রামের যুবকরা অর্থাৎ গ্রামের যুবশক্তি ক্রমে ক্রমে শহরে চলে যাচ্ছে এবং শেষে সেখানেই বাস করছে। এ ছাড়া, শিক্ষার ফলে যুবশক্তি থেকে যে নেতৃত্ব বা নেতার দল গড়ে উঠতে পারে, তার সুফল গ্রামগুলি তো পাচ্ছে না। গ্রামে—যেখানে চালনাশক্তি বা নেতৃত্ব করবার মতো লোকের আরও বেশী প্রয়োজন, সেখানেই এর ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্যই বলেছি যে শিক্ষার সুযোগসুবিধার অভাবে গ্রামগুলি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, এত ক্ষীণ যে গ্রামে এখন কিছু কল্যাণমূলক ব্যবস্থা করাও কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে গ্রামীণ শিক্ষার উদ্দেশ্যের কোন পার্থক্য আছে কিনা। উদ্দেশ্যে এবং লক্ষ্যে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য যা, তা সব ব্যক্তিকে নিয়ে—শহরের কি গ্রামাঞ্চলের সেটা বড় কথা নয়। মানুষকে গড়ে তোলা, তার ব্যক্তিত্বকে স্ফুরিত করা, বিশেষ ক'রে আমাদের এই গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সচেতন থাকা—এই হ'ল শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য। সেটা শহরের লোকের জন্য যেমন ঠিক, গ্রামের লোকের পক্ষেও তেমনি সত্য। অতএব উদ্দেশ্যের কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য তবু থাকবে, সে হ'ল কিসে বেশী জোর দেব, আর কিসে নয়।

গ্রামীণ শিক্ষায় কয়েকটি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। প্রথমটি হ'ল অন্নবস্ত্র, কারণ এই অর্থনৈতিক ব্যাপারটা সর্বত্র মূল সমস্যা। দ্বিতীয় হ'ল স্বাস্থ্য—ঘরবাড়ী, পরিচ্ছন্নতা, রোগনিবারণ ইত্যাদির কথা। তৃতীয় হ'ল শিক্ষার দিক। তারপর সমাজের কথা; আর আছে সাংস্কৃতিক বিষয়। অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ রেখে শিক্ষা। গান্ধীজীর বুনিয়াদি

শিক্ষা-পরিকল্পনা এই উদ্দেশ্যই কাজ করেছে, এবং এই জীবনের সঙ্গে যোগাযোগের তাগিদেই হাতের কাজ ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছিল।

গ্রামীণ শিক্ষার কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়—বুনিয়াদি শিক্ষা। মাধ্যমিক পর্যায়ে উত্তর-বুনিয়াদি কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যসূচী। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক পর্যায়ে বুনিয়াদি শিক্ষা—একটা স্বীকৃত ব্যাপার এখন। মাধ্যমিক পর্যায়ে কিছু উত্তর-বুনিয়াদি এবং কিছু উচ্চ মাধ্যমিক থাকবে। এখন উচ্চ শিক্ষার কথা। এ সম্বন্ধে ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার চারজন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। তিন মাস পরে তাঁরা যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তার নির্দেশ অনুযায়ী এখন গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার কাজ চলেছে।

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতে এ পর্যন্ত দশটি পরিষদ (Institute for Rural Higher Education) খোলা হয়েছে। এগুলি সব আবাসিক এবং গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত মনোরম জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। ছাত্রছাত্রীদের এবং অধ্যাপকদের এখানেই বাস করতে হবে। গ্রাম-সংগঠনের ব্রতে যে সব মহৎ প্রতিষ্ঠান এ যাবৎ দেশে কাজ ক'রে আসছে, সেখানেই এগুলি স্থাপিত হচ্ছে। তা ছাড়া অন্যান্য গ্রাম-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এই সব পরিষদগুলির ঘনিষ্ঠ যোগ থাকবে, বিশেষ ক'রে সমাজ-উন্নয়ন ব্লকগুলির সঙ্গে। বাংলাদেশে শ্রীনিকেতনে এই রকম একটি পরিষদ স্থাপিত হয়েছে।

এই সব পরিষদে নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে: গ্রামীণ সেবাকার্যে একটা তিন বছরের ডিপ্লোমা, একটা এক বছরের শিক্ষণ-বিষয়ে ডিপ্লোমা এবং একটা সার্টিফিকেট্, মহিলা-স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য একটা দু বছরের সার্টিফিকেট্, আর কৃষিকার্যে দু-বছরের সার্টিফিকেট্। অবশ্য এখন যে কটা পরিষদ ভারতে স্থাপিত হয়েছে, তাতে সব কটি কোর্সে'র যে ব্যবস্থা আছে, তা নয়। সাধারণতঃ তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স রয়েছে—যাতে সমাজসেবা, কৃষিকার্য বা গ্রামীণ শিল্পবিজ্ঞানে বিশেষ পাঠ নেওয়া যায়।

সমাজসেবার ডিপ্লোমা কোর্সে'র জন্য উচ্চ মাধ্যমিক বা উত্তর বুনিয়াদি পাশ করা চাই। শুধু স্কুল ফাইনাল পাশ হ'লে তার এক বছর হাতে কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা চাই। এই সব কোর্সে'র পরীক্ষার মাপকাঠি গতানুগতিক লিখিত পরীক্ষায় ততটা বিচার্য হবে না, যতটা হবে পরিষদে থাকাকালীন তার হাতের কাজ, উৎসাহ, কর্মপ্রবণতা ইত্যাদির পরিমাপ থেকে।

কিন্তু এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত গ্রামীণ শিক্ষারও একটা ব্যবস্থা থাকা চাই। অর্থাৎ যারা গ্রামীণ এই সব পরিষদে গেল না, তাদের শিক্ষার কী ব্যবস্থা হবে? এখানে সমাজ-শিক্ষার কথা আসছে। এজন্য সমস্ত সমাজ-উন্নয়ন ব্লকগুলিতে আজ পুরুষ এবং মহিলা সমাজ-শিক্ষা-সংগঠক রয়েছেন। এঁদের কাজ হ'ল—উন্নততর জীবনের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা গ্রামের জনমণ্ডলীর মধ্যে। তার জন্য নিরক্ষরতা-দূরীকরণ, পাঠাগার-পরিচালনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, সিনেমা, শিক্ষা-শিবির প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। সমাজ-শিক্ষার মাধ্যমে যদি একটা আগ্রহ এবং সচেতনতা আনা যায়, তাহলে গ্রামীণ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক যে সব ব্যবস্থা আছে, তাতে লোকের আরও বেশী সাড়া পাওয়া সম্ভব। এ ছাড়া আছে জনতা-কলেজগুলি। এখানে গ্রামীণ নেতৃত্বের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামের জীবনে নেতৃত্বের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। গ্রামের পুনরুজ্জীবনের জন্য আদর্শবাদী এবং বৈজ্ঞানিকভাবে

শিক্ষিত নেতার দরকার। জনতা-কলেজ এবং এই সব গ্রামীণ পরিষদগুলি গ্রামের অনেক যুবক-যুবতীর মধ্যে সেই নেতৃত্বশক্তি এনে দেবে, যা গ্রামের সামগ্রিক উন্নতির জন্য বিশেষ দরকার।

গ্রামীণ শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার মান বা standard সম্বন্ধে আমাদের অবহিত থাকতে হবে। শহরাঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় আজ একটা সর্বভারতীয় মান আসছে। গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার মান ওরই মতো করতে হবে। তা না হ'লে, শহর এবং গ্রামের বৈষম্য দূর না হয়ে আগের মতোই থেকে যাবে—অর্থাৎ সব বিষয়ে গ্রামবাসীর হীনম্মন্যতা। ধনী পরিবারে এক-জন গরীব হ'লে তার যা অবস্থা হয়, দেশের সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রামীণ শিক্ষারও সেই দশা হবে। এই গ্রামীণ শিক্ষা-পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে তার মান সম্বন্ধেও যেন আমরা সচেতন থাকি।*

* রেডিওতে প্রদত্ত বক্তৃতার ভাবাবলম্বনে লিখিত।

প্রকৃতি ও মানবাত্মা

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

আদিম মানব বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে ভয় ও বিস্ময়ের বস্তুনিচয় দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত ঝড়, বাত্যা, বজ্রপাত, প্লাবন, অতিগ্রীষ্ম, অতিশীত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী প্রভৃতি ভয়ের বস্তুগুলি হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য মানব বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিবার প্রয়াস পাইল। আদিম যুগ হইতে বর্তমান সভ্যতার যুগ পর্যন্ত সে প্রয়াসের বিরাম নাই। বহিঃপ্রকৃতিতে সঙ্ঘটিত কালের দুর্বার গতি, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, নভোমণ্ডলে নক্ষত্ররাজির গতিবিধি, সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ এবং উপগ্রহগণের সঞ্চরণ, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, জলপ্রপাত, গগনস্পর্শী পর্বতমালা প্রভৃতি বিস্ময়ের বস্তুগুলির গবেষণাতে আদিম মানব নিজেকে নিযুক্ত করিল। সে গবেষণারও আজ পর্যন্ত বিরতি নাই, বরং বিজ্ঞানের আলোকপাতে বিস্ময় হইতে অধিকতর বিস্ময় মানব-মনীষাকে আপ্লুত করিতেছে।

অন্তঃপ্রকৃতি হইতে সঞ্জাত মানব-অন্তরে রাগ, দ্বেষ, কলহ, বিরহ ও বিয়োগ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির উদ্দাম গতি মানব-মনকে অবসন্ন করে। আদিম সভ্যতার যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানব উহাদের ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হইয়া শান্তির সন্ধানে ফিরিতেছে। কোন কোন মহামানব অদম্য চেষ্টায় অলৌকিক উপায়ে উহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে মানবের সহিত মানবের দ্বন্দ্ব পৃথিবীতে রক্তপাত, বিরোধ, এবং বহু অশান্তিকর ঘটনা ঘটাইয়াছে। মানব-বুদ্ধির অবিশ্রান্ত গতিতে লব্ধ মানবের উচ্ছেদ ও বিলোপ সাধন করিবার যে সব দুর্নীতি, কপটতা, ও মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা মানব-সমাজে ভয় ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমান যুগ মানব-প্রকৃতির বর্বরতায় সভ্যতার মুখে কালিমা লিপ্ত করিয়াছে।

কিন্তু এই প্রকৃতির স্বরূপ কি? মহাকবি কালিদাস তাঁহার কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান

'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্‌' নাটকে খুব অল্প বাক্যে প্রকৃতির সংজ্ঞা করিয়াছেন: 'যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা'—যিনি সৃষ্টিকর্তার আদি সৃষ্টি; 'যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্‌'—যিনি সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্তা রহিয়াছেন; 'যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি'—মনীষিগণ যাঁহাকে সকল বস্তুর উৎপত্তিস্থল বলিয়া কীর্তন করেন; 'যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ'—যাঁহা দ্বারা প্রাণিগণ প্রাণবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে; 'প্রত্যক্ষাভি⋯তনুভিঃ⋯অষ্টাভিঃ'—যিনি প্রত্যক্ষরূপে অনুভূতা ক্ষিতিময়ী, জলময়ী, অগ্নিময়ী, বায়ুময়ী, চন্দ্র-সূর্যময়ী, ও যজমানরূপা অষ্টমূর্তিতে বিরাজমানা।

এই সংজ্ঞায় কালিদাস ইহাও সংকেত করিয়াছেন যে প্রকৃতিদেবী সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরেরই বিবিধ দ্যুতিতে দ্যোতমানা, তিনি চৈতন্যরহিতা জড়প্রকৃতি নহেন।

এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য মনীষী ও কবিগণের উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য। বিশ্ববিশ্রুত জার্মান পণ্ডিত Goethe বলিয়াছেন: 'Nature is the living visible garment of God'—প্রকৃতি শ্রীভগবানের জীবন্ত দৃশ্যমান আবরণ। মার্কিন ঋষি Emerson বলেন: 'Nature is too thin a screen; the glory of One breaks in everywhere.'—প্রকৃতির অতি পাতলা পরদার ভিতর দিয়া ভগবানের মহিমা সর্বত্র বিচ্ছুরিত হইতেছে। ইংলণ্ডের ঋষি Carlyle প্রকৃতিকে এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:

'Nature is the time-vesture of God that reveals Him to the wise and hides Him from the foolish.'

—প্রকৃতিদেবী পরমেশ্বরের কাল-রূপ বস্ত্র পরিপরিধান করিয়াছেন। জ্ঞানীর কাছে তিনি তাঁহাকে প্রকটিত করেন এবং অজ্ঞের নিকট হইতে লুক্কায়িত রাখেন। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Newton কবির ভাষায় বলিয়াছেন:

'Not only the splendour of the sun, but the glimmering light of the glow-worm proclaims His glory.'

—সূর্যের সমুজ্জ্বল জ্যোতি শুধু নয়, জোনাকি পোকার অস্ফুট আলোও শ্রীভগবানেরই মহিমা প্রকাশ করে। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক Charles Kingsley বলেন: 'Study nature as the countenance of God.'—প্রকৃতিকে ভগবানের মুখমণ্ডল বলিয়া দেখ।

পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে Wordsworthই প্রকৃতির প্রশস্তিতে তাঁহার কবিতা পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি বলেন:

'...The anchor of my purest thoughts, the nurse, The guide, the guardian of my heart and soul, Of all my moral being.'

—হে প্রকৃতি! তোমার নিকট হইতে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র চিন্তা পাইয়াছি। তুমি আমাকে ধাত্রীর ন্যায় পালন করিয়াছ, জীবনপথে তুমিই পথ দেখাইয়াছ, তুমি আমার অন্তরকে চালিত করিয়াছ, তুমি আমার নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছ।

পাশ্চাত্য কবি Coleridge প্রকৃতিকে আহ্বান করিয়া গাহিয়াছেন:

'It may indeed be phantasy when I
Essay to draw from all created things
Deep, heartfelt, inward joy
that closely clings;
And trace in leaves and flowers
that round me lie
Lessons of love and earnest piety
So let it be; and if the wide world rings
In mock of this belief, it brings
Nor fear, nor grief, nor vain perplexity.
So will I build my altar in the fields,
And the blue sky my fretted dome shall be,

And the sweet fragrance
　　that the wild flower yields
Shall be the incense I will yield to thee,
The only G‚d ! and thou shalt not despise
Even me, the priest of this poor sacrifice.

—আমি যখন স্থষ্ট বস্তুনিচয় হইতে গভীর অন্তরতম আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করিবার চেষ্টা করি এবং আমার চতুর্দিকে পত্র ও পুষ্পের মধ্যে প্রেম ও আন্তরিক ধর্মের তত্ত্ব শিক্ষা করি, তখন লোকে উহা কল্পনাপ্রসূত অলীক বস্তু বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে। সমস্ত জগৎ যদি এই বিশ্বাসকে উপহাস করে, তাহাতে আমার কোন ভয়, কষ্ট বা অনর্থক মস্তিষ্ক বিকার ঘটাইবে না। আমি আমার প্রতীতি অনুসারে সুবিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে পূজার মন্দির নির্মাণ করিব। উপরে নীল আকাশ মন্দিরের সুতুঙ্গ চূড়া হইবে এবং সহজ-জাত ফুলগুলির সুগন্ধ, হে প্রকৃতি, আমি ধূপের ন্যায় তোমাকে দিব। হে আমার একমাত্র ঈশ্বরী! তুমি এই সামান্য যজ্ঞের পুরোহিত আমাকে অগ্রাহ্য করিবে না।

পাশ্চাত্য কবি Coleridge কি গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে প্রকৃতির সকল বস্তু নিরীক্ষণ করিতেন, উপরে উদ্ধৃত কবিতাটি হইতে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপূর্ব ভাষায় প্রকৃতির স্পন্দন নিজের ভিতরে এইভাবে অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন :

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রি দিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে, বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্॥
সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন॥

এই সকল উক্তিগুলির মধ্যে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে প্রকৃতি মানব-সত্তার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মানবের গঠন, পালন, ও অবশেষে পর্যবসানের ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই কি? মানব-জীবনে প্রকৃতির সহানুভূতি অপরিমেয়। মার্কিন ঋষি Emerson তাঁহার এক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন, 'Nature sympathises.' যখন মানুষ দুঃখ বিরহ এবং যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়ে তখন প্রকৃতিদেবী ধাত্রীর ন্যায় মানবের অন্তরে অশেষ শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়া থাকেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাবিরহে মুহ্যমান হইয়া লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে বনে সীতার সন্ধান করিতেছিলেন তখন বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের মুখে এই আর্তি প্রকাশ করিয়াছেন :

অপি কচ্চিত্ত্বয়া দৃষ্টা সা কদম্বপ্রিয়া প্রিয়া।
কদম্ব যদি জানীষে শংস সীতাং শুভাননাম্॥
স্নিগ্ধপল্লবসংকাশা পীতকৌষেয়বাসিনী।
শংসস্ব যদি বা দৃষ্টা বিল্ব বিল্বোপমস্তনী॥
অথবার্জুন শংস ত্বং প্রিয়াং তামর্জুনপ্রিয়াম্।
জনকস্য সুতা ভীরু যদি জীবতি বা ন বা॥

—অয়ি কদম্ব! তুমি সেই কদম্বপ্রিয়া আমার আমার প্রিয়া কোথায় আছেন, দেখিয়াছ? যদি জান, তাহা হইলে সেই শুভাননার কথা আমাকে বলিয়া দাও। অয়ি বিল্ব! সেই বিল্বসদৃশস্তনী, পল্লবতুল্য কান্তিমতী, পীতকৌষেয়-পরিধানা সীতাকে যদি দেখিয়া থাক, বল। অথবা হে অর্জুন! প্রিয়া তোমায় অতিশয় ভাল-

বাসিতেন। সেই ক্ষীণতনু জনকদুহিতা জীবিত আছেন কি না বল।

এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র ককুভবৃক্ষ, বনস্পতি, তিলকবৃক্ষ, অশোক, তাল, জম্বু, কর্ণিকার, পনস, বকুল, দাড়িম্ব প্রভৃতি বৃক্ষদিগের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শুধু বৃক্ষ নয়, হস্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তুদেরও নিকট গিয়া সীতার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

বিরহসন্তপ্তা গোপীগণ সারারাত্রি বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন :

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ ! প্লক্ষ ! ন্যগ্রোধ ! নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥
কচ্চিৎ কুরবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ ! ।
রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥
কচ্চিৎ তুলসি ! কল্যাণি ! গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ! ।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে ? জাতিযূথিকে ! ।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥

—অশ্বত্থ ! হে প্লক্ষ ! হে বট ! নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমহাস্যবিকসিত অবলোকনের দ্বারা আমাদের মন অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন; তোমরা মহান্, তোমাদের কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভের সম্ভাবনা আছে, তাঁহাকে তোমরা দেখিয়াছ কি? হে কুরবক! হে অশোক, হে নাগ! হে পুন্নাগ! হে চম্পক! তোমরা পুষ্পাদির দ্বারা পরোপকার করিয়া থাক, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব; যাঁহার হাস্য মানিনীগণের মান দূর করে, সেই বলরামের কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছেন কি?

—হে তুলসি! হে ভাগ্যবতি! শ্রীকৃষ্ণের চরণ তোমার প্রিয়; অলিকুলের সহিত তিনি তোমাকে ধারণ করিয়া থাকেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করা তোমার পক্ষে সম্ভব; তোমার অতি প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে তুমি দেখিয়াছ কি? হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতিকে! হে যূথিকে! করস্পর্শের দ্বারা তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গমন করিতে দেখিয়াছ কি?

কালিদাস তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে শকুন্তলার পতিগৃহে গমনকালে বীতরাগ কণ্বমুনির মুখে বলিতেছেন :

ভো ভোঃ সন্নিহিতবনদেবতাস্তপোবনতরবঃ।
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা,
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ,
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥

—হে বনদেবতাগণ ও আশ্রমস্থিত বৃক্ষসকল, তোমাদিগের সলিলসেক না করিয়া যে শকুন্তলা অগ্রে জলপান করিতে অভিলাষ করিত না, অলঙ্কার ভালবাসিলেও স্নেহবশে যে শকুন্তলা তোমাদের একটিমাত্র পল্লব ছেদন করিত না এবং তোমাদের কুসুম ফুটিলে যাহার আনন্দোৎসব হইত, সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে গমন করিতেছে; তোমরা এ বিষয়ে সকলে অনুমতি দাও।

দুঃখের ও সুখের সময় প্রকৃতিদেবী তাঁহার সন্তানগণকে শান্ত ও নন্দিত করেন। ইহা সাধারণ লোকের হৃদয়গম্য না হইলেও তীক্ষ্ণমেধা ও হৃদয়বান্ ব্যক্তিদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাই পাশ্চাত্য কবি Wordsworth বলিয়াছেন :

Nature never did betray
The heart that loved her.

—প্রকৃতিকে যিনি ভালবাসিয়াছেন, প্রকৃতি তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করেন নাই।

সমালোচনা

মহান ভারত (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব)। লেখক : শ্রীভিক্ষু; প্রকাশক : শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, ভারতী-প্রকাশ, ৩০ আশুতোষ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা—৩১; পৃষ্ঠা : প্রথম পর্ব—২৮৪+২৪, দ্বিতীয় পর্ব—৩২৯+১৭; মূল্য : প্রতি পর্ব ৭·৫০ টাকা।

"যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে—যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতভূমি!" ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু বলিতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তিটি স্বতই আমাদের মনে ভাসিয়া উঠে।

শত সহস্র যুগ ধরিয়া নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া সংগ্রথিত এই ভারত-ইতিহাস। ইহাকে জানিতে গেলে অবশ্যই কিছু পশ্চাতে তাকাইবার প্রয়োজন আছে। কোন দেশকে জানা মানে, শুধুমাত্র উহার ইতিহাস-ভূগোল, দর্শন-সাহিত্য, বিজ্ঞান-বাণিজ্য বা রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি জানাই নহে—উহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে খুঁজিয়া পাওয়া। ভারতবর্ষেরও সঠিক পরিচয় পাইতে হইলে তাহার চিন্তাধারা ও জীবনধারার গতিপথ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হওয়া দরকার। এই জীবনাদর্শের সন্ধান-প্রসঙ্গেই মিলিবে ভারত-ভারতীর যথার্থ স্বরূপ।

সত্য-শিব-সুন্দর—ইহাই ভারতীয় সমাজের আদর্শ-মন্ত্র। ভূমিতে অবস্থান করিয়াও ভূমাকেই শিরোধার্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করা—ভারতের সনাতন জীবন-ব্রত। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় এই জগৎকে ভারত অবহেলা করে নাই; বরং এই জগতের সকল স্তরেই—রাষ্ট্রে, সমাজে, শিল্পে, কাব্যে, সঙ্গীতে, শিক্ষায় ও সম্পদে—আবার উৎসবে-পার্বণে, বিবাহে-বিরহে, জন্মে-মৃত্যুতে, সকল অবস্থাতেই এক সর্ব-মহত্তম চেতন বস্তুর অভিব্যক্তি আবিষ্কার করিতে সে প্রয়াসী হইয়াছে।

কিন্তু কালদোষে বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে আধুনিক ভারত-সন্তান তাহার আত্মপরিচয় ভুলিতে বসিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রাদি পড়িবার মত অবসর, সামর্থ্য ও সুযোগ আজকালকার মানুষের নাই। গ্রন্থাদির দুষ্প্রাপ্যতা, সংস্কৃত শিক্ষার বিলোপ এবং সর্বোপরি দুর্বহ অন্নচিন্তা আমাদের যে-কোন প্রকার বলিষ্ঠ চিন্তার প্রতিকূল। অথচ এই বাহির-সর্বস্বতার যুগে আমাদের জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষাকে পুনরায় ভারত-মুখী করিতে না পারিলে সামাজিক বিপর্যয় অনিবার্য।

এ-হেন পরিস্থিতিতে বেদ-উপনিষদ্ ও স্মৃতি-পুরাণাদি হইতে ভারত-ঐতিহ্যের দ্যোতক ছোট-বড় বিভিন্ন অংশকে সাধারণের বোধ্য সহজ সরল ভাষায় যুগোপযোগী করিয়া জনসমাজে উপস্থাপনের অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। বাংলা ভাষায় এইরূপ একটি সংগ্রন্থনের অভাব ছিল।

শ্রীইন্দুমাধব ভট্টাচার্য (শ্রীভিক্ষু) প্রণীত আলোচ্য 'মহান ভারত' গ্রন্থদ্বয় এ-অভাব মোচনে অনেকখানি সহায়তা করিবে। সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের বর্তমান প্রয়াস সত্যই অভিনন্দনযোগ্য। প্রাচীন ভারতের এমন সুরুচিপূর্ণ একখানি আলেখ্য প্রস্তুতির জন্য লেখককে যে অপরিসীম

ধৈর্য ও শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে—তাহার নিদর্শন গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় মিলিবে। প্রথম পর্বে তিনি ভারতের অধ্যাত্ম-চিন্তার ক্রমবিকাশ, বৈদিক ও ঔপনিষদিক তত্ত্ব এবং পৌরাণিক ঐতিহ্যের নানা খুঁটিনাটি তথ্যকে অতি নিপুণ-ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, প্রয়োজনবোধে নূতনতর ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। আর দ্বিতীয় পর্বে চিত্রিত হইয়াছে সনাতন ভারতীয় সাধনার মর্মকথা—শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, কর্মকাণ্ডের নানা শাখা ও মত; আখ্যায়িত হইয়াছে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের বহু বিচিত্র গতি। ভারতের দর্শন, শিল্প, কাব্য, সঙ্গীত, আনন্দ-উৎসব, শাসন-পদ্ধতি, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদি কোন দিকই বর্ণনাপ্রসঙ্গে উপেক্ষিত হয় নাই।

গ্রন্থের ভাষা সরল সুন্দর, প্রকাশভঙ্গীও প্রাণস্পর্শী। পুস্তকে কয়েকটি বৈদিক মন্ত্র ও শান্তিপাঠ সন্নিবেশিত হইয়াছে। মন্ত্রগুলি সুনির্বাচিত ও উহার কাব্যানুবাদও ভাবানুগ। উভয় পর্বেই সংযোজিত বিস্তৃত বিষয়-সূচী পাঠকের খুবই সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই। ছাপা ও কাগজ ভাল এবং প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়। প্রুফ সংশোধনে আরও কিঞ্চিৎ সতর্ক হইলে ভাল হইত। আমরা এই গ্রন্থের উভয় পর্বেরই বহুল প্রচার কামনা করি। —**অজজানন্দ**।

বনের ডাক: স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীঅরুণকুমার দে—৬৫।১।১, মানিক-তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পরিবেশক: এম-সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড—১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, পৃঃ ২২৪, মূল্য পাঁচ টাকা।

'বনের ডাক' বইটির প্রচ্ছদপট ও নামটির মধ্যে বিজ্ঞানের চেয়ে কাব্যই এসে আগে ধরা দেয়। তার জন্য দুঃখ নেই, কারণ এটি উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের একটি 'পাঠ্যপুস্তক'ও নয়। এক মাসের মধ্যেই এই সুলিখিত বইখানি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সমালোচকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রথম দিকেই বনভোজনের মাধ্যমে নিপুণ শিল্পী লেখক যে পটভূমিকা প্রস্তুত করেছেন—তাতেই তাঁর উদ্দেশ্য নিশ্চয়-সফলতার দিকে পা বাড়িয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মনের একটি প্রীতির সংযোগ-সূত্র বাঁধা হয়েছে, যার সাহায্যে তাদের মনে জাগবে জ্ঞানের তৃষ্ণার সঙ্গে সৃজন-প্রবণতা ও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা। নিরক্ষর চাষীরাও পাবে এর থেকে তাদের প্রাঙ্গণে নানা গাছপালা লাগাবার প্রেরণা। বৃক্ষজগৎ নিয়ে অবসর-বিনোদনেরও অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যাবে এই অভিনব পুস্তকটি থেকে। আবালবৃদ্ধবনিতার উপযোগী হলেও বিশেষ ক'রে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-দের খুবই কাজে লাগবে বইখানি।

শিশুর স্বভাব খেলা ও অনুকরণ করা, তারই মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে সে কেমন ক'রে জ্ঞানের পথে এগিয়ে যেতে পারে—তার অনেক নিদর্শন বইখানিতে পাওয়া যাবে। তাই এই বইখানি প্রথমে শিশুকে বা শিক্ষার্থীকেই পড়তে হবে না, পড়তে হবে তাদের শিক্ষককে। আর শিক্ষার্থী এই বই-এর অন্তর্গত হাতের কাজগুলি ক'রে মিলিয়ে নেবে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবকে! তাতেই সে পাবে আত্মপ্রসাদ, অনুভব করবে আত্মশক্তি।

এই জাতীয় পুস্তক—যাতে রয়েছে জীবনের যোগ এবং বিবিধ হাতের কাজের সঙ্গে বিচিত্র জ্ঞানের সমন্বয়—শিক্ষার্থীর মনে শুধু আনন্দই দেবে না, শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে পারবে, তাদের মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা ক'রে এবং সৃজন-ও পালনশীল দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ক'রে।

জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষকসমাজ ও শিক্ষা-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই সত্যিকারের নতুন বইটির প্রতি।

পরলোকে ভক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৮ই মে শুক্রবার সন্ধ্যা ৫-৫৭ মিঃ সময়ে ৬৮ বৎসর বয়সে পরম ভক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ শিবপুরে তাঁহার বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি ডায়াবিটিস রোগে ভুগিতেছিলেন। গত ২১শে ফেব্রুআরি হইতে তিনি মস্তিষ্কের ব্যাধিতে (থ্রম্বোসিসে) শয্যাগত ছিলেন। শেষ কয়দিন তাঁহাকে চরণামৃত ছাড়া অন্য কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করানো যায় নাই।

১৮৯২ খৃঃ এক দরিদ্র পরিবারে ননীভূষণ সিংহের পুত্ররূপে তিনি মাতুলালয় হরিপালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পূর্বপুরুষ তারকেশ্বরের নিকট নালিকুল হইতে শিবপুরে আসিয়া বসবাস করেন। ৮ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর মাতা ও ভগিনীর ভরণপোষণের জন্য কিরণচন্দ্রকে ১৫ বৎসর বয়সেই চাকরি গ্রহণ করিতে হয়। বহুকাল পূর্বে শিবপুরেই তিনি পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দের সঙ্গলাভ করেন। ইহার কিছুদিন পর তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ দর্শন করেন। ১৯৪০ খৃঃ কালিম্পঙে স্বামী বিরজানন্দের নিকট তিনি দীক্ষালাভ করেন, এ বিষয়ে তাঁহার ধর্মপ্রাণা সহধর্মিণীর আগ্রহও কম ছিল না। তিনি পূর্বেই স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের কৃপালাভ করিয়াছিলেন।

১৯১৮ খৃঃ হইতে চাকরির সঙ্গে সঙ্গে কিরণচন্দ্র ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে মোটরের তেল বিক্রয় হইতে শুরু করিয়া মোটরের সাজসরঞ্জামের বিরাট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন তাঁহার ঐহিক জীবনের স্মরণীয় কীর্তি।

জীবন-সায়াহ্নে তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুরে গিয়া বাস করিবার বাসনা হয়; এতদুদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বসতবাটীর সংলগ্ন এক টুকরা জমি কিনিয়া চালা ঘর করিয়া মাঝে মাঝে তিনি সেখানে বাস করিতে যাইতেন। ক্রমশঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মস্থানে মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথা উঠিলে তিনি সানন্দে অর্থাদি সাহায্যে অগ্রসর হন। ইষ্টদেবতার প্রস্তর-নির্মিত মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন হইতে মন্দিরে মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া নানা বিষয়ে তিনি সাহায্য করিতেন। পরে নাটমন্দির নির্মাণেও তাঁহার সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নব্য বঙ্গে 'বাউলের দল' প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার প্রচার তাঁহার আর এক বিশেষত্ব; কীর্তন করিয়া তিনি কামারপুকুর পরিক্রমা করিতে ভাল-বাসিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মভূমির উপর তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। কেহ চারিধামে তীর্থভ্রমণের কথা তুলিলে তিনি বলিতেনঃ 'কামারপুকুর, জয়রামবাটী, দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুর—এই আমার চার ধাম।' বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতেও তিনি প্রায়ই আসিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উপর তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত।

শিবপুরে শ্রীশ্রীমায়ের নামে ঘাট, সাধারণের জন্য পাঠাগার, দরিদ্র-ভাণ্ডার প্রভৃতি স্থাপন তাঁহাকে শিবপুরে সকলের প্রিয় করিয়াছিল। বহু প্রতিষ্ঠান পরিবারকে গুপ্তভাবে তিনি কত যে দান করিতেন, তাহার কোন হিসাব নাই। এই মহানুভব ভক্ত ইষ্টচরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, এখনও তাঁহার ৮৭ বৎসরবয়স্কা জননী জীবিতা আছেন। এই অসহনীয় শোকে ভগবান এই বৃদ্ধা জননীকে, তাঁহার ধর্মনিষ্ঠ সহধর্মিণীকে ও শোক সন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা দিন। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

রহড়াঃ রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে কীর্তন, ধর্মসভা, কথকতা, রামায়ণ-গান, যাত্রাভিনয় ও বিভিন্ন প্রকার লোকসঙ্গীতের আয়োজন হয়। নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, কারিগরী বিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয়, মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় ও বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষার্থিবৃন্দের চিত্রশিল্প এবং বিভিন্ন প্রকার হস্তশিল্পের এক শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নানারূপ কুটীর-শিল্পেরও এক প্রদর্শনী খোলা হয়। লক্ষাধিক লোক এই প্রদর্শনী অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দর্শন করে।

১৮ই মার্চ প্রাতে মঙ্গলারতি, উপনিষদ্ ও গীতা পাঠের ভাবগম্ভীর পরিবেশে উৎসব আরম্ভ হয়। সকালে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। সন্ধ্যায় এক মহতী ধর্মসভায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী পর্যালোচনা করেন। রাত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার সৌজন্যে 'রেজা' গান হয়।

১৯শে প্রাতে প্রভুপাদ দ্বিজপদ গোস্বামী ভাগবত পাঠ করেন। সন্ধ্যায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ দাসের সভাপতিত্বে এক ছাত্রসভায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত' সম্পর্কে বক্তৃতা করে। সভাপতি মহাশয়ের ভাষণের পর আশ্রম-বালকগণ 'রাখালরাজা' কীর্তনাভিনয় করে।

২০শে প্রাতে শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'শিবায়ন' কীর্তন হয়। অপরাহ্ণে 'মণি-মেলা'-পরিচালক 'মৌমাছি'র সভাপতিত্বে শিশু-সম্মেলন হয়। সন্ধ্যায় এক বিচিত্রানুষ্ঠানে বিখ্যাত শিল্পিগণ সকলকে আনন্দ দেন।

২১শে প্রাতে মিশনের ক্রীড়াঙ্গনে আঞ্চলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ক্রীড়া-প্রতি-যোগিতা এবং দ্বিপ্রহরে নারায়ণসেবা হয়। অপরাহ্ণে এক ধর্মসভায় ডক্টর রমা চৌধুরী শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-দর্শন আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় আশ্রম-বালকগণ কর্তৃক 'মুক্তিযজ্ঞ' নাটক অভিনীত হয়।

২২শে প্রাতে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী রামায়ণ গান করিয়া ভক্তগণের মনোরঞ্জন করেন। বেলা ১০ ঘটিকায় কলিকাতার 'সুহৃদ্ ক্লাব' কর্তৃক 'কালীকীর্তন' হয়। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় শ্রীতামসরঞ্জন রায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন' আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় বিখ্যাত যাত্রাপার্টি 'আর্য অপেরা' কর্তৃক 'রামপ্রসাদ' নাটক অভিনীত হয়।

২৩শে প্রাতে আশ্রম-কর্মিবৃন্দের এক সম্মেলন হয়। সন্ধ্যায় ব্যায়ামবীর বিষ্ণু ঘোষের ছাত্রবৃন্দ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের বিভিন্ন প্রকার জিম্‌নাষ্টিক্ ও পেশীসঞ্চালন বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। রাত্রে 'ছায়াবাণী'র সৌজন্যে 'কাবুলিওয়ালা' চিত্র প্রদর্শিত হয়।

২৪শে প্রাতে মহাসমারোহে দোল-উৎসব উদ্‌যাপিত হয় এবং বালকগণ নগর-সঙ্কীর্তনে যোগদান করে। অপরাহ্ণে প্রদর্শনীতে অংশ-গ্রহণকারী শিল্পিবৃন্দকে 'প্রশস্তিকা' প্রদান করা হয়। সন্ধ্যায় সিঁথি অমৃত-সঙ্ঘ 'মহিষাসুর' যাত্রাভিনয় করেন। সপ্তাহব্যাপী উৎসবে এদিকে জনসাধারণের মধ্যে বিরাট আনন্দ ও উৎসাহের সাড়া পড়িয়া যায়।

আসানসোল : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৫শে হইতে ৩০শে মার্চ বিভিন্ন কার্যসূচীর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও স্বামীজীর স্মরণোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

এই উপলক্ষে প্রথম দুইদিন সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার বিখ্যাত রামায়ণগায়ক শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণ গান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। ২৭শে মার্চ উৎসবের প্রথম দিন প্রভাতে মঙ্গলারতির দ্বারা উৎসবের সূচনা হয়। সকাল সাড়ে ছয়টায় বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ও ভক্তমণ্ডলীর এক মিলিত শোভাযাত্রা ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ শহর পরিক্রমা করে। মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালে এক মহতী সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোচনা করেন স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন দে, হিন্দী-বক্তা শ্রীশিববালক রায় এবং স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী সভার কার্য পরিচালনা করেন। পরদিবস শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পূত চরিতকথা আলোচনা-সভায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপিকা ডক্টর সতী ঘোষ। শ্রীশিববালক রায়, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। সভার শেষে হাওড়া 'মায়ের মন্দিরে'র সভ্যবৃন্দ 'রামপ্রসাদ' লীলাকীর্তন পরিবেশন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে আনন্দ দান করেন।

উৎসবের তৃতীয় দিবস সকালে পূর্বোল্লিখিত সম্প্রদায় কর্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণ' লীলাকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় ৪৫০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালে এক জনসমাবেশে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর আলোচনা করেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও স্বামী পাবনানন্দ। সভার কার্য পরিচালনা করেন পূর্ব রেলপথের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীকৃপাল সিং।

শেষ দিনে ৩০শে মার্চ সোমবার সন্ধ্যায় আশ্রম-বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন জেলাশাসক শ্রীসুহাসরঞ্জন দাস মহাশয়। স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও সভাপতি মহাশয় 'ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' সম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। পুরস্কার-বিতরণের পরে আনন্দোৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

মনসা দ্বীপ (২৪ পরগনা) : গত ২৭শে মার্চ শুক্রবার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, পাঠ, শোভাযাত্রা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় রুদ্রনগর দেবেন্দ্র বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীত্রিলোকেশ মিশ্র এবং আশ্রমস্থ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুধীরকুমার মাইতি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিলে পর সভাপতি স্বামী জীবানন্দ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ কিভাবে গ্রহণ করা যায় তদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

প্রায় ১৫০০ পল্লীবাসী পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া রাত্রে প্রাক্তন ছাত্রগণ কর্তৃক অভিনীত 'বাঙালীর দাবি' যাত্রাভিনয় দর্শন করে।

তমলুক : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিগত ১০ই এপ্রিল শুক্রবার হইতে ১২ই এপ্রিল রবিবার পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠান সহায়ে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উৎসবে ঊষাকীর্তন, শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীশ্রীচণ্ডীর ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির কথকতা করেন। তিন দিনে তিন হাজার নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উৎসবের প্রথম দিনের সভায় স্বামী মিত্রা-

নন্দের বক্তৃতার পর সভাপতি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিন মহকুমা-শাসক শ্রীএস্. কে. চৌধুরী সভায় পৌরোহিত্য করেন। এই দিন স্বামী পূর্ণানন্দের বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দ উভয়দিনই সরল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর তাৎপর্য বুঝাইয়া দেন।

উৎসবের শেষ দিন ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; তিনি শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে সহজ সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ দেন। সন্ধ্যারতির পর আশ্রম সন্নিকটে জেলা গ্রন্থাগার-প্রাঙ্গণে তাঁহার রচিত 'শক্তি-সারদম্' সংস্কৃত নাটকটি ডক্টর রমা চৌধুরীর প্রযোজনায় প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদস্য-সদস্যাগণ কর্তৃক অভিনীত হয়।

টাকী : গত ২২শে হইতে ২৪শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব হয়।

প্রথম দিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পন্ন হয়। প্রায় ছয় সহস্রাধিক ভক্ত প্রসাদ পান। বৈকালে শ্রীঅচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ভগবানের সহিত ভালবাসার মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করাই তাঁহার আরাধনার সহজ এবং সরল পন্থা। সন্ধ্যায় কলিকাতার শিকদার বাগান সঙ্গীত-সমাজ কর্তৃক 'নদীয়া-লীলা' অভিনীত হয়। প্রায় দশ সহস্র নরনারী প্রেম-ভক্তিমূলক লীলাভিনয়-মাধুর্য আস্বাদন করেন।

দ্বিতীয় দিন প্রাতে 'কথামৃত' পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়। অপরাহ্ণে শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভজন গান করেন। রাত্রে শ্রীশিবরাম মুখোপাধ্যায় 'দক্ষযজ্ঞ' পালা কথকতা করেন।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় স্বামী মহানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বাণী আলোচনা করেন। তারপর পূর্ব দিনের মত 'কথকতা' হয়। রাত্রে আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ 'কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ' নাটিকা অভিনয় করে।

কিষেণপুর (দেরাদুন) : গত ১১ই মার্চ শহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে আশ্রমে বিশেষ পূজা ভোগারতি হোম সহ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি পরিপালিত হয়, বৈকালে প্রায় ৬০০ ভক্ত প্রসাদ পান। এতদুপলক্ষে ২৭শে মার্চ শহরে টাউন-হলে এক জনসভায় দিল্লী রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এক উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দেন; তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল: ধর্ম মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে বিকশিত করে।

সারগাছি (মুর্শিদাবাদ) : গত ২রা বৈশাখ অন্নপূর্ণাপূজা-দিবসে পূজাহোমাদি সহায়ে রাম-কৃষ্ণ মিশনের প্রকাশ্য সেবাব্রতানুষ্ঠানের ও আশ্রমস্থ মন্দির-প্রতিষ্ঠার শুভতিথি-স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় ৫০০ স্থানীয় জনসাধারণ ও শতাধিক শহরাগত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে একটি সভায় মালদহ আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দ ও শ্রীসত্যেন্দ্র শর্মারায় স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনকথা ও সেবাব্রতের বাণী আলোচনা করেন।

ইহার পরদিন হইতে বহরমপুরে উৎসব শুরু হয়। কথা, কীর্তন, জনসভা, ছায়াচিত্র প্রভৃতি ইহার অঙ্গ ছিল। শনিবার বিশেষ-ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন এবং রবিবার স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। স্বামী পরশিবানন্দ সভাপতিরূপে যুবকদের স্বামীজীর ভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান করেন। শ্রীশশাঙ্ক-শেখর সান্ন্যাল, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

পূর্ব পাকিস্তান

ঢাকা: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২৭শে ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিপূজা, ভজন ও ঠাকুর-স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা এবং সান্ধ্য আরাত্রিকের পর পালা-কীর্তন হয়। ২৮শে ফাল্গুন মধ্যাহ্ন হইতে রামায়ণ-গান ও সান্ধ্য আরাত্রিকের পর 'রামরসায়ন' কীর্তন হয়। ২৯শে ফাল্গুনও 'রাম-রসায়ন' কীর্তন হয়। মধ্যাহ্ন হইতে দরিদ্রনারায়ণ সেবায় ৫০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৩০শে ফাল্গুন অপরাহ্ণে ছাত্রসভায় আলোচ্য বিষয় ছিল: মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ। সভাপতি—শ্রীবসন্তকুমার দাস (এডভোকেট, ঢাকা হাইকোর্ট), বক্তা—অধ্যাপক ব্রজেন্দ্র-কুমার দেবনাথ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ।

১লা চৈত্র অপরাহ্ণে সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল: বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। সভাপতি ডাক্তার শৈলেন্দ্রকুমার সেন ও প্রধান অতিথি—মাননীয় বিচারপতি জনাব হামিদুর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ডক্টর গোবিন্দ-চন্দ্র দেব মিশনের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। তিনি বলেন, সেবাধর্ম ও মনুষ্যত্ববোধ জাগাইয়া তোলার উপর মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব মিশন বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাদান ও সেবাকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাক-ভারতে ও পাশ্চাত্য দেশের নানাস্থানে মিশনের বিবিধ কর্মধারার কথা অবগত হইয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়-মূলক ধর্মীয় আদর্শের সারগর্ভ আলোচনা করেন। অধ্যাপক মোজাহারউদ্দিন আহ্‌মদ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া বলেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে ধর্মকে দেখিতে পারিলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

নারায়ণগঞ্জ: গত ৪ঠা চৈত্র হইতে ৮ই চৈত্র রবিবার পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমা-রোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিক, ভজন, বিশেষপূজা, হোম এবং শাস্ত্রাদি পাঠ হয়। প্রথম দুই দিন অপরাহ্ণে কুমিল্লা রামমালা ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ রাসমোহন চক্রবর্তী সুললিত ভাষায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করেন। ৪ঠা, ৬ই ও ৭ই চৈত্র সন্ধ্যারাত্রিকের পর স্বামী শর্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে যথাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনালোচনা করেন। প্রথম চার দিন রাত্রে শ্রীদিবাকর চক্রবর্তী রামায়ণ গান করেন।

৫ই চৈত্র কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সহাধ্যক্ষ শ্রীজ্যোৎস্নাময় বসু সভাপতিত্ব করেন। ৬ই চৈত্র বৈকালে অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহের পৌরোহিত্যে এক ধর্মসভায় ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী পঠিত হইলে পর সভাপতি সাহেব 'ইস্‌লাম ধর্ম', শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী 'খৃষ্টধর্ম', শ্রীমদ্ প্রিয়ানন্দ ভিক্ষু মহাশয় 'বৌদ্ধধর্ম' ও পণ্ডিত রাসমোহন চক্রবর্তী 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনালোকে হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় প্রায় চারি সহস্র শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

৭ই চৈত্র মহিলা-সভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী সুন্দরভাবে আলোচিত হয়।

ফরিদপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ১১ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি স্বচারুরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐ দিন বিশেষ পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ হয়। সন্ধ্যারতির পর শ্রীহরবিলাস সাহা স্বরচিত শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসঙ্গীত এবং শ্রীঅমূল্য চক্রবর্তী, শ্রীসুধাময় ঘোষ প্রভৃতি ভজন গান করেন।

১৩ই মার্চ আশ্রমে দশ সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। উক্ত দিবস যথারীতি শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতি, পূজা ও হোমাদি করা হয় এবং বেলা তিন ঘটিকা হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্যন্ত স্থানীয় ও দূরাগত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করে।

বক্তৃতা সফর

আসামের ভক্তগণ কর্তৃক আহূত হইয়া গত এপ্রিল মাসে স্বামী মহানন্দ আসামের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজী ও বাংলায় বক্তৃতা দেন। নিম্নে স্থান, কাল ও বিষয় লিপিবদ্ধ হইল। অধিকাংশ বক্তৃতার বিষয় শ্রোতাদের নির্ণীত, বক্তৃতার শেষে বক্তা প্রশ্নাদির উত্তর দেন।

ডিগবয় ১৭ই এ.ও.সি.ক্লাব—কেমন ক'রে জীবনযাপন করব?
ঐ ১৮ই রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হলে—
শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী ও বর্তমান জীবন
ঐ ১৯শে ঐ আলোচনা
ঐ ঐ হাইস্কুল হলে—শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সভায়
দুষ্টু ছেলেদের কি ক'রে সামলানো যায়?
ঐ ২০শে ঐ ছাত্রদের সভায়—'মানুষ হও'
ঐ ঐ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হলে মহিলা-সভায়—
ভারতের নবজাগরণে নারীর কর্তব্য
তিনসুকিয়া ২১শে এ. ও. সি. হলে—
হিন্দুধর্ম ও বর্তমান পৃথিবী
নাহারকাটিয়া ২২শে অসমীয়া হলে—শিক্ষা ও ধর্ম
ঐ ঐ হাইস্কুল হলে (সর্বসাধারণের সভায়)
শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম
মারগারিটা ২৩শে পাবলিক হলে—ধর্মে সমাজবাদ
ডিব্রুগড় ২৪শে পাবলিক হলে—বর্তমান পৃথিবীতে বেদান্ত
ঐ ২৫শে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে—ব্যক্তিগত ও সমাজগত
জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর প্রয়োজনীয়তা
ঐ ২৬শে ঐ —শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের সার্থকতা।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে মতিলাল রায়

প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মতিলাল রায় চন্দননগরস্থিত প্রবর্তক আশ্রমে গত ১০ই এপ্রিল বেলা ৯-৪০ মিঃ ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। সায়াহ্নে সেখানেই তাঁহার নশ্বর দেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

১৮৮২ খৃঃ চন্দননগরে বিহারীলাল রায়ের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে মতিলাল রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ 'চৌহান'-বংশীয় রাজপুত। বাল্যকালেই মতিলালের মধ্যে ধর্মানুরাগের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পাঠানুরাগ ও সাহিত্যানুশীলন ছিল অসাধারণ।

স্বদেশী-আন্দোলনে শ্রীযুত রায় তাঁহার সকল শক্তি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়েন। ১৯১০ খৃঃ শ্রীঅরবিন্দ বৃটিশ রাজ্য হইতে আত্মগোপনপূর্বক তদানীন্তন ফরাসী রাজ্য চন্দননগরে আসিলে মতিলাল রায় স্বগৃহে তাঁহার প্রায় একমাসকাল অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মতিলাল রায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন-বাণী লইয়া কয়েকটি নাটক ও পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ: আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী, স্বদেশীযুগের স্মৃতি, কানাইলাল, বেদান্তদর্শন, শ্রীরামকৃষ্ণের দাম্পত্য জীবন, যুগাচার্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ, যৌগিক সাধন, মুক্তিমন্ত্র, শক্তিপূজা, নারীমঙ্গল, কর্মের ধারা, শতবর্ষের বাংলা।

উৎসব-সংবাদ

চেতলা (কলিকাতা) ঃ গত ২৭শে মার্চ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব চারিদিবসব্যাপী পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন, কথকতা, পাঁচালি, ধর্মসভা ও প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাতাঠাকুরাণীর দিব্যজীবন-কাহিনী ও উপদেশাবলী আলোচনা করেন। স্বামী ব্রহ্মেশ্বরানন্দ উৎসবের প্রয়োজনীয়তা বর্ণন প্রসঙ্গে বলেন, ভগবৎপ্রসঙ্গ-শ্রবণ অজ্ঞাতসারে শুভ সংস্কার গঠন করে ও মানুষকে ক্রমোন্নত জীবনের অধিকারী করে। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যায় অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতার-বরিষ্ঠত্ব ও বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার প্রভাব সম্বন্ধে বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্র ঃ গত ২৮শে মার্চ শনিবার শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্র প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব-উৎসব মঙ্গলারতি, পূজা, হোম, ভোগরাগ, ভজন, কীর্তন, গীতা, 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃত' পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে কলিকাতা পি, ৭৩এ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে সম্পন্ন হইয়াছে। স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী সুশান্তানন্দ ও শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

দক্ষিণেশ্বরে স্বামী যোগানন্দ উৎসব ঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ ও ঈশ্বরকোটী শ্রীমৎ যোগানন্দ মহারাজের শুভ-আবির্ভাব উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার পূত জন্মস্থানে যোগানন্দ উৎসব-সমিতি কর্তৃক ষষ্ঠ বাৎসরিক উৎসব গত ২৮শে ও ২৯শে মার্চ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি, চণ্ডীপাঠ, সংকীর্তনসহ তীর্থ-পরিক্রমা, লীলা-কীর্তন, ভজন, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী যোগানন্দজীর অলৌকিক জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

নূতন পুকুর (২৪ পরগনা): শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৫ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব শান্ত পরিবেশে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ও ভজনাদি সহ আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসব শুরু হয়। পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও চারিগ্রাম আশ্রমের রামকৃষ্ণ-কীর্তনে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে। মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী পরম তৃপ্তি সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন, অপরাহ্ণে ভক্তি-রসাত্মক সঙ্গীতের পর বারাসত মহকুমা-সেবক (S.D.O) শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এক ধর্ম-সভায় স্বামী জীবানন্দ, স্বামী আপ্তানন্দ এবং সভাপতি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

হুগলী-বাবুগঞ্জ ঃ পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি-পূজা ও তৎসহ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব বাবুগঞ্জে রথতলায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ পার্কে' হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ২৭শে ফাল্গুন হইতে পাঁচদিনব্যাপী পূজা, হোম, গীতা-চণ্ডী-ভাগবত-উপনিষদ্ পাঠ, আলোকচিত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা প্রদর্শন, আরতি ও ভজন হয়। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে ধর্মসভায় স্বামী পূর্ণানন্দ 'জগতে স্বামীজীর দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

আরারিয়া (পূর্ণিয়া) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২৭শে ফাল্গুন এবং ৬ই হইতে ৮ই

চৈত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজা, পাঠ, ভজন, অষ্টপ্রহরব্যাপী নামসংকীর্তন, ভজন, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, নরনারায়ণ-সেবা ও ধর্মসভা উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামী পরশিবানন্দ (সভাপতি) ও স্বামী অনুপমানন্দ বাংলা ভাষায় এবং স্থানীয় উকিল শ্রীহরিলাল ঝা হিন্দীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী আলোচনা করেন।

পিপড়াড়ি কোলিয়ারি : রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব গত ২৭শে ফাল্গুন বুধবার পিপড়াড়ি কোলিয়ারিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূজা, কালী-কীর্তন ও শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠে সমবেত জনগণ নির্মল আনন্দ লাভ করেন। ডাঃ ধনঞ্জয় দে বাংলা ভাষায় ঠাকুরের উপদেশ পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

ঢাকুরিয়া (কলিকাতা-৩১) : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৮শে ও ২৯শে চৈত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের সভায় যথাক্রমে শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও স্বামী গম্ভীরানন্দ সভাপতিত্ব করেন। দ্বিতীয় দিন স্বামী দেবানন্দ 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সিন্দ্রি (বিহার) : গত ৪ঠা হইতে ৬ই এপ্রিল ৩ দিন ধরিয়া সহরপুরা রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব ঊষাকীর্তন, পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় স্বামী মহানন্দ ইংরেজীতে ও বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন; ছায়াচিত্রে 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রদর্শিত হয়।

জয়নগর-মজিলপুর (২৪ পরগনা) : এই বৎসরও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত কবিগান ও পাঁচালি গান উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ভবানন্দ। আলোকচিত্রে 'যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ' পরিবেশিত হয়।

নাটশাল (মেদিনীপুর) : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৮ই চৈত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ ভক্তমণ্ডলী ও জনসাধারণ এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করেন। তারপর পূজা, হোম, পাঠ, ভজন ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অচিন্ত্যানন্দ।

সংস্কৃত-নাট্যাভিনয়

সংস্কৃত প্রচারের দিক হইতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ১৯৪৩ খৃঃ হইতে কলিকাতাস্থ গবেষণা-মন্দির 'প্রাচ্যবাণী' এই বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থাবলম্বন করিয়াছেন।

বিগত এপ্রিল মাসে প্রাচ্যবাণীর সদস্য ও সদস্যাগণ কয়েকটি বিশেষ অনুষ্ঠানে নিম্নোল্লিখিত সংস্কৃত নাটকাভিনয় করিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন :

(১) তমলুক রামকৃষ্ণ মিশনে অভিনীত শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনী অবলম্বনে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত 'শক্তি-সারদম্'।

(২) দিল্লী আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম সংস্কৃত নাটকাভিনয় ডক্টর চৌধুরী বিরচিত 'মহিমময়-ভারতম্' এবং ভাস-বিরচিত 'প্রতিমা-নাটকম্'।

(৩) কলিকাতা বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন-সমিতির উদ্যোগে বহু সুধীজনের উপস্থিতিতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের পুণ্য জীবনী অবলম্বনে ডক্টর চৌধুরী বিরচিত 'মহাপ্রভু-হরিদাসম্'।

দিল্লীতে লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার নাটকের বিশেষ প্রশংসাপূর্বক অভিনেতৃবৃন্দকে অভিনন্দিত করেন। সঙ্গীতাংশে অংশগ্রহণ করেন শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক, শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুবিখ্যাত শিল্পিগণ।

ভ্রম-সংশোধন

এই সংখ্যার ২৫৭ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ৩য় পঙ্‌ক্তি পড়িবেন : 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি'।

উৎসবে ও নিত্যপ্রয়োজনে
শতাব্দীর সুপরিচিত
লক্ষ্মীবিলাস
সর্ব্বঋতুর উপযোগী তৈল
এম,এল,বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস • কলিকাতা-৯

Get more strength
out of your
FOOD
BE WISE TO PICK UP
Vanasda
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMIN A & D
BERAR OIL INDUSTRIES
AKOLA
BOMBAY

OFFERING
TUBEWELLS
COMPLETE WITH
FOREIGN G.I.
PIPE
FILTER.
BUCKET
SOCKET
WITH ALL
PARTS
TUBE-WELL
(GUARANTED)
CHEAPEST
& BEST.
STOCKISTS
AGENTS
&
TUBE WELL
EXPERTS
&
SPECIALITIES
PHONE: BANK 4497.
N.SOLOMON & CO. LTD
29, STRAND ROAD, CALCUTTA—1.

জুতা

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সরল রাজযোগ—৪র্থ সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি বুলের বাড়ীতে কয়েক জন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্ত্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ॥০ আনা।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। ১০২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামিজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোযিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজান হইয়াছে। পরিচয় এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবিসম্বলিত। মূল্য ১ম ভাগ ৫৲ ও ২য় ভাগ ৪॥০ আনা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪॥০ ও ৪।০।

ভারতে বিবেকানন্দ—১২শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামীজির ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৬৪৫ পৃষ্ঠা মূল্য ৫৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪৸৵০ আনা

দেববাণী—৭ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্রদ্বীপোদ্যান' নামক স্থানে কয়েক জন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন তাহার একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ২২৭ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৸৵০ আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহিত অংশসমূহ বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সন্নিবেশিত। মূল্য ২।০ আনা।

বিবেক-বাণী—১৬শ সংস্করণ। আচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজীর উপদেশাবলী। স্বামীজির বাষ্টসম্বলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। মূল্য ।৵০ আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামীজির ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ আনা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

ভারতীয় নারী—১২শ সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান আদর্শ, পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজির মনোরম ছবি-সম্বলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান—৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৩ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদান্ত-মত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে আর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ—যে গুলি না বুঝিলে ধর্ম জিনিষটাকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৩শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়ভরতের-উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্য গণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট ও ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। মূল্য ১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

সন্ন্যাসীর গীতি—১৩শ সংস্করণ। স্বামীজি-রচিত 'Song of the Sannyasin' নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৵০ আনা।

পওহারী বাবা—৯ম সংস্করণ। গাজীপুরের বিখ্যাত মহাত্মা পওহারী বাবার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। স্বামীজির হাফটোন ছবিযুক্ত। মূল্য ॥০ আনা।

হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ—৫ম সংস্করণ, ৯০ পৃষ্ঠা। ইহাতে হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা, হিন্দুধর্মের ক্রমাভিব্যক্তি, ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর ও ডাঃ পল ডয়সেন সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মূল্য ৸০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ॥৴০ আনা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৪র্থ সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ।৵০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ।৴০ আনা।

অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৪র্থ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। এই পুস্তক পাঠে চরিত-কথার কল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। মূল্য ১।০ আনা।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৪র্থ সংস্করণ; আচার্য্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲ মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা—১ম সংস্করণ। স্বামী অরূপানন্দ প্রণীত। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা পুস্তক হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা।

ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন কথা। মূল্য ২৲ টাকা।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—২য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩॥০ আনা।

শিবানন্দ-বাণী—১ম ভাগ—৫র্থ সংস্করণ, ২য় ভাগ—২য় সংস্করণ স্বামী অপূর্ব্বানন্দ-সঙ্কলিত মূল্য প্রতি ভাগ ২॥০ আনা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। প্রথম ভাগ—(ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর) ৫ম সংস্করণ। দ্বিতীয় ভাগ—(ছান্দোগ্য) ৩য় সংস্করণ। তৃতীয় ভাগ—(বৃহদারণ্যক)' ৩য় সংস্করণ। ইহাতে উপনিষদের মূল, সংস্কৃত, অন্বয়মুখে বাংলা প্রতিশব্দ, সরল বঙ্গানুবাদ এবং আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যানুযায়ী দুরূহ বাক্যসমূহের টীকা প্রভৃতি আছে। সুদৃশ্য ছাপা, কাপড়ের মনোরম বাঁধাই, ডবল ক্রাউন—১৬ পেজি, প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য—প্রতি ভাগ ৫৲ টাকা।

সাধু নাগ মহাশয়—৮ম সংস্করণ। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ১॥০ আনা মাত্র।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত) অতুলনীয় সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত 'গোপালের মা' এর সংক্ষিপ্ত আদর্শ জীবনের কাহিনী। মূল্য ॥০ আনা।

নিবেদিতা—১২শ সংস্করণ। শ্রীমতী সরলা বালা দাসী-প্রণীত। স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা। মূল্য ৸০ আনা।

সৎকথা—স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক সংগৃহীত—৩য় সংস্করণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ (শ্রীলাটু) মহারাজের উপদেশাবলীর সংকলন। মূল্য ২৲ টাকা।

যোগচতুষ্টয়—স্বামী সুন্দরানন্দ-প্রণীত। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তিও যোগের সংক্ষিপ্ত সরল বিবরণ। মূল্য ২৲ টাকা।

বেদান্তদর্শন—১ম খণ্ড—চতুঃসূত্রী। শাঙ্কর ভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ, রত্নপ্রভা টীকা, ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্বলিত। প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ টাকা।

স্তবকুসুমাঞ্জলি—৫ম সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত—বৈদিক শান্তিবচন, সূক্ত, প্রার্থনা ইত্যাদি বিবিধ সংস্কৃত স্তোত্রাদির অপূর্ব্ব সঙ্কলন। সংবাদপত্রসমূহে উচ্চ প্রশংশিত। মূল সংস্কৃত, অন্বয়, অন্বয়মুখে সংস্কৃতের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং মূলের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৩৲ টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৫ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ॥৵০ আনা।

আগে চলো—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। কিশোরদের জন্য লেখা। তরুণমনে সুনীতি, দেশাত্মবোধ, সেবা, আদর্শনিষ্ঠা এবং ধর্মপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক যৌবনোন্মুখ ছেলেমেয়েকে এই বইখানি পড়িতে দেওয়া উচিত। মূল্য ১॥০।

হিন্দুধর্ম পরিচয়—১ম ও ২য় ভাগ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সরল কথায় হিন্দুধর্মের মুখ্য বিষয়গুলির সহিত পরিচিত চেষ্টা এই বই দুখানিতে করা হইয়াছে। মূল্য ১ম ভাগ ॥০ আনা, ২য় ভাগ ৸০ আনা।

দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য ও পূজা-পদ্ধতি—স্বামী কৈবল্যানন্দ-প্রণীত। মূল্য ১ম ভাগ (পরিবর্দ্ধিত ৪র্থ সংস্করণ ৸৵০, ২য় ভাগ (৩য় সংস্করণ) ১॥০।

ঠাকুর এবার এসেছেন

ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। এবার বাঁশ ও ঘাস ছাড়া যার ভেতরে একটু সার আছে সেই চন্দন হবে। তোমাদের ভাবনা কি ?...

সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ-মন ভাল থাকে।...কাজ করতেই হয়। কর্মেই কর্মপাশ কাটে। কাজ ছাড়া থাকা ঠিক নয়।............

—শ্রীমা

● ● ●

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী অদ্বয়ানন্দ ; ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, এম. আই. প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা—৩

৬১তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা — বার্ষিক মূল্য ৫৲

শ্রাবণ, ১৩৬৬ — প্রতি সংখ্যা ৷৷০

উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩৬৬

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বর্ষারম্ভ। বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে ভাল হয়। **বার্ষিক মূল্য সডাক ৫৲ ও যাণ্মাসিক ৩৲**। প্রতি সংখ্যা ॥৹ আনা।

বিশেষ কারণ না থাকিলে প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইয়া থাকে। পত্রিকা না পাইলে সেই মাসের ২০ তারিখের মধ্যেই সংবাদ দিবেন।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, ইতিহাস, সামাজিক উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। **পত্রোত্তর ও প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত পাঠানো হয় না। সাধারণতঃ ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। ঠিকানাসহ স্বাক্ষরিত প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 'উদ্বোধনে' **সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক** পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপন ঃ—বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু মনোনয়নের সম্পূর্ণ অধিকার কার্যাধ্যক্ষের উপর থাকিবে। বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের পর পরবর্তী মাসে প্রকাশের জন্য কোন বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না। বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছান দরকার। "উদ্বোধনে"র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।**

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

TRADE
MARK

শুভ্র শিবের সমীপে

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং
খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধনি
সোঽয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা ॥

—শংকরাচার্য

তুষারমণ্ডিত ধ্যানগম্ভীর রজতগিরি যাঁহার স্মরণ-প্রতীক, জীবন-কোলাহল সমাপ্ত হইলে যিনি তাঁহার সন্তানগণকে স্বীয় শান্তস্বরূপে লীন করিয়া লন, সর্ববর্ণের লয়স্থান সর্বাধারস্বরূপ সেই শুভ্র শিবের ধ্যান করি।

*　　　*　　　*

গাত্র যাঁহার শুভ্র ভস্ম দ্বারা রঞ্জিত, হাসি যাঁহার শিশুর মতো সরল সুন্দর ও শুভ্র, হস্তে যাঁহার নরকপাল ও খট্টাঙ্গ শুভ্র, যাঁহার বাহন শুভ্র বৃষভ, কর্ণে যাঁহার শুভ্র রৌপ্যকুণ্ডল, গঙ্গার উচ্ছল ফেনে যাঁহার জটা শুভ্র, এবং যে পশুপতির মস্তকে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র চন্দ্র সেই সর্বশুভ্র শিব আমাদিগের কালিমাময় জৈব পশুভাব—সর্ববিধ পাপতাপ বিনষ্ট করিয়া সর্বদা আমাদিগকে দিব্য ঐশ্বর ভাবে পূর্ণ করুন।

*　　　*　　　*

শ্রাবণের প্রতিটি দিন, বিশেষতঃ শ্রাবণের পুণ্য পূর্ণিমায় আমরা স্মরণ করি সেই শান্ত শুভ্র শিবকে—যিনি জগতের কল্যাণ-ধ্যানে যুগে যুগে যোগমগ্ন—যিনি জগতের সকল দুঃখ গরলজ্বালা নিজে একা ভোগ করিয়া বিশ্ববাসীর জন্য বর্ষণ করিতেছেন অমৃতের শান্তিধারা।

কথাপ্রসঙ্গে

বিশ্বমৈত্রীর তিনটি সূত্র

অ্যাটম-বম্ব ও স্পুটনিকের মতো 'বিশ্বমৈত্রী' কথাটিও আজকাল সকলের মুখে মুখে, তবে দুঃখের বিষয় ব্যাপারখানা কি বুঝাইয়া বলিতে বলিলে প্রায় সকলেই অন্য কথা পাড়েন। কি ভাবে অ্যাটম বোমা ফাটে, কিভাবে স্পুটনিক চলে, তাহা জনসাধারণের জানিবার কথা নয়; যদিও কাগজে পত্রে একরূপ বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে কৌতূহল নিবৃত্ত হইলেও প্রকৃত তত্ত্ব অজানাই থাকিয়া যায়।

আর 'বিশ্বমৈত্রী'? বিবদমান বিশ্বে আজ বিশ্বমৈত্রীই যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—একথা সকলে বুঝিলেও বিশ্বমৈত্রীর স্বরূপ কি, কিভাবে উহা মানব-সমাজে রূপায়িত হইবে—এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণার একান্ত অভাব। অথচ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে বিশ্বমৈত্রী অথবা বিশ্ব-ধ্বংস—মানুষ আজ এই দুই বিকল্প অবস্থার সম্মুখীন! নিজের ধ্বংস কেহই চাহে না, অতএব আত্মরক্ষার জন্যই আজ বিশ্বমৈত্রীর প্রকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। আলোক এবং অন্ধকার যেমন বিকল্প নহে, আলোকের অভাবই অন্ধকার; তেমনই এখানেও মৈত্রীর অভাবই হিংসা। বিশ্বমৈত্রী দেখা দিলে বিশ্বধ্বংসের ভাব তিরোহিত হইবে।

মনুষ্যজাতির এই সংকটকালে সর্বপ্রযত্নে আজ 'বিশ্বমৈত্রী' শব্দটির যথার্থ অর্থ বুঝিতে হইবে, এবং জীবনের সর্বস্তরে—ব্যক্তিগত, জাতিগত ও সর্বমানবিক ক্ষেত্রে মৈত্রী সাধনার ও মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে। এই মৈত্রী সাধনার তিনটি সূত্র: ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়—অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, তৃতীয়—বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সকলের মধ্যে একত্ব-দর্শন।

জাতিগত ক্ষেত্রে—সর্বপ্রথম স্বীয় জাতির শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে এবং নিজস্ব কৃষ্টির উপর শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে। কৃষ্টি একটি জাতির বৈশিষ্ট্য—কৃষ্টি যেন একটি জাতির 'ব্যক্তিত্ব'। স্বীয় কৃষ্টির উপর শ্রদ্ধাহীন জাতিকে মৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অপর যে কোন জাতি এই আত্ম-সম্মানহীন জাতিকে পদদলিত করিতে পারে এবং করেও। এ ক্ষেত্রে দাসত্বই সম্ভব, মৈত্রী নয়। মৈত্রীর জন্য তাই প্রথম প্রয়োজন নিজের প্রতি শ্রদ্ধা; সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ঘৃণা বা বিদ্বেষের দাবদাহে মৈত্রী অঙ্কুরিত হয় না। কোন জাতির সহিত মৈত্রীস্থাপন করিতে হইলে তাহাকে সন্দেহ করিলে চলিবে না, তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিলেও চলিবে না; তাহাকে সহযোগী ও সহযাত্রী মনে করিতে হইবে, তাহার গুণগ্রাহী হইতে হইবে; এক কথায় তাহার সম্বন্ধে—তাহার জীবনাদর্শ বা কৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হইবে। সর্বোপরি বুঝিতে হইবে, শত বিভিন্নতা—সহস্র বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সকল জাতিই এক মনুষ্য জাতি।

বিশ্বমৈত্রীর তাত্ত্বিক রূপটি আশা করি কিছুটা পরিস্ফুট হইয়াছে। এখন প্রয়োজন একটি ব্যবহারিক রূপরেখা। ব্যবহারের অভাবে অথবা ব্যবহার সম্ভব না হইলে বহু তত্ত্ব তত্ত্বই থাকিয়া যায়; বর্তমান যুগে তাহার বিশেষ মূল্য নাই। অতএব আমাদের দেখিতে হইবে বিশ্বমৈত্রীর এই আদর্শ

আমরা কিভাবে কাজে লাগাইতে পারি বা বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারি।

প্রীতি ও মৈত্রীপূর্ণ ব্যবহারের পরীক্ষা দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনের পরিধি ক্রমবর্ধিত করা যায়, ইহা প্রত্যেকেরই অনুভূতির ও আয়ত্তের মধ্যে; ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ব্যক্তিরই সমষ্টি জাতি; ব্যষ্টিতে যাহা সম্ভব, সমষ্টিতেও তাহা সম্ভব; ব্যক্তিকে বাদ দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া—বিশ্বমৈত্রী স্থাপিত হইতে পারে না। বহু লোক ব্যক্তিগত মৈত্রী সাধনায় সিদ্ধ হইলে তবেই আমরা পরবর্তী স্তরে জাতিগত মৈত্রী স্থাপনার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি; নতুবা দুই জাতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইতে পারে, মৈত্রী নয়! দুই দেশের সেনাপতির মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি-স্বাক্ষর বা দুইটি রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে 'সৌহার্দ্যপূর্ণ' করমর্দন ও শুভেচ্ছাপূর্ণ পত্রবিনিময়কে দুইটি জাতির মৈত্রী বলা যায় না।

আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যক্তি উপেক্ষিত, অবহেলিত; সমষ্টির নামে ব্যষ্টি বলিপ্রদত্ত। কিন্তু মৈত্রী-সাধনায় এই ব্যক্তিকে আনিতে হইবে সর্বাগ্রে। ব্যক্তির স্ফুরণের ভিতর দিয়াই জাতির স্ফুরণ হয়। ব্যষ্টির সিদ্ধিই সমষ্টির সিদ্ধি আনিয়া দেয়।

জাতিগত আলোচনার স্তরে এখন সাধারণ হইতে বিশেষে আসিয়া আমরা দেখিতে চাই ভারতের ক্ষেত্রে এই বিশ্বমৈত্রীর সাধনা বর্তমানে কিভাবে সম্ভব।

ভারতবর্ষ একদিন ব্যক্তির অন্তর্বিকাশের সাধনা করিয়াছিল, তাহাকে আবার সেই সাধনাই করিতে হইবে। আত্মবিস্মৃত হইয়া সে কিছুদিন জীবন্মৃত হইয়াছিল; আজও নিজের ব্যক্তিত্বে সে সন্দিহান, নিজের কৃষ্টির উপর শ্রদ্ধাহীন; তাই আজও তাহার দুর্দশার অবসান হইল না, আজও সে সর্ববিষয়ে পরনির্ভর।

আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার সমগ্র কৃষ্টির মূল্য আজ তাহাকে বুঝিতে হইবে, তবেই দূরীভূত হইবে প্রাদেশিকতার মোহ ও প্রান্তিকতার ভ্রান্তি! স্বাধীনতালাভের পর ভারতে ঐক্য না আসিয়া কেন ভাঙন আসিয়াছে, উদারতা না আসিয়া কেন সংকীর্ণতা আসিয়াছে, ত্যাগের ভাবাদর্শের স্থান কেন স্বার্থপূর্ণ ভোগবাদ অধিকার করিতেছে?—তাহার একটি মাত্র উত্তর, ভারত তাহার নিজ কৃষ্টি ভুলিয়া অপরের অন্ধ অনুকরণ করিতেছে; নিজের উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া সে অপরের অনুসরণ করিতেছে। এক্ষেত্রে অপরের সহিত তাহার বন্ধুত্ব সম্ভব নয়, নিজেকেও ঠিক রাখা দুরূহ।

ভবিষ্যৎ ভারত গড়িতে গেলে অতীত ঐতিহ্যের ভিত্তির উপরই গড়িতে হইবে। বিশ্ব-সভায় কোন্ পরিচয়পত্র লইয়া সে দাঁড়াইবে? ব্রিটিশের শৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষ—পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকারী ভারতবর্ষ? না, নানা জাতির উত্থান-পতনের সাক্ষী ভারতবর্ষ,—জ্ঞানবিজ্ঞান-দর্শনের দ্রষ্টা মহাভারতবর্ষ? প্রাচীন গৌরবময় উত্তরাধিকার বিসর্জন দিয়া কে কবে কোথায় নিজেকে অজ্ঞাতকুলশীল বলিয়া পরিচয় দিয়াছে?

শত শত সন্ত-সাধকের মাধ্যমে প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা ভারতে চিরদিন অব্যাহত আছে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকিলেও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভারত কোনদিন নিদ্রিত হয় নাই, সেখানে ভারত-পুরুষের অতন্দ্র চেতনা তাহার সাধনার ধারা বর্তমান ইতিহাসের ধারার সহিত মিশাইয়া দিয়াছে।

যেখানে জাতি সর্বাপেক্ষা সচেতন—বুঝিতে হইবে সেইখানেই তাহার প্রাণ, সেইখানেই তাহার প্রতিভার স্ফুরণ! এক এক জাতির প্রাণ-কেন্দ্র এক এক বিষয়ে। ভালোর জন্যই হউক, মন্দের জন্যই হউক—ভারতের প্রাণকেন্দ্র ধর্মে, ভারতের

প্রতিভার সার্থক স্ফুরণ আধ্যাত্মিক স্তরেই। তাই সর্বপ্রথম নিজ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন হইতে হইবে। নিজের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে কি করিয়া সে অপরের শ্রদ্ধা মৈত্রী আশা করিতে পারে?

কিন্তু এইটুকুই সব নয়! এই বিরাট বিচিত্র সংসারে 'আমি' ছাড়া আরও অনেকে আছে, তাহারাও আমারই মতো। নিজের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া—সশ্রদ্ধ হওয়া এক জিনিস, আর নিজেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা অন্য জিনিস! যখন কোন জাতি বা ব্যক্তি নিজেকে সর্ব শ্রেষ্ঠ মনে করে—তাহার প্রবর্তিত জীবনধারা বা ধর্মমতই একমাত্র পথ এবং সকলের অবলম্বনীয় মনে করে, সে তখন নিজের ও অপরের অমঙ্গল টানিয়া আনে; শান্তির নাম করিয়া সে তখন জগতে অশান্তি ছড়াইতে থাকে। আত্মশ্রদ্ধা ও অহংকার এক নহে; কত না জাতি, কত না ব্যক্তি স্বীয় জীবন দিয়া প্রমাণ করিয়াছে—অহংকার পতনের মূল। অপরের প্রতি অশ্রদ্ধা 'বুমেরাং'-এর মতো ঘুরিয়া আসে, আমাকেই ঘিরিয়া ফেলে আত্মঘৃণার নাগপাশে। গতকাল যাহা ভারতের পক্ষে সত্য হইয়াছে, আগামীকাল তাহা যে ইওরো-আমেরিকার পক্ষে সত্য হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

তাই অপরকে অশ্রদ্ধা করিয়া নয়—অপরের কৃষ্টিকে শ্রদ্ধা করিয়া আজ আমাদের অগ্রসর হইবে বিশ্বমৈত্রীর সাধনায়। দেশে ও কালে পৃথিবী আজ সংকুচিত; শুধু যে শত শত মাইল আজ সংকুচিত হইয়াছে তাহা নয়, শত শত শতাব্দীও আজ এই বিংশ শতাব্দীতে ভিড় করিয়াছে। অপরের সহিত না মিলিয়া না মিশিয়া—শম্বুকবৎ আত্মকেন্দ্রিক আত্মরক্ষা-পরায়ণ জীবন এখন অসম্ভব। আজ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়—একজনের জীবন অপর জনের সহিত জড়িত। একস্থানের আঘাত শত স্থানে প্রতিহত। অতএব আজ অপরকে দূরে না রাখিয়া, তাহাকে ঘৃণা না করিয়া, তাহার সম্বন্ধে অজ্ঞ না থাকিয়া তাহার সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞাতব্য জানিয়া লইয়া, তাহার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া তাহাকে যথাযথ মর্যাদা দিতে হইবে, ও তাহার সহিত নিজের ভাবের আদান-প্রদান করিয়া উন্নততর সভ্যতার পথ প্রস্তুত করিতে হইবে।

পাশ্চাত্যের বহু সদ্‌গুণরাশি আজ ভারতকে মুগ্ধ করিয়াছে, প্রভাবিত করিতেছে। কিন্তু বিনিময় তো একমুখী নয়; ভারত-কৃষ্টির বহু সূক্ষ্ম ধারা পাশ্চাত্য চিন্তায় সঞ্চারিত হইতে শুরু করিয়াছে! এবং আগামী যুগের আধ্যাত্মিক অখণ্ড মানবের বিশ্বকৃষ্টি এই ভাববিনিময়ের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এক জাতি ও অপর জাতি—এই থীসিস ও অ্যান্টিথীসিসের মাধ্যমেই আমরা মনুষ্যজাতি-রূপ সমন্বয়ে বা সিন্থেসিসে উপনীত হই। কৃষ্টি ও ধর্ম ব্যাপারেও এইরূপ সম্ভব। সংঘাত ও সংঘর্ষের পর যদি মিলন ও সমন্বয় না হয়, তবে বুঝিতে হইবে প্রকৃতির এই পরীক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে। নূতনতর সংঘাত সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এই প্রকার উন্মুক্ত মনোভাবের অধিকারী হইতে পারিলে আমরা অধ্যয়ন করিব—শুধু ভারত বা প্রাচ্যকৃষ্টি ও গ্রীক বা পাশ্চাত্য কৃষ্টি নয়, আমরা অধ্যয়ন করিব—সমগ্র মানবজাতির ষ্টি, এক বৈজ্ঞানিক লইয়া। তখনই আমরা বুঝিব—প্রত্যেক জাতির কৃষ্টি, ধর্ম, দর্শন কেন পৃথক হয়। পলিনেশিয়ার সাগরতটে অথবা মধ্য আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে আমরা তখন মানুষকেই দেখিতে শিখিব—যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে। রেড ইণ্ডিয়ান ও কালো ভারতবাসীর জীবনা-

দর্শের অন্তর্নিহিত ঐক্য তখনই আমরা খুঁজিয়া পাইব।

দেশকালের ভুজকোটিতে—ইতিহাস ও ভূগোলের পরিস্থিতিতে মানুষের উত্থান-পতনের গতিরেখা দেখিয়া কখন আমরা মুগ্ধ হইব, কখন ভীত হইব; তাহার মুহুর্মুহু রূপান্তরের গতিভঙ্গীর মাঝেও অপলক নিশ্চল নেত্রে দেখিতে থাকিব 'তরঙ্গ লীলার তলে অতল সাগর'! অনন্ত মানব সত্তায় হারাইয়া যায় ক্ষুদ্র মানবতা, অনন্ত জীবন স্রোতে ভাসিয়া যায়—জন্ম-মৃত্যুর ওঠাপড়া। এই অনন্তত্বের ধারণাই দূরীভূত করে সকল সীমা ও সংকীর্ণতা, সকল স্বার্থবোধ ও বিদ্বেষবৃত্তি; তখনই সঞ্চারিত হয় সমবেদনা ও সহানুভূতি, তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রদ্ধা, প্রীতি ও বিশ্বমৈত্রী।

* * *

বিশ্বমৈত্রীর যে তিনটি সূত্র এখানে আলোচিত হইল, বিস্তারিত ভাবে সেইগুলি সম্বন্ধে আলোচনার ও গবেষণার প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি সহায়ে 'বৈচিত্র্যে একত্ব দর্শন'-নীতির ভিত্তিতে মানব-কৃষ্টির তুলনামূলক অধ্যয়নই তাহার পথ প্রশস্ত করিবে।

* * *

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর পর হইতে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব্ কালচার (কৃষ্টি প্রতিষ্ঠান) এতদুদ্দেশ্যে গত ২১ বৎসর ধরিয়া আলোচনা, বক্তৃতা, গ্রন্থাগার-পরিচালনা, প্রকাশনা প্রভৃতির মাধ্যমে যে বৃহত্তর কার্যের ভিত্তি রচনা করিয়াছে—আজ তাহা একটি পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে।

আগামী শীতকালে UNESCO-সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের নবনির্মিত বিশাল ভবনে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র বসিবার কথা। বিশ্বের মনীষিবৃন্দ এখানে দুইটি ধারায় আলোচনা চালাইবেন: প্রথমতঃ কিভাবে বিভিন্ন জাতি পরস্পরের কৃষ্টিকে শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বদৃষ্টি (World-perspective)-লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে; দ্বিতীয় এই কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠান তাহার আদর্শের সার্থকতার জন্য কি প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করিবে।

যুগান্তরের সন্ধিক্ষণে আমরা এই একান্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। প্রার্থনা করি—প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মনীষার সমবেত মহৎ প্রচেষ্টা সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হইয়া বিশ্বমৈত্রী স্থাপনের সূত্র ধরিয়া আগামী পূর্ণাঙ্গ কৃষ্টির বিশাল ভিত্তি রচনা করুক।*

* ইন্‌স্টিট্যুট প্রকাশিত আদর্শ-নির্দেশক পুস্তিকা 'Threefold Cord' দ্রষ্টব্য।

For a complete civilization the world is waiting, waiting for the treasures to come out of India, waiting for the marvellous spiritual inheritance of the race.

* * *

A great moral obligation rests on the sons of India to fully equip themselves for the work of enlightening the world on the problems of human existence.

—*Swami Vivekananda*

চলার পথে

'যাত্রী'

এল বর্ষা। এল তার বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা নিয়ে। গ্রীষ্মের অনলে এতদিন যা লক্ষ অতৃপ্তির অন্তরালে জলে যাচ্ছিল তাকেই আবার শ্যামলিমার স্বপ্ন-সমারোহে আবিষ্ট ক'রে এল বর্ষা। এই আগমনের নিবিড় বর্ণাঢ্যে কেমন এক শাশ্বত এষণার স্বর্গস্বাদ মাখানো রয়েছে। চিরপিপাসিত ধরিত্রী আজ তার অনাহত আবাহনে এই স্বভাব-দুলাল বর্ষাকে ডেকে এনেছে তার মৃত্যুঘেরা নগ্নতাকে আবার প্রাণলীলায় সমুচ্ছল ক'রে তুলতে। পৃথিবীর মঙ্গল-তৃষাই পেরেছে এই চির যাযাবর বর্ষাকে কিছুদিনের জন্যও আমাদের স্বপ্নালু বিভাসের সাথী করতে! বর্ষা তাই সকল ঋতুর এক জীবন্ত প্রতিভূ !!

বর্ষা এসেছে। তাই জেগেছে পৃথিবী-দেহে সবুজ ঘাসের লোমহর্ষণ। বনে বনে জড়িয়ে গেছে কেমন এক বর্ণালী উদ্‌ভ্রান্তি। কলাপীর কেকারবে উর্দ্ধায়িত হয়েছে নিখিলের অন্তর্লীন স্বর-বিতান। নীপের শিহরণে বিসারিত কোটি বিভঙ্গ মধুরিমা। দাদুরীর অশ্রান্ত ঝঙ্কারে নবারুণ-রাগের সমুদ্বেল আবাহন। কেতকী তার কণ্টকিত বিরহের কঠিন নির্মোক খুলে দিয়ে শুষ্ক অশ্রুর সুরভি ছড়িয়ে দিয়েছে দিগ্‌বলয়ের সীমায় সীমায়। চারিদিকের উছল নদী-তড়াগের মধ্যেও কেমন এক রহস্যমদির চাঞ্চল্য। মানুষের মনেও সেই সঙ্গে কে যেন দিব্যদর্শনের অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে দিয়েছে। সবই আজ তাই স্বাদে সৌরভে গানে লীলায়িত।

বর্ষাকে দেখে মানুষের মন তার বিচিত্র ভাষার ও ভাবের ডালি সাজায়। কখন সে বলে: 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে'। আবার বলে—'কেন পান্থ, এ চঞ্চলতা; কোন্ শূন্য হতে এল কার বারতা?' কখন বা বলে, 'গগনে গগনে আপনার মনে কী খেলা তব, তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে নিতুই নব!' আবার শুনি, 'বাদল-হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে যূথীবনের বেদন আসে; ফুল ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল; ও তুই কী এনেছিস বল্।' পর মুহূর্তেই ঐ ভাব বদলে গিয়ে গান ওঠে—'বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ়, তোমার মালা; তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা।' তার পর মুহূর্তেই আবার শুনি, 'আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার, দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার—'।

বর্ষা ভারতের পঞ্চভাব সাধনের সমন্বয়ে গাঁথা এক অপরূপ ভাবময় রসাস্বাদন। এর মধ্যে দেখি, সকল রসের সার্থক সমাবেশ। এরি মাঝে শান্তরসে উদ্ভাসিত হ'য়ে সাধক তার 'তৃষ্ণা ত্যাগ' করে; দাস পায় তার আরাধ্য সেব্য ও প্রভুকে; সখা পায় তার নিবিড়তর সখাকে সকল 'অসম্ভ্রমের' স্বাদে জড়িয়ে; সন্তান পায় তার মমতাময়ী মাকে, মা পায় তার সন্তানকে; আর বিরহ-কাতর দয়িতা তার মধুর আত্মদানের মাধ্যমে দয়িতের রভস-প্রোজ্জ্বল গোমুখীর উৎস-ধারাকেও করে আবিষ্কার।

ঐ শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর রূপের মুকুতাটি বুকে রেখেই বরষা আমাদের হৃদয়-সাগরে রত্ন আহরণের আবাহন জানায়। যখনই প্রবল বর্ষণের পর মেঘমেদুর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে নীলিমার অজস্রতাকে আমাদের চোখের সুমুখে খুলে ধরে, তখনই তার মাঝে শান্ত-রসের প্রতীককে পাই খুঁজে। এই উদার, অদ্ভুত, ভাবময় দৃশ্য দর্শন ক'রে ধরিত্রীর তখনকার ঐ তন্ময়তার মাঝেও থাকে না আর কোন তিতীর্ষু তৃষ্ণা! শান্তরসের অপূর্বতায় তখন সে সমাহিত। তখন তার আর কোন চাওয়া-পাওয়া নেই।

আবার বনানীর তৃষিত অধরে বাৎসল্যের রস সিঞ্চন ক'রে বর্ষা যখন তাকে অজস্র আদরে লাবণ্যময় ক'রে তোলে, তখন তার মাঝে ফুটে ওঠে বাৎসল্য-জনয়িত্রীর স্নেহাস্পদ নিদর্শন।

কলাপী যখন মেঘ দর্শন ক'রে নাচতে থাকে, কিংবা মত্ত দাদুরী মাতে আনন্দ-ঝঙ্কারে, তখন তাদের সেই উষা-কামনার মাঝে যে গীত উৎসারিত হয় তার সুরে লেখা থাকে—'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।' সখ্যভাবের এইটিই তো সত্যকারের ছবি!

আবার যখন ধরার শুষ্ক পত্রের সম্ভার সরিয়ে, ধূলি-জঞ্জাল অপসৃত ক'রে, বদ্ধজল নদী-তড়াগের নবপ্রবাহে তাদের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বর্ধিত ক'রে সদাই-ব্যস্ত সেবক-মেঘকে ঐ অম্লান সেবার শ্রী ফোটাতে দেখি তখনই দাস্যভাব প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে।

অন্যদিকে আবার, যখন ঐ বর্ষারই নবানুরাগের সীমাহারা মেঘে ঝরে অঝোর ক্রন্দন, যখন বিরহবেদনায় চারিদিকে আঁধার ঘনিয়ে আসে তখন মানবমনের চিরন্তন বিরহ-বিধুরা রাধিকা মধুর ভাবের অনুধ্যানে শ্যামময় হয়ে ওঠে। প্রেমের দেবতাকে কাছে পাবার আশায় রাধিকার সেই আঁখি-যমুনার উছলিত ধারায় যে অশ্রুবিন্দু কুসুমিত হয়ে ওঠে, তার ভাষায় তখন ক্রন্দন ওঠে—'বলে দে, বলে দে সখী, কোথা মোর কালা। সহে না সহে না মোর বিরহের জ্বালা, এই ঝর ঝর বরষায়।' প্রকৃতির সকল দিক ভরেই তখন সুর ঝরে—'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।'

চল পথিক, 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' আমরাও আমাদের নিজ নিজ ভাবের মূর্তিকে জাগিয়ে তুলে সাধনায় মেতে উঠি। আমাদের সর্বাত্মক বিপুল প্রার্থনার মাঝে বর্ষার এই আহ্বানকে আপন ক'রে নিই। আমাদের অন্তরের মহাসাধনা বর্ষার ঐ স্পর্শমণি-স্পর্শে সোনা হয়ে উঠুক। প্রকৃতির মর্মে অনুস্যূত প্রকাশময়ী শিখাকে আমাদের অন্তর-প্রদীপে জ্বালিয়ে নিয়ে চল চিরন্তনের দুয়ারে উপনীত হই। আর দেরী নয়, চল, চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

মেঘে মেঘে মোর মনে পড়ে যায়

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

চেরাপুঞ্জির বর্ষণধারা দেখিনি কখন চোখে,
তৃষ্ণাকাতর গোবি-সাহারার শুনিনি আর্ত রব।
কার যেন প্রিয়-বিয়োগব্যথায় রজনী কাঁদিছে শোকে
অন্ধকারের মালা গেঁথে কে গো করিছে বিরলে জপ ?

প্রতি মানুষেরে মনে হয় সদা বিশাল গ্রন্থ সম,
সেই গ্রন্থের অধ্যায়গুলি এমন দিনেতে ল'য়ে
পড়িবার সাধ রয়েছে মরমে—সাধ্য নাহিক মম,
বাদলের গান শুনিতেছি বসে সঙ্গী-বিহীন হয়ে।

মেঘে মেঘে মোর মনে প'ড়ে যায় মেঘমল্লার সুর,
আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি কাজল রাতের কথা।
বর্ষায় ভরা গিরিতটিনীর কল্লোল সুমধুর
কানে আসে আর নুয়ে নুয়ে দোলে পান্থপাদপলতা।

চিত্তচয়ন করেছিনু কার হৃদয়বীথিকা হ'তে
স্মরিতে তাহারে চোখে আসে জল,—জোনাকিরা জ্বলে বনে ;
সংসার হ'তে ভেসে যায় দিন অনাদিকালের স্রোতে
গুণ্ঠিত প্রভা প্রোজ্জ্বল হ'ল দীপ নিভিবার ক্ষণে।

মোর বাসনার নগ্ন শিশুরা খেলা করে মন-মাঝে,
কথার অতীত সুরে যে আমার ভাবনার সমারোহ ;
কেকার ডাকেতে নেমেছে বাদল, তাহারি নূপুর বাজে,
ইন্দ্রজালের পরিবেশে কেন রহে মোর মায়া মোহ ?

বন্যকুসুমসৌরভ মেখে বাতায়নে বহে বায়ু
ইতিহাস-হারা দীঘল পথের স্মরণতিথির ঘ্রাণে।
বরষে বরষে বরষার রূপ হেরিতে হেরিতে আয়ু
ফুরায়ে আসিছে, তবুও পুলক কেন জাগে আজো প্রাণে ?

আত্মার সন্ধানে মানুষ

স্বামী নিখিলানন্দ

[নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ]

স্মরণাতীত কাল থেকে কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্ত্যে যোগী, দার্শনিক ও ধর্মবেত্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে 'মানুষ'। উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন, 'আত্মানং বিদ্ধি', সোক্রাতেসও উৎসাহ দিচ্ছেন, 'নিজেকে জানো'। জন রাস্কিনের মতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ মানুষের মনে তিনটি প্রশ্ন ওঠে: কোথা থেকে এসেছি? আমি কি? কোথায় চলেছি? বর্তমান বিজ্ঞানও জানতে চাইছে—বিশ্বজগতের প্রকৃতি ও তার মধ্যে মানুষের স্থান কোথায়? নবজাগরণের পর থেকে ইওরোপের ধর্ম ও দর্শনের চিন্তা ও ধারণা মানবতা-বাদের দ্বারা সমধিক প্রভাবিত

আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্, বৈজ্ঞানিক, ধর্মতত্ত্ববিদ্ ও দার্শনিকেরা মানুষের বিভিন্ন বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রধানতঃ মানুষের বাইরের দিকটা জানতেই ব্যস্ত। এইরূপে লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যেই পাশ্চাত্যদেশে সম্ভব হয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রগতি।

পাশ্চাত্ত্যের মতে—মানুষ হচ্ছে শরীরটা, আর তার একটা আত্মা থাকতেও পারে। শরীর ছাড়া সে একটা কল্পনার ছায়ামাত্র। ভারতীয় দর্শন-মতে মানুষ হচ্ছে আত্মা, তার একটা শরীর আছে। এইভাবেই ভারতীয় দার্শনিকেরা আত্মার রহস্য ভেদ করেছেন।

পাশ্চাত্য তার অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা এমন এক আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে একটি মণিমঞ্জুষার—যাতে মহামূল্য মণিটি নেই অপরপক্ষে ভারতে হিন্দুরা আবিষ্কার করেছে কতকগুলি মহামূল্য রত্ন, কিন্তু সেগুলি তারা রেখেছে জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের অনুসন্ধান-লব্ধ সিদ্ধান্তগুলির সামঞ্জস্য-বিধানই সর্বত্র মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হবে, এবং মানুষকে চরম উপলব্ধির দিকে নিয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যাঁরা জড়বাদী তাঁরা মনে করেন মানুষ জড় প্রকৃতিরই অংশ, এবং অন্যান্য পদার্থের মতো মানুষও পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞানের নিয়মাবলী মেনে চলে। মানুষের আকৃতি আছে, ওজন আছে, বর্ণ আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসে, খাদ্য-পরিপাকে, এবং বিভিন্ন গ্রন্থির প্রক্রিয়ায় (glandular action) মানুষের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটছে। জড়বাদী ও যান্ত্রিক দৃষ্টিতে এই হ'ল মানুষের রূপ।

প্রাণতত্ত্ববিদের মতে—মানুষ হচ্ছে পৃথিবীতে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ প্রকার জীব-জন্তুর মধ্যে এক প্রকার প্রাণী। জীবকোষের প্রধান উপাদান অঙ্গার, উদজান, অম্লজান, যবক্ষারজান, গন্ধক, সোডিয়ম, ক্যালশিয়ম ও ম্যাগ্নেশিয়ম। এই জীবকোষই হ'ল প্রাণিশরীরের মূল আকর (unit of life)। বিশেষ পরিবেশে জড় থেকে জীবসৃষ্টি সম্ভব। অন্যান্য জন্তুর মতো মানুষও আহার করে, বৃদ্ধি পায়, বংশবিস্তার করে ও ঘুরে বেড়ায়; মানুষ প্রতিক্রিয়াশীল ও অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে। অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের আরও মিল আছে, যথা—(১) বাঁচার তীব্র ইচ্ছা। (২) শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অংশবিশেষের সঙ্গে সম্বন্ধ, অথচ তা থেকে স্বতন্ত্র,

যার জন্যে আহত হ'লে বা অঙ্গহানি হলেও মানুষ আবার সেরে উঠছে, (৩) অভিজ্ঞতা থেকে শেখবার শক্তি, (৪) বয়ঃপ্রাপ্তি, (৫) স্বীয় জাতির বিস্তার ও সংরক্ষণ, (৬) পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন, (৭) নিদ্রা, কাজকর্ম, বিশ্রাম ও যৌনক্রিয়ার একটা নির্দিষ্ট নিয়মানুবর্তিতা।

ফ্রয়েড মানুষের ব্যাখ্যা করেছেন কামশক্তির (libido) দিক দিয়ে, আর কার্ল মার্কস্ করেছেন অর্থনীতির দিক দিয়ে। আধুনিক সংকটবাদীদের (existentialists) কেউ কেউ বলে থাকেন—মানুষ কাজকর্মে প্রধানতঃ চালিত হয় অকারণ অযৌক্তিক এক শক্তি দ্বারা। সাম্যবাদী (communism) দর্শন মানুষকে মনে করে মৌচাকের এক একটি ঘর—বা যন্ত্রের একটি অংশরূপে; মানুষ রাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যার কোন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই।

অতএব দেখা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন দিক থেকে মানুষকে নিয়ে আলোচনা করেছেন—কখনও জড় পদার্থরূপে, কখনও স্পন্দনরূপে—প্রতিক্রিয়াশীল প্রাণরূপে, কখনও প্রাণী-রূপে—জটিল একটি জন্তুরূপে, আবার কখনও সামাজিক একটি সমস্যারূপে। এঁদের অনুসন্ধান আমাদের দিয়েছে মানুষের বিশেষ বিশেষ দিকের মূল্যবান্ তথ্যরাশি; তবে অনেক সময় তাতে আসল মানুষটি হারিয়ে গেছে, অথবা তার শুধু অস্পষ্ট ছবিটি ধরা পড়েছে। মানুষ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার অনেকটা যেন মানচিত্রে আঁকা রাস্তাঘাটের মতো, তাতে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু পথিপার্শ্বের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দের মাধুর্য সেখানে নেই। মানুষ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান নির্ভর করে—তিনি কি জানতে চান ও তিনি কতটুকু জানবার শিক্ষালাভ করেছেন, তার ওপর। তাঁর জ্ঞান পরিমাণগত, গুণগত নয়। মানুষের সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়ে বিজ্ঞান অতি প্রখর আলোকপাত করে, কিন্তু আশে-পাশে গভীর অন্ধকার। বিজ্ঞানের অনুসন্ধান বড় পরিসংখ্যানমূলক, গড়পড়তার হিসাবে আসলের সন্ধান পাওয়া যায় না। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এখানে অবহেলিত।

ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিতে মানুষের স্বরূপ কি জানতে গিয়ে আমরা দেখি ইহুদী-খৃষ্টান ধর্মে 'মানুষ ঈশ্বর-সৃষ্ট' এই ভাবটির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর নিজের মতো করেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এবং ঐ এক ভাব থেকেই মানুষকে বুঝতে হবে। ঈশ্বরকে না জানলে মানুষ কখনও নিজেকে জানতে পারে না। ঈশ্বরকে জানলে তবেই মানুষ প্রকৃত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়। এই ব্যক্তিত্বই পাশ্চাত্য কৃষ্টির ও গণতন্ত্রের ভিত্তি।

হিন্দুধর্ম-মতে প্রকৃত মানুষ হচ্ছে আত্মা; আত্মা এক নিত্যমুক্তশুদ্ধবুদ্ধ ভাব—শরীর ইন্দ্রিয় ও মন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্ব-স্বভাবে মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা সুখদুঃখ নেই। মানুষের এই স্বধর্মের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বেদ-বেদান্তের মহাবাক্যগুলিতে—'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'। মানুষ যে আত্মা—ঋষিদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই এই সত্যের ভিত্তি; বেদাদি মহান্ শাস্ত্রে তা সুরক্ষিত আছে। তা ব'লে হিন্দুধর্মে বা দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান কর্তৃক উপস্থাপিত মানুষের যান্ত্রিক, প্রাণতাত্ত্বিক, জৈবিক বা সামাজিক ব্যাখ্যাগুলি অস্বীকার করা হয় না। এইগুলি মানুষের বহিঃপ্রকৃতির ব্যাখ্যা, তার অপরিহার্য স্বরূপের ব্যাখ্যা নয়। মানুষ যতক্ষণ এই প্রাকৃতিক জগতের অংশ, ততক্ষণ এই অপরা প্রকৃতিই তার প্রাণস্বরূপ; এ-কে অবহেলা করলে চলবে না। এই অংশের অবহেলা করার জন্যই ভারত আজ পিছিয়ে পড়েছে—বিশেষতঃ শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার দিক থেকে।

বেদে প্রকৃত মানুষকে তুলনা করা হয়েছে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্যের সঙ্গে। হঠাৎ একখানি মেঘ আসে, বিভিন্ন তার স্তর; সূর্য ঢেকে যায়, সূর্যরশ্মি তাতে ভেঙে যায়, মেঘের মধ্য দিয়েই তখন আলো দেখা যায়। হিন্দুদর্শনে এই 'আবরণ ও বিক্ষেপ'-এর কারণ মায়া। বেদান্ত—মায়ার পাঁচটি স্তরকে পঞ্চকোষ-রূপে বর্ণনা করেছে।

প্রথম অন্নময় কোষে মানুষের যে অংশটি ধরা ছোঁয়া যাচ্ছে—সেটি তার ত্বক্ অস্থি রক্ত মাংস ও শরীরের অন্যান্য উপাদান। অন্ন দ্বারাই এর সৃষ্টি, অন্নেই এর স্থিতি, অন্নের অভাবেই এর ধ্বংস। মানুষের এই অন্নময় কোষ নিয়েই পদার্থবিদ্ ও রাসায়নিকের গবেষণা, যার প্রয়োজন ভারতীয় ঋষিরা বার বার স্বীকার করেছেন, তবে তাঁদের মতে এটি উদ্দেশ্য নয়,—উপায়মাত্র।

দ্বিতীয় প্রাণময় কোষ; এর মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল আত্মা জীবন্ত প্রাণী-রূপে প্রতিভাত—প্রাণাভিমানীই আহার করে, বৃদ্ধি পায়, বিচরণ করে ও অবস্থানুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

তৃতীয় মনোময় কোষ: এখানে মানুষ তার চারদিকে যা ঘটছে তার দর্শকমাত্র নয়, সে প্রতিক্রিয়াশীল, সে চিন্তা করে—সন্দেহ করে, সুখ দুঃখের পার্থক্য বুঝতে পারে, 'অহং' ও 'অনহং' এর বৈচিত্র্য দেখতে পায়।

এই স্তরেই মানুষ কথা বলে, ভাষা ব্যবহার করে এবং অন্যান্য ইঙ্গিত-সহায়ে অপরের সহিত মনোভাবের আদান-প্রদান করতে পারে; এই স্তরেই মানুষ যন্ত্র আবিষ্কার করে এবং কৃষ্টির সূচনা করে। মনোময় কোষের সহিত জড়িত মানুষই সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার বস্তু। এই কোষও জড়,—আত্ম-চৈতন্যে আলোকিত।

অতঃপর বিজ্ঞানময় কোষ: মন সংশয় তোলে; মনকেই যে 'আমি' মনে করে, সেও নিজের সম্বন্ধে বা পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে নিশ্চয় নয়। নিশ্চয়-বুদ্ধির জন্য মানুষ ব্যবহার করে বিজ্ঞানময় কোষ। এখন সে একটি ব্যক্তি, এখানেই তার ব্যক্তিগত কর্তব্যবোধ, দায়িত্ব এবং আধ্যাত্মিক সাধনার সংকল্প। দ্বৈতবাদী ধর্মগুলি এই স্তরের মানুষকে নিয়েই আলোচনা করেছে।

সর্বশেষে ভারতীয় দার্শনিকেরা বলেন আনন্দময় কোষের কথা, এর সঙ্গে তাদাত্ম্য হ'লে (আনন্দময় কোষই আমি—এই বোধ হ'লে) মানুষ ক্ষুদ্র 'অহং' বা ব্যক্তিত্ব অতিক্রম করে। আনন্দময় কোষের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল—আরাম বা বিশ্রাম এবং চেষ্টাশূন্যতা, যা অনেক সময় কবি ও শিল্পীরা অনুভব ক'রে থাকেন; সাধারণ মানুষও তা অনুভব করে স্বপ্নশূন্য নিদ্রার (সুষুপ্তির) মাঝে।

এই পঞ্চকোষ মানুষের পাঁচটি অংশ—তার জড় আবরণ, বিভিন্ন এদের ঘনতা। মানুষ এগুলির ব্যবহার করে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য। অন্নময় কোষ পার্থিব অস্তিত্বের ভিত্তি। প্রাণময় কোষ অন্নময় শরীরে প্রাণ সঞ্চার করে। মনোময়কোষ-সহায়ে মানুষ বহির্জগৎ অনুভব করে। বিজ্ঞানময় কোষের সঙ্গে একীভূত হয়ে মানুষ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। আনন্দময় কোষের মাধ্যমে মানুষ ভোগ করে বিশ্রাম ও আনন্দ। এই পঞ্চকোষ অতিক্রম ক'রে তবে মানুষ আবিষ্কার করে তার প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা।

মানুষের আত্মা অশরীরী, এক ও অদ্বিতীয়। আত্মা ভয়শূন্য, নিঃসংশয় ও গোপনতা-বর্জিত। আত্মাই শক্তি ও জ্ঞানের উৎস, প্রেম ও করুণার প্রস্রবণ। অতএব স্বরূপতঃ মানুষ সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে এক। তার তথাকথিত ব্যক্তিত্ব একটি মুখোসমাত্র, যা তার স্বরূপ লুকিয়ে রাখে।

পৃথিবীর ব্যাধি দূর করতে আত্মজ্ঞানের আজ বড় প্রয়োজন। এরই সাহায্যে মানুষ পারে নিজেকে ঘৃণা, সংশয় ও অশুভ ইচ্ছার হাত থেকে মুক্ত ক'রে বিশ্বশান্তির পথ প্রস্তুত করতে। যুদ্ধের আতঙ্ক দূর করবার বিভিন্ন প্রচেষ্টা তখনই সফল হবে, যখন আমরা মানুষের অন্তর্নিহিত একত্ব ধারণা করতে পারব। শরীরের বা বুদ্ধির স্তরে এ ধারণা সম্ভব নয়—এটি একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি। অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষ দ্বৈত দেখতে পারেন, কিন্তু জীব জগৎ ও ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত ঐক্য কখনও তাঁর অনুভূতি থেকে লুপ্ত হয় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুশী তা কর।' আত্মার অমরত্ব জেনে জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে কর্তব্য সম্পাদন ক'রে বিচরণ করতে হয়।*

* কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব কালচারে ২৯.৩.৫৯ তারিখে প্রদত্ত (Man in search of the Soul) বক্তৃতার ভাবানুবাদ। [বৈশাখের 'উদ্বোধনে' ২২০ পৃষ্ঠায় এই দিনের সভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।]

আদান-প্রদান

['My master' বক্তৃতার প্রথমাংশ হইতে সংকলিত]

পাশ্চাত্য দেশে ইন্দ্রিয়বেদ্য জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্য দেশে আত্মিক জগৎ সেইরূপ সত্য। বস্তুতঃ অধ্যাত্মরাজ্যেই প্রাচ্য জনগণ দেখিতে পায় তাহাদের যাহা কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়, যাহা কিছু তাহাদের জীবন সার্থক করিতে পারে। পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে তাহারা স্বপ্নবিলাসী; আবার প্রাচ্য দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য জনগণই স্বপ্নাচ্ছন্ন—কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী খেলনা লইয়া তাহারা পুতুলখেলায় মত্ত! ভাবিতে তাহাদের হাসি পায় যে প্রাপ্তবয়স্ক পাশ্চাত্য নরনারী, যাহা আজ হ'ক কাল হউক ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এমন এক মুঠা ধূলা লইয়া এত মাতামাতি করিয়া বেড়াইতেছে। ·········মানব-জাতির অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের মতো প্রাচ্য আদর্শেরও প্রয়োজন রহিয়াছে; বোধ হয় সে প্রয়োজন আরও বেশী।

অতএব জগতে যখনই কোন আধ্যাত্মিক সমাধানের প্রয়োজন হয়, উহা স্বভাবতঃ প্রাচ্য দেশ হইতেই আসিয়া থাকে। প্রাচ্য জনগণ যদি যন্ত্রতত্ত্ব শিখিতে চায়, তবে তাহাদিগকে অবশ্যই পাশ্চাত্য দেশবাসীর পদতলে বসিয়া উহা শিক্ষা করিতে হইবে। আর পাশ্চাত্য জনগণ যদি পরমাত্মা, জীবাত্মা, ঈশ্বর এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে জানিতে চায়, তবে তাহাদিগকে প্রাচ্য দেশবাসীর পদতলে বসিয়াই ঐ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

* * * * *

আমাদের এই পৃথিবী শ্রমবিভাগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। একজনের হাতে সবকিছুর অধিকার থাকিবে, একথা বলার কোন অর্থ হয় না। পার্থিব ক্ষমতায় শক্তিশালী ভাবিয়া বসে·········যে জাতির বিত্তলালসা নাই, ঐহিক প্রতাপ নাই, সে জাতি বাঁচিয়া থাকার অযোগ্য, তাহার জীবন নিরর্থক। পক্ষান্তরে অন্য কোন জাতি নিছক জড়বাদী সভ্যতাকে একান্তই নিরর্থক মনে করিতে পারে।

একদা প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে ঘোষিত হইয়াছিল: কোন ব্যক্তি পৃথিবীর সমগ্র ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইয়াও যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞানবর্জিত হয়, তাহা হইলে বৃথাই তাহার জীবন। এইটিই প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গী, অপরটি পাশ্চাত্য। প্রত্যেকটিরই নিজস্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই দুই আদর্শের সংমিশ্রণে সামঞ্জস্য বিধান করাই বর্তমান যুগ-সমস্যার সমাধান।

নিউ ইয়র্ক, ফেব্রুআরি, ১৮৯৬।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

জন্মান্তর-কথা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, কারণদেহ ও জীবাত্মার সমষ্টিকে একটি প্রাণী বলা হয়। স্থূলদেহ জড়বস্তু, সহজেই ধ্বংসশীল; সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ জীবের যতদিন পর্যন্ত না আত্মজ্ঞান হয়, ততদিন পর্যন্ত স্থায়ী। জীবাত্মা চেতন পদার্থ—পরমাত্মার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ, ব্যষ্টি-জীব আত্মজ্ঞান লাভ করলে বিম্ব-স্বরূপ পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ করেন। অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত বা অবিদ্যাসৃষ্ট বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত জীবকে অণুচৈতন্য বা অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মতো পরমাত্মার অংশও কেউ কেউ ব'লে থাকেন। আত্মজ্ঞানবিহীন কোন জীব যখন দেহ ত্যাগ করেন, তখন জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহ-বিজড়িত হ'য়ে চ'লে যান এবং ঐ সূক্ষ্মদেহে অবস্থিত কর্ম-সংস্কার যেরূপ ক্ষেত্রে রূপায়িত হবার সুযোগ পান, সেরূপ ক্ষেত্রে জীবাত্মা পুনরায় স্থূলদেহ ধারণ করেন। এই প্রণালীকে জন্মান্তর-গ্রহণ বলা হয়। গীতায় এ সম্বন্ধে আর্য-দর্শনের চরমসিদ্ধান্ত এইরূপে প্রকাশিত হয়েছে :

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

—অর্থাৎ জাতব্যক্তির মৃত্যু যেরূপ নিশ্চিত, মৃত ব্যক্তির জন্মও সেইরূপ নিশ্চিত। এবং

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥

—অর্থাৎ বাতাস যেমন পুষ্পাদি আধার হ'তে গন্ধটুকু গ্রহণ ক'রে অন্যত্র চলে যায়, সেইরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ জীবাত্মা যখন এক দেহ ত্যাগ ক'রে অন্য দেহ আশ্রয় করেন, তখন মন বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্টি যে সূক্ষ্মদেহ সেইটুকু সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, সূক্ষ্ম কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চক, পঞ্চ বায়ু এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত দেহকে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ বলে। লিঙ্গ শরীরযুক্ত জীবাত্মা যতদিন পর্যন্ত ঐ দেহ হ'তে নিষ্কৃতি না পান, ততদিন তাঁর মুক্তি নেই।

প্রথমেই একটা প্রশ্ন উঠছে : আত্মা বা জীবাত্মা ব'লে কিছু আছে কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসা এই যে—স্থূলদেহটি জড় পদার্থ, চেতনের সংস্পর্শ ব্যতীত উহা কোন কাজ করতে সক্ষম হয় না, যেমন একটি যন্ত্র একজন চেতন পরিচালক ব্যতীত ক্রিয়াশীল হ'তে পারে না। যন্ত্রের উপাদানগুলি যন্ত্রকে চালিত করতে পারে না, সেইরূপ দেহের রক্ত, মাংস, হাড় প্রভৃতি উপাদান মিলিত হ'য়ে দেহকে ক্রিয়াশীল করতে পারে না। যদি বলা যায় যে ঐ গুলির মিলন সাধিত হ'লেই দেহ আপনা হ'তে কাজ করতে সক্ষম হয়, যেমন যন্ত্রের আগুন জল কলকব্জা প্রভৃতি সম্মিলিত হ'লে যন্ত্রটি আপনা হ'তেই চলে—তাও নয়। কারণ—আগুন, জলাদির সংযোগসাধন যেমন একজন চেতন ব্যক্তি ব্যতীত সম্ভব হয় না; সেইরূপ হাড়, মাংস, রক্ত প্রভৃতির সংযোগসাধন হলেই তাদের দ্বারা কোন কার্য সিদ্ধ হ'তে পারে না, যদি না চেতন জীবাত্মা দেহে মূল পরিচালকরূপে থাকেন। অতএব জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক। জীবাত্মা চেতন, নিরাকার ও জ্ঞানস্বরূপ, তার অসীম ও অনন্ত অস্তিত্ব থাকতে পারে; কিন্তু যা আকৃতিবিশিষ্ট, অজ্ঞান ও অচেতন, তার অস্তিত্ব অনুভূত হ'লেও তার কোন স্থিরতা নেই; তার অস্তিত্ব আগে ছিল না, পরেও থাকবে না, তা অচিরস্থায়ী।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে দেহ যেমন সৃষ্ট পদার্থ, জীবাত্মাও সেইরূপ প্রতি দেহভেদে একটি একটি হিসাবে সৃষ্ট বস্তু হবেন না কেন? মানুষ যখন ম'রে যায় তার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জীবাত্মারও মৃত্যু হোক না কেন? এইরূপ সংশয়ের উত্তর এই যে জীবাত্মা জড় বস্তুর ন্যায় সৃষ্ট পদার্থ নন। যার সৃষ্টি হয়, তারই ধ্বংস অনিবার্য, অবশ্য এই ধ্বংস শব্দের অর্থ অবস্থান্তর-প্রাপ্তি বা শেষ পর্যন্ত কারণ-অবস্থায় প্রত্যাবর্তন। জীবাত্মা চেতন-বস্তু, চেতনের আত্যন্তিক ধ্বংস সম্ভব নয়। আর জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহে একটি একটি হিসাবে বহুও নন্। একই পরমাত্মা অসংখ্য অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় বহু ব'লে মনে হয়, বস্তুতঃ আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, আত্মাই পরমাত্মা। অখণ্ড অসীম আকাশ, বিভিন্ন ঘটে ঐ এক ও অদ্বিতীয় আকাশের কিছু কিছু যেন খণ্ডাকারে অবস্থিত ব'লে মনে হয়। কিন্তু আকাশকে খণ্ড খণ্ড করা কি সম্ভব? তা হয় না! ঘটটি নষ্ট হ'লে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশের সঙ্গে এক হ'য়ে যায়, মহাকাশের সত্তা পায়, সেইরূপ 'আমি স্বতন্ত্র জীব' এইপ্রকার বুদ্ধিরূপ ঘট বিনষ্ট হ'লে, ব্যক্তি-চেতনা লুপ্ত হ'লে জীবাত্মা পরমাত্মার সত্তা পায় বা পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ করে। এ-কেই শাস্ত্রে মুক্তি বা মোক্ষ বলে।

আবার যদি বলা হয় যে জীবাত্মার অস্তিত্ব না হয় স্বীকার করা গেল, কিন্তু একথা তো বললেই চলে যে এক জীবাত্মা এক দেহকে এই প্রথম ও এই শেষ বারের জন্য গ্রহণ করলেন। কোন কোন ধর্মে এইরূপ মতবাদই স্বীকৃত। আত্মা আর আসবেন না, আর দেহ ধারণ করবেন না ও পূর্বেও করেননি? এই প্রশ্নের উত্তরে আত্মার জন্মান্তর-গ্রহণের পক্ষে যুক্তিগুলি আমাদের আলোচনা করতে হবে। 'একোঽহং বহু স্যাম্' এই শ্রুতি-বাক্য হ'তে আমরা বুঝি যে এক সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা তাঁর মায়া-শক্তিকে আশ্রয় ক'রে অনাদি কাল হ'তে সংখ্যাতীত বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে অর্থাৎ বুদ্ধি বা অন্তঃকরণকে আশ্রয় ক'রে সংখ্যাতীত ব্যষ্টি-জীব-রূপে জগতে সুখদুঃখ ভোগ করছেন। এই ব্যষ্টি-জীব ক্ষুদ্রতম কীটাণুর শরীর থেকে ক্রম-বিকাশের নীতি অনুসারে প্রাণিশ্রেষ্ঠ মনুষ্য-দেহ ধারণ করেন। পূর্ব জন্মের কর্ম ও সংস্কার অনুসারে তিনি বর্তমান জীবনে সুখদুঃখ ভোগ করেন ও তাঁর মনে নতুন সংস্কার গঠিত হয়। আমরা এই মুহূর্তে যেরূপ মনোভাবাপন্ন তা নিশ্চয়ই আমাদের অতীত চিন্তার ও কর্মের ফলস্বরূপ। অতীতের সত্তা স্বীকৃত না হ'লে বর্তমানের সত্তা স্বীকার করা যায় না। অতীত বর্তমানকে উৎপন্ন করছে। অতীত কারণ, বর্তমান কার্য। অতএব এই সিদ্ধান্তে আমাদের আসতে হচ্ছে যে আমরা পূর্বে ছিলাম, এবং যেহেতু আমরা পূর্বে ছিলাম, সেহেতু আমরা পরেও থাকব, অতএব আমরা অনাদি কাল হ'তে আছি ও অনন্তকাল পর্যন্ত থাকব। আত্মা বলতে তাই বুঝায় যা অনাদি ও অনন্ত, কোন কালে যাঁর সত্তার ব্যতিক্রম হয় না। আমরা যে বর্তমানে সুখ ও দুঃখ ভোগ করছি, তা নিশ্চয়ই আমাদের অতীত জীবনের কার্যের ফলস্বরূপ।

এই কার্যকারণ-সম্বন্ধকে বাদ দিলে কোন মীমাংসায় পৌছানো যায় না। জন্মমাত্র শিশু যে সুখদুঃখ ভোগ করে, তা নিশ্চয়ই তার এই জন্মের কোন কৃতকর্মের ফল নয়, পূর্বজন্মের কোন কর্মের ফলস্বরূপ, কারণ এ জন্মে তার এমন বয়স হয়নি, যে বয়সে ঐ ফল-লাভের উপযোগী কোন কর্ম সে নিজের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় করতে পারে। কোন কারণ নেই, অথচ শিশুটি দারুণ দেহকষ্ট ভোগ করছে বা পরমসুখে কাল কাটাচ্ছে, কোন মতেই তা স্বীকার করা যায়না। এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করলে

যে দোষ হয়, তাকে বলে 'অকৃতের অভ্যাগম'। অর্থাৎ কোন কারণ নেই অথচ ফল এসে উপস্থিত হ'ল। আবার ঠিক মৃত্যুর প্রাক্কালে কোন ব্যক্তি হয়তো বিশেষ পুণ্যজনক বা উৎকট পাপজনক কোন কাজ ক'রল; মৃত্যুর সঙ্গেই যদি সব ফুরিয়ে যায় তো ঐ পুণ্য বা পাপ কাজের কোন ফলই উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা থাকে না। এরূপ হ'লে যে দোষ হয়, তাকে বলে 'কৃতনাশ'—অর্থাৎ কাজ করা হ'ল, কারণ হ'ল, কিন্তু তার কোন ফল উৎপন্ন হ'ল না। অতএব যুক্তির শুভ্র আলোকে স্পষ্টই প্রতিভাত হচ্ছে যে কর্ম ও বাসনাসংস্কারসমষ্টি-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর-বিজড়িত জীবাত্মা পূর্ব পূর্ব জন্মে অনুষ্ঠিত কর্মের ফল ভোগ করার জন্য পূর্বসংস্কার-অনুরূপ মনোবৃত্তি নিয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রারব্ধ কর্ম ও সংস্কার ব্যতীত মানুষের যে 'অহং' বা 'আমি' বুদ্ধি আছে তার সাহায্যে তিনি বর্তমান জন্মের পুরুষকার প্রয়োগ করেন ও তার ফলে সংস্কার বা মনোবৃত্তির উন্নতি সাধন করতে পারেন, এমনকি তাঁর সঞ্চিত কর্মকে বিনষ্ট করতেও সক্ষম হন। যখন তাঁর সঞ্চিত কর্ম-সমষ্টি বিনাশ পায়, তখন তিনি 'জীবন্মুক্তি' করেন, তবে প্রারব্ধকর্ম ভোগ-ব্যতীত বিনষ্ট হয় না, এই কারণে তাঁর দেহ ততদিন থাকে, যতদিন না ঐ প্রারব্ধকর্মের ভোগ শেষ হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রবল প্রারব্ধ-জন্য যে সকল কর্ম করেন, তার আর ফল উৎপন্ন হয় না। সঞ্চিত কর্ম যা থাকে তা যেন তূণস্থ বাণ, ইচ্ছা করলে ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রারব্ধকর্ম ধনুর্মুক্ত বাণের ন্যায়, উহার গতি রোধ করার কোন উপায় নেই। তবে ঐ কর্মেরও বেগ গুরু-কৃপায় কিছু প্রমশিত হ'তে পারে; যেমন হয়তো উপর থেকে হঠাৎ পতিত কোন পদার্থের সংঘর্ষ-জন্য, বায়ু বা বৃষ্টিহেতু ধনুর্মুক্ত বাণের গতি মন্দীভূত হ'য়ে গেল।

দেখা যায় একই সময়ে জাত, একই পরিবারে একই পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত দুটি শিশুর সংস্কার বা মনোবৃত্তি দুই প্রকার। একটি সরল, দয়ালু, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সঙ্গীতপ্রিয়; অপরটি তার বিপরীত সংস্কারসম্পন্ন। এই পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হবে—পূর্ব জন্মের কর্মফল। মনোবৃত্তি হঠাৎ গঠিত হয় না, অভ্যাসের দ্বারা গঠিত হয়। যে প্রকার চিন্তা ও কাজ মানুষ করে ও দীর্ঘদিন করতে থাকে, তদনুযায়ী মনোবৃত্তি গঠিত হ'য়ে যায়। এই অভ্যাসটি পরে স্বভাবে পরিণত হয়। পূর্ব জন্মে জীবাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ-বিষয়ে মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য একটি প্রবল যুক্তি। পূর্বের অস্তিত্ব স্বীকৃত না হ'লে মানুষের কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভও সম্ভব হয় না। হঠাৎ কোন বিষয় সম্বন্ধে কেহ জ্ঞানলাভ করতে কখনও সক্ষম হয় না। কারণ কোন বিষয়ে যখন কেহ জ্ঞানলাভ করে, তখন সে তার পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে তা মিলিয়ে নিয়ে পরে ঐ জ্ঞান সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই সকল প্রবল কারণ-বশতঃ পূর্বজন্ম স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য ও সংস্কারের বিভিন্নতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে কেহ কেহ বলেন পিতামাতা বা পূর্বপুরুষগণের মনোবৃত্তির পার্থক্য-জন্য সন্তানগণের সংস্কারের পার্থক্য ঘটে থাকে। কর্মফল সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে জাতকদের মধ্যে কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী হয়। এই দুটি যুক্তির কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। পিতামাতা প্রভৃতি হ'তে উত্তরাধিকার-সূত্রে শিশু মনোবৃত্তি লাভ করেছে যদি বলা যায়, তো তার উত্তরে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যায়: যমজ শিশুদ্বয়ের জীবন ও চরিত্র

পৃথক হয় কেন? কোন বিশেষ শিশুই বা ঐরূপ পিতামাতার ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ ক'রল কেন এবং অপরেই বা ক'রল না কেন? তাদের ঐরূপ জন্মলাভের নিশ্চয়ই অন্য কারণ আছে, যা শিশু তার পূর্ব পূর্ব জন্মে স্বয়ং অর্জন করেছে। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধেও এই একই প্রশ্ন করা যায়। অতএব পিতামাতা কর্মফল-ভোগের সহায়ক মাত্র এবং গ্রহনক্ষত্রও শিশুর ভাবী জীবনের সুখদুঃখের পূর্বাভাস দেয় মাত্র। অর্থাৎ এগুলি জীবের মনোবৃত্তি (বা সংস্কার) ও সুখদুঃখের হেতু নয়।

মানুষ দেহ-সাহায্যে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে। আসল ভোক্তা পাশবদ্ধ জীবাত্মা, কারণ দেহ জড় পদার্থ, তার উপলব্ধিশক্তি থাকতে পারে না। দেহের মাধ্যমে জীবাত্মাই সুখদুঃখ ভোগ করেন। তবে কোন্ কর্মের ফলে কোন্ সুখটি উপস্থিত হ'ল ও কোন্ কর্মের ফলে কোন্ দুঃখটি উপস্থিত হ'ল, তা সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝবার কোন উপায় নেই। একমাত্র যোগিগণ—যাঁরা তাঁদের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে যোগবলে জ্ঞানলাভ করেছেন, তাঁরাই নিজেদের সম্বন্ধে উক্ত প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ। মহাপুরুষগণ অপরের জীবনের অতীত বিষয়াদিও ইচ্ছা করলে অবগত হ'তে পারেন। অতএব আত্মার জন্মান্তর-গ্রহণ একটা কল্পনামাত্র নয়, উহা অনুভূত এবং বাস্তব সত্য।

কেহ কেহ বলেন—এত তর্ক-বিচারের প্রয়োজন কি? বললেই তো হয় যে যিনি সৃষ্টিকর্তা সেই ঈশ্বরই কাকেও সুখী করেছেন, কাকেও বা দুঃখী করেছেন; কাউকে তিনি অন্ধ বা খঞ্জ করেছেন, আবার কাউকে চক্ষুমান্ ও পদযুক্ত করেছেন। এই মতকেও সঙ্গত বলা যায় না। ঈশ্বর পরমপ্রেমস্বরূপ, তিনি সকলের প্রতি সমান কৃপালু। জীবের মধ্যে পার্থক্যসৃষ্টির জন্য তাঁকে যদি দায়ী করা যায়, তো তাঁকে বলতে হয় নিষ্ঠুর ও পক্ষপাতিত্ব-দোষদুষ্ট। কিন্তু তিনি ঐ দুই দোষে দুষ্ট নন ও তিনি খামখেয়ালীও নন। অতএব স্বীকার করতেই হবে যে জীবই তার অদৃষ্টের গঠনকর্তা; যে যেমন কাজ করে, সে সেইরূপ ফলভোগ করে। ঈশ্বর কেবল কর্মফলদাতা মাত্র। জীবের সুখদুঃখের জন্য তিনি দায়ী নন, জীব নিজেই দায়ী—এই মতবাদ স্বীকার করলে মানুষই তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে, এ অদৃষ্টবাদ নয়।

জন্মান্তরবাদই জীবনের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে, জন্মান্তর স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সভ্যতার আদিজননী ভারতে সুপ্রাচীন কাল হ'তে এই ন্যায়ানুমোদিত অকাট্য মতবাদ সকল দ্বন্দ্বের নিরসন জন্য স্থির সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হ'য়ে আসছে। যুক্তি-পরিষ্কৃত বুদ্ধি ব্যতীত এই সূক্ষ্ম রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। যোগজ দৃষ্টি ব্যতীত দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুভূতিও অসম্ভব।

'শ্রীম'-সকাশে

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ সেন

১৫ই জুন, ১৯৩১—মাষ্টার মহাশয় তখন ৫০, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে মর্টন ইনস্‌টিট্যুশনে চার তলার উপরের ঘরে থাকেন। সেখানকার ছাদ হইতে আশে-পাশের কোনও স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, আর সামনে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ। সন্ধ্যার একটু আগে পৌছিয়া দেখি মাষ্টার মহাশয় ছাদে বেড়াইতেছেন। প্রণাম করিলে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন: দেখুন—ভক্তদের ঠাকুর বলতেন, 'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান'; তিনি ভাগবত শাস্ত্র, তিনিই ভক্ত, আবার তিনিই ভগবান হয়েছেন। গীতায় আছে —হাজার অন্যায় করেও যদি কেউ অনন্যচিত্ত হ'য়ে তাঁর ভজন করে তা হ'লে তার সমস্ত পাপ খণ্ডন হ'য়ে যায়।

শ্রীভগবান আরও বলেছেন,—'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' ভক্ত কি কম জিনিস? ভক্ত কত বড়—তা সে নিজে জানে না।

একজন ভক্ত—না জানাই ভাল, জানলে আবার অহঙ্কার হবে।

শ্রীম—তা হবার জো নেই। যে ভক্ত, তার অহঙ্কার হয় না; ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিতেন পোড়া দড়ির, দেখতে দড়ির মতো, কিন্তু ফুঁ দাও, উড়ে যাবে।

—আহা! আজ দুপুর বেলায় মেঘের কি চমৎকার শোভাই না হয়েছিল! একজন সাধু মেঘ দেখে কেবল নৃত্য করতেন। কেননা, তিনিই সব হ'য়ে রয়েছেন কিনা,—'খং বায়ুর্জ্যোতিরাপ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।'

আর একটি সাধু হিমালয়ের একটি জলপ্রপাত দেখে বলেছিলেন, আহা! কি জিনিসই করেছ। জলপ্রপাত দেখে তাঁর ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়েছে!

আজ একটি মেম ভক্ত দারজিলিঙ থেকে এক চিঠি লিখেছেন, "I wish you would enjoy the cold weather here." ওদেশের লোক কিনা—তাই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ক'রে সারা হয়। আমাদের দেশের লোক জানতে চায়, পাহাড় দেখে কেমন উদ্দীপন হয়। ঠাকুর তখন কাশীপুরের বাগানে, একটি ভক্ত দারজিলিঙ থেকে ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিগো, উদ্দীপন হয়েছিল তো? শিলিগুড়ি থেকে যখন গাড়ী উপরে উঠছিল, তখন ভক্তটির চোখ দিয়ে আপনা আপনি জল পড়েছিল। কেন যে জল পড়ছে সেকথা সে বুঝতে পারেনি। ঠাকুর যখন জিজ্ঞাসা করলেন উদ্দীপনের কথা—তখন তার মনে হয়েছিল, ও! এই কারণে চোখে জল পড়েছিল। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।" তিনিই হিমালয় হয়ে রয়েছেন। —লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তিনি বলিলেন, আসুন সব আমাদের ঘরের ভিতরে আসুন—আমাদের সব 'Gods' দেখে যান। এই বলে ভক্তদের ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও কুম্ভমেলা হইতে আনীত সব ছবি দেখাইলেন। ঘর হইতে বাহির হইবার পথে দেওয়ালে রক্ষিত একটি কীর্তনের খোলে দু-একটি টোকা মারিয়া, ছাদে আসিয়া উত্তর দিকে টবে সাজানো তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া একটু ধ্যান করিতে বসিলেন। ভক্তেরাও তাঁর পাশে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরে মাস্টার মহাশয় বলিতেছেন:

"তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ"

—তিনিই সূর্য-রূপে তাপ দেন, তাপ দিয়ে পৃথিবীর সব জল শোষণ ক'রে নেন; পরে বর্ষায় আবার সেই জল ঢালেন।

এই দেখুন না, গরমেতে একেবারে সব হাহাকার প'ড়ে গেছল—আবার কেমন বর্ষা প'ড়ে গেল। এখন আবার কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। একেবারে সোজাসুজি না রেখে, কেমন পৃথিবীটিকে একটু বাঁকাভাবে রেখেছেন, যার ফলে সব ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, তারপর শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত আসছে।

এ তো গেল সব বাইরের কাণ্ডকারখানা—তারপর ভেতরের কাণ্ডকারখানাটি একবার দেখুন। মানুষ বা অন্যান্য জীবজন্তু তৈরী করেছেন, বাহিরে হাত, পা, কান, নাক, চোখ আবার শরীরের ভিতরে—heart, spleen, liver, nervous system, consciousness, perception. নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবো বলে আগে থেকে তিনি কেমন বাতাস তৈরী করেছেন, একবার তিনি হাওয়াটা টেনে নিন দেখি, তারপর আমাদের free-will (স্বাধীন ইচ্ছা) কোথা থাকে দেখা যাবে।

এই তো গেল হাওয়ার কথা। তারপর খাদ্য! সকালবেলায় ব্রেকফাষ্ট, তারপর লাঞ্চ, পরে আবার বড় খাওয়া 'ডিনার' আছে। এই সব করলে তবে দেহ থাকবে। তবে গোঁফে চাড়া দেওয়া চ'লবে। না হ'লে কোথায় কি থাকবে?

আবার নিদ্রা করেছেন। সমস্ত দিন পরিশ্রম ক'রে– শরীর অবশ হ'য়ে প'ড়ল, রাত্রে নিদ্রা। অমনি সকালবেলায় refreshed (সতেজ)।

সকালে উঠে দেখি রাস্তার ফুটপাথে সারি সারি লোক ঘুমুচ্ছে। পুলিশ বা মিউনিসিপ্যালিটির লোক যায়, কেউ কিছু বলে না, কারণ জানে সকলেই ঘুমের বশীভূত।

আবার দেখুন, সূর্য সকাল বেলায় পূর্ব দিকে ওঠেন। এইটিই কি একটি কম miracle (আশ্চর্য) না কি? রোজ রোজ এ ব্যাপারটা ঘটে বলে তত কিছু আশ্চর্য মনে হয় না। আচ্ছা, যখন সূর্য প্রথম দিন ওঠে সেদিনের অবস্থা একবার ভাবুন দেখি! গুরুবাক্যে বিশ্বাস থাকা চাই।

মা বলে দিয়েছেন ছোট ছেলেকে ও তোর দাদা। ছেলের এমন বিশ্বাস হ'ল যেন মার পেটের ভাই। তার সঙ্গে এক পাতেই খেতে ব'সে গেল। তা সে কামারই হোক বা অন্য কোনও জাতেরই লোক হোক। সাধনের সময় যে যা বলেছে সরল বিশ্বাসে ঠাকুর তাই করেছেন।

একজন ভক্ত—তিনি বলতেন, আগে কিছু কর না কেন, তারপর কেউ বলে দেবে, 'এই এই।'

মাষ্টারমশাই—তার মানে ও নয়। তিনি যে ভাবে বলেছিলেন, তার মানে তখন বুঝতে পারা যায় নাই; 'এই এই' মানে হচ্ছে তিনি নিজে, সেই বাক্যমনের অতীত যিনি—তিনিই রূপ ধারণ ক'রে এসেছেন সেই মূর্তিতে। এই হচ্ছে মানে। বিশ্বাস করলে আর বিচারবুদ্ধি আসে না

আমরা এক গল্প শুনেছি তাঁর কাছে: 'এক জন মেয়ে নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞানী মনে করতেন। হিল উঁচু জুতা পরেন, মোজা পরেন, দেবদেবী মানেন না। এমন মায়ের ছেলের খুব অসুখ হয়েছে। প্রথমে সিভিল সার্জনকে দেখানো হ'ল। তারপর ভাল হোমিওপ্যাথী ডাক্তার, শেষে কবিরাজীও বাদ গেল না। ছেলের কিন্তু অসুখ সারবার নাম নেই। বরং ক্রমশঃ খারাপই হ'তে লাগল। তখন তাঁর এক আত্মীয়া বললেন, 'দিদি, তুমি এত ডাক্তারপাতি তো দেখালে, এক কাজ করতে পার? একবার ৺তারকেশ্বরে হত্যা দিতে পার? আমার মনে হয় তোমার ছেলে সেরে উঠবে।' তখন সেই ব্রহ্মজ্ঞানী মা জুতা-মোজা ফেলে তারকেশ্বরে হত্যা দিতে ছুটলেন। আর বিচার এল না। ৺কৃপায় ছেলে সেরে উঠল।

ঐ রকম বিশ্বাস হ'লে তবে তো হবে। বিশ্বাস করতে হবে, 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'রূপে তিনিই রয়েছেন সকলের হৃদয়ে।

ধর্মসংস্কারক রামমোহন

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়

রামমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে প্রথমেই আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে পরবর্তী যুগে একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিচিত হলেও তিনি নিজে কোন দিন এ দাবি করেননি যে হিন্দুসমাজ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোন সম্প্রদায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। একমাত্র গায়ত্রী-মন্ত্রের সাহায্যেই তিনি ব্রহ্মোপাসনার বিধান দিয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের ভিতর সর্বাধিক সম্মানিত বেদান্তকেই তিনি তাঁর দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন, এবং বেদান্তের ভাষ্যরচনায় নিজস্ব কোন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত না ক'রে অদ্বৈতবাদী শঙ্করের ব্যাখ্যাই তিনি অনুসরণ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর রচিত 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহিদ্দিন্' ও ব্রাহ্মসমাজের দলিলপত্র পাঠে সন্দেহ হতে পারে যে অদ্বৈতবাদের চেয়েও একেশ্বরবাদের প্রতিই তিনি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু অদ্বৈত-বাদীর পক্ষে চরম আত্মজ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত একেশ্বরবাদী হওয়া হিন্দুদর্শন অনুসারে অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক নয়। রামমোহনের একেশ্বরবাদে বিশ্বাস যে অন্ততঃ আংশিকভাবে ইস্‌লাম ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, এ কথা স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রী স্বীকার করেছেন। খৃষ্টধর্মের প্রতিও রাম-মোহনের শ্রদ্ধা ছিল গভীর। বিশেষতঃ খৃষ্টের উপদেশাবলীর মধ্যে যে নীতিকথা রয়েছে, মানুষের চরিত্র ও ধর্মবুদ্ধি উন্নত করার পক্ষে তার উপযোগিতা তিনি চিরকাল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। অবশ্য প্রচলিত খৃষ্টধর্ম হতে তাঁর ব্যবধান প্রচলিত হিন্দুধর্ম হতে ব্যবধানের মতই ছিল দুর্লঙ্ঘ্য। এমনকি খৃষ্টান একেশ্বর-বাদও তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেননি। ১৮২৯ খৃঃ ২২শে জানুআরি অ্যাডাম ডাঃ টাকারম্যান্‌কে এক পত্রে লেখেন:

> "The conviction has lately gained ground in my mind that he (Rammohon) employs Unitarian Christianity...as an instrument for spreading pure and just notions of God without believing in the divine authority of the Gospel."

জগতের সব কয়টি প্রধান ধর্মের মূল কথা একেশ্বরবাদ—রামমোহন এ সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। এই একেশ্বরবাদ ভিন্ন অন্য যা কিছু বিভিন্ন ধর্মে স্থান পেয়েছে, সেগুলি তাঁর মতে ধর্মের বহিরঙ্গ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির নিজস্ব প্রয়োজনে সেগুলির সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। এই একেশ্বরবাদের ভিত্তিতেই যে জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মিলন ও পারস্পরিক আদানপ্রদান সম্ভব, তা তিনি বুঝেছিলেন। এ বিষয়ে রামমোহনের দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। রামমোহন ছিলেন যুক্তিবাদী, সব সময়েই তিনি যুক্তিকে সংস্কারের উপর স্থান দিতেন। অবশ্য মানুষের যুক্তি যে সব সময় অভ্রান্ত নয়, একথা তিনি মানতেন এবং যুক্তি ও শাস্ত্রের মধ্যে সমন্বয়-সাধনই যে বিবেকী ব্যক্তির কর্তব্য—একথাও তিনি কেনোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় বলেছেন। বিলাতপ্রবাস-কালে রামমোহনের কর্মসচিব ছিলেন স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট। ১৮৩৩ খৃঃ নভেম্বর মাসে এশিয়াটিক জার্নাল পত্রিকায় প্রকাশিত রামমোহনের এক

জীবনীতে আর্নট লিখেছেন : শেষজীবনে রামমোহনের মনে সন্দেহ জেগেছিল—শুধু যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্মমত সমাজের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে কিনা। রামমোহনের প্রথম যুগের রচনায় যে সামান্য সংশয়বাদের চিহ্ন দেখা যায়, পরবর্তীকালে তা একেবারেই চলে গিয়েছিল। শেষজীবনে তিনি মনে করতেন, অতিরিক্ত অবিশ্বাসের চেয়ে বরং অন্ধ বিশ্বাস সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। স্বদেশে এবং ইংলণ্ডে নাস্তিক যুবকবৃন্দের উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপ লক্ষ্য ক'রে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। কলকাতার সরকারী হিন্দু কলেজে ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় তিনি স্কটিশ মিশনের নেতা আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌কে 'জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ্‌ ইন্‌ষ্টিটিউশন' নামে এক নূতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে উৎসাহিত করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল কোন ধর্মশিক্ষা না পাওয়ার চেয়ে ছাত্রদের বরং খৃষ্টধর্ম শিক্ষা পাওয়া ভাল। সকল ধর্মের মধ্যেই কিছু লৌকিক অনুষ্ঠান থাকা প্রয়োজন—এ কথাও রামমোহন স্বীকার করতেন, কিন্তু সে সব অনুষ্ঠান যতদূর সম্ভব সরল হওয়া উচিত, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। আর নিষ্ঠাবান বৈদান্তিক হিসাবে প্রতিমা-উপাসনাকে তিনি জীবনে কোনদিনই গ্রহণ করতে পারেননি। জাতিভেদ-প্রথা ও পুরোহিত-তন্ত্রের নিন্দায় রামমোহন চিরদিন ছিলেন মুখর। জাতিভেদ-প্রথার বিরোধী একটি সংস্কৃত গ্রন্থ 'বজ্রসূচী'র বঙ্গানুবাদও তিনি প্রকাশ করেন ১৮২৭ খৃঃ। কিন্তু সমাজের সংস্কার করতে হ'লে সমাজের ভিতরে থাকা যে একান্তই প্রয়োজন, তা রামমোহন বুঝেছিলেন। সেইজন্যই মৃত্যুর সময়েও তাঁর স্কন্ধে ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত অটুট ছিল এবং মৃত্যুর পরে যেন খৃষ্টান মতে তাঁর সমাধি না দেওয়া হয়, সে বিষয়ে তিনি বারবার নির্দেশ দিয়ে যান। ফরাসীরাজ লুই ফিলিপ তাঁর সম্বর্ধনার জন্য যে দুটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন রামমোহন তাতে উপস্থিত থেকেও কোন 'অভক্ষ্য' ভক্ষণ করেননি। ব্রাহ্ম-সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা-সভায় যে স্থানে বেদপাঠ হ'ত সেস্থানে শূদ্রের প্রবেশাধিকার তিনি দেননি, কারণ তাহলে সমাজে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে—এ আশঙ্কা তাঁর ছিল। অবশ্য তাঁর উপদেশ ও আচরণের মধ্যে এই অসঙ্গতি যে কিছু পরিমাণে তাঁর আন্দোলনকে দুর্বল ক'রে দিয়েছিল, সে কথাও অস্বীকার করলে চলবে না। ব্রাহ্ম উপাসনা-সভায় শূদ্রদের যে বেদপাঠ শ্রবণের অধিকার ছিল না—বিদেশী 'জন বুল' পত্রিকার দৃষ্টিতেও তা ধরা পড়েছিল—(জন বুল—১৮২৮, ২৩শে আগষ্ট)

ধর্মসংস্কারক হিসাবে রামমোহনের প্রকৃত স্থান কি এবং তাঁর সাফল্যের পরিমাণ কতটুকু, এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কারের ইতিহাসে রামমোহনের প্রধান কৃতিত্ব বাংলাদেশে বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বেদান্তের ব্যাখ্যা প্রচার করেন। তাঁর বেদান্তের ভাষ্যগুলি অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছিল এবং এই সব ধর্মগ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে বাংলাদেশে কোন দিনই বেদান্তের চর্চা একেবারে লোপ পায়নি। ১৮২৪ খৃঃ জানুআরি মাসে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজেও প্রথম হতে প্রায় কুড়ি বৎসর বেদান্ত অধ্যাপনার জন্য একটি পৃথক শ্রেণী ছিল। আরও স্মরণ রাখা উচিত যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ দেশে বেদ-

বেদান্ত চর্চার যে নূতন আগ্রহ দেখা যায়, তার পশ্চাতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার-সাফল্যের প্রেরণাও কম ছিল না। রামমোহন প্রচলিত হিন্দুধর্মের বহু কুসংস্কারকে আঘাত করেছিলেন এবং ধর্মের ক্ষেত্রে অন্ধ বিশ্বাসকে দূর করতে তাঁর আন্দোলন কিছুটা সাহায্য করেছিল। তবে রামমোহনের ধর্মের মূলকথা—'একেশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা বর্জন' বাংলাদেশের হিন্দুসমাজ আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি; বহু দেবদেবীর উপাসনা ও মূর্তিপূজা আজও এ সমাজে প্রায় পূর্বের মতই প্রচলিত।

বৃহত্তর হিন্দুসমাজের কথা বাদ দিলেও রামমোহনের ধর্মবিশ্বাস যে তাঁর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীকেও বিশেষ প্রভাবিত করেছিল, এ কথা মনে করা যায় না। রামমোহনের পত্নীদের ধর্মবিশ্বাস কি ছিল, তা জানবার কোন উপায় আজ আর নেই। কিন্তু তাঁর পুত্র রাধাপ্রসাদ যে তাঁর জীবদ্দশাতেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর দুর্গোৎসবে যোগদান করতেন, তা আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী থেকে জানতে পারি। রামমোহনের আর এক পুত্র রমাপ্রসাদ ব্রাহ্ম-সমাজের অছি নিযুক্ত হয়েও মাতৃশ্রাদ্ধে পৌত্তলিকতার চরম করেছিলেন—'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় তার কৌতুকপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরও যে ব্রাহ্মধর্ম ভাল বুঝতেন না, সে কথা দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'রামমোহন-স্মৃতিকথা'য় স্বীকার করেছেন।[১]

দেবেন্দ্রনাথ অতিরিক্ত ব্রহ্মচিন্তা করলে তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি কমে যাবে, এ ভয় দ্বারকানাথের যথেষ্ট ছিল। রামমোহনের অপর এক বন্ধু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাকাল হতেই তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, কিন্তু তিনি ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন সংশয়বাদী এবং রামমোহন এজন্য তাঁকে 'rustic philosopher' আখ্যা দিয়েছিলেন। রামমোহনের অন্যতম শিষ্য নন্দকিশোর বসু বাহ্য আচার-আচরণে বৈষ্ণব ছিলেন, একথা তাঁর পুত্র রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' হতে আমরা জানতে পারি। রামমোহন যাঁদের উপর ব্রাহ্ম-সমাজের পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন তাঁরাও কতদূর তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মজীবনী'র একস্থানে লিখেছেন, 'আবার এক সময় দেখি যে সেই ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের অবতার হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছেন।...আমি বেদী হইতে অবতারবাদের বর্ণনা নিবারণ করিলাম।' (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৬)

যে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের মৃতপ্রায় ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জীবন দান করেন, তাঁর ধর্মবিশ্বাসও যে রামমোহনের ধর্মবিশ্বাস হতে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল, একথা সর্বজনবিদিত। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করতে পারেননি এবং খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। মোটের উপর একথা স্বীকার করতেই হবে যে রামমোহনের ব্রাহ্ম আন্দোলন কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের ইংরেজী-শিক্ষিত নূতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশকে প্রভাবিত করেছিল এবং এই সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যেও এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল নিতান্তই অগভীর। পরোক্ষভাবে এই আন্দোলন বরং হিন্দুসমাজকেই সাহায্য করেছিল ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণের প্রবণতাকে রোধ ক'রে।

[১] Rammohon Roy by Debendra Nath Tagore, in 'The Father of Modern India'—Rammohon Roy Centenary Celebration Volume.

রামমোহনের ব্রাহ্ম আন্দোলনের এই সীমাবদ্ধ প্রভাবের কারণ বিশ্লেষণ করলে অবশ্য প্রথমেই এর জন্য দায়ী করতে হবে হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা বা স্থিতিস্থাপকতাকে। হিন্দুসমাজ কোন দিনই যুগধর্মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে স্থির থাকতে পারেনি, রামমোহনের বহু আদর্শকেই সে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু তাঁর ধর্ম-আন্দোলনের দুটি মূল কথা—একেশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা-বর্জন—সে আজ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের ফলে এ সম্ভাবনার সামান্য অবশেষটুকুও বিলুপ্ত হয়। এ থেকে অবশ্য এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না যে হিন্দুসমাজ একেশ্বরবাদ ও নিরাকার-উপাসনার বিরোধী। হিন্দুধর্মে অধিকারীভেদে উপাসনা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ। তাই মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাধকের জন্য একেশ্বরবাদ ও নিরাকার-উপাসনার বিধান দিয়ে সমাজের সাধারণ লোকের জন্য হিন্দুধর্ম রুচিভেদে বহু দেবদেবীর পূজা ও সাকার-উপাসনার উপযোগিতা স্বীকার করে হিন্দুধর্মের দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে রামমোহনের মতবাদকে একদেশদর্শী বলেই মনে হবে, কারণ সমাজের সব শ্রেণার লোকের প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা এতে নেই। ব্রাহ্ম আন্দোলনের এই সঙ্কীর্ণতা রামমোহনের পরবর্তী যুগে আরও বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে যে দলাদলির সৃষ্টি হয়—সমাজের জনপ্রিয়তা-নাশের তাই মূল কারণ।

কিন্তু হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা ছাড়াও রামমোহনের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার আরও অনেক কারণ ছিল। রামমোহনের জীবনে উপদেশ ও আচরণের অসঙ্গতি—এ আন্দোলনের দুর্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ। ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ ও বিষয়াসক্ত আচরণ—দুএর মধ্যে বিরাট ব্যবধান; এরূপ ক্ষেত্রে উপদেশ কখনও কার্যকরী হয় না।

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য রামমোহন অনেক সময় কুলার্ণব-ও মহানির্বাণ-তন্ত্রের উক্তি উদ্ধৃত করেন। আশ্চর্যের বিষয় রামমোহন পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে হিন্দুসমাজের সমস্ত কুসংস্কার ও জড়তার মূল কারণ বলে নির্দেশ করেন; কিন্তু বামাচারী তান্ত্রিক সাধকরা বাংলায় যে ব্যভিচারের প্লাবন ঘটিয়েছিলেন, তার নিন্দা কোথাও করেননি। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর প্রভাবে রামমোহন যে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তী কালে দিল্লী শহরে হরিহরানন্দের এক শিষ্য সুখানন্দ স্বামীর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় হয়। সুখানন্দ স্বামী তাঁকে বলেছিলেন, আমি এবং রামমোহন উভয়েই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য; রামমোহন রায় আমার মতন তান্ত্রিক ব্রহ্মাবধূত ছিলেন।[২]

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগে (প্রথম সংস্করণ; পৃঃ ১৬৪) লিখেছেন,—'তিনি (রামমোহন) তান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করেন, তান্ত্রিক আচারও স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তান্ত্রিক চরম মতবাদও অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে উহাই দেশের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু তন্ত্রের প্রতি বৈষ্ণব ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রগাঢ় বিদ্বেষ দেখিয়া তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের নামোল্লেখ করেন নাই।' যাই হোক রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবনে গভীর একাগ্র অধ্যাত্মসাধনার বিশেষ কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। রামমোহনের দেশবাসীরা যে তাঁকে সহজে বুঝতে পারেননি, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রামমোহনের দু'একটি আচরণ যে সত্যই প্রহেলিকাময়, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

২ দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত জীবনচরিত, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ১২২।

যে বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচার তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল না। ১৮২৩ খৃঃ ১১ই ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে লিখিত এক পত্রে তিনি সরকারী অর্থে বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা দেবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এই পত্রে তিনি বলেন :

Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines, which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother &c., have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better. ৩

রামমোহনের মুখে এই যুক্তি সত্যই বিস্ময়কর, বিশেষতঃ যখন আমরা স্মরণ করি যে তিনি ঠিক এই যুক্তিই খণ্ডন করেছিলেন তাঁর ১৮১৫ খৃঃ প্রকাশিত 'বেদান্ত-গ্রন্থে'র ভূমিকায়। শেষোক্ত স্থানে তিনি লিখেছেন :

যদি কহ, সর্বত্র ব্রহ্মজ্ঞান করিলে ভেদজ্ঞান আর ভক্ষ্যাভক্ষ্যের জ্ঞান কেন থাকিবেক, তাহার উত্তর এই যে লোকযাত্রা নির্বাহ নিমিত্ত পূর্ব পূর্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষুকর্ণহস্তাদির কর্ম চক্ষুকর্ণহস্তাদি দ্বারা অবশ্য করিতে হয় এবং পুত্রের সহিত পিতার কর্ম, পিতার সহিত পুত্রের ধর্ম আচরণ করিতে হইবেক। যেহেতু এ সকল নিয়মের কর্তা ব্রহ্ম হয়েন, যেমন দশজন ভ্রমবিশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে একজন অভ্রান্ত যদি কালক্ষেপ করিতে চাহে, সেই ভ্রমবিশিষ্ট লোকসকলের অভিপ্রায়ে দেহযাত্রার নির্বাহার্থ লৌকিক আচরণ করিবেক।৪

পরপর উদ্ধৃত এই দুটি রচনা একই ব্যক্তির, এ কথা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন। আমহার্ষ্টকে লিখিত পত্রে রামমোহন অবশ্য তাঁর দেশবাসীর উন্নতির জন্যই ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হোক—এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, কিন্তু তার জন্য বেদান্তের মহিমা এতদূর খর্ব করা তাঁর মতো বেদান্তবাদীর পক্ষে কতদূর ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল? সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হলেও এ ব্যাপারে তিনি যে পথ গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তাঁর অসঙ্গতির পরিচয় পাওয়া যায়।

রামমোহনের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার আর একটি প্রধান কারণ ছিল এই যে তাঁর ধর্মবিশ্বাস ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যুক্তিবাদ মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল ব্যক্তির মস্তিষ্কের ধর্ম, অগণিত জনসাধারণের হৃদয়ের ধর্ম তা হতে পারে না। পরবর্তীকালে এই সত্য উপলব্ধি করেই বোধ হয় কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতারা ব্রাহ্ম আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার জন্য নগর-সংকীর্তন প্রভৃতির আয়োজন করেছিলেন। রামমোহনের মধ্যে প্রকৃত ধর্মগুরুর হৃদয়ের উত্তাপ আমরা লক্ষ্য করি না, লক্ষ্য করি শুধু দার্শনিকের চিন্তাশীলতা। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে যথার্থই বলেছেন :

There was more of the spirit of a cautious philosopher than of the consuming fire of a prophet in him.

স্যাণ্ডফোর্ড আর্নটের উক্তি সত্য হ'লে রামমোহন নিজেও শেষ জীবনে যুক্তিবাদের উপর আস্থা কিছুটা হারিয়েছিলেন। যুক্তিবাদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাও রামমোহনের আন্দোলনকে কিছুটা দুর্বল ক'রে দিয়েছিল। শাস্ত্রজ্ঞানী রামমোহন বহু দেবদেবীর পূজা ও মূর্তিপূজাকে নিম্নস্তরের অধিকারীর উপযুক্ত বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তার ফলে নিরাকার-উপাসনার পক্ষে তাঁর যুক্তি সাধারণ লোকের কাছে আর তত প্রবল মনে হয়নি।

৩ রাজনারায়ণ বসু : হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত। দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত—পৃঃ ১০।

৪ রামমোহন গ্রন্থাবলী, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ বেদান্ত-গ্রন্থের ভূমিকা : পৃঃ ৫—৬।

উপরের আলোচনা হতে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—ধর্মসংস্কারক হিসাবে রামমোহনের প্রকৃত স্থান তাহলে কোথায়? রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী কলেট অবশ্য বলেছেন:

He was above all and beneath all a religious personality. The many and far-reaching manifestations of his prolific energy were forthputtings of one purpose. The root of his life was religion.

পরবর্তীকালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও কলেটের এই উক্তির সমর্থন করেছেন।[৫]

কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই মত আদৌ বিচারসহ নয়। রামমোহন মূলতঃ ছিলেন মানবিকতাবোধ-সম্পন্ন দার্শনিক। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্ তাঁকে "The first really earnest investigator in the science of comparative theology' বলে অভিহিত করেছেন। রামমোহনের জীবনের বহু বিচিত্র রূপের মধ্যে তাঁর এই মানবিকতাবোধ-সম্পন্ন দার্শনিকের রূপটিই বোধ হয় একমাত্র যথার্থ রূপ; কিন্তু ধর্মগুরু বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি রামমোহন আদৌ তা ছিলেন না। প্রাচীন কালের কথা বাদ দিলেও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য প্রমুখ যে সব ধর্মগুরু আবির্ভূত হয়েছিলেন, জনচিত্তের উপর তাঁদের প্রভাব অধিকতর। রামমোহনের জীবনে ধর্মসংস্কার একটি গৌণ উদ্দেশ্য ছিল বলেই মনে হয়, তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমাজ-সংস্কার। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে এদেশে সমাজের সঙ্গে ধর্মের যোগ এত নিবিড় যে সমাজ সংস্কার করতে হ'লে তার ভিত্তিস্থানীয় ধর্মকেও কিছু পরিবর্তন করতে হবে। রামমোহনের এই মনোভাবের কথা তাঁর প্রায় সমসাময়িক কিশোরী চাঁদ মিত্র ১৮৪৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে 'ক্যাল্‌কাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন,

He was a religious Benthamite and estimated the different creeds, existing in the world, according to his notion of their truth or falsehood, but his notion of their utility, according to their tendency to promote the maximization of human happiness and the minimization of human misery.

অর্থাৎ, রামমোহন বিভিন্ন ধর্মের মূল্য নিরূপণ করতেন তাদের অন্তর্নিহিত সত্যাসত্য বিচার ক'রে নয়, সমাজের সুখবৃদ্ধির পক্ষে তারা কতদূর সহায়ক হবে সেই বিচার ক'রে। রামমোহন নিজেও ১৮২৮ খৃঃ ১৮ই জানুআরিতে লিখিত এক পত্রে বলেছেন: প্রচলিত হিন্দুধর্ম, বিশেষতঃ জাতিভেদ-প্রথা এবং আচার-বাহুল্য তাঁর দেশ-বাসীর রাজনৈতিক উন্নতিসাধনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় এবং অন্ততঃ তাদের রাজনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক সুখের জন্যই প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন।—

"It is, I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort."[৬]

সমাজ-সংস্কারক হিসাবে, রাজনৈতিক চিন্তানায়ক হিসাবে, বাংলা গদ্যের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে ইতিহাসে রামমোহনের স্থান সুনির্ধারিত। রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভাকে স্বীকার ক'রে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিককে এ কথা বলতেই হবে যে ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর কীর্তি অনুরূপ নয়। রামমোহনের মত যুক্তিবাদীর বিচার যুক্তির সাহায্যেই সম্পন্ন হওয়া উচিত, উচ্ছ্বাসের সাহায্যে নয়।

৫ Vide Introduction to the Second Edition of the English works of Raja Rammohun Roy, published by the Panini Press, Allahabad in 1906.

৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যসাধক-চরিতমালা—১৬, পৃঃ ১১৫।

শ্রীমধ্বাচার্য ও তাঁহার সম্প্রদায়

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

[গতমাসে এই প্রসঙ্গে মধ্বমত ও মধ্বসম্প্রদায়ের চারজন সাধকের কথা আলোচিত হইয়াছে, এখানে আরও ছয়জনের কথা বলা হইতেছে। উঃ সঃ]

(৫) কনকদাস

কনকদাস নীচবংশসম্ভূত ছিলেন এবং ব্যাসরায় ব্রাহ্মণগণের প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁকে 'তীর্থ' পুণ্যজলক্ষেপে 'দাসকূটে'র অন্তর্ভুক্ত করেন। কনকদাসও ১৫২৫ খৃঃ দীক্ষার দিন থেকে নিজের সুদীর্ঘ ৯১ বৎসরব্যাপী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মাধ্ব-ধর্মের পরিপুষ্টি সাধন ক'রে গেছেন।

তাঁর রচিত 'নরসিংহ-স্তোত্র', 'মোহন-তরঙ্গিণী', 'রামধ্যানমন্ত্র', 'হরিভক্তি-সার', 'নলচরিতে' প্রভৃতি ভক্তিধর্মের উপাদেয় কন্নড় গ্রন্থ।

কনকদাস উডুপির কৃষ্ণ-মন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ করতে না পেরে একটি ছোট জানালার ভেতর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করেন। কনকদাস এই খিড়কীর মধ্য দিয়ে দেখেছিলেন বলে এখনও এই জানালা বা খিড়কীকে 'কনক-খিড়কী' বলা হয়।

কনকদাস মনকে উপদেশ দিয়ে এক স্থানে বলছেন: মন! তুমি ভাল ক'রে বোঝ। অচিরেই ভগবান্ তোমার উদ্ধার সাধন করবেন। পাষাণময় পর্বতাগ্রে গর্ত খুঁড়ে, জলের বাঁধ বেঁধে কে প্রবর্ধমান বৃক্ষসমূহকে নিরন্তর রক্ষা করছেন? এত রঙে বিভূষিত ক'রে কে ময়ূরের সৃষ্টি করেছেন? মিষ্টভাষী শুকের দেহে সবুজের মায়া কে মাখিয়ে দিল? যে ভগবান্ প্রস্তরের মধ্যে জন্মপরিগ্রহশীল ভেকের জন্য পর্যন্ত খাদ্য প্রস্তুত ক'রে রাখেন, তিনি কি তোমাকে কখন ভুলবেন? অচিরেই আদিকেশব তোমায় রক্ষা করবেন।

স্বকৃত 'হরিভক্তিসার' নামক কন্নড়-গ্রন্থের একটি সঙ্গীতে তিনি বলেছেন: ভগবন্! তুমি নিজের অশেষ বৈভব হেতু মদোদ্ধত হয়ে যদি দরিদ্রের দিকে না তাকাও, তা হ'লে আশ্রয়হীনের যে আশ্রয় থাকে না! সে কি তোমার করা উচিত?

বর্ণপ্রথার যাঁরা পক্ষপাতী, তাঁদের প্রতি তিনি কটূক্তি করেছেন; একটি সঙ্গীতে তিনি বলছেন: এই পৃথিবী 'বর্ণ, বর্ণ' ক'রে অনর্থক কোলাহল করছে। ধর্মপরায়ণদের আবার বর্ণ কি? কর্দমজাত পদ্ম দিয়ে কি নারায়ণের পূজা হচ্ছে না? গো-শরীরজাত দুগ্ধ কি ভূ-সুরেরা পান করছে না? কস্তুরীমৃগের অঙ্গ-মলজাত কস্তুরী নিয়ে দেবতারাও অঙ্গ বিলেপন করেন। নারায়ণের জাতি কি? পার্বতীনাথের জাতিই বা কি? আত্মা, জীব এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই বা কি জাতি? আদিকেশব যখন তুষ্ট হন, তখন জাতি থাকে কোথায়?'

(৬) বাদিরাজতীর্থ (সোদেরাজরু)

১৪০২ শকে (খৃঃ ১৪৮০) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পাঁচ বৎসর পূর্বে বাদিরাজতীর্থ মাঙ্গালোর জেলায় প্রাদুর্ভূত হন। তাঁর মাতাপিতার নাম গৌরম্মা ও রামভট্ট। তাঁর পূজ্য দেবতা হয়বদন। প্রথিত আছে যে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর রচিত 'তীর্থ-প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থ তত্ত্ব ও তথ্যের দিক থেকে অতি উচ্চাঙ্গের।

মধ্বসম্প্রদায়ে মধ্বাচার্যের পরেই বাদিরাজের[১] স্থান বললে অত্যুক্তি হয় না। মাধ্বেরা বিশ্বাস করেন যে বায়ুর অবতার হনুমান্, ভীমসেন এবং মধ্বাচার্যের মতো পরের কল্পে বাদিরাজই বায়ুর অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন।

বাদিরাজ অতি উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃত ও কন্নড় ভাষাকবি ছিলেন। বহু সুলাদি [ছন্দোবিশেষ] এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত ব্যতীত তিনি বাইশখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। সংস্কৃতে (১) গুরুরাজীয় সুধা টিপ্পনী (২) তত্ত্ব-প্রকাশিকা, (৩) তাৎপর্য-নির্ণয়-টীকা, (৪) তন্ত্রসারটীকা, (৫) ভগবদ্গীতা-টিপ্পনী, (৬) তীর্থ-প্রবন্ধ, (৭) মহাভারত-টিপ্পনী, (৮) রুক্মিণীশ-বিজয়, (৯) গুর্বর্থদীপিকা, (১০) প্রমেয়-সংগ্রহ, (১১) যুক্তিমল্লিকা, (১২) সরসভারতী-বিলাস, (১৩) পাষণ্ড-মত-খণ্ডন, (১৪) একাদশী-নির্ণয়, (১৫) সঙ্কল্প-পদ্ধতি, (১৬) পঞ্চাশৎ-স্তোত্র-সংগ্রহ॥ কন্নড় ভাষায়—(১) কন্নড়-তাৎপর্য-নির্ণয়, (২) বৈকুণ্ঠ-বর্ণনে, (৩) গুপ্ত-ক্রিয়া, (৪) লক্ষ্মী শোভন, (৫) স্বপ্নগন্থ, (৬) ভ্রমর-গীতা—এতদ্ব্যতীত সুলাদি ও ভক্তিমূলক গান। এ ছাড়াও বাদিরাজ অস্পৃশ্যদের নিমিত্ত 'তুলু' ভাষায় গান লিখেছিলেন, যা এখনও পর্যন্ত গাওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে বাদিরাজের প্রশংসনীয় সমাজ-সেবার উল্লেখ ও এখানে অবশ্য করণীয়। তিনিই উত্তর ও দক্ষিণ কন্নড়ের সকল সুবর্ণ বণিককে বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট করেছিলেন। তাঁরা এখনও পর্যন্ত স্বাদি মঠের আশ্রিত।

১২০ বৎসর বয়সে ১৬০০ খৃঃ তিনি দেহ রক্ষা করেন। অত্যন্ত সুখের বিষয়, জীবদ্দশায় তিনি চূড়ান্ত সম্মান লাভ ক'রে গেছেন।

অন্যান্য হরিদাস কবিদের মতো, বাদিরাজও সংসারের অনিত্যতা, চারিত্রিক অভ্যুন্নতি, নীতি-পরায়ণতা, নাম-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়ে বহু কথা বলেছেন। তবে মাধ্ব-ধর্মের উপর তিনি যে রকম জোর দিয়েছেন, অত জোরের সঙ্গে মাধ্ব-ধর্মের চরম উৎকর্ষের কথা আর কেউ বলেননি। একটি সঙ্গীতে তিনি বলেছেন:

মাধ্ব ধর্মই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তা প্রমাণ করার জন্য আমি কোন্ শপথ গ্রহণ ক'রব? হে মানব! এ বিষয়ে সকল বিদ্বজ্জন এক মত। গুরু মধ্বাচার্যের মতই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে তুলসী নিয়ে কি আমি প্রতিজ্ঞা ক'রব? অন্য ধর্মসমূহ যে বেদ-বিরুদ্ধ, তা প্রমাণ করার জন্য আমি কি সমুদ্র পার হবো? ভাগবত শাস্ত্রই যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র, তা প্রমাণের জন্য আমি কি অত্যন্ত ভারী কোন জিনিস উত্তোলন ক'রব? ভাগবতকে ঘৃণা করলে তার জন্য যে নরক সুনির্দিষ্ট, সেটি প্রমাণ করার জন্য আমি কি পর্বতের উপর থেকে গড়িয়ে প'ড়ব? দেব-সমূহের মধ্যে বিষ্ণুদেবতাই যে প্রধান, তা কি বেদ ও আগম শাস্ত্রকে দিয়ে বলাতে হবে? মোক্ষ লাভের নিমিত্ত তারতম্যই[২] যে শ্রেষ্ঠ পন্থা, সেটি প্রমাণ করার জন্য কি আমি বিষমতম বিষ পান ক'রব? হরিবাসর বা একাদশী এবং তার পরের দিনের মত যে দিন নেই, সেটি প্রমাণ করার জন্য আমি কি একটি ধাবমান কালসর্পকে ধরে নিয়ে আসব? মানব-জীবন সংরক্ষক যে আনন্দতীর্থ বা মধ্ব, সেটি প্রমাণ করার জন্য কি আমি গায়ে আগুন ধরিয়ে দেব? অত্যুদার হয়বদন যে সর্বগুণ-বিমণ্ডিত, সেটি প্রমাণ করার জন্য কি আমি আকাশবাণীর আশ্রয় গ্রহণ ক'রব?

১ মধ্বাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুতীর্থের মঠনিবাসী বাগীশতীর্থের শিষ্য, প্রবাদ ইনি ব্যাসরায়েরও শিষ্য।

২ মধ্বের মতে পঞ্চবিধ ভেদ অনাদি ও নিত্য, যথা: জীবেশ্বর, জড়েশ্বর, জীবভেদ, জড়জীবভেদ এবং জড়ভেদ। ভেদের মধ্যে আবার জীবে জীবে প্রভৃত তারতম্য। এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করবার বাসনা রইল।

(৭) বিজয়দাস

১৬৮৭ খৃঃ বিজয়দাস জন্ম পরিগ্রহ করেন তুঙ্গভদ্রা তীরস্থ রাইচুড় জেলার চিকনপরচি গ্রামে। ১৭৫৫ খৃঃ ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি দেহ রক্ষা করেন। বিজয়দাসের তিন শিষ্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন—ভাগন্না (গোপালদাস), তিম্মন্না এবং মোহন্না। বিজয়দাস তাঁদের ভক্তিমান্ ভাগন্না, শক্তিমান্ তিম্মন্না এবং চালাক মোহন্না নামে অভিহিত করতেন। রচনার পরিমাণের দিক থেকে বিজয়দাসকেই পুরন্দরদাসের পরে স্থান দিতে হয়।

বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ভাবের গাম্ভীর্যে, ভাষার সারল্যে ও রচনার পারিপাট্যে বিজয়দাসের রচনা কন্নড় ভাষার এক অতি অভ্যুন্নত স্থান অধিকার ক'রে আছে।

বিজয়দাস একটি কবিতায় বলছেন যে তিনি ভগবানকে দেখতে চাচ্ছেন না, চাচ্ছেন ভক্তগণকে দেখতে : আহা! আমি এখানে তোমাকে দেখতে আসিনি, এসেছি ভক্তগণের পাদপদ্ম দর্শন করতে। তুমি যখন সর্বত্রই বিদ্যমান, তখন তোমাকে দেখবার জন্য এই বিশেষ স্থানে আগমনের কি প্রয়োজন? ডাকলেই যখন তুমি ছুটে আস, তখন তোমাকে দেখবার জন্য আমার এতদূরে ছুটে আসার কি প্রয়োজন? তোমার শরণাগত যাঁরা, তাঁরা তো তোমাকে সর্বত্রই দেখতে পান। সুন্দর! জ্ঞানীদের মনোভূমিতে তুমি নিরন্তর নৃত্য কর। কিন্তু তোমার ভক্তগণের সাক্ষাৎ পাওয়াই যে দুর্ঘট ব্যাপার।

ভগবানের নিকট ভক্তি ভিক্ষা ক'রে বিজয়দাস বলছেন : শুধু এইটুকু কর যেন আমি মধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে থাকতে পারি। অন্য মতপ্রদর্শিত পথ যেন আমি ভুলে যাই। তুমি আমাকে সজ্জনসঙ্গে রাখ; সংসার-পাশবিনাশী তোমার নামামৃত-প্রসাদ আমাকে দান কর।

(৮) গোপালদাস

গোপালদাস (ভাগন্নাদাস) শক ১৬৫০ বা ১৭১৭ খৃঃ রাইচুড় জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। দাসপ্পা, সীনপ্পা এবং রঙ্গপ্পা নামক তাঁর তিন ভাইও দাসকূটে যোগদান করেন। মধ্বাচার্যের তাৎপর্যনির্ণয় গ্রন্থের দত্ত-কর্তৃত্ব খণ্ডন-লক্ষণ অনুসারে ত্রিবিধ জীবের (সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস) ভগবদ্দত্ত স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে 'হঠবাদ' নামক একটি গ্রন্থ গোপালদাস রচনা ক'রে গেছেন। কথোপকথনের আকারে গ্রন্থটি রচিত। দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদী এবং পরে ভীমসেন কথোপকথনে রত। যুধিষ্ঠির ক্ষমার পক্ষপাতী; এবং দ্রৌপদী ও ভীমসেন যুদ্ধকর্মের পক্ষপাতী। ধর্মরাজের মতে সমস্ত জগৎ ক্ষমাগুণের উপর বিধৃত এবং এই ক্ষমাগুণ বিশ্বেশ্বরেরই শক্তিপুষ্ট। নারায়ণ বিশ্বের নিমিত্ত (efficient) কারণ বলে জীবের যাবতীয় কর্ম তাঁর অধীন এবং তাঁরই প্রেরণাবলে সম্পাদিত হয়। ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত মানুষের স্বাধীনভাবে কোনও কাজ করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু দ্রৌপদী এবং পরে ভীমসেন বলছেন যে তাঁরা দত্ত-কর্তৃত্ব শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জীব ভগবানের দেওয়া শক্তি পাওয়ার পর নিজের বিবেচনানুসারে সেই শক্তি প্রয়োগ করবেন। তা না হ'লে মানুষের কর্ম এবং কর্মপ্রসূত ফল সবই ভগবানের উপর আরোপ করতে হয়। কিন্তু তা ন্যায়সঙ্গত নয়।

(৯) জগন্নাথদাস

জগন্নাথদাস শক ১৬৪৯ বা ১৭২৭ খৃঃ রাইচুড় জেলার ব্যাসবট্টি গ্রামে এক কুলকর্ণি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শক ১৭৩১ বা ১৮০৯ খৃঃ তিনি ধরাধাম ত্যাগ করেন।

জগন্নাথদাস সংস্কৃত এবং কন্নড় উভয় ভাষাতেই তাঁর রচনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

আধ্যাত্মিক সঙ্গীত ও তত্ত্বসুবালি ব্যতীত হরি-কথামৃতসার তাঁর অতি উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মাধ্ব দর্শন অতি সুন্দরভাবে কন্নড় ভাষায় বিবৃত হয়েছে। মহীশূরের টিপু সুলতানের প্রধান মন্ত্রী পূর্ণয্যা তাঁর বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন।

প্রবাদ অনুসারে ইনি একবার যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। গুরু বিজয়দাস গোপালদাসকে আদেশ দেন, তিনি যেন তাঁর জীবন থেকে ৪০ বৎসর আয়ুষ্কাল জগন্নাথদাসকে দেন। গোপাল দাস তদনুসারে তাঁকে আয়ু দান করেন।[৩]

খ্রীষ্টানদিগের পক্ষে যেমন বাইবেল, মাধ্বগণের কাছে জগন্নাথদাসের 'হরিকথামৃতসার'ও তাই। কন্নড় ভাষায় ভামিনী ষটপদী ছন্দে ৩৩টি সন্ধিতে রচিত এই গ্রন্থ মাধ্ব সম্প্রদায়ের সকলেরই নিত্য পূজ্য ও নিত্য পাঠ্য, এই গ্রন্থের শেষ সন্ধিটি জগন্নাথদাসের শিষ্য শ্রীদ বিট্‌ঠল রচনা করেন। ভগবৎ-প্রসাদ, ভগবানের সর্বব্যাপিত্ব, আত্মসমর্পণ, ধ্যান, নাম-মাহাত্ম্য দত্ত-স্বাতন্ত্র্য, ক্রীড়াবিলাস, বন্ধ-মোক্ষ, তারতম্যবাদ, দুঃখনিবারণ, অপরোক্ষ জ্ঞান প্রভৃতি সর্ব বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে রয়েছে।

তারতম্যবাদ প্রসঙ্গে জীবের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জগন্নাথদাস বলেছেন: দেবতা, ঋষি, প্রেত-গণ ও শ্রেষ্ঠ মানবেরা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; সাধারণ মানুষেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর; অসুর, দৈত্য, অধম মানব—এরা তৃতীয় শ্রেণীর। এই সকল প্রাণী এই জগতে এবং পরলোকে পরমাত্মা এবং নিজেদের থেকেও সর্বদা স্বতন্ত্র থাকে।

(১০) নারী কবি হেলবনকট্টি গিরিয়ম্মা

দাসকূটের নারী কবি ভীমব্বা, রামেশ্বর অব্বনবরু (গলগলি পরিবারের) এবং হেলবন-কট্টি রঙ্গ-গিরিয়ম্মা—এই তিন জনের মধ্যে শেষোক্ত কবিই শ্রেষ্ঠা। সৌভাগ্যক্রমে দাক্ষি-ণাত্যে কন্নড়ভাষায় হোন্নম্মা, মহাদেবিয়ক্কা, শৃঙ্গারম্মা, মালয়ালমে কুট্টিক্কুঞ্ঞ্ তকচ্চি, তামিলে অব্বার ও অণ্ডাল, তেলুগুতে মেমল্লা প্রভৃতি বহু নারী কবি জন্মগ্রহণ ক'রে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব-ধর্ম সম্প্রসারণের বিশেষ সহায়তা করেছেন।

হেলবনকট্টি গিরিয়ম্মা গোপালদাস এবং রাঘবেন্দ্রস্বামি-মঠের সুমতীন্দ্র যতির সমসাময়িক ছিলেন। বহু আধ্যাত্মিক সঙ্গীত ব্যতীত ইনি 'চন্দ্রহাস', 'সীতাকল্যাণ কথে' এবং 'উদ্দালিকন কথে' নামক গ্রন্থও রচনা করেছেন।[৪]

ভক্তবৎসল হরিকে সম্বোধন ক'রে নারী কবি এক স্থানে বলছেন, 'আমার প্রতি তুমি দয়া প্রদর্শন কর না কেন? সংসার-সমুদ্রে আমাকে ত্যাগ করা কি তোমার উচিত? আমাকে কূলে নিয়ে চল। তুমি ছাড়া আমাকে আর কে রক্ষা করবে? তুমিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ। তোমার যশের পরিধি নেই। নেই তোমার ক্রোধ, দেখ না তুমি কোনও দোষ। হে রঙ্গ! তুমি দরিদ্র-বান্ধব। দ্রৌপদীর সম্মান তুমিই রক্ষা করেছিলে। হে নাথ! তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

নিরন্তর মনঃসংযমের চেষ্টা করেও অসমর্থা হয়ে কবি মনকে সম্বোধন ক'রে বলছেন: 'হে মন! তুমি এত চঞ্চল হলে কেন; দুষ্টুমি ত্যাগ কর। সদ্বিবেচনা ত্যাগ ক'রে তুমি সংসার মায়ায় বদ্ধ হয়ে কষ্ট পেও না। ধনদৌলতের আসক্তিতে প্রপীড়িত হয়ো না। ভগবানকে স্মরণ কর। এই দেহ শাশ্বত নয়। মন!

৩ এই প্রসঙ্গে উডুপি শ্রীকৃষ্ণ প্রেস থেকে পবঞ্জে গুরু রাও কর্তৃক প্রকাশিত 'জগন্নাথদাসরে কীর্তনেগলু' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। কলমদানির 'জগন্নাথদাসর চরিত্রে' গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

৪ বাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত দেশপাণ্ডে রামরাও সংশোধিত 'গিরিয়ম্মনবর চরিতে' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যমযন্ত্রণার অধীন হয়ো না। 'তোমার, আমার' পদবাচ্য বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ কর। তোমার হওয়া উচিত ফলাভ্যন্তরস্থ বীজের মতো। মন, তুমি পরের দোষগুণের দিকে না তাকিয়ে নিজের দিকে তাকাও। মন, এই শরীরের রঙ তো উদুম্বর ফলের রঙের মত। মন! ভগবৎ-সেবা কর এবং হৃদয়ের সমস্ত আনন্দ উজাড় ক'রে দিয়ে তুমি মুক্তি কামনা কর।

গিরিয়ম্মার ব্যক্তিগত জীবন ছিল অতি পবিত্র। কথিত আছে—যদিও তিনি বিবাহ করেছিলেন, তাঁর স্বামী তিপ্প আরসা তাঁর সঙ্গে রাত্রে দেখা করতে এলেই শয্যায় একটি কৃষ্ণ সর্প দেখতে পেতেন। ফলে তাঁর স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন! হেলবনকট্টিতে অবস্থিত মন্দিরে তিনি রঙ্গ এবং লিঙ্গ উভয়েরই উপাসনা করতেন। কথিত আছে যে এইখানেই গোপাল-দাসের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

সম্প্রদায়ের দিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের সঙ্গে মধ্ব-দর্শনের ভেদবাদের পার্থক্য বিস্তর। দাসকূট কবিগণ ভগবানকে মাতা, পিতা, ভ্রাতা বলে সম্বোধন করেছেন, সে ভাবেই তাঁর প্রতি হৃদয়ের আকূতি জানাচ্ছেন—কিন্তু কোথাও প্রিয়া-প্রিয়ের মধুর ভাব ফুটে ওঠেনি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন মধুরভাবেরই তো পূর্ণ উৎসারণ! গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে মাধ্ব ধর্ম ও দর্শনের তুলনামূলক সমালোচনা অত্যন্ত অপেক্ষিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্র-দায়ের কবি ও লেখকদের কণ্ঠধ্বনি মাধ্ব সম্প্রদায়ের কবিগণের কণ্ঠেও বেশ শোনা যায়। সেই জন্যই এই প্রয়োজনের গুরুত্ব অধিক-তর অনুভব করি। মাধ্ব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গ্রন্থ কন্নড়ভাষায় লিখিত বলে এই গুরু দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করবেন, তাঁর কন্নড়-ভাষায়ও পটুত্ব বিশেষ প্রয়োজন।

মাধ্ব সম্প্রদায়ের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্র-দায়ের বিশেষ মিল এই যে উভয় সম্প্রদায়ই দেশীয় ভাষার মাধ্যমে ধর্ম ও দর্শন প্রচার করে-ছেন, নারীদের কোন ধর্মাধিকার থেকে বঞ্চিত করেননি; তদুপরি ধর্মের রাজ্যে বর্ণপ্রথা অস্বীকার ক'রে উভয় সম্প্রদায়ই ধর্ম সমাজে মিলনের ক্ষেত্র প্রশস্ততর ক'রে তুলেছেন। কিন্তু দর্শনবাদে মাধ্ব দর্শন ভেদের পর ভেদের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে মাধ্বাচার্যগণও পরমত আক্রমণে বদ্ধপরিকর। বাদিরাজের মতো মহাপণ্ডিতও 'পাষণ্ডমত-দলন' গ্রন্থ লিখেছেন। অন্য দিকে তাঁদের বিরুদ্ধ-বাদীরা মাধ্ব-মুখভঙ্গ, মধ্বমুখমর্দন প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে তাঁদের আবার কটূক্তি করেছেন। মাধ্বদের আক্রমণ শাঙ্করদের উপরেই সমধিক।

সাধনমার্গ—ভক্তিই হোক্ আর জ্ঞানই হোক্—তাতে সর্বদা ত্যাগ ও বৈরাগ্য, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সমভাবে অপেক্ষিত। বেদান্তসারের টীকাকার রামতীর্থ যতি বলেছেন, 'চিত্তশুদ্ধেঃ পরমপ্রয়োজনত্বং পরম্পরয়া মোক্ষসাধনত্বাৎ'। সাধনমার্গে দেহসুখ ত্যাগ, দেহ-বিস্মৃতি অবশ্য-ম্ভাবী। গোপীগণের দৃষ্টান্ত থেকে দেখতে পাই তাঁরা সর্ব জাগতিক স্মৃতি থেকে বহু দূরে সরে গেছেন—

'বিক্রেতুকামা কিল গোপকন্যা
মুরারিপাদাম্বুজদত্তচিত্তাঃ।
দধ্যাদিকং মোহবশাদ্ অবোচন্
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥'

মোক্ষপথানুসরণে পার্থক্য প্রতীতি হয় ভক্তিমার্গীদের সবিশেষ পথাবলম্বনে, এবং জ্ঞানকর্মীদের নির্বিশেষ সংচিন্তনে—নিদিধ্যাসনে বা সবিশেষ পথ অবলম্বনে। এই শেষোক্ত বিষয়

নিয়ে যত মনোমালিন্য। মানুষের ভিন্ন রুচি থাকবেই। মস্তিষ্কপ্রধান ব্যক্তি জ্ঞানের দিকে এবং হৃদয়প্রধান ব্যক্তি ভক্তির দিকে ঝুঁকবে—এটি স্বাভাবিক। তা নিয়ে কোলাহল ও অশান্তির সৃষ্টি করলে ধর্মজগতের নিবিষ্ট দর্শক যাঁরা, তাঁদের ভীতি উৎপাদন করা হয় মাত্র। লাভ তো কিছুই নেই। বরফ ও বরফগলা জলের মতো এর পার্থক্যই বা কতটুকু? গীতাভূষণ-ভাষ্যে বলদেব বিদ্যাভূষণ কি সুন্দর কথাই বলেছেন—'উচ্যতে, জ্ঞানমেব কিঞ্চিদ্ বিশেষাদ্ ভক্তিরিতি। নির্ণিমেষবীক্ষণ-কটাক্ষবীক্ষণবদনয়োরন্তরম্'—জ্ঞান ও ভক্তি, যেন অনিমেষ দেখা ও কটাক্ষে দেখা।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ 'প্রীতি-সন্দর্ভে' বলেছেন,—'তচ্চ পরমতত্ত্বং দ্বিধাবির্ভবতি; অস্পষ্ট-বিশেষত্বেন স্পষ্ট-স্বরূপভূতবিশেষত্বেন চ'। তাঁর মতে ব্রহ্মাখ্য অস্পষ্ট বিশেষ পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের উপায় জ্ঞান এবং ভগবদাখ্য স্পষ্ট বিশেষ পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের উপায় ভক্তি। সহস্রারে যিনি, হৃৎপদ্মেও তিনি। সহস্রারে যিনি নিগুর্ণ, হৃদয়ে তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ইষ্ট।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্ত দার্শনিকদের এই উক্তি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং সর্বজনগ্রাহ্য। মুক্তির উপায় কেবল একটি, আর কিছুই নেই—এ কোন কাজের কথা নয়! এ বিষয়ে মধুসূদন সরস্বতীর জীবনাদর্শ এক অপূর্ব সমন্বয়ের সন্ধান দেয়। অত বড় বৈদান্তিক—লিখলেন 'অদ্বৈতসিদ্ধিঃ'; ব্রহ্মের নিগুর্ণত্ব, নিরাকারত্ব সবই সংস্থাপন ক'রে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলছেন: আমার ঘনশ্যাম বংশীবদন পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ থেকে পরতত্ত্ব আমি আর কিছুই জানিনে।

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ।
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বং ন জানে॥

এই লেখকই একাধারে ভক্তি-রসায়ন-গ্রন্থে 'ভক্তি'র প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির বিরোধ তিনি মোটেই স্বীকার করেননি। সেইজন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন, সব বিধি-নিষেধকে একটি কথায় বলে দেওয়া যায়:

স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব বিধিনিষেধাঃ স্যুঃ এতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

—অর্থাৎ সতত ভগবানকে স্মরণ করবে, তাঁকে কখনও ভুলবে না, এই একমাত্র বিধি-নিষেধ; অন্য সব বিধি-নিষেধ এরই কিঙ্কর।

জয়ন্তভট্ট নৈয়ায়িক—সব কিছু কুটি কুটি বিশ্লেষণ ক'রে তারপর তিনি কোন কথা বলেন। তিনি তাঁর 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে বলছেন:

যে চ বেদবিদামগ্র্যাঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদয়ঃ।
প্রমাণমনুমন্যন্তে তেঽপি শৈবাদি-দর্শনম্॥
পাঞ্চরাত্রেঽপি তেনৈব প্রামাণ্যমুপবর্ণিতম্।
অপ্রামাণ্যনিমিত্তং হি নাস্তি তত্রাপি কিঞ্চন॥

গ্রন্থের শেষে আরও একটু অগ্রসর হয়ে তিনি বলেছেন: বহবো হ্যুপায়াঃ একত্র তে শ্রেয়সি সংপতন্তি সিন্ধৌ প্রবাহা ইব জাহ্নবীয়াঃ॥

ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত, ভাববন্যাবিপ্লুত, অণুপরমাণু-প্রকোপ-ত্রস্ত বর্তমান জগতে ধর্ম ও দর্শন শান্তির একমাত্র উৎস। এই উৎসের নীর ব্রহ্মকমণ্ডলু-বাহী জাহ্নবী-তোয়ধারার মত শীতল ও কূটতর্ক-দাবাগ্নিজ্বালা-রহিত হয়ে জগদ্‌জনের ব্যামোহ-গ্রস্ত চিত্তে অনিবার্য শান্তি আনয়ন করুক—এই প্রার্থনা।

চন্দ্রলোকে জনসভা

[দার্শনিকের স্বপ্নদর্শন]

ডক্টর শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব

লাইকাকে নিয়ে 'রাশ্যান স্পুটনিকে'র চন্দ্রলোক অভিযানের রোমাঞ্চকর সংবাদ প্রচারিত হবার কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি—যার ভাল ব্যাখ্যা এখনও খুঁজে পাইনি। সর্বদাই তরুণ-পোষণ ও তোষণে ব্যস্ত থাকায় কালিকলমের আঁচড়ে সেই স্বপ্নের একটা চলনসই ছবি আঁকবার সুযোগও তখন জোটেনি। অনলস, দীর্ঘসূত্রী ও অনর্থক অতিব্যস্ততার ফাঁকে যে কাহিনীর স্মৃতি মনের কোণে আবছায়ার মতো মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে, তাকে আজ সত্যি সত্যি কালিকলমের বন্ধন স্বীকার করতে হ'ল।

এই স্বপ্নদর্শনের দিনকয়েক আগে এক বিদ্বজ্জন-সমাবেশে 'দর্শনের প্রয়োজনীয়তা' নিয়ে এক বিতর্ক হয়—যার সঙ্গে আমার স্বপ্নের কিছু অব্যক্ত যোগসূত্র থাকা অসম্ভব নয়। সে বিতর্কে আমি আদা-নুন খেয়ে দর্শনের পক্ষ সমর্থন করি, কারণ আমার ক্ষুদ্র জীবনের অজস্র অকৃতকার্যতার ভেতর সাফল্যের যে কণিকা লুকিয়ে আছে তার আসল হ'ল 'দর্শন', বাকীটুকু হ'ল তারই সুদ।

তবে আসলের চেয়ে সুদের উপর বেশী আসক্তি রেখে দুটোকেই না হারাতে হয়, এই ভয়েই এই দর্শন-বিতৃষ্ণার যুগেও দর্শনকে ধরে আছি আঁকড়ে। এই অতি-আসক্তির ফলে যে বাক্‌চাতুরী দেখিয়েছিলাম, তার চাপেই বোধ হয় সেদিনের বিতর্ক-সভায় আমাদের পক্ষই হয়েছিল জয়ী। সে সভায় এক প্রবীণ অধ্যাপক ছিলেন বিরোধী দলের নেতা। বাক্যের তুবড়ী রচনা ক'রে আমাকে নাজেহাল করার চেষ্টা তিনি কম করেননি। হঠাৎ দর্শনের নিরর্থকতা প্রমাণ করবার আগ্রহাতিশয্যে তিনি শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বাঁকা হাসি হেসে বললেন, "এই যে দেখছেন ডক্টর দেব, একজন বড় ('বড়' কথাটি বক্তার উক্তি থেকে উদ্ধৃত। পাঠকের মনে রাখা উচিত বিতর্ক-সভায় বিরোধী দলের কাউকে বড় বলা হয় ছোট অর্থে) দার্শনিক, তাঁকে যদি লাইকার সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় স্পুটনিকে ক'রে চন্দ্রলোকে, তবে তাঁর দশা কি হবে?" তার এই চটকদার, চমকপ্রদ উক্তি শুনে মনে হ'ল দর্শনের সাফল্যের সঙ্গে এই অঘটন-ঘটনের নিকট যোগ যদি সত্যি থাকে, তবে তার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন তা বলা বাহুল্য। নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার। তবে খুবই আশার কথা এই যে জাগ্রত চেতনায় যে অসম্ভব সম্ভব হয়নি, স্বপ্ন-মানসে তার আংশিক সত্যের হয়েছে অনুভূতি। এতেই ইউক্লিডের উপপাদ্যগুলোর মতো প্রমাণিত হয়ে গেছে যে বাস্তব জীবনে দর্শনের যতই পরাভব ও পরাজয় হোক না কেন, স্বপ্ন-জীবনে তার একাধিপত্য অনস্বীকার্য।

হঠাৎ গভীর রাত্রে হল-ক্যান্টিনের জমাট আসর ও তার নিত্য সহচর অনবরত শব্দের গোলাবর্ষী রেডিও-র স্মৃতি গেল মুছে। সুষুপ্তির ভিতর স্বপ্নের স্বাতন্ত্র্য-লোকে হঠাৎ হ'ল প্রবেশ। যা দেখলাম তার সঙ্গে আজকের দিনের চাঞ্চল্য-কর শ্লোগান-সাইরেনের কোনও যোগ নেই। তথাপি তা অতি বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। হঠাৎ সাদা চোখে দেখতে পেলাম স্পুটনিকে ক'রে

মুহূর্তে অবলীলাক্রমে হাজির হয়ে গেছি চন্দ্র-লোকে; বন্ধুবর লাইকা সঙ্গে নেই। ডারুইনের নীতির ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ অনুসারে লাইকার সঙ্গে আমার প্রাচীন পুরুষানুক্রমিক অনাবিল প্রেমের সম্পর্ক স্মরণ করেই হয়তো প্রবীণ অধ্যাপক বিতর্ক-সভায় তার সঙ্গে আমার সংযোগ-স্থাপনের চেষ্টা করে-ছিলেন। ডারুইনের নীতি সম্ভবতঃ চন্দ্রলোকে অচল। কাজেই অতি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সেখানে আমার একাকী আবির্ভাব।

ছোট বেলা থেকেই ধর্ম ও দর্শনের পুঁথিতে চন্দ্রলোকের কথা পড়ে আসছি। হিন্দুদের পরলোকের কাহিনীতে মৃত্যুর পর পুণ্যবলে চন্দ্রলোকে যাওয়ার কথা আছে। কিন্তু এমন সশরীরে চন্দ্রলোকে যাওয়া বিজ্ঞানের আশীর্বাদেই সম্ভব হ'ল—তবে যা দেখলাম সেটা বৈজ্ঞানিক চন্দ্রলোক না আধ্যাত্মিক চন্দ্রলোক, তা আজও ঠিক করতে পারিনি। আমার চন্দ্রলোক অভি-যানের প্রেরণা সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক, তবে আমার স্বপ্নমানসে চন্দ্রলোকের যে রূপায়ণ হয়েছিল তার উপাদান সম্ভবতঃ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক; বিজ্ঞানের চন্দ্রলোক মোটেই সুদৃশ্য বা রমণীয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে জন্যই বলেছেন—চাঁদের সঙ্গে সুন্দর মুখের তুলনা যাঁরা করেন, তাঁরা জানেন না সে উপমা যদি আক্ষরিক অর্থে সত্য হয় তবে তার ফল কি ভয়ানক ও ভয়াবহ। আমার স্বপ্নের চন্দ্রলোক সত্যি খুব মনোরম, মনোহারী, শান্ত, স্নিগ্ধ ও সুন্দর। একবার দেখলে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না।

হঠাৎ দেখি—নেমে পড়েছি চন্দ্রলোকের সেই শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর ও স্বস্তিকর আবহাওয়ায়। সামনে দেখি এক বিরাট জনসভা। সভা সামনে দেখা আমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক—তার সঙ্গে আমার একটা নিকট যোগ নিশ্চয়ই আছে; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমি আবাল্যজড়িত। মহাভারত আলোচনা ক'রে আমি জানতে পেরেছি যে আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো সভা-পর্ব ও গদাপর্বের অপূর্ব সমন্বয়, এই দুই পর্বে যাঁরা বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তাঁদের চরম পরিণতি বনপর্বে ও স্বর্গারোহণ-পর্বে। পৃথিবীর প্রাত্যহিক জীবনের কাদামাটির সঙ্গে ভাল ক'রে যোগ রাখা তাদের পক্ষে অসম্ভব। যাই হোক, এখন সে আলোচনা মুলতবী রেখে চন্দ্রলোকের সভার কথাই বলি। সেই সভায় পৌরোহিত্য করছেন দেখতে পেলাম মহাভাগবত এক ভিক্ষু; তাঁর জ্যোতির্ময় কান্তি, গৈরিক বসন, শান্ত গাম্ভীর্য ও অচঞ্চল প্রসন্ন হাস্য সেই বিরাট জন-সমুদ্র থেকে তাঁকে অতি স্বাভাবিক ভাবেই ক'রে রেখেছে পৃথক ও স্বতন্ত্র। ভূতলে গিরিশৃঙ্গের মতো তাঁর চিন্তা জন-মানসের বহু উর্ধ্বে।

সে সভার আলোচ্য বিষয়: পৃথিবীতে স্পুটনিক আবিষ্কার ও চন্দ্রলোকে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া। নানা বক্তার বক্তৃতা শুনে মনে হ'ল পৃথিবীতে স্পুটনিক আবিষ্কারে চন্দ্রলোকের নেতারা ভীত, সন্ত্রস্ত ও বিচলিত। তাদের বক্তব্যের সারমর্ম: চন্দ্রলোকে খাদ্যসঙ্কট নেই। পৃথিবীর জনসংখ্যা অনবরত বেড়েই চলেছে। কাজেই সেখানে খাদ্যসঙ্কট ক্রমবর্ধমান, এ দুরবস্থা অপরিহার্য। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে স্পুটনিক আবিষ্কারের ফলে চন্দ্রলোকে পড়বে পৃথিবীর মানুষের লোলুপ দৃষ্টি ও তাতে হবে সেখানকার শান্তি-ভঙ্গ। যে বাস্তহারা-সমস্যায় পৃথিবী জর্জরিত—পৃথিবীর মানুষের সংস্পর্শে চন্দ্রলোকেও সে সমস্যার দেখা দেবে। এই ভাবে সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যেই তাঁরা তাঁদের দিশারী ভিক্ষুর পৌরোহিত্যে করেছেন এই বিরাট সভার আয়োজন।

ভয়, নৈরাশ্য ও মানসিক চাঞ্চল্যের যে

আবহাওয়া বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতায় সৃষ্টি হয়েছিল, সভার পুরোহিত শান্তচিত্ত ভিক্ষু যে মুহূর্তে সবার সামনে তাঁর বহুবাঞ্ছিত ভাষণ দেবার জন্য দাঁড়ালেন, অমনি যেন তা চলে গেল। চন্দ্রলোকের গণমানসের এমন আকস্মিক পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম ও মনে পড়ল মহাকবি কালিদাসের উক্তি—"চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে"; সমস্ত সভা যেন রঙের তুলিতে আঁকা ছবির মতো নিস্পন্দ ও নিশ্চল।

সমাহিতচিত্ত ভিক্ষু শান্তকণ্ঠে বললেন: পৃথিবীর মানুষের উপর তোমাদের ঈর্ষা অযৌক্তিক ও অবাঞ্ছনীয়। তোমরা চন্দ্রলোকবাসী পৃথিবীর মানুষের মতো নানা সংঘর্ষের দ্বারা জর্জরিত নও সত্য, কিন্তু পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকেই—বিশ্বের এক মহাসত্য তোমাদের শিখতে হবে। সে সত্য হচ্ছে বিশ্বের সর্ব জীবের একত্ব। বেদ, বাইবেল, কোরান, ও জেন্দাবেস্তায় যুগ যুগ ধরে এই তত্ত্ব পৃথিবীর মহামানবেরা করেছেন প্রচার। তোমরা চন্দ্রলোকবাসী সে সত্যের খবর রাখ না। স্পুটনিক আবিষ্কারের ফলে সে সত্য হৃদয়ঙ্গম করবার, জীবনে রূপায়িত করবার নূতন প্রেরণা পাবে পৃথিবীর মানুষ ও তাদের সংস্পর্শে এসে সমস্ত বিশ্বের অধিবাসী।

মনুষ্যলোকে অতি প্রাচীন যুগে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য খুব জোরের সঙ্গে গার্গীকে বলেছিলেন, এই অবিনাশী ও অক্ষর তত্ত্বকে না জেনে যে যজ্ঞ-তপস্যাদি করে, তার সমস্তই নিষ্ফল, সে তত্ত্বসুখসম্ভোগ-বঞ্চিত কৃপণ। মনুষ্যলোকে বিজ্ঞানের বিরাট জনকল্যাণ-যজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে আজ হতে চলেছে নিষ্ফল। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে সেই মহাযজ্ঞকে সাফল্যমণ্ডিত করাই আজকের দিনে মনুষ্যলোকবাসী ও চন্দ্রলোকবাসী উভয়েরই অপরিহার্য কর্তব্য। তাতেই দূরীভূত হবে সবার জীবনের দৈন্য, নৈরাশ্য ও কার্পণ্য।

চন্দ্রলোকবাসী বন্ধুগণ, পৃথিবীর মানুষ চন্দ্রলোকের উপর হামলা করবে—এই আশঙ্কা অমূলক। বিজ্ঞানের দৌলতে পৃথিবীর মানুষ আজ বেশ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে যুদ্ধের ফল অতি ভয়াবহ। বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত মারণাস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহৃত হ'লে সমস্ত মানুষজাতির সত্তা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যেতে পারে, একথা পৃথিবীর অনেক মনীষী আজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করছেন। সেজন্যই পৃথিবীতে আজ শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রভূত চেষ্টা। সঙ্কীর্ণতা—তা প্রাদেশিকই হোক, অর্থনৈতিকই হোক, রাজনৈতিকই হোক, আর তথাকথিত ধর্মীয়ই হোক--মানুষের মনে বিদ্বেষ জাগিয়ে তাকে করে যুদ্ধোন্মুখ। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম ভেবে মানুষ আজ তার উল্টোপথে চলতে আরম্ভ করেছে। আজ তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সারা জগতের মানুষের কল্যাণমূলক জীবন-দর্শন, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি আবিষ্কারের ও জীবনে তার প্রয়োগের চেষ্টায় তৎপর। চন্দ্রলোক ও মনুষ্যলোকের ভেতর স্পুটনিক মারফত যে যোগসূত্র আজ স্থাপিত হ'ল, তাতে এই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা চন্দ্রলোক থেকেও হবে বিলুপ্ত এবং পৃথিবীতে যেমন বহু শতকের ভ্রান্ত চেষ্টার পর জনগণের ব্যাপক ও সামগ্রিক কল্যাণকেই করা হচ্ছে সমস্ত সংস্থার প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য, চন্দ্রলোকেও হবে তার পুনরাবৃত্তি।

পৃথিবীর মানুষেরও এতে হবে বিশেষ মঙ্গল। কারণ তারা এতকাল শুধু পৃথিবীর কথাই ভেবেছে। চন্দ্রলোকের সংস্পর্শে এসে সারা জগতের সকল জীবের কল্যাণ সম্বন্ধে তারা হবে সজাগ ও সচেতন।

আড়াই হাজার বছর আগে পৃথিবীরই এক মহামানব তথাগত বুদ্ধ প্রচার করেছেন 'সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু'—সব প্রাণী সুখী হোক। * * *

এমন সময় ঘরের ছিটকিনি না-লাগানো কাচের জানালা বাতাসে দেয়ালে লেগে হ'ল খট খট শব্দ, আর ঘুম গেল ভেঙে। স্বপ্নমঙ্গলের এমন অপ্রত্যাশিত অবসানে স্পুটনিকে ক'রে পৃথিবীতে ফিরে আসার লোভনীয় অভিজ্ঞতা থেকে হলাম বঞ্চিত। দেখি সেই পুরানো ঘরে ভাঙা খাটে আছি শুয়ে; আর গভীর রাতের অন্ধকারে বিজলীবাতির ক্রমবর্ধমান আলোতে চোখের সামনে 'জগন্নাথ-হলে'র ত্রিতল প্রাসাদ তার সুপ্তিমগ্ন যুবশক্তি নিয়ে করছে জ্বলজ্বল।

মনোবিশ্লেষণের নিয়মে প্রগতিপন্থীরা আমার এই স্বপ্নের পেছনে অবচেতন মনের কোন্ অবদমিত ইচ্ছার অভিব্যক্তি আবিষ্কার করবেন, তা জানি না; তবে আন্তরিক ও অকপট প্রার্থনা—আমার স্বপ্নলোকের আদর্শ জীবলোকে মূর্ত ও বাস্তব হয়ে উঠুক।

মুরলীধর

[ইন্দিরাদেবীর মীরাভজনের অনুবাদ]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বাজায় মুরলী সে, সখী, বাজায়—
মধুর আলাপনে মুরছনায়!

বাঁশির তান শুনি' ওঠে গো গুনগুনি' কুঞ্জবন তারি সুরে উছল।
যখন দেয় তাল গোপাল—প্রতি তাল ওঠে গো দুলি', কাঁপে ধরণীতল,

মধুর আলাপনে মুরছনায়
বাজায় মুরলী সে যবে বাজায়!

শুনি' সে-মধুতান বিভোর মনপ্রাণ, হারাই জ্ঞান, তনু আবেশে ছায়,
লুপ্ত হয় পলে ভুবন, যায় গ'লে লজ্জা কুল মান তার নেশায়,

প্রেমের অপরূপ মধুরিমায়
বাজায় মুরলী, সে যবে বাজায়!

তোমারে জানি শ্যাম দোদুল অভিরাম, অতুল চিরসাথী হে গুণধাম!
তোমারে চিনি প্রাণে কৃপাল অভিধানে গোপাল ব্রজবাল তোমার নাম।

শরণ মীরা চায় কমল-পায়
বাজায় মুরলী—সে যবে বাজায়!

চৈতন্যচরিতামৃত-কাব্যপরিচয়

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমদনমোহন গোস্বামী

প্রাক্-চৈতন্য যুগে শ্রীকৃষ্ণলীলারসাস্বাদনের দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ধারায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও ভগবত্তার উপর এবং অপর ধারায় বৃন্দাবন-লীলার অন্তর্গত শৃঙ্গার-রসবর্ণনার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ধারার কবি মালাধর বসু প্রভৃতি এবং জয়দেব ও বিদ্যাপতি প্রভৃতি দ্বিতীয় ধারাকে অনুবর্তন করিয়াছেন।

বৈষ্ণবধর্মের উৎস অনুসন্ধান করিতে গেলে বেদান্তসূত্রে পৌঁছিতে হয়। মূল বেদান্তে ও বৈষ্ণব মতবাদে কোন বিরোধ নাই। 'বৈষ্ণব' শব্দটি বেদোক্ত 'বিষ্ণু' ['ব্যাপ্নোতি বিশ্বম্ ইতি বিষ্ণুঃ']-শব্দ বা তদাখ্য দেবতা হইতে আসিয়াছে। বেদে বহুশঃ সূর্যের পরিবর্তে 'বিষ্ণু' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্', 'বিষ্ণুঃ ত্রিবিক্রমঃ' ইত্যাদি। যাগযজ্ঞপ্রধান বৈদিক ধর্মে ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণব ধর্মের উল্লেখ নাই। তবে উপনিষদে বৈষ্ণব ধর্মের কৃপা বা প্রপত্তির আভাস পাওয়া যায়। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—বৈষ্ণব দর্শন গঠনের মূলেও উপনিষদের এই ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণ, নারায়ণ, বাসুদেব প্রভৃতির উপাসকদিগকে বৈষ্ণব বলা হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন দেবতা কখনও স্বতন্ত্র, কখনও বা মিলিত ভাবে বিবর্তনের ধারায় কৃষ্ণের একত্বে উপনীত হইয়াছেন। যেমন, পাণিনি [খৃঃ পূঃ ৫ শতক] বাসুদেব শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, হেলিওডোরার গরুড়-স্তম্ভে বাসুদেব-কৃষ্ণের উল্লেখ আছে কচিৎ কারণবারি-শায়ী নারায়ণ বাসুদেবের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন। বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের অর্থ হইতেছে বিষ্ণু চারিরূপের প্রকাশ মাত্র: বাসুদেব পরমপুরুষ, সঙ্কর্ষণ জীবাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, প্রদ্যুম্ন মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অনিরুদ্ধ চৈতন্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

পুনশ্চ, মহাভারতের কৃষ্ণ বাসুদেব-কৃষ্ণ। মহাভারতে অনুল্লিখিত বৃন্দাবন-লীলার গোপাল-কৃষ্ণও বাসুদেব-কৃষ্ণ। পরবর্তী কালে এই দুই কৃষ্ণ মিলিয়া গিয়াছেন। ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে অবশ্য গোপাল-কৃষ্ণের উল্লেখ রহিয়াছে। ভাগবতের বহুস্থানে দ্রাবিড় দেশের বৈষ্ণব ধর্মের কথা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ের বিষ্ণুভক্ত আলোয়ার-সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হইবার পূর্বেই আবির্ভূত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের উপর দ্রাবিড়ধর্মের ভক্তিপ্রভাব আছে এবং ইহাতে কৃষ্ণলীলা ব্যতীত ভারতীয় প্রধান দার্শনিক মতবাদসমূহ ও বিবিধ উপাসনাপদ্ধতির সার-সঙ্কলনও রহিয়াছে। দ্বৈতমতবাদীদিগের প্রধান অবলম্বন ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপ শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ গ্রন্থকর্তাগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থসমূহে সমর্থক ভাগবতশ্লোক প্রায়শই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বৈষ্ণব দর্শনের প্রধান আচার্য শ্রীরামানুজাচার্য; জীবাত্মা, ব্রহ্ম ও জগতের সম্পর্ক লইয়াই ইহার সহিত অদ্বৈতবাদ বা শঙ্করাচার্য-মতের বিরোধ। চতুর্বিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই ['শ্রী' (রামানুজ), 'সনক' (নিম্বার্ক), 'রুদ্র' (বিষ্ণুস্বামী), 'মাধ্ব' (মধ্বাচার্য)] মূল কথা একটি—'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে'। নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা ও ষড়ৈশ্বর্যময় সগুণ ভগবান্ পরমতত্ত্বের ত্রিবিধ রূপ। ব্রহ্মের স্বরূপও প্রকারভেদে ত্রিবিধ: সৎ [=সন্ধিনী, জীবশক্তি,

তটস্থা শক্তি], চিৎ [=সম্বিৎ, পরাশক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি], আনন্দ [হ্লাদিনী, মায়াশক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি]। বৈষ্ণবদিগের রাধাকৃষ্ণের লীলা-স্থল বন-বৃন্দাবন কিংবা মনোবৃন্দাবন অপেক্ষা নিত্য-বৃন্দাবন প্রকৃত—সেখানে 'রসো বৈ সঃ' 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' আস্বাদক, শ্রীরাধা হ্লাদিনী শক্তি আস্বাদ্য। মাধুর্যপূর্ণ রাধাপ্রেমই বৈষ্ণব ধর্মের সাধ্যসার। এই সাধ্যসার লাভের উপায় যথাক্রমে স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে ফলার্পণ, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, জ্ঞানশূন্যা ভক্তি ও প্রেমভক্তি। স্বধর্মাচরণ ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তি হইতেছে বৈধী ভক্তি। রস অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের স্বরূপাস্বাদনের প্রকারও পাঁচটি: শান্ত [=কৃষ্ণপ্রেম ও তৃষ্ণা-ত্যাগ], দাস্য [=শান্ত+সেবা], সখ্য [=শান্ত +দাস্য+অসম্ভ্রম], বাৎসল্য [=শান্ত+দাস্য+ সখ্য+মমতা], মধুর [=শান্ত+দাস্য+সখ্য+ বাৎসল্য+আত্মদান]। মধুররসযুক্ত গোপীপ্রেমই বৈষ্ণব দর্শনের সাধ্যসাররূপ রাধাপ্রেম। বৈষ্ণব দর্শনের মুক্তি [সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য, স্বারূপ্য] হইতেছে রাধাকৃষ্ণের নিত্য সহচর হওয়াতে।

চৈতন্য-পরবর্তী যুগে প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের কিছু বিশেষত্ব আছে। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে কংসাদি অসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য নারায়ণ কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে প্রেমময় জগৎপাতা সমদর্শী ভগবানের পক্ষে কাহারও বধের জন্য রূপ পরিগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত নহে। কৃষ্ণাবতারের মূল কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' পাইতেছি:

পূর্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলা শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করেন জগৎপালন॥
আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ করুণ পরম।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥

রূপগোস্বামীর কড়চা হইতেও কৃষ্ণাবতারের এই অভিনব হেতু দুইটির প্রেমরসাস্বাদন ও রাগানুগাভক্তি-প্রচার সন্ধান মিলিতেছে:

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

—শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য, রাধার প্রণয়মহিমা ও রাধানুভূত কৃষ্ণমিলনানন্দ, এই ত্রিবিধ সুখাস্বাদনের জন্য 'অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর' শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবের প্রাধান্য প্রাক্-চৈতন্যযুগে ছিল, চৈতন্য-পরবর্তী যুগে দেখা দিয়াছিল মাধুর্য-ভাব। শ্রীচৈতন্যের অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ কেবল নামসঙ্কীর্তন করা—'চৈতন্য-ভাগবতে'র এই মত 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' সমর্থিত হয় নাই। কারণ পুরী অথবা বৃন্দাবনে চৈতন্য-দেব সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব পরবর্তীকালে প্রচারিত হইয়াছিল, বৃন্দাবন দাস তাহার সহিত পরিচিত ছিলেন না। তাই 'চৈতন্যভাগবতে'র অধ্যায়-বিভাগের বেলাতেও 'চরিতামৃতে'র সহিত পার্থক্য নজরে পড়ে।—

কলিযুগে ধর্ম হয় হরিসঙ্কীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
আদিখণ্ডে প্রধানতঃ বিদ্যার বিলাস।
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের কীর্তন প্রকাশ॥
শেষখণ্ডে সন্ন্যাসী-রূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ স্থানে সমর্পিয়া গৌড়ক্ষিতি॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে :

অবতার প্রভু প্রচারিলা সঙ্কীর্তন।
এহো বাহ্য হেতু পূর্বে করিয়াছি সূচন॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণ সেই কার্য নিজ॥

'চৈতন্যভাগবতে'র আদিখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের গয়াগমন পর্যন্ত 'আদিলীলা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু 'চরিতামৃতে' সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত ২৪ বৎসর লীলাই আদিলীলা। পরবর্তী ছয় বৎসর তাঁহার নানা স্থান পর্যটনের লীলাই মধ্যলীলা এবং শেষে নীলাচলে অবস্থিতি-কালের (১৮ বৎসর) লীলা অন্ত্যলীলা। সুতরাং দেখা যাইতেছে রাগানুগা-ভক্তিধর্মী দুই মহাগ্রন্থের অধ্যায়-বিভাগের ব্যাপারেও বিশেষ অসামঞ্জস্য বিদ্যমান।

শ্রীচৈতন্যকে অবতার বলিয়া স্বীকার করার নিমিত্তই তাঁহার ভক্তবৃন্দ তদীয় জীবনবৃত্তান্তকে ঈশ্বরের লীলারূপে লিখিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব চরিতকারগণের এই প্রশংসার যোগ্য শুভ চেষ্টার ফলে আমরা শ্রীচৈতন্যদেব এবং অপরাপর ব্যক্তির জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছি। তথাপি অনেক তথ্যই অলব্ধ রহিয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের ব্যাপার। যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব মানব-সংস্কৃতিতে আধুনিক যুগের বিশিষ্ট মনোভাব, মানবিকতার সুপ্রভাত সূচনা করে। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া ইহারই উজান-ভাঁটি বঙ্গসাহিত্যের প্রবাহের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙ্গালা দেশে একটি অপূর্ব পরিবর্তন আসিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই অবতার বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চরিতকথা অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম আধুনিকতার সূত্রপাত হইয়াছিল। তাঁহারই জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যে মানবিক চেতনা আসিল এবং 'কলিযুগ সর্বযুগসার' বলিয়া অভিনন্দিত হইল। শ্রীচৈতন্যের সর্বপ্রথম জীবনীকাব্য তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মানুচর মুরারিগুপ্ত কর্তৃক বিরচিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত'। চৈতন্যজীবনীসম্পর্কিত প্রাচীনতম এই গ্রন্থটি 'মুরারিগুপ্তের কড়চা' নামেই প্রসিদ্ধ। কাব্যটি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকে রচিত হইয়া থাকিবে। চৈতন্যচরিত সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় রচনা জনৈক বঙ্গদেশীয় বিপ্র-বিরচিত অধুনা-লুপ্ত একটি নাটক। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ইহার নান্দীশ্লোকটি মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপরবর্তী রচনা কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' (১৫৭২ খৃঃ) ও 'চৈতন্য-চরিতামৃত' মহাকাব্য (১৫৪২ খৃঃ)। স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধ, ইহার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্যসূচক কয়েকটি শ্লোক লিখিত হইয়াছে। রঘুনাথদাস-বিরচিত 'গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষঃ' সংস্কৃতে বিরচিত স্তোত্র। বাসুদেব ঘোষ ও তদীয় ভ্রাতৃযুগল গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ, নরহরি সরকার এবং পরমানন্দ গুপ্ত—শ্রীচৈতন্যের এই কয়জন মুখ্য অনুচর তাঁহার জীবনবৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়া কতিপয় পদ রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে এইগুলিই বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনী।

কাব্যে বিরচিত সর্বপ্রথম বাঙ্গালা চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থ হইতেছে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবত' [রচনাকাল আনুমানিক ১৫৭৬ খৃঃ বা কিছু পূর্বে]। এই গ্রন্থের উল্লেখ 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' রহিয়াছে। চৈতন্যজীবনী-কাব্য হিসাবে প্রথম নাম করিতে হয় বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত', লোচনের গ্রন্থ রসাত্মক রচনা হিসাবে

মূল্যবান্ হইলেও জীবনী হিসাবে মূল্যহীন; জয়ানন্দের রচনা জনশ্রুতি ও অবাস্তর কাহিনীর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত (১৮৯৫ খৃঃ) নিবন্ধটি নিতান্তই অর্বাচীন; ইহাকে শ্রীচৈতন্যজীবনীর প্রামাণ্য দলিল মনে করিবার কোন যুক্তি নাই।

সর্বাপেক্ষা সুলিখিত ও প্রামাণ্য চৈতন্য-জীবনী-সংক্রান্ত গ্রন্থ হইতেছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত'। সমস্ত চরিত-কথাগুলির মধ্যে কেবল ইহার মধ্যেই শ্রীচৈতন্য-দেবের অন্তিম দ্বাদশ বৎসরের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, জীবনীগ্রন্থ-হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-সম্ভার, রঘুনাথ দাসগোস্বামী ও স্বরূপ দামোদর প্রভৃতির নিকট হইতে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য ও দার্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদির যথাযথ বিন্যাস—এই গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণব-সমাজ এই গ্রন্থটির অত্যন্ত সমাদর করিয়া থাকেন। গ্রন্থটির একটি টীকা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে। টীকাকার বৈষ্ণব দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে প্রচলিত রচনা তিনটি—'চৈতন্যচরিতামৃত', 'গোবিন্দলীলামৃত' (সংস্কৃত) মহাকাব্য ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রণীত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থের টীকা 'সারঙ্গরঙ্গদা'। কোন রচনাতেই লিপিকাল-জ্ঞাপক কোন শ্লোক যুক্ত হয় নাই। 'চৈতন্যচরিতামৃত' তিনটি ভাগে বিভক্ত: আদিলীলা, পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ১৭; ১-১২ পরিচ্ছেদ মুখবন্ধ ও অবশিষ্টাংশ চৈতন্য-দেবের নবদ্বীপ-লীলাবর্ণন। মধ্যলীলা, পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ২৫; বৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর নীলাচল প্রত্যাগমন পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। অন্ত্যলীলা, পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ২০; মহাপ্রভুর তিরোধান ব্যতীত শেষ জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের ছন্দ মূলতঃ ত্রিপদী ও পয়ার, গান করিবার বিশিষ্ট অংশগুলি 'যথা রাগঃ' বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রতিটি লীলার শেষে বঙ্গসাহিত্যে সুবিরল একটি পরিচ্ছেদসূচী [অনুবাদ] প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থটি পুরাতন বাঙ্গালা ভাষাতে বিরচিত, উদ্ধৃতি-বহুল, কিন্তু দুর্বোধ্য নহে। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাস, মালাধর বসু ও বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বৃন্দাবন দাসের পূর্বসূরিত্ব স্বীকার করিয়াও কবি যাহা রচনা করিয়া গেলেন, তাহা অচিন্তিত-পূর্ব। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর চৈতন্যের রাঢ় ভ্রমণ ও শান্তিপুরে আগমনের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে 'চৈতন্য-চরিতামৃত' ও 'চৈতন্য-ভাগবতে'র মধ্যে অনৈক্য দেখা যায়; এক্ষেত্রে কবিরাজ গোস্বামীর বিবৃতিকে ঐতিহাসিক মূল্য দিতে হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নামে একাধিক ব্যক্তির রচনা চলিয়া গিয়াছে। সাধন-সম্পর্কিত বিবিধ আকৃতির কতকগুলি নিবন্ধের (যথা, স্বরূপবর্ণন, আত্ম-জিজ্ঞাসা, রত্নসার ইত্যাদি) আত্মপরিচয় অংশে রচয়িতৃগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামের 'কঞ্চুকমুড়ি' দিয়াছেন; আবার কখনও বা কেহ আপনাকে কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য [যথা, সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ের কবি মুকুন্দদাস] বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত লেখার সহিত কবিরাজের কোনই সম্বন্ধ নাই। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র অপব্যাখ্যাও যে হয় নাই, এমন নহে। অকিঞ্চনদাসের 'বিবর্তবিলাস' নামক গ্রন্থটি তাহারই প্রমাণ দেয়। ইহাতে 'চরিতা-মৃতে'র প্রতি জীবগোস্বামীর বিরাগ-বিষয়ক গোটা কত কাহিনী রহিয়াছে।

কবিরাজ গোস্বামীর রচনাবলীর—বিশেষতঃ চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ, উদ্ধৃতি, ব্যাখ্যা ও প্রভাব খৃষ্টীয় ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতকে

বিরচিত বহু গ্রন্থে পড়িয়াছে। যেমন, ষোড়শ শতকের রচনা—ঈশাননাগর-কৃত 'অদ্বৈত-বিলাস', লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র', বিষ্ণুদাস আচার্যের 'সীতাগুণকদম্ব', কবিশেখর-রচিত 'অষ্টপ্রহরীয়া পদাবলী', নন্দকিশোর দাসের 'রসকলিকা'; সপ্তদশ শতকের লেখা—রাজবল্লভের 'মুরলীবিলাস', যদুনন্দন দাসের 'গোবিন্দ-লীলামৃত' কাব্য, মনোহর রায়ের 'দিনমণি-চন্দ্রোদয়'; অষ্টাদশ শতকের রচনা—কবিচন্দ্রের 'ভাগবতামৃত', কৃষ্ণদাসের 'চমৎকারচন্দ্রিকা', নীলাম্বরদাসের 'সংগৃহীতসুধাসার', প্রেমদাসের 'বংশীশিক্ষা' প্রভৃতি।[১]

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষার্ধে বিরচিত 'ভুবনমঙ্গল' নামে একটি চৈতন্যচরিত-কাব্যের খণ্ডিত পুঁথি মিলিয়াছে। পুঁথিটির রচয়িতা নিত্যানন্দ প্রভুর অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য চূড়ামণি দাস।

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়ের কালনির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে বিস্তর মতানৈক্য বর্তমান। ৺জগবন্ধু ভদ্রের মতে কবির জীবৎকাল ১৪১৮ শক—১৫০৪ শক [১৪৯৬ খৃঃ—১৫৮২ খৃঃ], পিতা ভগীরথ, মাতা সুনন্দা, ভ্রাতা শ্যামদাস, জাতি বৈদ্য ['গৌরপদতরঙ্গিনী'-র উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য]। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ হইতে জানা যায় কবির বাসভূমি নৈহাটির নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে (স্বপ্নে, 'প্রেমবিলাস'-এর মতে সাক্ষাৎ) কবি ব্রজে আসিয়া রূপ-সনাতনের আশীর্বাদ লাভ করিয়া রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহান্তদিগের আগ্রহে তিনি শ্রীচৈতন্যের শেষলীলা বর্ণনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবনদাসের আজ্ঞাও পাইয়াছিলেন এবং চরিতামৃতের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন সাক্ষাৎদ্রষ্টা ব্যক্তির নিকট হইতে। ইঁহাদিগের মধ্যে রঘুনাথ ও স্বরূপ-দামোদরের নাম উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিকতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার অবকাশ কবিরাজ গোস্বামী রাখেন নাই। বীর হাম্বিরের রাজত্বকালে পুঁথি-লুটের কাহিনী আদৌ ঘটিয়াছিল কিনা, এই বিষয়ে গুণিজনের সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরসন হয় নাই।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র রচনাকাল গ্রন্থকর্তার ন্যায়ই অজ্ঞাত। এই বিষয়ে পরিগৃহীত মতানু-সারে গ্রন্থের রচনাকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের মধ্যবর্তী সময়ে। পুঁথি ও অধিকাংশ মুদ্রিত সংস্করণের একটি পুষ্পিকা-শ্লোক লইয়া গোলযোগ ঘটিয়াছে অনেক। সেই শ্লোকটি এই :—

'শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ [পাঠান্তর : 'শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ'] জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্যেঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥'

প্রথম পাঠানুসারে রচনাকাল হয় জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা পঞ্চমী রবিবার ১৫৩৭শক=১৬১৫ খৃঃ; দ্বিতীয় পাঠানুসারে রচনাকাল ১৫০৩ শক=১৫৮১ খৃঃ। রচনাস্থল বৃন্দাবন, কবি নিশ্চয়ই প্রৌঢ়। অবশ্য 'বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির' কবির বৈষ্ণব-জনোচিত দীনতা; চরিতামৃত-রচনা শক্তিহীনের কর্ম নয়। কাব্যরচনাকালে রঘুনাথ দাস, বৃন্দাবন দাস, শিবানন্দ চক্রবর্তী, সনাতন গোস্বামী [তিরোভাবকাল ১৫৫৪ খৃঃ] প্রভৃতি জীবিত ছিলেন। জীবগোস্বামীর 'গোপালচম্পূ' [রচনা-সমাপ্তিকাল ১৫৯২ খৃঃ] কাব্যের পত্তনের কথা কবিরাজের জ্ঞাত ছিল। পূর্বোক্ত শ্লোকটি কোন পুঁথি অনুলিখনের কালজ্ঞাপক শ্লোকমাত্র, ইহা অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। পাঠান্তরের শকাব্দের সহিত মাস ও তিথির

১ ঐতিহাসিক তথ্যগুলি ডাঃ সুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম সং, ১ম খণ্ড) হইতে গৃহীত

মিল থাকিলেও বার মেলে না। কবির বৃন্দাবন-বাস সনাতনের তিরোভাবের পরে নিশ্চয় নহে, কারণ কবি রূপ-সনাতনের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৬১৫ খৃঃ রচনাকাল হইতে পারে না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কোন রচনাতেই কোন কালজ্ঞাপক শ্লোক যুক্ত হইতে দেখা যায় না। সুবৃহৎ কাব্য 'গোপালচম্পূ'র রচনা-সমাপ্তিকালও চরিতামৃতের পূর্ববর্তিত্বের পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ নহে। পুষ্পিকা-শ্লোক-গুলি অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত, অনুলেখকদিগের কীর্তি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীয় গুরুর নাম কোথাও করেন নাই, কেবল বলিয়াছেন তিনি চৈতন্যের একজন প্রধান অনুচর ছিলেন, কিন্তু সাধারণ ধারণা তিনি রঘুনাথ দাসের শিষ্য ছিলেন। কবির স্বীকৃতি :

'শ্রীরূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
* * *
যত্তপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিএ আমি তাঁহার প্রকাশ।'

অনেকে অনুমান করেন কবির গুরু ছিলেন স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু।

রাধাকৃষ্ণলীলা-সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র গৌড়। কবিরাজ গোস্বামীর কাব্য চৈতন্য-জীবনী, তৎপ্রবর্তিত ধর্মমত, বৈষ্ণবদর্শন ও রসশাস্ত্রের 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' বা বিশ্বকোষ। দুস্তর তত্ত্বসমুদ্রে 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র তরণী ভক্তজনের ও অনুসন্ধিৎসুর পরম নির্ভর। পাণ্ডিত্যের সহিত কবিত্বের এইরূপ সহজ মিলন যথার্থ ই দুর্লভ। সত্যই 'চৈতন্য-লীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান'॥

ভাষা ও ভাব

ডাঃ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

ভাষা বলে : ওগো ভাব,
ভাবিছ কি বসি ?
হের আমি 'কৃষ্ণ' নাম
করি দিবানিশি॥

ভাব বলে : ওগো ভাষা
কথা মোর কই ?
'কৃষ্ণের' প্রেমেতে আমি
সদা মগ্ন রই।

দুলিছে রাধা-শ্যাম

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

ঝুলন-দোলনায় দুলিছে রাধা-শ্যাম !
ভুবন ভ'রি জাগে মধুর রূপ ঠাম !
যেন রে মেঘ 'পরি বিজুলী রূপ ভ'রি
কনক হাসি-ছটা ঝকিছে অভিরাম !
ঝুলন-দোলনায় দুলিছে রাধা-শ্যাম !

দুলিছে শিখী-চূড়া মাধব-শিরোশোভা,
দুলিছে পীত-বাস, হয়েছে মনোলোভা !
শ্রীকরে বাজে বাঁশী, অধরে মধু-হাসি,
পরাণ ভুলে যায় হেরি সে প্রাণারাম !
ঝুলন-দোলনায় দুলিছে রাধা-শ্যাম !

কানন-ফুলে গাঁথা মালিকা দোলে গলে,
অযুত নভ তারা মাণিক হ'য়ে জ্বলে !
দুলিছে রাঙাপদ- বিকচ-কোকনদ,
দুলিছে মুখখানি যেন রে শশী-দাম !
ঝুলন-দোলনায় দুলিছে রাধা-শ্যাম !

দুলিছে পাশে রাধা উপমা নাহি আর !
কষিত হেম যেন তনুর দ্যুতি তার !
বলয়-কঙ্কণ বাজিছে কনকন,
ধ্বনিছে নিরবধি শ্যামেরি মধু নাম !
ঝুলন-দোলনায় দুলিছে রাধা-শ্যাম !

বিরহে জর-জর বেদনা-ভরা-বুক,
খুঁজিয়া পেল আজি গভীরতম সুখ !
যে নদী ছিল দূরে, সে আজি মধু সুরে,
সাগরে ধেয়ে এসে দুলিছে অবিরাম !
ঝুলন-দোলনায় দুলিছে রাধা-শ্যাম !

বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন

[প্রথম প্রস্তাব]

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করার পর আজ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এই পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরে তাঁর সম্বন্ধে অবিরাম বহুবিধ আলোচনা হয়েছে, দেশে বিদেশে বহু মনীষী এই কার্য সম্পন্ন করেছেন। সেই সকল আলোচনা হতে বিশ শতকের মধ্যপাদের মানুষ আমরা এই জেনেছি যে নতুন যুগে ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন পুনর্গঠনে অন্যতম প্রধান শক্তি ছিলেন বিবেকানন্দ, আর সমগ্র বিশ্বের ধর্ম-দর্শন-সংক্রান্ত চিন্তাধারায় তাঁর নব-বেদান্তবাদ এক অমূল্য অবদান। সংক্ষেপে তিনি জাতীয় জাগরণের গুরু, স্বদেশপ্রেমিকদের সেনাপতি, বেদান্ত-ধর্মের নির্ভীক ও শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা—তাঁর এই পরিচয়ই আমরা এতাবৎ কাল পেয়েছি। উনিশ শতকের শেষ দশ বৎসর ছিল তাঁর কার্যকাল। সে এক মহাযুগ-সন্ধিক্ষণ; সেই সময় ভারতের সুপ্রাচীন সমাজ-জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন পূর্ণ গতিবেগ প্রাপ্ত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন। স্বাধীনতা-সংগ্রাম তখন কিভাবে, কোন্ পথে আরম্ভ হবে—তার অপেক্ষায় ছিল। বিবেকানন্দের আবির্ভাব সেই দৃষ্টির বাধা দূর ক'রে দিল; সৈনিকেরা পথটিকে আবিষ্কার ক'রে নিলেন। তার পর সেই আন্দোলনে পরোক্ষভাবে কেন্দ্রশক্তিরূপে কাজ করেন বিবেকানন্দ; স্বাধীনতা-সংগ্রামের লক্ষ লক্ষ সৈনিক তাঁর জীবন, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মোৎসর্গ করেছেন। তখনকার সমাজ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পরিবর্তন ও উন্নতি রূপ পেয়েছে তাঁর বাণী থেকে। এ কথা সে যুগের মনীষী কর্মী ও একালের ঐতিহাসিকেরা—সকলেই স্বীকার করেছেন।

কিন্তু, সেই জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রভাত ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের মুহূর্ত আজ অতিক্রান্ত। সমাজ-জীবন কালবশে আমূল রূপান্তরিত হয়েছে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামও শেষ হয়েছে। অর্থাৎ তখনকার অধিকাংশ সমস্যাই আজ আর নেই। আমাদের জাতীয় জীবনে আজ নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র পৃথিবীতে সমাজ-সভ্যতার যে পরিণতি ঘটছে তা উনিশ শতকের শেষ-পাদেও সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। নানা পরিবর্তন সমাজের রূপান্তর সাধন করেছে; রূপান্তরিত হয়েছে আমাদের মূল্যবোধ। পূর্ব যুগের জীবন-মূল্য আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখছি, তার অনেক কিছুই পরিত্যাগ করতে হবে; অনেক কিছুই আজ আমরা মানব-জীবন-দর্শনে শেষ কথা নয় বলে জেনেছি। বিশ শতকের এই মধ্যপাদে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে এক শতাব্দী কাল মধ্যে আমরা সহস্র বৎসরে সম্ভাব্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছি। যন্ত্র-আবিষ্কার ও যন্ত্র-প্রয়োগ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে; এবং এরই বিপুল প্রভাব সমাজ-মানসের উপর আজ দেখা যাচ্ছে।

এই যুগের জীবন-দর্শনের রচয়িতা কে? এ কথা চিন্তা ক'রে দেখতে গেলে যুগসন্ধিক্ষণের স্বামী বিবেকানন্দের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গত যুগের উপর তাঁর আধিপত্য নিয়ে আমাদের আলোচনা ব্যাপৃত ছিল বলে

এ ভ্রান্ত ধারণা অনেকেরই মনে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে যে বাংলায় তথা ভারতে বিবেকানন্দ-যুগের অবসান হয়েছে। অনেক যশস্বী সমাজ-তত্ত্ববিদও এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েছেন।[১] কিন্তু, যুগান্তরের অধিনায়ক-রূপেই যে বিবেকানন্দের আবির্ভাব—আগামী কালের সেই স্রষ্টার দিকে আমরা আশাপথ চেয়ে বসে আছি, সে কথা উপলব্ধির দিন আজ এসেছে। এতকাল বিশেষ কারও নজরে পড়েনি যে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দেরও একটি সমাজ-দর্শন আছে—এতকাল আমরা তা প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে এসেছি। অবশ্য এ উপেক্ষা ইচ্ছাকৃত নয়, কালান্তরের পূর্বে নবযুগ-সৃষ্টিকারী দর্শন-চিন্তা লোকমনের আয়ত্ত-সাধ্য ছিল না বলেই এটা ঘটেছে। কালের পরিবর্তন আজ আমাদের দৃষ্টির বাধা অপসারিত করেছে, তাঁর প্রতি কথা, তাঁর বক্তৃতাবলীর প্রতি ছত্রে ছত্রে আজ আমরা নতুন পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি।

অবশ্য এর থেকে যেন কেউ একথা না মনে করেন যে সমাজ-তত্ত্ব রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সযত্ন প্রয়াসে মার্কসীয় দর্শনের মতো একখানি সমাজ-দর্শন রচনা করেছেন। স্বল্পকাল-ব্যাপী কর্মজীবনে তাঁর সে সময় ছিল না; আর বসে বসে থীসিস্ রচনাও তাঁর কাজ ছিল না। তিনি এসেছিলেন এক জীবন্ত প্রেরণা হয়ে, জলন্ত সূর্যের মতো সক্রিয় শক্তিরূপে। তাঁর স্বল্পকালব্যাপী জীবন একটি নিদ্রিত মহাজাতির ঘুম ভাঙাতে ও গৌরবময় ঐতিহ্যের পথে পুনর্বার গতিবেগ সঞ্চার করতে এবং বিশ্ব-মানব-সভ্যতাকে অদূর ভবিষ্যতে আসন্ন সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য গঠনমূলক কাজ করতেই ব্যয়িত হয়েছিল। কিন্তু, মানব-সমাজ পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা যাঁর ছিল, তাঁর সমাজ-গঠনের মূল প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, বিবর্তনের বিধিনিয়ম সব কিছু সম্বন্ধেই সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করতে হয়েছিল। তাঁর সেই সকল চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে আছে তাঁর আট খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলীর অন্তর্গত বিভিন্ন বক্তৃতায় ও রচনায়। বেশীর ভাগ বক্তৃতাগুলি পূর্ব-পরিকল্পিত নয়, প্রস্তুত-না-করা (extempore) বক্তৃতা বলেই জীবনীকারেরা বলেন। কিন্তু, আশ্চর্যের কথা এই যে তাঁর সমাজ-চিন্তা মোটেই এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত বা অসম্পূর্ণ নয়, তা রীতিমতো সুসম্বদ্ধ ও সুগঠিত এবং এর ভিত্তি ইতিহাস বিজ্ঞান সমাজ-তত্ত্ব ও গভীর প্রজ্ঞালব্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর এই সকল চিন্তাধারার মধ্যে কোন অসঙ্গতি বা অযৌক্তিকতা স্থান পায়নি। তবে হয়তো অনেক কথাই সূত্রাকারে আছে, যা ভাষ্যকারের অপেক্ষা রাখে। আরও লক্ষণীয় এই যে এ সমাজ-দর্শন আদৌ অবাস্তব আদর্শবাদ নয়; তাঁর অনেক সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তী ইতিহাস-সম্মত, কিছু পরবর্তী ইতিহাস সত্য বলে প্রমাণিত করেছে, কিছু উত্তরকালের সমাজ-তত্ত্ববিদেরা স্বতন্ত্র গবেষণা দ্বারা বহু আয়াসে সত্য প্রমাণ করেছেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও ভবিষ্যদৃষ্টির প্রমাণ এইখানে। এজন্য তাঁর সমাজ-দর্শনের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের কোন কোন সমাজ-তত্ত্ববিদের চিন্তার সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। এজন্য এঁদের মধ্যে যাঁরা তাঁর পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক তাঁদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত, একথাও অনেকে বলেন। কিন্তু, পরবর্তীকালের সমাজশাস্ত্রীদের মধ্যে অনেকে যাঁরা নতুন তত্ত্ব বা তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তাঁরাও অনেকেই তাঁর মতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, দেখা যায়। পূর্ববর্তীদের মধ্যে কতেঁ ফিক্‌টে, হার্ডার, মার্কস্-এঙ্গেলস্, প্রিন্স ক্রোপোট-কিন প্রভৃতি ও পরবর্তীদের মধ্যে টয়েনবী

(১) বিনয় ঘোষ—বাংলার নবজাগৃতি।

গোরোকিন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন গবেষক, লেখক এতাবৎ কাল আগ্রহ দেখাননি বলে অনেক ভুল ধারণা, অনেক হাস্যকর ভ্রান্ত মতের সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে একটি প্রচলিত ভ্রান্ত মত: তাঁর ধর্মচিন্তার জন্য বেদান্ত-দর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি ঋণী, কিন্তু তাঁর সমাজ-চিন্তার জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে ইওরোপীয় চিন্তানায়কদের কাছে ঋণী। এবং এই প্রকল্প হতে কেউ কেউ এই অভিমত দিয়েছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ 'মধ্যযুগীয়' প্রভাবের মধ্যে তিনি যদি না পড়তেন তাহলেই তিনি তাঁর চিন্তাধারায় ও কার্যকলাপে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিতে পারতেন, দেশ ও সমাজের উপকারে লাগতেন। এ মত এমনই হাস্যকর যে এ নিয়ে আমাদের আলোচনা ক'রে সময় অপচয় অনুচিত হবে। বিবেকানন্দরূপ শক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ গঠন করেছেন, এ কথা বিবেকানন্দের নিজের। সেই বিরাট অধ্যাত্ম-সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত বিবেকানন্দ, তাঁরই অপরদিক—সমাজ-সংসারের সক্রিয় গঠন-শক্তি; যেমন সূর্যের তেজকণায় সঞ্জীবিত পৃথিবীর প্রাণলীলার চাঞ্চল্য সেই সৌর-শক্তির রূপান্তর মাত্র। রামকৃষ্ণের সমন্বয়-বাণীর ধারক, বাহক ও পালক বিবেকানন্দ বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার হতে গ্রহণ করেছেন প্রত্যেক যুক্তিসহ তত্ত্বকে, স্থান দিয়েছেন নিজের সুবিশাল চিন্তাধারায়।

বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তার দিকে প্রকৃষ্টভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ভারতীয় সমাজ-তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তিনি তাঁর 'Creative India'-য় 'Vivekananda as an World-conquerer' এবং 'Ramakrishna the Prophet of the young and the new' শিরোনামায় দুটি নিবন্ধে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এই দর্শনের সঙ্গে। সেখানে তিনি এই নূতন সমাজ-দর্শনের মূল্য নির্ধারণ করবার প্রয়াসও পেয়েছেন। তিনি উক্ত আলোচনার শেষে বলছেন:

> Altogether as embodying, the synthesis of the positive and idealistic, Ramakrishna has furnished the young and the new with the tremendous psychology of world conquest, of supremacy over the bounds of nature, of emancipation from the fetters of society. And it is under the inspiration of this synthesis that an India of secular activities and cultural adventure, an India of material prosperity and idealistic social service—has been absorbing the interest of constructive thinkers and statesmen of young India. (Creative India—pg. 696)

—অর্থাৎ আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয়ের প্রতিমূর্তি রামকৃষ্ণ বর্তমান যুগের নব্যপন্থীদের ও তরুণ সম্প্রদায়ের মনে বিশ্বজয়ের মনোভাব জাগ্রত করেছেন। প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন করতে, সমাজের অন্যায় বন্ধন ভেঙে ফেলতে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে তাঁর বাণী—উদ্বুদ্ধ করছে ভারতে আর্থিক উন্নতি ও সেবা-ধর্মের সমন্বয় সাধন করতে। পরিষ্কাররূপে এই কথা-কয়টির মধ্যে আমরা বিবেকানন্দ কর্তৃক ব্যক্ত ও রামকৃষ্ণে মূর্ত নতুন সমাজ-দর্শনের পরিচয় পাচ্ছি।

> From the days of Mahenjo Daro culture of the Indus valley to the neo-Vedantic positivism of the Gangetic delta of to-day, world culture and humanity have been experiencing the 'charaiveti' (march on) of Hindu energism. It is but the five thousand year old Indian tradition of 'Digvijaya'—world-conquest and elevation of the most diverse races and classes to soul-entrancing ideals and activities that Vivekananda and after him the Swamis of the Ramakrishna order have been pursuing under modern condition, thereby exhibiting the vitality and strenuousness of Hindu humanism and spirituality.

অর্থাৎ সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদারো সভ্যতার কাল থেকে বর্তমান যুগের গাঙ্গেয় বদ্বীপের নব বৈদান্তিক বাস্তববাদের কাল পর্যন্ত বিশ্ব-সভ্যতা ও মানবজাতি হিন্দু শক্তিবাদের

একই বাণী—'চরৈবেতি' লাভ করেছে। সেই পাঁচ হাজার বছরের পুরানো জগজ্জয়ের সে ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন শ্রেণীকে স্ব স্ব ভাবে আত্মমুক্তির আদর্শে ও কর্মে জাগ্রত করবার যে ধর্ম তাইই বিবেকানন্দ ও তাঁর অনুগামী সন্ন্যাসিগণ অনুসরণ করেছেন তাঁদের কর্মপন্থায়। এর দ্বারা হিন্দু মানবতা ও আধ্যাত্মিকতার শক্তি ও সামর্থ্যের নতুন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের মূলকথা এই 'চরৈবেতি' বাণী। মানুষ অগ্রসর হয়ে যায়, তাই সমাজের পরিবর্তন ঘটে। গতি ও পরিবর্তন প্রাণধর্মের পরিচায়ক। সে সময় সাধারণের এই মহা বিভ্রান্তিকর ধারণা মনে দৃঢ় সন্নিবদ্ধ হয়েছিল যে সমাজ অপরিবর্তনীয়। সমাজ অপরিবর্তনীয়, এ অযৌক্তিক কথা; প্রাচ্যদেশে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলছেন :

> Customs of one age, of one yuga, have not been the customs of another and as yuga comes after yuga, they will still have to change.

অর্থাৎ এক যুগের প্রথা আর এক যুগের প্রথা নয় এবং যুগের পর যুগ যখন আসে, তখন সেই সব প্রথার রূপান্তর ঘটে কিন্তু আবার তিনি বলছেন :

> We know that in our books, a clear distinction is made between two sets of truth—the one set is that which abides for ever, being built upon the nature of man, on nature of the soul, the soul's relation to God, perfection and so on. there are principle of cosmology of the infinitude of creation, on more correctly speaking—projection, the wonderful law of cyclical procession, and so on ; these are principles founded upon universal laws in nature. The other set comprises the minor laws, which guides the working of our everyday life. Even in our nation the minor laws have been changing all the time.
> (Complete works—Vol III—pg. 112)

অর্থাৎ আমরা জানি যে আমাদের শাস্ত্রে দুটি সত্যের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। প্রথম হচ্ছে যা অপরিবর্তনীয় শাশ্বত সত্য—জীবের প্রকৃতি, আত্মার স্বরূপ, জীবাত্মা ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ, পূর্ণতা ইত্যাদি সম্পর্কিত; এই অনন্ত সৃষ্টির রহস্য এই বিশ্ব-প্রকৃতি যার প্রয়োগমাত্র, চক্রাকারে যা পরিবর্তনশীলতার অপূর্ব নিয়মের অধীন, ইত্যাদি; এগুলি প্রকৃতির সর্বজনীন বিধির উপর ভিত্তি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। অপর যে সত্য তা অগৌণ নিয়মের সমষ্টি, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবন চালিত করে। আমাদের এই জাতিরও এই সকল অগৌণ নিয়ম সমস্ত সময়ই পরিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই অপরিবর্তনীয়ের মধ্যে যে পরিবর্তন তাই বিবেকানন্দের তত্ত্বের মূল কথা। কিন্তু এ তত্ত্ব আধুনিক অনেক প্রসিদ্ধ সমাজ-তত্ত্ববিদ্দের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের বিপরীত। কার্ল মার্কস্ বলেন পরিবর্তনীয়তাই সমগ্র বিশ্বের ও সৃষ্টির মূল তত্ত্ব; অপরিবর্তনীয় এখানে কোন কিছুই নেই। এখানেই এই দুই আধুনিক চিন্তাবীরের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্যের আরম্ভ। উভয়ের সমাজ-চিন্তায় এই দার্শনিক চিন্তার প্রভাব প'ড়ে উভয়কে এই বিভিন্নমুখী পন্থায় সমাজ-সভ্যতার সঙ্কটের পথ নির্ধারণে নিযুক্ত করেছে। এবং সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনের ধারা ; সমাজ-জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ, লক্ষ্য—এ সব কিছু সম্বন্ধে তাঁদের ভিন্ন আদর্শের অভিমুখী করেছে। অনিত্যের মধ্যে নিত্যের অবস্থিতিতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য চিন্তা চেষ্টা ধ্যানধারণা সব কিছুই পালটে যায়, কাজে কাজেই পালটে যায় সমাজ-সভ্যতার গতি-বিকাশের সম্বন্ধে ধারণারও।

বিবেকানন্দ যে প্রাত্যহিক জীবনের অগৌণ বিধির কথা বলেছেন তা পরিবর্তনশীল, কেন এ কথা বললেন—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এ সকল যে পরিবর্তনশীল, তা আমরা নিত্য চোখে দেখতে পাই, কিন্তু 'কেন ?' এই হ'ল প্রশ্ন। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের শাশ্বত সত্য সম্বন্ধে ধারণা

অস্বচ্ছ; আমরা যে জীবন যাপন করি, তা শাশ্বত-সত্য উপলব্ধির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে আমরা পারি না; সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা সমাজবদ্ধ হয়েছি এবং সমাজ-জীবন পরিচালনা করবার প্রয়াস পাচ্ছি! কিন্তু মর-জগতে ক্ষণস্থায়ী বস্তু নিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিপূর্ণরূপে এবং আজীবন সমানভাবে আমাদের যে অসাধ্য প্রয়াস তা অবশ্যই সফল হয় না। এই বিধানের রূপ তাই বারে বারে বদলায়। সামাজিক নিয়ম কানুন প্রথা সবই তাই বারবার বদলায়; এক যুগে যা ভাল তা আর এক যুগে ভাল নয়। কারণ সমাজ-সংগঠনের বিভিন্ন মৌল উপাদানের কোন একটিতে হয়তো পরিবর্তন হয়েছে, ফলে সমাজের নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি, শৃঙ্খলা-বিধি, জীবন-যাত্রাপ্রণালী, মূল্যবোধ সবই বদলায়। কিন্তু মূল্যায়ন দণ্ড যেটি তার পরিবর্তন ঘটে না; তার ভিত্তি মানব-প্রকৃতি, জীব, ঈশ্বর, আত্মার-স্বরূপ, সৃষ্টির মূল রহস্য, আর তার অনন্ত চক্রাকারে বিবর্তনশীল প্রক্ষেপ এই বিশ্ব জগৎ—এই সব শাশ্বত সত্যের উপলব্ধির উপর। এই মূল্যায়ন দণ্ডটি বারবার মহাপুরুষেরা, শাস্ত্র-কারেরা, আইন-রচয়িতারা গঠন করবার প্রয়াস করেন নতুন ক'রে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-জীবনে আর্থিক পরিবর্তনের সঙ্গে আমরা সচেতন প্রয়াস করি কোনও বাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি সমাজে উপস্থাপন করতে। সেইজন্য, বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে দেখা যায় যে বিবেকানন্দ-বিবৃত সত্য এবং পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয় সত্য সম্বন্ধে যে ধারণা তার সম্যক্ পরিচয় না গ্রহণ করলে সমাজ-জীবন ও তার মূল সক্রিয় মৌল উপাদান-গুলি আমাদের কাছে অন্ধ অনায়ত্ত শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। মানুষ আর্থিক শক্তিরই হাতে অন্ধ ক্রীড়নক মাত্র, এ ভ্রান্তিমূলক ধারণা সমাজ-তত্ত্বে এই কারণেই প্রবেশ করেছে। আর্থিক শক্তি সমাজ-জীবনের অন্যতম মৌল উপাদান এবং পরিবর্তনের ব্যাপারে অন্যতম সক্রিয় শক্তি, তা বলে মানুষ তার অন্ধ দাস নয়। আমরা তার সঙ্গে আমাদের সচেতন প্রয়াস সংযুক্ত ক'রে তাকে নানারূপ ডৌল দিতে পারি। তাছাড়া, মানুষের অধ্যাত্ম ও ধর্ম-চিন্তা, শিল্প-প্রয়াস ও উপলব্ধি, জীবন-বোধ ও জীবন-রহস্য-বোধের প্রচেষ্টা—এগুলিও সমাজ-জীবনের পরিবর্তনে সক্রিয় শক্তি। বুদ্ধের ধর্ম-চিন্তা ও মার্কসের দার্শনিক ও সমাজ-চিন্তা সমাজে বহু পরিবর্তন এনেছে, বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে ও চীন-রাশিয়ার বিপ্লবের মধ্যে তার সাক্ষ্য আছে।

মানব-প্রকৃতি ও মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নিরূপণের উপর সমাজ-জীবন অনেকাংশে নির্ভর-শীল। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ দু'টি মূল তত্ত্বের উদ্ঘাটন করেছেন, তা তাঁর সত্য উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। তা হ'ল প্রথমতঃ মানুষের দেবত্ব (Divinity of man) ও মানুষের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রবণতা (Essential spirituality of man)-এর থেকে তিনি সমাজ-জীবনের কাম্য রূপ নির্ণয় করেছেন; বলেছেন:

> That every society, every state, every religion ought to be based on the recognition of this all-powerful presence latent in man. ......That in order to be fruitful all human interest .ought to be guided and controlled according to the ultimate idea of the spirituality of life.

অর্থাৎ প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক রাষ্ট্র, প্রত্যেক ধর্মকে মানুষের মধ্যে সেই সর্বশক্তিমান অস্তিত্ব যে সুপ্ত অবস্থায় নিহিত আছে, এই সত্য স্বীকৃতির উপর ভিত্তি ক'রে দাঁড়াতে হবে এবং মানব-জীবনের যে আধ্যাত্মিক-প্রবণতা স্বাভাবিক তা জেনে নিয়ে মানুষের সব স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে

গড়ে তুলতে হবে ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তবেই সমাজগঠনের উদ্দেশ্য সফল হবে। তাঁর এ কথার তাৎপর্য কি ? এ কথার সুগভীর তাৎপর্য আজও পর্যন্ত ভেবে দেখিনি আমরা। সেই কারণেই আমরা এর এই নিহিতার্থ এতাবৎকাল ধরে নিয়েছি যে তিনি এর দ্বারা সব মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা ও সকলকে সমান অধিকার প্রদানের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। কথাটি সত্য, কিন্তু আংশিক সত্য। সব মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা তিনি নিশ্চয়ই বলেছেন। কিন্তু তা স্থূল আর্থিক বা রাজনৈতিক অধিকারের অর্থে মাত্র নয় এবং ঠিক এই জন্যই তাঁকে অন্যান্য সমাজতন্ত্রবাদীদের সমগোত্র বলে ঘোষণা করলে নিতান্ত ভুল হবে। আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকারের কথাই মাত্র তিনি বলেননি, তা হ'লে তাঁর মৌলিকতার কোনও দাবিই থাকে না। তিনি বলেছেন সমান অধিকার থাকলেই চলবে না, মানুষের সব স্বার্থ গড়ে তুলতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক-প্রবণতার দিকে দৃষ্টি রেখে। এখানেই বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তা অন্যান্য যাবতীয় সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌দের চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন রূপ নিয়েছে এবং নতুন অর্থবহ হয়ে উঠেছে। যে সাম্যবাদের কথা তিনি বলেছেন তাই তার রূপও অন্য। বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলেই সে সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। সে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যপদ্ধতি, সে সমাজের সমগ্র জীবন মানব-জীবনের দেবত্ব ও আধ্যাত্মিকতা উন্মেষের সহায় হবে। ফলে শুধু রাষ্ট্রবিপ্লব নয়, আর্থিক বিপ্লব নয়, মানুষের সমগ্র জীবন-জোড়া এক আমূল পরিবর্তনের তিনি রূপ দিয়েছেন ; এবং সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধার অবসান চেয়েছেন তিনি। শুধু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক নয়, ধর্মের নামে যে বিশেষ সুবিধা আবহমান কাল ধরে প্রতিষ্ঠিত রাখবার প্রয়াস চলেছে তারও তিনি অবসান চেয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত :

But the idea of privilege is the bane of human life....There is first the brutal idea of privilege, that of strong over the weak. There is the privilege of wealth. If a man has more money more than another he wants a little privilege over those who have less. There is still the subtler and more powerful privilege of intellect; because one man knows more than others, he claims privilege. And the last of all and the worst, because the most tyrannical is the privilege of spirituality. If some persons think that they know more of spirituality, of God, they claim superior privilege over everyone else... The same power is in every man, one manifesting more, the other less, the same potentiality is in every one. There is the claim to privilege ?

—(Vedanta and Privilege)

সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধার অবসান চেয়েছেন বিবেকানন্দ ; সে বিশেষ সুবিধা শারীরিক শক্তির ভিত্তিতে হোক, অর্থের বুদ্ধির বা বিদ্যাবত্তার ভিত্তিতে হোক বা ধর্মের ভিত্তিতে হোক। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজের যে পরিকল্পনা করেছেন বিবেকানন্দ তাতে বিশেষ সুবিধার কোনও স্থান নেই।

যে সর্বাত্মক সাম্যবাদের কথা বিবেকানন্দ বলেছেন, অনেকে তাকে নিছক কয়েকটি উচ্ছ্বাসের কথা বলে ধরে নিয়ে তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন 'romantic socialist'. পাশ্চাত্যে এই আখ্যা-প্রাপ্ত কয়েকজন সাম্যবাদী আছেন, যথা Robert Owen, St. Simon, Fichte প্রভৃতি। কিন্তু এই সকল সাম্যবাদীদের সঙ্গে বিবেকানন্দের আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ তাঁদের সাম্যবাদ হচ্ছে একটি 'pious wish' বা সদিচ্ছা মাত্র, যুক্তি-তর্কের ভিত্তি তাঁদের

বিশেষ ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দের অভি-মতের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক যুক্তি-সহ ও ইতিহাস-সম্মত। প্রথমতঃ বেদান্তের সিদ্ধান্ত হতে তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী তাঁর সিদ্ধান্ত তিনি উপস্থাপিত করেছেন জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ যদি অভিন্ন হয়, তাহলে সহজ সিদ্ধান্ত এই যে সব মানুষের সমান অধিকার আছে, কারও কোন বিশেষ সুবিধা থাকতে পারে না। এ ছাড়া বিজ্ঞান ও ইতিহাস-ব্যাখ্যার দ্বারাও তিনি তাঁর মত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করেছেন তাঁর প্রমাণ আমরা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা পত্র এবং অনুপম অথচ অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ 'বর্তমান ভারতে' পাই। বারান্তরে এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার ইচ্ছা রইল।

শ্রীশ্রীভক্তজন-স্তুতি

[সঙ্গীত]

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

সর্বশক্তি বিশ্বপতি কে করেছে জয়?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের হৃদয়॥
অণুপরমাণু হয়েও বেঁধেছে ভূমা।
ষড়ৈশ্বর্য-রূপধারী মহান্ মহিমা॥
ভবে থেকেও ভবপাশ কে করেছে ক্ষয়?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের হৃদয়॥

বিশ্বমাঝে নিঃস্বভাবে কে করেছে দান?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের পরাণ॥
আত্মা-ধনে সর্বজনে করেছে অর্পণ।
ভরি' বক্ষ হর্ষে দুঃখ করেছে হরণ॥
বিশ্ববিষ অহর্নিশ কে করেছে পান?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের পরাণ॥

সুধাহাসি পূর্ণশশী কে করেছে ম্লান?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের বয়ান॥
স্নিগ্ধ শোভা মনোলোভা করেছে শীতল।
শতধারে মধুঝোরে তপ্ত ধরাতল॥
অমৃতের উৎস-তলে কে করেছে স্নান?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের বয়ান॥

অরূপের রূপসুধা কে করেছে পান?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের নয়ান॥
চিত্তদ্যুতি নিত্য-নিতি করেছে উজ্জ্বল।
রক্তরাগে অনুরাগে কলঙ্ক-কজ্জল॥
দেব-হৃদে পরাহ্লাদে কে মেরেছে বাণ?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের নয়ান॥

ধরাধূলা পরাজিয়া কে করেছে রণ?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের চরণ॥
পদক্ষেপে বিশ্ব ব্যেপে ফুটেছে কমল।
লীলা-লোল রসোচ্ছল নবনী-কোমল?
স্বর্গ-লোকে নিত্য-সুখে কে করে ভ্রমণ?
সে তো আর কিছুই নয়, ভক্তের চরণ॥

রমা দীনা অকিঞ্চনা যাচে কৃপাকণা।
ভক্ত-পাদ-পদ্ম-রেণু পীযূষ-ঘনা॥
হোক ভক্তগণ জয়!
অমৃত অভয়।
হোক বিশ্ব নিরাময়!
বিভু-পদাশ্রয়॥

সমালোচনা

Idealism : A New Defence and a New Application—প্রণেতা শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পাকিস্থান কো-অপারেটিভ্ বুক সোসাইটি, ঢাকা কর্তৃক পরিবেশিত। রয়াল—১১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪৲ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-ধারার চিরাচরিত বস্তু-বিশ্লেষণের রোমন্থন নয়। ইহার প্রধান নয়টি অধ্যায়ে এবং প্রায় দেড়শত অনুচ্ছেদে, একদিকে যেমন বিভিন্ন দর্শনবাদের মূলসূত্রগুলিকে আহরণ করা হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি আবার তাহাদের সুচিন্তিত প্রয়োগমূলক সংযোগে মানবের কল্যাণকামী সমাজ কিভাবে নানা আদর্শবাদী দর্শনের সমন্বয়-সূত্রের সাহায্যে সার্থক মানবগোষ্ঠির সৃষ্টি করিয়া এই জগতেই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রসর করাইয়া দিয়া তাহাকে যথার্থ মনুষ্য-ধর্মে ব্রতী করিতে পারে—তাহারই একটি সুষ্ঠু আলোচনা রূপায়িত হইয়াছে।

ইহাতে প্রথমেই দেখিতে পাই আদর্শবাদী দর্শন-চিন্তার প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও বর্তমান রূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং উহাদেরই সাথে সাথে লেখকের ঐ সব বিষয়ে প্রশংসনীয় অভিমত-চয়ন। এই আলোচনায় সোক্রাতেস্, প্লেতো, আকুইনস্, কাণ্ট, হেগেল, স্পিনোজা, শঙ্করাচার্য, আল্-ঘাঝলী প্রভৃতি অনেকের দর্শনবাদের সারাংশের বিচার আছে এবং এই প্রসঙ্গে আদর্শবাদের কোন কোন ভুলের প্রতিও (অবশ্য লেখকের মতে) আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কিভাবে ঐসব সুসংস্কৃত আদর্শবাদের সঙ্গে বিজ্ঞান ও বাস্তবতা, তথা বস্তুবাদ ও আদর্শবাদ সম্মিলিত হইয়া আবার মনুষ্যত্বকে বাঁচাইতে পারিবে—সে বিচারও আমাদের নিকট উপস্থাপিত দেখিতে পাই।

পরিশেষে দার্শনিক ভিত্তিতে জগতের বর্তমান রাজনীতি ও সমাজনীতি সুসংস্কৃত করিলে মানুষ কিরূপে এক সর্বমানবীয় ভালবাসার জীবনালোকে উদ্ভাসিত হইয়া সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারিবে—তাহারও দিঙ্ নির্ণয় সুধী লেখক করিয়াছেন।

মোট কথা, ইহা বিভিন্ন দর্শনবাদের একটি সংকলন-পুস্তক নহে। ইহাতে দর্শনের আদর্শবাদের পটভূমিকায় ভবিষ্যৎ মানবের গ্রহণীয় দার্শনিক মতবাদের কথাই আলোচিত হইয়াছে অধিক। তথ্যের দিক হইতে এই বিচার এক নূতনতর আস্বাদে রুচিকর হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তাহা কিভাবে কার্যে পরিণত করা যায়, এবং সেজন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, কিভাবে ঐ আদর্শ প্রচার করিলে তাহা সর্বমানবের নিকট গ্রহণীয় হইবে, কিংবা এই তথ্য সত্যসত্যই এই পার্থিব জীবনে সকলের দ্বারা প্রতিপালন করা সম্ভব কিনা—ইত্যাদি প্রয়োগমূলক আলোচনার বহুমুখী বিচার আরও অধিক আলোচিত হইলে ভাল হইত।

পুস্তকের পরিশেষে লেখক যে কল্পনার ছবি আঁকিয়াছেন—'নবদর্শন'-অনুযায়ী ভবিষ্যরূপের অনুশীলন দ্বারা জগতে একটি মাত্র মানুষ জাতি তাহাদের আদর্শবাদের নবরূপায়ণের মাধ্যমে পরস্পর প্রীতি ও প্রেমের আকর্ষণে, এবং বিজ্ঞানের মঙ্গলীভূত প্রচেষ্টায় একেশ্বরবাদের আলোকে সহ-অবস্থান করিতেছে—তাহা যদি

সত্যই এই মুমূর্ষু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহা হইলে পরম মঙ্গল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সত্য-সত্যই বাস্তবে পরিণত হইবে কিনা তাহা আগামীকালের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিবে। একথা ঠিকই যে পৃথিবীর সকল মানবই যদি মহম্মদ ও রামচন্দ্র, যীশু ও শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কনফুসিয়সে পরিণত হইত তাহা হইলে জগৎ সত্যই সুন্দর হইত, কিন্তু ইহা যে হয় না, তাহাই তো সকল দুঃখের মূল।

পুস্তকটির কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই সুন্দর ও রুচিকর। ইহাতে অনেক বানান ভুল রহিয়া গিয়াছে, পরবর্তী সংস্করণে তাহা সংশোধিত হইলে পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি হইবে আশা রাখি।

আমরা সর্ব শ্রেণীর পাঠককেই এই পুস্তকে আলোচিত সকল মানবের মঙ্গলপ্রদ আদর্শ পথ-রেখার সন্ধান নিতে আহ্বান জানাইতেছি।

—মহানন্দ।

অনামী (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ) : শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত, প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা ৪২২, মূল্য টাকা ৬·৫০।

শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদপূত গ্রন্থখানি একদিকে যেমন সাধক 'সুরসুধাকরে'র অনবদ্য অবদান, অন্যদিকে তেমনি পাঠক-পাঠিকাদের আকাঙ্ক্ষিত একখানি সুন্দর সঞ্চয়ন।

'অনামী' রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া নাম; নামটি একাধিক কারণে সার্থক হয়েছে। ভাগবত রস যে নামের মাধ্যমে সিঞ্চিত হয়, যে নাম নামীর সন্ধান দেয়—সে নাম অনামীর মাঝেই হারিয়ে যায়। তাছাড়া 'অনামী' শুধু তো গীতিসঞ্চয়ন বা কাব্যসংগ্রহ নয়। সূচীপত্রেই তার পরিচয়।

(১) মণিমঞ্জুষায় আছে নানা কবির সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ কবিতার অনুবাদ। সংস্কৃত, ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান, হিন্দী, ফার্সী কবিদের কোথাও অনুবাদ, কোথাও অনুরণন, কোথাও বা প্রতিস্বনন (resonance)।

(২) 'কবিতা-কুঞ্জে' কবি নিজে সুর ধরেছেন, এখানে তাঁর নিজের নির্বাচিত কবিতা। বহু পরিচিত কবিতার সঙ্গে আবার যেন নতুন ক'রে দেখা হয়। লঘুগুরু ছন্দে ১৮ পঙ্‌ক্তির, ১২ পঙ্‌ক্তির সনেট বাংলায় বড় দেখা যায় না। ১৮টি 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিকা' ভাবের গভীর-তায়, ভাষার সংক্ষিপ্ততায় এবং ছন্দের বৈচিত্র্যে শিল্পরীতির নতুন ইঙ্গিত দেয়, তবে মনে হয় এ রীতি অনুকরণ করা সহজ নয়।

(৩) 'গীতিগুঞ্জনে'—কবির অন্তর্লোকের সাধনার সুর-মূর্ছনা বেজে উঠেছে কখনও গভীর গাম্ভীর্যে, কখনও বা ব্যাকুল ব্যঞ্জনায়।

(৪) 'মীরাভজনে' পাওয়া যায় ইন্দিরা-দেবীর 'সুধাঞ্জলি' গীতাবলীর অনুবাদ।

(৫) 'পরিশিষ্টে' আছে দেশী বিদেশী মনীষী-দের কাছে লেখা দিলীপকুমারের চিঠি, কোন কোন ক্ষেত্রে আছে দিলীপকুমারকে লেখা তাঁদের চিঠি।

এতগুলি অন্তর্নিহিত নাম যে গ্রন্থের, তার কি অন্য নাম সম্ভব? 'অনামী' নাম ঠিকই হয়েছে। এই হৃদয়োৎসারিত কাব্য-সঙ্গীত-সুষমা আমাদের ভাল লেগেছে এবং যাঁরা দিলীপ-কুমারের অন্তরের পরিচয় পেতে চান—তাঁদের পক্ষে এই সঞ্চয়নখানি অপরিহার্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

মাদ্রাজ : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৪২,৫৮৬ ('৫৭ খৃঃ ১,৩৩,৩৫১); এক্স-রে বিভাগে ৩ শতাধিক, চক্ষু-বিভাগে ১৭ হাজারের অধিক, E.N.T. বিভাগে ১১ হাজারের অধিক এবং দন্ত-বিভাগে ৫,৬৬৬ রোগীর পরীক্ষা ও চিকিৎসাদি করা হয়। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের ৯,০০০ রুগ্ণ ও অপুষ্ট শিশুর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মোট ৮৫,৮৩৯ জনকে দুধ দেওয়া হয়। লেবরেটরির পরীক্ষাকার্য উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে; ৬২০টি নমুনা পরীক্ষা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১৪জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসা করেন। সরকার ও জনসাধারণের সহানুভূতিতে এই সেবা-প্রতিষ্ঠান ক্রমবিস্তার লাভ করিতেছে।

বাঙ্গালোর : শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ খৃঃ স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রম-সংলগ্ন একটি গৃহে। জনসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রদিগকে নৈতিক জীবন-গঠনের সুযোগ দানের জন্য পর বৎসরই ডক্টর নারায়ণ রাও-এর প্রদত্ত ভবনে ইহা স্থানান্তরিত হয় এবং বিদ্যার্থিসংখ্যাও ৬ হইতে বাড়িয়া ৩৫ হয়। এই ভবনেই ১১ বৎসর বিদ্যার্থিমন্দিরের কাজ চলে।

১৯৫৪ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে নূতন বিদ্যার্থিমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ।

নীচের তলায় ১৮টি এবং উপর তলায় ১৯টি ঘর বিশিষ্ট প্রশস্ত দ্বিতল ভবনের নির্মাণ-কার্যে ৭৫,৩৫০ টাকা খরচ হইয়াছে। প্রার্থনা-গৃহ, অধ্যয়ন-গৃহ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে; গ্রন্থাগার ব্যায়ামাগার প্রভৃতি এখনও নির্মিত হয় নাই। ৮৫ জন ছাত্র এখানে থাকিতে পারিবে।

রাঁচি : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৮ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণীতে প্রকাশ : এই কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়টিতে রোগী-সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, যথেষ্ট বায়োকেমিক এবং এলোপ্যাথিক ঔষধও রাখা হয়। সহায়ক সহ একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক সেবার ভাবে প্রতিদিন রোগিগণের চিকিৎসা করেন। এ বৎসর রোগীর সংখ্যা ৮ হাজারের উপর। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পথ্যও দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত দরিদ্র পল্লীবাসীদের প্রায় ১,০০০ জনকে গুঁড়া দুধ ও ১০০ জনকে বিবিধ-পুষ্টিসাধক খাদ্য (multipurpose food) দেওয়া হইয়াছে।

শহরের প্রান্তে নির্জন স্থানে নূতন গ্রন্থাগার নির্মিত হওয়ায় শহরের ও পল্লী-অঞ্চলের লোকদের পাঠের সুবিধা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান রাজনীতি অর্থনীতি ইতিহাস সাহিত্য ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে ১,৩১৪ খানি নূতন পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। লাইব্রেরি-হলে সমাজ ও কৃষ্টি সম্বন্ধীয় সভা এবং শিক্ষামূলক চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, মাঝে মাঝে সঙ্গীতানুষ্ঠানও উল্লেখযোগ্য।

আশ্রমে নিয়মিত পূজা পাঠ ভজন কীর্তন হয়। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খৃষ্টের জন্মদিনে বিশেষ ভজন ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথিতে বিশেষ উৎসবে দরিদ্রনারায়ণ-সেবা অনুষ্ঠিত হয়, এবং সভায় তাঁহাদের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়। আদিবাসী গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আশ্রমটির সমাজসেবামূলক কাজের পরিধি ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

উৎসব-সংবাদ

বালিয়াটী: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ১৪ জ্যৈষ্ঠ হইতে ২০শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে নগরকীর্তন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, হোম, সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

১৯ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্নে দরিদ্রনারায়ণ-সেবায় ৩০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে বার্ষিক সভায় অধ্যাপক উপেন্দ্রমোহন সাহা অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ আলোচিত হয়। ১৮ই হইতে ২০শে জ্যৈষ্ঠ তিন দিন স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক 'স্বামীর ঘর' ও 'মহিষাসুর' অভিনীত হইয়াছে।

জয়রামবাটী (বাঁকুড়া) **:** গত ২৭শে বৈশাখ (অক্ষয় তৃতীয়া) শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পবিত্র আবির্ভাব-ভূমি জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির-প্রতিষ্ঠার সপ্তত্রিংশ বার্ষিক মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি পূজা, পাঠ, ভজন ও সমাগত ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালে বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে এক জনসভায় কলিকাতা হইতে আগত অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত, শ্রীসমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী ভবানন্দ মহারাজ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ভজন ও রামায়ণ গান হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

সানফ্রান্সিসকো: প্রতি রবিবারে বেলা ১১টায় এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় বেদান্ত সোসাইটির নিজস্ব ভাষণ-গৃহে স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন:

জানুআরি, '৫৯: নববর্ষের আহ্বান; স্বামী শিবানন্দ—যেমন আমি বুঝিয়াছি; কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব; মানুষ—ঈশ্বরের প্রতিরূপ; খৃষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণ; পূজা—তত্ত্ব ও সাধন; আধ্যাত্মিক অনুভূতির মনোবিজ্ঞান; কর্ম হইতে কিরূপে মুক্তি পাওয়া যায়?

ফেব্রুআরি: তাঁহাকে খুঁজিও না—দর্শন কর; অন্তর্জীবন; স্বামী বিবেকানন্দ—আমেরিকায় প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ; অমরত্বের প্রমাণ; শান্তি নয়, তরবারি; ঈশ্বর কোথায়? আমরা মরি কেন? মানুষের একটিই সমস্যা—মন।

মার্চ: ঈশ্বর দর্শনের অর্থ; ব্যক্তিগত ধর্ম; মন পবিত্র করিবার উপায়; শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও কর্ম; ঈশ্বর এবং আত্মা; শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ; প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য; পুনরুজ্জীবনের প্রকৃত অর্থ।

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। প্রতি রবিবার ছোটদের মধ্যে সকল ধর্মের উদার সর্বজনীন সাধারণ ভাবগুলি সঞ্চারিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। স্বামী অশোকানন্দ ধর্মজীবন-গঠনে আগ্রহশীল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ভক্ত পণ্ডিত আকুলি মিশ্র

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৩০শে মে, ১৯৫৯, শনিবার অপরাহ্ণ ৫।১০ মিনিটের সময় ওড়িষ্যার বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক বিশিষ্ট সমাজসেবী ভক্ত পণ্ডিত আকুলি মিশ্র সত্তর বৎসর বয়সে কটক তেলেঙ্গাবাজার-স্থিত নিজ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। চারি বৎসর পূর্বে পণ্ডিত মিশ্রের দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় এবং এক বৎসর হইল তিনি রক্তচাপ-জনিত রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন।

পণ্ডিত আকুলি মিশ্র কটক জিলার খণ্ডসই গ্রামে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দরিদ্র পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। বদান্য ব্যক্তিদের সাহায্যে আকুলিবাবু কেন্দ্রপাড়া বিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং সেখান হইতে কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে চাকরির জন্য তিনি কটকে আসেন এবং সেখানে মিশনরী স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন, সেই সময়ে (১৯১৪) কটকে পাঠ্য পুস্তকের কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ছিল না। পণ্ডিত মহাশয় কয়েকজনের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য লইয়া 'কটক ট্রেডিং কোম্পানি' নামে ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই উহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে সুলভ মূল্যে বিক্রয়ের জন্য ওড়িয়া ভাষায় বহু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেন। এ ছাড়া তিনি জগন্নাথ দাসের ওড়িয়া ভাগবত, কৃষ্ণসিংহ-রচিত মহাভারত, রাধানাথ-গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন।

পণ্ডিত মিশ্র অতি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ১৯১২।১৩ খৃঃ যখন তিনি কলিকাতায় ছিলেন, তখন পদব্রজে জয়রামবাটী গিয়া সেখানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষা লাভ করেন।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে কয়েকজন বন্ধুর সহিত কটকে দরিদ্র ছাত্রদের সুশিক্ষা দানের এবং ধর্মজীবন যাপনের জন্য 'রামকৃষ্ণ কটেজ' নামে একটি ছাত্রনিবাস স্থাপন করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচারে সহায়তা করিতে থাকেন। পণ্ডিত আকুলি মিশ্রের দেহত্যাগে সমগ্র উৎকলবাসী একজন বিশিষ্ট ধর্মপরায়ণ, সাধুপ্রকৃতি এবং সমাজসেবী ব্যক্তি হারাইলেন, আমরা এই ভক্তের আত্মার কল্যাণ কামনা করি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উৎসব-সংবাদ

দক্ষিণেশ্বর: শ্রীরামকৃষ্ণ বানপ্রস্থ আশ্রমে গত ৫ই আষাঢ় (২০শে জুন, ১৯৫৯) স্নানযাত্রা দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা হোম ও ভোগারতির পর প্রায় দুই শতাধিক ভক্তকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ভজন হয়। সন্ধ্যারতির পর কলিকাতা 'হরিবাসরে'র সভ্যগণ কর্তৃক কীর্তন ও শ্যামা-সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়।

খড়গপুর: গত ১৩ই জুন হইতে দিবসত্রয় এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিবস অষ্টপ্রহর নাম-যজ্ঞ, দ্বিতীয় দিবস শোভা-যাত্রা ও বেতার-কথক পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'র কথকতা এবং তৃতীয় দিবস বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, কথামৃত আলোচনা ও প্রসাদবিতরণের পর বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী মহানন্দের সভাপতিত্বে এক বিরাট ধর্মসভা হয়। সভাপতি

মহারাজ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় দুই ঘণ্টাব্যাপী ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিবস কথকতায় প্রায় ৪,০০০ এবং তৃতীয় দিবস ধর্মসভায় প্রায় ৫,০০০ নরনারীর সমাগম হয়।

মেদিনীপুরের মফঃস্বলেঃ গত এপ্রিল, মে ও জুন মাসে ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, শালবনী, গোপীনাথপুর, কল্যাচক ও ব্রাহ্মণবসানে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পূজা পাঠ ভজন ও প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাটালে আয়োজিত সভায় মহকুমাশাসক শ্রীঅমলকুমার দাশগুপ্ত (সভাপতি) এবং স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। চন্দ্রকোণায় অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন 'যুগসমস্যা ও শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সব কয়টি স্থানেই শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গীত-সহযোগে কথকতা শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। স্বামী বিশ্বদেবানন্দ তিনটি সভায় পৌরোহিত্য করেন। কল্যাচকের সভায় স্বামী অন্নদানন্দ সভাপতিত্ব করেন।

কুচবিহারঃ স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৮ই হইতে ২০শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী যুক্তানন্দ বিভিন্ন দিনে 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী', 'স্বামী বিবেকানন্দ' ও 'শ্রীশ্রীমা' সম্বন্ধে বলেন। উৎসবের প্রথম ও শেষ দিন রাত্রে 'কৃষ্ণযাত্রা' হয়।

আলিপুর দুয়ারঃ গত ২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বহু ভক্ত সমক্ষে স্বামী যুক্তানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন আলোচনা করেন।

ডিব্রুগড়ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে গত ২৪শে হইতে ২৬শে এপ্রিল দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের সভায় স্বামী মহানন্দ 'বর্তমান যুগে বেদান্তের স্থান' বিষয়ে বক্তৃতা দেন এবং সভাপতি লখিমপুরের জেলাশাসক বেদান্তের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিন শ্রীনন্দেশ্বর চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী সৌম্যানন্দ ও স্বামী মহানন্দ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা ও নাগরিকদের কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া 'আধুনিক যুগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শেষদিন কীর্তন ভজন পূজা ও প্রসাদবিতরণ হয়।

ইম্ফলঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির উদ্যোগে গত ২৪শে এপ্রিল বাবুপাড়া পূজামণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথম দিন জনসভায় স্থানীয় জুডিসিয়েল কমিশনার শ্রীরবি-বর্মা তিরুমলপদ সভাপতিত্ব করেন। এই উৎসবে শিলং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ভব্যানন্দ যোগদান করেন।

দ্বিতীয় দিন পূজা, হোম, ভোগরাগ ও সারাদিনব্যাপী ভজন ও কীর্তন ছিল প্রধান অঙ্গ। সমবেত ভক্তবৃন্দ পুষ্পাঞ্জলির পর প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

কুমিল্লাঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৭ই হইতে ১০ই বৈশাখ পর্যন্ত চারদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। নোয়াখালি 'গান্ধী শান্তিশিবিরে'র ব্যবস্থাপক শ্রীচারু চৌধুরীর সভাপতিত্বে তৃতীয় দিবসে একটি সাধারণ সভায় ভক্ত ও মনীষিগণ বিভিন্ন দিক দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আলোচনা করেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার বাল্যকালের কথা স্মরণ করিয়া বলেনঃ ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণীতে পড়িবার সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংগৃহীত 'শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ' বইখানি পাই, তখন কিছু বুঝি নাই। 'বিবেকবাণী' বইখানি পড়িয়া বুঝি যে স্বাধীনতা-লাভই জীবনের উদ্দেশ্য, সে সাধনা এখনও চলিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-সাধনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন : জগতের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এক একটি ধর্ম দিকে দিকে বিকশিত হয়েছে; হিন্দুধর্মে দর্শনের, বৌদ্ধধর্মে করুণার, খৃষ্টধর্মে সেবার, ইসলামে সৌভ্রাত্রের বিকাশ।

পরিশেষে সভাপতি বলেন : বেদের শেষ ও শ্রেষ্ঠ ভাব যেমন বেদান্ত, তেমনি আজ সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ভাব নিয়ে 'ধর্মান্ত' করার সময় এসেছে। অর্থাৎ 'কে কোন্ ধর্মের' এ প্রশ্ন আর কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না। ধর্মসমন্বয়ই এই 'ধর্মান্ত'! গীতায়ও শ্রীভগবান বলেছেন 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—সকল ধর্মের শেষে সেই এক ভগবান্, তাঁহার উপর একান্তভাবে সর্বস্ব সমর্পণ করাই 'ধর্মান্ত', এই ভাবের দ্বারাই সব মানুষ এক হতে পারে। অশুভচিন্তনের দ্বারা আবহাওয়া বিষাক্ত হয়। শুভচিন্তার দ্বারা তা আবার ভাল হতে পারে। নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রার্থনা শেষ ক'রে যদি সকলে দিনান্তে একবার একত্র হয়ে সকলের শুভচিন্তা করে, তাহলে দেখা যাবে কিছু দিনের মধ্যে আবহাওয়া বদলে গেছে। বিভেদের মাঝে এই এক করার আহ্বান নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আজ আমাদের হৃদয়ের দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

জলে লবণতা-বৃদ্ধি : এ বৎসর কলিকাতায় পরিস্রুত ও ঘোলাজলের লবণতা গত বৎসর অপেক্ষা বাড়িয়াছে। কলিকাতা করপোরেশনের রেকর্ড অনুযায়ী এ বৎসর ২৯শে মে পরিস্রুত জলের লবণতা সর্বাধিক হইয়াছিল দশ লক্ষ ভাগে ৮৪০ ভাগ (840 parts per million gallons of water)। গত বছর (১১ই মে) সর্বাধিক লবণতার এই সূচক সংখ্যা ছিল ৬৮০ (680 p.p.m.)।

ঘোলা জলের সর্বাধিক লবণতা এ বৎসর ২৪৫০ (2450 p.p.m.), গত বৎসরের এই সংখ্যা ছিল ১৯২০ (1920 p.p.m.)। বৃষ্টি হওয়ার পর হইতে এই লবণতা কমিতেছে।

থ্রম্বোসিস : হৃদ্রোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মাথুর আগ্রায় (Indian Council of Medical Research) চিকিৎসকদের গবেষণা-সভায় বলিয়াছেন : গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতে করোনারি থ্রম্বোসিসের আক্রমণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। হৃদ্‌যন্ত্রে রক্ত জমাট বাঁধিয়া রক্ত-চলাচলে বাধা সৃষ্টির ফলে এই রোগ হয়।

ডাঃ মাথুরের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়িয়াছে,—পল্লীবাসী অপেক্ষা শহরের অধিবাসীদেরই এই রোগ হইবার সম্ভাবনা বেশী। তাঁহার পরীক্ষিত রোগীদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই উচ্চতর সামাজিক-আর্থনীতিক স্তরের (higher Socio-economic group)—তাঁহাদের অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী, উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্মচারী এবং ব্যবসাদার। চাষী ও মজুরদের মধ্যে এই রোগ অজ্ঞাত।

করোনারি থ্রম্বোসিসের রোগীদের অধিকাংশের বয়স ৪৫ হইতে ৫৫। নারী রোগী খুবই কম, পুরুষ রোগীর সংখ্যার অষ্টমাংশ।

ডাঃ মাথুরের মতে শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ও আধুনিক জীবনের অত্যধিক মানসিক চাপই এই রোগের প্রধান কারণ।

বি. সি. জি. : যুক্তরাষ্ট্রের ১৭ জন ডাক্তার বি. সি. জি. টিকার যক্ষ্মা-প্রতিষেধক শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। 'বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালে' তাঁহারা তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন।

যদিও এই টিকার সাফল্য সম্বন্ধে প্রায়ই দাবি করা হয়, তথাপি তাঁহারা বলিয়াছেন—ইহার সঠিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

আইসলাণ্ড, হাওয়াই ও হল্যাণ্ড হইতে যক্ষ্মা দূরীভূত হইয়াছে, এ সকল স্থানে বি.সি.জি. ব্যবহৃত হয় নাই বলিলেই চলে। ডেনমার্ক নরওয়ে এবং সুইডেনে বি সি. জি'র সাহায্যেই যক্ষ্মার সহিত সফল সংগ্রাম করা হইতেছে, তবে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পদ্ধতিও আছে।

সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁহারা বলিয়াছেন: খাঁটি বি সি.জি নাই বলিলেই হয়। এই টিকায় কয়েক প্রকার জীবাণু আছে এবং দেখা গিয়াছে কয়েকটি বিপজ্জনক। প্রধানতঃ গবাদি পশুর যক্ষ্মা-প্রতিষেধের পরীক্ষার ভিত্তির উপর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সকল গোশালায় টিকা বিফল হইয়াছে সে সকল স্থানে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে; অল্প কয়েক স্থানে যেখানে পূর্ব পদ্ধতিই বহাল আছে, সেখানে অবস্থা সংকটাপন্ন।

সংস্কৃতি সংবাদ

বাইবেলের অনুবাদ: মূল গ্রীক হইতে বাইবেলের নূতন টেষ্টামেণ্ট আধুনিক ইংরেজীতে অনূদিত হইতেছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। ক্যাথলিক চার্চ ব্যতীত অন্যান্য বড় বড় চার্চের অনুমতি লইয়া অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজে হাত দেন। পুরাতন টেষ্টামেণ্ট অনুবাদের কাজও আরম্ভ হইয়াছে, তবে উহা প্রকাশিত হইতে কয়েক বৎসর সময় লাগিবে। নূতন টেষ্টামেণ্ট মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে।

কালাডি (কেরল): গত ১৫ই মে বিহারের শ্রীকপিলদেব শর্মা শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে অখিল ভারতীয় সংস্কৃত সম্মেলনে কালাডিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমাবেশে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে:

(১) 'সংস্কৃত' সরকারী ভাষা হউক। তাহা হইলে প্রাদেশিক ভাষাগুলিরও যথেষ্ট উন্নতি হইবে, এবং হিন্দী-ইংরেজী বিতর্কের অবসান হইবে।

(২) এই সম্মেলন ভারতের বিভিন্ন মঠ ও দেবস্থানগুলির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(৩) কুরুক্ষেত্র, বারাণসী ও দ্বারভাঙ্গার আদর্শে কেরল রাজ্যের অন্তর্গত শংকরাচার্যের জন্মস্থান কালাডিতে একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক, যেখানে 'বেদ', 'শাংকর বেদান্ত' ও 'তুলনামূলক ধর্ম' অধ্যয়নের বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে।

(৪) সংস্কৃত শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক করিতে হইবে।

(৫) ছাত্রদিগকে গবেষণার সুযোগ দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) 'সাহিত্য আকাদামি'র আদর্শে 'সংস্কৃত আকাদামি' প্রতিষ্ঠিত হউক।

(৭) অপ্রকাশিত সংস্কৃত পুঁথিও প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হউক।

(৮) সংস্কৃত ভাষায় সাময়িক পত্রিকাদি প্রকাশিত হউক।

(৯) সকল রাজ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

(১০) বৈদেশিক দূত নিয়োগ ব্যাপারে সংস্কৃত জ্ঞান বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া আবশ্যক, কারণ সংস্কৃতই ভারতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বাহক।

(১১) বেতার-সূচীতে সংস্কৃতে সংবাদ ও সংস্কৃত-শিক্ষা প্রচারের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হইতেছে।

উৎসবে ও নিত্যপ্রয়োজনে
শতাব্দীর সুপরিচিত
লক্ষ্মীবিলাস
সর্ব্বঋতুর উপযোগী তৈল
এম,এল,বসু য্যাণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস • কলিকাতা-৯

কাশি!
COUGH
SYRUP
তাড়াতাড়ি আরাম
আর
নিরাময়ের জন্য
বি. আই. কফ সিরাপ
বেঙ্গল ইমিউনিটি

Get more strength
out of your
FOOD
BE WISE TO PICK UP
Vanasda
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMIN A & D
BERAR OIL INDUSTRIES
AKOLA
BOMBAY
MADE FROM VEGETABLE OILS ONLY
Vanasda
F.P.S/BL2-/09

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সরল রাজযোগ—৪র্থ সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি বুলের বাড়ীতে কয়েক জন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্ত্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ॥০ আনা।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। ১০২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামিজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোযিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজান হইয়াছে। পরিচয় এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবিসম্বলিত। মূল্য ১ম ভাগ ৫৲ ও ২য় ভাগ ৪॥০ আনা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪॥০ ও ৪।০।

ভারতে বিবেকানন্দ—১২শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামীজির ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৬৪৫ পৃষ্ঠা মূল্য ৫৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪॥৵০ আনা

দেববাণী—৭ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান' নামক স্থানে কয়েক জন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন তাহার একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ২২৭ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৸৵০ আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহিত অংশসমূহ বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সন্নিবেশিত। মূল্য ২।০ আনা।

বিবেক-বাণী—১৬শ সংস্করণ। আচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজীর উপদেশাবলী। স্বামীজির বাষ্টসম্বলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। মূল্য ।৵০ আনা।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামীজির ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ আনা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

ভারতীয় নারী—১২শ সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান আদর্শ, পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজির মনোরম ছবি-সম্বলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান—৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৩৩ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদান্ত-মত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে আর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ—যে গুলি না বুঝিলে ধর্ম জিনিষটাকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ১॥০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৩শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়ভরতের-উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্য গণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট ও ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। মূল্য ১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৵০ আনা।

সন্ন্যাসীর গীতি—১৩শ সংস্করণ। স্বামীজি-রচিত 'Song of the Sannyasin' নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৵০ আনা।

পওহারী বাবা—৯ম সংস্করণ। গাজীপুরের বিখ্যাত মহাত্মা পওহারী বাবার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। স্বামীজির হাফটোন ছবিযুক্ত। মূল্য ॥০ আনা।

হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ—৫ম সংস্করণ, ৯০ পৃষ্ঠা। ইহাতে হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা, হিন্দুধর্মের ক্রমাভিব্যক্তি, ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর ও ডাঃ পল ডয়সেন সম্বন্ধে আলোচন আছে। মূল্য ৸০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ॥৵০ আনা।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৪র্থ সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ।৵০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ।৵০ আনা।

অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৪র্থ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। এই পুস্তক পাঠে চরিত-কথার কল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। মূল্য ১৷০ আনা!

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৪র্থ সংস্করণ; আচার্য্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲ মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা—১ম সংস্করণ। স্বামী অরূপানন্দ প্রণীত। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা পুস্তক হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। মূল্য ৷৵০ আনা।

ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন কথা। মূল্য ২৲ টাকা।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—২য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৷০ আনা।

শিবানন্দ-বাণী—১ম ভাগ—৫র্থ সংস্করণ, ২য় ভাগ—২য় সংস্করণ স্বামী অপূর্ব্বানন্দ-সঙ্কলিত মূল্য প্রতি ভাগ ২৷০ আনা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। প্রথম ভাগ—(ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর) ৫ম সংস্করণ। দ্বিতীয় ভাগ—(ছান্দোগ্য) ৪র্থ সংস্করণ। তৃতীয় ভাগ—(বৃহদারণ্যক) ৩য় সংস্করণ। ইহাতে উপনিসদের মূল, সংস্কৃত, অন্বয়মুখে বাংলা প্রতিশব্দ, সরল বঙ্গানুবাদ এবং আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যানুযায়ী দুরূহ বাক্যসমূহের টীকা প্রভৃতি আছে। সুদৃশ্য ছাপা, কাপড়ের মনোরম বাঁধাই, ডবল ক্রাউন—১৬ পেজি, প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য—প্রতি ভাগ ৫৲ টাকা।

সাধু নাগ মহাশয়—৮ম সংস্করণ। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ১৷০ আনা মাত্র।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত) অতুলনীয় সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত 'গোপালের মা' এর সংক্ষিপ্ত আদর্শ জীবনের কাহিনী। মূল্য ৷০ আনা।

নিবেদিতা—১৩শ সংস্করণ। শ্রীমতী সরলা বালা দাসী-প্রণীত। স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা। মূল্য ৸০ আনা।

সৎকথা—স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক সংগৃহীত—৩য় সংস্করণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ (শ্রীলাটু) মহারাজের উপদেশাবলীর সংকলন। মূল্য ২৲ টাকা।

যোগচতুষ্টয়—স্বামী সুন্দরানন্দ-প্রণীত। জ্ঞান; কর্ম্ম, ভক্তিও যোগের সংক্ষিপ্ত সরল বিবরণ। মূল্য ২৲ টাকা।

বেদান্তদর্শন—১ম খণ্ড—চতুঃসূত্রী। শাঙ্কর ভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ, রত্নপ্রভা টীকা, ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্বলিত। প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ টাকা।

স্তবকুসুমাঞ্জলি—৫ম সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত—বৈদিক শান্তিবচন, সূক্ত, প্রার্থনা ইত্যাদি বিবিধ সংস্কৃত স্তোত্রাদির অপূর্ব্ব সঙ্কলন। সংবাদপত্রসমূহে উচ্চ প্রশংশিত। মূল সংস্কৃত, অন্বয়, অন্বয়মুখে সংস্কৃতের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং মূলের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৩৲ টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৫ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ৷৵০ আনা।

আগে চলো—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। কিশোরদের জন্য লেখা। তরুণমনে সুনীতি, দেশাত্মবোধ, সেবা, আদর্শনিষ্ঠা এবং ধর্মপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক যৌবনোন্মুখ ছেলেমেয়েকে এই বইখানি পড়িতে দেওয়া উচিত। মূল্য ১৷০।

হিন্দুধর্ম পরিচয়—১ম ও ২য় ভাগ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সরল কথায় হিন্দুধর্মের মুখ্য বিষয়গুলির সহিত পরিচিত চেষ্টা এই বই দুখানিতে করা হইয়াছে। মূল্য ১ম ভাগ ৷০ আনা, ২য় ভাগ ৸০ আনা।

দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য ও পূজা-পদ্ধতি—স্বামী কৈবল্যানন্দ-প্রণীত। মূল্য ১ম ভাগ (পরিবর্দ্ধিত ৪র্থ সংস্করণ ৸৵০, ২য় ভাগ (৩য় সংস্করণ) ১৷০।

ঠাকুর এবার এসেছেন

ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। এবার বাঁশ ও ঘাস ছাড়া যার ভেতরে একটু সার আছে সেই চন্দন হবে। তোমাদের ভাবনা কি?...

সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ-মন ভাল থাকে।...কাজ করতেই হয়। কর্মেই কর্মপাশ কাটে। কাজ ছাড়া থাকা ঠিক নয়।............

—শ্রীমা

● ● ●

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী অদ্বয়ানন্দ; ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, এম. আই. প্রেস হইতে মুদ্রিত
এবং ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

Udbodhan-Phone: 55-2447 : July 1959 : Regd. No. C. 295

সম্পাদক—স্বামী নিরাময়ানন্দ

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা—৩

৬১তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা | বার্ষিক মূল্য ৫৲

ভাদ্র, ১৩৬৬ | প্রতি সংখ্যা ০·৫০

কম দামে ব্যাটারী কিনে অনেকে মনে করেন যে কিছু বাঁচান গেল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে তৈরী নয় বলে এগুলি যতটা কাজ দেবে বলে মনে করা যায় তা প্রায়ই দেয় না। আর হায়রানিরও অন্ত থাকে না।

তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাটারীগুলির সমপর্য্যায়ভুক্ত ভাবতে প্রস্তুত এক্সাইড ব্যাটারী আপনার মোটর গাড়ীতে ব্যবহার করুন। এর স্থায়িত্ব, কার্য্যকরীশক্তি ও গুণাগুণ বিচার করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এক্সাইড ব্যাটারী কিনে আপনি বরং লাভই করেছেন...
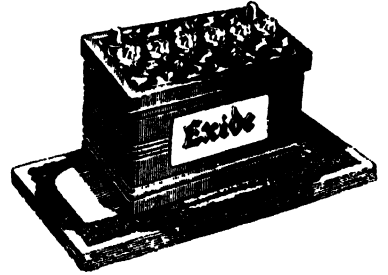
প্রাপ্তিস্থানঃ—

স্থাপিত—১৯১৮

প্রধান কার্য্যালয়—
পি, ৬, মিশন রো এক্সটেনসন
কলিকাতা—১
ফোন—২৩-১৮০৫...৯ (৫ লাইন)

শাখা—
পাটনা, ধানবাদ, কটক,
গৌহাটী, শিলিগুড়ি
(দিল্লী ও বম্বে)

উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৬৬

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

ফোন: ৩৪-৪৯৮২
বিখ্যাত স্বর্ণশিল্পী ও
জহরত্নকার
অন্নপূর্ণা জুয়েলারী হাউস
৮৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২
গ্যারান্টী যুক্ত গিনি সোনার গহনার
প্রতিষ্ঠান। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য
১৷৷৹ টাকার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্রম্

শ্রীকালীপদ-বন্দ্যোপাধ্যায়-বিদ্যাবিনোদেনর্ষ্ণবিরচিতম্

লব্ধ্বা পাশ্চাত্যশিক্ষামগণিতযুবকা ধর্মহীনা বিমূঢ়াঃ
স্বৈরাচারপ্রমত্তাঃ শুভমতিরহিতা ধ্বংসমার্গং গতাশ্চ।
তেষামুদ্ধারণার্থং ভুবনবিজয়িনং মাতৃমন্ত্রং দদানং
বন্দে শ্রীরামকৃষ্ণং কলিকলুষহরং পাবনং পুণ্যরাশিম্ ॥১॥

ধর্মানৈক্যাৎ পৃথিব্যামজনি জনমনঃস্বাসুরী ভেদবুদ্ধি-
র্হিংসা-দ্বেষোত্থদাবানল-দহনভয়ব্যাকুলে সর্বলোকে।
সর্বে ধর্মাঃ সমানা ইতি নিজচরিতৈর্মানবং দর্শয়ন্তং
বন্দে শ্রীরামকৃষ্ণং হরিহরদয়িতং কালিকা-লীনচিত্তম্ ॥২॥

নাধীত্য গ্রন্থরাজিং ন চ গুরুভবনং শিষ্যরূপেণ গত্বা
বেদান্তাতীত-তত্ত্বং সুললিত-বচনৈর্হেলয়া কীর্তয়ন্তম্।
জ্ঞানে তুঙ্গং মহীধ্রং শিশুমিব সরলং বিশ্বকল্যাণমূর্তিং
বন্দে শ্রীরামকৃষ্ণং দ্বিজকুলতিলকং নির্জরং মানবাখ্যম্ ॥৩॥

বাল্যাৎ ত্যাগস্য মার্গে স্থিরমতিচলিতং ভোগমার্গঞ্চ হিত্বা
পশ্যন্তং ন প্রভেদং কমপি করধৃতে কাঞ্চনে মৃচ্চয়ে চ।
জিত্বা জৈবপ্রবৃত্তিং প্রকৃতিসহচরং ব্রহ্মচর্যং চরন্তং
বন্দে শ্রীরামকৃষ্ণং জগতি নিরুপমং সাধকেষগ্রগণ্যম্ ॥৪॥

জীবন্মুক্তং মহান্তং বিজিতভবভয়ং শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপং
বিশ্বারাধ্যং মহিম্না বিজিতরিপুচয়ং তাপসং দেবকান্তিম্।
ভক্তানামার্তিরাশিং নিজবরবপুষি স্বেচ্ছয়া ধারয়ন্তং
বন্দে শ্রীরামকৃষ্ণং শরণগ-সদয়ং তাপিত-ত্রাণহেতুম্ ॥৫॥

শ্যামাধ্যানে নিমগ্নং হসিতরুদিতয়োর্লীলয়া দীপ্যমানং
'মা! মা! মা! মা!' ব্রুবাণং চরণ-সরসিজে তন্ময়ং লুপ্তসংজ্ঞম্।
উদ্গীতে মাতৃমন্ত্রে পুনরপি তরসা লব্ধসংজ্ঞং সচেষ্টং
বন্দে শ্রীরামকৃষ্ণং স্মরহর-রুচিরং পূজিতং সর্বলোকৈঃ ॥৬॥

গ্লানৌ ধর্মস্য পৃথ্ব্যাং প্রভবতি কলুষে পীড্যমানে চ সাধৌ
দুষ্টানাং শাসনায়াবতরতি ভুবনে বিশ্বরাড্‌বিশ্বভূত্যৈ।
যো রামো যো হি কৃষ্ণঃ শমন-ভয়হরো মানব-ত্রাণকর্তা
বিশ্বপ্রেমাবতারো ধৃতমনুজতনূ রামকৃষ্ণঃ স এব ॥৭॥

জাহ্নব্যাঃ পুলিনে পবিত্রধরণৌ শ্রীমন্দিরে শোভনে
ঘণ্টা-শঙ্খ-নিনাদ-নিত্যমুখরে চৌঙ্কার-সন্দীপিতে।
দিব্যে ধাম্নি দিনে দিনে চ বহুভিঃ পুণ্যার্থিভিঃ সেবিতে
লীনং শ্রীভবতারিণী-চরণয়োঃ শ্রীরামকৃষ্ণং স্তুমঃ ॥৮॥

(বঙ্গানুবাদ)

পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া যখন দেশের অসংখ্য যুবক ধর্মহীন, বিমূঢ়, স্বেচ্ছাচারী ও শুভমতি-রহিত হইয়া ধ্বংসের পথে যাইতেছিল, তাহাদের উদ্ধারের জন্য যিনি ভুবনবিজয়ী মাতৃ-মন্ত্র দিয়াছিলেন, সেই কলিকলুষহারী—লোকপাবন এবং পুণ্যরাশি-স্বরূপ—শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দনা করি।১।

ধর্মের অনৈক্যবশতঃ যখন পৃথিবীতে জনগণের মনে অসুরসুলভ ভেদবুদ্ধির উদ্ভব হইয়াছিল, যখন লোকসকল হিংসাদ্বেষ-জনিত দাবানলের দহন-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন যিনি নিজ আচরণের দ্বারা 'সকল ধর্মই সমান' ইহা মানবকে দেখাইয়াছিলেন, সেই হরিহরপ্রিয় এবং কালিকা-নিবিষ্টচিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দনা করি।২।

যিনি গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন বা শিষ্যরূপে গুরু-গৃহে গমন না করিয়াও বেদ-বেদান্তের অতীত তত্ত্বসকল অবলীলাক্রমে সুললিত ভাষায় কীর্তন করিতেন, এবং যিনি জ্ঞানে অত্যুচ্চ পর্বতসদৃশ হইয়াও শিশুর ন্যায় সরল ও বিশ্বকল্যাণের মূর্তিস্বরূপ ছিলেন, সেই দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠ এবং মানব-নামধারী দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দনা করি।৩।

যিনি বাল্যকাল হইতেই ভোগের পথ ত্যাগ করিয়া স্থিরচিত্তে ত্যাগের পথে চলিয়াছিলেন, যিনি হাতে সোনা এবং মাটির ঢেলা ধরিয়া উহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পান নাই, এবং যিনি জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে জয় করিয়া প্রকৃতি-সহচর হইয়াও ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছিলেন, জগতে তুলনাবিহীন এবং সাধকগণের অগ্রগণ্য সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দনা করি।৪।

যে জীবন্মুক্ত মহান্, ভবভয়-জয়কারী, শুদ্ধসত্ত্বগুণস্বরূপ, মহিমায় বিশ্বের আরাধ্য, রিপুগণ-জয়ী, দেবকান্তি তাপস স্বেচ্ছায় নিজের দিব্যদেহে ভক্তগণের আধিব্যাধি ধারণ করিয়াছিলেন, শরণাগতের প্রতি সদয় এবং তাপিতের ত্রাণকর্তা সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দনা করি।৫।

যিনি শ্যামা-ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া হাসিকান্নার লীলায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেন, যিনি 'মা! মা! মা! মা!' বলিতে বলিতে তাঁহার চরণকমলে তন্ময় হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন, আবার যিনি উচ্চ স্বরে মাতৃমন্ত্র উচ্চারিত হইলে তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া চেষ্টাশীল হইয়া উঠিতেন, সেই মহাদেবতুল্য মনোহর ও সর্বলোক-পূজিত শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দনা করি।৬।

পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি ও পাপের অভ্যুত্থান হইলে এবং সাধুলোক নিপীড়িত হইলে বিশ্বের রাজা (ভগবান্) দুষ্টের শাসন ও বিশ্বের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন; যিনি শমনভয়হারী এবং মানবের ত্রাণকর্তা রাম ও কৃষ্ণ, তিনিই বিশ্বপ্রেমের অবতার মানব-দেহধারী রামকৃষ্ণ।৭।

জাহ্নবীতটে পবিত্রভূমিতে প্রতিদিন বহু পুণ্যার্থিসেবিত দিব্যধামে, শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনিতে নিত্য-মুখরিত, ওঙ্কার-সমুজ্জল মনোরম মন্দিরে শ্রীভবতারিণীর চরণলীন শ্রীরামকৃষ্ণের স্তব করি।৮।

কথাপ্রসঙ্গে

মানসিক পুনর্বাসন

থ্রম্বোসিস বা ক্যানসার নয়, মানসিক স্তরচ্যুতিই এ যুগের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ব্যাধি। এই ব্যাধি দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং মানুষের ব্যক্তিগত পরিবারগত সমাজগত—সর্ববিধ শান্তি বিনষ্ট করিয়া আজ মানুষকে গৃহহারা লক্ষীছাড়া উদ্বাস্তর মতো করিয়া তুলিয়াছে। এই ব্যাপক ব্যাধির কারণ কি এবং কিভাবে ইহা দূরীভূত হইতে পারে, কিভাবে মানুষ আবার তাহার পূর্ব শান্তি ফিরিয়া পাইতে পারে, অর্থাৎ কিভাবে মানুষের মানসিক পুনর্বাসন সম্ভব—তাহাই আজ মানবপ্রেমিক মনীষিগণের চিন্তার বিষয়।

প্রাচ্যের মানুষ চাহিয়া আছে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানলব্ধ সুখসুবিধা ও জাঁকজমকের প্রতি, আর পাশ্চাত্য মনীষিগণ সে-দেশের অশান্ত জীবনে বিরক্ত হইয়া শান্তির সন্ধানে বাহির হইয়াছেন প্রাচ্য-তীর্থ-পরিক্রমায়; কিন্তু এদেশে আসিয়া তাঁহারা দেখেন—এখানে এখন রাজনীতির কচকচি, শিল্পোন্নতির উগ্র আকাঙ্ক্ষা; পাশ্চাত্যের চর্বিত-চর্বনেই, পাশ্চাত্য যাহাতে পরিপূর্ণতা পায় নাই তাহাতেই এখন প্রাচ্যের আগ্রহ, উনবিংশ শতাব্দীর পরিত্যক্ত আদর্শগুলির প্রতিই এখনও তাহার মোহ।

জগৎ জুড়িয়া আজ এই মানসিক স্তরচ্যুতি। দেশে এবং কালে—উভয়ত্র এই বিপর্যয়! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এক সমতলে অবস্থিত নহে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যেও আজ ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সামর্থ্য না বুঝিয়া প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে জীবনের সর্বক্ষেত্রে উপর হইতে বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে, কে জানে জন-মনের সহন-সীমা কোথায়! হতাশ হৃদয়ে প্রশ্ন ওঠে: শিল্প-বিপ্লবের বন্যার মুখে আধ্যাত্মিক আদর্শ কি ভাসিয়া যাইবে? অথচ সেই আদর্শ ভিন্ন পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী শান্তি—মানুষের যথার্থ কল্যাণ সম্ভব কি?

প্রাচ্যে চলিয়াছে পুরাতন জীবনাদর্শ ছাড়িয়া আধুনিকতার অর্থাৎ শিল্প-বিজ্ঞান-যন্ত্রের দুঃসাহসিক অভিযানে। আর পাশ্চাত্যে জীবনের সর্ববিধ মূল্যবোধ আজ স্থগিত, মহামৃত্যুর সম্মুখে আজ তাহার একান্ত প্রয়োজন—জীবনের চরম প্রশ্নের উত্তর। আজ তাহাকে কতকগুলি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা জীবন-সংশয়। তাহার জীবন আজ এক বিষম মোড়ের মাথায় উপস্থিত। এখনকার গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতেছে শুধু পাশ্চাত্যের নয়, পাশ্চাত্য-নির্ভর প্রাচ্যেরও জীবন।

(১) হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার করা হইবে কিনা? ইহাই প্রথম প্রশ্ন। বিজ্ঞানের বলে তো অণুর অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্কার করা হইয়াছে, কিন্তু ততঃ কিম্! শত্রু-সংহারে এ শক্তি অবশ্যই ব্যবহার করা যায়, শত্রু একেবারে নিশ্চিহ্ন না হইলেও নিস্তেজ হইয়া যাইবে, কিন্তু বিপদ হইয়াছে—শত্রুর হাতেও যে এই অস্ত্র। অতএব কি করা যায়?—তাহাই আজ প্রথম প্রশ্ন!

(২) তবে শত্রুর সহিত তথাকথিত বন্ধুত্ব স্থাপন? সেই চেষ্টাই এখন চলিতেছে। কিন্তু দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শের মিলন কি সম্ভব? একদিকে 'জনগণে'র এক-নায়কত্ব, অন্যদিকে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র—ইহাদের সহাবস্থান সম্ভব কিনা, তাহারই পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চলিতেছে আজ দেশে-বিদেশে।

(৩) তৃতীয় প্রশ্ন: এই যান্ত্রিকযুগে সমষ্টি-কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের হাতে সামগ্রিক ক্ষমতা

প্রয়োজন, কিন্তু তাহাতে কি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে না? ব্যক্তিগত অভ্যুদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে চেষ্টা ও চরিত্রের কোন মূল্য থাকিবে কি? মানুষমাত্রেই কি রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশমাত্রে পরিণত হইবে না? ব্যক্তিগত নীতিবোধ, ব্যক্তিগত চরিত্র, ত্যাগ ও সেবা, সাধনা ও পবিত্রতা—সকলই কি অর্থহীন হইয়া পড়িবে না? সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা যদি রাষ্ট্রায়ত্ত হয়, তবে তাহাদের মূল্য কতটুকু? স্বাধীনচেষ্টা- ও স্বাধীনচিন্তা-হীন জীবন যাপনের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

মানুষের সম্মুখে আজ এই সব প্রশ্ন? প্রশ্ন-গুলির ধরন দেখিয়াই বেশ বোঝা যায় মানুষের মনে আজ ফাটল ধরিয়াছে,—মানুষ আজ বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছে না, ব্যক্তিগত মানুষের নিজেরও চিন্তায় এবং কর্মে এত অসঙ্গতি—বোধ হয় কখনও এমন করিয়া ধরা পড়ে নাই। ডক্টর জেকিল ও মিষ্টার হাইড আজ আর বইএর পাতায় বা সিনেমার পর্দায় নাই, পথে-ঘাটে ঘরে-বাইরে এই বিচ্ছিন্ন-ব্যক্তিত্ব (Split personality) মানুষটির সাক্ষাৎ আমরা পাই। মানসিক স্তরচ্যুতিই আজ মানুষের বিষম ব্যাধি; ইহারই অপর নাম 'ভাবের ঘরে চুরি'। মানুষ জানে এক, করে আর এক, মুখে বলে: উপায় নাই, বর্তমান পরিবেশে এরূপ না করিলে বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব! কিন্তু কেন যে বাঁচিয়া থাকা—এ প্রশ্ন কেহ করে না। আধুনিক মানবের মনে এ প্রশ্ন নিরর্থক, এ প্রশ্ন অবান্তর, এ প্রশ্ন পাগলের। অথচ আশ্চর্য, এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই নির্ভর করিতেছে—জীবনের মূল্য-বোধ, এবং তাহারই উপর নির্ভর করে অন্য সকল প্রশ্নের উত্তর।

বিজ্ঞানলব্ধ প্রাকৃতিকঘটনা-জ্ঞানে মনের ও জীবনের এ সকল মৌলিক প্রশ্নের উত্তর মিলিতে পারে না, তাই এই সঙ্কটে কল্যাণকর সিদ্ধান্তে পৌছিবার জন্য আজ আবার ডাক পড়িয়াছে প্রাচীন প্রজ্ঞার।

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ভিত্তির উপর শিল্পের প্রতিষ্ঠা। শিল্প-বিপ্লবের প্রথম ফলভোগ করিলেন বণিকেরা, ধীরে ধীরে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র তিরোহিত হইয়া দেখা দিল গণতন্ত্র ও জাতীয়তা এবং শাসনক্ষমতা আসিয়া পড়িল রাজনীতিকদের হাতে। বিজ্ঞানের দ্বিতীয় ফসল কাটিতেছেন তাঁহারাই, এবং তাঁহারাই কল্যাণরাষ্ট্রের প্রতি-শ্রুতি দিয়া সাধারণ মানুষকে টানিয়া আনিতেছেন বিলুপ্তির বিপুল গহ্বরে। মানুষ আজ গৃহ-পরিবার ছাড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে মাঠ হইতে কারখানায়, গ্রাম হইতে শহরে। যে গৃহ-পরিবার ভাঙিয়া যাইতেছে, তাহা আর গড়িতেছে না!

শিল্প-বিপ্লব ইওরোপে আসিয়াছিল ধীরে ধীরে দুই শতাব্দী ধরিয়া; রাষ্ট্রনীতিক পদ্ধতি সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের পথে। কিন্তু প্রাচ্যদেশসমূহে রাজনীতিক পরি-বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বিপ্লব দেখা দিয়া এদেশের জনসাধারণের জীবন বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এশিয়া-আফ্রিকার এই জাগরণের ফল ইওরোপ-আমেরিকায় যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতেছে, তাহাও যে সর্বথা সুখকর হইতেছে, তাহা নয়।

বিজ্ঞান ও রাজনীতিজ্ঞান শেষ রক্ষা করিতে পারিবে—এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না। পরন্তু দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞানচর্চা যে পরিমাণে হইয়াছে—প্রজ্ঞার চর্চা সে পরিমাণে হয় নাই বলিয়াই আজ এ সঙ্কট, সভ্যতার এ অধোগতির সূচনা।

জ্ঞান বা বিজ্ঞান অবশ্যই একটা শক্তি, তাহা মানুষকে ক্ষমতা দিয়াছে মানুষের উপর প্রভুত্ব করিবার। শক্তিমান্ যদি প্রজ্ঞাবান্ না হয়, তবে শক্তির অপব্যবহারই হয়। এরূপ নেতার নেতৃত্বে মানুষের কোন মূল্য থাকে না, মানবিক মূল্য-বোধ তিরোহিত হয়।

বিজ্ঞান-শক্তিকে চালিত করিবার জন্য আজ একান্ত প্রয়োজন প্রজ্ঞা-শক্তি—উচ্চতর মানসিক শক্তি। অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে পরিপূর্ণ করিবার জন্যই প্রয়োজন এই প্রজ্ঞান। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া নয়, বিজ্ঞানের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই জীবন-প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে, এ ছাড়া অন্যরূপ আজ আর সম্ভব নয়, এইখানেই হইয়াছে মুস্কিল। পূর্ব পূর্ব যে-সকল পদ্ধতি দ্বারা মানব-জীবন চালিত হইত, তাহা এখনকার বৈজ্ঞানিক মনের অগ্রাহ্য! 'ইহা ভগবানের আদেশ', 'শাস্ত্রে এ কথা আছে' অথবা 'আমার নিকট সত্য এইভাবে প্রকাশিত হইয়াছে'—এরূপ বলিলে এখন আর চলিতেছে না। তবে উপায় কি? বৈজ্ঞানিক মন লইয়াই বিচার করিতে হইবে: পূর্ব পূর্ব যুগের পদ্ধতি-সকল কেন এখন বিফল হইতেছে? মানুষের মনের কতদূর কি পরিবর্তন হইয়াছে? পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও কোথাও অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল কি না?—ইত্যাকার গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে—অনুরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া মানুষকে একাধিক বার যাইতে হইয়াছে। আজ আণবিক শক্তি মানুষকে যতটা বিচলিত করিতেছে, সহস্র বৎসর পূর্বে বারুদ আবিষ্কার তাহাকে তাহা অপেক্ষা কম বিচলিত করে নাই। এইরূপ অন্যান্য ছোটবড় সকল আবিষ্কার সম্বন্ধেই বলা যায়।

যে প্রজ্ঞা মানুষকে আজ সৎপথে, সত্য ও কল্যাণের পথে, প্রেম ও মিলনের পথে চালিত করিতে পারে, সেই প্রজ্ঞার উৎস কোথায়—এখন তাহাই সন্ধান করিতে হইবে। স্বভাবতই আমরা আসিয়া পড়িয়াছি ধর্ম ও দর্শনের এলাকায়। এইখানে অন্বয়-ব্যতিরেকী প্রমাণে দেখা যায় শাস্ত্র কিছু জ্ঞানের উৎস নয়। পণ্ডিত অজ্ঞ থাকিয়া যায়, আবার আর একজন শাস্ত্র না পড়িয়াও সর্ব জ্ঞানের অধিকারী হয়। এ জ্ঞান কোথা হইতে আসে? অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়—ধর্ম-জীবনের সাধনায় অন্তর্নিহিত এমন কোন শক্তি জাগ্রত হয়, যাহা কল্যাণময় জ্ঞানের উৎস। এই জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিলে তবেই অন্যান্য জ্ঞানকে আমরা শুভ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারি। শুভ বুদ্ধি জাগ্রত না হইলে শক্তিকে আমরা অশুভ উদ্দেশ্যেও লাগাইয়া থাকি। এই শুভ বুদ্ধি—এই কল্যাণ-বুদ্ধির অপর নাম প্রজ্ঞা (wisdom)। এই প্রজ্ঞাই সিদ্ধান্ত করে কোন্ পথ অবলম্বনীয়, এই প্রজ্ঞাই আমাদের পথ দেখাইয়া চলে—এই প্রজ্ঞাই মানুষের অন্তরে উর্ধ্বতর শক্তির ইঙ্গিত-স্বরূপ। এই প্রজ্ঞাই বুঝাইয়া দেয় মানবিক মূল্যবোধ, বুঝাইয়া দেয় জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি—পরম কাম্য কি, বুঝাইয়া দেয় অপরের সুখশান্তির সহিত নিজের সুখ-শান্তিতেই চরম তৃপ্তি, পরম লাভ।

অতএব দেখা যাইতেছে, আর্থনীতিক সমস্যাকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখাইয়া যন্ত্রবিজ্ঞান সহায়ে তাহার সমাধান করিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আরও দশটি সমস্যা উদ্ভূত হইয়া সমস্যার সমাধান অসম্ভব করিয়া তুলে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সমস্যাগুলি আর আর্থনীতিক নয়, অধিকাংশই মানসিক; বস্তুকেন্দ্রিক (objective) নয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক (subjective); অতএব বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও পদ্ধতিকে আজ বস্তুতে নিবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না, ব্যক্তিকেও ধরিতে হইবে; অর্থাৎ এ সকল সমস্যার সমাধান হইবে মনোবিজ্ঞানের রাজ্যে, এবং ধর্মকেও আজ মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণের সম্মুখীন হইতে হইবে। বিজ্ঞানকে বলিব, 'ধর্মকে পরীক্ষা না করিয়া যদি উড়াইয়া দাও, তবে তুমি অবৈজ্ঞানিক'; আর ধর্মকে বলিব, 'যদি তোমার ভিতর সত্য থাকে, তবে ভীত

হইও না—বিশ্লেষণী পরীক্ষার সম্মুখীন হও, সত্য উদ্‌ঘাটিত হইবে।'

এক কথায় বলিতে পারা যায়: বস্তু ও ব্যক্তিকে, জড় ও মনকে পৃথক্‌ভাবে না দেখিয়া একই সত্তার বিভিন্ন অবস্থারূপে দেখা সম্ভব কি না?—বিজ্ঞান এই চিন্তার সূত্র লইয়া গবেষণা করুক। মনের বিভিন্ন অবস্থায় একটা ক্রম-বিকাশের সহজ নিয়ম প্রতিভাত হইবে। মনের বিভিন্ন স্তরে একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ। এই একের সূত্র ধরিতে পারিলে আর স্তরচ্যুতির আশঙ্কা কই? এইখানেই মানুষ খুঁজিয়া পায় তার নিশ্চিত আশ্রয়।

এই নিশ্চিত এবং নিশ্চিন্ত আশ্রয়েই মানুষের পুনর্বাসন সম্ভব। এইখানে আসিলে তাহার ভয় নাই, ভাবনা নাই, অপরের নিকট হইতে ক্ষতির আশঙ্কা নাই, অপরের ক্ষতি করিবারও প্রবৃত্তি নাই। এইখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব—মানুষের স্বরূপানুভূতি,—অমৃতত্ব!

বৈজ্ঞানিকেরা রাতারাতি আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না; তাই আধ্যাত্মিক সাধকদেরই শুরু করিতে হইবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং দেখিতে হইবে আধ্যাত্মিকতাকে কুজ্ঝটিকা-মুক্ত করিয়া 'অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে' পরিণত করা সম্ভব কিনা। যদি তাহা সম্ভব হয়, তবেই এ যুগের মানুষ তাহার বিষম ব্যাধি মানসিক স্তরচ্যুতির প্রতিকারের জন্য—শাশ্বত শান্তি লাভের জন্য ছুটিয়া আসিবে ধর্মের কাছে। সেইখানেই সে পাইবে তাহার সমগ্র মনের পরিচয়—সে চিনিবে নিজেকে, নিজেকে চিনিয়াই সে চিনিবে সকলকে, এই আত্মানুভূতিতেই ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব মানসিক স্বাস্থ্য ও শান্তি।

যখনই এই জ্ঞান—এই যোগ লুপ্ত হয়, তখনই ব্যাপকভাবে দেখা যায় মানসিক স্তরচ্যুতি—তখনই বহু মানব অধর্ম আচরণ করে, দুর্নীতি-পরায়ণ হয়,—ইহারই অপর নাম ধর্মগ্লানি! তখনই ঐশ্বর শক্তি আবির্ভূত হন, এই জ্ঞান ও যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। আবার বহু মানব স্বধর্ম পালন করিতে আরম্ভ করে, সমাজে সংসারে শান্তি ও সুনীতি ফিরিয়া আসে, ইহাই মানসিক পুনর্বাসন—ইহারই অপর নাম ধর্মস্থাপন।

Science of Religion

All science has its particular methods; so has the science of religion. It has more methods also, because it has more material to work upon. The human mind is not homogeneous like the external world. According to the different natures there be different methods.

Yet through all minds runs a unity and there is a science which may be applied to all. This science of religion is based on the analysis of the human soul. It has no creed.

—*Swami Vivekananda*

চলার পথে

'যাত্রী'

তোমায় মনে পড়ে! মনে পড়ে, এই রকম এক কৃষ্ণাষ্টমীতেই তুমি একদিন এসেছিলে। সেদিনের আকাশ অসীম উদার নীলে হাসেনি। রাতের নভতলে সেদিন ছিল নিবিড় মেঘের আবরণী। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কেমন এক ভয়াল ভ্রূকুটি। নিথর নিশীথে ছিল—মহাতন্দ্রার নিমীল অনুভূতি। বৃষ্টি পড়ছে অবিরত, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে। আর সেই ভরাদুর্যোগের মধ্যে বসুদেব চলেছেন সদ্যোজাত তোমাকে কোলে নিয়ে। তোমাকে দেখে, তোমার ঐ 'অখিলরসামৃতমূর্তি' রূপের ছটায় তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। অত ভয়ের মধ্যেও তাঁর শোণিত-স্রোতে লহরে লহরে কেমন এক পুলক ঝলমল করছে। পূর্ণচন্দ্র তুমি, সেদিন তুমি তাঁর হৃদয়-সাগর দিয়েছিলে দুলিয়ে। আকুল তাঁর সে পথচলায়, মাতাল বাতাস এসে কত না স্বপ্ন ঝরাল। তবুও সমস্ত 'সৌন্দর্যসারসন্নিবেশ' তোম'কে ছাড়তে হবে মনে ক'রে তাঁর আকুল ক্রন্দন, স্মৃতি-যমুনার কূলে এসে কত না আছাড় খেল! আবেগে তাঁর উথল পরাণ হ'ল উদাস।

মৃত্যুহীন তুমি, এলে মর-জগতে। জন্মজরাহীন তুমি, অথচ সাধারণ মাণবকের মতোই হ'লে বর্ধিত। রূপহীন তুমি, কিন্তু কি এক অপূর্ব অভিরাম নব-ঘন-শ্যাম-দ্যুতি তোমার তনুকে ক'রল আলোকিত। তুমি অচঞ্চল, তুমি 'ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্'—ক্রীড়াচ্ছলেই দেহ ধারণ করেছ, তবুও ভারতের সকল দিক ঘিরেই তোমাকে নিয়ে লুকোচুরি খেলার অন্ত নেই। তাইতো প্রেমভাবে গোপিকাগণ, ভয়ভাবে কংস, দ্বেষযুক্ত হ'য়ে শিশুপাল, সংসার সম্বন্ধে বৃষ্ণিবংশীয়গণ, সখ্যভাবে পাণ্ডবগণ, বাৎসল্যভাবে যশোদা, ভক্তিভাবে উদ্ধবাদি ভক্তগণ তোমার জীবনায়নের সবটুকুই ঘিরে রেখেছে। আর আশ্চর্য! বিভিন্নভাবে, এমনকি বিরুদ্ধ ভাবে হলেও, অনন্য-মনে তোমাকে চিন্তা ক'রে এরা সকলেই তোমাকে পেয়ে গেল! তোমাকে পেয়ে ধরণী ধন্য! তোমার পায়ের পরশ পেয়ে তৃণ-গুল্ম ধন্য তোমার নখ-স্পর্শে তরুলতা ধন্য! তোমার সদয় দৃষ্টিলাভ ক'রে নদী-গিরি-পশু-পক্ষীরাও ধন্য (ধন্যেয়ম্···করজাভিমৃষ্টাঃ—ভাগবত, ১০।১৫।৮)!

কিন্তু তুমি যে ঠিক কে, তা আজও বুঝতে পারলাম না। মহাভারতে, পুরাণে, ভাগবতে, গীতায় এবং পরবর্তী কত না ভক্তিশাস্ত্রে তোমাকে কত রূপেই না দেখেছি। কতবার তোমাকে দেবতা বলে মনে হয়েছে, কখনও পূর্ণব্রহ্ম—আবার পরক্ষণেই মনে হয়েছে তুমি সাধারণ মানুষের মতো—তুমি 'অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল'। কেন এমন হয়? সর্বজীবে, সর্বভাবে, সর্বানুভবে তুমি ওতপ্রোত ব'লেই কি—কিংবা ভালমন্দ, সবার ভেতরেই তুমি একাকার ব'লেই কি ঐ রকম হয়? শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব, তিনগুণের অতীত ব'লেই কি তোমার আপাতবিরুদ্ধ কথাবার্তা ও ব্যবহারের মধ্যেই তোমার শ্রেষ্ঠত্ব ওঠে ভেসে? এই প্রসঙ্গে আচার্যের সেই কথা মনে পড়ে—'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ'—তিনগুণের অতীত ব্যক্তি যখন জীবনের পথে চলেন, তখন তাঁকে কখন কোন বিধিনিষেধের মধ্যে আটকে রাখা যায় না।

তুমি তো বলেছ—তুমি সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা (গীতা, ১০।২০)। তুমি অব্যক্ত স্বরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত ক'রে অবস্থান ক'রছ (গীঃ, ৯।৪), তাইতো ভক্তের চোখে 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে' (চৈতন্যচরিতামৃত)। ভাগবতেও শুনি, সকল আত্মার আত্মা তুমি। জানি,

তুমি জগতের হিতের জন্য মায়াযোগে এই পৃথিবীতে দেহ ধরে এসেছ ('কৃষ্ণমেনমবেহিত্বম্ …মায়য়া।' ভাগবত, ১০—পূর্বার্ধ ১৪।৫৫)। শুধু তাই নয়, তুমিই যে আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তুমি পিতাপুত্রাদি থেকে প্রিয়, ধনসম্পদের চেয়ে প্রিয়, অন্য সমস্তকিছুর থেকেও প্রিয় (বৃঃ উপঃ, ১।৪।৮)। এমন কি, সমস্ত প্রিয় বস্তুর মধ্যে তুমিই প্রিয়তম (ভাঃ, ৩।৯।৪২)। আমাদের দেহ যে এত প্রিয়, তাও তার মধ্যে তুমি রয়েছ ব'লে (ভাঃ, ৩।৯।৪২)। তোমাকে পেলে অন্য কোন পাওয়া আর সুখকর ব'লে মনে হয় না (গীঃ, ৬।২২)। আর তুমি নিজে নির্গুণ-ব্রহ্ম হ'য়েও সকল জীবের মঙ্গলের জন্যই মনুষ্যদেহ আশ্রয় ক'রে লীলা করতে এসেছ, যাতে বহির্মুখ জীব, তোমার লীলাকথা শুনে তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয় ('অনুগ্রহায়…তৎপরোভবেৎ।'—ভাঃ, ১০।পূর্বার্ধ ৩৩।৩৭) আর রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ তুমি, তোমার প্রতি কেউ আকৃষ্ট না হ'য়ে কি পারে? তোমার অনুভবও আমাদের কাছে আনন্দপ্রদ ('কেবলানুভবানন্দ স্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।'—ভাঃ, ৭।৬।২৩)। তাইতো, হে পরম প্রিয়, তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছি। তোমার শঙ্খনিনাদে আমাদের মোহ ঘুচিয়ে দাও। আমাদের আঁখির নীলে তোমার স্বপন-সুরভি দাও ছড়িয়ে। তোমার কৃপাকণা দিয়ে আমাদের হৃদয় দাও রাঙিয়ে। ওগো বাঁশরিয়া, তোমার সেই মহাকর্ষণের বাঁশীটি আবার বাজাও।

শুনেছি, তুমিই হ'লে আমাদের গতি, আমাদের সকল কর্মের নিয়ামকও। এমন কি, তোমাকে জানবার ইচ্ছাটুকুও তোমারি দেওয়া (গীঃ, ১৫।১৫)। আমরা তোমার হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তুমি যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু—নিমিত্ত মাত্র (গীঃ, ১১।৩৩), আমাদের সকল ক্লান্তি তোমার ছোঁয়ায় সরিয়ে দাও।

তবে আমাদের বলতে কি কিছুই নেই? আছে। তুমি যদি হও আগুন, আমরা তার স্ফুলিঙ্গ; তুমি যদি হও বারিধি, আমরা তার জলকণা; তুমি যদি হও আকাশ, আমরা তার একটি স্থান-বিন্দু; তুমি যদি হও পৃথিবী, আমরা তার ধূলিকণা। আমাদের মনে তোমার স্মৃতি নিয়ত রয়েছে আঁকা।

এর পরেও, 'তুমি কে?'—এ প্রশ্ন আর তুলব না। এই রকম প্রশ্নের উত্তরেই তুমি অর্জুনকে বলেছিলে—'হে পার্থ, তোমার এত সব বিভূতি জেনে লাভ কি? জেনে রাখ, এই সমস্ত জগৎ আমার এক অংশ দিয়েই ধরে রেখেছি।' (গীঃ, ১০।৪২; 'পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি'—ছাঃ উপঃ, ৩।১২।৬)। সামান্য অংশের পরিমাণই যদি এত হয়, তাহলে তোমার স্বরূপ কি? উত্তরে বলবে, সেটা তোমাদের সান্ত মন দিয়ে জানা সম্ভব নয়, কারণ—সেটা অনন্ত, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অজ্ঞেয়। বুঝলাম, আমাদের জ্ঞানের ছোট্ট দীপটি নিয়ে তোমার মতো সূর্যকে দেখানো যায় না, আরতি করা যায় মাত্র।

তাই চল পথিক, তাঁকে আবাহন করবে চল। তোমাদের ডাকের জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন যে! মনে রেখ, তোমরা আছ বলেই তিনি আছেন। মনে রেখ—সন্তানকে বাদ দিয়ে মাতৃত্ব নেই, প্রেমাস্পদকে বাদ দিয়ে প্রেমিক নেই, জীবকে বাদ দিয়ে নেই ঈশ্বরত্ব, মেঘকে বাদ দিয়েও রামধনু হেসে ওঠে না। তোমাদের আকর্ষণ করছেন বলেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ। যেমন ক'রে পার তাঁকে আঁকড়ে ধর। যশোদার মত তাঁকে স্নেহ দিয়ে ধরো, কংসের মত তাঁকে ভয় দিয়ে ধরো, শিশুপালের মত তাঁকে ঈর্ষা দিয়ে ধরো, অর্জুনের মত তাঁকে সখা ব'লে ধরো, শ্রীরাধার মত তাঁকে প্রেম দিয়ে ধ'রে এক হয়ে যাও। তোমাদের জন্যই তো লীলার স্রোতে তিনি ভেসে এসেছেন তোমাদেরই প্রাণের খেয়ায়। চল চল, সেই খেয়ার ঘাটে তাঁকে আহ্বান ক'রে নিতে চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

সৎপ্রসঙ্গ *

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

জ্ঞান, কর্ম ও যোগ—এই তিনটিই উপায়, এই তিনটিই তাঁকে লাভ করবার পথ।

ভগবান বলেছেন, যে তাঁকে যেভাবে চায়, তাকে তিনি সেভাবেই দেখা দেন।

যাঁরা রাজসিক প্রকৃতির, কাজ না ক'রে থাকতে পারেন না, তাঁদের জন্যে কর্মের উপদেশ। আসক্ত কর্ম নয়, নিরাসক্ত কর্মই কর্মযোগ। আর যাঁরা সংসারে থেকেও সংসারে আসক্ত না হ'য়ে ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তাঁদের জন্যে ভক্তি। আর যাঁরা ব্রহ্ম ছাড়া সংসারে বা অন্য কিছুতেই তৃপ্তি পান না, তাঁরা জ্ঞানী।

ভগবান অর্জুনকে কর্মের উপদেশ দিয়েছেন, অর্জুন ক্ষত্রিয়, কর্ম করাই তাঁর প্রকৃতি। কিন্তু সে কর্ম কেমন ক'রে করতে হবে, ভগবান তা নিজেই শিখিয়ে দিলেন: 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব'—আমি তো পূর্বেই মেরে রেখেছি, কর্তা আমি—তুমি নও।

'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা'-ই নিজেকে 'কর্তাহমিতি মন্যতে'—কাঁচা আমিই নিজেকে কর্তা মনে করে, কিন্তু পাকা আমি জানে, 'আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর।'

শরণাগত হ'তে হবে—'যৎ করোষি'—যা কিছু কর সবই তাঁর কর্ম। তুমিই যে তাঁর, এই ভাব নিয়ে থাকতে হবে।

প্রথমে চাই গুরুবাক্যে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস থেকে নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা—'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। গুরু সব দিয়ে দেন শিষ্যকে। অর্জুন যখন 'আমি তোমার শিষ্য—আমাকে কৃপা কর' বলে শরণাগত হলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ পরম গুহ্যতম জ্ঞান দিলেন অর্জুনকে, বিশ্বরূপও দর্শন করালেন—যা কেউ দর্শন করেনি।

আর বললেন: 'মৎকর্মকৃৎ'—আমার কর্ম কর, মৎপরায়ণ হও, আমার ভক্ত হও। অর্জুন, তুমি আমার পরম প্রিয়, তাই তোমাকে গুহ্যতম কথা শোনাচ্ছি, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'—সকল ধর্ম ত্যাগ ক'রে 'মামেকং শরণং ব্রজ'—একমাত্র আমারই শরণ লও, আমিই শুভাশুভ পাপ-পুণ্যের পারে নিয়ে যাব।

পুণ্যকর্ম, শুভকর্মও বন্ধন, যদি তা সকাম ভাবে করা হয়। অশুভ কর্ম তো বন্ধনই; সংসারে জড়িয়ে রাখে—তাঁর কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

তাই কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণ নিতে হবে। 'তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি'—তাঁর কৃপাতেই পরমা শান্তি পাওয়া যাবে।

ঠাকুরও ছিলেন মায়ের শরণাগত। ধর্ম-অধর্ম, শুচি-অশুচি, পাপ-পুণ্য—সবই তিনি সমর্পণ করেছিলেন মাকে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শুনে বললেন, 'সবই যে দিয়ে দিলেন, আপনার রইল কি?'

এই তো 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'—সব ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে তাঁর শরণ লওয়া, তাঁর হ'য়ে যাওয়া। গীতায় স্পষ্টই তো বলেছেন ভগবান: 'বৈধী ভক্তির পার হও, শুভাশুভ ধর্মাধর্মের পার হ'য়ে এসো অর্জুন!

* ১৯৫৭ খৃঃ শিলচর ও করিমগঞ্জে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজনীয় সহাধ্যক্ষ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গের সারাংশ। অনুলেখিকা—শ্রীসুধা সেন।

তারপর তো আমি আছি—আমিই ধুয়ে মুছে সাফ ক'রব তোমায়। সবচেয়ে সোজা পথ এই শরণাগতি! যাগ-যোগ নেই, কোনও কষ্ট নেই; শুধু আত্মসমর্পণ করা, তাঁর হ'য়ে যাওয়া।

সকলের হৃদয়ে তিনি অধিষ্ঠিত থেকে যন্ত্রের মতো সকলকে ঘোরাচ্ছেন। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা কিছুই নেই। গরুকে যেন লম্বা দড়ি দিয়ে খোঁটায় বেঁধে রেখেছে, ঐ সীমার মধ্যেই ঘোরা-ফেরা, যত আস্ফালন।

অর্জুনকে উপলক্ষ ক'রে সংসারী জীবদের বলছেন ভগবান: কর্মের সাধনা ক'রে পরা ভক্তি লাভ কর। পরা ভক্তি আর পর জ্ঞান তো একই কথা!

তাই শুধু তাঁর হ'য়ে কর্ম ক'রে যাওয়া, শরণাগত হ'য়ে পড়ে থাকা—স্বাধীনতা এত-টুকুও নেই। যাকে তুলবেন তাকে দিয়ে 'এষ এব এনং সাধু কর্ম কারয়তি'—সাধু কর্ম করাচ্ছেন; আবার যাকে ফেলবেন তাকে দিয়ে অসাধু কর্ম করাচ্ছেন। সবই তাঁর ইচ্ছা। আমাদের কোন ইচ্ছা বা কোন স্বাধীনতা নেই।

'তমেব শরণং গচ্ছ'—সর্বভাবে তাঁরই শরণ লও। তিনিই গতি, ভর্তা, প্রভু সব।

কৃপা পাওয়া যাবে, তিনি কৃপা করবেন। তিনি জ্ঞানীর কাছে অবাঙ্‌মনসোগোচর, যোগীর কাছে পরমাত্মা আর ভক্তের কাছে ভগবান। একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে হবে।

ভগবান এসে অযাচিত ভাবে কৃপা করছেন, নিজে ডেকে বলছেন: 'মাং নমস্কুরু'—আমাকে নমস্কার কর; 'মদ্‌যাজী'—আমার সেবাপরায়ণ হও। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়েছ, এবার এগিয়ে পড়। এই তো অমৃতত্ব-লাভের পথ। তাঁকে ভক্তি কর, তাঁকে ধর, আর কিছু করতে হবে না। তিনি নিজে এসে বলেছেন, 'আমি তো আছি—।'

ঠাকুরও বলেছেন: আমি ছাঁচ তৈরী ক'রে রেখেছি, তোরা শুধু মনটা ছাঁচে ঢেলে নে—বাড়া ভাতে বসে যা।

মাথা নীচু করতে শেখ। মাথা নীচু ক'রে তাঁর শরণাগত হ'য়ে যাও। তিনি আছেন, ভয় কি?

* * *

রাজসিক আহার বর্জন ক'রে সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করলে মন স্থির হয়, চঞ্চলতা দূর হয়। চঞ্চল মনকে সংযত স্থির করতে হ'লে অভ্যাস চাই। এই অভ্যাসই সাধনা। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ—এইগুলি অভ্যাস করতে হবে।

ভগবান বলেছেন:

যিনি অনন্যচিত্ত হ'য়ে আমাকে স্মরণ করেন, আমি তাঁর কাছে অনায়াসলভ্য। নিত্য স্মরণে কি হয়? আমরা তো কাজলের ঘরেই থাকি। নিত্য স্মরণে আমাদের গায়ে কালি লাগে না ·তাছাড়া সংস্কারগুলো ততটা ক্ষতি করতে পারে না। স্মরণ বেশী হলেই তো ধ্যানে পরিণত হ'ল।

এই তিনটি জিনিসের মূলে আবার থাকা চাই অনুরাগ, বিশ্বাস। কামনা-বাসনা দমনের জন্য শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণের দরকার। আর চাই সাধুসঙ্গ। সাধুর কাছ থেকে ভগবৎকথা শ্রবণ ক'রে পরে সে সব মনন করতে হয়। সাধন ঠিক হ'লে সিদ্ধি হয়। পওহারী বাবা বলতেন: 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'। ঠিক রাস্তায় গেলে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। শাস্ত্রে চিনি ও বালি মেশানো আছে, বালি ফেলে চিনি নিতে হয়। সাধুমুখে শাস্ত্রের সার মর্ম জেনে নিতে হয়।

Intellect আর Intuition দুটি জিনিস। Intellect অর্থাৎ মস্তিষ্ক দিয়ে, কেবল পাণ্ডিত্য দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। Intellect আমাদের কেবল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু

Intuition অর্থাৎ আসল অনুভূতি আমাদের নিয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রিয়াতীত সত্যে। ধ্যানের ভেতর দিয়ে সেখানে যেতে হয়।

আজ দেখছি মস্তিষ্কবান্ পণ্ডিতেরা সব হৃদয়ের কাছে, অনুভূতির কাছে মাথা নত করছেন। ঠাকুরের কাছে এই অনুভূতির কথা পেয়েছে বলেই জগৎ আজ তাঁর পূজা করছে।

সাধুসঙ্গ দরকার—তপস্যায় যা না হয়, সাধুসঙ্গে তাই হয়।

গিরিশবাবুর কাছে গেলুম। তিনি বললেন, 'ওরে তোরা ঠাকুরের কথা শুনতে এসেছিস, আমাকে ত্যাখ, আমাকে কি ক'রে দিয়েছেন ঠাকুর। ত্যাখ, কি ছিলুম, আর কি হয়েছি!'

সাধারণ লোকের মন বন্ধক দেওয়া আছে বিষয়ের কাছে, সাধুসঙ্গে সে বন্ধক ছুটিয়ে আনা যায়। ঠাকুর বলতেন, 'মাতালকে চাল-ধোয়া জল খাইয়ে দিলে মাতলামি যায়, হুঁশ হয়।'

মাঝে মাঝে ঠাঁই-নাড়া হ'তে হয়, নির্জনে গিয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। যে ঘরে বিকারের রোগী, সে ঘরেই জলের জালা আর তেঁতুল—রোগ সারে কখনও?

আর চারা গাছকে বেড়া দিয়ে রাখতে হয়। গুঁড়ি মোটা হ'য়ে গেলে আর ছাগল-গরুতে খেতে পারে না।

যীশুও বলেছেন এমনি কথা। একজন কিছু বীজ ছড়ালে; কিছু পড়ল পাহাড়ে, কিছু কাঁটার জঙ্গলে, কিছু রাস্তায়, কিছু উর্বরা জমিতে। পাহাড়ের পাথরে বীজ ফ'লল না, কাঁটার জঙ্গলে বীজের গাছ হ'ল, কিন্তু বাড়তে পেল না, রাস্তার বীজ খেয়ে গেল পাখীতে, শুধু উর্বর চষা জমিতেই বীজের থেকে গাছ হ'ল, ফসল ফ'লল।

জমির চাষ মানে কি? অভ্যাস, সাধন; তবে তো জ্ঞান-ভক্তির ফসল ফলবে।

সংসারে সারাদিন খাটতে পারি আমরা, কিন্তু তাঁকে ডাকবার সময় পাই না।

ঠাকুর বলতেন, সংসারে কুলোর মতো হবে, চালুনির মতো নয়। কুলো অসার বস্তু ফেলে দিয়ে সার বস্তু গ্রহণ করে। আর আমরা চালুনির মতো সার ফেলে দিয়ে অসার নিয়েই মেতে আছি।

ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা*

শ্রীবিমানেশ চট্টোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ মিশনের এই গ্রন্থাগারটি উদ্বোধন করবার দুর্লভ সুযোগে ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে দু-এক কথা বলব। বিশেষ আশা করি, এই গ্রন্থাগার ভারতীয় চিন্তা-বিকীরণের ও ভারতীয় কৃষ্টি-ব্যাখ্যার একটি কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠবে।

একই সমুদ্র যেখানে দুটি দেশের উপকূল বিধৌত করে সে ক্ষেত্রে ইতিহাস ও ভূগোলের পরিস্থিতি অনুসারে যতটা আশা করা যায়, ভারত-কৃষ্টি এখানে ততটা প্রসারিত হয়নি; তবু মিশনের বন্ধুদের চেষ্টায় এই গ্রন্থাগার শুভ সূচনাই করছে।

ঠিকভাবে ব্যবহৃত হ'লে গ্রন্থাগার কৃষ্টি-বিস্তারের বিশেষ সহায়ক, বিভিন্ন জাতির কৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করবার জন্যে দেশে দেশে

* মরিশাস রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রে গ্রন্থাগার-উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার সারানুবাদ। মেজর জেনারেল চট্টোপাধ্যায় তখন মরিশাসে ভারত সরকারের কমিশনার ছিলেন; বর্তমানে নিউইয়র্কের কনসাল নির্বাচিত হইয়াছেন।

গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে সভ্যতার উষাকালেই। পুস্তক রচিত হয়েছে, পঠিতও হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। প্রশ্ন ওঠে: বই লেখা ও বই পড়ার দ্বারাই কি মানুষ তার জীবনের চরম উদ্দেশ্য—পরম পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে? আরও প্রশ্ন জাগে, বিদ্যা ও কৃষ্টি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন উদ্দেশ্য কিনা?

জ্ঞানী সমদর্শী; তিনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে যে চোখে দেখবেন মূর্খ চণ্ডালকে—এমনকি অন্যান্য জীবজন্তুকেও সেই চোখে দেখবেন, শান্ত মনে। তিনি সৃষ্টির সব কিছুকে এক উদার দৃষ্টিতে দেখবেন। এইটিই হচ্ছে ভারতীয় কৃষ্টির মূল কথা।

কৃষ্টি ও সভ্যতা

বিষয়টির ভেতরে প্রবেশ করবার আগে 'কৃষ্টি' ও 'সভ্যতা' কথা-দুটির সংজ্ঞা-নিরূপণের চেষ্টা ক'রব। সংস্কৃত ভাষায় 'কৃষ্টি' বা 'সংস্কৃতি'র অর্থ উৎকর্ষ; অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্তব্য-সচেতন প্রাকৃতিক বুদ্ধিকে শুদ্ধ ক'রে উৎকৃষ্ট করবে যে প্রক্রিয়া—তাই সংস্কৃতি বা কৃষ্টি।

কৃষ্টির মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের একটি মানদণ্ড পাওয়া যায়। কৃষ্টি বলতে বোঝায়—একই স্থানে একই পরিবেশে অবস্থিত অনেক মানুষের মনের ও বুদ্ধির উৎকর্ষ। জাতীয় কৃষ্টিতে ধরা পড়ে একটি জাতির প্রতিভা ও সংখ্যাধিক লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পাঞ্জাবী, তামিল, মারাঠী প্রভৃতি আঞ্চলিক কৃষ্টি থাকতে পারে, তারা ভারতীয় কৃষ্টির প্রশস্ত ধারাকেই পুষ্ট করে। আবার ভারতীয় কৃষ্টি প্রাচ্য কৃষ্টিরই একটি বিশেষ ধারা। পাশ্চাত্য কৃষ্টিও এইরূপ এক আঞ্চলিক ও জাতীয় কৃষ্টি থেকেই গড়ে উঠেছে। এখন এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কৃষ্টির সমন্বয়েই রূপ নেবে এক বিশ্ব-কৃষ্টি, যাকে বলা যেতে পারে এ যুগের সভ্যতা।

'কৃষ্টি' ও 'সভ্যতা' ব্যবহারের দিক্ থেকে প্রায় সমার্থক; কিন্তু তাদের মূলগত পার্থক্য বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে ধরা পড়ে। 'কৃষ্টি' মানসিক অগ্রগতি, আর 'সভ্যতা' জাগতিক উন্নতি। 'কৃষ্টি' কথাটির মধ্যেই একটা গতি-ময়তা রয়েছে; অবিরত অগ্রসর চিন্তাধারা মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির অপূর্ণতা পরিপূরণ ক'রে দিচ্ছে। বড় বড় সাধক, দার্শনিক, কবি, দেশপ্রেমিক ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের মনীষিবৃন্দ ইতিহাসের স্রোতে তাঁদের ভাবধারা মিশিয়ে দিয়েছেন, যার ফলে দেখা দেয় নব নব কৃষ্টির ক্রমবিকাশ।

ইংরেজী 'civilization' কথাটি 'civil' বা 'city' শব্দের সঙ্গে জড়িত। এই 'সিটি' বা নগরে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বাস ক'রত দিগ্-দেশাগত বিচিত্র লোক, পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময়ে একটা সামঞ্জস্য সাধন ক'রে তারা শিক্ষায় ও সৌন্দর্যবোধে উৎকর্ষ লাভ করে। বুদ্ধিসহায়ে শিল্পবাণিজ্য, নগরনির্মাণ, যোগা-যোগস্থাপন, সামাজিক স্বাধীনতা, রাজনীতিক সংঘ প্রভৃতির সূত্রপাত ক'রে মানুষ চাইল তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে। সব কিছুর উদ্দেশ্য উৎকর্ষ-লাভ; ভয় ও অভাব থেকে মুক্ত জীবন-যাপনই তার লক্ষ্য। যারা এর বিপরীত—যারা শহর থেকে দূরে একা একা বা ছোট ছোট পরিবার নিয়ে বাস ক'রত, তাদের থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে এরা নিজেদের 'নাগরিক' বা 'সভ্য' ব'লত।

সংস্কৃত 'সভ্য' কথাটি এসেছে 'সভা' শব্দ থেকে। 'সভ্য' মানে সভার উপযুক্ত। 'দাস' বা 'দস্যু' প্রভৃতি জাতির অমার্জিত রীতির পরিবর্তে এরা ছিল সমাজ-জীবনের সুখসুবিধার পক্ষপাতী।

বিশ্বজনীনতা

প্রাচীন ভারতের কৃষ্টিগত চিন্তা বরাবরই বিশ্বজনীনতায় বিশ্বাসী। ভারতবাসীর চেতনায় এর গভীর প্রভাব। ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের মতে

কতগুলি দেশের উৎকট যুক্তিনিষ্ঠ প্রয়োগবাদ (rationalistic pragmatism) সংশোধন করার জন্য যে বিশ্বজনীন চিন্তা প্রয়োজন, তা রয়েছে ভারতে।

সমাজ-জীবনের সাংস্কৃতিক পদ্ধতি মানুষের স্বার্থপরতার কাঁটাগুলি দূরীভূত করে, এবং পারস্পরিক সাহচর্যে ও ভাববিনিময়ে একটা স্বাভাবিক দায়িত্বও গড়ে ওঠে।

সহস্র সহস্র বছর ধরে যে অফুরন্ত পরিবর্তন চলেছে—আদিম, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক মানুষের মনে ও সমাজে, সর্বত্র তা অবশ্যই প্রতিফলিত রয়েছে। আজ শহরের পরিবেশে সভ্যতার মান আমাদের হিসাবে উঁচু, তা ব'লে গ্রামাঞ্চলে কৃষ্টির মান নীচু নয়।

নৈতিক মূল্যমান

ভারতের প্রাচীন জীবনদর্শন—যার ধারা যুগ যুগ ধরে অব্যাহত—তা শুধু যে মানব-জীবনের রহস্যময় বিপরীত ধারাগুলির ব্যাখ্যা করে তা নয়, ব্যক্তিকেও উৎসাহিত করে এমন একটি ভাবে জীবন যাপন করতে—যাতে সে নিজে শান্তি পেতে পারে, অপরকে সুখী করতে পারে, এবং সমাজব্যবস্থা শক্তিশালী ক'রে তুলতে পারে। যে দেশে বিভিন্ন রীতিনীতি, নানা ভাষা ও একাধিক ধর্মবিশ্বাস বর্তমান—সেই বহুসমাজবিশিষ্ট দেশে যে সামাজিক নীতিবোধ প্রয়োজন, তা এই জীবনদর্শনই দিতে পারে।

ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক উদারতা ও তার ঘনীভূত চিরন্তন ভাবরাশি নতুন নতুন কৃষ্টি-শক্তিকে আত্মসাৎ করেছে এবং এই প্রক্রিয়ায় ভারত লাভবান্‌ই হয়েছে। 'আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ'—ভদ্র চিন্তাধারা চারি দিক থেকে আমাদের কাছে আসুক—ঋগ্‌বেদের এই প্রার্থনার ভাব—যত না প্রচারিত হ'ত, তার থেকে বেশী আচরিত হ'ত। সমসাময়িক চিন্তার অপ্রধান ধারাগুলিও আমাদের সভ্যতায় অনেক কিছু এনে দিয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি—উত্তরকালের জন্য যে অনেক খোরাক রেখে গিয়েছিল, তা জাতীয় জীবন-রক্ষায় ও উৎসাহ-সঞ্চারে আজ যতটা কাজে লাগছে, এতটা বোধ হয় আর কখনও লাগেনি।

মনই সকল কৃষ্টির উৎস, মানুষের সকল কর্ম-প্রচেষ্টাও মনকেই কেন্দ্র ক'রে। প্রাচীন দার্শনিক-দের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি কত স্বচ্ছ ছিল! বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁদের গভীর গবেষণা দেখে মানুষ আজও বিস্ময়ে অভিভূত। ভারতীয় দর্শনের সার কথা, জীবনের সংকল্প ও উদ্দেশ্য অতি তাৎ-পর্যপূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়েছে এই প্রার্থনায়ঃ

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়।

ভারত-কৃষ্টিতে রয়েছে এমন একটি গতি-শীলতা, যা ব্যক্তিগত চিন্তা কথা ও ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনকে বিকশিত করে মানসিক ঐশ্বর্যে ও নৈতিক সৌন্দর্যে। উর্ধ্বতর এই রূপান্তরের সাধনায় ভারতীয় মন স্বীকার করে প্রার্থনার বা দিব্যশক্তির প্রভাব।

অনাসক্তির শিক্ষা

অনাসক্তি অভ্যাস করতে গেলে কিছু না কিছু পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়; এই ত্যাগের ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। যার যেমন প্রয়োজন তাকে তেমন একটু সাহায্য করা—জমি বা অর্থ দ্বারা সাহায্য, অন্ন বস্ত্র বা আশ্রয় দান, কি একটু পরামর্শ দেওয়া বা কারও শুভ চিন্তা করা—সবই অনাসক্তি বা ত্যাগমূলক কর্মের প্রতীক।

মন নিয়ন্ত্রণ করে শরীর, অতএব মনঃসংযমের পথেই জীবনকে অনাসক্তভাবে গ্রহণ করা সম্ভব। অনাসক্ত ভাব দ্বারা প্রলোভন জয় করা যায়, এবং লাভক্ষতির ভাব দূর হলেই দায়িত্ববোধ

জাগ্রত হয়। আজকের বিভ্রান্ত বিশ্বে দৈনন্দিন কর্তব্য-সম্পাদনেও যে তিক্ততা ঈর্ষা ভুলবোঝা ভয়জাত ক্রোধ ও ঘৃণা দেখা যায়—তা সবই এড়ানো সম্ভব, যদি আমরা 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' গীতার এই নীতি অনুসারে কাজ ক'রে যেতে পারি; যদি আমরা সম্মান পুরস্কার, এমনকি স্বীকৃতিরও অপেক্ষা না রেখে নিষ্ঠাসহকারে নিজ নিজ কর্তব্য ক'রে যাই, তবে অবশ্যই ফল ফলবে—যথাসময়ে।

স্বতই মনে পড়ছে গত শতাব্দীর দৃঢ়সংকল্প অগ্রগামী দলের কথা, যারা মাতৃভূমি ছেড়ে বেরিয়েছিল—দূর বিদেশে নিজ নিজ শ্রমের সাহায্যে ভাগ্য পরীক্ষা করতে। ক্রমাগত সং-পরিশ্রমের দ্বারা তারা প্রমাণ ক'রে গেছে যে তারা ' র্মকুণ্ঠ ছিল না, আজ দেখা যাচ্ছে তাদের কর্ম ফল হয়নি।

মনঃসংযম

প্রাচীন আর্যদের প্রার্থনা সূর্যের কাছেঃ আমাদের মন আলোকিত কর। প্রাচ্য চিন্তা বার বার জোর দেয়—চিত্তশুদ্ধির ওপর। জগতের মায়াজাল থেকে মুক্তি পেতে মুনি-ঋষিরা প্রার্থনা করেছেন এই আলোর জন্য। তাঁরা বুঝেছিলেন, আত্মপরীক্ষার উদ্দেশ্যে এই আলোক অন্তর্মুখী করতে হবে। বিশাল ভারত-কৃষ্টিতে কত বিচিত্র ছাঁচ– সবই মনঃসমীক্ষার ফল, আত্মোপলব্ধির সাধনার পথে ক্রমপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতা। এরই জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করা হয়েছিল জ্ঞানের আলো। এই ভাব 'ভারত' নামটির সঙ্গেও যেন জড়িয়ে গেল। 'ভা' শব্দের অর্থ জ্ঞানালোক, 'রত'—সাধননিমগ্ন। তাই কোন কোন মনীষীর মতে 'ভারত' শব্দটির অর্থ—অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোকের সাধনায় নিমগ্ন।

আত্মোপলব্ধি

ইতিহাসের অসংখ্য পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে ভারতীয় কৃষ্টি চেষ্টা করেছে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে তার স্বরূপে, যেখানে বোঝা যায়—জীবনের অর্থ কি, জীবনযাপনের উদ্দেশ্য কি? ঐতিহাসিক ভাগ্যবিবর্তন ও সামাজিক রাজনীতিক বিপ্লব সত্ত্বেও ভারতের আত্মা অপরিবর্তিত রয়েছে। যে সব ভ্রান্ত ধারণা ভারতের মূলগত ভাবকে নষ্ট করতে চেয়েছিল, তার ভেতর থেকে দেশকে টেনে তোলার শক্তি জুগিয়েছে এই কৃষ্টি। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে অভিজ্ঞতার আগুনে কৃষ্টির গঠন বদলাচ্ছে, তার প্রয়োগও পরিবর্তনশীল। তাই একটি দেশের কৃষ্টি ঠিক মতো বুঝতে গেলে প্রয়োজন যথাযথ তথ্যসহ সে বিষয়ে শিক্ষা।

তথাকথিত উচ্চ শিক্ষা বলতেই যে উচ্চ কৃষ্টি বোঝায় তা নয়। ভারতে প্রায়ই দেখা যায় পল্লীবাসী দরিদ্র অশিক্ষিত; কিন্তু উচ্চ ভাবের পরিবেশে তারা মানুষ হচ্ছে, তাদের কৃষ্টিও উচ্চ স্তরের। সংকল্পের শুদ্ধতা ও সিদ্ধির আগ্রহ থেকেই হৃদয়ে অনুভূতি জাগে, শুধু পাঠ ও আলোচনার দ্বারা সত্যের উপলব্ধি হয় না। মেঘ সরে গেলে যখন আর কোন বাধা থাকে না, তখনই সূর্য দেখা যায়। মনের মলিনতা দূর হলেই অন্তরের দিব্যভাব অনুভূত হয়।

আত্মনিগ্রহ

বর্তমান পৃথিবীতে—মানুষের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-গুলি যখন গোলমাল সৃষ্টি করছে, মানুষে মানুষে ভুলবোঝা, ঈর্ষা হিংসা চলেছে, তখন আমরা সগর্বে আমাদের প্রাচীন উত্তরাধিকারের দিকে ফিরে তাকাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারত এগিয়ে চলেছে সামনে, তার রসদ জোগানো হচ্ছে পেছন থেকে। গান্ধীজীও বলেছেন, জীবন এগিয়ে যাবে সামনে, কিন্তু তাকে বুঝতে হবে পেছন থেকে

স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই বলতেন, 'শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, শক্তিই সকল ব্যাধির মহৌষধ।' মনের শক্তিকে বাদ দিয়ে শুধু শারীরিক বা জড়শক্তি কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে না। চিত্তবৃত্তি-নিরোধমূলক যোগই সেই সাধনা, যা শক্ত মনের সহায়ে শক্ত শরীরও গড়ে দেয়

ভয় ক্রোধ ঈর্ষা লোভ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কলুষিত করেছে; এগুলি জন্মায় অজ্ঞান মনে; অসীম থেকে এরা আমাদের মনকে টেনে নিয়ে যায় জড় বস্তুর প্রতি। তাইতো বলা হয়, 'বাসনার দুয়ার রুদ্ধ হলেই অন্তরের মানুষটির দেখা মেলে।'

শান্তিপ্রিয়তা

যন্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রতিদিনই পৃথিবী সংকুচিত হচ্ছে; ফলে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ সংঘর্ষময় আকর্ষণে পরস্পরের ঘাড়ে এসে পড়েছে। এতে শান্তি নষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এরই প্রত্যুত্তরে জ্ঞান-সমুজ্জ্বল কল্পনা-সহায়ে জেগে উঠবে এক উচ্চতর কৃষ্টি, যখন মানুষ মানুষের ভেতর দেখতে চাইবে শাশ্বত ও সম্পূর্ণ মানবটিকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় বস্তুকে নয়।

ভারতীয় কৃষ্টির গতি শান্তির পথে, শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে মানুষের মনে শান্তি আনাই তার উদ্দেশ্য। যজুর্বেদের সেই শান্তি-প্রার্থনা আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'সা মা শান্তিরেধি'—সেই শান্তি আমার কাছে আসুক —এই প্রার্থনা ভারতবাসীর শান্তিপ্রিয়তার যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে।

শান্তির সন্ধানেই ধ্যান ও উপাসনার স্থান-গুলি নির্মিত হয়েছিল দুর্গম পর্বতে বা তরঙ্গমুখর সমুদ্র-সৈকতে, ঘনবনের ভয়াল নির্জনতায় অথবা লোকালয় থেকে দূরে—নদীতীরে। এই সব স্থানে মানবের অন্তর্নিহিত মহামানব বা বিশ্বমানব অনুভব করেন প্রকৃতির সৌন্দর্য—দেবতার উজ্জ্বল ঐশ্বর্য।

সত্য-শিব-সুন্দর

অবিনশ্বর পরমেশ্বরের চিন্তা সর্বদা প্রয়োজন —আমাদের ব্যক্তিগত অভিমান খর্ব করবার জন্য। দৈনন্দিন আচরণে—প্রার্থনায়, কথাবার্তায় কাজে-কর্মে, নৃত্যগীতে, খেলাধূলায়, পড়াশুনায়, চাষবাসে, খাওয়া-পরায়—জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় কৃষ্টি সত্য-শিব-সুন্দরের এক অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীত-ধারার ইঙ্গিত দেয়! জীবনের সর্বপ্রচেষ্টায় —হ'ক তা আধ্যাত্মিক বা সামাজিক, আর্থ-নীতিক বা রাজনীতিক, শিল্প বা সাহিত্য, দর্শন বা বিদ্যা—সর্বত্র প্রকাশিত এক কল্যাণময় আভিজাত্য ও সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্যা ও শারীরিক পরিচ্ছন্নতা এখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরই একটি অঙ্গ; এদেশের লোক বিশ্বাস করে—পবিত্র শরীরেই পবিত্র মন থাকতে পারে। খাদ্যের শুচিতার ওপরও এত যে লক্ষ্য রাখা হয়, তার কারণ শুধু যে উপনিষদে আছে 'অন্নব্রহ্মে'র কথা—তা নয়, চিত্তের ধীরতা ও শরীরের নিরাময়তার জন্য প্রয়োজন এক নির্দিষ্ট মানের খাদ্য—এ ধারণা এ দেশের মজ্জা-গত। সাধকদের অভিজ্ঞতা, আহারশুদ্ধি থেকেই মন শুদ্ধ হয়, তাই থেকে লাভ হয় ধ্রুবা স্মৃতি; এই ধ্রুবা স্মৃতি থেকেই অজ্ঞান দূরীভূত হয়।

অহিংসার আদর্শ

কল্যাণভাবের মধ্যেই নিহিত আছে হিংসার বিরোধিতা, এই অহিংসা ভারতীয় কৃষ্টিতে ও জীবননীতিতে এক উচ্চ স্থান অধিকার ক'রে আছে। 'অহিংসা' বলতে মহাত্মা গান্ধী শুধু শারীরিক হিংসার অভাবই বুঝতেন না, যা কিছু সত্য শিব ও সুন্দর—তাই বুঝতেন। অহিংসার ওপর এত জোর দেওয়া হয়েছে যে চরম সীমায় উপায় যেন উদ্দেশ্যকেও ছাড়িয়ে যায়। 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'; 'অপ্রিয় সত্য বোলো না'—এই কর্কশতা-পরিহার সজ্জনসম্মত, এও এক প্রকার অহিংসা।

ঘৃণার দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না, ভালবাসাতেই ঘৃণা অবলুপ্ত, ভারতের এই চিরন্তন চিন্তার সঙ্গেও অহিংসা এক সুরে বাঁধা। মন্দ উপায় দ্বারা উচ্চতম উদ্দেশ্য লাভ করা যায় না, এ উক্তিও অহিংসাভাবের দ্বারা সমর্থিত।

সর্বোদয় ও সমন্বয়

অতি প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন বর্ণের, সভ্যতার নানা স্তরের জাতি—একের পর এক ভারতে প্রবেশ করেছে, পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের পর সমন্বয়ের পথ ধরেই ভারত চলেছে শক্তি ও আত্মবিশ্বাসপূর্ণ জীবনের শান্ত ছন্দ বজায় রেখে, এই তার অধিবাসীদের সহনশীলতার ও অবস্থানুযায়ী আচরণ করার শক্তির বিপুল পরিচয়।

সর্বভূতে দয়া বা করুণাই সকল সন্দেহ অবিশ্বাস ভয় ও বিরোধিতাকে জয় ক'রে মানুষের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করতে পারে। যে সূক্ষ্ম কৃষ্টিতে কোন ভেদই থাকবে না, তার জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিমার্জিত দৃষ্টিভঙ্গী, তারই আভাস পাওয়া যায় 'য একোঽবর্ণঃ' শ্রুতির মধ্যে।

এই উদার দৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে আছে 'সর্বজীবে সমভাব'। বিপর্যয়পূর্ণ ইতিহাসের সুদীর্ঘ যাত্রায় এই নীতিই ভারতকে পথ দেখিয়েছে। এ-কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে সহনশীলতা, আদান-প্রদান, সহাবস্থান প্রভৃতি ভাব আজ আরও বেশী ক'রে প্রয়োজন।

উদার দৃষ্টি, মহৎ চিন্তা, মধুর ভাষা, স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও সৎ আচারণের দ্বারা সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষ এদেশে চেষ্টা করে যাতে জীবনের কটা দিন মানুষের সেবায়, মানুষকে সুখ-শান্তি দিতেই কেটে যায়। জন্মলাভের পূর্বে সবই অব্যক্ত, মৃত্যুর পরও সব কিছু অজানা, মাঝের জীবনটুকুই তো আমাদের হাতে।

বর্তমান কর্তব্য

সর্বভূতে দয়া, পরম সত্তায় বিশ্বাস, সত্য জিজ্ঞাসা, সৌন্দর্যানুভূতি ব্যতীত মাতাপিতা ও জ্যেষ্ঠকে মেনে চলা, বৃদ্ধের যত্ন নেওয়া, বিদ্বান্‌কে শ্রদ্ধা করা, সাধু-সন্ন্যাসীকে ভক্তি করা; নারীর প্রতি সম্ভ্রম, শিশুর প্রতি স্নেহ, দেশপ্রেম, অতিথি-সৎকার—প্রভৃতি যে সব সূক্ষ্ম ভাব জীবনকে সুখকর ও সুন্দর করে, সে সবই ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত।

ভারতের মতো বহুসমাজবিশিষ্ট দেশে—যেখানে ভাবের অখণ্ড সমগ্রতাই চিন্তায় ও কর্মে সামঞ্জস্য আনতে পারে, সেখানে অপরের ভাষা প্রথা ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, তদভাবে সহনশীলতা একান্ত প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাদর্শ ভারত-কৃষ্টির এই ভাব প্রচার করবার প্রেরণা দিতে পারে।

অন্তরের আলো

আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান আজ মানুষকে যত কাছাকাছি এনেছে, এত কাছাকাছি বোধ হয় মানুষ এর আগে কখনও আসেনি। আবার মনের দিক দিয়ে মানুষ এখন মানুষের থেকে যত দূরে সরে গেছে—এত দূরে বোধ হয় পূর্বে কখনও যায়নি।

আমাদের কৃষ্টি অবিরত অন্তঃসমীক্ষার নির্দেশ দিচ্ছে, যাতে আমাদের চিন্তার তীক্ষ্ণকঠিন অসামঞ্জস্যগুলি দূরীভূত হয়, মনের যাবতীয় গ্রন্থি খুলে যায় এবং ভ্রান্তি ও স্বার্থপরতা যাতে আমরা বীরের মত জয় করতে পারি।

আশা করি মানব-মনে জ্ঞানের স্ফুরণে—এই গ্রন্থাগার বিকীরণ করবে সেই অতি প্রয়োজনীয় অন্তরের আলো। বিশ্বাস করি, এই প্রতিষ্ঠান দুই দেশের কৃষ্টির মধ্যে অধিকতর বোঝাপড়ার ভাবপ্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করবে; আরও আশা করি ভারত-কৃষ্টির চিন্তাধারা মানবচরিত্র-গঠনে সর্বত্র ব্যবহৃত হবে, এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী শ্রেণী জাতি ধর্ম রাষ্ট্র—সকলের মধ্যে পারস্পরিক মিলনের পরিধি ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে মানুষের সততা ও শুভবুদ্ধি এক স্থিরতর আশ্রয় লাভ করবে।

রামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

একদা বৈকুণ্ঠাধিপতি স্বয়ং ছোট্ট শিশুটি হ'য়ে বৃন্দাবনে এসেছিলেন যশোদা মায়ের কোলে। যিনি যুগে যুগে ভারতের উপাস্য দেবতা, তিনি খেলাচ্ছলে গোপ-বালকদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, বুকের ওপর চেপে ধরেছেন তাদের ধূলিমাখা পা। মাটি খেয়ে আর পাঁচজন শিশুর মতো মার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে অস্বীকার করেছেন। হাঁ করতে বললে শিশু মুখ ব্যাদান করলেন। এ কী! সমগ্র বিশ্ব যে সেই ছোট্ট মুখগহ্বরে! অমঙ্গল চিন্তায় যশোদা 'ষাট্‌ষাট্‌' বলে শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। মহাভারতের মহাবীর কৃষ্ণসখা অর্জুন দিব্যচক্ষু দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে ভয়চকিত স্বরে বলে উঠেছিলেন: 'অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে' এবং কত ক্ষমা চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের সৌম্যরূপ দেখবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। সেই বিশ্বরূপ মা যশোদা দেখলেন সাদা চোখে; অপরিসীম মাতৃস্নেহে বিশ্বরূপের আধার সেই অপরূপ শিশুকে বুকে চেপে ধরলেন।

আমরা মাধুর্যেই মুগ্ধ হ'য়ে আছি, রামকৃষ্ণের ভগবত্তা আমরা যেন দেখেও দেখতে পাইনা। ভালই হয়েছে। আমাদের শাস্ত্রে অধিকারি-ভেদের কথা আছে। আমাদের সাদা-মাঠা চোখে যেটুকু দেখতে পাই, তাতেই তো অন্তর ভরে যায়, তা বলতে পারলেই ধন্য হবো। যিনি আমাদের ভালবেসে চিরকাল কাছে কাছে রইলেন, দুর্গম গুহায় কঠোর তপশ্চর্যায় সংসার-সমাজ ছেড়ে চলে গেলেন না, গেরুয়াবসন পরলেন না সাদা ধুতি ছেড়ে, যিনি সরল শিশুর 'মা' 'মা' ডাকে বিশ্বভুবনকে মুগ্ধ মুখরিত ক'রে 'পরম' পদ লাভ করলেন, নিজের জননীর মাঝে বিশ্বজননীকে প্রত্যক্ষ করলেন, সহধর্মিণী সারদামণিকে পূজা ক'রে অপূর্ব মাতৃসাধনায় পূর্ণাহুতি দিলেন, ধর্মের যে তত্ত্ব গুহায় নিহিত—তা অকৃপণ হাতে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিলেন যিনি স্বচ্ছ তাঁর জীবনরসে স্নিগ্ধ ক'রে ঘরোয়া অনাড়ম্বর গ্রাম্য ভাষার সহজবোধ্য উপমার সাহায্যে, তাঁকে যে পরম আপন জনের মতো পেয়েছি, এখানেই তো আমাদের জোর—আমাদের অধিকার। গান আমাদের যতই বেসুরো হ'ক না কেন, ভাষা আমাদের ভাবের যতই দুর্বল বাহন হ'ক না কেন, তা দিয়েই আমরা কাছের মানুষ—ভালবাসার মানুষ রামকৃষ্ণের দিগ্‌দর্শন ক'রব। আমাদের ভয় কি? আমরা তো আর নির্বিকল্প-সমাধিমগ্ন সাধকশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণের কথা আলোচনা করছি না।

কিন্তু তাতেই কি রেহাই আছে নাকি আমাদের? মাধুর্য দিয়ে ঐশ্বর্যকে সর্বদা আড়াল ক'রে রাখবার শক্তি যোগমায়াই বা পাবেন কোথায়? দ্বাপরের বৃন্দাবনে তাই সময় সময় বিভ্রাট বেধেছে। আমরাও সাধারণ স্থূল দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণকে দেখতে গিয়ে অভিভূত হ'য়ে যাই, ভাবি অবাক্ বিস্ময়ে—এই সহজ সরল গাঁয়ের মানুষটি কেমন ক'রে হলেন এ যুগের ভারতেতিহাসের প্রধান স্রষ্টা, যুগন্ধর মহামানবের অপরিমেয় শক্তির আধার!

সাধারণ যুক্তি দিয়ে একটু বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক রামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য। তার আগে ভারতেতিহাসের মর্ম-বাণীটি খুঁজে পেতে হবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল সূত্র ধর্ম, এই বিরাট প্রাচীন দেশের সামগ্রিক কাহিনীকে বিধৃত ক'রে রেখেছে ধর্ম। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে এটি আমাদের চোখে পড়ে না, বরং রাজনৈতিক ইতিকথা প'ড়ে আমরা সিদ্ধান্ত ক'রে বসি যে তথাকথিত ধর্মই এদেশটার বারবার সর্বনাশ ঘটিয়েছে। একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারব, যে তথাকথিত ধর্ম যুগে যুগে ভারতের পতন ডেকে এনেছে, তা মোটেই ধর্ম নয়—তা ধর্মহীনতা। ধর্ম মানে মানবধর্ম, যা আমাদের সনাতন ধর্মের প্রাণস্বরূপ। 'একেশ্বরবাদী' সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের ঊর্ধ্বে এর স্থান, বিশেষ উপায়ে বিশেষ কোন দেবতার পূজাপদ্ধতিতেও এ ধর্ম পর্যবসিত নয়। এ ধর্মের প্রাণ জ্ঞান প্রেম ও ঔদার্য। এ ধর্ম গণ্ডী টানে না, এর বিকাশ হয় আপাত-দৃষ্টিতে বিবদমান মতবাদগুলির সামঞ্জস্য স্থাপনের মধ্যে। এ ধর্ম বাহুতে শক্তি দেয়, হৃদয়ে ভক্তি দেয়, আর এই শক্তি ও ভক্তি দিয়েই মন্দিরে মন্দিরে প্রতিমা গড়া হয়। অপর ধর্মমতকে সম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন দ্বারা স্বধর্ম পালন সার্থক হ'য়ে ওঠে এই ধর্মেরই আশ্রয়ে। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ এবং ক্রান্তদর্শী বিবেকানন্দ ভারতেতিহাসের এই পরম সত্যটি ধরতে পেরেছেন এবং তাঁদের অজস্র লেখায় ও কথায় তা প্রকাশিত হয়েছে। ইওরোপের মানদণ্ডে এঁরা হয়তো কিছু ঐতিহাসিক পদবাচ্য নন। কিন্তু জাতীয় উত্থান-পতনের ইতিহাসের পশ্চাতে মহাকালের শাশ্বত ইঙ্গিতের সাঙ্কেতিক লেখা তত্ত্বদর্শী এই দুই মহামনীষী পড়তে পেরেছেন। আর এটাই তো ইতিহাস-দর্শনের আসল কথা। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অগণিত তথ্যগুলি যখন এঁদের দেওয়া তত্ত্বের আলোকে এবং এঁদের দেখানো ধারায় পরিবেশিত হবে, সে দিন রচিত হবে এদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

রাজা মন্ত্রী সেনাপতি ও সভাসদদের রাজনৈতিক কীর্তিকাহিনী স্বভাবতই ভিড় ক'রে আছে আমাদের ইতিহাস-গ্রন্থে। এ তো বহিরঙ্গ কাঠামো মাত্র ভারতেতিহাসের, এর অন্তরালে রয়েছে অন্তরঙ্গ ফল্গুধারার মতো প্রাচীন ভারতের যা কিছু গৌরব। তা নিহিত রয়েছে সংঘর্ষ বা সংহারে নয়, আত্মসাৎ করাতেও নয়, রয়েছে সমন্বয় সাধনের মধ্যে, রয়েছে বহুর মধ্যে একের সাধনায়। যতদিন এই সমন্বয়ী ধর্ম তার ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, ততদিনই ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। আর্যগণ এদেশে এসে বহু সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল 'অনাস'* অনার্য ভারতীয়দের সঙ্গে, এ সংঘর্ষের কাহিনী আমরা অল্পবিস্তর জানি। কিন্তু আর্য অনার্য সংস্কৃতির ও ধর্মের এমনকি দেবতাদেরও কেমন ক'রে কি অপূর্ব সমন্বয় হ'ল, সে ইতিহাস আজও অলিখিত। অথচ সনাতন ধর্মের অধুনাতন রূপ হিন্দুধর্মের সূচনা এই সমন্বয়ের মাঝে। আর্য রুদ্র আর আর্য-পূর্ব পশুপতি—মহাদেব বা শিবে একাত্ম হয়েছেন, যেমন হয়েছেন বৈদিক বিষ্ণু আর পৌরাণিক কৃষ্ণ—নারায়ণে। সমন্বয়ী আর্য ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে কত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিধৃত হ'য়ে আছে আমাদের শাস্ত্রাদি গ্রন্থে। ইতিহাসে পড়ি আর্য ভারতের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে মৌর্যোত্তর যুগে এবং গুপ্তোত্তর যুগে সার্থক সামরিক অভিযান ক'রে সাম্রাজ্য গড়েছিল গ্রীক শক পহ্লব কুষাণ হুন গুর্জর প্রভৃতি বহু বহিরাগত জাতি। এই বিজয়ী জাতিরা কিন্তু কালক্রমে সম্পূর্ণ ভারতীয় হ'য়ে গেল অন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে বিবাহাদি নানা সামাজিক

* প্রাক্-আর্য ভারতীয়দের আর্যেরা বলতেন 'অনাস'—কারণ তাদের নাক চেপ্টা ছিল, যেন নাসাহীন; তাই 'অনাস' ঘৃণাবাচক শব্দ।

সম্বন্ধের মাধ্যমে। আর্যসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে এরা গুণানুসারে গৌরবের স্থান ক'রে নিল, মিশ্রিত জাতি হয়েও খাঁটি আর্য রক্তের গৌরবে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য রচনায় বিরাট অবদান রেখে দিল; রাজপুত্রদের ইতিহাসের এই তো গোড়ার কথা। সমন্বয়ধর্মী ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-ধর্মকেও এমনি ক'রে ক্রমবিবর্তনের দ্বারা তার ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রসাধনায় ও বৈষ্ণবধর্মে আপন ক'রে মিশিয়ে ফেলে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের বাংলাদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি। জাগ্রত সমৃদ্ধ প্রাচীন ভারতের এই তো ইতিহাসের ধারা।

কিন্তু মুসলমান যখন এল উত্তর-পশ্চিমের সিংহদ্বার ভেঙে, তখন হিন্দু ভারত তার ধর্মের প্রকৃত মর্ম হারিয়ে ফেলেছে। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে'—ভারতের এই জীবনবেদ তখন অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে কূপমণ্ডুকতার আত্মপ্রসাদে কুসংস্কারের জঞ্জালে সামাজিক ঘৃণা, অসাম্য ও অত্যাচারের অভিশাপে লুপ্ত হয়েছে, বাইরের জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে হিন্দু ভারত তখন অচলায়তন সৃষ্টি করেছে। ধর্মের প্রকৃত মর্ম-জ্ঞানহীনতা-জনিত শক্তিহীনতাই হিন্দু ভারতের পতন ডেকে আনল। ইসলাম-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ধর্মপ্রচারের উন্মাদনায় জাগ্রত দুর্ধর্ষ তুর্কি জাতি ভারতের অধীশ্বর হ'ল। বিভিন্ন রাজপুত বংশের রাজগণ বারবার ব্যক্তিগত শৌর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েও ইসলামের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

তারপর তিনশত বৎসর ধরে দিল্লীকে কেন্দ্র ক'রে ভারতের রাজনৈতিক যে ইতিহাস আবর্তিত হ'ল, তা অত্যন্ত গ্লানিকর। শাসক মুসলমান আর শাসিত হিন্দুর বিরাট ব্যবধান ঘ'টল, রচিত হ'ল অত্যাচারী শাসক আর অত্যাচারিত প্রজার নিষ্ঠুর বিভেদের মর্মন্তুদ কাহিনী। এ কাহিনীই আমরা সবিস্তারে পড়ি। কিন্তু দিল্লীর কথাই তো মধ্য যুগের একমাত্র কথা নয়, শেষ কথাও নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভার-তের সর্বত্র ভিড় ক'রে এলেন কত সাধু ও সন্ত—রামানন্দ, কবীর, নানক, ভাস্করাচার্য, নামদেব ও নিমাই। ভারতের লুপ্ত সমন্বয়ী ধর্মকে আবার ভাষা দিলেন তাঁরা, জীবনের সাধনা দিয়ে আবার তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। হিন্দু ভারত আর ইসলাম শাসন কাছাকাছি এল, ভয়শূন্য চিত্তের উদার প্রেমধর্ম ম্রিয়মাণ সনাতন ধর্মে নব-জীবন-রস ঢাল্‌ল। এই সাধু-সন্তরাই তৎকালীন ভারতের সত্যিকার ইতিহাস-স্রষ্টা, দিল্লীর সুলতানদের চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে। উত্তরকালে (ষোড়শ শতাব্দীতে) মহামতি মুঘল সম্রাট্ আকবর এই হিন্দু-মুস্লিম সংস্কৃতি ও ধর্মের সমন্বয়সাধনে দৃঢ় পাদক্ষেপে অগ্রসর হ'য়ে 'মহাভারত' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক করেছিলেন। উদার সমন্বয়ী ধর্মকে ব্যাপক রাজনীতিতে রূপায়িত ক'রে আকবর মধ্যযুগের সাধু-সন্তদের বলিষ্ঠ উত্তর সাধকের স্থান গ্রহণ করলেন।

কিন্তু আবার তা হারিয়ে গেল, যখন ঔরংজীব তাঁর সমগ্র শক্তি দিয়ে আকবরের নীতিকে চূর্ণ ক'রে ফেললেন। তাঁর মৃত্যুর পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান রাজশক্তির নির্বীর্যতা ও ব্যভিচার এবং হিন্দু সমাজের অবিশ্বাস্য কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও লোকাচারনিষ্ঠ ভাবহীন ধর্মপালন ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের সুদূরব্যাপী পথ রচনা ক'রল। কালক্রমে কলকাতা হ'ল এই নূতন রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র, পশ্চিমের জড়বাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাদপীঠ। আসল বিপর্যয় দেখা দিল তখন। ইওরোপ যেখানেই উপনিবেশ বা বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন ক'রে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে সেখানেই গড়ে উঠেছে বৃহত্তর ইওরোপ। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া,

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ—সবই ইওরোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্র, তাদের নিজস্ব প্রাচীন কৃষ্টি প্রায় অবলুপ্ত। স্বাধীন হবার পরেও তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইওরোপীয় ছাঁচে ঢালা, ধর্ম ইওরোপেরই দেওয়া খৃষ্টধর্ম। খৃষ্ট-ধর্মের গোটা ইতিহাসেই এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। খৃষ্টপূর্ব গ্রীসের এবং রোমের বিরাট সভ্যতা অতীত ইতিহাসের এক একটি বিচ্ছিন্ন গৌরব-ময় অধ্যায় মাত্র, বর্তমান গ্রীস বা ইটালির ইতিহাসের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ কোন যোগ নাই। বর্তমান যুগের গ্রীক বা ইতালিয়ানের মধ্যে তার পরম বিদগ্ধমনা হেলেনিক পূর্বপুরুষের বা মহা-অভিমানী প্রাচীন বীর্যবান রোমান নাগরিকের চিহ্নটুকুও আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইসলামের ইতিহাসও তাই। মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম পীঠস্থান মিশরদেশ আজ বৃহত্তর আরব সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র, ইসলামের শ্রেষ্ঠ বাহন। নীলনদের প্রাচীন সভ্যতা মরুপথে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, পিরামিডের অতল-তলে কান পাতলে আর তার মৃদুতম স্পন্দনও শোনা যাবে না। প্রাচীন পারস্য দেশের সুন্দর পারসিক সভ্যতা ইরাণীয় ইসলামের প্রচণ্ড প্রতাপে অবলুপ্ত। সকল ধর্মমতের নিরাপদ আশ্রয় সমন্বয়ী ভারতের বম্বে অঞ্চলে পার্শী সংস্কৃতির মধ্যে তার ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি শোনা যেতে পারে মাত্র। ভারতেও ইসলাম এই ব্রত নিয়েই এসেছিল, দার-উল-হার্‌বকে দার-উল-ইসলামে* পরিণত করতে; শত শত বৎসর ধরে ইসলামের সমগ্র শক্তি এখানে এই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত ছিল। শাশ্বত ভারত ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু আবার তা চির পুরাতন সমন্বয়ী ধর্মের সুরে বেঁচে থাকার দাবি জানিয়েছিল সদর্পে, ইস-লামকে সাদরে স্থান দিয়ে ভারত ভারতবর্ষই রয়ে গেল—কেমন ক'রে তা আমরা সাধুসন্তদের জীবনে ও আকবরের মহৎ কীর্তিতে দেখতে পেয়েছি।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বিপর্যয় আরও গুরুতর, কারণ তা সাংস্কৃতিক বিপর্যয়, আর মুস্‌লিম যুগে এটা ছিল রাজনৈতিক সমস্যা মাত্র। রাজনৈতিক স্বাধিকার ভারত বহুবার হারিয়েছে, কিন্তু রাজনীতিকে ভারত কোন দিন সবার ওপরে স্থান দেয়নি ব'লে এতে তার সামগ্রিক বিপর্যয় ঘটেনি, অব্যাহত রয়েছে তার যুগযুগান্তব্যাপী ইতিহাসের ধারা। কিন্তু ইংরেজ শাসন তার মূল ধরে টান দিল। জড়বাদী যন্ত্রসভ্যতা আর ইও-রোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ইংরেজ বণিকের জাহাজে পণ্য হ'য়ে এল সমুদ্রের ঢেউয়ের কুলপ্লাবী মত্ততা নিয়ে। এর প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে গেল আমাদের দুর্বল মাটির বাঁধ, ভেসে গেলাম আমরা। খৃষ্টধর্ম আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতি শিক্ষিত বাঙালীর তথা ভারতবাসী মাত্রেরই কাম্য হ'ল, অবলম্বন হ'ল। কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে চলেছে সনাতন ভারতবর্ষের এই অবলুপ্তির পালা, আর পল্লীভারত ধর্মের বিকৃতির বোঝা নিয়ে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মাঝে ক্ষুদ্রতর জীবনের গ্লানি বহন করছে। বিরাট প্রশ্ন জেগে উঠল সমগ্র ভারতবর্ষের সম্মুখে: রাজনৈতিক স্বাধিকার হারিয়ে এবার কি ভারত তার অতীতকে মুছে ফেলে দিয়ে আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো বৃহত্তর ইওরোপের একটি অঞ্চল মাত্রে পরিণত হবে?

সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের এই ঘনকৃষ্ণ মেঘের বুক চিরে হ'ল বিদ্যুতের স্ফুরণ, রামমোহন দাঁড়ালেন এসে বলিষ্ঠ নেতিবাচক বাণী নিয়ে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে; নব্যভারত জন্মগ্রহণ ক'রল তাঁর চিত্তে। সমন্বয়ের সূত্র আবার খুঁজে পেলেন এই

* 'বিধর্মী ও অবিশ্বাসীর দেশকে ইসলামী দেশে পরিণত করতে হবে'—কথাটা ঔরংজীবের রাজত্বকালে খুব চালু ছিল।

মহামনীষী যুগমানব। ভারত গ্রহণ করবে পশ্চিমকে নিঃস্ব কাঙালের ভাবে নয়; সনাতন সমন্বয়ী ধর্মের শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে পশ্চিমকে নতুন ক'রে গ্রহণ ক'রে নিজেকে প্রবুদ্ধ ও সমৃদ্ধ করবে ভারত। সনাতন ধর্মের অঙ্গে যে জঞ্জাল পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তা পরিষ্কার ক'রে ঔপনিষদ একেশ্বরবাদ উদ্ধার করলেন তিনি, ইসলামের 'জবরদস্ত মৌলভি' হয়ে তিনি তারও প্রাণশক্তিকে জাগালেন, খৃষ্টধর্মের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সাদরে বরণ করলেন। এ তিনের অপূর্ব সমন্বয়ে ফুটে উঠল ভবিষ্যৎ ভারতের নবরূপ। এ-কেই মূলধন ক'রে সৃষ্ট হ'ল ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজ, এদেশকে বাঁচাতে যার দান অপরিসীম।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের আবেদন বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত শহরবাসীদের গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহৎ পল্লী-ভারতের দুয়ারে পৌছতে পারল না। সহজ সরল মানুষের কাছে আবেদন পৌছয় হৃদয়ের মধ্য দিয়ে, মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে নয়। পল্লী-ভারত আর নগর-ভারতের ব্যবধান তাই নিছক যুক্তির পথে দূর হ'ল না; সূচনা বা পটভূমিকা রচিত হ'ল বটে। এক মাহেন্দ্রক্ষণে ভারতভাগ্য-বিধাতার ইঙ্গিতে পল্লীভারতের একটি মানুষ তখন পূজারী হ'য়ে এলেন জড়বাদী সভ্যতার ভারতীয় কেন্দ্র কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী-মন্দিরে। হৃদয়ের আবেদন নিয়ে শাশ্বত ভারত এই অভিনব পূজারী ব্রাহ্মণের মাঝে রূপ নিল। সবার অলক্ষ্যে একটি নূতন নক্ষত্র সেদিন বুঝি আকাশে জেগেছিল—গদা-ধরকে 'রামকৃষ্ণ' হবার পথনির্দেশ করতে। নীরবে অনাড়ম্বরে এক বিরাট বিপ্লবের পটভূমি রচিত হ'ল।

এ ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায় সবারই অল্প-বিস্তর জানা আছে, দু'একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত মাত্র দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। ব্রাহ্ম-সমাজ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তনের আন্দোলন করেছেন, মূর্তিপূজাকে নিন্দা ক'রে। অবশ্য এর প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য। কারণ, হিন্দুসমাজ তখন অন্ধ সংস্কারবশে প্রায় পৌত্ত-লিকই হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে একই ব্রহ্মের আরাধনা করে—এ তত্ত্ব তখন সাধারণ্যে লুপ্তপ্রায়, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান তখন বিস্মৃত বা অবহেলিত। দক্ষিণেশ্বরের অদ্ভুত পূজারী তখন ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদন করছেন কালীমূর্তির সামনে বসে 'মা, মা' ডাকে চারিদিক মুখরিত ক'রে। মৃন্ময়ী কালীমাতা চিন্ময়ী ব্রহ্মময়ীরূপে তাঁকে দেখা দিলেন। হিন্দু যে পৌত্তলিক নয়, মাতৃসাধক রামকৃষ্ণ অপূর্ব সাধনার বলে তা আবার নতুন ক'রে জানিয়ে দিলেন। কলকাতায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। বুদ্ধিজীবী যুক্তিবাদী, ভক্তিপথগামী, নিছক কৌতূহলী—সকল শ্রেণীর নরনারী ভিড় ক'রে এই পাগলঠাকুরকে দেখতে এলেন, আর তাঁকে ছেড়ে যেতে পারলেন না। এলেন নরেন্দ্রনাথ, পশ্চিমের যুক্তি-প্রধান উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত সংশয়বাদী শক্তিমান্ যুবক। এসেই প্রশ্ন করলেন, মশাই আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন? রামকৃষ্ণের শান্ত সহাস্য আননে চিরন্তন ভারতবর্ষ সহজ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে উঠল: হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে কথা কই যে, এই যেমন তোর সঙ্গে কথা কচ্ছি। যুক্তিবাদী পশ্চিম যেন ভারতবর্ষকে প্রশ্ন ক'রল: কী অধিকার আছে তোমার বর্তমান জগতে টিকে থাকবার সনাতন ধর্মকে আঁকড়ে ধরে? এস আমার ভাবাদর্শে অবগাহন ক'রে নতুন হ'য়ে ওঠ, প্রগতির পথে চল। ওই মহাশক্তিধর পূজারী ব্রাহ্মণ সমগ্র ভারতবর্ষের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে চিত্তে স্থাপন ক'রে যেন বললেন: অধিকার আছে বৈকি? ভারত পশ্চিমকে গ্রহণ করবে নিজের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত ক'রে নয়। পশ্চিমকে প্রাচ্যের সঙ্গে সমঞ্জসীভূত ক'রে নতুন

ক'রে আবার তার সত্যের সাধনা শুরু হবে। সত্য অন্তরে, সত্য তো বাইরে নয়, ভারত এই সত্যের আরাধনা করেছে যুগে যুগে, ডাক দিয়েছে ঃ শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। সকলকে সঙ্গে নিয়ে সে বিশ্বজোড়া আসন পেতে প্রেমের পথে সত্যের আরাধনায় নিমগ্ন। ভারতাত্মাই যেন বলে উঠলেন ঃ 'যত মত তত পথ', সত্যলাভে—ব্রহ্মলাভে সকলেরই সমান অধিকার। নিজে সকল ধর্মমতে উপাসনা ক'রে ভগবৎপ্রাপ্তির দ্বারা এ সত্যকে প্রকটিত করলেন সমন্বয়াচার্য রামকৃষ্ণ; শাশ্বত ভারতবর্ষকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন আধুনিক সভ্যতার পটভূমিকায়।

এই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েই যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ হলেন অনুভবী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, সহস্ররশ্মি সূর্য রামকৃষ্ণের একটি রশ্মি দ্বারা নিজের অন্তর-দীপ জ্বালিয়ে নিয়ে বিশ্বজয় করলেন। ভারতের হীনম্মন্যতা দূর হ'ল, নবতর মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ভারতবর্ষ পশ্চিমকে আমন্ত্রণ জানাল ভাবের আদান-প্রদানের জন্য। বিবেকানন্দ তার অগ্রদূত। কম্বুকণ্ঠে তিনি ডাক দিয়ে বললেন—এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ! অপূর্ব এক ঐতিহাসিক সম্ভাবনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত ভাস্বর হ'য়ে উঠল। যে নব ভারতের সূচনা রামমোহনে, তারই পূর্ণ রূপ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে, তারই আনন্দরসঘন প্রগতির পথে যাত্রা মহাকবি রবীন্দ্রনাথে। আরও কত মনীষী, শিল্পী ও দার্শনিক নবভারত রচনাকে পূর্ণাঙ্গ করতে জীবনব্যাপী সাধনার ফল এনে দিলেন অর্ঘ্যরূপে। অথচ এ আশ্চর্য ঘটনা ঘ'টল যখন ভারত বিদেশী শাসনের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ। কোন পরাধীন দেশের ইতিহাসে এ রকম ঘটনা আর ঘটেনি; এমন ক'রে ধর্মকে ভিত্তি ক'রে সমন্বয়ের পথে সংস্কৃতির নবজন্ম আর কোথাও ঘটেনি।

কিন্তু এ তো গেল ভাবরাজ্যের বিপ্লবের কথা, ভারতের নব জাগরণের সূচনা মাত্র। কর্মসূচী কই—এ-কে রূপায়িত করবার? রামকৃষ্ণের দিগ্বিজয়ী রূপ বিবেকানন্দ সেই কর্মসূচী দিলেন। মাত্র দশ বছরের কর্মজীবনে তিনি আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক অপূর্ব অধ্যায় সূচনা ক'রে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় পেয়ে তিনি স্বভাবতই চেয়েছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর পরমবাঞ্ছিত আত্মার মুক্তির তপস্যায় নিভৃত গুহায় চলে যেতে। ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্নেহের কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ তুই এত স্বার্থপর, নিজের মুক্তি খুঁজছিস্! ওরে, তোর মুখ চেয়ে আজ যে কোটি কোটি মানুষ বসে আছে। জীবকে শিবজ্ঞানে আরাধনা—এই তো শ্রেষ্ঠ তপস্যা। এখানেই দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের জন্ম হ'ল। সমগ্র ভারত পরিক্রমা করলেন তিনি, এর অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য আর দুর্গতি মরমী সাধক বেদনার চোখে দর্শন করলেন। ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে কন্যাকুমারিকার সমুদ্রতটে শিলার ওপর বসে ধ্যান করলেন শাশ্বত ভারতবর্ষের, বর্তমানের সমগ্র দুঃখ নিজের বলিষ্ঠ বুকে ভরে নিলেন, দেশের সামগ্রিক শোষণ, বঞ্চনা ও দুর্দশায় তাঁর অন্তর কেঁদে উঠল। ভগবানের আরাধনায় যাঁর চিত্ত নিমজ্জিত, অন্তর নিবেদিত, দেহ উৎসর্গীকৃত, সেই পূতপবিত্র সত্তার অন্তস্তল থেকে উদাত্ত ঘোষণা দিগ্‌বিদিক্ কম্পিত ক'রল ঃ আগামী পঞ্চাশ বৎসর জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য হউন! —হে ভারতবাসী, আজ থেকে তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা তোমার দেশ, অন্য সব দেবতার পূজা এখন থাক।

স্বামীজীর মন্ত্র জাতির ক্লীবত্ব পরিহারের মন্ত্র; জাতীয় মুক্তির আন্দোলন স্বামীজীর জীবন থেকেই প্রত্যক্ষ প্রেরণা পেল। গোখলে বলেছেন ঃ আধুনিক যুগে বাংলা সমগ্র ভারতের গুরু, কি ভাবরাজ্যে—কি কর্মক্ষেত্রে। স্বদেশী আন্দো-

লনের জন্ম বাংলাদেশে, আবার বিপ্লবপন্থীরাও স্বামীজীর শক্তিবাদে অনুপ্রাণিত। এটা ভাবোচ্ছ্বাস নয়, নিছক ঐতিহাসিক সত্য। সম্প্রতি আমেরিকার মিস মেরী লুই বার্কের রচিত 'নব আবিষ্কার' নামে স্বামীজীর আমেরিকা-জীবনের ওপর একখানা বিরাট প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং স্বামীজীর অপূর্ব কার্যাবলীর অনেক অপ্রকাশিত কাহিনী তাতে স্থান পেয়েছে। ভারতে শোষণ-ভিত্তিক ইংরেজ শাসন তিনি কি ঘৃণার চোখে দেখতেন, তা আমরা জানতে পেরেছি আজ। খৃষ্টধর্মের নির্ভীক সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন সভায় বারবার বলেছেন, ভারতে খৃষ্টান ইংরেজদের নিষ্ঠুর শাসনের কথা, যে শাসন মানুষকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা স্বদেশ ছেড়ে ভারতে এলেন গুরুর কাজে আত্মনিয়োগ করতে, এ দেশের বেদনা ও বঞ্চনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গেলেন তিনি গুরুর প্রেরণায়। এই মহীয়সী নারীর জীবন থেকে এদেশের বিপ্লব আন্দোলন উৎসাহ পেয়েছে, তাও আমরা জানি। মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা ক'রে একদিকে জাতির সামগ্রিক মনুষ্যত্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধনে গুরুভাইদের সহযোগিতায় অপূর্ব কর্ম-সূচী রচনা করলেন স্বামীজী, আর একদিকে মানস-কন্যা নিবেদিতাকে দান করলেন দেশের মুক্তি-সাধনায়। কর্মযোগী বিবেকানন্দের নিঃস্বার্থ বলিষ্ঠ সেবাব্রত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি-স্থাপন; স্বাদেশিকতার মহত্তম প্রেরণা ও পথপ্রদর্শক নেতা স্বামীজী!

সপ্তদশ শতাব্দীতে শিবাজী-গুরু রামদাস যেমন মারাঠা জাতির সংহত বলিষ্ঠ জাগরণের মন্ত্রোদ্গাতা, এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতের নবজাগরণের মন্ত্রোদ্গাতা; স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাগণ অনেকেই তা স্বীকার করেন। জীবনের সায়াহ্নে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যে সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়কের পদে বরণ ক'রে গিয়েছিলেন, তিনি মুক্তকণ্ঠেই একথা বলতেন। বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার নিরপেক্ষ ইতিহাসের বিচারে দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করেছেন যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীরাগ্রগণ্য দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র; তাঁর অসামান্য বলিষ্ঠ কর্মধারায় এদেশের স্বাধীনতার পথ সুগম হয়েছে। তাঁর জীবনদর্শন স্বামীজীর দান, এ কথা সুভাষচন্দ্রই বারবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

আর স্বামীজী? সহস্র প্রতিকূলতার মাঝে শাশ্বত ভারতের সমন্বয়ী ধর্মের পুনরুজ্জীবনে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে এবং দেশপ্রেম-মন্ত্রদানে এই সন্ন্যাসী কি অপরিসীম শক্তি ও প্রেরণা পেয়েছেন তাঁর গুরু ওই পাড়াগাঁয়ের সহজ সরল মানুষটির কাছে, যিনি দেহাতীত জ্যোতির্ময় সত্তায় সর্বদাই তাঁর কাছে কাছে থাকতেন—এ স্বামীজীর নিজেরই কথা। সত্যই বর্তমান ভারতের ইতিহাস-স্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ, যুগন্ধর মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভাব ও সাধনার এক বিরাট সম্প্রসারণ।

আজ স্বাধীন ভারতের নাগরিক হ'য়ে এ কথা আমাদের আরও গভীর ভাবে স্মরণ ও মনন করা প্রয়োজন। কারণ স্বাধীনতা পাওয়ার চেয়ে তাকে রক্ষা করার কাজ মোটেই কম দায়িত্বপূর্ণ নয়। আমাদের জাতীয় জীবনের সকল স্তরে আজ অনেক ফাঁকি ও দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। কথার মাধুরী দিয়ে যতই আমরা ঢাকতে চেষ্টা করি না কেন, একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের জীবনের ভারসাম্য আবার নষ্ট হবার উপক্রম

হয়েছে, সামঞ্জস্যের বা সমন্বয়ের সূত্র আবার আমরা হারিয়ে ফেলছি। পশ্চিম আবার আমাদের গ্রাস করতে আসছে। ধর্মকে দুর্বলতা ব'লে পরিহার করতে চেষ্টা করছি অথবা ধর্মের নামে আবার ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। এদিকে আমাদের রাষ্ট্রিক শাসনতন্ত্রের কাঠামোর নাম দেওয়া হয়েছে 'সেক্যুলার ডেমোক্রেসি' বা ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতন্ত্র—এও পশ্চিমের অনুকরণে। দুর্গত মানুষের দুঃখে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করছি, বক্তৃতা-মঞ্চ সরগরম রাখছি, কিন্তু আসলে সেবা করছি নিজ নিজ নগ্ন স্বার্থের। আমাদের সাজানো মিষ্টি কথা আজ যেন আমাদের স্বার্থমগ্ন মনকে আড়াল করার বাহনে পরিণত হয়েছে, ভুলে গেছি স্বামীজীর কথা—'চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না'। দেশপ্রেম কি কথার কথা? অপর এক মানুষকে কি সত্যই ভালবাসা যায়, যদি না তাকে আমার আত্মার আত্মীয় ব'লে মনে করতে পারি? কিভাবে ভালবাসতে হয়, ঠাকুর তা দেখিয়ে গেছেন; কিভাবে দেশপ্রেম জন্মায়, স্বামীজীর জীবন ও বাণী তা প্রকাশ ক'রে গেছে। মানবতা-বাদের বড়াই করি আমরা, সমাজতন্ত্র-বাদের স্বপ্ন দেখছি আমরা; কিন্তু কোন কিছুই সার্থক হবে না, হ'তে পারে না, ভারত যদি স্বধর্মচ্যুত হয়। এই ধর্মই ভারতের প্রাণরস-সঞ্চারী, ভারতের ইতিহাসের নিয়ন্তা। এই ধর্মই বর্তমান জড়বাদের পটভূমিকায় মহাসমন্বয়াচার্য রামকৃষ্ণের জীবন দ্বারা রূপায়িত।

শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদ দ্বারা জড় সভ্যতার কাঠামোতে এক অখণ্ড পৃথিবী এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির এক সুখী পরিবার গড়তে গিয়ে আজ বিশ্ব এসে দাঁড়িয়েছে মহতী বিনষ্টির গহ্বর-মুখে। শান্তির ললিতবাণী মুখে মুখে আওড়ানো হচ্ছে যত জোর গলায়, ততই বেড়ে যাচ্ছে সমরোপকরণের নব নব সম্ভার এবং সমাবেশ। পশ্চিমের বিবদমান দুই মতবাদের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের নাগপাশের বন্ধনে মনুষ্যত্বের নাভিশ্বাস উঠেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অনুশীলনের আশীর্বাদে আজ পশ্চিম মানব-সভ্যতাকে কি অপূর্ব ঐশ্বর্যের আভরণে সজ্জিত করেছে, কত কাছাকাছি এসেছে, কত ছোট হ'য়ে গেছে আজ মানবের বাসভূমি—এই সুন্দর পৃথিবী! তবুও পৃথিবীর কোটি কোটি নিরীহ মানুষ একটা কি অশুভ আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। ধরণীর এত শোভার মাঝে এ কি অভিশাপের বাণী লেখা!

ওদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানব-দরদী মনীষিগণ —তাঁদের সংখ্যাও মোটেই কম নয়—তাই তাকিয়ে আছেন ভারতবর্ষের দিকে, যে ভারতবর্ষ সমন্বয়ী মানবধর্মের জন্মভূমি। অন্তরকে উপবাসী রেখে শুধু মস্তিষ্কের নিরলস চালনা দ্বারা পশ্চিম তার বিরাট কর্মসূচীর কল্যাণপ্রদ সমাপ্তি আর যেন দেখতে পাচ্ছে না। বিভ্রাট বেধেছে এই-খানে। দিব্যদৃষ্টিতে জড়সভ্যতার এ পরিণতি দেখেই স্বামীজী, শুধু ভারতবর্ষকে নয়, সমগ্র বিশ্বকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন: এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ! মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সংযোগেই বিশ্বজোড়া মানবজাতির এক সুখী পরিবার গড়ে উঠতে পারে। মস্তিষ্ক দিয়েছে পশ্চিম, হৃদয় দেবে ভারতবর্ষ; সে আশায় পৃথিবী কাল গুনছে।

এত বড় উত্তরাধিকার আমাদের! শুধু ভারতকে নয়, বিশ্বকে সহজ ও আনন্দময় করার বিরাট দায়িত্ব আমাদের। শুধু ভারতের ইতি-হাসে নয়, বিশ্ব-ইতিহাসে যুগোপযোগী বিরাট পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। এ ঐতিহ্য আমাদের শক্তি দিক, আমাদের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা দিক।

তত্ত্ববোধিনী সভা

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে একটা অনগ্রসর জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে আকস্মিক রূপান্তর ঘটতে পারে তার পরিচয়-বাহী হ'ল ১৮৩৯ খৃঃ ৬ই অক্টোবর কলকাতায় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা। ১৮৩৯ খৃঃ অক্টোবর হ'তে ১৮৫৯ খৃঃ ডিসেম্বর—মাত্র এই বিশ বৎসর বাংলা দেশে এ প্রতিষ্ঠানটি সক্রিয় ছিল; কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত স্বল্প কালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালীর সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মজীবনে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য জাগিয়ে দিয়ে নয়া বাংলার গোড়া পত্তনে যে যুগান্তকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তার তুলনা খুবই বিরল। বস্তুতঃ গত শতাব্দীর জ্ঞান- বিজ্ঞান- ও ধর্মচর্চামূলক এ সাংস্কৃতিক সংস্থা সে যুগের সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের নবতর রূপদানে যদি বহুমুখী ও বলিষ্ঠ কর্মপন্থা গ্রহণ না ক'রত তাহলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রগতি যে বিলম্বিত ও ব্যাহত হ'ত, তা অনুমান করা অহেতুক নয়

॥ ১

যে ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই স্মরণীয় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল, প্রথমে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বাংলা দেশে ইংরেজ অধিকারের প্রথম বিশৃঙ্খলার যুগ বহুদিন আগে গত হয়েছে। দেশের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়েছে রাজধানী কলকাতা শহরে। জব চার্নকের অন্ধকারাচ্ছন্ন কলকাতার চেহারা তখন আর চেনা যায় না। শাসনকার্যের জন্য বহু ইংরেজের সমাগম হয়েছে এ আজব নগরী কলকাতায়, আর সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বণিকও খুলে বসেছে তাদের বিচিত্র পণ্যের পশরা। ইংরেজরাজের রাজকার্যে ও বিদেশী বণিকের বাণিজ্য-ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য তখন রাজধানী কলকাতায় যুগপ্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে একদল অর্ধ ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর। কিছু ইংরেজী শব্দ আয়ত্ত ক'রে 'যেন তেন প্রকারেণ' ইংরেজ প্রভুর সঙ্গে কাজের কথা চালাতে পারলে রাজসরকারে চাকরি হবে, কিংবা বণিক-বৃত্তিতে উন্নতি করা যাবে, এই আশায় তৎকালীন কলকাতার বহু পরিবারের ছেলে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে উঠল। বিদেশী ইংরেজরাও সুযোগ বুঝে কলকাতার স্থানে স্থানে ইংরেজী স্কুল স্থাপন ক'রে মহা উৎসাহে বাঙালী ছেলেকে ইংরেজী শিখাতে লাগলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পাঠে জানা যায়, সে যুগে ইংরেজী শিক্ষার পীঠস্থান ছিল চিৎপুর রোডে সার্বরণ (Sherburne) নামক ফিরিঙ্গীর স্কুল, আমড়াতলায় ফিরিঙ্গী মার্টিন বাউলের (Martin Bowle) স্কুল, আর আর-টুন পিট্রাস (Arraton Petres) নামক ফিরিঙ্গীর স্কুল। এ সমস্ত স্কুলে শিক্ষানবিশী ক'রে যাঁরা উত্তরকালে কলকাতার বিত্তবান্ সমাজের শীর্ষ-স্থান লাভ করেছিলেন তাঁদের দু'জনের নাম বাংলা দেশের সকলেই জানেন; একজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর, আর একজন সুবিখ্যাত ধনী ও দানবীর মতিলাল শীল; এ ছাড়া কানা নিতাই সেন এবং খোঁড়া অদ্বৈত সেনও ছিলেন সাহেবদের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। এ সমস্ত স্কুলের শিক্ষার মান ছিল একটু অদ্ভুত রকমের। যে ছাত্র যত বেশী ইংরেজী শব্দ

আয়ত্ত করতে পারত, তাকে তত বেশী শিক্ষিত বলে গণ্য করা হ'ত।

সে কালের অর্ধ ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী সামান্য ইংরেজী শব্দের পুঁজি নিয়ে ইংরেজদের আপিসে আদালতে কাজ ক'রত, আর ইংরেজ বণিকের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। ক্রমে ক্রমে প্রগতিশীল বাঙালীদের মধ্যেও ইংরেজী শিক্ষাকে সামগ্রিক ভাবে গ্রহণ করবার জন্যে একটা আন্তরিক আগ্রহ জেগে উঠল। কিন্তু 'নেটিভ'দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করলে পাছে এ-দেশবাসী নতুন বিদ্যাকে গুরুমারা কাজে লাগায়, এ আশংকায় সে যুগের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ইংরেজী শিক্ষা-প্রসারে বহুকাল উদাসীন হ'য়ে রইলেন। শিক্ষানীতি সম্পর্কে সরকারের এরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থা চলেছিল ১৮১১খৃঃ যাবৎ। সে বৎসর বড় লাট লর্ড মিণ্টো এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্যে যে মন্তব্য (minute) লিখলেন তাতেও তিনি এ-দেশীয় শিক্ষার ওপরেই জোর দেবার কথা বললেন। এ দেশের শিক্ষার ইতিহাসে ১৮১৩ খৃঃ একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘ'টল। সে বৎসর ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টার্স্ ভারত-সরকারকে দেশী শিক্ষা চর্চা প্রসারের জন্য অন্যূন এক লক্ষ টাকা খরচ করতে নির্দেশ দিলেন। ১৮১৪ খৃঃ Committee of Public Institution নামক সরকারী শিক্ষাসংস্থা গঠিত হ'লে কমিটির সভ্যগণ সে এক লক্ষ টাকা সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রণ, পণ্ডিতদিগের বৃত্তি এবং সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বাবদ ব্যয় করতে শুরু করেন।

সে যুগের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এ দেশে ইংরেজী শিক্ষায় প্রচারবিমুখ হলেও তৎকালীন প্রগতিশীল বাঙালী সমাজ যে দেশের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারের উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে উঠেছিলেন, রামমোহন রায়ের শিক্ষাবিস্তার আন্দোলনই তার প্রথম প্রমাণ। শিক্ষাপ্রেমিক ডেভিড হেয়ার, বিচারপতি হাইড্ ইষ্ট্ (Sir Hide East) প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে রামমোহন ১৮১৭ খৃঃ ১৭ই জানুআরি গরানহাটায় যে মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ স্থাপন করবার উদ্যোগ করেন এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ইতিহাসে সে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শুধু কলকাতায় নয়, ১৮১৫ খৃঃ শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেষ্টায় শ্রীরামপুরেও একটি মিশনারী কলেজ স্থাপিত হ'ল। ১৮২৪ খৃঃ হিন্দু কলেজ সরকারী অর্থে নির্মিত সংস্কৃত কলেজের পাশে একটি নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হ'ল। ১৮২৮ খৃঃ হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও এ কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। তাঁর যুক্তিবাদী শিক্ষায় এ সময় কলকাতায় সৃষ্টি হ'ল 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে অভিহিত শিক্ষিত সম্প্রদায়; এঁদের বিপ্লবমুখী সংস্কার প্রচেষ্টায় আধুনিক বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত জীবনে অনুভূত হ'ল এক বিরাট প্রাণচাঞ্চল্য। 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, (মাইকেল) মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ সিকদার, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন প্রাচীনপন্থী, অধিকাংশ ছিলেন অবশ্য ভাববিপ্লবী নবীনপন্থী।

একদিকে সংস্কৃত কলেজের মাধ্যমে প্রাচ্য বিদ্যা, আর একদিকে হিন্দু কলেজের মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যা—এ দু'ধারায় বাংলা দেশের শিক্ষা প্রবাহিত হ'তে থাকল আরও কিছুকাল। ক্রমে ক্রমে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের জন্যে দেশের প্রগতিশীল শ্রেণীর দাবি জোরালো হ'য়ে উঠল। ১৮৩৫ খৃঃ ভারতের শিক্ষা-সচিব তাঁর ঐতি-

হাসিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় মন্তব্যে (minute) ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুপারিশ করলেন। তাঁর সুপারিশ গ্রহণ ক'রে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক কোর্ট অফ ডিরেক্টর কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ (এক লক্ষ টাকা) ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা প্রচারের জন্য ব্যয়িত হবে ব'লে বিধি প্রচার করলেন (১৮৩৫, ৭ই মার্চ)। বাংলা দেশে ইংরেজীর মারফতে শিক্ষাব্যবস্থা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রল। বিপ্লবপন্থী 'ইয়ং বেঙ্গল' সর্বান্তঃকরণে এ শিক্ষাব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানালেন। শুধু যে তাঁরা এই নব-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বাগত জানালেন তা নয়, ভারতীয় সাহিত্য ও শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে তাঁরা মেকলের মতোই উন্নাসিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে আত্মশ্লাঘায় স্ফীত হ'য়ে উঠলেন। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন:

> তাঁহারা যে কেবল ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্বত্র ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে; তাঁহারাও মেকলের ধূয়া ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন যে—'এক সেল্‌ফ্‌ ইংরাজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই।' তদবধি ইঁহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্‌স্‌পীয়র সেস্থলে অধিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's tales সেই স্থানে আসিল। বাইবেলের সমক্ষে বেদ-বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।
>
> [দ্রষ্টব্য: রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—পৃঃ ১৪২।]

সরকারী শিক্ষাসংস্কারের পূর্বেই কিন্তু হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান্ শিক্ষক ডিরোজিওর শিক্ষা 'ইয়ং বেঙ্গল'দের অন্তরে বিপ্লবের আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। শুধু মাত্র অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে ডিরোজিও যে তাঁর ছাত্রদের অন্তরে স্বাধীন চিন্তা জাগিয়ে দিয়েছিলেন তা নয়, ছাত্রদের নিয়ে 'অ্যাকাডেমিক এসোশিয়েশন' স্থাপন ক'রে বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমেও তিনি এ স্বাধীন চিন্তা-প্রবৃত্তিকে তীব্রতর ক'রে তুললেন। এ স্বাধীন চিন্তা যে সর্বাংশে সুফলপ্রসূ হয়েছিল, তা বলা চলে না। সমাজ- ও ধর্ম-সংস্কারের উন্মাদনায় তাঁদের ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ জীবনে প্রবল প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিল। প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ মাংস ভোজন ও সুরাপান, জাতীয় জীবনে যা কিছু পুরাতন ও সনাতন—তার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন তাঁদের সংস্কার-প্রচেষ্টার প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে পরিগণিত হ'ল। এদিকে ডাফ্, ড্রিয়াল্‌টি প্রভৃতি মিশনারীগণ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে যে শুধু খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে লাগলেন তা নয়, প্রকাশ্য সভাসমিতি ক'রে খৃষ্টধর্মের মহিমা কীর্তনে তৎপর হলেন। হিন্দু কলেজের হিন্দু সভ্যগণ এ সমস্ত কারণে শংকিত হ'য়ে প্রথমে ছাত্রদের উন্মার্গগামী করবার অপরাধে ডিরোজিওকে পদ-চ্যুত করলেন; তারপর খৃষ্টীয় ধর্মসভায় ছাত্রদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ ব'লে আদেশ প্রচারিত হ'ল। হিন্দু সমাজের মুখপাত্র রাজা রাধাকান্ত দেব ইংরেজী শিক্ষিতদের মানসিক স্থিতিস্থাপকতা ও স্বধর্মে আস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্যে 'ধর্মসভা' নামে এক সভা স্থাপন করলেন। কলকাতার স্থানে স্থানে তার শাখা স্থাপিত হ'ল, এবং তাতে সনাতন হিন্দুধর্মের মহিমা কীর্তিত হ'তে লাগল।

রাজা রাধাকান্ত দেব ছাড়াও সনাতন হিন্দু-ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে যাঁরা সেই অনিশ্চয়তার যুগে অগ্রণী হয়েছিলেন তার মধ্যে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন রামমোহন। কারণ রামমোহনই ছিলেন সে যুগে যুক্তিবাদী ধর্মান্দোলনের প্রধান উৎসাহ-

দাতা। রামমোহন প্রাচীনপন্থীদের 'চ্যালেঞ্জ'কে গ্রহণ ক'রে যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। তারপর প্রাচীনপন্থীদের আক্রমণের সুতীক্ষ্ণ শরগুলি নিক্ষিপ্ত হ'তে লাগল ভাববিপ্লবী 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের প্রতি। 'ইয়ং বেঙ্গল'ও এ আক্রমণের জবাব দিতে দেরি করলেন না। প্রাচীনপন্থীদের দ্বারা গৃহতাড়িত ও লাঞ্ছিত হ'য়ে হিন্দু কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'Inquirer' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ ক'রে প্রাচীনপন্থীদের প্রতি তীব্র বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এ পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে নব-তন্ত্রের বিপ্লবী হিন্দুরাও দলবদ্ধ হ'তে লাগলেন। ১৮৩২ খৃঃ ২৩শে আগষ্ট Inquirer পত্রিকাতে একটা চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হ'ল : ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তি—মহেশচন্দ্র ঘোষ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। প্রাচীনপন্থীরা এ ধর্মান্তরের সংবাদ পেয়ে শিউরে উঠলেন। সে বছরের ১৭ই অক্টোবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। জনরব প্রচারিত হ'ল হিন্দু কলেজের সমস্ত ভাল ভাল ছাত্র খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হবে। এতে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের মনে আরও ভীতির সঞ্চার হ'ল। কিছুকাল পরে প্রতিভাবান্ 'ইয়ং বেঙ্গল' মধুসূদন দত্ত এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরও খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। সনাতনপন্থী হিন্দুরা অনুভব করতে লাগলেন এ ধর্মান্তরের স্রোতকে বাধা না দিলে হয়তো বা বাঙালীর জাতীয় সত্তাই বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে। এ সনাতনপন্থী হিন্দুদের অনেকেই ছিলেন উদার মনোভাবের অধিকারী। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাতে এ সমাজবিধ্বংসী প্রভাব দেখে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, জাতীয় জীবনে এ বিজাতীয় স্রোতকে বাধা দিতে হ'লে এমন এক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে যার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্লবপন্থীরা আত্মস্থ হবে, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, এবং সমন্বয়ের ভিত্তিতে এমন একটা উদার জাতীয় সংস্কৃতি সৃষ্টি করবে, যে সংস্কৃতি এনে দেবে বাঙালীর গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত জীবনের মুক্তির ইঙ্গিত। যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এ বিপরীত ভাবস্রোতের মধ্যে জাতীয় শ্রেয়োবোধের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তিনি হলেন চিন্তাশীল ও কর্মবীর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং যে সাংস্কৃতিক সংস্থার মাধ্যমে সে যুগের বিভ্রান্ত বাঙালী শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে একটা কল্যাণময় সত্য-পথের ইঙ্গিত পেল, সে প্রতিষ্ঠানের নাম—'তত্ত্ববোধিনী সভা'।

॥ ২ ॥

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী! আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি- ও সাহিত্য-বিকাশের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। এ বাড়ীরই কৃতী সন্তান দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম ইংরেজী-শিক্ষিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা সর্বপ্রথম বাঙালীকে বিদেশাগত ইংরেজদের নিকট সম্পর্কে এনে দিল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর যুগে এ প্রগতিশীল মানুষটি ইংলণ্ডে গিয়ে নিজের ধনৈশ্বর্যের দীপ্ত গৌরবে বলদৃপ্ত ইংরেজের চোখে সে যুগের বাঙালীর আভিজাত্য-গৌরবকে বাড়িয়ে দেন শতগুণ। ইংরেজী শিক্ষা-প্রচারের প্রথম যুগে রামমোহনের দক্ষিণ বাহু ছিলেন দ্বারকানাথ। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটি, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু জাতীয় কল্যাণমূলক কাজের জন্য তাঁর মুক্তহস্তে দানের কথা বাঙালী চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।

বন্ধু রামমোহনের মতো ধর্মমতের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথও প্রগতিবাদী; রামমোহনের নব-

উপলব্ধ মানবতাবাদী ধর্মবোধের তিনি একজন প্রধান সমর্থক। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু মানসপ্রকৃতির দিক দিয়ে পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দু কলেজের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন; কিন্তু হিন্দু কলেজের শিক্ষায় সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিতদের জীবনে বিপ্লবের যে ঢেউ উঠেছিল, সে ঢেউ স্থিতধী দেবেন্দ্রনাথকে ভাসিয়ে নিতে পারেনি। সমসাময়িক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবল ভাবাবর্তের মধ্যে বাস করেও তাঁর মনে দেশীয় প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অটুট। কর্মক্ষেত্রে পিতার অসাধারণ ক্ষমতা হয়তো তাঁর ছিল না, কিন্তু বেদান্তবাদী হয়েও বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি যে মোটেই উদাসীন ছিলেন না, তার প্রমাণ আছে। পিতার বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েও বিষয়-বাসনা দেবেন্দ্রনাথের স্বভাবশুচি মনকে কখনও প্রলুব্ধ করতে পারেনি। উপনিষদের ঋষিদের সত্যধর্ম ও জীবনাদর্শ তাঁর সমস্ত চিন্তাকে জাগ্রত করেছিল, আর উন্মোচিত করেছিল তাঁর মোহমুক্ত দৃষ্টির সামনে এক আদর্শ জীবনলোক।

সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই মহাপুরুষের মন সমসাময়িক ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকদের উচ্ছৃঙ্খল জীবন-উন্মাদনা দেখে যে ব্যথিত ও পীড়িত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। স্বজাতি- ও স্বদেশ-প্রেমিক দেবেন্দ্রনাথ তখন অন্তরের গভীরে অনুভব করতে লাগলেন জাতীয় সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠায় এমন কোন সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে, যার সাহায্যে সমসাময়িক ইংরেজী শিক্ষায় বিভ্রান্ত বাঙালী যুবকেরা আত্মস্থ হবে—আর সৃষ্টি করবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বিত আদর্শে এক নব্য সংস্কৃতির। বাঙালী সংস্কৃতির নতুন রূপদান-পরিকল্পনায় দেবেন্দ্রনাথের চিন্তা যখন কুয়াশাচ্ছন্ন, রাম-মোহনের মৃত্যু হয়েছে তখন সুদূর ইংলণ্ডের ব্রিস্টল শহরে (১৮৩৩ খৃঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর)। তিনি জীবিত থাকলে সে যুগের বাঙালীর জাতীয় জীবনের কেন্দ্রচ্যুতির কথা দেবেন্দ্র-নাথকে হয়তো এত ভাবতে হ'ত না, এ জন্য যে বিরোধী শক্তির সঙ্গে বিরামহীন সংগ্রাম ক'রে জাতীয় জীবন-সংস্কৃতিকে একটা আদর্শলোকে পৌছিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় রাম-মোহনের ক্ষমতা ছিল তুলনাহীন। স্বদেশে থাকতে ও বিলাতে গিয়ে রামমোহনের বেদান্ত-চর্চার উদ্দেশ্যও ছিল বিশ্ববাসীর সামনে সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির গৌরবকে নতুন ক'রে তুলে ধরা। তাঁর অকালমৃত্যুতে এ মহৎ প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত ঘ'টল। চিন্তাশীল দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের অনুসৃত শাস্ত্র-বিচারের পথেই জাতীয় সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত খুঁজে পেলেন। তিনি অনুভব করলেন বেদান্তচর্চার মাধ্যমে রামমোহন যে জীবন-সত্যের সন্ধান করেছিলেন, সে মহত্তম সত্যোপলব্ধিকে বিভ্রান্ত জাতির সামনে পুনরায় উপস্থিত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফলে ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল পরিণাম দেখে তিনি এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হলেন যে, দেশীয় কৃতবিদ্য লোকের পরিচালনায় দেশের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হ'লে উৎকেন্দ্রিক বাঙালী জীবনকে জাতীয়তার পাদপীঠে স্থাপন করবার আশা বৃথা। তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা, অথচ সে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা হ'তে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিষয়ও বাদ যাবে না। দেশবাসীর বিচার-বিমূঢ় চিত্তের সঙ্গে সনাতন ভারতীয় শাস্ত্রের সত্যোপলব্ধির মিলন ঘটাবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন শাস্ত্রের অনু-শীলনের জন্যে প্রতিবৎসর চারজন ক'রে ছাত্রকে কাশীতে প্রেরণ করাও তাঁর নবপরিকল্পিত

শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হ'ল।

এ সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্যে রূপ দেবার জন্যে দেবেন্দ্রনাথ নিজ পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্য হ'তে মাত্র দশজন সভ্য সংগ্রহ ক'রে ১৮৩৯ খৃঃ ৬ই অক্টোবর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করলেন, যার নাম দেওয়া হ'ল প্রথমে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভার প্রধান উপদেষ্টা রামমোহনের সহকর্মী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে ঐ সভার নাম পরিবর্তন ক'রে নতুন নামকরণ করা হ'ল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'।

প্রধানতঃ ধর্মালোচনা ও ধর্মপ্রচারের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে ইতঃপূর্বে প্রতিষ্ঠিত 'ধর্মসভা'র পার্থক্য ছিল মৌলিক। সনাতন হিন্দুধর্মপন্থীদেরও 'ধর্মসভার' দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অনেকটা একপেশে (parochial)। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গঠিত হয়েছিল ব'লে সে ধর্মসংস্থা সে যুগের ধর্ম- ও সমাজ-জীবনের ভাঙন প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বাধা দিতে পারেনি। কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সভ্যেরা সংস্কারমুক্ত ও সত্যান্বেষী দৃষ্টি দিয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে যে নতুন আদর্শ স্থাপন করলেন তার ফলে সমসাময়িক প্রবল বিরুদ্ধ ধর্মস্রোতকে বাধা দেওয়া সহজ হ'ল। এ দিক থেকে বিচার করলেও সে যুগে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

শুধুমাত্র বিরুদ্ধ প্রবল ধর্মস্রোতকে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে নয়, তদানীন্তন বাংলাদেশের সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির নবজাগরণের ইতিহাসে একটা গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'; তা ক্রমশঃ আলোচ্য।

॥ ৩ ॥

স্বদেশীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও প্রসারের চেষ্টায় মনীষী দেবেন্দ্রনাথের এ মহৎ উদ্দেশ্য সমকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি শীঘ্রই আকর্ষণ ক'রল। ১৮৪০ খৃঃ হ'তে এর সভ্য-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ঐ বৎসর সভার সভ্য-সংখ্যা ছিল মাত্র ১০৫ জন; কয়েক বছরের মধ্যেই সে সংখ্যা বেড়ে হ'ল ৮০০ জন। এই সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান সমকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী মহলে কতটা জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল এর সভ্যসংখ্যা-বৃদ্ধিই তার অন্যতম প্রমাণ।

সভার কাজে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে লাগলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : শ্যামাচরণ শর্মা সরকার, ডাক্তার দুর্গাচারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, রমাপ্রসাদ রায়, অমৃতলাল মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, আনন্দকৃষ্ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তবে প্রকৃতপক্ষে এ সভার নায়ক ছিলেন চার জন: (১) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, (৩) অক্ষয়কুমার দত্ত ও (৪) রাজনারায়ণ বসু। অবশ্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছিলেন সভার প্রধান উপদেষ্টা ও আচার্য।[১] কি ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বে, কি মনীষায়, কি তীক্ষ্ণ সমাজচেতনায়, কি সংস্কৃতি-প্রসারে সমসাময়িক বাংলা দেশে এঁদের স্থান কোথায়, সে আলোচনা বোধ হয় এখানে নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীযোগানন্দ দাস ১৩৪৫ সনের চৈত্র-সংখ্যা প্রবাসীতে 'তত্ত্ববোধিনী সভার' ৬৪ জন সদস্যের নাম উল্লেখ করেছেন। এ তালিকা হ'তে দেখা যাবে—এ সমস্ত সভ্যের অধিকাংশ বাংলা দেশের

১ যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্যসাধক-চরিতমালা—৩য় খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা।

'রেনেসাঁ'র প্রধান নায়ক। নিম্নে সে তালিকা হ'তে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হ'ল: পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; অক্ষয়কুমার দত্ত; রাজনারায়ণ বসু; তারাচাঁদ চক্রবর্তী; নবগোপাল ঘোষ; রাজেন্দ্রলাল মিত্র; কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত; ভূদেব মুখোপাধ্যায়; ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; গঙ্গাচরণ সরকার; কালীকৃষ্ণ দত্ত; রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়; রামতনু লাহিড়ী; নন্দকিশোর বসু; কেশবচন্দ্র সেন; শিবচন্দ্র দেব; দিগম্বর মিত্র; দ্বারিকানাথ ঠাকুর; পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্যারীচাঁদ মিত্র; কিশোরীচাঁদ মিত্র; কাশীপ্রসাদ ঘোষ; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; মধুসূদন দত্ত।

এ তালিকা পাঠে এ কথা স্পষ্ট হবে সমকালীন বাংলা দেশের প্রতিভাবান্ কবি, লেখক, মনীষী, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, এমনকি চর্যাসম্পন্ন ভূস্বামী পর্যন্ত—একই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন পাশ্চাত্য ভাবস্রোতে ভাসমান বাংলা দেশকে ভারতীয় ঐতিহ্যের পটভূমিকায় আধুনিকতার পাদপীঠের ওপর স্থাপিত করবার জন্যে। এ রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের প্রধান নায়ক অবশ্য মনীষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরিবর্তিত অবস্থায় বাঙালী সংস্কৃতির নব রূপ দান করবার এরূপ প্রচেষ্টা বাংলা দেশে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠার আগে আর দেখা যায়নি।

॥ ৪ ॥

শিক্ষা, সাহিত্য ও ধর্ম—এক কথায় জাতীয়তার ভিত্তিতে বাঙালী সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের যে বিপুল প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিল এবং অবশেষে সমন্বয়ের ভিত্তিতে যে নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি রচনা সম্ভব হয়েছিল, তার প্রাথমিক সূচনা দেখি আমরা 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র ত্রিবিধ কার্যক্রমের ভেতর। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবল বিরুদ্ধ শক্তিকে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হওয়ায় তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যধারার ভেতর হয়তো বা কিছু প্রতিক্রিয়াশীলতা ছিল ব'লে মনে হবে (যেমন, বেদাধ্যয়নের জন্য কাশীতে ছাত্র প্রেরণ); কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তত্ত্ববোধিনী সভার অস্তিত্বের বিশ বৎসর অর্থাৎ ১৮৩৯ থেকে ১৮৫৯ খৃঃ যাবৎ বাঙালী সংস্কৃতির সৃজ্যমান যুগ।

তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম কাজ হ'ল জাতীয়তার ভিত্তিতে একটি পাঠশালার প্রতিষ্ঠা। সৃজ্যমান বাঙালী সংস্কৃতির যুগে এ পাঠশালা-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য কতখানি তা বুঝতে হ'লে সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থার একটু পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠার আগেই দেশীয় বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হ'য়ে গেছে। এ ছাড়া কিছু কিছু দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়োগের নীতিও গৃহীত হয়েছে। এ অবস্থায় বিদেশী ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে দেশবাসীর মন যে উন্মুখ হ'য়ে উঠবে—এ তো খুবই স্বাভাবিক। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীর ওপর বেশী জোর দেওয়াতে দেশের বাংলা পাঠশালা ও মাতৃভাষা শিক্ষার যে খুবই দুরবস্থা হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। সমসাময়িক এক-চক্ষু শিক্ষাকে এই ত্রুটি থেকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে একটি পাঠশালা স্থাপন করলেন ১৮৪০ খৃঃ ১৮ই জানুআরি। এ বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান

উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মাধ্যমে ইওরোপীয় ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। এ পাঠশালার আদর্শই মনীষী দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ত্ববোধিনী সভার কর্মকর্তাদের অনুপ্রেরণা দিল অনুরূপ একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ক'রে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে দেশী-বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করতে। এ ছাড়া ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের মনে যাতে দেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত হয়, এ নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সেদিকেও দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের দৃষ্টি রইল সদা জাগ্রত। এ উদ্দেশ্য নিয়ে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যেই ১৮৪০ খৃঃ ১৩ই জুন তারিখে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত হ'ল কলকাতার সিমলা অঞ্চলে। সভার অন্যতম সদস্য অক্ষয়কুমার দত্তের মতো সুপণ্ডিত ব্যক্তি প্রথম থেকেই পাঠশালার শিক্ষা-দান-কার্যে ব্রতী ছিলেন। কিন্তু সমস্যা হ'ল পাঠ্যপুস্তক নিয়ে। ইতঃপূর্বে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ নিজ পাঠশালার জন্যে যে সমস্ত বই কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের দ্বারা বাংলায় লিখিয়েছিলেন, তাদের ভেতর যাতে প্রাচ্য দর্শন, রীতিনীতি, বা ভাবধারা স্থান না পায় সেইটেই ছিল তাদের বিমাতা-সুলভ দৃষ্টি। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান নায়ক দেবেন্দ্রনাথ দেখলেন, এ সমস্ত বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে তা হবে সভার আদর্শের পরিপন্থী। সেজন্য দেবেন্দ্রনাথ নিজেই নতুন ধারায় পাঠ্যপুস্তক রচনায় অগ্রসর হলেন। ছাত্রদের পাঠোপযোগী বাংলা ভাষায় একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ তিনি রচনা করলেন। পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্তও ভূগোল, অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে বাংলায় পাঠ্য বই রচনা করলেন। এ সমস্ত বই 'পাঠ-শালা'র ছাত্রদের পাঠ্য হিসেবে নির্ধারিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য 'ধর্মতত্ত্ব' পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল। এ ভাবে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বাংলা দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নতুন আদর্শের সন্ধান দিল।

কিন্তু উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষা অর্থকরী বিদ্যার অনুকূল না হওয়ায়, এবং শিক্ষার সময় (সকাল ৬টা হ'তে ৯টা) ছাত্রদের পক্ষে অসুবিধাজনক হওয়ায় পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে লাগল। এ সমস্ত কারণে 'পাঠশালা' কলকাতায় তিন বছরের বেশী চ'লল না। কর্তৃপক্ষ তখন পাঠ-শালার কার্যক্রমের কিছু পরিবর্তন ক'রে এই নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে হুগলী জেলার অন্তর্গত বংশবাটী নামক গ্রামে স্থানান্তরিত করলেন। পল্লীবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই বিদ্যালয় স্থানান্তরের প্রধান উদ্দেশ্য ব'লে ঘোষিত হলেও আসলে কলকাতার ইংরেজী স্কুলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার সামর্থ্যের অভাবই এই স্থানান্তরের প্রধান কারণ ব'লে মনে হয়। পাঠ-শালার স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যক্রমেরও কিছু পরিবর্তন সাধিত হ'ল: 'ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় উপযুক্ত-মত বৈষয়িক বিদ্যা, বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা হইল।'[২] বংশবাটীতে'পাঠশালা'র প্রতিষ্ঠা-উৎসব-বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত উভয়েই শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় আদর্শের প্রয়োজনীয়তা এবং মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষাদানই যে পাঠশালার প্রধান উদ্দেশ্য, সে সম্পর্কে সকলকে অবহিত হ'তে বলেন।[৩]

'পাঠশালা'র দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণে প্রকাশ—বংশবাটীর বিদ্যালয়েও ছাত্রসংখ্যা ১২৭

২ যোগেশচন্দ্র বাগল—সাহিত্যসাধক-চরিতমালা—৩য় খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

৩ দ্রষ্টব্য : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা- আশ্বিন, ১৭৬৫ শক।

জনের বেশী হয়নি। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা যত কমই হ'ক, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পঠন-রীতি ও শিক্ষার মান যে অত্যন্ত উন্নত ছিল তৎকালীন সরকারী শিক্ষা-পরিষদও (Council of Education) তা স্বীকার না ক'রে পারেননি।

আরও তিন বৎসর পাঠশালাটি বাঁশবেড়েতে কৃতিত্বের সঙ্গে চলেছিল। কিন্তু 'কার ঠাকুর কোম্পানি' ও 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে'র পতনের ফলে 'পাঠশালা'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথ আর প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করতে সক্ষম না হওয়ায় ১৮৪৬ খৃঃ পাঠশালার কাজ একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র শিক্ষাবিস্তার-প্রয়াস আজ অনেক পাঠকের নিকট হয়তো নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হবে; কিন্তু এখানে শিক্ষা-বিস্তারের কথাটাই বড় নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেকালের ইংরেজী শিক্ষানবীশ বাঙ্গালীর উৎকেন্দ্রিকতাকে সুস্থ মানসবৃত্তিতে রূপান্তরিত করবার জন্যে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা তাঁদের সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়েও কতটা নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিলেন তা দেখাবার উদ্দেশ্যেই এ দীর্ঘ প্রসঙ্গের অবতারণা।

॥ ৫ ॥

হিন্দু কলেজের শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল' যখন পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি মন্থন ক'রে বাংলা দেশে নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি রচনা-প্রস্তুতির জন্য ব্যস্ত, সে সময় তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের অর্থব্যয় ক'রে কাশীতে বেদবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ছাত্রপ্রেরণ কতকটা প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ ব'লে মনে হবে। কিন্তু মনীষী দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, যে শিক্ষা বিদ্যার্থীকে স্ব-ধর্ম ও স্বদেশীয় সংস্কৃতি বিমুখ ক'রে তোলে সে শিক্ষা মূল্যহীন। সেজন্য দেবেন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগী হ'য়ে হিন্দুর সনাতন শাস্ত্র বেদবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য তিন জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কাশী প্রেরণ করেন ১৭৬৬ শকে (১৮৪৪-৪৫ খৃঃ)। এঁরা যে শুধু বেদের বিভিন্ন অংশ পাঠ করেছিলেন তা নয়, টীকা-সমেত উপনিষদ্‌ও এঁরা ভাল ক'রে পাঠ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র (ভট্টাচার্য) বেদান্তবাগীশ পরবর্তীকালে বাংলা দেশের সংস্কৃতি-বিকাশের ইতিহাসে বেদচর্চা ও আলোচনার দ্বারা তাঁর দীপ্ত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ পেয়ে মনীষী রাজনারায়ণ উপনিষদের ইংরেজী তর্জমা করেন। এ ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ নিজেও হিন্দুশাস্ত্রের মূলসমেত কিছু কিছু অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ক'রে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বিশ্ববাসীর ঔৎসুক্য জাগ্রত করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে এবং মনীষী দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ সমস্ত আলোচনা-গবেষণার ফলে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি শুধু উৎকেন্দ্রিক কালচার-বিলাসী বাঙালীর নয়, ভারতের এবং বিদেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও সশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠেন। এভাবে তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে বাংলা দেশে বেদচর্চা বাঙালীর সংস্কৃতি-বিকাশে পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিল, সন্দেহ নেই।

॥ ৬ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বাঙালী সংস্কৃতি-বিকাশে যে ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা বাঙালী মাত্রেরই স্মরণযোগ্য। কি সাংবাদিকতা, কি সাহিত্য, কি সমাজ-সংস্কার, কি ইতিহাস-চেতনা, কি বিজ্ঞানানুরাগ—সংস্কৃতির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই 'সভা'র মুখপত্র এই সংবাদপত্রখানি যে উচ্চ মান স্থাপন

ক'রল, বাংলা দেশে তা অভূতপূর্ব। বহুবিস্তৃত বিদ্যার বিচিত্র ক্ষেত্রে এ সংবাদপত্রের লেখকদের অবাধ সঞ্চরণ বাঙালী মানসিকতাকে আধুনিকতার তোরণে উত্তীর্ণ ক'রে দিল ; এ পত্রিকার আলোচনা-গবেষণার মাধ্যমে বাঙালীর স্বদেশ-চেতনাও একটা সৃষ্টিধর্মী রূপ পেল। এ পত্রিকার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিতদেরও অনুপ্রাণিত ক'রল নিজেদের চিন্তাপ্রসূত বিষয়গুলিকে রূপ দিয়ে পত্রিকাখানিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলবার জন্যে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মোড় ঘুরে গেল। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রেখেও প্রাচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে উঠল এ পত্রিকার ইংরেজী-শিক্ষিত পাঠকেরা।

পত্রখানির প্রভাব ছিল দ্বিবিধ : একদিকে এ পত্রিকা নব্যশিক্ষিত বাঙালীর জড়বাদী দৃষ্টিকে অধ্যাত্মমুখী ক'রে তুলল, আর একদিকে ভাবপ্রবণ বাঙালী মানসকে যুক্তিবাদের কঠোর ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠা ক'রে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি-রচনার অগ্রদূত হয়েছিল এই জ্ঞানগর্ভ সংবাদপত্র। 'গুপ্ত কবি'র সুবিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকরে'র সঙ্গে এ পত্রিকার পার্থক্য ছিল মৌলিক। 'গুপ্ত কবি'র 'সংবাদ প্রভাকর' যেখানে সমসাময়িক কাব্যকবিতার অন্যতম উৎসাহদাতা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সেখানে কাব্যকবিতা প্রকাশের প্রতি একান্তভাবে বিমুখ। 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদকেরা ছিলেন অনেকেই সংস্কারক, তাই সাহিত্যসৃষ্টিমূলক রচনা অপেক্ষা লোকহিতকর রচনাই যে সে পত্রিকায় প্রাধান্য পাবে, তা খুবই স্বাভাবিক। এ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সুসাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র বাগল বলেন : শিক্ষায় স্বাবলম্বন, মিশনারীদের আক্রমণ হইতে স্ব-ধর্ম ও স্ব-ধর্মীদের রক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা, সুরাপান-নিবারণ, শারীরিক শক্তির উন্মেষ, নীলকরের অত্যাচার, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ-নির্ণয়, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গবাসীদের অনুপ্রেরণা দিয়াছিল।[৪]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ এবং প্রথম সম্পাদক বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সুলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত—সে যুগের পক্ষে বলা যায় মণি-কাঞ্চন সংযোগ। এ পত্রিকার মান যে কত উন্নত ছিল, তা বোঝা যায় প্রবন্ধ-নির্বাচন-ব্যাপারে। এশিয়াটিক সোসাইটির অনুসরণে একটি গ্রন্থ-কমিটি (Paper Committee) স্থাপন ক'রে দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি প্রকাশযোগ্য রচনাকে কমিটি দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নেবার রেওয়াজ প্রবর্তন করেন। গ্রন্থ-কমিটির সদস্যরাও ছিলেন সে কালের সেরা লেখক, যেমন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি। রচনা-নির্বাচন-ব্যাপারে এ গ্রন্থ-কমিটির মতামতই ছিল চূড়ান্ত। এমনও হ'ত, কোন কোন সময় গ্রন্থ-কমিটি রচনা-প্রকাশ-ব্যাপারে পত্রিকা-প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের মতামত পর্যন্ত অগ্রাহ্য করছেন। ব্যক্তি-ও মতামত-নিরপেক্ষ এ রচনা-নির্বাচনপ্রথা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-কে যে সর্বজনসমাদৃত ও শ্রদ্ধেয় ক'রে তুলেছিল তা নিঃসন্দেহ।

প্রধানতঃ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রচারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাখানি। প্রকাশের প্রথমাবস্থায় অধ্যাত্মবিষয়ক আলোচনা রচনায় প্রাধান্য লাভ করলেও যুক্তিবাদী পণ্ডিত অক্ষয়কুমারের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ক্রমে পত্রিকার মেজাজ পরিবর্তিত হ'তে শুরু করে। তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় অধ্যাত্মবিষয় ছাড়াও যুক্তিবাদী জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক বিচিত্রধর্মী রচনা

৪ যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্যসাধক চরিতমালা—৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫।

পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্থান পেতে শুরু করে। বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী দেবেন্দ্রনাথ ঐ সমস্ত রচনা পছন্দ করুন আর না করুন, গ্রন্থ-কমিটির সুচিন্তিত মতামতের ওপর তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। অবশ্য মত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ নিজেও যখন 'যুক্তিবাদী' হ'য়ে পড়েন তখন ঐ শ্রেণীর রচনা-প্রকাশে তাঁর আর কোন দ্বিধা দেখা যেত না। পত্রিকায় রচনা-প্রকাশে শেষ পর্যন্ত অক্ষয়কুমারের মতামতই জয়ী হ'ল। বস্তুতঃ তাঁর সম্পাদনা-কালেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সমৃদ্ধি হয়েছিল সব চাইতে বেশী।

জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক কত বিভিন্ন বিষয়ে কত জ্ঞানগর্ভ রচনা প্রকাশিত হ'য়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সে যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর রুচি ও জ্ঞান-পিপাসাকে তৃপ্ত করতে পেরেছিল বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত কতগুলি প্রবন্ধের শীর্ষনাম থেকেই তার একটা পরিচয় পাওয়া যায়।[৫] এ তালিকায় অবশ্য অধ্যাত্মবিষয়ক সমস্ত রচনা বাদ দেওয়া হয়েছে :

অদ্ভুত কীটাণু ; অয়স্কান্তমণি ; অলৌকিক রাসায়নিক ; অসভ্য জাতির অদ্ভুত ভাব ও রীতি ; অসভ্য জাতিগণের সৌন্দর্যের ভাব ; অশোকচরিত ; আকবর সাহার ধর্মবিষয়ক মত ; আগ্নেয়গিরি ; আগ্নেয় গোধা ; আত্মদর্শন—ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ; আদিম মনুষ্য ; আন্দামান দ্বীপবাসীদিগের বৃত্তান্ত ; পার্বত্যজাতির নীতিশাস্ত্র ; আর্যজাতির উপনিবেশ ; আর্যবংশের আদি ধর্ম ; * * * সমুদ্রযাত্রা (প্রাচীন হিন্দুদিগের), সিন্ধুঘোটক, সিপিয়া মৎস, শূদ্রদিগের বেদপাঠে অধিকার বিষয়ে প্রমাণ, হিমশিলা, হীরক। ইংরেজীতে : A Bengali in Germany, Famine Relief--Letter dated about 1861, Female seclusion, Philosophy and religion from Cousin (দ্রষ্টব্য : ইংরেজীতে অধিকাংশ রচনা এবং পত্রের উত্তর ধর্মবিষয়ক)।

৫ এই নির্বাচিত রচনার নামগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১ম হ'তে ৯ম কল্পের নির্ঘণ্টপত্র থেকে সংগৃহীত—লেখক।

তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তত্ত্ববোধিনীর বিভিন্ন সম্পাদক ও লেখকেরা আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রথম যুগে এমন সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা-গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন যা এ কালের প্রগতিশীল সংস্কৃতির যুগেও আমাদের অনেক পত্রপত্রিকায় কম দেখা যায়। বিষয়গুলির শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়ক নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলি তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছিল :

উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, দর্শন, ভূগোল, প্রাচীন কীর্তি—স্থাপত্য, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, জীববিষয়ক আলোচনা, পদার্থবিদ্যা, কীটতত্ত্ব, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, রাজা-প্রজা-বিষয়ক আলোচনা, পশুবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা (Zoology), পৃথিবীতত্ত্ব, সমরতত্ত্ব, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, জ্ঞান ও ধর্মের তুলনামূলক বিচার, প্রাচীন শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সুদীর্ঘ বারো বৎসর (১৮৪৩-১৮৫৫ খৃঃ) যাবৎ এ পত্রিকার সম্পাদনা করেন জ্ঞানতাপস অক্ষয় কুমার দত্ত। তাঁর সম্পাদনা-কালেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শুধু যে বিষয়বৈচিত্র্য লাভ করেছিল তা নয়, সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালীর জ্ঞান-স্পৃহা সম্পর্কে জাগ্রত কৌতূহলকেও পরিতৃপ্ত করেছিল। সেকালে এ পত্রিকাখানির জনপ্রিয়তার অন্যতম নিদর্শন হ'ল—তাঁর সময়ে গ্রাহক-সংখ্যার আশাতীতরূপে বৃদ্ধি। এ সম্পর্কে "অক্ষয়-চরিতকার" নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস ও মনীষী দেবেন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

'অক্ষয়বাবুর চেষ্টায় ইহাতে ধর্মবিষয় ব্যতীত সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্বাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হইতে আরম্ভ হয়।' (দ্রঃ—অক্ষয়কুমার-চরিত—পৃঃ ১৯-২১)।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল, তাহা কেবল এক অক্ষয়বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।' [দ্রষ্টব্য : ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃঃ ২১]

অক্ষয়কুমার দত্তের ক্লান্তিহীন প্রয়াস ও মনীষার স্পর্শে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্মালোচনা এক কথায় সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্র কর্ষণ ক'রে বাঙালী মানসিকতার অনুর্বর ভূমিতে যে একটা যুগান্তরের সৃষ্টি করেছিল—তা সর্বজন-স্বীকৃত। এ পত্রিকার যুগোচিত আবির্ভাবের অনিবার্য ফলশ্রুতি হ'ল ভাবাবেগপ্রধান বাঙালী চিত্তে যুক্তিশৃঙ্খলার সৃষ্টি, যে যুক্তিশৃঙ্খলার প্রাধান্য পরবর্তীকালে বিদগ্ধ বাঙালী গদ্যলেখকদের অনুপ্রাণিত করেছে মননশীল প্রবন্ধ-রচনায়। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী-প্রধান ও বিষয়নিষ্ঠ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ঐতিহাসিক আবির্ভাব না ঘটলে উনবিংশ শতাব্দীর বিচিত্রমুখী সংস্কৃতি-বিকাশ যে বিলম্বিত হ'ত—তা অনুমান করা অহেতুক নয়।

১৮৫৯ খৃঃ 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের এ যুগান্তকারী পত্রিকার প্রচারও বন্ধ হয়ে যায়।[৬]

৬ সজনীকান্ত দাস, সাহিত্যসাধক-চরিতমালা—১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা।

॥ ৭ ॥

বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি-বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যৌথ প্রয়াসের সাহায্যে দেশের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে নবযুগ সম্ভাবনা হয় সুদূর পরাহত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র ভূমিকা সে যৌথ প্রয়াসেরই পরিচয়বাহী। বস্তুতঃ তত্ত্ববোধিনী সভা যদি ত্রিমুখী কর্মপন্থার মাধ্যমে সে সংঘাতপূর্ণ যুগে দেশের সর্বত্র 'সংঘমন'কে[৭] ছড়িয়ে দিয়ে একটা 'যুগমন' গঠনে সক্ষম না হ'ত—তা হ'লে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালী সংস্কৃতি কি রূপ নিত তা বলা কঠিন। শিল্প-চেতনার দিক দিয়ে না হ'ক বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ও গভীরতার দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্য তাৎপর্যময় হ'য়ে ওঠে এ তত্ত্ববোধিনীর যুগে; আর আজ আমরা যে সমন্বিত আদর্শের বাঙালী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক—তার সূচনা হয় এই 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সমবেত প্রচেষ্টায়।

৭ 'সংঘমন' ও 'যুগমন' কথা দুটি—প্রবাসী চৈত্র (১৩৪৫) সংখ্যায় শ্রীযোগানন্দ দাস কর্তৃক ব্যবহৃত।

মগ্ন

শুভ গুপ্ত

ভোর হলো মেঘে মেঘে;
হে আলোর পাখি,
কে তোমারে দিল ঢাকি
প্রচ্ছন্ন ছায়ায়।

তৃণে তৃণে শিশির-স্বাক্ষর
রেখে গেছে নিদ্রাহীন
রাত্রির বেদনা;

আরো ম্লান ছায়া কেন
দিনের মুকুরে!

হয়তো প্রতীক্ষা তবু
ফিরে ফিরে ডাকে এই
সজল বাতাসে।

ঘাসের ডগায় কাঁপে
হাওয়ার ইসারা
প্রাণের আড়ালে দেখি
প্রজাপতি পাখ্‌না কাঁপায়।

হৃদয় দু'বাহু মেলে
পৃথিবীকে ফিরে পেতে চায়,
অতলের তল ছুঁয়ে
ফিরে পাই বাঁচার আশ্বাস।

খাদ্যে কৃত্রিমতা

অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন

দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত, আটা, ময়দা প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যে নানারূপ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ব্যবসায়ীরা বিক্রয় করে। লোভে পড়িয়া ধর্ম ও সততা বিসর্জন দিয়া খাদ্যদ্রব্যে নানারূপ ভেজাল মিশাইয়া তাহা অখাদ্যে ও বিষে পরিণত করিতেছে। আমরাও অনেক সময় কেবল সস্তা জিনিস ক্রয় করিতে আগ্রহ প্রকাশ করি। ব্যবসায়ীরা খাঁটি জিনিস সস্তায় দিতে না পারিয়া খাঁটি দ্রব্যের সহিত অল্প মূল্যের জিনিস মিশাইয়া সস্তা দরে বিক্রয় করে। আমরা সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে এই ভেজাল নিবারণ করিতে পারি। খাঁটি দ্রব্য ব্যতীত যদি আমরা সস্তায় খারাপ জিনিস না কিনি, তাহা হইলে ভেজাল নিবারণ করা যাইতে পারে। য়ুরোপ ও আমেরিকা যে উপায়ে ভেজাল নিবারণ করিয়াছে, আমাদের তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ডাক্তার দুর্গারতন ধর বলেন, "য়ুরোপ ও আমেরিকায় অধুনা আইন-প্রয়োগ, স্বাস্থ্যবিভাগের অধিকসংখ্যক কর্মচারীর দ্বারা খাদ্যাদি প্রস্তুত করার কারখানা ও গোশালা পরিদর্শন, সর্বোপরি জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান এবং দায়িত্বপূর্ণ জনমতের গঠন এই সকল কুকর্ম হইতে ব্যবসায়ীদিগকে বিরত করিয়াছে।" অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্যে নানারূপ ভেজাল দিয়া থাকে। নিত্যব্যবহার্য পদার্থ বিশুদ্ধ অবস্থায় না পাওয়া গেলে বড়ই অসুবিধা হয়।

দুগ্ধ

দুগ্ধে প্রধান ভেজাল জল। দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিলে ইহা পাতলা হইয়া যায়, কাজেই গোয়ালারা জল মিশ্রিত দুগ্ধের সহিত এবং মাখনতোলা দুগ্ধের সহিত আটা, ময়দা, বাতাসা, চিনি প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে। মহিষদুগ্ধ গোদুগ্ধ হইতে ঘন ও সস্তা, এই কারণে সময় সময় ব্যবসায়ীরা গোদুগ্ধের সহিত মহিষদুগ্ধ ও জল মিশ্রিত করে। কলিকাতায় ময়লা জল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া থাকে। এই ময়লা জল কলেরা, টাইফয়েড্ এবং আমাশয়ের বীজাণুতে পূর্ণ থাকে; কাজেই এই ময়লাজলমিশ্রিত দুগ্ধ ভালরূপ ফুটাইয়া না খাইলে কলেরা, টাইফয়েড্ প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে দুগ্ধ-দোহনকারীর হস্তে ময়লা থাকে, পাত্রেও সময় সময় ময়লা থাকে এবং কখনও কখনও বাঁটের দূষিত ঘায়ে দুগ্ধ দূষিত হয়। এইরূপ দুগ্ধ ফুটাইয়া পান করিলেও সময় সময় পেটের অসুখ হইয়া থাকে। যক্ষ্মা-রোগে পীড়িত গাভীর দুগ্ধে এই রোগ-জীবাণু থাকে এবং এই দুগ্ধ খাইয়া অনেকে এই রোগাক্রান্ত হয়। যদি ভালরূপ ফুটাইয়া দুগ্ধ পান করা যায়, তবে এই রোগের জীবাণু মরিয়া যায়।

ল্যাক্টোমিটার (Lactometer) নামক যন্ত্রে দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণীত হয়। দুগ্ধে জল মিশ্রিত থাকিলে এই যন্ত্রে ধরা যায়। দুগ্ধে চিনি বা বাতাসা মিশ্রিত করিয়া আপেক্ষিক গুরুত্ব সমান করিয়া দিলে তাহা এই যন্ত্র দ্বারা ধরা যায় না। সাধারণতঃ খাঁটি দুগ্ধে শতকরা ৩½ হইতে ৪ ভাগ মাখন থাকে। ল্যাক্টোস্কোপ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যদি দেখা যায় যে মাখনের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা কম, তাহা হইলে বুঝা যাইবে দুগ্ধে জল মিশ্রিত করা

হইয়াছে, অথবা মাখন তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। গোদুগ্ধে মহিষের দুগ্ধ এবং জল মিশ্রিত করিয়া যদি মাখনের পরিমাণ শতকরা ৩½ ভাগ রাখা হয়, তবে এইরূপ ভেজাল ল্যাক্টোস্কোপ দ্বারাও ধরা পড়ে না। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ ভেজাল ধরা যায়।

পরীক্ষা ১ঃ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ একটি টেষ্টটিউবে লইয়া তাহার সহিত সমপরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক্ অম্ল যোগ করিবে। ইহার সহিত ২।১ গ্রেন রিসোরসিন্ (Resorcin) যোগ করিয়া উত্তাপ দিলে যদি সাদা-রঙবিশিষ্ট হয় তবে দুগ্ধে চিনি মিশ্রিত আছে।

পরীক্ষা ২ঃ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ একটি টেষ্টটিউবে লইয়া তাহাতে সমপরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক অম্ল যোগ করিবে। ইহার সহিত আয়োডিন দ্রাবক (Iodine Solution) যোগ করিলে যদি দুগ্ধে নীল রঙ হয় তবে বুঝিতে হইবে, দুগ্ধে ময়দা মিশ্রিত আছে

মাখন

১। সাধারণতঃ মাখনে ভেজাল জল। উৎকৃষ্ট মাখনে শতকরা ১০।১২ ভাগ জল মিশ্রিত থাকে। কখনও কখনও মাখনে শতকরা ৩০।৪০ ভাগও জল থাকিতে পারে।

২। সময় সময় মাখনের সহিত চর্বিও মিশ্রিত থাকে।

৩। কখনও কখনও মাখনের সহিত দধি মিশ্রিত থাকে।

৪। ব্যবসায়ীরা মাখনের সহিত কলাও চট্‌কাইয়া মিশ্রিত করে

মাখনে যদি শুধু জল মিশ্রিত থাকে তবে উহা কোনও পাত্রে জ্বাল দিলে, ঘৃতের পরিমাণ অধিক হইবে না এবং পাত্রের তলায় খাঁক্‌রিও অধিক হইবে না। যদি খাঁক্‌রি অধিক হয়, তবে বুঝিতে হইবে মাখনের সহিত চর্বি ও জল ছাড়া অন্য পদার্থও মিশ্রিত আছে। মাখনে যদি চর্বি মিশ্রিত থাকে, তবে ঘৃতের পরিমাণ অধিক হইবে এবং পাত্রের তলায় খাঁকরি থাকিবে না।

ঘৃত

অসাধু ব্যবসায়িগণ চীনে বাদামের তৈল, নারিকেল তৈল, মহুয়ার তৈল, রেড়ীর তৈল, পোস্ত বীজের তৈল, নানা প্রকার প্রাণীর চর্বি প্রভৃতি, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ তৈল ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া থাকে। অধিক চর্বি মিশ্রিত থাকিলে ঘৃত জমাট বাঁধিয়া যায়।

ঘৃত নানা প্রকার মিষ্টান্নের প্রধান উপাদান। এ দেশে ঘৃত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার জহরলাল দাস ও বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহাদের প্রণীত (Hygiene) পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, কলিকাতায় প্রতি বৎসর ২ লক্ষ ৭০ হাজার মণ ঘৃত আমদানী হয়। এই ঘৃতের অধিকাংশ মহিষদুগ্ধ হইতে উৎপন্ন এবং অবিশুদ্ধ। অধিক ভেজাল থাকিলে গন্ধ, বর্ণ এবং আস্বাদনের দ্বারাই বুঝা যায়। সামান্য একটু ঘৃত হাতে রাখিয়া ঘর্ষণ করিলে ভাল ঘৃত সুগন্ধ হইবে। নিম্নলিখিত উপায়ে ঘৃতে ভেজাল আছে কিনা ধরা যায়।

পরীক্ষা ১ঃ এক ভাগ ঘৃত ও বারো ভাগ ক্লোরোফরম্ একটি টেষ্টটিউবে লইয়া তাহাতে কয়েক ফোঁটা ফস্‌ফো-মলিবডিক অম্ল (Phosphomolybdic Acid) দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া দিলে মিশ্রিত তৈল এবং ঘৃতের সংযোগস্থলে একটি সবুজ বর্ণ অঙ্গুরীয়ক দেখা যাইবে।

পরীক্ষা ২ঃ নয় অংশ কার্বলিক অম্লে (Carbolic Acid) এক অংশ জল মিশ্রিত

করুন। এই মিশ্র দ্রব্যের আড়াই অংশ একটি টেষ্টটিউবে লইবেন এবং তাহার সহিত এক অংশ ঘৃত মিশ্রিত করুন। এইরূপ করিবার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। মাখন বা ঘৃত জাতীয় পদার্থ অম্লে দ্রব হইয়া যাইবে, কিন্তু প্রাণীর চর্বি যদি ঘৃতে থাকে তবে উহা উপরে উঠিবে। ঘৃতের সহিত অধিক তৈল মিশ্রিত থাকিলে তৈল তরল অবস্থায় উপরে ভাসিবে এবং দানার অংশ অধিক হইবে না। গ্রীষ্মকালে বিশুদ্ধ ঘৃত গলিয়া সময় সময় তরল হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এইরূপ ঘৃতে কিরূপে ভেজাল ধরা যায়। বিশুদ্ধ এবং ভেজাল ঘৃত তুলনা করিয়া যদি দেখা যায় যে দানার পরিমাণ কম, তাহা হইলে যেটিতে দানা কম, সেটি কৃত্রিম বুঝিতে হইবে।

সরিষার তৈল

কখনও কখনও সরিষার তৈলের সহিত একরূপ মেটে (মৃত্তিকাজাত) তৈল মিশ্রিত করা হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ সরিষার তৈলের সহিত মাদ্রাজী বাদাম, পোস্ত, সোরগুজা, সস্তাদরের তৈল, হুড়হুড়ে বীজ, তারা বীজ, রেড়ীর বীজ প্রভৃতির তৈল মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত দ্রব্য সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘানিতে পিষিয়া তৈল প্রস্তুত করা হয়।

কৃত্রিম তৈলকে সরিষার তৈলের ন্যায় ঝাঁজ-বিশিষ্ট করিবার জন্য সজিনার ছাল এবং লঙ্কা মিশ্রিত করিয়া ঘানিতে পেষা হইয়া থাকে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বড় বড় দোকানে ১নং ২নং ৩নং তৈল বিক্রয় হয়। ১নং তৈলে অর্দ্ধেক সরিষা এবং অর্দ্ধেক অন্য দ্রব্য থাকে। ২নং তৈলে সিকি সরিষা এবং বাকী অন্য পদার্থ। ৩নং তৈলে নামমাত্র সরিষা থাকে।

যাঁহারা সরিষা ক্রয় করিয়া কলুর বাড়ী হইতে পিষিয়া আনিবেন, তাঁহারা খাঁটি তৈল পাইতে পারেন। বাজারে খাঁটি ঘানির তৈল বলিয়া যাহা বিক্রয় হয়, তাহাতে কিছু পরিমাণ ঘানির তৈলের সহিত কলের তৈল মিশ্রিত থাকে।

আটা ময়দা

কখনও কখনও চাউলের গুঁড়া আটা ও ময়দার সহিত মিশ্রিত করা হয়।

আমরা যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে অন্য দ্রব্যের গুঁড়া আটা ও ময়দার সহিত মিশ্রিত আছে কিনা।

কলের ময়দার সহিত চাক-খড়ির, ফরাসি খড়ির (French chalk) ও পাথরের গুঁড়া (Soft stone) এবং এক প্রকার ঘাসের বীজ মিশ্রিত থাকে, ইহারও আমরা প্রমাণ পাইয়াছি।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।

—রবীন্দ্রনাথ

'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্—'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমাতে আনন্দ মোর অনির্বচনীয় ;
তোমা চেয়ে আর কিছু নাহি লোভনীয়
স্বর্গে, মর্ত্যে, রসাতলে—ওগো প্রিয়তম,
আমার হৃদয়াকাশে ধ্রুবতারা সম
জ্বলুক এ মহাসত্য ঃ 'দূস্‌রা ন কোঈ'—
জীবনের মর্মমূলে যেন তোমা বই
আর কেহ নাহি রয়। এ দুটি নয়ন
সর্বত্র তোমারে শুধু করিবে দর্শন।

সমস্ত মানুষে ভালোবাসিব তোমারে।
তোমার আনন্দ রবে সবার মাঝারে।
তব পাদপদ্মে যদি লগ্ন থাকে হিয়া
প্রতিটি নিমেষে—জানি লইবে তুলিয়া
আমার সমস্ত বোঝা। ভাঙো অহঙ্কার।
হে প্রভু, আমারে করো—তোমার তোমার।

একান্ত আপন

শ্রীশান্তশীল দাশ

অনেকের মাঝে আছি ; মনে হয়,
এ অনেক কেহ মোর আপনার নয়।
কারো 'পরে পারিনাতো করিতে নির্ভর ;
যদিও তাদের সাথে আমার এ ঘর
বেঁধেছি এখানে। দেখাশুনা প্রতিদিন
হয়। হাসি, কথা কই ; তবু বড় ক্ষীণ।
সে বন্ধন—ছিঁড়ে যায় নিমেষে আঘাতে।
মনে হয় ঃ সঙ্গীহীন আমি, কারো সাথে
নেই মোর কোন চেনা—নিঃসঙ্গ, একাকী।
তখন তোমার কথা মনে পড়ে ; ডাকি
তোমায় আকুল হ'য়ে ; তুমিই আমার
একান্ত আপন জন ; নেই কেহ আর
তোমার মতন প্রিয়। বেদনাশ্রু-জলে
সঁপে দিই আপনারে ও চরণতলে।

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

[শ্রীজ্ঞানদেব-বিরচিত গীতার ব্যাখ্যা মূল মারাঠী 'ভাবার্থ-দীপিকা'র নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ]

পাঠকপাঠিকাদের স্মরণ থাকিতে পারে গত বৎসর চারিটি সংখ্যায় গীতার এই অপূর্ব ব্যাখ্যার পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩৬৪ উদ্বোধন, ১১শ ও ১২শ সংখ্যায় সন্ত জ্ঞানেশ্বরের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাওয়া যাইবে। নিম্নে ব্যাখ্যার অন্তর্গত বন্ধনীস্থ সংখ্যাগুলি মূল 'জ্ঞানেশ্বরী'র শ্লোক-সংখ্যা। উঃ সঃ

আপনারা একাগ্রচিত্তে অবধান করুন, আপনারা এই কথা শ্রবণ করিলে সর্বসুখের পাত্র হইবেন—ইহা আমি স্পষ্টভাবে বলিতেছি; পরন্তু ইহা আত্মশ্লাঘাপূর্ণ কথা নয়, আপনারা বিজ্ঞ, আপনাদের সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য ইহাই আমার আত্মীয়তাপূর্ণ নিবেদন; কারণ আপনাদের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন 'মাতৃগৃহ' থাকিলে প্রেমের সকল আবদার পূর্ণ হয়, মনোরথের মনোরথ সফল হয়; আপনাদের কৃপাদৃষ্টির আর্দ্রতায় প্রসন্নতার উপবন ফলফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে, শ্রান্ত হইয়া আমি তাহারই ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছি। হে প্রভুগণ, আপনারা সুধামৃতের গভীর জলাশয়, সুতরাং আমি আপন ইচ্ছামত সুধামৃত পান করিয়া শীতল হইতে চাহি—তাহাতে যদি আত্মীয়তা প্রকাশ করিতে ভয় পাই, তবে আমি তৃপ্ত হইব কিরূপে? অথবা শিশুর অর্ধস্ফুট বাণী শুনিয়া, বা তাহার আঁকাবাঁকা চরণের কৌতুকপূর্ণ গতিভঙ্গী দেখিয়া মাতা যেমন আনন্দিত হন, তেমনই আপনাদের ন্যায় সন্তজনের প্রেম প্রাপ্ত হইবার জন্য অত্যধিক আগ্রহের সহিত আত্মীয়তাপূর্ণ অন্তরঙ্গতা করিতেছি; নতুবা আপনাদের ন্যায় জ্ঞানী শ্রোতৃগণের সম্মুখে কি আমার কিছু বলিবার যোগ্যতা আছে? সরস্বতীর পুত্রকে কি পাঠ পড়িয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়? দেখুন, জোনাকি যত বড়ই হউক না কেন, সূর্যের মহাতেজের সম্মুখে কি তাহার দ্যুতি নিষ্প্রভ হইয়া যায় না? এরূপ কি রসপূর্ণ সুখাদ্য আছে, যাহা অমৃতের থালায় পরিবেশন করা যায়? চন্দ্রকিরণকে পাখার বাতাস করা, অনাহত নাদকে গান শোনানো, অলঙ্কারকে অলঙ্কৃত করা কি কখনও সম্ভব? (১০)

বলুন তো, পরিমল স্বয়ং কেমন করিয়া আঘ্রাণ করিবে? সমুদ্র কোথায় স্নান করিবে? এমন কি বৃহৎ বস্তু আছে, যাহা সারা গগনকে আচ্ছাদন করিবে? তেমনই এমন বক্তৃতা-শক্তি কাহার আছে যে আপনাদের শ্রবণের তৃপ্তি সাধন করিবে এবং আপনাদের এমন আনন্দ দান করিবে যে আপনারা বলিবেন 'হাঁ, ইহাই ঠিক'? তথাপি বিশ্বপ্রকাশক সূর্যকে কি হাতের প্রদীপ দ্বারা আরতি করা যায় না? কিংবা, অঞ্জলিপূর্ণ জলে কি সমুদ্রকে অর্ঘ্য দেওয়া হয় না? আপনারা মহেশের মূর্তি, আর আমি দুর্বল; ভক্তি দ্বারা আপনাদের পূজা করিতেছি,—অতএব আমার বাণী (নিগুঁড়ী * পত্রের ন্যায়) নির্গুণ হইলেও আপনারা কি তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইবেন না? বালক পিতার থালায় বসিয়া পিতাকে খাওয়াইতে

* গঙ্গাবতী—নিগুঁড়ীর পত্র—বিল্বপত্রের অভাবে পূজায় ব্যবহৃত হয়।

আরম্ভ করিলে পিতা সন্তোষে পূর্ণ হইয়া মুখ বাড়াইয়া দেন, তেমনই আমিও বালক-বুদ্ধিতে আপনাদের সহিত ইচ্ছামত ক্রীড়া করিতেছি, আপনারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন—ইহাই প্রেমের রীতি ; আর আপনারা—সন্ত শ্রোতারা—বহু প্রকারে আমার প্রতি আপনাদের প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং আমি আপনাদের সহিত আত্মীয়তাসুলভ ব্যবহার করিতেছি, তাহা আপনাদের বিব্রত করিবে না ; মাতার স্তনে শিশুর মুখের ঝটকা লাগিলে স্তনে আরও অধিক দুগ্ধ নিঃসৃত হয়--অত্যন্ত প্রিয়জনের রোষে প্রেম দ্বিগুণ বর্ধিত হয় ; আমার বালকসুলভ কথায় আপনাদের সুপ্ত কৃপালুতা জাগ্রত হইয়াছে—ইহা জানিয়াই আমি এই ভাবে বলিতেছি, নতুবা চন্দ্রকিরণকে কি জাঁক দিয়া পাকাইতে হয় ? বায়ুকে কি গতি প্রদান করিতে হয় ? গগনকে কি জালে টানিয়া আনা যায় ? (২০)

শুনুন, জলকে আর তরল করিতে হয় না, মাখনের মধ্যে মন্থনদণ্ড ঢোকানো নিষ্প্রয়োজন, তেমনই যাহাকে দেখিলে ব্যাখ্যান লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসে—শুধু ইহাই নহে, শব্দব্রহ্ম স্তব্ধ হইয়া যে পালঙ্কের উপর শান্ত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, সেই গীতার্থ মারাঠী ভাষায় বলিবার যোগ্যতা (আমার) কই ? পরন্তু ইহাই আমার ইচ্ছা, আমার একমাত্র আশা এই যে আমার ধৃষ্টতা দ্বারা ভবাদৃশ জনের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিব ; এখন চন্দ্র হইতেও শীতল, অমৃত হইতেও অধিকতর সঞ্জীবনীশক্তিবিশিষ্ট আপনাদের অবধান (মনোযোগ) দান করিয়া আমার মনোরথের পোষণ করুন। আপনাদের কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হইলে আমার বুদ্ধি সকলার্থসিদ্ধির পরিপক্কতা লাভ করিবে ; অন্যথায় যদি আপনারা উদাসীন থাকেন, তবে আমার প্রতিভার অঙ্কুর শুকাইয়া যাইবে ; আপনারা স্মরণ রাখিবেন, বক্তৃতাকে যদি অবধানরূপ খাদ্য দেওয়া যায়, তবে শব্দের সহিত অর্থের সামঞ্জস্য হয় ; অর্থ শব্দের পথ দেখিতে পায় (শব্দের সহিত অর্থের প্রতিপত্তি হয়), এক অভিপ্রায় (অভিপ্রেত অর্থ) হইতে অন্য অভিপ্রায় বাহির হয়, বুদ্ধির মস্তকে ভাবের কুসুমবৃষ্টি হয় ; এই ভাবে (বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে) সংবাদের অনুকূল পবন বহিতে থাকিলে হৃদয়াকাশ বক্তৃতার সারস্বত (জ্ঞানপূর্ণ) রসে ভরিয়া যায়, শ্রোতা অমনোযোগী হইলে বক্তৃতার রস নষ্ট হইয়া যায় ; চন্দ্রকান্ত মণি দ্রবীভূত হয় বটে, পরন্তু তাহাকে দ্রব করিবার শক্তি চন্দ্রমাতেই আছে, তেমনই শ্রোতা (শ্রোতার অবধান) বিনা বক্তা বক্তাই নয় ; পরন্তু তণ্ডুলকে কি বিনতি করিতে হয় যে 'আমাকে গ্রহণ করুন' ? কাষ্ঠপুত্তলীকে কি (নাচাইবার জন্য) সূত্রধারকে প্রার্থনা করিতে হয় ? (৩০) সূত্রধার কি কাষ্ঠপুত্তলীর কাজের (উপকারের) জন্য তাহাকে নাচায় ? কি, আপনার কলানৈপুণ্য দেখাইবার জন্য নাচায় ? সুতরাং আমার বৃথা কষ্ট করার কি প্রয়োজন ;

তখন শ্রীগুরু বলিলেন, 'কি হইল ? (তোমার) এ সমস্তই আমি অঙ্গীকার করিয়া লইলাম, এখন নারায়ণ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) যাহা নিরূপণ করিলেন তাহাই বলো, ইহাতে নিবৃত্তিদাস (জ্ঞানদেব) সন্তুষ্ট হইয়া উল্লাসভরে বলিলেন, যথা আজ্ঞা—এখন শুনুন ঃ

শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বলিতে লাগিলেন—

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥১

হে অর্জুন, তোমাকে আমার হৃদয়ের অন্তস্তলের গুহ্য রহস্য—জ্ঞানের মূল বীজের কথা পুনরায় বলিতেছি; এইভাবে অন্তঃকরণের গুপ্ত দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া আমাকে কি গুহ্য রহস্যের কথা বলিবেন—এইরূপ কোনও সহজ সন্দেহ যদি তোমার মনে উঠিয়া থাকে, তবে হে প্রাজ্ঞ, শোন—তুমি (শ্রদ্ধার) প্রতিমূর্তি, আমার কোনও বাক্য অবজ্ঞা কর না; এই জন্য আমি চাহি যে আমার অন্তরের গূঢ় তত্ত্ব বাহির হইয়া আসুক; যাহা বলিবার নয় তাহাও ব্যক্ত করিতে বাধ্য হই, পরন্তু আমার হৃদয়ে যাহা কিছু আছে তাহা তোমার হৃদয়ে গিয়া প্রবেশ করুক; স্তনে দুগ্ধ ভরা থাকে, কিন্তু স্তন সে দুগ্ধের মিষ্টত্ব আস্বাদন করিতে পারে না; যদি দুগ্ধ পান করিবার কোনও একনিষ্ঠ বৎস মিলে তবে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়; যদি বীজের পাত্র হইতে বীজ লইয়া তৈয়ারী জমিতে বপন করা হয়, তবে কি বলা যায় যে বীজ ছড়াইয়া নষ্ট করা হইল। এইজন্য সুমনা শুদ্ধমতি অনিন্দক ও অনন্যগতি প্রেমিকের কাছে গোপনীয় বিষয়ও সুখে বলা যায়। (৪০)

এখন তুমি ভিন্ন এই সমস্ত গুণসম্পন্ন অন্য কেহই নাই, সুতরাং গুহ্য হইলেও এই রহস্য তোমার নিকট গোপন করা উচিত নহে; বার বার 'গুহ্য রহস্য' এই কথা শুনিতে শুনিতে তোমার হয়তো ইহা (কানাড়ী ভাষার ন্যায়) দুর্বোধ্য মনে হইবে, এইজন্য আমি বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান স্পষ্টভাবে উপদেশ করিতেছি; আসল ও জাল মুদ্রা একত্র থাকিলে যেমন তাহা পরীক্ষা করিয়া আলাদা করিতে হয়, তেমনই জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান পৃথক্ করিয়া দেখাইব; রাজহংস চঞ্চুর সাহায্যে জল হইতে দুধ পৃথক্ করে, তেমনই আমি তোমাকে 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' পৃথক্ করিয়া বুঝাইব; বায়ুর প্রবাহে তুষ উড়িয়া যায় এবং শস্যের দানা রাশীকৃত হইয়া পড়িয়া থাকে, তেমনই জ্ঞানলাভের পর সংসারকে সংসারের মধ্যে রাখিয়া মোক্ষ-শ্রীর সিংহাসনে গিয়া বসিবে।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥২

যে জ্ঞান সুবিদ্যার নগরে মুখ্য আচার্যের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা সকল গুহ্য বিষয়ের স্বামী, পবিত্র বস্তুর রাজা; আর ধর্মের নিজ ধাম, উত্তমের মধ্যে উত্তম, যাহা প্রাপ্ত হইলে আর অন্য জন্মের আবশ্যকতা হয় না; যাহা সামান্য পরিমাণে (দীক্ষাকালে) গুরুর মুখে উদয় হইতে দেখা যায়, পরন্তু যাহা হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ (স্বয়ম্ভূ) এবং আপনা-আপনিই তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে থাকে; আত্মসুখের সিঁড়ি বাহিয়া চড়িতে চড়িতে যাহার দর্শন পাওয়া যায়—যাহা প্রাপ্ত হইলে ভোক্তা তাহাতেই বিলীন হয়; (৫০)

পরন্তু ভোগের (প্রাপ্তিসুখের) এপারের সীমানাতেই (লয় হইবার পূর্বেই) চিত্ত সুখে পূর্ণ হইয়া স্থির হইয়া থাকে,—এই জ্ঞান সুলভ ও সহজ হইলেও উহাই পরব্রহ্ম; এই জ্ঞানের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে উহা একবার প্রাপ্ত হইলে আর নষ্ট হয় না। আর অনুভব করিলে কমিয়াও যায় না, নিষ্প্রভও হয় না; যদি তার্কিকের ন্যায় তোমার মনে এই সংশয় হয় যে এই প্রকার বস্তু লোকের গ্রাস হইতে কি প্রকারে রক্ষা পাইল—যে শতকরা একমুদ্রা সুদের

জন্য জলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে পারে, সে অনায়াসে লভ্য এই আত্মসুখের মাধুর্য কি করিয়া ত্যাগ করে? ইহা গৌরবের ও রমণীয়, সুখলভ্য, সুসুখ (সুখকারক) ও পরম ধর্ম্য (ধর্মানুকূল), ইহা স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত করাইয়া দেয়; এরূপে সর্বপ্রকারে অনুকূল হইয়াও ইহা লোকের হস্তগত হয় নাই কেন? এই শঙ্কার সত্যই কারণ আছে, পরন্তু তুমি এ আশঙ্কা করিও না।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩

দেখ, দুগ্ধ অতি পবিত্র ও সুমিষ্ট, (গাভীর স্তনে) ত্বকের একটা পরদার নীচেই সঞ্চিত থাকে, পরন্তু রক্তপায়ী কীট তাহা উপেক্ষা করিয়া রক্ত পান করে; কিংবা কমলকন্দ ও ভেক একই স্থানে বাস করে, পরন্তু ভ্রমর কমলের পরাগ আস্বাদন করে, ভেকের ভাগ্যে কর্দমই জোটে; অথবা দুর্ভাগার ঘরে দ্রব্যপূর্ণ সহস্র ভাণ্ড থাকিতে পারে, পরন্তু সে ঐ ঘরে বসিয়া উপবাস করে বা দারিদ্র্যে দিনপাত করে; তেমনই সর্ব সুখের আরাম (বিশ্রামস্থল) আমি 'রাম' (আত্মারাম) হৃদয়ের মধ্যে থাকিলেও লোকে ভ্রান্ত হইয়া বিষয় কামনা করে। (৬০)

(দূর হইতে) মৃগজল দেখিয়া মুখভরা অমৃত ফেলিয়া দিলে যেমন হয়, অথবা শুক্তি পাইয়া গলায় বাঁধা পরশপাথর ভাঙিয়া ফেলিলে যেমন হয়, তেমনই বেচারা জীব 'অহংতা' ও 'মমতা'র পঙ্কে পড়িয়া আমাকে পায় না এবং সেইজন্য জন্মমরণের দুই তীরের মধ্যে চুবানি খাইতে থাকে; বাস্তবিক পক্ষে আমি মুখের সম্মুখে সূর্যের মতো—পরন্তু সূর্য কখনও দেখা যায়, কখনও দেখা যায় না, আমার সে ন্যূনতাও নাই, (আমাকে সর্বদা অনুভব করা যায়)।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৪

যদি আমার বিস্তারের কথা বল, এ সমস্ত জগৎই কি আমার স্বরূপের বিস্তার নহে? দুগ্ধ যেমন স্বভাবতঃ জমিয়া দধি হয়, কিংবা বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ হয়, অথবা স্বর্ণ হইতে যেমন অলঙ্কার হয়, তেমনই এই জগৎ একমাত্র আমারই বিস্তার; আমার স্বরূপ অব্যক্ত অবস্থায় ঘনীভূত হইয়া থাকে, এই বিশ্বাকার জগৎ তাহারই তরল অবস্থা—এই ত্রৈলোক্য আমার নিরাকার স্বরূপের সাকার বিস্তার; মহত্তত্ত্ব হইতে দেহ পর্যন্ত এই অশেষ ভূতগ্রাম আমাতেই প্রতিবিম্বিত আছে—জলে যেমন ফেনা থাকে; পরন্তু হে পাণ্ডুসুত, ফেনার মধ্যে দেখিলে যেমন জল দেখা যায় না, অথবা স্বপ্নের অনেকতা (স্বপ্নে দেখা অনেক প্রকারের রূপ) যেমন জাগ্রত হইলে অদৃশ্য হয়, তেমনই এই ভূতগণ আমার মধ্যেই ভাসমান, আমি তাহাদের মধ্যে নাই—এই উপপত্তি (যুক্তি) আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি; অতএব যাহা বলা হইয়াছে তাহার পুনরুক্তি করিব না—এইজন্য ইহা থাকুক, পরন্তু তোমার দৃষ্টি আমার স্বরূপে প্রবেশ করুক। (৭০)

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫

প্রকৃতির অতীত আমার যে স্বরূপ তাহা যদি কল্পনা (সঙ্কল্প-বিকল্প)-রহিত হইয়া বিচার কর, তবে সমস্ত ভূতগ্রাম যে আমার মধ্যে অবস্থান করে, এই কথাও মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারিবে

—কারণ আমিই সর্বস্বরূপ; নতুবা সঙ্কল্প-বিকল্পের সন্ধ্যাবেলায়—যখন বুদ্ধির দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন বুদ্ধির গোধূলি-সময়ে অখণ্ডিত পরব্রহ্মকে ভূত হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখে; সেই সন্ধ্যার যখন লোপ হয়, তখন অখণ্ড পরব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন—যেমন শঙ্কা দূর হইলেই মালার সর্পাভাস যায়; মৃত্তিকা হইতে কি স্বতই কলসী-ঘটাদি উৎপন্ন হয়?—না উহারা কুম্ভকারের বুদ্ধির গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়? অথবা সমুদ্রের জলে কি তরঙ্গের খনি আছে? উহা কি বায়ুরই অতিরিক্ত কার্য নহে? দেখ, কার্পাসের উদরে কি বস্ত্রের পেটিকা থাকে? ব্যবহারনিপুণ ব্যক্তি দ্বারা বস্ত্র তৈয়ারী হয়; স্বর্ণ হইতে অলঙ্কার তৈয়ারী হইলে কি তাহার স্বর্ণত্ব নষ্ট হয়? আর অলঙ্কারও—যে ব্যবহার করে তাহার কল্পনা-অনুসারেই তৈয়ারী হয়। বল দেখি, প্রতি-ধ্বনির প্রত্যুত্তর, বা দর্পণে প্রতিবিম্ব—কি নিজেরই কথা বলা বা দেখার ফল?—না সত্য সত্যই সেখানে আমি থাকি? তেমনই আমার এই নির্মল স্বরূপে যে পঞ্চভূতের কল্পনা আরোপিত হয়, সেই সঙ্কল্পের জন্যই এই ভূতাভাস হয়; কল্পনাকারী প্রকৃতির শেষ হইলে ভূতাভাসেরও অন্ত হয় এবং একমাত্র আমারই শুদ্ধ অবিকৃত স্বরূপই অবশিষ্ট থাকে। (৮০)

এ কথা থাকুক; নিজে ঘুরিতে থাকিলে যেমন চতুর্দিকের পাহাড়-পর্বত ঘুরিতেছে দেখা যায়, তেমনই নিজের মনে কল্পনা উৎপন্ন হইলে অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপে ভূতাভাস হয়; সেই কল্পনা ছাড়িয়া দিলে আমি ভূতমধ্যে আছি বা ভূতগ্রাম আমার মধ্যে আছে, ইহা স্বপ্নেও ভাবা যায় না; 'আমিই ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি', অথবা 'আমি পঞ্চভূতের মধ্যে আছি'—এইসব কথা সঙ্কল্পরূপ সন্নিপাত-জ্বরের প্রলাপ-বাক্য; অতএব হে প্রিয়োত্তম, শোন—এইভাবে আমি বিশ্বের বিশ্বাত্মা, এই মিথ্যা ভূতগ্রামের আমিই অধিষ্ঠান বা আশ্রয়; সূর্যকিরণের আধারেই যেমন মিথ্যা মৃগজলের আভাস দেখা যায়, তেমনই ভূতজাত সর্ব পদার্থ আমারই সত্তার মধ্যে, এবং আমিও তাহাদের মধ্যে—ইহাই কল্পনা করা হয়; সূর্য এবং সূর্যের প্রভা যেমন অভিন্ন, তেমনই ভূতভাবন আমিও সর্বভূত হইতে অভিন্ন; ইহাই আমার ঐশ্বর্যযোগ—ইহা কি তুমি উত্তম-রূপে বুঝিয়াছ? এখন বলো, ইহাতে কি ভূতভেদের তিলমাত্র স্থান আছে? এইভাবে ভূত-মাত্রই আমা হইতে ভিন্ন নয়—ইহাই সত্য, আর আমাকে কখনও ভূতগণ হইতে ভিন্ন মনে করিও না।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥৬

আকাশের যতখানি বিস্তার, আকাশের মধ্যে পবনও ততখানি বিস্তৃত, সহজ সঞ্চালনেই তাহাকে পৃথক্ বলিয়া দেখা যায়, নতুবা উহা তো আকাশই; তেমনই আমার মধ্যে ভূতজাত আছে—ইহা কল্পনা করিলেই তাহার আভাস হয়, কল্পনার অভাবে (নির্বিকল্পে) ঐ আভাস চলিয়া যায়, তখন সমস্তই আমি হইয়া যাই। (৯০)

সেইজন্য ভূতগণের 'থাকা' বা 'না-থাকা' কল্পনার সংযোগেই হয়, কল্পনার লোপ হইলে তাহাদের অস্তিত্ব যায়, কল্পনার সহযোগে তাহাদের আভাস হয়; কল্পিত পদার্থের মূল কল্পনাই যখন থাকে না, তখন (ভূতগণের) 'থাকা' 'না-থাকা' কোথা হইতে আসিবে? সেইজন্য

তুমি পুনরায় আমার ঐশ্বরযোগ দেখ; অনুভবরূপ বোধসমুদ্রে তুমি আপনাকে একটি তরঙ্গের মতো দেখ—চরাচর বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সর্বত্র আপনাকেই দেখিবে।

তোমার মধ্যে কি এই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছে? এখন (তোমার) দ্বৈত স্বপ্ন মিথ্যা হইয়াছে কিনা? আবার কদাচিৎ যদি বুদ্ধিতে কল্পনার নিদ্রা আসিয়া যায়, তবে স্বপ্নের ঘোরে এই অভেদবোধ চলিয়া যাইবে, এইজন্য এখন আমি সেই সত্যরূপ গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিব, যাহাতে নিদ্রার পর্ব ভাঙিয়া যাইবে, এবং তোমাকে নিখিল আত্মজ্ঞানের আলোকে সর্বদা জাগ্রত রাখিবে; হে ধনুর্ধর ধনঞ্জয়, তুমি ধৈর্য ধরিয়া উত্তমরূপে অবধান কর—মায়াই সর্বভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ।

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥৭

যাহাকে প্রকৃতি কহে তাহা দ্বিবিধ, তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথমটিতে অষ্ট প্রকারের ভেদ, দ্বিতীয়টি জীব-রূপ; হে পাণ্ডব, এই প্রকৃতির সমস্ত বিষয়ই তোমাকে পূর্বে শুনাইয়াছি, সুতরাং বারংবার বলিবার প্রয়োজন নাই; মহাকল্পের অন্তে সর্বভূতগণ আমারই প্রকৃতিরূপ অব্যক্তে ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হয়। (১০০)

গ্রীষ্মের আধিক্যে তৃণ যেমন বীজ-সহিত পুনরায় ভূমির মধ্যে বিলীন হয়; অথবা বর্ষার আড়ম্বর শেষ হইলে যেমন শরৎ ঋতুর আগমন হয়, তখন আকাশের মেঘসমূহ যেমন আকাশেই বিলীন হয়; অথবা শূন্যগর্ভ আকাশের মধ্যে যেমন বায়ু শান্ত হইয়া লুপ্ত হয়, কিংবা তরঙ্গ যেমন জলে বিলীন হইয়া যায়; অথবা জাগ্রত হইলে মনের স্বপ্ন যেমন মনেই মিলাইয়া যায়, তেমনই প্রাকৃত (প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন) জগৎ কল্পান্তে প্রকৃতিতেই বিলীন হয়; কল্পের প্রারম্ভে পুনরায় আমিই জগৎ সৃষ্টি করি—ইহাই লোকে বলে। এই বিষয়ে যথার্থ যুক্তি শ্রবণ কর:

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥৮

হে কিরীটী, আমি সহজ লীলায় স্বকীয়া প্রকৃতির অধিষ্ঠান হইয়া আছি; বয়নের কৌশলে যেমন তন্তুর সমষ্টি বস্ত্রের আকার ধারণ করে, সেই বয়ন-কৌশলের ছোট ছোট চতুষ্কোণ হইতে যেমন বস্ত্র তৈয়ারী হয়, তেমনই পঞ্চভূতাত্মক আকারে 'প্রকৃতি' হইতে সৃষ্টি উৎপন্ন হয়; দম্বল (অম্ল) সংযোগে দুধ যেমন জমিয়া যায়, তেমনই প্রকৃতিও সৃষ্টির আকার ধারণ করে; জলের সহিত সংযোগ হইলে বীজ যেমন শাখা-প্রশাখার রূপ ধারণ করে, তেমনই ভূতসৃষ্টির প্রসার আমা হইতেই হয়; 'রাজা নগর বসাইয়াছেন' বলিলে ঠিকই বলা হইবে, পরন্তু যথার্থ দেখিতে গেলে রাজার হাত কি এই জন্য কষ্ট করে? (১১০)

আর আমি কিভাবে প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া আছি?—যেমন কেহ স্বপ্ন হইতে জাগ্রদ-বস্থায় প্রবেশ করে; হে পাণ্ডুসুত, স্বপ্ন হইতে জাগৃতিতে আসিতে কি পায়ে ব্যথা হয়? অথবা স্বপ্নের মধ্যে কি প্রবাসযাত্রা এবং যাত্রার কষ্ট হয়? এই সমস্ত বলিবার অভিপ্রায় এই যে এই ভূতসৃষ্টির জন্য আমাকে কিছুই করিতে হয় না—ইহাই তাহার অর্থ; রাজার আশ্রয়ে প্রজাকে

যেমন আপন কার্যের জন্য সমস্ত ব্যাপার আপনাকেই করিতে হয়, প্রকৃতির সহিত সঙ্গ (সম্বন্ধ) আমার তেমনই, তাহাকেই সমস্ত কার্য করিতে হয়; দেখ, পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে সমুদ্রে অপার জোয়ার আসে, হে কিরীটী, তাহাতে কি চন্দ্রের কোনও পরিশ্রম হয়? লৌহ জড়, পরন্তু চুম্বকের কাছে আসিলে চলিতে থাকে, সান্নিধ্যের জন্য কি চুম্বককে কষ্ট পাইতে হয়? কিংবহুনা, এইভাবে আমি নিজ প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করি এবং ভূতবর্গ একেবারে প্রসূত হইতে আরম্ভ করে; হে পাণ্ডব, এই সমস্ত ভূতগ্রাম প্রকৃতির অধীন—বীজ হইতে লতা-পল্লব বাহির করিতে ভূমিই যেমন সমর্থ, অথবা দেহসঙ্গই যেমন বাল্যাদি অবস্থার মুখ্য কারণ, অথবা মেঘপুঞ্জই যেমন আকাশ হইতে বর্ষণের কারণ কিংবা নিদ্রাই স্বপ্নের কারণ, তেমনই হে নরেন্দ্র, প্রকৃতিই এই সৃষ্ট ভূত-সমুদ্রের সৃষ্টিকর্ত্রী। (১২০)

স্থাবর-জঙ্গম, স্থূল-সূক্ষ্ম—অধিক কি বলিব—সমস্ত ভূতগ্রামের মূলই প্রকৃতি; অতএব ভূতগ্রামের সৃষ্টি কিংবা সৃষ্ট প্রাণীর প্রতিপালন—এই সমস্ত কর্মের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই; জলের উপর চন্দ্রকিরণের প্রসার দৃষ্ট হয়, কিন্তু চন্দ্র তাহা (সেই প্রসার) করে না (দূরেই থাকে); তেমনই এই সমস্ত কর্ম আমা হইতে উদ্ভূত হইলেও আমা হইতে দূরে থাকে।

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥৯

সমুদ্রের জলে তরঙ্গ উঠিলে লবণের বাঁধ তাহাকে রোধ করিতে পারে না, সকল কর্মের আমাতেই অন্ত হয়। কিন্তু ঐ কর্ম কি আমাকে বাঁধিতে পারে? ধূমকণার পিঞ্জরে কি প্রবহমাণ বায়ুকে আটকানো যায়? কিংবা সূর্যবিম্বের মধ্যে কি অন্ধকার প্রবেশ করিতে পারে? আর অধিক কি বলিব? বর্ষার ধারা যেমন পর্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনই প্রকৃতির যাবতীয় কর্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির এই নামরূপাত্মক বিকারের আমিই একমাত্র আধার জানিবে, পরন্তু উদাসীনের মতো আমি কিছু করিও না, করাইও না—যেমন ঘরের মধ্যে রক্ষিত দীপ কাহাকেও কিছু করায় না, কিছু বাধাও দেয় না, আর কে কোন্ ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে দীপ তাহা জানেও না; সেই দীপ যেমন সাক্ষীভূত হইয়া গৃহব্যাপারাদি কর্মে প্রবৃত্তির হেতু হয়, তেমনই আমিও ভূতকর্মে অনাসক্ত থাকিয়া ভূতের মধ্যে থাকি। একই অভিপ্রায় (বক্তব্য) নানারূপ যুক্তি দ্বারা আর বার বার কত বলিব? হে সুভদ্রাপতি, একবার ইহাই জানিয়া লও (১৩০)—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ততে ॥১০

সমস্ত লোকচেষ্টায় (ব্যাপারে) সূর্য যেমন শুধু নিমিত্তমাত্র, তেমনই হে পাণ্ডুসুত, আমাকেও জগতের উৎপত্তির হেতুমাত্র জানিবে; আমাতে অধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতেই এই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি, সুতরাং আমিই এই উৎপত্তির হেতু (নিমিত্তকারণ)—ইহাই এ সম্বন্ধে উপপত্তি (যুক্তি)। এখন এই জ্ঞানের সত্য প্রকাশে আমার ঐশ্বরযোগ দেখিলে বুঝিবে যে ভূতমাত্রই আমার মধ্যে আছে, পরন্তু আমি ভূতের মধ্যে নাই; অথবা ভূতগণও আমার মধ্যে নাই, আমিও ভূতগণের মধ্যে নাই—এই

রহস্য তুমি কখনও ভুলিও না। আমার সমস্ত গূঢ় রহস্য তোমার কাছে প্রকাশ করিলাম, এখন ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তরে ইহা উপভোগ কর; এই মর্ম অধিগত না হইলে (বুঝিতে না পারিলে) আমার সত্য স্বরূপের উপলব্ধি হয় না—যেমন তুষের মধ্যে শস্যকণা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনুমানের সাহায্যে আমার স্বরূপ জানা যায় মনে হয়, কিন্তু মৃগজলের আর্দ্রতায় কি ভূমি সিক্ত হয়? জলে জাল ফেলিলে মনে হয় চন্দ্রবিম্বকে ধরা গেল, পরন্তু কিনারায় আনিয়া জাল ঝাড়িলে কি তাহা হইতে চন্দ্রবিম্ব পাওয়া যায়? বলো। তেমনই বাক্যের বাচালতায় বৃথাই প্রতীতির (অনুভবের) চেষ্টা করা হয়, পরন্তু যথার্থ বোধের সময় দেখা যায়—সত্যই কোনও অনুভূতি হয় নাই। —(ক্রমশঃ)

অনুপম

[ইন্দিরাদেবীর মীরাভজনের অনুবাদ]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দেখিনি তোমার মতন কাউকে শ্যামল—আমার নয়নে!
চিতচোর! আঁখির আড়াল দিয়ে আসো চিত্তে কেমনে?

অগণন আমার মতন অনাথ, কে নাথ তোমার মতন আর?
তবুও বিন্দু মজে সিন্ধুতে যেই—হয় সে পারাবার।
অকূলে কৃপার মীরা ডুবল—কেটে কূলের বাঁধনে।

বঁধু, কে তোমার মতন দয়াল, নিঠুর কে তোমার মতন?
পরশে যার মিলিয়ে যায় পলে—ধন-গৃহ-পরিজন!
মধুময় প্রেমিক—তবু দাও না ধরা চাইলে মিলনে।

বাঁধলে কেমন প্রেমে—কাটলেও যার কাটে না বন্ধন!
নাম যার যায় না ভোলা—থাকুক কি বা থাক দূরে ভুবন।
জনমে জনমে যার দাসী মীরা চায় শ্রীচরণে।

ওরা গায়ঃ তুমি ত্রিলোকপতি চক্র-সুদর্শনধারী
আমি গাইঃ তুমি গোপাল আমার হৃদি-বৃন্দাবনচারী।
হে পরম সুন্দর নাথ বন্ধু মীরার জীবন-মরণে।

স্মৃতি-কুসুমাঞ্জলি

ডাক্তার শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়*

১৯০৬ খৃঃ ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষা দিয়া শিবপুর ইঞ্জিনিয়রিং কলেজে ভরতি হইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানকার মনোনয়নের কার্ড পাওয়ার পর ইচ্ছা হইল বি.এ. পরীক্ষা দিয়া ইঞ্জিনিয়রিং পড়িব। রাজনীতিক কারণে এই সময় মোটেই পড়াশুনা করি নাই। ...১৯০৮ খৃঃ মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হইলাম।

আমাদের সাবেক বাড়ীর পাশেই স্বর্গীয় ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গদের অনেকেই সে বাড়ীতে আসিতেন। আমরা বিদ্রূপ করিতাম; তখন এদিক সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম।

আমাদের বাড়ীটি তিনমহল ছিল; বাহিরের মহলে একটি বড় উঠানে আমরা খেলাধূলা করিতাম। একদিন বৈকালে অনেকক্ষণ ধরিয়া লাফালাফি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং ঐ উঠানের দক্ষিণে বৈঠকখানা-ঘরের উত্তর বারান্দায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। উঠানের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বাটীর দ্বিতলে ডাক্তার বিপিনবাবুর শয়নকক্ষ। হঠাৎ দেখি আমার বামদিকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' নামক একটি পুস্তকের খানকতক ছেঁড়া পাতা পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্বে এই পুস্তকের নামও শুনি নাই। পাতা কয়খানি কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে লাগিলাম। এত ভাল লাগিল যে চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। সমগ্র বইখানি পড়িবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইল।

পুঁটিয়ার মহারাণীর জামাতা বিশ্বেশ্বরবাবুর ভাগিনেয় বিভূতিবাবু সিটি কলেজে বি. এ. পড়িতেন এবং আমাদের সমিতিতে আমার নিকট লাঠিখেলা শিখিতেন। সেই কারণে তাঁহার সহিত হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বইটির বিষয় কিছু জানেন কিনা। তখন ঐ পুস্তকের তিন ভাগ বাহির হইয়াছিল, তিনি আমায় তিন ভাগই পড়িতে দেন।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদিগের উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হইল। ঐ সময়ের কিছুদিন পূর্বে আমাদের সাবেক বাড়ীর কাছে 'উদ্বোধন কার্যালয়' ছিল এবং নিকটেই ছেলেরা একটি লাঠিখেলার সমিতি করিয়াছিল। আমাকে উহাদের খেলা দেখিবার জন্য দুইবার লইয়া যায়। বেলুড় মঠের জ্ঞান মহারাজ (ব্রহ্মচারী জ্ঞান) তখন ঐ স্থানে থাকিতেন। পরে শুনিয়াছিলাম উদ্বোধন কার্যালয় ওখান হইতে বাগবাজারে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে।

'কথামৃত' পাঠের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবার পর একদিন বৈকালে চিৎপুর রোড ধরিয়া লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বাড়ীতে ঢুকিয়াই বামদিকে বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ)-কে দেখিতে পাইলাম এবং অতিশয় শ্রদ্ধান্বিতভাবে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। আমার সকল পরিচয় পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ঠাকুরঘরে গিয়াছিলাম কি না। আমি বলিলাম, এখানে এই প্রথম আসিতেছি, ঠাকুরঘর কোথায় জানি না। তখন তিনি একজন সাধুকে আদেশ করিলেন—আমাকে ঠাকুরঘরে লইয়া যাইতে। আমি ঠাকুরঘরে যাইয়া দর্শন ও প্রণাম করিয়া প্রসাদ ধারণ করিয়া নীচে মহারাজের নিকটে আসিয়া পুনরায় বসিলাম।

* বিবিধ সংবাদে লেখকের পরলোকগমন-সংবাদ দ্রষ্টব্য।

সেই সময় ডাক্তার কাঞ্জিলালবাবু প্রত্যহ 'মায়ের বাড়ী'তে আসিয়া সন্ধ্যার পূর্বে শরৎ মহারাজের নিকট গান শিক্ষা করিতেন। মহারাজ তানপুরা বাঁধিয়া তাঁহাকে দিলেন—তিনি প্রথমেই 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ' এই গানটি গাহিতে লাগিলেন। ছেলেরা মিছিল করিয়া ঐ গানটি গাহিয়া যাইতেছিল, শুনিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ গান ইহার পূর্বে সভাসমিতিতে আমি বহুবার গাহিয়াছি, সেইজন্য গানটির স্থর ঠিক হইতেছে না বলিয়া আমার অস্বস্তি হইতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'ঐ গানের স্থর আপনার হইতেছে না।' তখন মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি গান জান নাকি?' আমি বলিলাম, 'মহারাজ, এই গান বহুবার গাহিয়াছি।' তখন মহারাজ আমাকে গানটি গাহিয়া শুনাইতে আদেশ করিলেন।

গান শুনিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্যামাসঙ্গীত কিছু জান কি না।' উত্তরে বলিলাম, 'কিছু কিছু জানি।' বলিয়া পাঁচ ছয়খানি শ্যামাসঙ্গীত গাহিয়া শুনাইলাম। মহারাজ গান শুনিয়া বলিলেন, 'তোমার বেশ গলা। তুমি গান শেখ, তান মান লয় শিখিলে তুমি উঁচুদরের গায়ক হইতে পারিবে।' আমি বলিলাম, 'মহারাজ, আমার গান শিখিবার খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু হইয়া উঠিবে কি না বলিতে পারি না।'

সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া আমি বলিলাম, 'মহারাজ, আমি এইবারে আসি।' আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম এবং বাটী ফিরিবার জন্য উদ্যত হইলাম। মহারাজ বাটী ফিরিবার আদেশ দিয়া বলিলেন, 'আবার এস।' সেই কথা শুনিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া বাড়ী ফিরিলাম। মনে হইতে লাগিল যে এত মিষ্ট করিয়া 'আবার এস' এই কথা বলিতে কাহাকেও কখনও শুনি নাই এবং সেইদিন হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ও মহারাজদের প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মাইল এবং নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী যাইতে লাগিলাম।

সেই সময়ে অরবিন্দঘোষ-মহাশয় 'বন্দে মাতরম্' ইংরেজী কাগজ সম্পাদনা করিতেন এবং বাংলা 'যুগান্তর' কাগজ দেবব্রতবসু-মহাশয় সম্পাদনা করিতেন। দুইজনেই বোমার মামলায় ধৃত হইলেন। অরবিন্দবাবু পণ্ডিচেরী চলিয়া গিয়া সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করিলেন এবং সেই খানেই শ্রীঅরবিন্দরূপে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দেবব্রতবাবুর বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণাভাবে প্রত্যাহৃত হইলে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর-মায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইলেন; তাঁহার নাম হইল 'স্বামী প্রজ্ঞানন্দ'। তিনি 'মায়ের বাটী'তেই বসবাস করিতে লাগিলেন। আমার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি পণ্ডিত ছিলেন এবং সকলের প্রতি সহৃদয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং সকলকেই সমান ভাবে ভালবাসিতেন। তাঁহার সঙ্গলাভে আমরা সকলেই বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম।

সাধু সজ্জন-পরিবেষ্টিত 'মায়ের বাটী'টির পরিবেশ অতি উচ্চ ধরনের ছিল। তাহার উপর যখন শ্রীশ্রীমা আসিয়া ওখানে থাকিতেন, তখন ঐ বাটীর শোভা এবং আকর্ষণ এত বাড়িয়া যাইত যে সকলেই আমরা আনন্দে ভরপুর হইয়া থাকিতাম। শ্রীশ্রীমা আহারান্তে দুধ-ভাত মাখিয়া একটি বাটিতে করিয়া আমাদিগের জন্য প্রসাদ রাখিয়া দিতেন। আমি এবং আমার মতো যাহারা প্রত্যহ বৈকালে মায়ের বাটীতে যাইত তাহারা সকলেই সেই প্রসাদ পরম আনন্দে একটু একটু করিয়া ধারণ করিত। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য প্রবোধবাবু খুব শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং বেশ মৃদঙ্গ বাজাইতে পারিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থানকালে সন্ধ্যার পর প্রায়ই গানবাজনা হইত এবং প্রবোধবাবু মৃদঙ্গ সঙ্গত করিতেন। শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজও সেই সময় আনন্দে ভরপুর হইয়া থাকিতেন। —(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

দীক্ষিতের নিত্যকর্ম ও উপাসনা—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক সংকলিত। প্রকাশক—শ্রীসতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল, সন্তোষপুর মডার্ন কলোনি, যাদবপুর, কলিকাতা—৩২। পৃষ্ঠা—২৬৪; মূল্য পাঁচ টাকা।

শাস্ত্রানুমোদিত সৎকর্মের আচরণে চিত্ত শুদ্ধ না হইলে সাধনমার্গে প্রবেশ-লাভ দুরূহ। কিন্তু 'গহনা কর্মণো গতিঃ'—কর্মপ্রধান ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন বিরাট ও জটিল বলিয়া আচরণীয় কর্মসমূহের মর্মোদ্ঘাটন সহজ নয়। দীক্ষা গ্রহণ করিলেও নিয়মিত সাধন-ভজন ও দীক্ষিতের কর্তব্য যথাযথ অনুষ্ঠানের অভাবে সাধকের জীবনে ঈশ্বরকৃপা শান্তি ও আনন্দ লাভ হয় না। যাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা গুরু-সকাশেই অনুষ্ঠান-পদ্ধতির আলোচনা করিয়া সংশয় নিরসন করিবেন। যাঁহারা উপাসনা-রহস্য জানিতে উৎসুক তাঁহারা বর্তমানকালোপযোগী সহজসাধ্য সাধনার দিগ্-দর্শন আলোচ্য গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকায় (৫৮ পৃষ্ঠা) পাইবেন সন্দেহ নাই।

পুস্তকখানিতে অকারাদি-ক্রমে একটি সূচী প্রথমেই আছে বটে, তথাপি অধ্যায়ানুযায়ী একটি বিষয়সূচীর অভাব অনুভূত হয়। গ্রন্থারম্ভে অধ্যায়-সূচী দিয়া গ্রন্থশেষে অকারাদি-ক্রমিক সূচী দেওয়া যাইতে পারে।

শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুকূল যুক্তি সহায়ে বৈধ কর্মের প্রয়োজনীয়তা স্থাপন এবং নাস্তিক্যবাদ ও অশ্রদ্ধা হইতে মনকে মুক্ত করিয়া তাহাকে অন্তর্মুখ করিবার উপায়গুলি সাধককে সাহায্য করিবে।

আনন্দই জীবের প্রকৃত স্বভাব, ব্রহ্মের জীবরূপে ভ্রান্তি, মায়া অতিক্রমণের পন্থা, ঈশ্বর নিরাকার হইয়াও সাকার, তন্ত্রের ভাবত্রয়, ভাব-শুদ্ধিই লক্ষ্যের বস্তু, ইষ্ট-সাধনার পক্ষে যৌবন-কালই অধিকতর উপযোগী, বিভিন্ন দেবদেবীর মন্ত্র-পূজা-ধ্যান-জপ-প্রণালী, দক্ষিণাকালিকার বিস্তৃত পূজা ও হোম-পদ্ধতি প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য তত্ত্বে পুস্তকটি সমৃদ্ধ।

সাধনা গুরূপদেশ সাপেক্ষ, এবং গুরুর নির্দেশানুযায়ী করণীয়। চিকিৎসার পুস্তক পড়িয়া যেমন রোগনির্ণয় বা ঔষধনির্বাচন হয় না, সেইরূপ সাধন-পদ্ধতির গ্রন্থ পড়িয়া সাধনা করা যায় না, তথাপি স্বীকার করিতে হয় ইহা খানিকটা সাহায্য করে মাত্র। —**জীবানন্দ**

সরণী—'ভাস' প্রণীত। প্রকাশক—বাণী-তীর্থ, ২৬-২বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ২॥০, পৃষ্ঠা ১৪৫।

বাংলা দেশের সজল আবহাওয়াতে আপাত-অদৃশ্য কবিত্বকণার প্রাচুর্য রয়েছে—একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। পরিচিত বাঙালীর মধ্যে এমন লোক খুব কম মেলে, যাঁরা জীবনে দু'চারবার পদ্য লেখার চেষ্টাও করেননি। এতে পরিহাসের কোন কারণ নেই। ভাবলোকের এই নীহারিকা থেকে কিছুসংখ্যক নক্ষত্র-কবি আমাদের মানস-গগনে উদিত হবেন—এমন আশা করা যায়। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার প্রতি যাঁদের আগ্রহ আছে, তাঁরাই একথা স্বীকার করবেন। দেশের বেশীর ভাগ মানুষের মনে এই কাব্যচর্চার প্রেরণা থাকার ফলে অজস্র কাব্যগ্রন্থ প্রতিবৎসরই প্রকাশিত হয়। 'ভাস'-প্রণীত সরণীও তেমনি একটি কাব্যগ্রন্থ। রচনার সার্থকতায় নয়, কবির আন্তরিকতায় এ গ্রন্থের পরিচয়। মাঝে মাঝে কয়েকটি কবিতায় ভাবের সৌন্দর্য রয়েছে—'অকাল', 'আজবদেশ', 'দিল্লী', 'বন্ধনপ্রশস্তি' প্রভৃতি কবিতা লক্ষণীয়। —**প্রণব ঘোষ**

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

নিউ দিল্লী: রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ১৯২৭ খৃঃ এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন শাখা-কেন্দ্রসমূহের মধ্যে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুদৃশ্য মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তি, ৯০০ লোকের উপবেশনোপযোগী প্রশস্ত ভাষণ-গৃহ, শিশুবিভাগ-সমন্বিত আধুনিক গ্রন্থভবন ও পাঠাগার, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম-সমন্বিত ত্রিতল যক্ষ্মা-ক্লিনিক প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য।

ইহার বর্তমান কর্মধারা:

(১) ধর্ম: নিয়মিত আলোচনা ও সময়োপযোগী বক্তৃতার মাধ্যমে বেদান্তের জীবনপ্রদ ভাব ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী-প্রচারের চেষ্টা করা হয়। দৈনন্দিন ভজন, পূজা, ধ্যান, মাঝে মাঝে রামনামকীর্তন প্রভৃতি সহায়ে সমাজে যাহাতে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয়, তাহারও ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

(২) চিকিৎসা: এই বিভাগ কর্তৃক আশ্রমে হোমিওপ্যাথিক ফ্রি বহির্বিভাগ এবং কারোলবাগে ফ্রি যক্ষ্মা-ক্লিনিক পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৪২,৪৭৬ (নূতন ১৪,০২৭)। যক্ষ্মা-বহির্বিভাগে ১০৮,৬৪৪ জন রোগী (নূতন ১,৯৩৭) চিকিৎসা লাভ করে, অন্তর্বিভাগে ৫৩১ জন রোগী (স্ত্রীলোক ২৬২) পর্যবেক্ষণ করা হয়। ৪০০টি পরিবারকে বিনামূল্যে দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছিল। গত বৎসর একটি নূতন এক্স-রে ইউনিট সংযোজিত হইয়াছে।

(৩) শিক্ষা ও সংস্কৃতি: আশ্রমে ফ্রি লাইব্রেরি ও পাঠাগার পরিচালিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা ১০,৭৫১, পঠনার্থে প্রদত্ত সংখ্যা ১০,৫৮০, দৈনিক পাঠক-সংখ্যা গড়ে ৩৫০। পাঠাগারে ১৪টি দৈনিক ও ১০৩টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। সংস্কৃত-শাস্ত্রে আগ্রহশীল বয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্য সংস্কৃত-ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। তুলসী-রামায়ণের হিন্দী আলোচনাও বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত-সমিতির উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ-হলে প্রতি রবিবার সকালে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 'পাতঞ্জল যোগসূত্রের' ক্লাস করেন। ছাত্র ও শিক্ষক মিলিয়া গড়ে শ্রোতৃসংখ্যা ১৫০।

(৪) প্রচার: আলোচ্য বর্ষে সাপ্তাহিক বক্তৃতা-সংখ্যা আশ্রমে ২৫ এবং বাহিরে ২৩; শ্রোতৃবৃন্দের মোট উপস্থিতি যথাক্রমে ৩১,০০০ এবং ৩,৬৩৫। কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং আন্তর্জাতিক ধর্মেতিহাস-সভায় আহূত হইয়া জাপানে যান, ফিরিবার পথে সিঙ্গাপুর ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জেও বক্তৃতা দেন। ভারতের বাহিরে ৩২টি সভায় ১৫,০০০ শ্রোতা যোগদান করেন। এই বৎসরের মোট বক্তৃতা ও আলোচনার সংখ্যা ২০৬, মোট শ্রোতৃসংখ্যা ৯২,০২০।

(৫) জন্মোৎসব: শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ ও নানকের জন্মদিন পূজা পাঠ ভজন আলোচনার মাধ্যমে যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য সহকারে প্রতিপালিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ৯৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ২,২৫০ ছাত্র যোগদান করে, এবং তাহাদিগের মধ্যে মোট ৩০৪টি পুরস্কার বিতরিত হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'স্বাধীন ভারতে স্বামী

বিবেকানন্দের শিক্ষা' ও 'ভারতের যুবকগণের প্রতি স্বামীজীর বাণী'। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব আশ্রমে ও দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

(৬) সারদা মহিলা-সমিতির সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক কার্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বলরাম-মন্দির (কলিকাতা) : নিম্নোক্ত ক্রম অনুযায়ী প্রতি শনিবার পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল—

	বিষয়	বক্তা
এপ্রিল :	বাংলার নবযুগ ও বিবেকানন্দ	শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়
	শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	স্বামী দেবানন্দ
	শ্রীরামকৃষ্ণ	„ জীবানন্দ
	নারদীয় ভক্তিসূত্র	পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী
মে :	বিবেকানন্দ	অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার
	শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী সুশান্তানন্দ
	গীতা	„ দেবানন্দ
	অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ	শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমন্বয়ে রামকৃষ্ণ	স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
	যোগবাশিষ্ঠে জগতের উৎপত্তি	„ জীবানন্দ
জুন :	শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী পূজা	পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
	ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশ	স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
	গীতা	„ সাধনানন্দ
	রামকৃষ্ণ-জন্মপ্রসঙ্গ	শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
	শ্রীমদ্ভাগবত	স্বামী বোধাত্মানন্দ
জুলাই :	স্বামীজী ও ৪ঠা জুলাই	„ নিরাময়ানন্দ
	শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবত	পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ
	শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ও অধ্যাপক সমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	নারদীয় ভক্তিসূত্র	পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী

চিঙ্গলেপুট (মাদ্রাজ) : এই শাখা-কেন্দ্রের ১৯৫৭ ও '৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া চিঙ্গলেপুটে সর্বপ্রথম মিশনের কাজ শুরু হয় ১৯৩৬ খৃঃ এবং ১৯৪০ খৃঃ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে এই কেন্দ্রে বালকদের উচ্চ বিদ্যালয় (ছাত্র—৪০০), বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয় (ছাত্রী—২৫৬), প্রাথমিক বিদ্যালয় (ছাত্র—২৫৭, ছাত্রী—১৯৪), ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার ও পাঠাগার (পুস্তক—৪,৭৩০ ; পত্রপত্রিকা—২২) এবং ছাপাখানা পরিচালিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাড়া নৈতিক চরিত্র গঠন ও স্বাস্থ্যচর্চার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। বাগান করা, ছাপার কাজ, অঙ্কন প্রভৃতি শেখানোর ব্যবস্থা আছে। মনোরম পরিবেশে আশ্রমটি অবস্থিত।

সেবাকার্য

রাজমহেন্দ্রী : রাজমহেন্দ্রীতে মিশন-পরিচালিত ১৯৫৬-৫৮ খৃঃ বন্যা-রিলিফের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। নদীর বন্যায় এই অঞ্চলের হরিজন অধিবাসিগণ চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়। অন্ধ্রের রাজ্যপাল তাঁহার তহবিল হইতে ২৪,০৬৫৲ দেন। ১½ একর জমি সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ইহাকে ৪০টি প্লটে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি গৃহনির্মাণে ১,২৫০ টাকা খরচ পড়ে। কলোনির জন্য মোট ব্যয় হয় ৫০,৮৪০ টাকা। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক ১৯৫৮ খৃঃ জুন মাসে এই কলোনির উদ্বোধন করেন। ৪০টি দুঃস্থ গৃহহীন হরিজন পরিবারের বাসের সুব্যবস্থা হইয়াছে। সদাশয় গবর্ণরের নাম স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে কলোনির নামকরণ করা হয় 'ত্রিবেদী নগর'।

শিক্ষাশিবির

নরেন্দ্রপুর (২৪ পরগনা) : সমাজ-শিক্ষার কার্যে নিযুক্ত কর্মিগণকে লইয়া গত ১লা জুন হইতে ১৫ই জুন পর্যন্ত সাক্ষরোত্তর শ্রেণীর কর্মসূচী সম্বন্ধে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে লোকশিক্ষা-পরিষদের পরিচালনায় মূল কেন্দ্র নরেন্দ্রপুরে

১৫ দিনের এক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। লোকশিক্ষা-পরিষদ-পরিচালিত ১৫টি শাখা-কেন্দ্রের ৩০ জন কর্মী ছাড়া বাহিরের ১৩টি প্রতিষ্ঠান হইতে ২০ জন কর্মী এই শিবিরে যোগদান করেন। প্রতিদিন ভোর ৪-৩০ হইতে রাত্রি ১০-৪৫ পর্যন্ত সময়-সূচীর মধ্যে নিয়মিত কাজ ছাড়া দৈনিক সাড়ে নয় ঘণ্টা করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। মোট ৫ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শিক্ষাব্যবস্থার ৪টি ভাগ :

১।	গ্রামে কাজ	প্রতিদিন ২ ঘণ্টা
২।	তাত্ত্বিক শিক্ষা	„ ৩ „
৩।	ব্যাবহারিক শিক্ষা	„ ৩ „
৪।	বিশেষজ্ঞ দ্বারা বক্তৃতা	১½

বিভিন্ন দিনে বক্তৃতার বিষয় ছিল : শিবির-জীবনের উদ্দেশ্য, ভারতের বাণী, বয়স্ক-শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস, গ্রামীণ নেতৃত্ব, সমাজ-শিক্ষায় ছাত্রদের ভূমিকা, যুবসমাজের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, গ্রাম্য দলাদলি ও তাহার সমাধান, সংগঠন নীতি ও পদ্ধতি, গ্রন্থাগার-সংগঠন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও গ্রাম্য জীবন, সাক্ষরোত্তর শিক্ষায় শ্রেণীবিভাগ, গোষ্ঠী-স্বাস্থ্য।

বক্তাদের মধ্যে ছিলেন : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ব্রহ্মচারী বিপ্রচৈতন্য, অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্র দত্ত-চৌধুরী, অধ্যক্ষ শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদার, শ্রীঅসীমকুমার দত্ত, ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীধনুর্ধারী বসু, শ্রীননী দত্ত, শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপরিমল কর, শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, ডাঃ বি. পি. ত্রিবেদী।

গ্রামীণ কাজের জন্য নিকটবর্তী একটি গ্রামের একটি পাড়া লওয়া হয়। সেখানে ২৩টি পরিবারের প্রায় সকলেই কুম্ভকার। স্তূপীকৃত জঞ্জাল ছাড়া ঘরবাড়ীর চারিদিকে স্তূপীকৃত ভাঙা হাঁড়িকলসীর টুকরা ছিল। শিবিরের ছাত্রেরা গ্রামবাসীদের সহায়তায় সে-গুলি পরিষ্কার করিয়া কিভাবে ঘরবাড়ীর চারিপাশ পরিষ্কার রাখিতে হয় শিখায়; সারের গর্ত, সবজিবাগান, বেড়া প্রভৃতি করিয়াও দেখাইয়া দেয়। ২য় সপ্তাহে গ্রামের রাস্তা মেরামত ও জলনিকাশের ভাল ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গ্রামবাসীদের উন্নত জীবনের পথ ধরাইয়া দেয়।

ব্যাবহারিক কাজের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির উপর জোর দেওয়া হয় :

(১) পাঠ্যবস্তু প্রণয়ন—প্রাচীরপত্র, পোস্টার, সদ্য-সাক্ষরদের জন্য বয়স্ক সাহিত্য, ছোট গল্প। (২) শ্রুতিচাক্ষুষী পদ্ধতিতে—গীতি-আলেখ্য, একাঙ্ক নাটক, ম্যাজিক লণ্ঠন, সিনেমা। (৩) হিসাব রাখা। (৪) প্রাথমিক শুশ্রূষা। (৫) দেশী খেলা। (৬) গোশালা, হাঁস-মুরগী পালন, মাছের চাষ, মৌমাছি পালন, বই বাঁধা শেখা।

১৪ই জুন শিবিরের সমাপ্তি-উৎসব পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব ডক্টর ডি. এম. সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কৃতী প্রতিযোগী-দিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারি শ্রীবি. বি. ঘোষ। সভান্তে শিক্ষার্থীদের রচিত একটি গীতি-আলেখ্য ও একটি একাঙ্ক নাটকের অভিনয় হয়।

অতিথিভবন-উদ্বোধন

বাঁকুড়া : গত ২৬শে জুলাই, বেলা ৯ঘটিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ কর্তৃক বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 'শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী স্মৃতি' অতিথি-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন-কার্য সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে বাঁকুড়া জেলাশাসক শ্রীরণজিৎ ঘোষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় স্থানীয় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দজী অতিথি-ভবনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন। সভায় শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বক্তৃতা-সূচী

গত মে ও জুনমাসে বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ কলিকাতা নগরী ও তাহার উপকণ্ঠে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দেন:

স্থান	বিষয়
বাগবাজার, বলরাম-মন্দির	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ, ধর্মজীবনের ক্রম-বিকাশ
বেলুড়মঠ, ট্রেনিং সেণ্টার	মহাপুরুষদের পুণ্যস্মৃতি
রহড়া, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম	সফল জীবন
বারাসত, শ্রীরামকৃষ্ণ শিবানন্দ আশ্রম	মহাপুরুষ শিবানন্দজীকে যেরূপ দেখিয়াছি
কাশীপুর ক্লাব	প্রাচীন ও নবীন ভারত
সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ	যিনি বিবেকানন্দকে গড়িয়াছিলেন
শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রম	ভারতীয় বালিকাদের জীবনাদর্শ
নরেন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম	ছাত্রজীবন
টালিগঞ্জ, জয়শ্রী সেবাপ্রতিষ্ঠান	শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের বৈশিষ্ট্য
ঢাকুরিয়া, পল্লীমঙ্গল-সমিতি	শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্ব
শ্যামপুকুর সারদা সংসদ	ভারতীয় নারীর আদর্শ

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

নিউইয়র্ক : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার—প্রতি রবিবার বেলা ১১টার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়:

এপ্রিল: মানুষের দৈব উপাদান, আচার্য শঙ্করের জীবন ও বাণী, শুদ্ধচৈতন্য সম্বন্ধে সচেতনতা, ধ্যানের প্রণালী।

মে: প্রকৃত এবং প্রতীয়মান সুখ, আধ্যাত্মিক জ্ঞানদীপ্তি। [এ পর্যন্ত স্বামী ঋতজানন্দ একাই চালাইতেছিলেন, অতঃপর স্বামী নিখিলানন্দ ভারত হইতে ফিরিয়া আসেন।] ভারতে যাহা দেখিয়াছি, বুদ্ধবাণী, আত্মার সন্ধানে মানুষ।

জুন: হিন্দুধর্ম ও আধুনিক সংশয়, ঈশ্বরের প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু কে? আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা, যোগানুভূতির প্রকারভেদ।

প্রতি মঙ্গলবার ধ্যান ও নারদীয় ভক্তিসূত্রের ক্লাস এবং প্রতি শুক্রবার উপনিষদ্ অধ্যাপনা ও আলোচনা করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ভক্ত ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ১৫ই শ্রাবণ শুক্রবার শেষ রাত্রে ৭২ বৎসর বয়সে কম্বুলিয়াটোলায় নিজ বাসভবনে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের পরম ভক্ত ডাক্তার শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল তিনি রোগ ভোগ করিতেছিলেন এবং গত বৎসর একটি অস্ত্রোপচারের পর হইতে শয্যাগত ছিলেন।

ছাত্রজীবনেই শ্যামাপদ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-সহচরগণের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁহাদের বিশেষ স্নেহ ও কৃপা লাভ করেন। তিনি ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষালাভ করিয়া সংসার-জীবনে উত্তম ভক্তের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাশ করিয়া তিনি উত্তর কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার বিপিন বিহারী ঘোষ-মহাশয়ের সহকারীরূপে কাজ আরম্ভ করেন। উদ্বোধনে, মঠে ও বলরাম-মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচরগণের চিকিৎসা ও সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

উদ্বোধনের এই সংখ্যায় তাঁহার লিপিবদ্ধ 'স্মৃতি-কুসুমাঞ্জলি'র প্রথমাংশ প্রকাশিত হইল। শরণাগত ভক্তের আত্মা শান্তি লাভ করিয়াছে। তাঁহার সহধর্মিণী কয়েক বৎসর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছেন, আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

খাদ্য-পরিস্থিতি

১৯৫৮-৫৯ খৃঃ পৃথিবীতে ১৩'৫ কোটি টন ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে, গত বৎসর হইতে প্রায় ৯০ লক্ষ টন বেশী। পাকিস্তান ও কাম্বোডিয়া ছাড়া এশিয়ার সর্বত্রই ভাল বর্ষার দরুন বেশী ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। পাকিস্তানে এবার গমের ফলন প্রচুর হয়। অভাবের দেশসমূহে যথেষ্ট ফলনের জন্য বৎসরের প্রথম দিকে আমদানি-রপ্তানি অন্য বৎসরের তুলনায় এবার কম ছিল, তবে ভারতকে প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশের চাল আমদানি করিতে হয়।
[F.A.O. হইতে সংকলিত]

আমেরিকায় দেশবিদেশের ভাষাশিক্ষা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নূতন কর্মসূচী অনুসারে ব্যাপকভাবে এশিয়ার ও আফ্রিকার ভাষা ও কৃষ্টি শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, তামিল ও তেলুগু শেখানো হইবে।

শিক্ষা স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগের সেক্রেটারি আর্থার ফ্লেমিং বলেন: অপর দেশের শুধু ভাষাই যে আমাদের শিখতে হবে তা নয় তাদের অর্থনীতি এবং কৃষ্টিও আমাদের জানতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই কর্মসূচীতে ৩০ লক্ষ ডলার খরচ করবেন, সারা যুক্তরাষ্ট্রে ছড়ানো ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। ২০০ জন গ্রাজুয়েটকে হিন্দুস্থানী, রাশ্যান, চীনা, আরবী, জাপানী ও পোর্টুগীজ ভাষা শেখবার জন্য ফেলোশিপ দেওয়া হবে। ২০টি গবেষণা-পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া হয়েছে—ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। [USIS—হইতে সংকলিত]

ভারতীয় বিজ্ঞানের গুণগান

সম্প্রতি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুবকদের বিজ্ঞান-পক্ষে (International Youth Science Fortnight) বৃটিশ বৈজ্ঞানিক সার আলেকজাণ্ডার ফ্লেক তাঁহার সাম্প্রতিক ভারত ও পাকিস্তান সফর উল্লেখ করিয়া বলেন: ভারত বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিয়া নানা দিকে উন্নতি করিতেছে, আগামী আণবিক যুগের জন্যও ভারতে যথেষ্ট মোনাজাইট মজুত আছে।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমশঃ বিজ্ঞানের জটিলতর সমস্যা-সমাধানে সক্ষম হইতেছেন, এবং তাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের সুখ-সুবিধা কাজে লাগাইতে অগ্রসর। যদিও ভারতে তিন চতুর্থাংশ লোক লিখিতে বা পড়িতে জানে না, তথাপি বিজ্ঞানের নানা বিভাগে শিক্ষিত যথেষ্ট গ্র্যাজুয়েট আছেন—যাঁহারা যন্ত্রশিল্পের সকল দিক না হইলেও বর্তমানের বহু প্রয়োজন মিটাইতে পারেন।

সার আলেকজাণ্ডার প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিভারও সুখ্যাতি করিয়া বলেন: জল-সরবরাহ ও জলনিকাশ-বিজ্ঞানের নিদর্শন মহেন্‌জোদাড়োয় দেখিয়াছি। রোমানরা বৃটেনকে সভ্য করিতে আসার পূর্বেই ভারত ইস্পাত প্রস্তুত করিয়া রপ্তানি করিতে শুরু করিয়াছে। বীর আলেকজাণ্ডারকে তিন টন ইস্পাত প্রদত্ত হয়—একথা ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের মধ্য দিয়াই ইস্পাত সিল্ক কাগজ কাচ ও বিস্ফোরকদ্রব্য-প্রস্তুতপ্রণালী ইওরোপের দিকে গিয়াছে। একজন ভারতীয়ই পঞ্চম শতকে ত্রিকোণমিতির সাইন (Sine)—সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলির অনুপাত ধারণা করেন।

পরিশেষে তিনি বলেন: এই সব দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইবে বিজ্ঞানের বিস্তৃতি একমুখী নয়, আজ প্রাচ্যদেশগুলি পশ্চিম হইতে বিজ্ঞান শিখিতেছে। আমরাও তাহাদের কাছে বিপুল ভাবে ঋণী।

উৎসবে ও নিত্যপ্রয়োজনে
শতাব্দীর সুপরিচিত
লক্ষ্মীবিলাস
সর্ব্বঋতুর উপযোগী তৈল
এম,এল,বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস • কলিকাতা-৯

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সরল রাজযোগ—৪র্থ সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি বুলের বাড়ীতে কয়েক জন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্ত্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ০'৫০।

পত্রাবলী—১ম ভাগ। অভিনব পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। প্রায় ৫৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামিজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজান হইয়াছে। পরিচয় এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবিসম্বলিত। মূল্য ১ম ভাগ ৫৲; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪'৫০।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৩শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামীজির ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৬৪৬ পৃষ্ঠা মূল্য ৫৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪'৬৫।

দেববাণী—৮ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান' নামক স্থানে কয়েক জন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন তাহার একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১'৯০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৩য় সংস্করণ। শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিক-ভাবে সন্নিবেশিত। ১৭০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'৫০।

বিবেক-বাণী—১৬শ সংস্করণ। আচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজীর উপদেশাবলী। স্বামীজির বাষ্টসম্বলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। মূল্য ০'৪০।

কথোপকথন—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামীজির ছবি-যুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১'১৫।

মদীয় আচার্য্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১০ম সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষাসম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামিজীর বিবৃতি। মূল্য ০'৭৫; উঃ-গ্রাঃ-পক্ষে ০'৭০।

ভারতীয় নারী—১২শ সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান আদর্শ, পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজির মনোরম ছবি-সম্বলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১২০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১'১৫।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান—৭ম সংস্করণ, ১৩১ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদান্ত-মত বিশেষরূপে আলো-চিত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে আর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ—যে গুলি না বুঝিলে ধর্ম জিনিষটাকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ১'২৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১'১৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৪শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়ভরতের-উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্য গণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট ও ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। মূল্য ১'২৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১'১৫।

সন্ন্যাসীর গীতি—১৩শ সংস্করণ। স্বামীজি-রচিত 'Song of the Sannyasin' নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ০'১৫।

পওহারী বাবা—৯ম সংস্করণ। গাজীপুরের বিখ্যাত মহাত্মা পওহারী বাবার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। স্বামীজির হাফটোন ছবিযুক্ত। মূল্য ০'৫০।

হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ—৫ম সংস্করণ, ৮৮ পৃষ্ঠা। ইহাতে হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা, হিন্দুধর্মের ক্রমাভিব্যক্তি, ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর ও ডাঃ পল ডয়সেন সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মূল্য ০'৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ০'৭০।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৪র্থ সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০'৪০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ০'৩৫ আনা।

অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৪র্থ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। এই পুস্তক পাঠে চরিত-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ১·২৫।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য প্রণীত—৪র্থ সংস্করণ; আচার্য্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲ মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা—৫ম সংস্করণ। স্বামী অরূপানন্দ প্রণীত। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা পুস্তক হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। মূল্য ০·৪০।

ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য ২৲ টাকা।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—২য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। প্রায় ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩·৫০।

শিবানন্দ-বাণী—১ম ভাগ—৪র্থ সংস্করণ, ২য় ভাগ—২য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ সঙ্কলিত মূল্য প্রতি ভাগ ২·৫০।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। প্রথম ভাগ—(ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর) ৫ম সংস্করণ। দ্বিতীয় ভাগ—(ছান্দোগ্য) ৪র্থ সংস্করণ। তৃতীয় ভাগ—(বৃহদারণ্যক) ৩য় সংস্করণ। ইহাতে উপনিষদের মূল, সংস্কৃত, অন্বয়মুখে বাংলা প্রতিশব্দ, সরল বঙ্গানুবাদ এবং আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যানুযায়ী দুরূহ বাক্যসমূহের টীকা প্রভৃতি আছে। সুদৃশ্য ছাপা, কাপড়ের মনোরম বাঁধাই, ডবল ক্রাউন—১৬ পেজি, প্রায় ৪৬৫ পৃষ্ঠা। মূল্য—প্রতি ভাগ ৫৲ টাকা।

সাধু নাগ মহাশয়—৯ম সংস্করণ। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ১·৫০ মাত্র।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ প্রণীত (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত) অতুলনীয় সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত 'গোপালের মা' এর আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ০·৫০।

নিবেদিতা—১৩শ সংস্করণ। শ্রীমতী সরলা বালা দাসী প্রণীত। স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা। মূল্য ০·৭৫

সৎকথা—স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক সংগৃহীত—৩য় সংস্করণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ (শ্রীলাটু) মহারাজের উপদেশাবলীর সংকলন। মূল্য ২৲ টাকা।

যোগচতুষ্টয়—স্বামী সুন্দরানন্দ প্রণীত। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগের সংক্ষিপ্ত সরল বিবরণ। মূল্য ২৲ টাকা।

বেদান্তদর্শন—১ম খণ্ড—চতুঃসূত্রী। শাঙ্কর ভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ, রত্নপ্রভা টীকা, ভাব-দীপিকা ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্বলিত। প্রায় ২৪৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ টাকা।

স্তবকুসুমাঞ্জলি—৫ম সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত—বৈদিক শান্তিবচন, সূক্ত, প্রার্থনা ইত্যাদি বিবিধ সংস্কৃত স্তোত্রাদির অপূর্ব্ব সঙ্কলন। সংবাদপত্রসমূহে উচ্চ প্রশংশিত। মূল সংস্কৃত, অন্বয়, অন্বয়মুখে সংস্কৃতের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং মূলের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৩৲ টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৬ষ্ঠ সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ০·৬৫।

আগে চলো—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। কিশোরদের জন্য লেখা। তরুণমনে সুনীতি, দেশাত্মবোধ, সেবা, আদর্শনিষ্ঠা এবং ধর্মপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক যৌবনোন্মুখ ছেলেমেয়েকে এই বইখানি পড়িতে দেওয়া উচিত। মূল্য ১·৫০।

হিন্দুধর্ম পরিচয়—১ম ও ২য় ভাগ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সরল কথায় হিন্দুধর্মের মুখ্য বিষয়গুলির সহিত পরিচিত চেষ্টা এই বই দুখানিতে করা হইয়াছে। মূল্য ১ম ভাগ ০·৫০, ২য় ভাগ ০·৭৫।

দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য ও পূজা-পদ্ধতি—স্বামী কৈবল্যানন্দ প্রণীত। মূল্য ১ম ভাগ (পরিবর্দ্ধিত ৪র্থ সংস্করণ ০·৮৮, ২য় ভাগ (৩য় সংস্করণ) ১·৫০।

ঠাকুর এবার এসেছেন

ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। এবার বাঁশ ও ঘাস ছাড়া যার ভেতরে একটু সার আছে সেই চন্দন হবে। তোমাদের ভাবনা কি ?···

সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ-মন ভাল থাকে।···কাজ করতেই হয়। কর্মেই কর্মপাশ কাটে। কাজ ছাড়া থাকা ঠিক নয়।············

—শ্রীমা

● ● ●

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী অদ্বয়ানন্দ ; ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, এম. আই. প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

Udbodhan-Phone : 55-2447 : August 1959 : Regd. No. C. 295
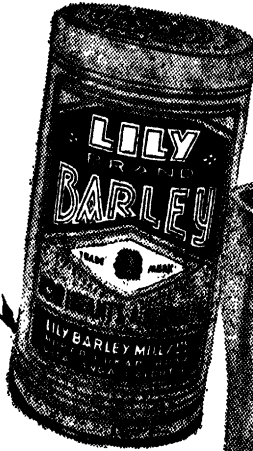
সম্পাদক—স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন

শারদীয়া সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৬৬
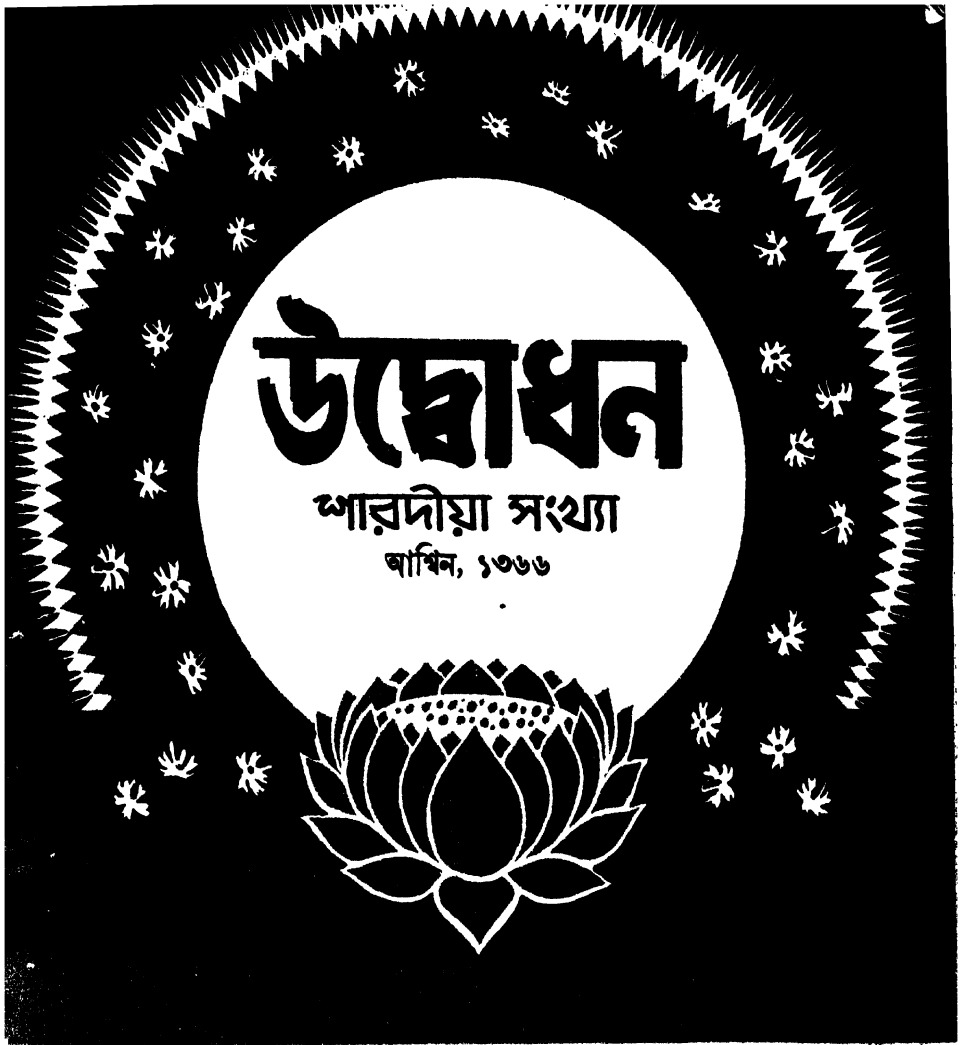
উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা - ৩

৬১তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

এই সংখ্যার মূল্য ১'২৫

শারদোৎসবে
আমাদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিবাদন
গ্রহণ করুন।

শক্তির-আরাধনা

"মা তোমার কৃপাদৃষ্টি
সমভাবে সুধাবৃষ্টি,
শত্রু মিত্র সকলের উপরেই করো গো,
সমভাবে ধনী-দীনে,
রক্ষা কর নিশিদিনে,
মৃত্যু বা অমৃত, দু'য়ে তব কৃপা ঝরে গো,
যাচি পদে, নিরুপমে,
ভুলো না মা, এ অধমে,
শুভদৃষ্টি তব যেন সর্বতাপ হরে গো।"
"তোমারি প্রসাদে তুমি সদা মোরে রাখিছ,
তুমি গতি মোর তাই স্নেহে, মা পালিছ।"

(সংস্কৃত 'অম্বা স্তোত্রম্' হইতে)

—স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৬৬

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

৭০ বৎসর সততার সহিত পরিচালিত
অক্ষয় কুমার লাহা
১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা
ইমারতের
মটর গাড়ীর
সিনেমার
কারখানার
"রেডিয়াম" মার্কা
চিরস্থায়ী
সিমেন্ট-কলার
KEY
BRAND
PAINTS
ফোন : ২৩-২৭৬৫
গ্রাম : "কলারম্যান"

ব্রুক বণ্ড চা
Brooke
Bond
Darjeeling
লক্ষ লক্ষ লোকের প্রিয়
BB 328 D
ব্রুক বণ্ড ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

ফোন: ৩৪-৪৯৮২
বিখ্যাত স্বর্ণশিল্পী ও
গ্রহরত্নকার
অন্নপূর্ণা জুয়েলারী হাউস
৮৫, বড়বাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২
গ্যারান্টী যুক্ত গিনি সোনার গহনার
প্রতিষ্ঠান। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য
১৷৷০ টাকার ডাকটিকিট সহ পত্র লিখুন।

কাশি!
তাড়াতাড়ি আরাম
আর
নিরাময়ের জন্য
বি. আই. কফ সিরাপ
বেঙ্গল ইমিউনিটি
COUGH
SYRUP

শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম্

ব্রহ্মচারি-মেধাচৈতন্য-বিরচিতম্

যামারাধ্যামররিপুবরো রাবণো বাহুদর্পা-
ল্লঙ্কারাজ্যং কনকরচিতং শাসদাসীদবাধম্।
বিষ্ণূ রামো নয়নকমলেনাপি সংতোষয়ংস্তাং
রক্ষোরাজং তৃণমিব শিখী নাশয়ামাস জিষ্ণুম্ ॥১॥

রুদ্রঃ শূলী স্বয়মপি বিধির্যদ্ভয়ান্মুদ্রিতাক্ষঃ
শেতে ভূমৌ শব ইব শিবো রূপমস্যাঃ স্মরন্ সঃ।
দক্ষেজ্যায়াং তনুমপি যদা হীয়মানাং যদীয়াং
স্কন্ধারূঢ়াং বহতি বিপুলং ভারতং সা শরণ্যা ॥২॥

যদ্দেহাংশা ভরতবসতাকেকপঞ্চাশদস্যাং
পীঠক্ষেত্রায়তনসুকৃতিস্থানরূপাণি জগ্মুঃ।
যামাশ্রিত্য প্রথমপুরুষঃ সৃষ্টিকার্যং বিদধ্যৌ
সাম্প্রাকন্ত প্রকৃতজননী সৈব পূজ্যা শরণ্যা ॥৩॥

বিশ্বারাধ্যা ভবতি জননী বিশ্বাভূতাঽদ্বিতীয়া
দৃশ্যং সর্বং তব বিলসিতং নৈব কিঞ্চিদ্ধৃতং স্যাৎ।
কালার্কাগ্নিগ্রহসুরপতিব্যোমবায্বগ্নিসিন্ধু-
ক্ষিত্যাদ্যাস্তে জড়চিতিগণাঃ ক্বাসতে ত্বাং বিহায় ॥৪॥

কিংবা সর্বং ন বিতথমিদং সত্যমেব ত্বদীয়ং
কার্যং মিথ্যা ভবতি নু কথং কারণে তত্ত্বভূতে।
লীনং দৃষ্টং যদপি চ ভবেদ্বর্ততে তদ্বিধাত্র্যা-
মুদ্ভূয়াপি প্রথিতমখিলং ত্বত্ত এব প্রকৃত্যাঃ ॥৫॥

অনুবাদ—যাঁহাকে আরাধনা করিয়া দেবগণের প্রবল শত্রু রাবণ বাহুদর্পে নির্বিঘ্নে সুবর্ণরচিত লঙ্কারাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, স্বয়ং বিষ্ণু শ্রীরামচন্দ্ররূপে নয়নপদ্মের দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিজয়ী হইয়া অগ্নি যেমন তৃণ ভস্মীভূত করে সেইরূপ সেই রাক্ষসাধিপতিকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥১॥

ত্রিশূলধারী রুদ্র শিব স্বয়ং বিধাতা হইয়াও যাঁহার ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইঁহার রূপ স্মরণ করিতে করিতে ভূমিতে শবের মত শয়ন করেন, এবং দক্ষের যজ্ঞে যাঁহার বিগ্রহ পরিত্যক্ত হইলে সেই মূর্তি স্কন্ধে ধারণ করিয়া বিশাল ভারতভূমি ভ্রমণ করেন, তিনি (আমাদের) শরণ্য ॥২॥

যাঁহার দেহের অংশসকল এই ভারতবর্ষে একপঞ্চাশৎ পুণ্যস্থানরূপ পীঠক্ষেত্র হইয়াছে, প্রথম পুরুষ (বিরাট্) যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিকার্যের চিন্তা করিয়াছিলেন—তিনিই আমাদের প্রকৃত জননী, তিনিই পূজ্য, তিনিই শরণ্য ॥৩॥

জননী বিশ্বের আরাধ্যা বিশ্বরূপা অদ্বিতীয়া। সমস্ত দৃশ্য পদার্থ তাঁহার লীলাবিলাস—কিছুই পৃথগ্ভাবে সত্য নয়। কাল, সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, গ্রহ, আকাশ, বায়ু, তেজ, সমুদ্র, পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত জড় ও চেতন পদার্থ, তিনি ছাড়া কোথায় থাকে ? ॥৪॥

অথবা কিছুই মিথ্যা নয়, সবই সত্য। (হে মাতঃ!) কারণস্বরূপ তুমি যখন সত্য, তখন তোমার কার্য কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে ? যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়া প্রথিত হইতেছে, যাহা কিছু বর্তমান, যাহা কিছু লয় পাইতেছে, সে সমস্তই প্রকৃতিভূত তোমা হইতেই হইতেছে ॥৫॥

শারদা বরদা এস মা জননী

শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

শা রদা বরদা এস মা জননী দশভুজা ভগবতি !
র ঞ্জিত করি ভূলোক দ্যুলোক দশদিকে তুলি জ্যোতি।
দা ক্ষায়ণি, মাগো তোমার পূজার ঘটা কিবা ঘরে ঘরে,
ব ন্দনা-গীতি গাহে বিহগেরা বন-মন্দিরে ভোরে।
র ক্ত কমল স্বচ্ছ সায়রে উঠিয়াছে শত ফুটি,
দা নিতে অর্ঘ্য পূজিতে মা তব রাতুল চরণ দুটি।
এ কান্তে বসি সেবিকা শেফালী গাঁথিছে হীরকহার,
স মীরণ সদা সিঞ্চিয়া চলে শূন্যে সুরভিসার।
মা লা গেঁথে যায় লতায় পাতায় ; ছড়ায়ে সবুজ শাখা
জ ননি, তোমার অঙ্গ ব্যজনে শাখীরা দুলায় পাখা।
ন দী-সৈকতে প্রান্তরে ক্ষেতে নিত্য দিবস রাতে ;
নী রবে বসিয়া কাশ-কুমারীরা শুভ্র চামর হাতে।
দ শদিকে ঐ বাজে নহবত—দোয়েল-শ্যামার শিস ;
শ রৎ তোমাকে শ্যাম-সুষমায় সাজায় অহর্নিশ।
ভু বনে ভুবনে তোমার পূজার চলিতেছে আয়োজন ;
জাগো মহামায়া জাগাও মোদের সুপ্তিমগন মন।
ভ য়ে ভীত মাগো মর্ত্য-মানব সদা সঙ্কটে পড়ি ;
গ নিছে প্রহর অসুর-নাশিনি, তব আশাবাণী স্মরি।
ব রদার বেশে পলকের তরে দেখা দাও মহামায়া ;
তিরোহিত হোক যতেক মোদের দুঃখশোকের ছায়া।

কথাপ্রসঙ্গে

মাতৃভাবের মাধুর্য

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য আমাদিগকে অভিভূত করে, প্রেমস্বরূপের সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ হই, মাতৃভাবের মাধুর্যে আমরা ডুবিয়া যাই।

সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী ঈশ্বরের বিরাট বিশ্বে চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা—নদীসমুদ্র বনপর্বত প্রত্যক্ষ করিতে করিতে, নিত্যনিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতির ঋতুনৃত্য উপভোগ করিতে করিতে আমরা সৃষ্টিকর্তাকেই ভুলিয়া যাই।

বহির্মুখী ইন্দ্রিয়নিচয় চলিয়াছে নিজ নিজ ভোগ্যবিষয়-সন্ধানে—চক্ষু চলিয়াছে রূপের সন্ধানে, কর্ণ ছুটিয়াছে ধ্বনির সন্ধানে, মনোমত রূপরসগন্ধশব্দ-স্পর্শের সন্ধানে জীবনের এই অভিযান!—কোথায় এর আদি? কোথায় এর অন্ত? 'কবে আমি বাহির হলাম?'—কোথা হইতে? কেন? কাহার আশায়?

স্থূল সূক্ষ্ম বহু বিষয় গ্রহণ করিয়া, বর্জন করিয়া ক্লান্ত মন যখন প্রশ্ন করে: 'কী আমার ঈপ্সিত-তম? কোথায় আমার বিশ্রাম-স্থান? কবে আমার যাত্রা শেষ?' তখনই শুরু হয় প্রত্যাবর্তনের পালা—উৎসমুখ সন্ধানের অভিযানে! মন হয় অন্তর্মুখী, কর্ণ শোনে দূরাগত বংশীধ্বনি, চক্ষে ভাসে প্রেমময়ের প্রতিচ্ছবি! পটীয়সী নর্তকী প্রকৃতি আর পারে না দর্শকের মনকে মুগ্ধ করিতে—আর পারে না তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে! শ্রান্ত ক্লান্ত মন তখন ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল।

কে আছে ঘরে? কে সেখানে তাহার জন্য অনন্তকাল অনিমেষ-নয়নে প্রতীক্ষা করিতেছেন? কে নিশ্চয়ই জানেন—খেলার শেষে ক্লান্ত শিশু তাঁহারই কাছে ফিরিয়া আসিবে, ছুটিয়া আসিবে—বিশ্রামের জন্য—ঘুমাইয়া পড়িবার জন্য—ক্ষয়ক্ষতির পর পরম পুষ্টির জন্য!

মায়ার খেলার পরে মহামায়ার লীলা শুরু! ঈশ্বরের ঐশ্বর্য আমাদিগকে বিস্ময়বিহ্বল করে; প্রেমস্বরূপের সৌন্দর্য আমাদের মন প্রাণ আকর্ষণ করে; মাতৃভাবের মাধুর্যে মগ্ন হইয়া আমরা আত্মহারা হই, আমাদের হারানো স্বরূপ ফিরিয়া পাই! উৎসেরই বুকে পরিসমাপ্তি; যেখান হইতে যাত্রা শুরু সেইখানেই তো যাত্রা শেষ!

স্বামী আত্মবোধানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৯ই সেপ্টেম্বর (২৩শে ভাদ্র) বেলা ১১-৪৮মিঃ সময়ে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি (ও রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির সদস্য) এবং বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের ও উদ্বোধন-কার্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মবোধানন্দ ৬৮ বৎসর বয়সে মূত্রাশয়বিকার রোগে উদ্বোধন-ভবনে (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে) দেহত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি রক্তচাপ ও বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন; শেষ কয়েক মাস মূত্রগ্রন্থির (kidney) রোগই তাঁহার প্রধান কষ্টের কারণ হইয়াছিল। কলিকাতার হৃদ্রোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত দীর্ঘ দিন ধরিয়া স্বয়ং তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই রোগযন্ত্রণার অনেকটা উপশম হইত। শেষ দিন বেলা ১১॥টায় ভোগ নামার পর ঠাকুরঘর বন্ধ হইলে স্বামী আত্মবোধানন্দ স্নানচেষ্টার সময় সহসা কিছুক্ষণ হৃদ্‌যন্ত্রে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন, এবং চরণামৃত ধারণের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম শুনিতে শুনিতে তিনি চিরনিদ্রিত হন। প্রবল বারিবর্ষণ ও দুর্যোগ সত্ত্বেও বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে উত্তর কলিকাতায় কাশীমিত্র শ্মশানঘাটে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে তাঁহার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

স্বামী আত্মবোধানন্দ ১৮৯১ খৃঃ (১২৯৮, আষাঢ়) ময়মনসিংহ জেলায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং চার বৎসর বয়সেই মাতৃহীন হন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম সত্যেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এবং পৈতৃক বাসভূমি নেত্রকোণা মহকুমার নওপাড়া গ্রাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিত শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর স্বামী বিবিদিষানন্দ বিংশাধিক বর্ষ যাবৎ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে সিয়েটল্ শহরে রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ।

বাল্যকালেই সত্যেন্দ্রের মন আর্তসেবার জন্য ব্যাকুল হইত; বিদ্যালয়ে পাঠের সময়ই দেশের পরাধীনতা তাঁহাকে ব্যথিত করিত এবং তাঁহার মন দেশসেবার দিকে আকৃষ্ট হইত। ১৫ বৎসর বয়সে একবার একটি কলেরা-রোগীকে সৎকার করার পর জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া তিনি হরিদ্বারে চলিয়া যান। ১৯১৪ খৃঃ তিনি ৺কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান করেন; এবং পরবৎসর মায়াবতী (হিমালয়) অদ্বৈত আশ্রমের কর্মী হইয়া সেখানে যান। এই স্থান হইতে তিনি দুর্গম কৈলাস এবং পরে অমরনাথ প্রভৃতি হিমালয়-তীর্থ দর্শন করেন।

১৯২০খৃঃ তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সময় কলিকাতার কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের যে প্রকাশন-বিভাগটি খোলা হয়, স্বামী আত্মবোধানন্দ 'উদ্বোধনে' থাকিয়া তাহার পরিচালনা করিতেন।

১৯২৬ খৃঃ সংঘের প্রথম মহাসম্মেলনের (Convention) সময় তিনি বেলুড় মঠে আসেন এবং নবগঠিত ওআর্কিং কমিটির অন্যতর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২৯ খৃঃ জুলাই মাসে স্বামী বিরজানন্দজীর সহকারীরূপে তিনি বাগবাজার মঠে আসেন, এবং উদ্বোধন-কার্যালয়ের কার্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৩০ ডিসেম্বর হইতে এই কেন্দ্রের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। শেষ দিন পর্যন্ত অক্লান্তভাবে এবং কৃতিত্বের সহিত তিনি এই গুরু দায়িত্ব বহন করিয়া গিয়াছেন।

স্বামী আত্মবোধানন্দ

১৯২৯ হইতে ১৯৪৫ খৃঃ পর্যন্ত তিনি মিশনের বাগবাজারে অবস্থিত নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বেলুড়ে অবস্থিত মিশন সারদাপীঠের প্রথমে তিনি সহসভাপতি ছিলেন, সম্প্রতি সভাপতি হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি ও বহুবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি অনাথ ভাণ্ডারেরও তিনি সভাপতি ছিলেন।

কাজকর্মে শৃঙ্খলা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ, প্রকাশনার ক্ষেত্রে শিল্পচেতনা, সঙ্ঘের ও বাহিরের প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ব্যাপারে শান্ত ধীর সুবিবেচনা, সকলের সহিত—বিশেষভাবে প্রতিবেশীদের সহিত অমায়িক ব্যবহার এবং তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি ও বিপদে আপদে পরামর্শদান—সব মিলিয়া একটি স্নেহকোমল সরল সুন্দর সাধুজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহা আজ চোখের অন্তরালে চলিয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে তাঁহার অভাব অপরিপূরণীয়। সন্ন্যাসীর দেহমুক্ত আত্মা চির শান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

চলার পথে

'যাত্রী'

তুমি কে মা? এমন ক'রে, আমাদের সকল জীবন ভ'রে, আমাদের সকল শিক্ষায় ব্যাপ্ত হ'য়ে, আমাদের সর্ব-ভাবের আঙ্গিনা ঘিরে ও আমাদের সমস্ত উন্নতির পরিবেশকে ধ'রে র'য়েছ;—রয়েছ আমাদের জীবনের সকল সম্ভাবনার স্বাভাবিক স্বরূপতায়!

আমাদের এই প্রিয় দেহের সৃষ্টি-সহায়ক তুমি—তার পরিপোষণ ও পরিপালনেও তোমার আন্তরিক অবদান অবারিত। শুধু কি তাই! তোমার মাতৃমূর্তি'র কল্যাণ-অঙ্ক না পেলে কি আমরা এই পৃথিবীর আলো আশা ও আনন্দকে আপনার ক'রে নিতে পারতাম? পারতাম কি আমাদের ধমনীতে উষ্ণ প্রস্রবণ বহাতে, তোমার স্তন্য-সুধার অমৃত-আস্বাদন না পেলে?

আমাদের জীবনের প্রতিটি অণুতে অনুস্যূত রয়েছে তোমার দান, প্রতিটি চিন্তায় বিজড়িত রয়েছে তোমার স্মৃতি, চলা-ফেরার প্রতিটি ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে তোমার শক্তি, জীবনের সবখানিকে ঘিরেই তোমার লীলাখেলা চলেছে, মা! নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিকতার মত তা আবার এমন সহজ ক্রমে ও পরম প্রেমে উৎসারিত হচ্ছে যে আমাদের জীবনের সবকিছুকেই যে তুমি প্রথম চালিয়ে দিয়েছিলে—তার প্রারম্ভিক গতি দিয়েছিলে—তা মনে রাখতেই ভুলে যাই! ভুলে যাই—এ পৃথিবীতে আসার আগে তোমারই জঠরে থাকার সময়, তোমার ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা, তোমার পুষ্টির সঙ্গে আমাদের পুষ্টি, তোমার স্পন্দনের ছন্দে আমাদের স্পন্দনের সমতানতা পরিবাহিত হয়েছিল ব'লেই আমরা আজ মানুষ হ'তে পেরেছি! তোমার জীবনের ঘড়ির সঙ্গে প্রথম ঘড়ি মিলিয়ে নিয়েছিলাম ব'লেই তো আজও সময়বোধ যায়নি, জীবনবোধও হারাইনি! তোমার জীবনের কণা কণা কুড়িয়েই তো আমরা গেঁথেছি আমাদের জীবনের স্বর্ণ-হার। তা ছাড়া আমাদের জীবন-সত্তায় তোমারই জীবনসত্তার গোপন পরিক্রমা আজও চলেছে অব্যাহত—এ কথা যখন ভাবি, তখন আমাদের জীবনে যে তোমার জীবন সর্বতোভাবে বিধৃত এই কথাই মনে জাগে!

এত দিয়েও, আমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও না কেন, মা? মনে হয়, মাতৃরূপে তুমি মানবী নও, তুমি দেবী! মানুষ হ'লে কি আমাদের এত দিয়ে, পরিবর্তে কিছু না চেয়ে কি থাকতে পারতে? দেবীত্বের তথা মহামানবতার এক সুউচ্চ মণিকোঠায় তোমার মনটি বাঁধা, তাই তুমি নিজের মর্মের শত-বন্ধন ছিঁড়ে, আমাদের জন্য সব দিয়ে, ফতুর হ'য়ে আমাদের 'মা' হয়েছ!

বাস্তব জীবনের সবখানিকে ঘিরেই যখন তোমার এই অভিব্যক্তি, তখন আমাদের চিন্তার রাজ্যে, আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনায় তোমাকে আহ্বান করলে তুমি কি আমাদের না দেখা দিয়ে পারবে? পারবে কি মাতৃরূপের পরম পবিত্রতার মাধ্যমে, আমাদের অধ্যাত্ম-রূপ ফোটাবার জন্য যখন তোমাকে 'মা' বলে ডেকে, আমাদের সবকিছুকে, সেই ভাবের কান্নায় উজাড় ক'রে ঢেলে দেব, তখন কাছে না এসে দূরে সরে থাকতে? আমাদের ছোট বয়সের সেই অজানা-ক্রন্দনে-আঁকা ব্যথার আড়ালে দাঁড়িয়ে কতবার তো কোলে টেনে নিয়েছিলে;—আর আজকের এই অঝোর ক্রন্দনে সাড়া না দিয়ে কি থাকতে পারবে? পারবে কি না এসে, যখন আকুল কান্নায় উতরোল হয়ে বলব:—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর স্নেহহীন আকর্ষণে ব্যথিত হ'য়ে সন্তান তোমায় ডাকে, তুমি এস মা; সংসারের হৃদয়হীনতায় আহত হ'য়ে সন্তান তোমায় ডাকে, তুমি এস মা; জীবনের ভাঙা ভেলায় পার হবার সময় ভরসা দেবার জন্য সন্তান তোমায় ডাকে, তুমি এস মা; চারিদিকের দেওয়া-নেওয়ার হিসাব নিকাশে বিপর্যস্ত হয়ে সন্তান তোমায় ডাকে, তুমি এস মা; ওপারের অজানা কথায় সংশয়িত হ'য়ে তোমার অন্তরধন তোমায় ডাকে, তুমি এস মা; আধ্যাত্মিকতার উদ্ভাসিত আলোকে আমাদের স্নান করিয়ে দেবার জন্য সন্তান তোমায় ডাকে, তুমি এস মা। সংশয়াতীত হ'য়ে তোমার কোলে থাকবার জন্য সন্তান তোমায় ডাকে, তুমি কোল প্রসারিত ক'রে এস, মা!

জানি, অন্তরে তোমার শক্তিই আমাদের মাঝে দেখা দিয়েছে আমাদের আত্মারূপে,—বাহিরে আবার সেই শক্তিই বিকশিত হয়েছে 'প্রকৃতি'রূপে। আর এই দুয়ের দ্বন্দ্বেই জন্ম নিয়েছে মানুষের জীবন, তার মনুষ্যত্বও। আমরা যা কিছু করছি, যা কিছু বলছি, তা সবার পেছনে তোমারই শক্তির স্বীকৃতি—এ কথা শাস্ত্রও স্বীকার করে। আমাদের দুর্দিনে আমাদের সকল বন্ধুই—দারা পুত্র পরিজন সকলেই—আমাদের ছেড়ে যেতে পারে, কিন্তু তুমি তো মা, তখনই আমাদের বেশী নিকটে এসে, ধূলো মুছে, কোলে তুলে নাও! জানি, সন্তানের শত অপরাধেও মায়ের কল্যাণহৃদয় অমৃতের আস্বাদন ঝরায়!

তাই বলি, চল বন্ধু, মাকে হৃদয়ের নিবিড় নিভৃতে আহ্বান ক'রে নিতে চল—চল, তাঁর অঙ্কে আমাদের একান্ত নির্ভরতার পরাশান্তি পেতে চল। কোনরূপ প্রতিদানের, কোনরূপ ভয়ের লেশমাত্র না রেখে, এই একাধারে ভীষণা ও মধুরা, ভয়ঙ্করা ও শুভঙ্করা—মহামায়ার বিশ্বময়ী-মাতৃরূপকে হৃদয়ের মৌনগেহে আহ্বান ক'রে তাঁর জন্য সেবাহুতির সাধনা জ্বালাও। তাঁকে জানাও—'অর্ঘ্য তোমার আনিনি ভরিয়া বাহির হ'তে, ভেসে আসে পূজা পূর্ণপ্রাণের আপন স্রোতে।' দেখছ নাকি, পথিক, মেঘ-মেদুর বর্ষার ক্রন্দনময়ী পৃথিবীর অশ্রু মুছিয়ে শরতের এই সোনার রোদ মায়ের মতই আঁখি মুছিয়ে তার হাসি ফুটিয়ে দিয়েছে। চল পথিক, আমরাও মায়ের ঐ শারদীয়া মূর্তির চরণে আনত হ'য়ে প্রাণের প্রণতি রেখে হাসি ফুটিয়ে নিই। চল, চল, আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

রাজনীতি ও ধর্ম

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

এখন আমরা 'ধর্ম' বলিতে বুঝি—Religion. ধর্ম প্রকৃতপক্ষে মানুষের কর্তব্য। যাহার যাহা কর্তব্য, তাহাই তাহার ধর্ম—ইহাই গীতায় বলা হইয়াছে। সে ধর্ম—Religion নহে; কারণ, তাহার সহিত আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধ না-ও থাকিতে পারে এবং তাহার সহিত ঈশ্বরবাদ সংযুক্ত না-ও হইতে পারে।

বর্তমান কালে রাজনীতিকে Religion সম্পর্কশূন্য করিবার একটা চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে—অর্থাৎ কর্মনাশার জলে জাতীয়তা বিসর্জিত করিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষকে—বদরীনারায়ণ হইতে কন্যাকুমারী ও চন্দ্রনাথ হইতে দ্বারকা এই দেশকে যাঁহারা বিভক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতের জন্য যে শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলা হইয়াছে। রাষ্ট্রের কোন ধর্ম নাই। কেহ কেহ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—রাষ্ট্র ধর্মকে বর্জন করে নাই, কোন বিশেষ ধর্মও স্বীকার করে না। সম্রাট্ অর্থাৎ জারকে নিহত করিয়া রুশিয়ায় যে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম একেবারে বর্জিত হইয়াছিল; পূর্বে ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল—রাজ্যে একটি ধর্ম স্বীকৃত ছিল এবং রাজা ধর্মের রক্ষক—Defender of the Faith বলিয়া অভিহিত হইতেন। কিন্তু রাজ্যে যে অন্য কোন ধর্মমত থাকিতে পারিত না, এমন নহে। ভারতবর্ষ যখন হিন্দুস্থান ছিল, তখনও অগ্নির উপাসক পার্শীরা মুসলমানের ধর্মান্ধতার ও পরধর্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতার জন্য পলাইয়া আসিয়া ভারতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। কালিকটের রাজা (জামোরিন) তাঁহাদিগকে আশ্রয় ও অভয় দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অগ্নির উপাসনায় আপত্তি করেন নাই, কেবল শর্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহারা গোমাংস ভক্ষণ করিবেন না। হিন্দুদিগের বৈশিষ্ট্য ছিল—তাঁহারা পরধর্মদ্বেষী ছিলেন না এবং অন্য ধর্মাবলম্বীকে হিন্দুর সমাজে গ্রহণ করিতেন না; সেই কারণে তাঁহারা নির্বিবাদী ছিলেন।

মুসলমানরা সেরূপ ছিলেন না। তাঁহারা অন্য ধর্মাবলম্বীকে ইসলামে দীক্ষিত করা পুণ্য কার্য বলিয়া মনে করিতেন। সেই জন্য তাঁহারা অত্যাচারী ছিলেন। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরাও মনে করেন, তাঁহাদের ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম। তাঁহারা মনে করেন, আর সব ধর্মের লোক অন্ধকারে রহিয়াছে—তাঁহারাই তাহাদিগকে সত্যধর্মের পথে লইয়া যাইতে পারেন—

'They call us to deliver
Their land from error's chain'.

কিন্তু সকল ধর্মই—অল্প বা অধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, মানুষ স্বভাবতই দেবত্বের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। ধর্মকে বাদ দিলে যে রাজনীতি হয়, তাহা মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে। কিন্তু জড়বাদ তাহাই চাহে; কারণ তাহা ইহকালসর্বস্ব।

মানুষ আপনাকে যত ক্ষমতাবান্‌ই মনে করুক না কেন, সে যে সর্বশক্তিমান্ নহে এবং হইতে পারে না, তাহা সে স্বীকার করিতে বাধ্য। আর মানুষের মন স্বভাবতই তাহা স্বীকার করিবার প্রবণতা অনুভব করে।

হিন্দুর সমগ্র সমাজ-জীবন ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। কোন ইংরেজ লেখক ভারতে ইংরেজ কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি প্রদর্শনার্থ বলিয়াছিলেন: হিন্দুদিগের শিক্ষা-পদ্ধতি মানুষের তিনটি প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া রচিত হইয়াছিল—(১) শৃঙ্খলা, (২) সন্তোষ, (৩) ধর্ম। আর ইংরেজ আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে সেই তিনটিই বর্জন করিয়াছিল। এ দেশে শিক্ষা-পদ্ধতি শৈশবাবধি মানুষকে ঐ তিনটি বিষয়ে অবহিত করিত, ইংরেজের শিক্ষা-পদ্ধতি ঐরূপ না হওয়ায় বিপদ উৎপন্ন হইতেছে।

তিনি বলিয়াছেন—এ দেশে বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্র প্রথমে দেবার্চনার স্তোত্র গান বা পাঠ করিত; তাহার পরে লিখিবার সময়, প্রথমে ঈশ্বরের নাম লিখিয়া পরে অন্য কিছু লিখিত। এখন যে ঈশ্বর অস্বীকৃত—শিক্ষা যে ধর্মবর্জিত, তাহার ফল ভয়াবহ হইবে।

রাজনীতি যদি আধ্যাত্মিকতা অস্বীকার করে, তাহা যদি ধর্ম উচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াসী হয়, তবে তাহা মানুষের মনের অভাব অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যবস্থা করে, তাহা কল্যাণকর হয় না।

দেশের লোককে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দিলে তাহাতে মানুষ সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু অপরের ধর্মাচরণে বাধাদানের অধিকার অস্বীকার করিতে হয়।

আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত সমাজ পশুত্বের আদর করে এবং তাহা মনুষ্যত্বের শত্রু।

রাজনীতিকে যাঁহারা ধর্ম অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা বর্জিত করিতে প্রয়াস করেন, তাঁহারা তাহাকে কেবল জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন—তাহা মানব-জাতির কল্যাণকর না হইয়া সর্ববিষয়ে অকল্যাণের কারণ হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ভারত কর্তৃক বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সে জয় অস্ত্রের দ্বারা নহে—আধ্যাত্মিকতার দ্বারা। ভারতবর্ষ অর্থাৎ হিন্দুস্থান একদিন যে নানা দেশে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সে-ও তাহার আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য। সেই আধ্যাত্মিকতাই হিন্দুকে পরমতসহিষ্ণু করিয়াছিল এবং ভারতের আধ্যাত্মিক প্রভাবই চীনে, জাপানে, কোরিয়ায়, যব প্রভৃতি দ্বীপে—ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে—মূলতঃ এক, কিন্তু বাহ্যিক ভাবে বিভিন্ন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। অরবিন্দ সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে, বিজ্ঞানে—নানাদিকে প্রাচীন ভারতের অসাধারণ কীর্তির কারণ সন্ধান করিয়া বলিয়াছেন, 'Without a great and unique discipline involving a perfect education of soul and mind, a result so immense and persistent would have been impossible'.

সেই শিক্ষা ও শৃঙ্খলার কারণ ধর্ম—আধ্যাত্মিকতা। তাহা যদি রাজনীতি হইতে বর্জন করা হয়, তবে মানুষের সভ্যতার অবসান হয়, এবং মানুষ পশুত্বের আদর করিয়া সভ্যতার ধ্বংস সাধন করে।

‘একৈবাহং জগত্যত্র’*

স্বামী নির্বেদানন্দ

চণ্ডীতে একটি সুন্দর ভাব রয়েছে। মা ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী প্রভৃতি রূপ ধ'রে শুম্ভের সঙ্গে লড়ছেন দেখে সে হেসে বললে, ‘এই তোমার একা যুদ্ধ করা! তুমি তো দেখছি অনেককে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করছ।’ মা তখন হেসে বললেন, ‘মূর্খ, জগতে আমি একাই তো রয়েছি! এরা কি আমা থেকে আলাদা? এরা যে আমার ভেতর থেকেই বেরিয়েছে’ বলেই মা তাদের নিজ শরীরে লীন ক'রে নিলেন। এখন ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, ব্রহ্মাণী এঁদের যেমন আমরা মা বলেই মনে ক'রে থাকি, তেমনিধারা যদি জগৎটাকে মায়ের বিভূতি—মা হ'তে উদ্ভূত ব'লে ভাবতে পারি, জানতে পারি, তবেই তো সব গোল চুকে যায়। তিনি কি শুধু ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী প্রভৃতিকেই সৃষ্টি করেছেন? এ সমস্ত জগৎকেই তিনি ভেতর থেকে বের করেছেন, আবার প্রলয়কালে নিজের ভেতর টেনে নিচ্ছেন। তবে ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণীকে যেভাবে আমরা শ্রদ্ধা করি, জগতের আর সকলকে সেভাবে করি না কেন? সকলই তো মায়ের বিভূতি। এরূপ ভাবাই হচ্ছে পরম সাধন। দিনরাত এইভাবে সবকিছুকে মায়ের বিকাশ ব'লে জানতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাব নিয়েই তো বেশ্যাকেও মা ব'লে দেখেছিলেন। বস্তুতঃ শুম্ভের মতো চশমা চোখে আছে বলেই আমরা জগৎকে মা ব'লে ভাবতে পারি না, পৃথক্ পৃথক্ দেখি। সে চশমা খুলে গেলেই দেখব মা-ই সব হয়েছেন। ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী মানে কিনা ইন্দ্রের শক্তি—ব্রহ্মার শক্তি—রুদ্রের শক্তি; মা যে শুধু এই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, রুদ্রের রুদ্রত্ব—তা নয়; তিনি বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, মানুষের মনুষ্যত্ব—সকলের সকলত্বরূপে বিরাজ করছেন।

গীতায়ও—বিশেষ ক'রে বিভূতি-যোগে এই ভাবটি রয়েছে। সকলকে ভগবানের বিভূতি ব'লে ভাবা কঠিন; সেজন্য যেখানে যা কিছু বিশেষ শক্তি সবই ভগবান তাঁর নিজের ব'লে বর্ণনা করেছেন। অর্জুন ব'লে আলাদা একটি লোক রয়েছে—এ ভাবার চেয়ে পাণ্ডবদের মধ্যে তিনিই অর্জুনরূপে বিরাজ করছেন, এ ভাবা অনেক ভাল। যা কিছু বিশেষ শক্তি—সবই ভগবানের ব'লে ভাবতে ভাবতে আমরা ক্রমে সবই তাঁর শক্তির বিকাশ—এটি ভাবতে সক্ষম হব। ভগবান নিজের বিভূতির কথা গীতায় অনেক ব'লে শেষে বলেছেন, ‘আমার বিভূতির অন্ত নেই, যেখানে যা কিছু শ্রীসম্পন্ন, অর্থাৎ উর্জিত বলযুক্ত—সবই আমার শক্তির অংশসম্ভূত। অধিক কি ব'লব—আমার একাংশেই জগৎ বিধৃত রয়েছে।’ ঋষিরা এই তত্ত্ব বহু প্রাচীনকালেই সাক্ষাৎকার করেছিলেন; মুণ্ডকোপনিষদে আছে অগ্নি থেকে যেমন নানা সজাতীয় (অগ্নিধর্মী) স্ফুলিঙ্গ বেরোয়, তেমনি অক্ষর (ব্রহ্ম) থেকে বিবিধ জীব বেরিয়েছে, আবার তাতেই লয় পাচ্ছে। অগ্নি আর তার স্ফুলিঙ্গ একই। আবার কঠোপনিষদে রয়েছে—

> অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
> রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
> একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
> রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তেও আছে—

> সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
> স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥

* বিদ্যার্থী আশ্রমে প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ।

সেই সহস্রশির, সহস্রচক্ষু পুরুষ সমস্ত বিশ্ব জুড়ে রয়েছেন, আবার তাকে অতিক্রম করেও রয়েছেন। এই স্থূল জগৎ তিনি বই আর কিছু নয়, আর এর পারে যে সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ রয়েছে—সেও তিনি। সমস্ত জগৎকে তাঁর বিকাশ ব'লে ভাবতে না পারলেও আমরা যদি বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন বস্তুকে তাঁর বিকাশ ব'লে ভাবতে আরম্ভ করি, তাহলেও আমরা এগোতে পারব। এই সব মহারাজকে (ঠাকুরের সন্তানদের) আমরা যদি ঠাকুরের বিভূতি ব'লে ভাবতে পারি—তিনিই তাঁর ভেতর থেকে এঁদের বের ক'রে নানারূপে লীলা করছেন ব'লে ভাবতে পারি—তাতেও আমাদের অনেক সাধন হ'য়ে যায়। এভাবে যতই একত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় ততই আনন্দ, কেবল আনন্দ। তাই উপনিষদে আছে—'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি' অর্থাৎ ভূমাতেই পূর্ণানন্দ এবং 'যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্' অর্থাৎ একত্বানুভূতি না হওয়া পর্যন্ত আংশিক আনন্দ।

এই জগৎ মহামায়ার বিভূতি—কি ক'রে যে তাঁর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরাও বলছেন, ঋষিরাও অনুভব করেছেন, এই বাইরের স্থূল জগৎ আলোকের স্পন্দন বই আর কিছু নয়। ঈথর-এ নানা রকম স্পন্দন হচ্ছে আর আমরা তাকেই রূপ, রস, মানুষ, ঘোড়া, গরু ব'লে ভাবছি। এ কি রকম ক'রে হয়? মন রয়েছে ব'লে এরূপ হওয়া সম্ভব হচ্ছে। মনেতেই আকাশের কোন স্পন্দন রূপ, কোনটি রস, আর কোনটি মানুষ ব'লে অনুভূত হচ্ছে। আর মনের পশ্চাতে বোধস্বরূপ চৈতন্য রয়েছেন ব'লে এ-সকলের জ্ঞান হচ্ছে। সেই মহাশক্তি একরূপে জড় মন ও আকাশ হ'য়ে রয়েছেন, আর একরূপে চেতন হয়েছেন; আর দুয়ের সংযোগে জগৎ ব'লে একটা পদার্থের ভান হচ্ছে। মনটা যেন একটা কালো পর্দা—তার মাঝখানে একটা ছিদ্র আছে। আকাশের স্পন্দনে আকার কেবলই পরিবর্তিত হচ্ছে। সে কখন সুখের আকার ধরছে, কখন দুঃখের আকার ধরছে; কখন হাতী, কখন বা মানুষ হচ্ছে। আর এ পর্দার পশ্চাতে রয়েছেন চৈতন্য; ছিদ্রের ভেতর দিয়ে চৈতন্যের আলো বাইরে আসছে, আর আমাদের সুখ, দুঃখ, হাতী, মানুষ এই সবের অনুভূতি হচ্ছে। মায়ার দুটি শক্তি আছে, একটি আবরণ-শক্তি, অন্যটি বিক্ষেপ-শক্তি। একটি শক্তি পরদা, চৈতন্যকে সে ঢেকে রেখেছে, তাই অনন্ত চৈতন্যের অনুভূতি হচ্ছে না। আর যে শক্তি-বলে ছিদ্রটির আকার বদলাচ্ছে, তা হচ্ছে বিক্ষেপ শক্তি, তাতেই চৈতন্যের রশ্মি পড়ে নানারূপ অনুভূতি জাগাচ্ছে। চেতনের স্বভাবই হচ্ছে যে সে নিজে রয়েছে ব'লে অনুভব করে। জড় কাকে বলি? যার নিজের সম্বন্ধে বোধ নেই। আমরা কি ভাবতে পারি যে আমরা নেই? তা কখনও হয় না, কাজেই আমরা চেতন। কাউকে যখন ক্লোরোফরম দ্বারা অজ্ঞান ক'রে দেওয়া হয়, তখন তার রূপ-রসের অনুভূতি হয় না, কারণ তখন তার মনের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যায়; সুষুপ্তিতেও তাই। সেই মহাশক্তিই সব হয়েছেন। ভগবানকেও আমরা প্রতি মুহূর্তেই বোধ করছি প্রতিটি অনুভূতির মধ্যে। আমাদের যে স্ত্রী-পুরুষ বোধ হচ্ছে—সেই বোধের শুধু বোধটুকুই তিনি, তিনি বোধস্বরূপ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে আছেঃ নানারকম বাদ্যযন্ত্রে নানা-রূপ শব্দ হচ্ছে, সেখানে নানারূপত্ব বাদ দিয়ে কেবল শব্দ ব'লে যেমন একটি পৃথক্ তত্ত্ব রয়েছে, তেমনি নানারকম বোধের নানাত্ব বাদ দিলে যে নির্বিশেষ বোধটুকু থাকে, তাই ভগবান বা চৈতন্য। একেরই বিভিন্ন বিচিত্র বিকাশ।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী — সমাসন্ন

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ

শ্রীমতী বার্ক-এর গ্রন্থের[১] সঙ্গে স্বামীজীর পত্রাবলী পড়ার সুযোগ হ'ল আবার। ইংরেজী পত্রাবলীর (১৯৪৮—সংস্করণ) অধিকাংশ চিঠি লেখা হয়েছে (৮৫—৩৬০ পৃষ্ঠা) তাঁর শিকাগোতে আবির্ভাব, ধর্মমহাসম্মেলন এবং প্রায় তিন বছর (১৮৯৩-৯৬) প্রধানতঃ আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বেদান্ত-প্রচার বিষয়ে। সেই 'বিরাট-পর্ব' শেষ ক'রে দেশে ফিরেই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ 'উদ্যোগ-পর্ব'। তখন যে বীজ তিনি বপন করেছেন আজ তা মহীরুহ! ১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দে শেষ বিদেশ-ভ্রমণ-কালেই বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, বেলুড়ের গঙ্গা-তীরেই তাঁর নির্বাণ (১৯০২) আসন্ন। মাত্র ৪০ বছরের জীবনে 'যুদ্ধপর্ব' সেরে তাঁর 'শান্তি-পর্ব'। এত অল্প দিনে এত বড় কাজ আর কে করেছেন, আমি জানি না। শুধু জানি যে ভারতবাসীকে, বিশেষভাবে বাঙালীকে প্রস্তুত হ'তে হবে - উপযুক্তভাবে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী ব্রত উদ্‌যাপন করতে। আজ ভগিনী নিবে-দিতার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করি। ১৯০১ থেকে ১৯১১ সালে তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত, নিবেদিতা একাই কত কাজ ক'রে গেছেন, তাঁর Master As I Saw Him প্রভৃতি অমূল্য রচনাই তার প্রমাণ। আশা দেবী (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা)-রচিত নূতন নিবেদিতা-জীবনীও তার সাক্ষ্য দেয়। তেমনি আরও গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হবে—সে আশা করেই দু'একটি কথা বলছি।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার নিয়মিত পাঠকরূপে সম্পাদক মহা-শয়কে জানাই যে তিনি গত বছর শার-দীয়া সংখ্যায় উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যার প্রবন্ধ-তালিকা ছেপে আমাদের ধন্যবাদ অর্জন করে-ছেন। এবার অনুরোধ, তিনি যেন সমাসন্ন বিবেকানন্দ-জন্মশতাব্দী মনে রেখে (১৮৬৩-১৯৬৩) ধারাবাহিক ভাবে বিবেকানন্দ-যুগের অনুসন্ধান (research) শুরু করান। আমার ক্ষুদ্র শক্তিমত আগেই কিছু ইঙ্গিত করেছি—এবারও 'উদ্বোধনে' সে প্রসঙ্গ তুলছি। কারণ ১৯৫৩ সালে, অর্থাৎ Parliament of Religion এর ৬০বর্ষ-পূর্তি অথবা হীরক-জয়ন্তী বৎসরে আমি শিকাগো গিয়েছি এবং সেখানে স্বামীজীকে স্মরণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আবার গত বছর (আগষ্ট, ১৯৫৮) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধর্মসম্মেলন[২] বসে, সেখানেও হিন্দুধর্ম বিভাগের নেতৃত্ব করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

সেখানে পুনর্দর্শন পেলাম Rev. Lathrop-এর; রেভারেণ্ড লেথ্‌প একেশ্বরবাদী প্রচারক। তিনি আমাদের গল্প শোনালেন :

১৮৯৩ সালে তিনি শিকাগোতেই ছিলেন—দশ বারো বছরের ছোকরা; কষ্ট ক'রে লেখাপড়া করেন—হঠাৎ খবর পেলেন গৈরিকধারী এক ভারতীয় সাধুপুরুষ (বিবেকানন্দ) এসেছেন ভাষণ দিতে। কিন্তু তাঁর দর্শন পেতে হ'লে টিকিট কেটে ধর্মসম্মেলনের হলে যেতে হবে। কিন্তু টাকা কোথা? তবু তাঁকে দেখবার এত আগ্রহ যে বাড়ী বাড়ী ফাই-ফরমাস খেটে তরুণ লেথ্‌প

১ Swami Vivekananda in America : New Discoveries By Marie Louise Burke (1958).

২ International Congress of Religious Freedom.

১০ ডলার উপার্জন করেন ও টিকিট কিনে বিবেকানন্দ দর্শন ক'রে আর তাঁর দিব্য বাণী শুনে ধন্য হন। যেন সেদিনের কথা। আজ ৮০ বছর বয়সের লেথ্‌প কৃতজ্ঞচিত্তে সেকথা আমায় শোনালেন।

শ্রীমতী মারী লুইস বার্ক Swami Vivekananda in America : New Discoveries (১৯৫৮) গ্রন্থে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করেছেন; স্বামীজীর জীবনে অভিনব আলোকপাত তিনি করেছেন। তাঁর প্রধান সন্ধান-ক্ষেত্র আমেরিকা তাঁকে বহু পত্রিকাদি সরবরাহ করেছে এবং তার ফলে ৬০০ পৃষ্ঠার উপর এক বিরাট গ্রন্থ আমরা পেলাম।

অথচ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি বাংলা তথা কলকাতা ভারতের পত্রিকা-সাহিত্যের খনি; সেখানে খননকার্য চালাবার মত সুদক্ষ কর্মী আজও আমরা পাই না কেন? তথাকথিত স্বাধীনতা-সংগ্রাম বা Indian mutiny থামার দশ বছরের মধ্যেই (১৮৫৯-১৮৬৯) দেখি কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব : জগদীশচন্দ্র ও বিপিনচন্দ্র (১৮৫৮), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১), প্রফুল্লচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথ (১৮৬৩) ও মোহনদাস গান্ধি (১৮৬৯)—যেন এক অনিবার্য কারণেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে কারণ যেন ভারতের তথা এশিয়ার সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা—বিজ্ঞানে ও দর্শনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে, চিন্তায় ও সাধনায়, সাহিত্যে ও শিল্পে—সর্বক্ষেত্রেই এক নব প্রেরণার ও অভিনব যুগের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী প্রায় কাছাকাছি উদ্‌যাপিত হবে। সেই সুবর্ণসুযোগে দেশের তরুণতরুণীদের আহ্বান করি—পরাধীনতার মিথ্যা জাল ছিন্ন ক'রে সত্যানুসন্ধান দ্বারা এক গৌরবের ইতিহাস রচনা করতে। রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে তাঁরা প্রকাশ করুন সে কালের অধ্যাত্ম সম্পদ ও ভাবধারা—ধর্মে ও কর্মে, শিল্পে ও সাহিত্যে। সেই তো হবে স্বাধীন ভারতের ও প্রবুদ্ধ ভারতের সার্থক উদ্বোধন।

১৮৬৩ থেকে ১৮৮৩ খৃঃ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথের প্রথম কুড়ি বছরের জীবন এখনও অনেকখানি অস্পষ্ট আছে। অথচ তাঁর জন্মস্থান শিমুলিয়া ও শিক্ষাস্থান 'জেনারেল এসেম্ব্লী' কলেজও সুপরিচিত। দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুরে ঘনিষ্ঠভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গলাভ (১৮৮৩-৮৬) নানা ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে; কিন্তু তৎকালীন পত্রিকাদি আজও ভাল ক'রে দেখা হয়নি। 'সংবাদপ্রভাকর' বন্ধ হলেও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, আর্যদর্শন, বঙ্গদর্শন, ভারতী প্রভৃতি মূল্যবান্ বাংলা পত্রিকা এবং ইংরেজী Hindoo Patriot, Calcutta Review, Indian Mirror ও অমৃতবাজার পত্রিকার দুষ্প্রাপ্য ফাইল ঘেঁটে সংকলন করলে 'রবীন্দ্র-নরেন্দ্র' যুগের আদিপর্ব সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। আবার ১৮৯৭-১৯০২ বিবেকানন্দ-জীবনের এই শেষ পাঁচ বছরের বহু মূল্যবান্ তথ্য ভারতের তথা বিদেশের নানা পত্রিকায় আমরা নিশ্চয় পেতে পারি। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কাজ করা হয়নি।

বিশ্ব-বেদান্ত-সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) আজও করা হয়নি। অথচ তার মধ্যে রামমোহন থেকে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজ নিজ প্রভায় দেখা দেবেন; শুধু আমাদের সেই গ্রন্থপঞ্জী সাজিয়ে ছেপে দিতে হবে। পরিভাষা-সূচীতে শ্রীমতী বার্ক (Burke) তার কিছু আভাষ দিয়েছেন; কিন্তু তার subject-index—আমেরিকায় বসে তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হয়নি।

তাঁর মূল্যবান্ গ্রন্থে একজন রুশ মনীষীর নাম পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি। ভারতের সঙ্গে চীন ও জাপান শিকাগো-সভায় যোগ দিয়েছিল;

কিন্তু তুর্কী ও রাশিয়া দূরে ছিল। দর্শক হিসাবে দেখি স্বামীজীর অনুরাগী প্রিন্স ভল্‌কনস্কি (Prince Wolkonsky—freelance delegate) ছিলেন; তাঁর সম্বন্ধে আলবার্ট স্পালডিং (Albert Spaulding) লিখে গেছেন যে, ভারত-অনভিজ্ঞ মার্কিন প্রেস স্বামীজীকে নানা অদ্ভুত নামে ডেকেছিল যথা—'Indian Rajah', 'The High Priest of Brahma', 'The Buddhist Priest', 'Theosophist' ইত্যাদি। কিন্তু রুশ ভলকনস্কি (Wolkonsky) বিবেকানন্দের বন্ধুত্ব লাভ করেন এবং কিছুকাল দুজনে পত্রব্যবহারও করেন। অথচ সে সব চিঠি আমরা এ পর্যন্ত পাইনি; হয়তো কোন রুশ গবেষক একদিন সেগুলি আবিষ্কার করবেন।

মনীষী রম্যা রঁলার সঙ্গে যখন মহাত্মা গান্ধি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-জীবনী নিয়ে কাজ করি, তখনই জেনেছিলাম যে ঋষি টলষ্টয় (Tolstoy) বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' (Raja Yoga) গ্রন্থখানি পড়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর (১৯১০) দশ-বারো বছর আগেই। ১৯৫০ সালে যখন আমি 'Tolstoy and Gandhi' লিখি, তখন দেখিয়েছিলাম যে বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' (মার্কিন সংস্করণ) কোন এক বন্ধু (হয়তো Wolkonsky) টলষ্টয়কে উপহার দেন এবং সেই বই পাঠ ক'রে তিনি উপকৃত হ'য়ে তাঁর শিষ্য পল বিরুকভ্‌কে (Paul Birukov) বলেন। সেকথা বিরুকভের মুখেই আমি শুনেছি যখন ১৯২৩ সালে তিনি তাঁর 'Tolstoy and the Orient' রচনায় আমার সাহায্য চান। রুশ-জাপান যুদ্ধে তাঁর দেশ যখন উদ্‌ভ্রান্ত (১৯০২-১৯০৪) তখন টলষ্টয় বেশী ক'রে ভারত ও এশিয়ার অধ্যাত্ম তত্ত্বে ডুবেছিলেন; তখনই অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর দুই তিন বছর আগে গান্ধিজীর সঙ্গে টলষ্টয়ের পত্রালাপ হয়। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ ও বৈষ্ণব-নেতা 'বাবা ভারতী' থেকে শুরু ক'রে বিপ্লবী তারকনাথ দাস ও গান্ধিজী যে টলষ্টয়-জীবনীর অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গেছেন, সে বিষয়ে রাশিয়ার ও ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি।

স্বামী মাধবানন্দজীর আমন্ত্রণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে বেলুড়ে একবার বলেছিলাম যে ধর্মে তথাকথিত ঔদাসীন্য দেখালেও রাশিয়া একদিন রুশ ভাষায় 'কথামৃত' অনুবাদ করবে। আজ নিশ্চয় জেনেছি[৩] যে সেই 'কথামৃত' অনুবাদের বহুল প্রচার তথাকথিত নাস্তিক রাশিয়াতেও হয়েছে।

রুশ-জাপান যুদ্ধের আগেই বিবেকানন্দের দেহান্ত হয়; অথচ তিনি কোন এক দিব্য দৃষ্টির বলে যেন স্বচক্ষে দেখেই ব'লে গেছেন: বিংশ শতকের প্রারম্ভে—ইউরোপের অভ্যুদয় শেষ হ'য়ে তার পতন যেন শুরু হচ্ছে। আর তাদের চেয়ে বড় হ'য়ে দেখা দিচ্ছে শ্রমিক-তান্ত্রিক দুই দেশ, চীন ও রাশিয়া! ১৯১১তে চীন-বিপ্লব ও ১৯১৭তে রুশ-বিপ্লব ঘনিয়ে এসে বিগত অর্ধ শতাব্দী ধ'রে যেন স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎ বাণীকেই স্পষ্ট রূপায়িত করছে। শিকাগোতে তাঁর মনে স্বপ্ন জেগেছিল—বিতর্কের ঊর্ধ্বে এক বিশ্ব-ধর্মে পূর্ব ও পশ্চিম সম্মিলিত হবে![৪]......

৩ সম্প্রতি যে সব ভারতীয় পুস্তক রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার তালিকায় 'কথামৃতে'র নাম দেখেছি।

৪ শিকাগোর প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'Poetry'র সম্পাদিকা বিখ্যাত কবি হ্যারিয়েট মনরো (Harriet Monroe) ১৮৯৩ সালে স্বামীজীর ভাষণ শোনেন এবং ১৯৩৬ সালে Argentina-তে P E N Congress ও শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক উৎসবের পর সেই কাহিনী আমায় শোনান; তার কিছু দিন পরেই কবি Harriet Monroe দেহত্যাগ করেন। তাঁর আত্মজীবনী A Poet's Life গ্রন্থে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে এই কথাগুলি লিখে গেছেন:

The 'world's first Parliament of Religion'—seemed a great moment in human history, prophetic of the promised new era of tolerance and peace.

হয়তো তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে সেই স্বপ্ন অভিনব রূপ পরিগ্রহ করবে। সেই আশায় আমার দেশবাসীদের আহ্বান করি বিবেকানন্দ-যুগের তথ্যানুসন্ধানে অগ্রসর হ'তে।

Swami Vivekananda the magnificent stole the whole show and captured the town. ...The handsome monk in the orange robe gave us in perfect English a masterpeice. His personality, dominant and magnetic; his voice, rich as a bronze bell; the controlled fervor of his feeling; the beauty of his message to the Western world he was facing for the first time—these combined to give us a rare and perfect moment of supreme emotion. It was human eloquence at its highest pitch.

One cannot repeat a perfect moment—the futility of trying to has been almost a superstition with me. Thus I made no effort to hear Vivekananda speak again, during that autumn and winter when he was making converts by the score, to his hope of uniting East and West in a world religion, above the tumult of controversy.

Vide Burke, Swami Vivekananda: New Discoveries—pages 59-60.

[ভাবানুবাদ: পৃথিবীর প্রথম ধর্মমহাসম্মেলন...মানবেতিহাসে এক মাহেন্দ্রক্ষণ; শান্তি ও পরমত-সহিষ্ণুতার প্রতিশ্রুতিময় নবযুগের সম্ভাবনায় পূর্ণ।

মহিমময় স্বামী বিবেকানন্দ সারা সম্মেলনের হৃদয় হরণ ক'রে শিকাগোবাসীর চিত্ত জয় করেছিলেন। গৈরিক-পরিহিত সেই সুন্দর সন্ন্যাসী শুদ্ধ ইংরেজীতে দিলেন সর্বোত্তম ভাবপূর্ণ ভাষণটি। অপরকে প্রভাবিত ও আকর্ষণ করার শক্তিপূর্ণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, গীর্জার ঘণ্টার মতো গম্ভীর তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর সংযত আবেগ, পাশ্চাত্য জাতির সহিত প্রথম সাক্ষাতেই প্রদত্ত তাঁর বাণীর সৌন্দর্য—সব মিলে আমাদের দিয়েছিল চরম আবেগের একটি পরম দুর্লভ মুহূর্ত, যার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব,...সে চেষ্টাও আমার ব্যর্থ হয়েছে..., তাই আমি আর সে বছর শরতে ও শীতে বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনার চেষ্টাই করিনি; তখন তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে এক বিশ্বধর্মে মিলিত করার আশায় শত শত ব্যক্তিকে তাঁর ভাবে দীক্ষিত করছিলেন।]

উপনিষদের বাণী

স্বামী বোধাত্মানন্দ

উপনিষদের বাণী বল-বীর্যের বাণী, আত্মার মুক্তির বাণী। উপনিষৎ বলেন, মানুষ যে নিজেকে দুর্বল অসহায় মনে করে—তাহার কারণ নিজ স্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞতা। বস্তুতঃ মানবাত্মার মহত্ত্বই উপনিষৎ ব্যক্ত করেন। মানুষ যে কত বড়, কত মহান্, সে যে সত্যসত্যই নিষ্পাপ নিত্য-মুক্ত অমৃতস্বরূপ আত্মা, এই কথাই উপনিষৎ তারস্বরে ঘোষণা করেন। ভ্রমবশতঃ সত্য না জানার জন্য মানুষের এই হীন অবস্থা। জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান দূরীভূত হইলে মানুষ তাহার নিজ আনন্দস্বরূপ আত্মাকে ফিরিয়া পায়। স্বামী বিবেকানন্দ একান্তভাবে ইচ্ছা করিতেন যে এদেশের লোক শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদের চর্চা করে, উপনিষদুক্ত আত্মার মহত্ত্বে বিশ্বাসী হইয়া ভয় দুর্বলতাকে জয় করে। আর এই অজর অমর আত্মায় বিশ্বাসী হওয়াই সকল দুর্বলতাকে—সর্বপ্রকার দুঃখকে জয় করিবার উপায়, পরম আনন্দ লাভের ও একান্ত অভীঃ হওয়ার উহাই নিশ্চিত পথ।

বেদের প্রথম দিকে বিবিধ যাগযজ্ঞাদির কথা থাকিলেও সাধারণতঃ অন্তভাগে অর্থাৎ উপনিষদে উপাসনার কথা, পরম তত্ত্বের কথা, আত্মার স্বরূপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উহা মানুষকে নিঃশ্রেয়স কল্যাণের পথ দেখাইয়া দেয়।

হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব এই উপনিষদে নিবদ্ধ। উপনিষৎপাঠে জানা যায়—আর্য ঋষিগণ কত উচ্চতত্ত্ব-আলোচনায় নিবিষ্ট থাকিতেন, কত উচ্চ আনন্দের তাঁহারা অধিকারী হইয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল ধরিয়া উপনিষদের পুণ্য প্রভাব এদেশবাসীর উপর পতিত হইয়াছে। ইহার ভাবগাম্ভীর্যে বৈদেশিক দার্শনিকগণও মুগ্ধ। জার্মান দেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক শোপেনহর এই উপনিষদের ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন: উপনিষদের মতো এমন কল্যাণকর ও উচ্চভাবপ্রদ বিদ্যা সমগ্র জগতে আর নাই। জীবনকালে ইহা আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, মরণেও ইহা আমাকে সান্ত্বনা দিবে।

মানুষ চায় সুখ, শান্তি; সে চায় অনন্ত জ্ঞান। এই আশায় সে নানাবিধ কর্ম করে; জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য কত বাহিরের বিদ্যা শিক্ষা করে। কিন্তু পরে সে স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিতে পারে, 'প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়'। বাহিরের প্রকৃতি-জয়ে বা তাহার জ্ঞানে সেই ভূমানন্দ পাইবার আশা নাই দেখিয়া সে অন্তর্জগতে প্রবেশ করে। সেই সত্য, সেই আনন্দ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। মুণ্ডক উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই: এই ভাবে ধন-মান-যশে অতৃপ্তচিত্ত সত্যজিজ্ঞাসু মহাগৃহস্থ শৌনক সর্বত্যাগী তত্ত্বজ্ঞ ঋষি অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করেন, 'কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'?'[1] মহাশয়! কোন্ বস্তুকে জানিলে এই জগতের সব জিনিস জানা হয়? লোক-পরম্পরায় শ্রবণ করিয়াই হউক বা নিজ অভিজ্ঞতা বলেই হউক, শৌনকের এই ধারণা মনে আসিয়াছিল যে জগতে এমন একটি বস্তু আছে যাহা জানিলে মানুষ সর্বজ্ঞ হয়, যাহা পাইলে সে আপ্তকাম হয়। আর সেই বস্তু জানিবার, পাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা শৌনকের প্রাণে।

ঋষি অঙ্গিরা সেই নিত্যধনে ধনী, সদাতৃপ্ত। তিনি ভাবিতে লাগিলেন কেমন করিয়া সেই তত্ত্ব শৌনককে বুঝাইবেন, কেননা সেই বস্তুটি এমন যে তাহা সাধারণভাবে বর্ণনা করা যায় না। অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিও সে তত্ত্ব সহজে অবধারণ করিতে অসমর্থ। বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ যতদূর যাইতে পারে, যতদূর চিন্তা করিতে পারে সেই বস্তু যে তারও পারে। তাই তিনি উত্তর দিলেন, 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চ অপরা চ।' দুই প্রকার বিদ্যা অর্জন করিতে হইবে—এক অপরা, যাহার দ্বারা জাগতিক বিষয়ের জ্ঞান, মানুষের যেটি জাগতিক রূপ সেই শরীরেন্দ্রিয়-সংঘাতের জ্ঞানলাভ হয়, তাহার চাহিদা মিটানো যায়। আর মানুষের এই জাগতিক রূপের পারে তার যে নিত্যরূপ নিত্যসত্তা বিদ্যমান, যে স্বরূপটিকে না দেখিয়া তাহাকেই সে শরীরেন্দ্রিয়রূপে, এই বহির্জগৎরূপে নিয়ত গ্রহণ করে, সেই এক তত্ত্ব—যে বিদ্যার দ্বারা সাক্ষাৎকার করা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা।

এই পরা বিদ্যার বিষয় আত্মা বা ব্রহ্মকে শৌনকের বুদ্ধিতে ক্রমশঃ আরূঢ় করাইবার জন্য ঋষি বলিতে লাগিলেন: এই ব্রহ্ম হইতেই অন্ন প্রাণ মন, পঞ্চসূক্ষ্মভূত, সপ্তলোক, কর্ম, কর্মফল সকলই সৃষ্ট হইয়াছে। 'তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্মাণি যান্যপশ্যন্'[2] বৈদিক মন্ত্রে যে সকল কর্মের উল্লেখ আছে, সেগুলি সত্যফলপ্রদ বলিয়া তত্ত্ব-দর্শিগণ দেখিয়াছেন। অধিক কি কর্ম, উপাসনার সহিত সংযুক্ত হইলে উহা সাধককে সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, ইহাও সত্য। বৃহদারণ্যকেও আমরা পাই—যেমন অগ্নি হইতে সমধর্মাপন্ন বিস্ফুলিঙ্গ সকল বাহির হইয়া আসে সেইরূপ সেই এক আত্মা হইতে সকল প্রাণ, সকল লোক, দেবগণ ও ভূতসমূহ বহির্গত হয়।

১—১।১।৩

২ মুণ্ডক ১।২।১

ইহার পর কথিত হইয়াছে, 'প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ (আত্মা) সত্যম্'[৩]—প্রাণ প্রভৃতি সত্য, আত্মা তাহাদিগের অপেক্ষা সত্য। কেনোপনিষদে এই তত্ত্বকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে আমরা সত্যের তর-তম ভাব স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই। কাজেই সৃষ্ট জগৎকে আকাশ-কুসুমের মতো অলীক বলা যায় না, অথচ ব্রহ্মের মতো চিরসত্য ও বলিতে পারি না।

অতঃপর অঙ্গিরা বলিতে লাগিলেন: এই সব সৃষ্ট জগৎ সত্য, কিন্তু অনিত্য। নিত্যসুখ, ভূমানন্দ এই জগতের কোথাও নাই। উহা পাইবার সন্ধান—ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট হইতেই লাভ করিতে হয়। অন্তরের সমগ্র শ্রদ্ধা, আকুল আগ্রহ লইয়াই তাঁর নিকট উপস্থিত হইতে হয়। যাহার চিত্ত বিষয়ের আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া সম্যক্ প্রশান্ত হইয়াছে, মন স্বভাবতঃ অন্তর্মুখীন, যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু, এইরূপ শিষ্যই যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী। আর আত্মজ্ঞ গুরুরও এই রীতি যে এইরূপ উপযুক্ত শিষ্য উপস্থিত হইলে যে প্রকারে শিষ্য ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, সেই ভাবে তিনি তাহাকে উপদেশ দান করেন। গুরুর অহেতুকী কৃপাই তাঁহাকে শিষ্যের কল্যাণে নিযুক্ত করেন; তাঁহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

বিদ্যালাভের উপায়ের কথা বর্ণনা করিয়া ঋষি এখন শৌনকের মূল প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বলিতে লাগিলেন: এই বৈচিত্র্যময় জগৎ সেই এক ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই-মাত্র বলিয়াই ঋষি নীরব হইলেন না। তিনি মহা-সত্য উচ্চারণ করিলেন, 'পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্। এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য'।[৪]

৩ বৃহদারণ্যক—২।১।২০ ৪ মুণ্ডক—২।১।১০

এই কর্ম-তপোযুক্ত বিশ্ব পুরুষই—অর্থাৎ পুরুষ হইতে অপৃথক্। এই পুরুষ—এই ব্রহ্মকে যিনি নিজের হৃদয়ে উপলব্ধি করেন তিনিই অবিদ্যার পাশ হইতে মুক্ত হন। তাঁহার আর 'আমি আমার' ভাব থাকে না। সর্বস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত একত্ব অনুভব করায় তিনি অজ্ঞানের পারে চলিয়া যান।

এখন পুরুষই কিরূপে এই বৈচিত্র্যময় জগৎ হইলেন? যদি এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম আর নির্বিকার অসঙ্গ থাকেন না। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন: এষ আত্মা অসঙ্গো ন হি সজ্যতে…অনন্তরমবাহ্যম্।[৫] এই আত্মা অসঙ্গ—ইহার বাহির ভিতর বলিয়া কিছুই নাই। কাজেই বলিতে হয়, এই জগৎ ব্রহ্মের প্রতীয়মান রূপ; ঠিক ঠিক রূপ নহে—অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য সত্যই জগৎ হইয়া যান নাই। ঋষিগণ চরম সত্যের আলোকে অনুভব করেন যে ব্রহ্মই আছেন—আর কিছুই নাই। অন্য উপনিষৎও এই সত্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'[৬]—এই ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদ নাই। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'[৭] ব্রহ্ম একই, দ্বিতীয়-রহিত। ঋগ্‌বেদও বলেন, 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।' মায়ার দ্বারা পরমেশ্বর এই বহুরূপ ধারণ করি-ছেন। ঐশ্বরিক এই মায়া এই অচঞ্চল, নির্বিকার ব্রহ্মের উপর এই নামরূপাত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন। যতক্ষণ মায়াকে সত্য বলিয়া মনে হয়, ততক্ষণ সত্যের এই পূর্বকথিত তর-তম ভাব পরিদৃষ্ট হয়। এই মায়া, এই অজ্ঞান অপসৃত হইলে সর্বত্র ব্রহ্মই উপলব্ধ হন, জগৎ নহে। তাই অঙ্গিরা বলিলেন, 'ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্।'[৮]—সর্বদিকে ব্রহ্মই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। পূর্বে অজ্ঞানবশতঃ যে নামরূপাত্মক

বৃহদারণ্যক—৪।২.৪ কঠ—২।১।১১
ছান্দোগ্য—৬।২।১ —২।২।১১

জগৎ অব্রহ্মরূপে দেখা যাইতেছিল, আজ জ্ঞানালোকে সেই জগতের অস্তিত্ব নাই; তৎস্থলে ব্রহ্মই একমাত্র রহিয়াছেন। এই একের জ্ঞানে সকল বিষয়ের জ্ঞান হইল। কেননা শৌনক এখন প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন: সেই এক ব্যতীত আর কিছু নাই। সেই একই চিরন্তন সত্য; তাহার সত্তাতেই জগতের সত্তা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই একই সত্য বর্ণিত হইয়াছে। সত্যদ্রষ্টা যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন, 'আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্'[৯]—এই আত্মা দৃষ্ট শ্রুত বিচারিত ও বিজ্ঞাত হইলে সর্ব তত্ত্ব বিদিত হয়।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য পরম তত্ত্বের কেবল সন্ধান দিয়াই নিরস্ত হন নাই। এই তত্ত্ব যাহাতে অনুভব করা যায় তাহার উপায়ও বলিয়াছেন: 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'[১০]। এই আত্মতত্ত্বের উপলব্ধির জন্য শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। শাস্ত্র ও গুরুমুখে এই তত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। ঐ শ্রবণ তখনই শেষ হইবে যখন সাধক সম্যক্ প্রকারে এই ধারণায় উপস্থিত হইতে পারিবে যে, সকল উপনিষদের লক্ষ্য চরম প্রতিপাদ্য বিষয় ঐ এক অদ্বৈত তত্ত্ব। তারপর মনন। শ্রুতি-সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তি দিয়াই সাধকের নিজের বুদ্ধিতে সেই চরম সত্যটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। যখন দ্বৈত দর্শন হইতেছে—ব্যাবহারিক দর্শন-শ্রবণাদি চলিতেছে, তখনও কিন্তু চরম সত্যের দৃষ্টিতে ঐ দর্শন-শ্রবণ বাস্তব নয়। নিষ্ক্রিয় আত্মাতে ঐ দর্শন-শ্রবণক্রিয়া আরোপিত হইতেছে মাত্র। তাই তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের শরীরেন্দ্রিয়াদির দ্বারা নানা কল্যাণকর কার্য কৃত হইলেও তিনি নিজেকে কোন ক্রিয়ারই কর্তা বলিয়া বোধ করেন না।

অজ্ঞানবশতঃ সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যেক ব্যাপারের প্রত্যেক ক্রিয়ার কর্তা বলিয়া নিজেকে মনে করে। সেই শুদ্ধ আত্মা শুদ্ধ ব্রহ্মই আমার স্বরূপ ঐ ধারণায় আসিতে যে অসম্ভব ভাবনা বা বিপরীত ভাবনার উদয় হইবে, তাহারও ঐরূপ যুক্তি ও গুরুবাক্যবলে নিরসন করিতে হইবে। জীবাত্মার স্বরূপ যে ব্রহ্ম, এই মহাসত্যটি উপনিষদে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভাবে জীবাত্মা যে বস্তুতঃ ব্রহ্মই—এই সিদ্ধান্তে আসিয়া ঐ ঐক্যবিষয়ে নিরন্তর ধ্যান করিতে হইবে। উহারই নাম নিদিধ্যাসন। ঐ নিদিধ্যাসনের ফলে মন ব্রহ্মাকারাকারিত হইয়া নির্বিকল্পরূপে অবস্থান করে। ঐক্যবোধের প্রতিবন্ধক অজ্ঞান অপসৃত হয়। চিদাভাস পরব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন হয়।

এই সত্য-উপলব্ধি-বিষয়ে শুদ্ধ মনই প্রধান সহায়। ধ্যান ও সমাধি, সবিকল্প ও নির্বিকল্প—এ সবই মনের অবস্থাবিশেষ। এগুলি জীবের নিকট আত্মার প্রকাশের প্রতিবন্ধক দূর করে। মৈত্রায়ণী উপনিষৎ সত্যই বলিয়াছেন:

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্॥

মন যতদিন বিষয়-চিন্তায় আসক্ত, ততদিন মুক্তি ঈশ্বরলাভ প্রভৃতি কথার কথা। মন যে পরিমাণে ঈশ্বরে নিবিষ্ট, সেই পরিমাণে বন্ধনের নাশ—সত্যের অনুভূতি। ষোল আনা মন ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে ঈশ্বরের যথাযথ স্বরূপের অনুভব—সাংসারিক ভাবের আত্যন্তিক বিনাশ।

উপাসনাদির ফলে যাঁহাদের মন অন্তর্মুখীন ও সূক্ষ্মতত্ত্ব অবধারণে সমর্থ, তাঁহারা বিচারের

৯ বৃহদারণ্যক—৪।৫।৬ ১০ বৃহদারণ্যক—৪।৫।৬

দ্বারা এই তত্ত্ব সহজেই বুদ্ধিতে আরূঢ় করাইতে পারেন। অপর সকলকে গুরুনির্দিষ্ট পথে ধ্যানাদির অভ্যাস করিয়া বুদ্ধির ঐ শুদ্ধাবস্থা আনয়ন করিতে হয়। তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে শুদ্ধ আত্মার বন্ধন নাই, কাজেই তার মুক্তিও নাই। তিনি সদামুক্ত। বন্ধন জীবের, অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃ অন্তঃকরণের সহিত একীভাবাপন্ন চৈতন্যের। তত্ত্বতঃ চৈতন্য অন্তঃকরণের সহিত এক হইয়া যায় না। কেননা জড়ের সহিত চৈতন্যের এক হওয়া সম্ভব নয়, তথাপি সাধারণ মানুষের ব্রহ্মবিষয়ে এই অজ্ঞান সুপরিচিত। পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞান সেই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যকে কখনই আবৃত করিতে পারে না; কিন্তু উহা মানুষের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে অর্থাৎ জীবের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আসিতে দেয় না যে, সে সত্য সত্যই অজ্ঞানের পারে অবস্থিত নিত্যমুক্ত আত্মা। ভোগাকাঙ্ক্ষারূপ মলিনতা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইলে শুদ্ধচিত্ত সাধক গুরুমুখে সত্য শ্রবণ করিয়া তাহার মর্ম সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারেন। তিনি তখন প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারেন যে তিনি চিরকাল মুক্ত আত্মাই ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন।

নিজ মন দেখিয়াই সাধক তাহা বুঝিতে পারিবেন তিনি কিরূপ অধিকারী। বিশেষ গুরু এ বিষয়ে পরম সহায়ক। উপনিষৎ অনধিকারীকেও অধিকারী করিবার জন্য নানাবিধ উপাসনার বিধান করিয়াছেন। উহা দ্বারা সাধক উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করিয়া পরিশেষে চরম সত্যের দ্বারে উপস্থিত হন। সংযত জীবনযাপন করত সাধক যাহাতে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হন, তজ্জন্য কঠোপনিষদে সাবধানী বাণীও শ্রুত হয়:

নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

—যিনি অসৎ কর্ম হইতে বিরত, সংযতেন্দ্রিয়, প্রশান্তমনা, সমাহিতচিত্ত তিনিই জ্ঞানের দ্বারা এই আত্মাকে উপলব্ধি করেন—অপরে নহে।

উপরি-উক্ত সাধনাদির দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষ শরীরে থাকিলেও অশরীরী। তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি কর্মরত হইলেও তিনি অকর্তা। এতকালের ধাঁধাঁ তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত। সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের আত্মা আর সীমাবদ্ধ নহে; সকলের আত্মাই আজ তাঁহার আত্মা। এ জগতে কেহই তাঁহার পর নাই; সকলেই তাঁহার আপন। ভয় বা দুর্বলতার আর স্থান কোথায়? অপর কেহ থাকিলে তো ভয়! শরীরাদিতে অভিমান থাকিলে তো দুর্বলতা! তিনি যে আজ জ্ঞানবলে বলী।

আজ বিশ্বে যে নানা ভাববিপর্যয়, পরস্পরের প্রতি যে দ্বেষ ও অবিশ্বাস; পরস্পরকে বিনাশের যে অশ্রুতপূর্ব আয়োজন দেখা যাইতেছে, উপনিষদুক্ত এই একাত্মবাদই তাহার প্রতিষেধক। এই মহতী চিন্তাধারাই পৃথিবীর সমগ্র মানবসমাজকে একতাসূত্রে বন্ধন করিতে সমর্থ। উপনিষদের ভাবধারায় স্নাত সমদর্শী মহাপুরুষই অন্তরের গভীরতম অনুভূতির সহিত এই কল্যাণময়ী বাণী উচ্চারণ করিতে পারেন:

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

দুই আমি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আমি দিবালোকে দাঁড়াইয়া আছি—রাজপথের পাশে, শহরের মাঝখানে, আকাশের নীচে। পথের উপর দিয়া গাড়ী ছুটিতেছে, মানুষ হন্তদন্ত হইয়া চলিতেছে, নগরীর বহুতর কর্মব্যস্ততার নানাবিধ শব্দ অবিচ্ছিন্নভাবে আমার কানে আসিয়া ঢুকিতেছে। বিংশ শতাব্দীর আকাশে পাখীরা ডানা নাড়িতেছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে—কেননা সেথায় আধিপত্য করিতেছে বিকট গোঙানি তুলিয়া তীব্রবেগে উড্ডীয়মান ছোট বড় কত রকমের বিমান। পাখীরা তো ভয় পাইবেই। দিনের আলোতে দাঁড়াইয়া আমি লক্ষ লক্ষ মানুষের একজন হইয়া আমার পারিপার্শ্বিকের কথা, আমার নিজের কথা ভাবিতেছি।

আমার দশদিকে যে বিপুল চাঞ্চল্য, আমিও উহার সহিত মিশিয়া আছি। ঐ চাঞ্চল্য অপরিহার্য প্রয়োজনে সৃষ্টি করিয়াছি আমিই এবং আমারই মতো হাজার হাজার নরনারী। জীবনধারণের জন্য এবং জীবনের বহুমুখী আনন্দ উপভোগের জন্য আমাদের প্রত্যেককে ভাবিতে হয়, নানা উদ্যম আনিতে হয়, বহু দিকে বহু ভাবে ছুটাছুটি করিতে হয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না; তাহার অর্থ জীবনকে প্রত্যাখ্যান করা। কিন্তু আমি তো বাঁচিয়া থাকিতে চাই, বাঁচিয়া থাকাকে নানাভাবে সার্থক করিয়া তুলিতে চাই; অতএব আমাকে ছুটিতে হয়, প্রচণ্ড গতিবেগ আনিতে হয় আমার দেহে, মনে, স্নায়ুমণ্ডলীতে, রক্তপ্রবাহে, আমার চারিপাশে; আমার পক্ষে উপায়ান্তর নাই। যতক্ষণ আমি দিবালোকে রাজপথের পাশে দাঁড়াইয়া আছি, ততক্ষণ আমার কর্মচঞ্চল পরিবেশ আমা হইতে পৃথক্ নয়। আমিও চঞ্চল, চাঞ্চল্য আমার স্বধর্ম। আমাকে অতি সকালে বাজারে গিয়া শাক মাছ আটা হলুদ তেল কিনিয়া সওয়া সাতটার মধ্যে বাড়ীতে পৌছাইয়া দিতে হয়, নতুবা কিছু নাকে মুখে গুঁজিয়া সাড়ে নয়টায় ট্রাম ধরিতে পারিব না। আমাকে সাত আট ঘণ্টা—ভাল লাগুক বা না লাগুক—আফিসে বসিয়া কলম পিষিতে হয়, তাহার পর আবার বাসে ট্রামে ভিড় ঠেলিয়া দাঁড়াইয়া বা বসিয়া অর্ধমৃত অবস্থায় গৃহে ফিরিতে হয়। তখনও ছুটি নাই। গৃহের কত রকমের সমস্যা লইয়া ভাবিতে হয়, উহাদের সমাধানের জন্য ছুটাছুটি করিতে হয়। খাইয়া দাইয়া যে কয়েক ঘণ্টা ঘুমাইয়া থাকি, সেই সময়টুকু বোধ করি ছুটাছুটি হইতে নিষ্কৃতি পাই। অবশ্য কখনো ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ঘুমের ব্যাঘাতও ঘটে। পুনরায় সকাল, পুনরায় থলি লইয়া বাজারে যাওয়া, আফিস, বাড়ী। দিনের পর দিন এই ভাবে আমার দিন কাটে—ছুটিয়া, হাঁপাইয়া, ঘামিয়া, আধমরা হইয়া। নিয়মিত কার্যক্রম অনুসরণ করিয়াও নিষ্কৃতি নাই। মাঝে মাঝে ছুটাছুটি বাড়ে—অসুখ-বিসুখ, সাংসারিক আপদ-বিপদ, টাকার টানাটানি, সামাজিক লেন-দেন ইত্যাদি তো লাগিয়াই আছে। কিন্তু করিব কি? ইহা যে আমার জীবন-ধর্ম, ইহা যে আমার ঈপ্সিত।

আমি যদি কলিকাতা শহরে মার্চেন্ট আফিসের কেরানী না হইয়া উকীল হইতাম, কিংবা ডাক্তার বা ইনসিওরেন্সের এজেন্ট বা ব্যবসায়ী হইতাম, অথবা মাষ্টার বা অধ্যাপক হই-

তাম—তাহা হইলে আমার থাকা-খাওয়া-পরার সুখের হয়তো কিছু তারতম্য ঘটিত, কিন্তু জীবনের প্রবল ঘূর্ণাবর্ত হইতে অব্যাহতি পাইতাম কি? ছুটাছুটি থামিত কি? না। কেরানী-জীবনের কতকগুলি নির্দিষ্ট অলিগলি আছে, আমি উহাদের ভিতর দৌড়াদৌড়ি করি; উকীলবাবু ডাক্তারসাহেব, মাষ্টারমহাশয় প্রভৃতি—ইঁহাদেরও ছুটিতে হয়, তবে অন্য রাস্তা দিয়া—এই পর্যন্ত। দিবালোকে, রাজপথের পাশে শহরের মাঝখানে, আকাশের নীচে আমরা সকলেই একটি জায়গায় এক,—আমরা প্রত্যেকেই ছুটিতেছি, ছুটিতেছি, ছুটিতেছি—রাজপথে গাড়ী-ঘোড়ার মতো, আকাশে এয়েরোপ্লেনের মতো। 'চরৈবেতি চরৈবেতি'—এই বেদমন্ত্র বোধ করি আমাদেরই জন্য উচ্চারিত হইয়াছিল।

দুই হাজার বৎসর আগেও মানুষ ছুটিত। যে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চায়, যে মানুষ এই সুন্দর পৃথিবীতে জীবনের পানপাত্র পরিপূর্ণ ভাবে পান করিতে চায় তাহাকেই ছুটিতে হয়। ইহা বিশ শতাব্দী আগেও যেমন সত্য ছিল, এই বিংশ শতাব্দীতেও তেমনই সত্য। তবে বিংশ শতাব্দীতে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি অনেক বদলাইয়াছে, উহা প্রাচীনকালের তুলনায় অনেক বেশী জটিল এবং সেইজন্য মানুষের ছুটিবার ধরনও এখন বহুতর বক্র। আগে মানুষ ছুটিতে ছুটিতে এক একবার পিছনে তাকাইত, একটু দম লইবার অবসর পাইত, মাঝে মাঝে লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিত। এখন মানুষকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ছুটিতে হয়, আশে পাশে তাকাইবার মৌকা নাই, একদণ্ড বিশ্রামের ফুরসত নাই। সংসারের এত জিনিস এখন করায়ত্ত করিতে হয়, এত রকমের জ্ঞান বিজ্ঞান মগজে ঢুকাইতে হয়, এত বিচিত্র তামাসা দেখিয়া লইতে হয়, এখন মানুষের নিশ্বাস ফেলিবার সময় কোথায়? বিংশ শতাব্দীর দিবালোকে দেহ-মনযুক্ত যে মানুষ আমি—আমার সহিত বিংশ শতাব্দীর অনেক তীব্রগতি যন্ত্রের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। আমরা উভয়েই কর্ম-পাগল, আমরা উভয়েই অনবরত ছুটিয়া চলি, ছুটিবার মুখে প্রখর তাপ উদ্গিরণ করি, অপরের চোখ ঝলসাইয়া দি। আমরা উভয়েই দুর্বার, দুরন্ত, নির্মম।

আমার জীবনের এই যান্ত্রিক গতিবেগের ভাল মন্দ দুটা দিকই আছে। ভাল দিক এই যে, উহা আমাকে উন্নতির পথে, সুখের পথে, সমৃদ্ধির পথে লইয়া যায়, আমার অসাড় অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে, আমার পৌরুষকে সার্থক করে। আর মন্দ দিক বোধ করি এই যে, উহা আমাকে গতানুগতিকতার দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখে, আমার আত্মিক স্বাধীনতা খর্ব করে, আমাকে ভাবিবার অবসর দেয় না, বর্তমান গতিবেগের ঊর্ধ্বে কোনও উচ্চতর স্থিতির প্রশ্ন একেবারেই চাপিয়া রাখে।

* * *

আমি দিবাশেষে রাজপথ হইতে কিছু দূরে বসিয়া আছি। শরীর অসুস্থ হইয়াছে, পর পর অনেকগুলি দ্বন্দ্বে মনও অবসন্ন। রাজপথের শব্দ কানে আসিতেছে, কিন্তু আমার কাছে উহা যেন বিরক্তিকর বোধ হইতেছে। শরীর-মনে বল পাইতেছি না, উৎসাহ পাইতেছি না। জীবনের গতিবেগ যেন মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। উল্টা প্রশ্ন মনে উঠিতেছে, এত ছুটিতেছিলাম কেন? টাকার জন্য? পারিবারিক নিরাপত্তা—সাংসারিক সুখের জন্য? সামাজিক প্রতিপত্তি, বিদ্যার খ্যাতির জন্য? হাঁ, তাই। এইগুলি চাই বলিয়াই আমাকে খাটিতে হয়, ছুটিতে হয়। 'এই সবে আমার প্রয়োজন নাই'—যদি জোর করিয়া বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে অনেক

ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যাইত। কিন্তু ঐরূপ বলা তো আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাহা ছাড়া ঐরূপ বলা সমীচীনও কি? মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি যখন, তখন মানুষ-জীবনের স্বাভাবিক চাহিদাগুলি হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিব কেন? উহা তো মৃত্যুর লক্ষণ। লক্ষ লক্ষ মানুষ যে বিদ্যা উপার্জনের জন্য, অর্থোপার্জনের জন্য, পারিবারিক সুখের জন্য, নানাবিধ আমোদপ্রমোদের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে, আমাকেও ঐ পথে যাইতে হইবে। ইহাই তো স্বাভাবিক, ইহাই তো সঙ্গত। অন্য প্রকার ভাবাও যে বড় দুঃসাহসের কথা।

কত বিদগ্ধ বুধমণ্ডলী জীবনের জয়গান করিয়া গিয়াছেন। সংসারের উন্নতি, স্ত্রীপুত্র-পরিবারের স্বর্গীয় ভালবাসা, সামঞ্জস্যপূর্ণ গৃহের নিবিড় শান্তি, জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য, নৃত্যগীত, সামাজিক সম্মেলন, উৎসব—এ সবই মানবজীবনের ভিন্ন ভিন্ন দিক। তাঁহারা নানাভাবে এই সকলের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন, এই সকল বিষয় লইয়া কত বড় বড় বই লিখিয়াছেন। প্রত্যেকটির মূল্য আছে, প্রত্যেকটির গভীর সার্থকতা আছে। অতএব জীবনের এই সব মূল্য আমাকেও স্বীকার করিতে হইবে। ঐ সব ক্ষণজন্মা প্রসিদ্ধ জ্ঞানী গুণী ব্যক্তির চেয়ে আমি কি বেশী বুদ্ধিমান্? অতএব না, আমি জীবনের স্বাভাবিক গতি সম্বন্ধে কোন সংশয় তুলিব না। সুবোধ বালকের মতো জীবনকে স্বীকার করিব। জীবনের সার্থকতার জন্য অপরিহার্য যে ছুটাছুটি তাহা মানিয়া লইব; ঘাম ছুটিবে—তা ছুটুক। কষ্ট হইবে, কখনো হাত পা ভাঙিবে, তা উপায় কি? দিবাশেষের চিন্তা আমার অলস দুঃস্বপ্ন। দিবালোকের উজ্জ্বল সত্যই আমার অপ্রত্যাখ্যেয় সত্য, দিবালোকের অকুণ্ঠিত অনুসরণই আমার স্বধর্ম।

আমার পায়ের নীচে এই বিস্তীর্ণা পৃথিবী, এই পৃথিবীর বুকের উপর মানুষের অসংখ্য কীর্তি, আমার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। আমি আজ অনন্ত মহাকাশকে আমার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়া পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছি। একদা, আমি বিশ্বপ্রকৃতির বিশালতায় ভীত, বিমূঢ় হইতাম। তখন মনে হইত প্রকৃতির নানা শক্তির কাছে আমার জীবন একটি অসহায় ক্রীড়নক মাত্র। এখন আর আমার সে ভয়—সে অসহায়তা নাই। প্রকৃতির রহস্যনিচয় আমি আজ একটির পর একটি উদ্‌ঘাটন করিয়া চলিয়াছি। বিশ্বপ্রকৃতি বিশাল—অতি বিশাল, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি সেই বিশালতার মর্মবোদ্ধা। আমার মেধা, আমার উদ্ভাবনী প্রতিভা বুক ফুলাইয়া প্রকৃতির সামনে দাঁড়াইতে পারে। আমি বিংশ শতাব্দীর দিবালোকের মানুষ—আমি বৃহৎ, আমি অপরাজেয়।

*　　*　　*

কিন্তু জানিতাম কি প্রাবৃট্‌কালে আকাশে কালো মেঘের নিরুপম শোভা দেখিতে দেখিতে এক মুহূর্তে অঘটন ঘটিতে পারে? এক মুহূর্তে মেঘের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতে পারে—চমকাইয়া ঘনপ্রসারিত মেঘপুঞ্জকে চোখের পলকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে? আকাশে তাকাইয়া ছিলাম, মেঘের খেলা দেখিতেছিলাম, বিদ্যুৎ যে কোথায় লুকাইয়া ছিল, জানিতাম না। কিন্তু হঠাৎ যখন সে দেখা দিল—তাহার আকাশ-হইতে-ভূমিতল-স্পর্শ-করা বিশাল দীপ্তি দেখিয়া অবাক্ হইলাম। আকাশে মেঘ থাকে, বিদ্যুৎও থাকে—কিন্তু বিদ্যুতের শক্তি এবং ক্রিয়া মেঘের অপেক্ষা কত অধিক!

আমার দিবালোকের পৃথিবীকে চমকিত করিয়া দিবালোকচারী আমার দৃপ্ত অহমিকাকে

স্তম্ভিত করিয়া বিদ্যুল্লেখার দীপ্তির মতো এক নূতন সত্য আমার চেতনায় নামিয়া আসিল; কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া আসিল—তাহা জানি না, জানিবার প্রয়োজন নাই। সেই সত্য আমার অতি পরিচিত রাজপথকে, রাজপথের কর্মপ্রবাহকে, আমার গতানুগতিক জীবনযাত্রাকে, আমার আমাকে—আকাঙ্ক্ষাকে, লক্ষ্যকে, চেষ্টাকে যেন 'ন স্যাৎ' করিয়া দিতে চায়। আমার প্রাচীন সংস্কার, আমার চিরা-চরিত অভ্যাস, আমার বিশ্বাস, জ্ঞান, যুক্তি, শক্তি সকলই যেন আমার নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে। আমি যেন আমাতে নাই, আমার পুরাতন 'আমি'র এক অভিনব রূপান্তর ঘটিয়াছে। এক নূতন 'আমি' আমাতে ভর করিয়াছে। এ কি মৃত্যু না নূতন জন্ম? এ কি অন্ধকার না আগন্তুক আলোক? এ কি রিক্ততা, না সম্পন্নতা?

যে আমি লক্ষের একজন হইয়া, ধাবমান সংসারযাত্রায় নিজেকে লীন করিয়া, ঘাত-প্রতিঘাত আশা-নিরাশা তৃপ্তি-বেদনার মধ্য দিয়া নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া ফিরি—যে আমি অবিচ্ছিন্নগতি পারিপার্শ্বিকের ঘূর্ণাবর্ত হইতে নিজেকে কিছুতেই পৃথক্ করিতে পারি না, ঘূর্ণাবর্তের সহিত মিশিয়া অবিরত ঘুরিয়া মরি—সে আমি এই নূতন আমির কাছে—বিদ্যুতের কাছে মেঘের মতো একান্তই সাধারণ, ক্ষুদ্র, দুর্বল, ভঙ্গুর। আমার সেই ক্ষুদ্র 'আমি' এত কাল এত ভাবে যাহা কিছু ভাবিয়াছে, বলিয়াছে, করিয়াছে তাহাদের নিজস্ব মূল্য ছিল—সার্থকতা ছিল, কিন্তু আমার বৃহৎ নূতন 'আমি'র বিদ্যুদ্দীপ্তির নিকট সে মূল্য সামান্য, সে সার্থকতা অকিঞ্চিৎকর। পুরাতন 'আমি' দেহের মধ্যে ছুটাছুটি করে; প্রাণের স্পন্দনের সহিত নাচে, মন-বুদ্ধির আন্দোলনের সহিত ওঠে নামে, ইন্দ্রিয়বেদ্য বস্তু ও ঘটনানিচয়ের বাহিরে আর কিছু দেখিতে পায় না, দেখিতে চায় না। বৃহৎ 'আমি'র কিন্তু কোন সীমা নাই। দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, এই অতি বিস্তৃত দেশ-কালে পরিধির অসংখ্য বস্তু ও ঘটনাসমূহ বৃহৎ 'আমি'র মাত্র এক তুচ্ছ বিন্দুতে অবস্থান করে। বৃহৎ 'আমি'র অনন্ত অপরিসীম ভূমা সত্য ক্ষুদ্র 'আমি'র সকল কল্পনার বাহিরে।

আমার বৃহৎ 'আমি' যখন আকাশে লুকাইয়া আছে, তখন রঙ্গমঞ্চের সমস্ত দৃশ্য নৃত্য সঙ্গীতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক হইল আমার ক্ষুদ্র 'আমি'—যে-আমি কেরানী, যে-আমি উকীল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, মাষ্টার—যে আমি অনবরত ছুটিতেছে, এই সংসারকে একান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে—যে-আমি এই সংসারের বিত্ত-বিভব জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিবার-সমাজের একনিষ্ঠ উপাসক। বিংশ শতাব্দীতে আমার এই ছোট-আমির বিদ্যা ও ঐশ্বর্যের অভিমান, কীর্তির দম্ভ, ক্ষমতার ঔদ্ধত্য—সকল ভব্যতার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। সেক্ষেত্রে বৃহৎ-আমির আকাশে লুকাইয়া লুকাইয়া হাসা ছাড়া আর কি করিবার আছে? ক্ষুদ্র-আমির সহিত রঙ্গমঞ্চে প্রতিযোগিতা? ছি ছি লজ্জার কথা! বৃহৎ-আমি যে সম্রাট্—তাহার তো কোন অভাব নাই, দৈন্য নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, প্রয়োজন নাই।

আমার দুই আমি—ক্ষুদ্র-আমি ও বৃহৎ-আমি। ক্ষুদ্র-আমির উপাদান কাঠ, মাটি, খড়, আলকাতরা; বৃহৎ-আমি হইল উৎপত্তি ও বিনাশহীন স্বয়ংজ্যোতি চৈতন্য। ক্ষুদ্র-আমি অন্ধ, মূঢ়, বদ্ধ—বৃহৎ-আমি সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, চিরমুক্ত। যখন বৃহৎ-আমির সন্ধান পাই নাই, তখন ক্ষুদ্র-আমির সহিত মিশিয়া কত উন্মত্ত আচরণ করিয়াছি, কত প্রলাপ বকিয়াছি, কত ভয় পাইয়াছি, কত বেদনা, কত অপমান সহিয়াছি। বৃহৎ-আমিকে যখন বুঝিয়াছি

তখন সে আমাকে শান্ত করিয়াছে, নম্র করিয়াছে, নির্ভয়, নিসংশয় করিয়াছে।

আমার বৃহৎ 'আমি' আমার অনুপম ঐশ্বর্য। বৃহৎ 'আমি'তে দাঁড়াইয়াই আমি জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজিয়া পাই—জন্ম ও মৃত্যু, আশঙ্কা ও অভাব, সংগ্রাম ও পরাজয়—এই দ্বন্দ্বসমূহের পারে নিরাবরণ সত্যকে লাভ করি। বৃহৎ 'আমি'তেই মানুষের সর্বোত্তম, বৃহত্তম, সুন্দরতম মহিমা—মানুষের ঈপ্সিততম ভালবাসার পূর্ণ অভিব্যক্তি।

যখন বৃহৎ 'আমি'কে দেখি নাই তখন ভাবিতাম—আমার ক্ষুদ্র 'আমি'ই বুঝি সব। বৃহৎ 'আমি'কে দেখিয়া বুঝিলাম, কী ভুলই করিয়াছি! 'বৃহৎ আমি'-রূপে আমি আছি, বরাবরই আছি। 'ক্ষুদ্র আমি' সাজিয়া আমি যখন আত্মভরিতা করি, তখনও আমি জানি আর না জানি, আমি 'বৃহৎ আমি'তেই আশ্রিত। ক্ষুদ্র-আমি বৃহৎ-আমির একটি বিকৃত ছায়া মাত্র।

আমি যেন আমাকে ঢাকিয়া না রাখি। আমি যেন আমাকে বরণ করি, বিশ্বাস করি, গ্রহণ করি। আমি যেন আমাকে দেখিয়া ভীত না হই, সংশয়াচ্ছন্ন না হই। আমি যেন আমাতে বাস করি, বিলাস করি, আমি যেন আমাতেই তৃপ্ত হই, শান্ত হই, পূর্ণ হই।

শ্যামাসঙ্গীত

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মাগো,—ডাকিতে জানি না তাই, তাই তুমি আস না।
চাহিতে জানি না তাই মিটেনাক বাসনা।
বৃথা করি আরতি মা বৃথা করি প্রণতি,
হৃদয়ে মোদের নাই এক কণা ভকতি,
বাহুতে পাই না তাই বীরোচিত শকতি
হাসিতে জানি না মাগো, তাই তুমি হাস না॥
রুদ্রাণীরূপ তব, নহ তুমি নিদয়া
ভয়ের ছলনা কর, জানি তুমি অভয়া,
জননী কি হয় কভু অকরুণ-হৃদয়া,
না যাচিতে কর দয়া, মাগো তাপনাশনা॥
এক হাতে বরাভয় আর হাতে খড়্গ,
তব পদে রাজে মাগো চারি অপবর্গ,
যে পায় তোমার কৃপা চায় না সে স্বর্গ,
নরকবারিণী তুমি অন্তক-শাসনা॥
তনয় ভুলিতে পারে, মা তো কভু ভোলে না,
দ্বারে করাঘাত দিলে মা কি দ্বার খোলে না?
দুলাল অশুচি বলি মা কি কোলে তোলে না?
সেই ভরসায় রই শিব-হৃদয়াসনা॥

প্রাণের ঠাকুর এস ফিরে

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মানুষ বিভ্রান্ত আজি পরাশ্রয়ী অশান্ত জীবনে,
পরম ক্ষুধায় তার চিত্ত নহে অস্থির চঞ্চল,
উদরে ক্ষুধার জ্বালা, আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ক্ষণে ক্ষণে
পৃথিবীরে মনে হয় সর্বরিক্ত চির-নিঃসম্বল।

আজন্ম অশেষ স্নেহে যে শস্যশালিনী ভূমি-মাতা
নির্বিচারে সন্তানেরে পালন করেছে অকাতরে,
বৈমাত্রেয় দুষ্ট বুদ্ধি আজি হ'ল পরামর্শদাতা,
তারে চির-বন্ধ্যা বলি পরিহার করে অনাদরে।

স্ব-দেশের স্বর্ণধূলি শ্রদ্ধাভরে রাখে না মাথায়
দেবতারে দূরে ঠেলি সভা করে পূজার মন্দিরে,
ভুলেছে সাধন-মন্ত্র, নাস্তিকের প্রশস্তি-গাথায়
ন-স্যাৎ করিয়া দেয় শুভঙ্করী বিজয়-চণ্ডীরে।

তাইতো প্রার্থনা করি, হে ঠাকুর, এস এস ফিরে—
তব যাদুস্পর্শে দাও নবজন্ম আর এক জীবনে,
চরণে আশ্রয় মাগি পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-তীরে
চিনুক আপন মায়ে, মাতৃপূজা শুভ উদ্বোধনে।

মহালগ্নে দেবীপূজা, বঙ্গভূমি পাদপীঠ তার,
তুমি তার পুরোহিত, তোমার অঞ্জলি হ'তে দেবী
নিজ হস্তে নিয়েছেন হাস্যমুখে অমৃতসম্ভার
তব চিত্তবিনিঃসৃত। মহা তপস্যায় ইষ্টে সেবি

দাঁড়ালে সেদিন তুমি, অন্ধকারে মগ্ন চারিধার—
আনিলে বিবেক-জ্যোতি, প্রভাতের উৎসারিত আলো,
মানব-চৈতন্যে এল কি অপূর্ব অনুভূতি তার !
বহু পথ বহু মত—এক হ'য়ে তোমাতে মিলালো।

তোমারে স্মরণ করি, হে পরমতৃষ্ণা-নিবারণ,
বহু তপস্যায় লব্ধ তব মহাজীবনের সুরে
ব্যাপ্তিতে তৃপ্তিতে আজ দীপ্ত হোক অপ্রবুদ্ধ মন;
গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গে মোহের মালিন্য যাক দূরে।

আলোহীন প্রাণহীন এ নীরন্ধ্র সংশয়-তিমিরে
এস এস প্রাণারাম, প্রাণের ঠাকুর এস ফিরে।

সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একদিন এক ব্রাহ্ম ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মহাশয়! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে নানা মত কেন? কেউ বলে—সাকার, কেউ বলে—নিরাকার, আবার সাকারবাদীদের নিকট নানা রূপের কথা শুনতে পাই। এত গণ্ডগোল কেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোন গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তাহলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না, সব খবর পাবে কেমন ক'রে?'

ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন যা বলেছিলেন, আজ তাঁর সম্বন্ধেই তা প্রযোজ্য ব'লে মনে হয়। তাঁর মধ্যে এতগুলি ধর্মভাবের ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির সমাবেশ ছিল যে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বুঝা ও তাঁর সর্বভাবের কথা ঠিক ঠিক ভাবে বলা আমাদের মতো লোকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। তাই আজ তাঁর সম্বন্ধে শিক্ষিত ও পণ্ডিত লোকদের মধ্যে নানা মত দেখতে পাই ও নানা ভাবের কথা শুনতে পাই। অবশ্য তাঁরা সকলেই তাঁর সর্বধর্ম-সমন্বয়ের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু এই সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মূলে যে তাঁর মধ্যে সব ভাবের ও অনুভূতির সমাবেশ আছে, সে কথা তাঁরা সব সময় বুঝেন বা স্বীকার করেন ব'লে মনে হয় না। কেহ তাঁকে পরম কালীভক্ত বলেন, কেহ পরম জ্ঞানী বলেন; কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন; কেহ তাঁকে পরম যোগী মনে করেন, কেহ বা তাঁকে নিষ্কাম কর্মী বলেন। আবার কেহ কেহ তাঁর ভক্তি ও অদ্বৈতজ্ঞানকে বিরুদ্ধ ভাবের অসংহত ও অসঙ্গত সমাবেশ মনে করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবন এবং ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে এরূপ বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ ধারণা তাঁর অপূর্ব অলৌকিক অধ্যাত্ম-জীবনের সম্পূর্ণ বা সত্য বর্ণনা নয়। এক একটি ধারণা তাঁর দিব্য জীবনের এক একটি দিক স্পর্শ করে মাত্র এবং উহা আংশিকভাবে সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। এস্থলে ভগবান বুদ্ধ ও যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের দুটি উপদেশপূর্ণ গল্পের কথা মনে পড়ে। এক সময় বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, 'চার অন্ধ ব্যক্তি যেমন এক হাতীর দেহের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ ক'রে তার সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করে এবং প্রত্যেকে নিজ ধারণাটিকেই সত্য ব'লে পরস্পর কলহ করে, তেমনই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিকগণ আংশিক সত্যমাত্র জেনে পরস্পরের মত খণ্ডন করবার জন্য কলহে প্রবৃত্ত হন।' শ্রীরামকৃষ্ণ যে গল্পটি বলতেন তা আরও সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। তিনি বলতেন: একজন বাহ্যে গিছিল। সে দেখলে যে গাছের উপর একটি জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বললে, 'দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম।' লোকটি উত্তর করলে, 'আমি যখন বাহ্যে গিছিলাম, আমিও দেখেছি—তা সে লাল রঙ হতে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ।' আর একজন বললে, 'না, না, আমি দেখেছি—হলদে।' এইরূপে আরও কেউ কেউ বললে,

'না জরদা, বেগুনী, নীল' ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি—তোমরা যা যা ব'লছ, সব সত্য—সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন নীল, আরও সব কত কি হয়। আবার কখন দেখি, কোনও রঙ নাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনায় যেন অনন্ত ভাবধারার সমাবেশ ও সমন্বয় দেখা যায়। তাঁকে যিনি যেভাবে দেখেছেন, অথবা তিনি যাঁর কাছে যেভাবে দেখা দিয়েছেন, তিনি তাঁকে সেইভাবে বুঝেছেন। তাই কারও কাছে তিনি জগন্মাতার একনিষ্ঠ ভক্ত, আদ্যাশক্তি কালীর শ্রেষ্ঠ উপাসক বা শাক্ত, কারও কাছে ভগবান বিষ্ণুর পরম ভক্ত বা বৈষ্ণব, কারও কাছে শিবের পরম ভক্ত বা শৈব, কারও কাছে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত মতাবলম্বী বেদান্তী, কারও কাছে ধ্যানমগ্ন রাজযোগী, কারও কাছে নিষ্কাম কর্মযোগী, আবার কারও কাছে সর্বভাবাতীত নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত, নির্বিকল্প সমাধিমগ্ন অদ্বৈতবেদান্তী বা পরম জ্ঞানযোগী।

কখনও তিনি অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা' এই উপদেশ দিয়েছেন, এবং এবং যোগ্য পাত্র দেখে তাকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হবার প্রেরণা দিয়েছেন এবং সন্ন্যাসীর জীবনাদর্শ যে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ ও জীবসেবা তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন। আবার কখনও ভিন্ন অধিকারীকে দ্বৈতজ্ঞানের ও ভক্তি-পথের কথা বলেছেন, এবং ঈশ্বরই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন একথা ব'লে, সংসারে থেকে ভগবানে মন রেখে সংসারধর্ম পালন করতে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর কাছে যিনি যে ঈশ্বরীয় ভাব নিয়ে যেতেন, তাকে তিনি সেই ভাবেই ভাবিত ও অনুপ্রাণিত করতেন। তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপমা তাঁতেই প্রয়োগ ক'রে বলতে হয়, তিনি এমন এক দিব্য রঞ্জক ছিলেন যে তাঁর কাছে যে যে-রঙে কাপড় ছোপাতে চেয়েছে তাকে তিনি সেই রঙেই তা ছুপিয়ে দিয়েছেন, তাঁর এক আধারেই সব রঙ ছিল, কখন কখন তাতে কোন রঙই দেখা যেত না। এখন আমরা যদি বলি, তিনি ভক্ত ছিলেন, জ্ঞানী নয়; শাক্ত ছিলেন, বৈষ্ণব বা শৈব নয়; দ্বৈতবাদী ছিলেন, অদ্বৈতবাদী নয়; তবে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ-বর্ণনা—'বহুরূপী লাল নয়—সবুজ, সবুজ নয়—হলদে' ইত্যাদি বর্ণনার মতো আংশিকভাবে সত্য হলেও সম্পূর্ণরূপে সত্য হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরুর তলে যিনি সর্বদা ব'সে থাকতেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: ঠাকুরের ভাবের ইয়ত্তা করা যায় না, তিনি ছিলেন একাধারে সমভাবে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী, ভক্ত ও জ্ঞানী।—এই বর্ণনাই সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনা।

অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী মানুষের মন জ্ঞানরূপ সূর্যের মেঘাবরণ। মেঘ যেমন মধ্যে মধ্যে সূর্যকে আবৃত ক'রে আমাদের দৃষ্টির অগোচর করে, তেমনই অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী মন কূট তর্কজাল বিস্তার ক'রে জলন্ত ও জীবন্ত সত্যকে অস্পষ্ট ও আবৃত করে। কোন কোন পণ্ডিত ও সাধুলোক বিভিন্ন ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির একত্র সমাবেশ স্বীকার করেন না, অথবা সে সম্বন্ধে সন্দেহ ও আপত্তি করেন। তাঁদের ধারণা শাক্ত মত সত্য হ'লে বৈষ্ণব বা শৈব সিদ্ধান্ত সত্য হ'তে পারে না। সেইরূপ দ্বৈতবেদান্ত ঠিক হ'লে অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত ঠিক হবে না, এবং অদ্বৈত মত ঠিক হ'লে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত ঠিক হবে না। বেদান্ত আলোচনার সময় একদিন একজন খ্যাতনামা দ্বৈত-

বেদান্তী সাধু আমাকে এই কথাই বলছিলেন। বেদান্ত-দর্শনের বিভিন্ন শাখাগুলি পরস্পর বিরোধী নয় এবং তাদের একটা সমন্বয় সাধন করা যায়,—একথা বলায় তিনি আমাকে অনেক ভৎর্সনাও করেছিলেন। বোধ হয় সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় নেই। যাই হ'ক তাঁর বহু তর্কযুক্তির উত্তরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'যদি কোন লোক আপনার সম্মুখভাগ দেখে আপনার এক রকম বর্ণনা দেয়, এবং আর একজন লোক পশ্চাৎভাগ দেখে আর এক রকম বর্ণনা দেয়, তবে সেই দুইটি বর্ণনার মধ্যে কোন্‌টি ঠিক, আর কোন্‌টি ভুল—বলতে পারেন?' তিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলেন না, শুধু বললেন, 'উপমার দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয় হয় না।' কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।

তত্ত্বানুভূতি বা তত্ত্বসাক্ষাৎকারই তত্ত্বনির্ণয়ের প্রকৃষ্ট উপায়। আর একথাও সত্য যে তত্ত্বানুভূতির প্রকারভেদে তত্ত্বপ্রকাশ ও তত্ত্বনির্ণয়েরও প্রকারভেদ ঘটবে। সকলের তত্ত্বানুভূতি এক প্রকার হয় না এবং সেজন্য সকলের তত্ত্বনির্ণয়ও একরূপ বা একপ্রকার হবে না। মানুষের মন যখন যে ভূমিতে থাকে, তার জ্ঞান তখন সেই স্তরে ওঠে এবং তার তত্ত্বানুভূতিও সেই প্রকারের হয়। এ-সম্বন্ধে বেদে মনের সপ্তভূমির কথা আছে। মন যখন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভিদেশে থাকে তখন মানুষের জ্ঞান ইন্দ্রিয়বিষয়ে ও ইন্দ্রিয়সুখে নিবদ্ধ থাকে, এবং তার কাছে পরম তত্ত্ব রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-গুণযুক্ত জড়-জগৎরূপে প্রকাশিত হয়। মনের চতুর্থ ভূমি হৃদয়, পঞ্চম কণ্ঠ, ষষ্ঠ ভূমি ভ্রূমধ্য। মন যখন এসব ভূমিতে ওঠে, তখন মানুষের ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ ও ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। কিন্তু তখন জ্যোতিঃরূপে বা ঈশ্বরীয় রূপে প্রকাশিত তত্ত্ব এবং মানব মন বা মানবাত্মার মধ্যে একটা ব্যবধান থাকে এবং তাদের মধ্যে একটা ভেদ-জ্ঞানও স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে থাকে। এই স্তরে জ্ঞানের উৎকর্ষ ঘটালে মন সমাধিস্থ হয়। এ সমাধিকে যোগশাস্ত্রে সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প সমাধি বলা হয়েছে। এ অবস্থায় সাধক পরম তত্ত্বকে পরা শক্তি, পরমেশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মরূপে অনুভব করেন। তত্ত্বানুভূতির এই প্রকার ভেদে ও জ্ঞানের এই স্তরে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং তার উপরই শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের এবং দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি বৈষ্ণব বেদান্ত-মতের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

শিরোদেশ মনের সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সব চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। তখন আর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, বিষয়ী ও বিষয়, জীব ও ঈশ্বর ইত্যাদি দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। মন তত্ত্বে লীন হয় এবং পরম তত্ত্ব পরম ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। অনুভূতির এই অবস্থাকে তুরীয় বলে এবং জ্ঞানের এই স্তরকে অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বিকল্প সমাধি বলে, এবং এখানে তত্ত্ব সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম-রূপে প্রকাশিত হন। এটি শুদ্ধ অভেদ জ্ঞানের অবস্থা, ইহাই অখণ্ডানুভূতি বা অদ্বৈত জ্ঞান। এই নির্বিকল্প সমাধি ও অখণ্ডানুভূতির উপর যোগীর শুদ্ধ আত্মজ্ঞান ও বেদান্তীর অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত।

এখন আমরা বুঝতে পারি যে মনের বিভিন্ন ভূমিতে, জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে তত্ত্ব কেমন বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয় এবং তা থেকেই বিভিন্ন ধর্মের ও দর্শনমতের প্রতিষ্ঠা হয়। এগুলি বিভিন্ন হলেও এদের মধ্যে একটি মাত্র সত্য, অপরগুলি মিথ্যা—এ কথা বলা যায় না। যেমন একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন সম্বন্ধে পিতা, পুত্র, স্বামী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্বোধনে অভিহিত করা

হয় এবং তার কোনটিই মিথ্যা নয়, কেননা প্রত্যেকটিতেই তিনি কোন না কোন ভাবে বিদ্যমান, তেমনই একই পরম তত্ত্বকে প্রকাশ ভেদে আদ্যাশক্তি কালী, মহাবিষ্ণু, পরম শিব, আত্মা, ভগবান, সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্ম বলা যায়; তার কোনটিই মিথ্যা নয়, কারণ প্রত্যেকটিতে একই তত্ত্ব কোন না কোন ভাবে প্রকাশিত।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জানতে পারে—তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তি জানে যে তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনি সগুণ আবার তিনি নির্গুণ।'

নানা সাধনা ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকার অনুভূতিই লাভ করেছিলেন এবং জ্ঞানের সর্ব স্তর থেকে তত্ত্বের সর্ব রূপের ও ভাবের সাক্ষাৎকার করেছিলেন। তাই তিনি সর্ব ধর্ম ও দর্শনের মহাসমন্বয়ের বাণী দিয়ে গেছেন—'যত মত তত পথ'। এখন আমরা যদি তাঁর ধর্ম বা দর্শনমতকে একটি ক্ষুদ্র কোটরে আবদ্ধ করি, অথবা তাকে এক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ করি, তবে তাঁর সব সাধনা ও শিক্ষাকে অস্বীকার করা হবে। কিন্তু সেটা শুধু ভুল হবে না, তাঁর প্রতি বড় অবিচারও করা হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বভাবময় পরম পুরুষ, সর্বধর্ম-সমন্বয়ের যুগাবতার। যুগপ্রয়োজনেই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। সে যুগপ্রয়োজন হ'ল—বিশ্বব্যাপী ধর্মদ্বন্দ্ব, ধর্মসম্প্রদায়গুলির কলহ, সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও দর্শনমতের বিরোধ দূর ক'রে তাদের মহামিলন সাধন করা। এই যুগপ্রয়োজন আজ সিদ্ধির পথে যাত্রা শুরু করেছে, এবং কালে তা পূর্ণ হবে।

প্রতীক্ষান্তে

শ্রীশান্তশীল দাশ

চিরসুন্দর আমার জীবনে আসবে সে কোন্ রূপে?—
দিনের আলোকে ক্ষিপ্র চরণে অথবা আঁধারে চুপে,
নানালঙ্কারে বিভূষিত হয়ে, অথবা নিরাভরণ,
রূপখানি তার সযতনে ঢেকে বেশবাসে সাধারণ,—
কিছু তো জানি না; বসে আছি শুধু আকুল প্রতীক্ষায়;
অনাদরে যেন দেবতা আমার ফিরে নাহি চলে যায়।

দিন কেটে যায় পথ পানে চেয়ে, আঁধারে সন্ধ্যা নামে;
পথ প্রান্তর জনহীন হয়, কলকোলাহল থামে;
তবু তার দেখা মেলে না তো, কই—সুন্দর এল না যে
মনের গভীরে অস্ফুট সুরে হতাশার সুর বাজে।
আসবে না সে কি? আমার সময় হয়নি এখনো পার?
ব্যাকুল এ মন আসা-পথ পানে ফিরে চায় বারবার।

নিশীথ রাত্রি, স্তব্ধ গভীর, চারিদিক নিঝ্ঝুম,
ক্লান্ত চোখের পাতা দু'টি ঘিরে নামে বিষণ্ণ ঘুম।
সে ঘুমের মাঝে দেখি বিস্ময়ে—খুঁজি যারে বার বার,
আমার সমুখে সে আছে দাঁড়ায়ে, হাসিমাখা মুখ তার।

গ্রন্থাগারে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমার বই-এর ছোট্ট আলমারিতে সারি সারি বিরাজ করেন সমুদ্রের এ-পারের এবং ও-পারের মনীষীরা। তাঁদের কেউ বা অতীতের, কেউ বা বর্তমানের। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এঁদের কথা শুনি, শিক্ষাও পাই, আনন্দও পাই। মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথিবীটা পাগলা-গারদ। হৃদয়ে ঘনিয়ে আসে নৈরাশ্যের অন্ধকার। বুঝতে পারিনে—কি রকমের পরিবর্তন দরকার, কল্যাণময় জীবনের বৈশিষ্ট্যই বা কি? তখন আশার আলো খুঁজে পাই দেশ-বিদেশের চিন্তা-বীরদের লেখার মধ্যে।

হাঁ, পৃথিবীতে যাঁরা চিন্তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে গেছেন দিগ্বিদিকে, তাঁদের সঙ্গে সত্যি কারও তুলনা হয় না। বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলের Principles of Social Reconstruction পড়তে পড়তে দেখি এক জায়গায় লেখা রয়েছে: The power of thought, in the long run, is greater than any other human power. —মানুষের নানা রকমের শক্তি আছে, চিন্তার শক্তির কাছে তারা কিছুই নয়। আর একথা হাজার বার সত্যি যে পৃথিবীতে যুগান্তকারী যত বড় বড় আন্দোলন হয়েছে তাদের উৎসমূলে তো মুষ্টিমেয় চিন্তাবীরের 'আইডিয়া'।

তাই আমার বইয়ের ছোট্ট আলমারিটা আমার কাছে একটা মহাতীর্থ। এই সুদূর গ্রামে সেবা-কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বাধার পর যখন বাধা পেয়েছি, স্বামীজীর পত্রাবলী প'ড়ে তখন সাহস এসেছে, ধৈর্য এসেছে—এসেছে আশা, উদ্দীপনা, উদ্যম। ১৮৯৪ খৃঃ আমেরিকা থেকে লেখা একখানি পত্রে দেখতে পেলাম লেখা রয়েছে:

> হায়! যদি ভারতে একটা মাথাওয়ালা কাজের লোক আমায় সহায়তা করবার জন্য পেতাম! কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে—এখন দেখছি, আমাকে একলা ধীরে ধীরে কাজ করতে হবে।

১৮৯৬ খৃঃ লণ্ডন থেকে লেখা আর একখানি পত্রেও একই নিঃসঙ্গতার কথা। লিখেছেন:

> জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে। যে দেশে লোকের ভাবরাশি সহজে কার্যে পরিণত হ'তে পারে সেই স্থানে এবং সেই সকল লোকের সঙ্গে প্রত্যেকের থাকা উচিত। হায়! যদি দ্বাদশ জন মাত্র সাহসী, উদার, মহৎ ও অকপটহৃদয় লোক পেতুম!

আবার একখানি পত্রে লেখা রয়েছে:

'আর একটা ভূত যদি আমার মতো পেতুম!' পড়ি, ভাবি আর অবাক হয়ে যাই। জনতার মধ্যে স্বামীজী কি রকম নিঃসঙ্গ ছিলেন! কি পর্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্নের মধ্যে তিনি কাজ ক'রে গেছেন! লণ্ডন থেকে লিখছেন এক মহিলাকে:

> আমি শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরবো, পরিবর্তন-বিরোধী থস্‌থসে মাছের ন্যায় অস্থিমজ্জাহীন জড়প্রায় বিরাট দেশটার কিছু করতে পারি কি না দেখতে।

কিন্তু একদিকে যেমন নিঃসঙ্গ ছিলেন তিনি আর একদিকে কি সাহস, কি ধৈর্য! দিগন্ত-প্রসারী অন্ধকারের মধ্যে বসে দিকে দিকে বইয়ে দিয়ে গেলেন বৈপ্লবিক চিন্তার বিদ্যুৎপ্রবাহ। হৃদয়ের মধ্যে এ আশা অম্লান ছিল—তাঁর ভাব-

রাশি ব্যর্থ হবে না কখনও। একদিন না একদিন সেই ভাবের তরঙ্গমালা তাঁর স্বদেশবাসিগণের হৃদয়ে হৃদয়ে জাগাবে একটা নূতনতর প্রেরণা; সকল ক্লান্তি, সকল নৈরাশ্য মিলিয়ে যাবে দেশজোড়া উদ্দীপনার এবং মহাবীর্যের মধ্যে।

আমার ঐ ছোট্ট লাইব্রেরির মধ্যে বিরাজ করছেন যাঁরা, তাঁদের বাণীর মধ্যে কী আশ্চর্য মিল খুঁজে পাই। মাঝে মাঝে 'The Republic of Plato' নেড়ে চেড়ে দেখা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। মগজের কসরত ভালই হয়—আখ চিবোলে যেমন হয় চোয়ালের আর প্লেটোর রসবোধও কী সুতীব্র! প্লেটো যে একজন রসিক পুরুষ ছিলেন—এতে কোন সন্দেহ নেই। কতকাল আগে তিনি লিখে গেছেন তাঁর Republic! কিন্তু সেদিন তাঁর কাছে যে-সব 'আইডিয়া' সত্য ব'লে প্রতিভাত হয়েছিল, আজও তারা আমাদের মনকে কী রকম নাড়া দেয়! বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে-আসা প্লেটোর আইডিয়াগুলি আমাদের কাছে মনে হয় যেন উত্তুঙ্গ গিরিশিখরের বায়ু, যার মধ্যে আছে নবজীবন-সঞ্চারিণী শক্তি। মাদকদ্রব্য-বর্জন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য আজও কত সত্য! এক জায়গায় বলছেন:

And you will grant that drunkenness, offiminacy and idleness are most unbecoming in guardians.

যারা হবে রাষ্ট্রের অভিভাবক, রাষ্ট্রতরণীর পরিচালক, রাষ্ট্রকে রক্ষা করবার দায়িত্ব থাকবে যাদের হাতে, তারা যদি মদ্যপ হয়—তবে তাদেরই রক্ষা করবার জন্যে তো রক্ষী লাগবে। প্লেটো রসিকতা ক'রে বলছেন, "Truly it would be ridiculous for a guardian to require a guard'.—রক্ষককে রক্ষা করবার জন্যে রক্ষীর প্রয়োজন, সত্যি একটা হাস্যকর ব্যাপার! প্লেটো বলেছেন: A guardian is the last person in the world, I should think, to be allowed to get drunk, and not know where he is.

গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাব মার্কিন কবি হুইটম্যানের কবিতাতেও প্রচুর। মদ্যপানকে হুইটম্যানও দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। হুইটম্যানের কাছে পবিত্রতা এবং স্বাস্থ্যের তুল্য আর কিছু নেই। নতুন যুগকে জয় করবার জন্যে সুখ-সম্পদ-মায়া-মমতার বন্ধন ছিঁড়ে পথে বেরিয়েছে যারা, তাদেরই জয়ধ্বনি কবির কণ্ঠে। পথ দুর্গম, বাধা বিপুল। নতুন পৃথিবীকে সৃষ্টি করবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কবির সহযাত্রী হবে যারা, তারা হবে valiant living men! তাদের যোগ্যতা-পরীক্ষার মাপকাঠি সাহস এবং স্বাস্থ্য। তিন শ্রেণীর মানুষকে কবি সঙ্গে নিতে নারাজ। প্রথম—যারা ব্যাধিগ্রস্ত, দ্বিতীয়—যারা মদ্যপায়ী এবং তৃতীয়—কুৎসিত ব্যাধিতে রক্ত যাদের দূষিত। Song of The Open Road কবিতায় হুইটম্যান বলছেন: No diseas'd person, no rum-drinker or venereal taint is permitted here. মাতালকে তিনি তাঁর সহযাত্রীদলে ঠাঁই দিতে মোটেই রাজী নন। হুইটম্যান আগে থাকতেই বেশ সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন: None may come to the trial till he or she bring courage and health. যদি দেহে স্বাস্থ্য এবং মনে সাহস থাকে, তবেই এগিয়ে এসো বাছাধন। আর যদি দেহের মধ্যে রোগ বাসা বেঁধে থাকে, অজানায় ঝাঁপিয়ে পড়তে মন ভয় পায়, তবে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

স্বামীজীর বাণীর মধ্যেও একই সুর। 'পত্রাবলী' পড়তে পড়তে দেখতে পাই কত

সুরে, কত ভঙ্গীতে স্বামীজী নব্যভারতের কানে শুনিয়েছেন শক্তির অগ্নিমন্ত্র—শরীরে শক্তি, মনে শক্তি। হুইটম্যান যেমন বলেছেন, 'Only those may come who come in sweet and determined bodies' স্বামীজীও তেমনই বলেছেন, 'আমি চাই এমন লোক যাহাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত-নির্মিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব; ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ।' স্বামীজীর বজ্রকণ্ঠে বারংবার শুনতে পাই: 'সাহসী হও, সাহসী হও,—মানুষ একবারই মরে। আমার শিষ্যেরা যেন কখনও কোনমতে কাপুরুষ না হয়।' The Master As I saw him এক অপূর্ব গ্রন্থ! এই গ্রন্থে নিবেদিতা লিখছেন—এডেনের কাছাকাছি এক সন্ধ্যায় স্বামীজী তাঁর এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন:

'So I preach only the Upanishads. If you look, you will find that I have never quoted anything but the Upanishads. And of the Upanishads it is only that one idea—Strength. The quintessence of Vedas and Vedanta and all lies in that one word.'

—এই জন্য আমি কেবল উপনিষদের কথাই ব'লে থাকি। তুমি যদি দেখ, দেখতে পাবে আমার সমস্ত কথার মধ্যে শুধু উপনিষদের বাণীই উদ্ধৃত হয়েছে। আর উপনিষদের ভিতর থেকে শুধু শক্তির ভাবই আমি পরিবেশন করেছি। বেদবেদান্তের সার কথা ঐ 'শক্তি'।

এই অমূল্য গ্রন্থে নিবেদিতা আর এক জায়গায় গুরুদেব সম্পর্কে বলেছেন: Strength, strength, strength—was the only quality, he called for in woman as in man.

বাছাবাছা বইগুলির উপরে চোখ বুলাতে বুলাতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের মহামানবদের কণ্ঠে একই আইডিয়ার সমর্থন খুঁজে পেলে মনে হয় দিশেহারা চিত্ত সংশয়-সাগরে একটা আশ্রয় খুঁজে পেল।

যারা পৃথিবীটাকে নূতন ক'রে গড়ে তুলতে চায়, তারা যেন সুখের আশা না করে—এই কথাটা কত মনীষীর কণ্ঠে কত ভঙ্গীতেই না প্রকাশ পেল! রাসেলের Principles of Social Reconstructionএর শেষ পরিচ্ছেদে দেখতে পাচ্ছি লেখা রয়েছে: Those who are to begin the regeneration of the world must face loneliness, opposition, poverty, obloquy.—যারা দুনিয়াকে নবজীবনের পথে এগিয়ে দেবার কাজে হাত দেবে তাদের নিঃসঙ্গতার, বাধার, দারিদ্র্যের এবং লোকনিন্দার সম্মুখীন হতেই হবে। খেতড়ির মহারাজকে লিখিত স্বামীজীর পত্রে দেখতে পাচ্ছি—প্রত্যেক কার্যকেই তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়—উপহাস, বিরোধ ও পরিশেষে গ্রহণ। যে কোন ব্যক্তি তার সময়ের প্রচলিত ভাবরাশি ছাড়িয়ে আরও উচ্চতর তত্ত্ব ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করে, তাকে নিশ্চিতই লোকে ভুল বুঝবে। ১৮৯৫ খৃঃ আমেরিকা থেকে লিখিত পত্রখানিতে লেখা আছে:

বৎসগণ, কামড়ে পড়ে থাক, আমার সন্তানগণের মধ্যে কেউ যেন কাপুরুষ না থাকে। তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যে সাহসী, সর্বদা তার সঙ্গ করবে। বড় বড় ব্যাপার কি কখনও সহজে বিনা বাধায় হ'য়ে থাকে? সময় ধৈর্য ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিতেই কাজ হয়।'

হুইটম্যানের Song Of the Open Road কবিতায় যাদের তিনি মুক্ত পথে আহ্বান করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করেছেন:

He going with me goes often with spare diet, poverty, angry enemies, desertions.

—আমার সহযাত্রীর ভাগ্যে অর্ধাশন, দারিদ্র্য ক্রুদ্ধ শত্রুদল; আপন জন তাকে ছেড়ে যাবে।

রবি ঠাকুরের 'বলাকা'য় শুনি হুইটম্যানের বিবেকানন্দের ও রাসেলের প্রতিধ্বনি। যাদের হাতে পুরাতনের জয়পতাকা, সেই প্রবীণ এবং পাকারা তাদের আঘাত তো হানবেই যারা নতুনকে নিয়ে আসছে আবাহন ক'রে।

'তোরে হেথায় করবে সবাই মানা
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে একী বিষম কাণ্ডখানা।
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা!'

মানুষের আত্মা দেশকালকে অতিক্রম ক'রে আছে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, সক্রেটিস্, হুইটম্যান, টলস্টয়, রাস্কিন, রাসেল, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—মানুষকে মর্যাদা দিলেন না কে?

আর নতুন সমস্যা ব'লে কি পৃথিবীতে কিছু আছে? এক বন্ধুর বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজনের শেষে (কোন্ বইতে ঠিক মনে নেই) পড়ছিলাম: There is nothing new in the world; there are only the old problems happening to new people. মানুষের প্রকৃতি আগেও যা ছিল, আজও তেমনই আছে। তপোবনের ঋষিরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, আমাদের সামনেও সেই সব চির পুরাতন সমস্যা। শুধু নচিকেতার মতো স্বচ্ছ বুদ্ধিকে সহায় ক'রে যদি মৃত্যুর জালকে ছিঁড়ে যেতে পারতাম! মহৎ সাহিত্যের মধ্যে পথের নির্দেশ, আসক্তিকে জয় করবার ইঙ্গিত, ভালোবাসার জয়গান, দুর্বলতার উপরে কটাক্ষপাত।

শরৎ-সকাল

শ্রীপ্রণব ঘোষ

সবুজ সকালখানি,
ঘাসের শীতলপাটি
আঙিনায় পাতা—
নরম ধানের গুচ্ছে
লক্ষ্মীর আসন,
আম জাম নারিকেলে
দিগন্ত গহন,
ছড়ানো মাটির বুকে
রোদের আলপনা।

এখানে প্রাণের তারে
গান বাঁধো
হে মোর স্বদেশ,
কোমলে শ্যামলে মিলে
আলোকে শিশিরে,
অশ্রুর আনন্দ দিয়ে
পূর্ণ করো সুর,
মেঘে মেঘে নীলে নীলে
দূর হ'তে দূর।

প্রতিভা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রতিভার সংজ্ঞা ও উৎস কি?—এ-সম্বন্ধে আমার যা মনে উঠেছে—তাই বলছি, যদিও প্রশ্ন-দু'টির উত্তর দেওয়া মোটেই সহজ নয়।

কেন সহজ নয়? কারণ আমরা সংসারে অনেক কিছুরই সম্বন্ধে যা যা জানি তাদের মধ্যে অনেকখানি অংশই পাতলা মেঘের মতন আমাদের জ্ঞানের আলো-কে খানিকটা আবছা—অনির্বচনীয় ক'রে তোলে। এই অনির্বচনীয়তাকে ইংরেজী ভাষায় 'মিস্‌টিক' বিশেষণ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু 'মিস্‌টিক' কথাটিও কম মিস্‌টিক নয়, অর্থাৎ ওর ভাব হৃদয়ে থিতিয়ে গেলেও রূপের নাগাল পাওয়া শক্ত। আমাদের মনের গভীরে রকমারি আলো, প্রভা, স্ফুলিঙ্গ ঝিক্‌মিক্ করে, কিন্তু তাদের ছোঁয়া গেলেও ধরতে গেলেই ফসকে যায়।

'প্রতিভা' কি বস্তু? 'সৌন্দর্য' কাকে বলে? 'সুরুচি'র সংজ্ঞা কি? 'মায়া' মানে কি? এই জাতীয় নানা প্রশ্নই আমাদের মনের দুয়ারে টোকা মারে প্রায়ই। কিন্তু দুয়ার খুলে তাদের আপ্যায়িত করতে গেলেই দেখি, তাদের সংশয়-গ্রন্থি ছিন্ন করা ভার হ'য়ে ওঠে। এক কথায় যে-সব প্রশ্ন নিয়ে দিনের পর দিন ঘর করতে করতে মনে হয়, তাদের উত্তর খানিকটা জানি; তাদের সঙ্গে নির্জনে মুখোমুখি হ'তে না হ'তে দেখি যে জানার মতন জানি না।

এত কথা বলছি এইজন্য যে, সংজ্ঞা নির্ণয় করতে যাওয়ায় বিপদ পদে পদে। একটা খুব জানা উদাহরণ দিই। প্রতিভা কালেভদ্রে আসে, তাছাড়া সাধারণ মানুষের প্রতিভা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই ব'লে প্রতিভার সম্বন্ধে তাদের বোঝাবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কখনও ভালবাসেনি এমন লোক দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া ভার। অর্থাৎ যদি রাম-শ্যাম-যদু-মধুকে জিজ্ঞাসা করা যায়—প্রেম সম্বন্ধে তারা কি বোঝে, দেখা যাবে সাড়ে পনেরো-আনা মানুষই ভুল জবাব দেবে এবং এক পাই মানুষকেও বোঝানো যাবে না যে প্রেমের প্রাণের কথাটি হ'ল—ভালোবাসতে চাওয়া, ভালোবাসা পাওয়া নয়; অর্থাৎ সত্যিকার প্রেম দেওয়া-নেওয়া নয়। নিধুবাবুর একটি গানে আছে:

'ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসিনে—
আমার স্বভাব এই তোমা বই জানি নে।'

এক তরফা ভালোবাসায় কেউ পুরোপুরি সুখী হ'তে পারে না, কিন্তু একথা নিশ্চয়ই বলছি যে ভালোবাসার যদি স্বভাব এই হয় যে প্রতিদানে চাই প্রেমাস্পদের ভালোবাসার অঙ্গীকার, তবে সে হ'ল বাণিজ্য, আইনের ভাষায়: quid pro quo—আমি দিচ্ছি এই, তুমি দাও ঐ। বিশেষ ক'রে আজকের মানুষকে বোঝানো অসম্ভব খৃষ্ট কি বলতে চেয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, 'নেওয়ার চেয়ে দেওয়ার আনন্দই বেশি।' অসম্ভব এইজন্যে যে মনের মধ্যে খানিকটা অন্ততঃ নিষ্কামভাব না এলে 'নিষ্কাম প্রেম' শুনলে মনে হয় সোনার পাথর-বাটি বা আকাশ-কুসুম—অর্থাৎ ও হয় না, অবাস্তব। তাই হাজার চেষ্টা করলেও তাদের বোঝাতে পারা যাবে না যে রাধার প্রেমের মূল তত্ত্বটি হ'ল আত্মদান, দর-কষাকষি নয়—তুমি ভালোবাসলে তবেই আমি তোমাকে ভালোবাসব, নইলে নয়। রাধার মনের ভাব অঙ্গীকার করেই তো শ্রীচৈতন্য বলেছিলেন:

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্ মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

কোন নব্যা এ কথায় ফোঁস্ ক'রে উঠে বলবেন: 'আহা! কি কথা!' আধুনিকাদের 'আল্টিমেটাম' ফুটে উঠেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমরেরই মুখে—যে সতী হ'য়েও করতে চেয়েছিল শর্ত, গোবিন্দলালকে বলেছিল: 'যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য ছিলে ততদিনই তোমাকে ভক্তি করিয়াছি...' ইত্যাদি। ভ্রমর গোবিন্দলালকে যতই ভালোবেসে থাকুন না কেন, তাঁর সে নিবিড় প্রণয়ও ছিল নীতিসম্মত প্রেম, রাধার প্রশ্নহীন শর্তহীন প্রেম নয়—যে প্রেম শুধু ভালোবেসেই সার্থক—যে প্রেম বলে, তোমাকে যদি নাও পাই, তাহ'লে আর কাউকে চাইব না।

সংজ্ঞা-নিরূপণের দুরূহতা যদি প্রেমের সম্বন্ধেই সত্য হয়—যার ছিটেফোঁটা অনুভব মানুষমাত্রেই করেছে, তাহ'লে দুর্লভ প্রতিভা বলতে কি বোঝায় তা বোঝানো কি বিষম দায়! তাই কাউকে বোঝাবার চেষ্টা না ক'রে ব'লে যাই প্রতিভা বলতে আমার যা মনে হয়েছে।

সংস্কৃতে দু'টি বিশেষণ দিয়ে প্রতিভাকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি: নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা; অন্যটি: মায়া-র উপমায়—অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি।

প্রথমটির ভাষ্য—প্রতিভা নিজের পথ নিজেই কেটে চলে নিত্য-নতুন পথে। এ কথা কে না মানবে যে প্রতি প্রতিভাই অদ্বিতীয়? প্রতি মানুষও তাই—সত্য, কিন্তু প্রতিভার অদ্বিতীয়ত্ব বিশেষভাবে সত্য, কেননা অনন্যতন্ত্রতা তার শুধু রক্তে নয়—মজ্জায়। তাকে যেন চেপে ধ'রে চালায় এক অদৃশ্য তাগিদ—স্পিরিট। স্পিরিটের 'ভূত' প্রতিশব্দও এখানে খাটে। কারণ প্রতিভা যে তার প্রেরণা, খানিকটা ভূতে-পাওয়া মানুষের মতনই যেন নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যায়—সে চলে খানিকটা যেন বিবশ হ'য়েই।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে হয়তো আমার বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে। ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার, প্রতিভার বরপুত্র বিটোভন্ গামলায় মুখ ধুচ্ছেন, এমন সময় তাঁর মাথায় এল স্বর-সম্পাত। তৎক্ষণাৎ মুখ না মুছেই বসলেন তিনি স্বরলিপি করতে। ঘর জলে জলময়—তাঁর ল্যাণ্ডলেডি (গৃহকর্ত্রী) রেগে আগুন, কিন্তু বিটোভনের গ্রাহ্যই নেই।

আর একটি দৃষ্টান্ত: এমার্সন লিখছেন দার্শনিক প্রবন্ধ। স্ত্রী অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে বললেন, 'আমার এক জ্বালা হয়েছে তোমায় নিয়ে। শীতে কেঁপে মরি, চাকর পালিয়েছে। অথচ এই ঠাণ্ডা ঘরে ব'সে তুমি লিখে চলেছ কি যে মাথামুণ্ডু! যাও বাগান থেকে কিছু চেলাকাঠ নিয়ে এসো, এ-ও কি আমার কাজ নাকি?' এমার্সন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লেখা ছেড়ে উঠলেন। বাগানে গিয়ে কুড়ুল দিয়ে কয়েকটা কঞ্চি কেটে স্ত্রীর সামনে দিয়ে বললেন, 'এই নাও। এখন আমি শুরু করি—যা জীবনে একমাত্র বাস্তব সত্য—রিয়্যাল।' এই ব'লে লিখতে বসলেন দার্শনিক তত্ত্বকথা। তাঁর কাছে শীতে কাঁপার দুঃখও তেমন বাস্তব সত্য ছিল না, যেমন সত্য ছিল তাঁর দার্শনিক ভাবধারাকে ভাষায় রূপায়িত করা। তাই না তিনি হয়েছিলেন জগতের একজন সেরা দার্শনিক। ভাব এলে তাঁর আর নিস্তার ছিল না—তাকে যতক্ষণ না ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁর পক্ষে আর কোন কাজে মন দেওয়া ছিল অসম্ভব।

হাল আমলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখতে পাই এ-প্রেরণার ফলে কী-ভাবে তিনি চলতেন; 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে এই সত্যেরই

পরিচয় পেয়ে মন অভিভূত হয় যে দারুণ রোগ-যন্ত্রণাও তাঁকে ঠেকাতে পারেনি কবিতা লেখা থেকে। যখন কলম ধরতে পারছেন না, তখনও লিখলেন—মানে, আবৃত্তি করলেন—অপরে টুকে নিল:

'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে···
যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার অনর্থ হয়েছে পরাজয়।···'

অবসন্ন চেতনায়ও কবি কী অনুভব করলেন, তাকে ছন্দে ফুটিয়ে না তুলে রোগশয্যায়ও চুপটি ক'রে শুয়ে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠল—তাই-না লিখতে হ'ল তাঁকে:

'দেখিলাম, অবসন্ন চেতনার গোধূলি-বেলায়
দেহ মোর ভেসে যায়
কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি'

তবু প্রতিভার প্রেরণা জাগালো তাঁর বুকে প্রার্থনা:

'···উর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—
হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতমরূপ,
দেখি তারে—যে-পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।'

আর এক বিরাট প্রতিভা শ্রীঅরবিন্দ। চোখে দেখতে পেতেন না তিনি শেষ কয় বৎসর। কিন্তু মুখে ব'লে চলেছেন, আর একজন টুকে নিচ্ছে, এইভাবেই তিনি রচনা করেন তাঁর মহাকাব্য—'সাবিত্রী'। শুনতাম এ-যুগ হ'ল লিরিক্ কাব্যেরই যুগ, এপিক্ আর কেউ রচনা করতে পারবে না। এ-যুগের শেষ এপিক্ না হোক্ আধা এপিক্ হ'ল মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লষ্ট', কারণ তাতে এপিকের ছন্দ থাকলেও বিপুল বিস্তৃতি নেই। 'সাবিত্রী'র মধ্যে আছে এপিকের কল্লোল তথা ঔদার্য—ব্যাপ্তি; এ-হেন এপিক তিনি প্রায়ান্ধ অবস্থায়ও মুখে-মুখেই রচনা ক'রে গেলেন। এরই নাম তো অঘটনঘটন-পটীয়সী প্রতিভা। বিরাট কাব্য মুখে-মুখে রচনা—তার কত ভাব, কত অনুভূতি, কত আবিষ্কার—নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা আর কার নাম? তিনি দেখতে পেলেন যে আমরা যা: করি, ভাবি, সাধি—তার পিছনে রয়েছে এক চিরন্তন প্রেরণা—সেই চালায় এ বিশ্বভুবনকে:

A mystic motive drives
the stars and suns...
A mighty Supernature waits on Time.

প্রাতিভ প্রেরণা এক নিয়ন্ত্রিত করে সূর্যতারা···
কালের বাহিকা এক মহীয়সী অলোক-প্রকৃতি।

এবার প্রতিভার উৎস-মুখে প্রায় এসে গেছি। প্রতিভার ইতিহাসে এমন গভীরদর্শী ক-জন জন্মেছেন? 'সাবিত্রী'র সপ্তম স্কন্ধে ষষ্ঠ উল্লাসে তিনি লিখছেন:

The genius too receives
from some high fount,
Concealed in a supernal secrecy,
The work that gives him
an immortal name.
The word, the form, the charm,
the glory and grace
Are missioned sparks of a stupendous Fire.

—প্রতিভাও এক তুঙ্গ মহান্ গহন আলোকের
আদি-উৎস হ'তে পায় তার নিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা,
যার বরে সে লভে অমরণী কীর্তি এ-ধরায়।
লাবণ্য মহিমা ভাব-রূপায়ণ হ্লাদিনী সুষমা,
তারি মহীয়ান্ অনলের বাণীবাহী বহ্নিকণা।

প্রতিভার আদি-উৎস সম্বন্ধে এর চেয়ে সুন্দর স্পন্দমান সংজ্ঞা আর কোথাও পড়েছি ব'লে মনে পড়ে না। এ-স্থলে শ্রীঅরবিন্দ আরও একটি মূল্যবান্ কথা বলেছেন: এই স্বর্গীয় প্রেরণা মানব-মনের সীমাক্লিষ্ট ছোঁয়াচে খানিকটা খুইয়ে বসে তার আদিম দিব্য দীপ্তি: when least defaced, then is it most divine.

—মানসের ম্লান স্পর্শ হ'তে মুক্তি লভে সে যতই ততই সে হয় তার স্বর্গীয় স্বরূপে মূর্তিমতী।

এর বেশী আর কী বলা যেতে পারে প্রতিভার অমর্ত্য স্বরূপের সম্বন্ধে? শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Future of Poetry গ্রন্থে চমৎকার ক'রে ব্যাখ্যা করেছেন নানাশ্রেণীর কবিতার প্রেরণার স্তর। সে ব্যাখ্যার মূলে আছে প্রতিভাধর কবিদের এই চিরন্তন অনুভূতি যে তারা যে-পরিমাণে নিজেদের উচ্চতর সত্যলোকের কাছে খুলে ধরে সেই পরিমাণেই তাদের মধ্যে নেমে আসে সে অলক্ষ্য লোকের নিজস্ব ছন্দ দ্যুতি বর্ণ রাগ। এদের নিয়েই মানুষ আবহমানকাল শিল্পের দর্শনের কাব্যের সঙ্গীতের পসারী হ'য়ে এসেছে। অর্থাৎ, আসল কথা: আমাদের মর্ত্যমানস যে-অনুপাতে অমর্ত্যের বাহন হবে সেই অনুপাতেই সে প্রতিভাধর হ'য়ে ফুটে উঠবে।

এ-বাণীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ মেলে অধ্যাত্ম জগতে; কারণ, শিল্পে কাব্যে দর্শনে মানুষের মন নিরন্তর হানা দিয়ে অমল প্রেরণাকে খানিকটা চ্যুত করেই তার মলিন ছোঁয়া-তে। তাই এ-ছোঁয়াচ থেকে সবচেয়ে বেশি মুক্তি পায় কবি শিল্পী মনীষী নয়—যোগী, ঋষি, অবতারকল্প মহাপুরুষ। এ-যুগে এ-কথার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মিলবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবন পর্যালোচনা করলে। সচরাচর মহাপুরুষ মহাত্মাদের আমরা প্রতিভাধর নাম দিই না। কিন্তু বিচক্ষণ অল্‌ডাস্ হাক্স্‌লি—যিনি প্রতিভার একজন সেরা বোদ্ধা—ঠিকই বলেছেন যে ধর্মের জগতেই আমরা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই দিব্য প্রতিভার মর্ত্যলীলা। ঠিকই বলেছেন এইজন্য যে ধর্মের জগতেই মানুষ সবচেয়ে বেশি 'আমি'-র লয় সাধন করতে পারে—ভগবৎপ্রেমের আত্মহারা সাধনায়। তাই, প্রতিভার চরম পরিচয় মেলে সেই অবতারকল্প দিব্য পুরুষের সাধনায়, যাঁরা আমি-র ক্লেদ থেকে মুক্তি লাভ ক'রে হ'য়ে উঠেছেন ভগবদ্‌ভাব ও ভগবৎশক্তির বাহন। পরমহংস-দেব সম্বন্ধে তাই তো স্বামীজী বলেছিলেন তাঁর একটি বক্তৃতায়: মানুষ মর্ত্যজীবনে যে কী ভাবে বিশুদ্ধ দেবত্বের পরিচয় দিতে পারে, তার দীপ্ততম দৃষ্টান্ত হ'য়ে এসেছিলেন এ-যুগে এই আশ্চর্য প্রেমের প্রতিভাধর, যাঁর প্রেমের শক্তি ছিল অঘটনঘটনপটীয়সী—অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই যাঁর প্রতিভা সারা বিশ্বে প্রকট করেছিল ভাগবতী শক্তির মহিমা। পরমহংসদেব বলতেন: আকাশজোড়া মুখ ক'রে ডাকতাম 'মা'! আর মাকে আনতাম টেনে। এই আবাহনের শক্তিই হয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ও ভাগবতী প্রেরণাই তার উৎস-গোমুখী।

ভক্তি-অর্ঘ্য

শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

জননি! জগদীশও তোমার অধীন!
পরা-অপরা ঐশ্বর্যে সদা পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার,
তাই কত দাও মোরে: আর আমি? দীন, অতি দীন
কোথা পাব বল কণা মাত্র তার?
তবু আজও হায়! আছে ভক্তি নীলপদ্ম-রূপে, তোমারি দয়ায়—
এ হৃদয় মানস-সরসে: যদি লহ করুণায়—
তাই দিব অর্ঘ্য, তব কমল-কোমল রাঙা পায়।

সেকালের কথকতা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সেকালে কথকতাই ছিল আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তারের প্রধান বাহন। দেশের নিরক্ষর বিরাট জনতা কথকতার আসর থেকে স্বল্প আয়াসে ধর্ম-জ্ঞান, নীতি-শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে শান্তি ও আনন্দলাভ ক'রত। বস্তুতঃ সে যুগে কথকতাই ছিল এদেশের সাধারণ জনগণের, বিশেষতঃ পল্লীবাসীদের সমষ্টিগতভাবে শিক্ষা-দীক্ষালাভ ও চিত্তবিনোদনের একমাত্র উপকরণ। অবশ্য পরবর্তীকালে পাঁচালি, যাত্রা, নাটক, তরজা, পালাকীর্তন প্রভৃতিরও ক্রমশঃ উদ্ভব এবং প্রচলন হয়। সম্প্রতি চলচ্চিত্র, বেতার, সংবাদপত্র এবং আরও কত চিত্তাকর্ষক উপকরণ সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে।

ইদানীং দেশের সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে নিরক্ষরতাও ধীরে ধীরে দূর হচ্ছে। মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা এবং পত্র-পত্রিকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। পল্লীতে পল্লীতে পাঠশালা, গ্রামে গ্রামে উচ্চ বিদ্যায়তন, শহরে শহরে কলেজ গড়ে উঠেছে। নারী-শিক্ষার প্রচলন এবং প্রসারও হয়েছে। মেয়েদের স্কুল-কলেজগুলিতে তাদের স্থান সঙ্কুলান হয় না।

সুতরাং এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-শিক্ষায় তথা আমাদের জাতীয় প্রগতিতে কথকতার অবদানের বিষয় বিচার করতে গেলে মনে হয়, সে সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা লাভ করা অসম্ভব হবে। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে কথকতার ভূমিকা যে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ এবং কত ব্যাপক, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হ'লে প্রথমে আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত ক'রে দূর অতীতের পারিপার্শ্বিকতায় নিয়ে যাওয়া দরকার।

তখন মুদ্রণযন্ত্র অথবা মুদ্রিত পুস্তক-পত্রিকাদি কিছুই ছিল না। হাতে লেখা তালপাতার পুঁথিই ছিল সম্বল এবং তার সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের টোল বা চতুষ্পাঠীগুলিতে লেখাপড়া এবং বিদ্যাচর্চা হ'ত, তাদের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল না। তা ছাড়া সর্বসাধারণের বিদ্যার্জনের কোন সুযোগই ছিল না। দেশময় ছেয়ে ছিল নিরক্ষতার নিবিড় ছায়া। অতএব সেই যুগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তবেই আমাদের লোক-শিক্ষার ক্ষেত্রে কথকতার বিরাট ভূমিকা এবং মহান্ অবদান সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা হবে।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে, সে যুগে দেশের জনসাধারণ নিরক্ষতার জন্য কি অজ্ঞ ও অধঃপতিত ছিল? তারা কি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত ছিল?—তা কখনই নয়। বরং বর্তমানের তুলনায় তখন তাদের নৈতিক মেরুদণ্ড সুদৃঢ় এবং চারিত্রিক মান উন্নততর ছিল। বস্তুতঃ এর মূলে ছিল শিক্ষাব্রতী কথকগণের সরল সুললিত কথকতারই অদৃশ্য প্রভাব। কথকতার আসরে বিমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গ কেবল ধর্ম ও নীতি-শিক্ষাই নয়, তার সঙ্গে আমাদের মহাকাব্য, সংস্কৃত সাহিত্য, জাতীয় সাধনা, অধ্যাত্ম সংস্কৃতি, আচার-পদ্ধতি, কর্তব্যপালন, পরার্থপরতা প্রভৃতি বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ ক'রত। নারী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র

নির্বিশেষে সর্বসাধারণের জন্যই কথকতার আসর সদা উন্মুক্ত ছিল।

বিশাল জনমণ্ডলী ঐ আসরে বর্ণমালা-পরিচয়ের অবকাশ না পেলেও, জ্ঞানলাভের প্রচুর সুযোগ পেত। ফলে দেশের জনসাধারণ কথকতা শুনে মুখে-মুখে যথেষ্ট জ্ঞান ও শিক্ষা-লাভ ক'রত। নিপুণ কথকগণের সরস কথকতায় এমনই চমৎকারিত্ব ছিল যে, তা শুনে বিশাল জনতা সহজেই আকৃষ্ট হ'ত। অজ্ঞ, নিরক্ষর শ্রমজীবীদেরও কোমল চিত্তে তার অপরিসীম প্রভাব পড়ত। এইজন্য সেই সমস্ত কথা-কাহিনী বা উপদেশ-প্রসঙ্গ একবার মাত্র শুনেই সেগুলি তারা অনায়াসে ধরতে পারত, কথাবার্তায় তা ব্যবহারও ক'রত এবং জীবনের আচরণেও ঐ সব সংশিক্ষা ফুটে উঠত।

প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যায় বাংলার পল্লীতে, শহরে নগরেও কথকতার আসর বসত। চণ্ডী-মণ্ডপ অথবা অন্য কোন দেবালয়ের প্রাঙ্গণ কিংবা ধর্মপ্রাণ গৃহস্থের বহির্বাটীই ছিল কথকতার আসরের স্থান। পুরাণ-শাস্ত্রাদির মনোহর কথামালা এবং সাধু-মহাত্মাদের অমর জীবন-কাহিনী শোনার আকাঙ্ক্ষায়, সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই, দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা পরম আগ্রহভরে সম্মিলিত হ'ত। কথকগণ বাস্তব উপমার মাধ্যমে, সুমধুর সঙ্গীতসহ সরস কথাচ্ছলে ঐ সমস্ত পুণ্য প্রসঙ্গ বিচিত্র ভঙ্গিমায় কথকতা ক'রে শোনাতেন। শুদ্ধ বস্ত্র-, উত্তরীয়- ও যজ্ঞোপবীত-পরিহিত এবং মাল্যচন্দনাদি-ভূষিত নধরকান্তি ভক্তিমান্ কথকঠাকুরকে দেখে শ্রোতৃবৃন্দের অন্তর ভাবে ও ভক্তিরসে আপ্লুত হ'য়ে উঠত। লোক-শিক্ষক কথকগণ অতিশয় আচারনিষ্ঠ, পবিত্রাত্মা ও ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন। তাঁরা নিজেদের দেহ ও মনের শুচিতার প্রতি সর্বদাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন

সেকালে আমাদের দেশে বারো মাসে কেবল তের পার্বণই নয়, সারা বছর অগণন পাল-পার্বণ ও ব্রতোৎসব লেগে থাকত। তখন দেশের আর্থিক অবস্থা ছিল যেমন সচ্ছল, লোক-চিত্তে ধর্মভাবও ছিল তেমনই প্রবল। ফলে, লোকে সৎকার্যে ব্যয় ক'রত অকুণ্ঠচিত্তে, পার্বণ-উৎস-বাদিতে খরচপত্র ক'রত মুক্তহস্তে। পাল-পর্ব উপলক্ষে ধর্মপ্রাণ রাজা, মহারাজা এবং জমিদার ও ধনী গৃহস্থগণ নিজ নিজ গৃহে কথকতা করাতেন। তাঁরা এই সকল অনুষ্ঠানে বেশ সমারোহও করতেন। জাঁকজমক এবং আড়ম্বর নিয়ে কখন কখন তাঁদের পরস্পরের মধ্যে প্রতি-যোগিতারও সৃষ্টি হ'ত।

প্রশস্ত প্রাঙ্গণে রঙবেরঙের বিস্তীর্ণ সামিয়ানা টাঙানো হ'ত। তার নিম্নে এক পার্শ্বে কথক-ঠাকুরের বসার জন্য নির্মিত হ'ত সুসজ্জিত মঞ্চ বা বেদী। তার চারি কোণে কলা-গাছ, ঊর্ধ্বে সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ এবং চতুর্দিকে আম্রপল্লব, চাঁদমালা, কুসুমস্তবক ও পত্র-পুষ্পা-দির মাল্য শোভা পেত। মণ্ডপে সামিয়ানার নীচে নানা বর্ণের উজ্জ্বল প্রদীপমালার ঝাড় সব ঝুলত। শ্রোতাদের বসার জন্য সমস্ত মণ্ডপ জুড়ে গালিচা, সতরঞ্চ প্রভৃতি বিছানো হ'ত। মহিলাদের জন্য পৃথক্ আসন নির্দিষ্ট থাকত; তাঁদের আসন 'চিক' দিয়ে আড়াল করা হ'ত। চিকের ফাঁক দিয়ে তাঁরা সুরসিক কথকঠাকুরের বিচিত্র ভাব-ভঙ্গিমাসকল বেশ স্পষ্টই দেখতে পেতেন।

মঞ্চ বা বেদীর উপরে কথকঠাকুরের জন্য পাতা হ'ত সুদৃশ্য আসন। ঐ আসনের সম্মুখ ভাগে থাকত শুদ্ধ বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি জল-চৌকি অথবা পিঁড়ি। কথকঠাকুর তার উপর কথকতার গ্রন্থ বা পুঁথি রাখতেন। আসনের পশ্চাৎভাগে শোভা পেত একটি তাকিয়া। বাম

পার্শ্বে থাকত জলপূর্ণ গাড়ু এবং তার উপর একটি গামছা অথবা বস্ত্রখণ্ড। কথকঠাকুর তা দিয়ে প্রয়োজন-বোধে হাত মুখ মুছতেন। দক্ষিণ-ভাগে থাকত তাঁর আচমনাদির জন্য পবিত্র জলপূর্ণ কোশাকুশি বা পঞ্চপাত্র। পুষ্পপাত্রে থাকত ফুল, চন্দন, তুলসী, দূর্বা, মাল্য প্রভৃতি; আর একটি বড় পাত্রে থাকত দেবতাকে নিবেদনের জন্য ফল-মূল, সন্দেশ-বাতাসা প্রভৃতি। সামনে তৈল কিংবা ঘৃতের প্রদীপ জলত; ধূপ-ধুনা দেওয়া হ'ত, তার মধুর সৌরভে চারিদিকে আমোদিত হ'য়ে উঠত।

মঞ্চে সামনের দিকে এক পার্শ্বে একটি টবে শোভা পেত তুলসীবৃক্ষ। ঐ টবটি সুন্দরভাবে লাল শালু দিয়ে আচ্ছাদিত থাকত। ঐ স্থানে তুলসী-মঞ্চ স্থাপনের একটি নিগূঢ় অর্থ ও আধ্যাত্মিক তাৎ-পর্য রয়েছে। এ সম্পর্কে পুরাণে পাওয়া যায়ঃ

তুলসীকাননং যত্র, যত্র পদ্মবনানি চ।

পুরাণপাঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥

—যে স্থানে তুলসীকানন থাকে, যে স্থানে পদ্ম-বন থাকে এবং যে স্থানে পুরাণশাস্ত্র পাঠ হয়, সেই স্থানে সাক্ষাৎ শ্রীহরির আবির্ভাব ঘটে।

কথকঠাকুর যে মঞ্চ, বেদী বা উচ্চাসনে বসে পুরাণশাস্ত্র কথকতা করতেন, তাকে বলা হ'ত 'ব্যাসাসন' বা 'ব্যাসপীঠ'। ঐ আসনকে ভাগবত-পুরাণাদি-প্রবক্তা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-দেবের আসন জ্ঞান করা হ'ত। কথকঠাকুর ঐ আসনে উপবেশন করার পূর্বে পরম ভক্তিভরে 'ব্যাসাসনায় নমঃ' কিংবা 'ব্যাসপীঠায় নমঃ' ব'লে তাতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন। কথকতা শেষেও তিনি আসন হ'তে নেমে আবার ঐ ভাবে ব্যাসাসনকে বন্দনা ও প্রণাম করতেন। ঐ আসনে উপবিষ্ট থাকাকালে তিনি কথকতার প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন কথাবার্তা কারও সঙ্গে বলতেন না। কখনও বিশেষ প্রয়োজনে কারও সঙ্গে অন্য কথা বললে তিনি আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করতেন। তার পর আবার যথারীতি কথকতা ক'রে যেতেন। তিনি আত্মাভিমান ত্যাগ ক'রে ঐ আসনে উপবেশন করতেন, তাই তাঁর সুমধুর কথকতার উপসংহারে তাঁর ভক্তি-গদ্‌গদকণ্ঠে শোনা যেত—অদ্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাস এই স্থানেই বিরাম (বিশ্রাম) গ্রহণ করলেন।

ধর্মপ্রাণ শ্রোতৃমণ্ডলীও ব্যাসাসন এবং কথক-ঠাকুরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-সম্মান ও ভক্তি-মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। তাঁরা কথককে কথকতাকালে সাক্ষাৎ 'ব্যাসদেব'-রূপে দেখতেন। এই জন্য, তাঁরা ঐ সময়ে তাঁকে কোনও প্রশ্ন অথবা তাঁর ব্যাখ্যাদি সম্বন্ধে কোনোরূপ কটু মন্তব্য করতেন না। কারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে তিনি কথকতাশেষে ঐ আসন থেকে নেমে এলে তবে তাঁকে প্রশ্ন করতেন। এই সময়ে কেউ ইচ্ছা করলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কও করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ব্যাসাসনে উপবিষ্ট থাকাকালে কেউ কখনও তাঁর প্রতি কোনরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করতেন না।

বিশেষ বিশেষ পর্বাহ ছাড়াও কতকগুলি সামাজিক ক্রিয়াকর্মে—যেমন অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষেও ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ-গণ নিজেদের গৃহে কথকতা করাতেন। বৈশাখ মাস হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র মাস। এই জন্য অনেকেই এই মাসে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিজ নিজ গৃহে কথকতার আসর বসাতেন। আবার 'নিয়মসেবা' উপলক্ষেও নানাস্থানে এক মাস ব্যাপী প্রত্যহ সন্ধ্যায় কথকতা হ'ত। আশ্বিনের শুক্লা একাদশী থেকে কার্তিকের শুক্লা একাদশী পর্যন্ত অথবা আশ্বিনের সংক্রান্তি থেকে কার্তিকের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রত্যহ যথাবিধি ভাগবতাদি পাঠ ও কথকতা হ'ত। এই কথকতাই নিয়মসেবার কথকতা বলে প্রসিদ্ধ।

নিয়মসেবায় ঘটস্থাপনা ও সংকল্প ক'রে পাঠ এবং কথকতা হ'ত। যে শাস্ত্রের কথকতার সংকল্প হ'ত, প্রত্যহ পূর্বাহ্ণে সেই শাস্ত্র ও তার অধিদেবতার যথারীতি পূজার্চনা করা হ'ত। প্রাতঃকালীন এই অনুষ্ঠান কথকতার মঞ্চ বা মণ্ডপে না হ'য়ে নিকটবর্তী আর একটি স্থানে হ'ত। কথকঠাকুর প্রত্যহ এই সময়ে ঐ গ্রন্থ ও দেবতার অর্চনাদি ক'রে গ্রন্থের মূল শ্লোকগুলি কিছু কিছু ধারাবাহিকভাবে পাঠ করতেন। পূর্বাহ্ণের এই অনুষ্ঠানকৃত্য-সম্পাদনে কথক কোন কারণে অক্ষম হ'লে, তিনি সংকল্প করিয়ে অন্য ব্রাহ্মণকেও ঐ কর্মে নিযুক্ত করতে পারতেন। যাঁকে ঐ কার্যে ব্রতী করা হ'ত তিনি 'পাঠক' নামে অভিহিত হতেন।

সকাল বেলার এই অনুষ্ঠানে আর দুইজন ব্রাহ্মণকে ব্রতী করা হ'ত—একজন 'ধারক' এবং একজন 'শ্রোতা'। ধারকের কাজ ছিল, পাঠকের পাঠে যাতে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তি না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে 'গ্রন্থরক্ষা' করা। অর্থাৎ পাঠকের সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগ সহকারে তাঁর নিজের পুঁথি দেখে যাওয়া। পাঠকের পাঠ বা উচ্চারণে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে ধারক তা সংশোধন ক'রে তাঁকে ধরিয়ে দিতেন। শ্রোতার কাজ ছিল অর্থবোধ সহ নিবিষ্টচিত্তে পাঠকের পাঠ শ্রবণ করা। ধারক এবং শ্রোতাও যথাবিধি সংকল্পাদি ক'রে নিজ নিজ কার্যে ব্রতী হতেন।

পূর্বাহ্ণের এই পাঠে নিত্যই কিছুসংখ্যক ধর্মপ্রাণ শ্রোতাও সেখানে বসে ভক্তিভরে ঐ পাঠ শ্রবণ করতেন। শ্রোতাদের বোঝার সুবিধার জন্য পাঠক ঐ সময়ে কোন কোন কঠিন শ্লোকের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও করতেন। প্রত্যহ সকালে যতখানি পাঠ হ'ত, সান্ধ্য আসরে কথকঠাকুর তা বিচিত্র ভঙ্গিমায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে কথকতা ক'রে শোনাতেন।

কথকতার উদ্‌যাপন উপলক্ষে ধর্মপ্রাণ রাজা-মহারাজা এবং জমিদার ও ধনী গৃহস্থগণ মহোৎসব করতেন। ব্রাহ্মণভোজন, পণ্ডিত-বিদায়, দরিদ্র-কাঙালসেবা এবং আত্মীয়বর্গ, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের খাওয়ানো প্রভৃতি ঐ উৎসবের অন্যতম অঙ্গ থাকত। কথক-ঠাকুরদের প্রাপ্তিযোগও বেশ মোটা রকমের হ'ত। তাঁরা মূল্যবান্ পট্টবস্ত্র, উত্তরীয়, শাল, স্বর্ণাঙ্গুরী, বিবিধ তৈজস, শয্যা-পালঙ্ক, ছত্র-পাদুকা, স্তূপাকৃতি ভোজ্যসামগ্রী এবং গিনি-মোহর প্রভৃতি যথেষ্ট দান-দক্ষিণা পেতেন। কথকতার বিশেষ বিশেষ পালার দিনে—যেমন কথকতার অন্তর্গত প্রসঙ্গানুযায়ী অন্নপ্রাশন, বিবাহ, রাজ্যাভিষেক, বামন-ভিক্ষা প্রভৃতিতে ধর্মপ্রাণ শ্রোতৃমণ্ডলীও কথক-ঠাকুরকে বহু বস্ত্র, অর্থকড়ি, অলঙ্কার, বাসন-কোসন, ভোজ্য প্রভৃতি দান-প্রণামীরূপে দিতেন।

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সেদিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। ......যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাট্‌না কাটে, যে ভাত পায়, যে না পায়, সেও শিখিত,...শিখিত যে ধর্ম নিত্য,...ঈশ্বর আছেন...পাপপুণ্য আছে,...পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে; জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য......—সে শিক্ষা কোথায়, সে কথক কোথায়? কেন গেল?

—**বঙ্কিমচন্দ্র**

শ্রীকণ্ঠের বিশিষ্ট-শিবাদ্বৈতবাদ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

ভারতের দর্শনশাস্ত্র যে সর্বদিক থেকেই জগতে অতুলনীয়, সে কথা আমরা গৌরবের সঙ্গেই ঘোষণা করতে পারি। এই দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে আবার বেদান্ত-দর্শনই যে তারাগণের মধ্যে 'একশ্চন্দ্রঃ' রূপে দেদীপ্যমান, তাও অবশ্য-স্বীকার্য। পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হবার জীবাত্মার যে শাশ্বত আকূতি—তারই প্রপূর্তি দৃষ্ট হয় বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' প্রমুখ মহাবাক্যে। সেজন্যই বেদান্তকে ভারতের আত্মার মূর্ত প্রতীক-রূপে গ্রহণ করা চলে। বেদান্তের জনপ্রিয়তা এবং সর্বজনীন প্রভাবের মূল কারণও এই। অন্য কোন দর্শনের এরূপ অসংখ্য ভাষ্য টীকা ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিরচিত হয়নি, এবং অন্য কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত থেকে এত অধিকসংখ্যক সাধক-সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়নি। শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের স্বাভাবিক দ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ এবং বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এই প্রখ্যাত 'পঞ্চ-বেদান্ত-সম্প্রদায়ে'র মধ্যে শেষোক্ত চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' ও পরবর্তী বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি প্রপঞ্চিত 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ'ও বৈষ্ণব বেদান্ত-সম্প্রদায়। কিন্তু বেদান্তের শৈব সম্প্রদায় সম্বন্ধে সেরূপ অধিক কিছু জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে—বেদান্তের দু'একটি মাত্র শৈব সম্প্রদায়ের বিষয়ই আমরা কিছু জানি—তাদের মধ্যে অধিকতর প্রখ্যাত শ্রীকণ্ঠ শৈবাচার্যের 'বিশিষ্ট-শিবাদ্বৈতবাদ'।

শ্রীকণ্ঠ-বিরচিত একটি মাত্র গ্রন্থের কথা আমরা জানি, সেটি তাঁর সুবিখ্যাত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য। এই ভাষ্যে সুনিপুণভাবে তিনি শৈব-মতানুযায়ী বেদান্ত-ব্যাখ্যা করেছেন। দুঃখের বিষয়, এই অমূল্য গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও আলঙ্কারিক অপ্পয় দীক্ষিত ষোড়শ বা সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে এই ভাষ্যের উপর 'শিবার্ক-মণি-দীপিকা' নামক একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করেন। এই শৈব-বেদান্ত-ভাষ্য শৈবগণের পরম আদরের বস্তু। শ্রীকণ্ঠ স্বয়ং এর গুণবর্ণনা ক'রে বলেছেন :

শ্রীমতাং ব্যাস-সূত্রাণাং শ্রীকণ্ঠীয়ঃ প্রকাশতে।
মধুরো ভাষ্যসন্দর্ভো মহার্থো নাতিবিস্তরঃ॥
সর্ব-বেদান্ত-সারস্য সৌরভাস্বাদ-মোদিনাম্।
আর্যাণাং শিবনিষ্ঠানাং ভাষ্যমেতন্মহানিধিঃ॥(৬-৭)

শ্রীকণ্ঠের জীবনী ও আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে প্রায় কিছুই সঠিক জানা যায় না। তাঁর ভাষ্যের প্রারম্ভে তিনি তাঁর গুরু শ্বেতাচার্যকে এইভাবে প্রণতি নিবেদন করেছেন :

নমঃ শ্বেতাভিধানায় নানাগমবিধায়িনে।
কৈবল্যকল্পতরবে কল্যাণ-গুরবে নমঃ॥ (৪)

শ্রীকণ্ঠের আবির্ভাব-সময় যথাযথভাবে নিরূপণ করা সম্ভবপর না হ'লেও, তিনি যে শঙ্করাচার্যের পরবর্তী ছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। স্বীয় ভাষ্যের প্রারম্ভে তিনি সেই ভাষ্যরচনার কারণ নির্দেশ ক'রে বলেছেন :

ব্যাস-সূত্রমিদং নেত্রং বিদুষাং ব্রহ্মদর্শনে।
পূর্বাচার্যৈঃ কলুষিতং শ্রীকণ্ঠেন প্রসাদ্যতে॥ (৫)

এস্থলে 'পূর্বাচার্য' শব্দের অর্থ যে শঙ্করাচার্য, তা নিঃসন্দেহ। অপ্পয়দীক্ষিত তাঁর 'শিবার্কমণি-দীপিকা'তে এই অর্থই গ্রহণ করেছেন। এতদ্ব্যতীত, শ্রীকণ্ঠ-ভাষ্যের বহু স্থলেই শঙ্করমত বা অদ্বৈতবাদের উল্লেখ ও খণ্ডন আছে। যথা, ২-৩-১৯, ২-৩-৪২, ২-৩-৪৯ প্রমুখ সূত্রে অদ্বৈত-মতানুযায়ী উপাধিবাদ প্রভৃতির খণ্ডন-প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্ম

সাম্প্রদায়িক মতানুসারে, শ্রীকণ্ঠ সর্বোচ্চ তত্ত্ব বা ব্রহ্মকে 'শিব'রূপে গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্ম বা শিব 'ভব', 'শর্ব', 'পশুপতি', 'মহাদেব', 'শম্ভু', 'রুদ্র', 'নীলকণ্ঠ', 'ত্রিলোচন', 'উমাপতি' প্রভৃতি অসংখ্য নামে অভিহিত হন। কিন্তু এইগুলি কেবলমাত্র অর্থহীন নাম নয়, উপরন্তু প্রত্যেকটির মাধ্যমেই আমরা শিবরূপী পরব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ, গুণ ও শক্তির আভাস পাই। ১-১-২ সূত্রে শ্রীকণ্ঠ শিবের আটটি প্রধান নামের উল্লেখপূর্বক, তাদের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন :

ভব-শর্বেশান-পশুপতি-রুদ্রোগ্র-ভীম-মহাদেবা-ভিধানাষ্টকস্যাধিকরণং বাচ্যং পরং ব্রহ্ম (১-১-২)।

—সর্বত্র সদা ভবতীতি ভব-শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম। শর্বশব্দেন সকল-সংহর্তৃ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতে। নিরুপাধিক-পরমৈশ্বর্য-বিশিষ্টত্বাৎ ঈশান-শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম। ঈশ্বরস্যেশিত-ব্যাপেক্ষতয়া পশুপতি-শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম। সংসার-রুগ্‌দ্রাবকত্বাৎ রুদ্র-শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম। পরতেজোভিরনভিভবনীয়ত্বাৎ উগ্র-শব্দবাচ্যত্বং ব্রহ্মণঃ। নিয়ামকত্বেন নিখিল-চেতনভয়হেতুতয়া ভীম-শব্দাভিধেয়ং ব্রহ্ম। মহত্ত্বেন দীপ্যমানতয়া মহাদেব ইত্যুচ্যতে শিবঃ।

অর্থাৎ সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান ব'লে তিনি 'ভব'; সর্ববস্তুর সংহারকর্তা ব'লে তিনি 'শর্ব'; অন্তহীন পরমৈশ্বর্যবিশিষ্ট ব'লে তিনি 'ঈশান'; সর্বজীবের শাসক ব'লে তিনি 'পশুপতি'; সংসার-ক্লেশ দূর করেন ব'লে তিনি 'রুদ্র'; অপর কর্তৃক অনভিভবনীয় ব'লে তিনি 'উগ্র'; সকল জীবের নিয়ামকরূপে ভীতি-উৎপাদক ব'লে তিনি 'ভীম' এবং মহান্ ও দীপ্তিমান্ ব'লে তিনি 'মহাদেব'। এরূপ আটটি প্রধান গুণ এবং অন্যান্য অসংখ্য গুণবিশিষ্ট পরব্রহ্ম পরমবিশুদ্ধ ও মঙ্গলভাজনরূপে 'শিব'পদবাচ্য।

পরমব্রহ্ম শিবই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি ও মূল কারণ—সাংখ্য-সম্মত প্রকৃতি (১-১-১২), জীব (১-১-১৬), জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ (১-১-১৭) বা অন্য কোন বস্তু নয়। শিব জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সাধারণতঃ নিমিত্ত ও উপাদান কারণ পরস্পর ভিন্ন এবং একে অন্যের বহির্ভূত হয়। যেমন, মৃন্ময়-ঘটের উপাদান-কারণ মৃৎ-পিণ্ড এবং নিমিত্ত-কারণ যন্ত্রাদি-সমন্বিত কুম্ভকার, একে অন্য থেকে ভিন্ন ও একে অন্যের বহিঃস্থিত। কিন্তু সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্ পরমব্রহ্মের বাহিরে ও তাঁর থেকে ভিন্ন অপর কিছুই নেই। সেজন্য তিনি নিজেই নিজের স্বরূপকে জগদ্রূপে পরিণত করেন—এরূপে তিনিই জগতের একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ। (১-১-২) সূত্রব্যাখ্যায় :

'নিরস্ত-সমস্ত-সংসার-কলঙ্কতয়া নিখিল-মঙ্গলাধারতয়া শিবতত্ত্বং যদবগম্যতে তদুক্ত-স্বভাবতয়া সকল-জগজ্জন্মাদি-কারণং ভবতি। তত্র তাদৃশ-মহিম্নি জগদুভয়কারণত্বসম্ভবাৎ।'

পরমব্রহ্ম শিব তাঁর মায়া বা ইচ্ছা-শক্তির মাধ্যমে জগতের উপাদান-কারণ হন বা জগৎ সৃষ্টি করেন। ১-২-৯ সূত্রে শ্রীকণ্ঠ জগৎসৃষ্টি-প্রক্রিয়া সংক্ষেপে এরূপে বর্ণনা করেছেন :

'অসঙ্কুচিতবিশ্বঃ পরমেশ্বরো হি সিসৃক্ষুঃ বহুপ্রপঞ্চভবনায়াত্মনো মায়ালক্ষণামিচ্ছারূপাং শক্তিমাশ্রয়তি। তপস্বরূপিকয়া জ্ঞানাত্মিকয়া শক্ত্যা সকলজীব-কর্মানুগুণ-তত্তচ্ছরীরসামগ্রী-মালোচয়তি। আলোচ্য চ······ক্রিয়াশক্ত্যা ইচ্ছাশক্তিভূতো নিখিল জগচ্চিত্রমুন্মীলয়তি সকলকার্য-জাতমনুপ্রবিশ্য শক্তি-ত্রয়সম্বন্ধেন ত্রিগুণভিন্নমূর্তিত্রয়াদি-প্রপঞ্চরূপো ভবতি।'

অর্থাৎ সৃষ্টিকালে পরমেশ্বর মায়ারূপ ইচ্ছা-শক্তির সাহায্যে জগৎসৃষ্টিতে ইচ্ছুক হন। তৎপরে তিনি তপোরূপ জ্ঞান-শক্তির সাহায্যে জীবগণের কর্ম এবং তদনুসারে নূতন সৃষ্টিতে

তাদের অবস্থা বিষয়ে চিন্তা করেন। পরিশেষে পূর্বোক্ত ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুযায়ী ক্রিয়াশক্তির সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেন। এরূপে পরমব্রহ্ম শিবের ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া—এই ত্রি-শক্তির সমন্বয়েই বিশ্বসৃষ্টি হয়

এই উপাদানরূপী শিবই বিষ্ণু বা নারায়ণ (১-২-৩), এরূপে বিষ্ণু শিবাশ্রয়ী হ'য়েও শিব থেকে অভিন্ন। 'যতো বিষ্ণুশিবয়োরুপাদান-নিমিত্তয়োরবস্থাভেদমন্তরেণ স্বরূপভেদো নাস্তি' (১-৩-১২)। পুনরায় জীবসমষ্টি হিরণ্যগর্ভ বিষ্ণুর আশ্রয়ী ও বিষ্ণু তাঁর উপাদান (৪-৩-১৪)।

পরব্রহ্ম শিব নির্গুণ নন, সগুণ। এক পক্ষে তিনি অসংখ্য কল্যাণগুণের আকর; অপর পক্ষে তিনি সমস্ত হেয়গুণ-বর্জিত।

'নিরস্ত-সমস্তোপপ্লব-কলঙ্ক-নিরতিশয়জ্ঞানানন্দাদি-শক্তিমহিমাতিশয়বত্বং ব্রহ্মত্বম্' (১-১-১)।

এই সকল গুণের মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি গুণ বিশেষ ভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ-দ্যোতক :

'সর্বজ্ঞত্বং নিত্যতৃপ্তত্বম্ অনাদিবোধত্বম্ স্বতন্ত্রত্বম্ অলুপ্তশক্তিমত্বম্ অনন্তশক্তিমত্বম্' (১-১-২)। —পরমব্রহ্মের জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদি-করণনিরপেক্ষ নিত্য, নিষ্কলঙ্ক এবং নিখিলবস্তু-ব্যাপী—সেজন্য তিনি 'সর্বজ্ঞ'। পরব্রহ্ম সমস্ত দোষকলঙ্কশূন্য এবং নিরতিশয় আনন্দপরিপূর্ণ সত্তা, সেজন্য তিনি 'নিত্যতৃপ্ত'। পরব্রহ্মের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণতম ও সীমারহিত সেজন্য তিনি 'অনাদি-বোধ'। পরব্রহ্মের শাসক পালক অন্য কেউ নেই, তিনিই সকলের শাসক ও পালক; তাঁর আশ্রয় অন্য কেউ নেই—তিনিই সকলের আশ্রয় ও ধারক, সেজন্য তিনি 'স্বতন্ত্র'। পরব্রহ্মের অসংখ্য শক্তি স্বাভাবিক—স্বভাবজাত ও নিত্য, অদ্বৈতমতানুযায়ী উপাধি-জাত ও অনিত্য নয়—সে-জন্য তিনি 'অলুপ্ত-শক্তি'। পরব্রহ্ম অসংখ্যশক্তিবিশিষ্ট, সে-জন্য তিনি 'অনন্ত-শক্তি'।

ব্রহ্মের গুণাবলী দুই শ্রেণীর—ভীষণ ও মধুর। একদিকে তিনি 'ভীষণং ভীষণানাম্'—অনন্ত অসীমশক্তিবিশিষ্ট শাসকরূপে ভয়জনক। 'কল্যাণ-মূর্তিরপি পরমেশ্বরঃ শাসকতয়া ভয়-দর্শনো ভবতি' (১৩-৪০)। কিন্তু অন্যদিকে তিনি আনন্দস্বরূপ এবং জীবগণের আনন্দ-দায়ক। 'ব্রহ্মানন্দ নিরতিশয়-শিরস্কত্বেনা ভাস্যতে। ...তস্মাদানন্দময়ো পরমেশ্বর এব' (১-১-১৩)। 'স্বয়ং প্রচুরানন্দো পরান্ আনন্দয়তি।' (১-১-১৫)। পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা এরূপে জীবগণের নিকট ভীতিপ্রদ কঠোর শাসকই কেবল নন—নিকটতম, আনন্দোচ্ছল, আনন্দপ্রদ সখা। তিনি সকল জীবের অনুগ্রাহক বন্ধু, এবং তাঁর প্রসাদেই জীবগণ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়।

চিৎ ও অচিৎ পরব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ। প্রলয়কালে চিৎ ও অচিৎ প্রচ্ছন্নভাবে ব্রহ্মে বিলীন হ'য়ে থাকে, সৃষ্টিকালে ব্যক্তরূপে জীব ও জগতে পরিণত হয়।

'নাম-রূপ - বিভাগানর্হ-সূক্ষ্ম-চিদচিৎ- প্রপঞ্চ-শক্তি-বিশিষ্টতয়া শিবঃ কেবল ইত্যুচ্যতে। স পুনঃ সর্গকালে স্বসংকল্পমাত্রেণ স্বস্মাৎ সকলং চিদচিদর্থজাতং সৃজতি প্রকাশয়তি'(১-২-৯)।

চিৎশক্তি ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া—এই ত্রিশক্তির সমাহার (১-২-৯); এবং অচিৎশক্তি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূতের সমাহার। ব্রহ্মা, জনার্দন, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব যথাক্রমে এই পঞ্চ মহাভূতের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা।

উপরি-উক্ত অষ্টরূপবিশিষ্ট চিৎ ও অচিৎ পরমব্রহ্মের শরীরস্থানীয়। 'সর্ব-চিদচিৎ-প্রপঞ্চ-বিশিষ্টং ব্রহ্ম সর্বপদ-বাচ্যম্' (১-২-৯)।

অন্যদিক থেকে বলতে গেলে চিৎ অচিৎ—ব্রহ্মের বিশেষণ বা গুণ, দেহ যেমন আত্মাকে—

নীলত্ব যেমন নীলোৎপলকে—বিশেষণরূপে বিশিষ্ট করে, চিৎ ও অচিৎ তেমনই ব্রহ্মকে গুণ বা বিশেষণরূপে বিশিষ্ট করে।

চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ বা অবস্থা—কারণ বা অব্যক্ত রূপ এবং কার্য বা ব্যক্ত রূপ। কারণাবস্থায় ব্রহ্মের চিদচিৎ-প্রমুখ গুণ ও শক্তিসমূহই সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মেই বিলীন হ'য়ে থাকে। কার্যাবস্থায় সেই সকল গুণ ও শক্তি বিচিত্রনামরূপ-বিশিষ্ট বস্তুজাতে প্রকটিত হয়। এরূপে পরমেশ্বর একাধারে স্রষ্টা কারণ ও সৃষ্ট কার্য উভয়ই—জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্ম-সত্তাময়।

ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা বা সর্বজ্ঞ উভয়ই—অর্থাৎ জ্ঞান তাঁর যুগপৎ স্বরূপ ও গুণ। শ্রুতিতে তাঁকে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ব'লে বর্ণনা করা হ'লেও, তাঁর জ্ঞাতৃত্ব বা সর্বজ্ঞত্ব তাতে নিষিদ্ধ হয়নি। 'যথা স্বর্ণরূপং কিরীটমিত্যেতৎ স্বর্ণরূপতা মাত্রকথনপরং, ন তৎখচিতরত্নাদিনিষেধপরং তদ্বদিতি' (৩-২-১৬)।

একটি রাজমুকুটকে 'স্বর্ণস্বরূপ' ব'লে উল্লেখ করলে, তার স্বর্ণরূপতাই সূচিত হয়, কিন্তু স্বর্ণের উপরে খচিত অন্যান্য বহু রত্নের অভাব বা বিলুপ্তি ঘোষিত হয় না। একই ভাবে সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব বা সর্বজ্ঞত্ব স্ববিরোধী নয়।

ব্রহ্ম ভোক্তা—অবশ্য জীবের মতো কর্মফল-ভোক্তা নন, কিন্তু স্বীয় অনন্ত স্বরূপানন্দের নিত্যাস্বাদী (১-১-২)।

পরিশেষে ব্রহ্ম কর্তা। তাঁর কৃত্য-পঞ্চক বা পাঁচটি কার্য এই : জন্ম, স্থিতি, প্রলয়, অনুগ্রহ ও তিরোভাব। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনিই বিশ্বচরাচরের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয় তাঁরই কার্য। উপরন্তু জীবের বন্ধ ও মোক্ষেরও ব্যবস্থাপক একমাত্র তিনিই (১-১-২)।

পরমব্রহ্ম শিব অপার্থিব দিব্যদেহধারী। 'শরীর-সম্বন্ধাদস্মদাদিবদীশ্বরস্য ন সংসারদোষাপত্তিঃ শ্রুতিরেব ভগবতী হ্যস্য শরীর-সম্বন্ধং সর্বপাপ-রাহিত্যং চ প্রতিপাদয়তি' (১-১-২১)।

'সুখ-দুঃখভোগ-হেতুভ্যো জীব-শরীরেভ্যো ব্রহ্মরূপস্যাস্তি হি বৈশেষ্যম্‌। ইচ্ছাগৃহীতত্বাদস্য তেষাং কর্মমূলত্বাচ্চ। ...অতএবাপ্রাকৃতানি পাপ-জরা-মরণ-শোকাদি-রহিতানি স্বেচ্ছা-সম্পাদিতানি লীলা-মঙ্গলরূপাণি পরমেশ্বরস্য স্থিরাণি নিত্যানি বিজ্ঞায়ন্তে'—(১-২-৪)। অর্থাৎ পরব্রহ্ম শরীরবিশিষ্ট হ'লেও, জীবের ন্যায় কর্মফলভোক্তা ও পাপপুণ্যভাগী নন। কারণ, তাঁর দেহ স্বেচ্ছা-প্রসূত, সকাম কর্মের ফল নয়; সেজন্য দেহধারী হ'য়েও তিনি সর্বপাপরহিত; বস্তুতঃ পাপ-জরা-মরণ-শোকাদি-রহিত লীলা-মঙ্গল তাঁর দিব্য অপ্রাকৃত রূপ নিত্য ও স্থির—জীবের ন্যায় তিনি মরণশীল পরিবর্তনশীল নন।

এইভাবে শ্রীকণ্ঠ বেদান্তের মূল তত্ত্ব 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে সুন্দর প্রপঞ্চনা করেছেন।

তিনি 'জীবজগৎ' সম্বন্ধে কি বলেছেন, সে বিষয়ে পরে কিছু আলোচনা করা হবে।

বিশ্বরূপের ভাবসন্ধানে পাণ্ঢারপুরে

ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

বিশ্বরূপ নিমাই পণ্ডিতের বড় ভাই। নিমাই যখন লিখিতে পড়িতে শিখেন নাই, এমনকি কাপড় পরিতেও শিখেন নাই, তখন বিশ্বরূপ বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপে অদ্বৈতের গৃহে বসিয়া শাস্ত্রচর্চা করিতেন; খুব সম্ভব 'যোগবাশিষ্ঠ' আলোচনা করিতেন। অদ্বৈত 'পড়াইয়া বাশিষ্ঠ, বাখানে কৃষ্ণভক্তি' (চৈঃভাঃ৩।২২)। সেইখানে মায়ের কথা অনুসারে নিমাই

দিগম্বর সর্ব-অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করেন উত্তর॥
ভোজনে আইস ভাই ডাকেন জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥ (ঐ ১।৫)

নিমাইয়ের বয়স তখন চার বা পাঁচ বৎসর হইলে বিশ্বরূপের বয়স অন্ততঃ কুড়ি বা একুশ হওয়া উচিত। কেননা সে সময়ে তিনি শুধু পণ্ডিতই নহেন, অনুভবী ভক্তও হইয়াছেন। বৃন্দাবন দাস বিশ্বরূপ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্।
আজন্ম বিরক্ত সর্বগুণের নিধান॥
সর্বশাস্ত্রে সবে বাখালেন বিষ্ণুভক্তি।
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা নাহি কারো শক্তি॥
শ্রবণে, বদনে, মনে, সর্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনে আর না বোলে না শুনে॥ (ঐ)

অন্যত্র ঃ সর্বস্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায়।
ভক্তিযোগ না শুনিয়া বড় দুঃখ পায়॥(ঐ)

কিন্তু মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন যে বিশ্বরূপ তখন যোল বছরের (১-৭-৪)। বিশ্বরূপের গুণবর্ণনামূলক তাঁহার শ্লোককয়টি অষ্টাদশ শতকের প্রথমে নরহরি 'ভক্তিরত্নাকরে' (পৃঃ ৭৮০-৮১) উদ্ধৃত করেছেন।

বিশ্বরূপ ছেলেবেলা হইতেই প্রতিভাবান্। ছোট বয়সে তিনি ছোট ভাই বিশ্বম্ভরের মতনই তেজস্বী ছিলেন। একদিন তিনি পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে পণ্ডিতদের বিচারসভায় গিয়াছিলেন। এক পণ্ডিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি পড় ছাওয়াল?' বিশ্বরূপ তাহার উত্তরে বলিলেন, 'কিছু কিছু সভাকার।'—অর্থাৎ তিনি এক আধখানি বই বা কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কারের মতন এক আধটি বিষয় পড়েন না। অনেক বিষয়েরই কিছু কিছু পড়েন। তাঁহার উত্তরে পণ্ডিতেরা আর কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু বাড়ীতে ফিরিবার পথে জগন্নাথ মিশ্র তাঁহাকে এক চড় মারিয়া বলিলেন, 'যে যে বই পড় বলিলেই হইত, সভার মাঝখানে কি সব বলিলে? পণ্ডিতেরা তোমাকে মূর্খ ভাবিলেন।'

মার খাইয়া বিশ্বরূপ পুনরায় সেই বিচারসভায় যাইয়া বলিলেন, 'আমার পড়ার কথা তো আপনারা কেহ জিজ্ঞাসাও করিলেন না; অথচ আমি বাপের কাছে মার খাইলাম। আপনাদের কার কি জিজ্ঞাসা করিবার আছে, করুন।' পণ্ডিতেরা বেশী কিছু না বলিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা আজ যা পড়েছ, তার ব্যাখ্যা কর তো।' বিশ্বরূপ কয়েকটি সূত্রের ব্যাখ্যা করিলেন; শুনিয়া পণ্ডিতেরা বলিলেন, 'বেশ, চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছ।' কিন্তু বিশ্বরূপ বলিলেন, 'মোটেই না, আপনাদের ঠকাইলাম, আপনারা ধরিতে পারিলেন না। উহার প্রকৃত অর্থ এইরূপ।' এবারে পণ্ডিতেরা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের উপরও বিস্ময়। বিশ্বরূপ সে ব্যাখ্যাও খণ্ডন করিয়া অন্যরূপ মানে করিলেন।

'এই মত তিনবার করিয়া খণ্ডন
পুন সেই তিনবার করিলা স্থাপন॥' (ঐ)

বোধ হয়, ন্যায়ের কোন সূত্র হইবে। ন্যায়ের

ফাঁকিতে নবদ্বীপ তখন ছিল মদগুল। বড় হইয়া তিনি নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের নিকট গীতা ব্যাখ্যা করিতেন (ঐ ২।২)।

কিন্তু শুষ্ক পাণ্ডিত্যে বিশ্বরূপের মন ভরিল না। তিনি ভক্তিভরে নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন আর বিষ্ণুগৃহে (বাড়ীর ঠাকুরমন্দিরে) থাকেন। তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। বিবাহ হইলে ছেলের যদি ঘরসংসারে মন বসে, এই তাঁহার আশা। কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হইল। বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে দেখিয়া বিশ্বরূপ একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন। পরে বাপ-মা ও আত্মীয়বন্ধুরা শুনিলেন—

জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।
চলিলা অনন্ত পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥

* * *

শিশুবয়সে নিমাইও অতিশয় চঞ্চল ছিলেন।

'পিতামাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয় ॥' (ঐ)

বড় ভাইয়ের উপর নিমাইয়ের খুব টান ছিল। না হইলে যে ছেলে বাপ-মাকেও ভয় করে না, সে বড় ভাইয়ের কথা শুনিয়া দুষ্টামি ছাড়িত কিরূপে? নিমাই পণ্ডিত ১৫১০ খৃঃ শীতকালে মাঘ মাসে চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাহার কয়েকমাস পরেই তিনি দক্ষিণদেশে তীর্থযাত্রায় বাহির হন। তীর্থযাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়তো ছিল বড় ভাইয়ের খোঁজ করা। কেননা তিনি সন্ন্যাসীদের কাছে শঙ্করারণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি পুরী হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত নানা তীর্থ দর্শন করিয়া মহীশূরের ভিতর দিয়া বোম্বাই প্রদেশের সূর্পারক তীর্থ (থানা জেলা) ও কোলাপুর হইয়া পাণ্ঢারপুরে আসেন। তিনি লোকমুখে পূর্বেই শুনিয়াছিলেন যে শঙ্করারণ্য পাণ্ঢারপুরে অনেকদিন ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ পাণ্ঢারপুরকে পাণ্ডুপুর বলিয়াছেন। এইখানে প্রেমভক্তি প্রচারের আদিগুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুরীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের দেখা হইল। পাঁচ সাত দিন উভয়ে একসঙ্গে কৃষ্ণকথায় কাটাইলেন। কথায় কথায় মহাপ্রভু বলিলেন যে তিনি নবদ্বীপের লোক। তাহা শুনিয়া শ্রীরঙ্গ পুরী বলিলেন যে তিনি একবার মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে নবদ্বীপে গিয়াছিলেন আর সেখানে—

'জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয় তেঁহো যেন জগন্মাতা॥
রন্ধনে নিপুণ তা সম নাহি ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহে করায় সন্ন্যাসী ভোজনে॥'
(চৈঃচঃ ২ ৯)

মোচার ঘণ্টের বিশেষ উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, শ্রীরঙ্গপুরী বাঙালী ছিলেন। বিহারে এখন পর্যন্ত লোকে মোচার তরকারি খাইতে জানে না। যাহা হউক খাওয়ার এই গল্প বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী বলিলেন:

তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিয়া সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্প বয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল॥

মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া ভাবাবেগে আকুল হইয়া সন্ন্যাসের রীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া বলিলেন, 'জগন্নাথমিশ্র মোর পূর্বাশ্রমে পিতা'।

মহাপ্রভু ১৫১১ খৃঃ তাঁহার বড় ভাইয়ের সিদ্ধিপ্রাপ্তির কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। তখন নিশ্চয়ই তাঁহার অভাগিনী মায়ের অসীম দুঃখের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। বিশ্বরূপ অল্প বয়সে লেখাপড়া শিখিয়া সন্ন্যাসী হইয়া-

ছিলেন বলিয়া নিমাইয়ের পিতামাতা তাঁহার পড়াশুনা করা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে ভয় ছিল পাছে এ ছেলেও লেখাপড়া শিখিয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করে। পরে অবশ্য নিমাইয়ের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে পড়িতে দিতে বাধ্য হন।

* * *

শ্রীচৈতন্য-স্মৃতিবিজড়িত পাণ্ঢারপুর! ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তির স্থান—সেই পাণ্ঢারপুর দর্শনের। কলেজে পড়ার সময় হইতে পাণ্ঢারপুরের বৈষ্ণব আন্দোলন ও মহারাষ্ট্রের জাতীয় জীবন-সংগঠনে তাহার প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনিয়া আসিতেছিলাম। ১৯৫৭ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে পুনায় অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এরূপ সময় করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম যাহাতে সম্মেলনের দুই দিন পূর্বে পুনায় পৌছিয়া পাণ্ঢারপুরে যাইতে পারি। পাণ্ঢারপুর পুনা হইতে ১৪৮ মাইল দূরে, কিন্তু ট্রেনে যাইতে সময় লাগে প্রায় সাড়ে নয় ঘণ্টা। আমরা সকাল ৮টায় ট্রেনে চড়িয়া বৈকাল পৌনে ছটায় পাণ্ঢারপুরে পৌছিলাম। পুনা হইতে ১১৫ মাইল দূরে কুর্দুবাদী জংশন; সেখানে নামিয়া গাড়ী বদল করিতে হয় লাটুর-মিরাজ লাইনের ট্রেন ধরিবার জন্য। কুর্দুবাদী হইতে পাণ্ঢারপুর ৩৩ মাইল দূরে। এই ৩৩ মাইল খুব জনবিরল। কোন ষ্টেশনে কিছু খাইবার জিনিস কিনিতে পাওয়া যায় না। বন জঙ্গল ও মাঠের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ট্রেন অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাবিলাম বুঝি বা কোন জনহীন প্রান্তরই পাণ্ঢারপুর হইবে। কিন্তু সহসা সন্ধ্যার কিছু আগে এক সুন্দর শহর দেখা গেল। ঐ শহরই হইল পাণ্ঢারপুর। নামিতেই পাণ্ডা আসিয়া পাকড়াও করিল। ষ্টেশনের কাছাকাছি কয়েকটি সুন্দর দোতলা ধর্মশালা ছিল। কিন্তু মন্দির সেখান হইতে এক মাইলের চেয়ে দূরে হওয়ায় আমি মন্দিরের নিকটে পাণ্ডার বাড়ীতেই থাকা স্থির করিলাম। পুরাতন শহর, তাহাকে নূতনের রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। তাই নূতন রাস্তাগুলি চওড়া, কিন্তু মন্দিরের নিকটের পথগুলি সরু গলি।

বিশাল মন্দির। অনেক দোকানে পূজার উপযোগী জিনিসপত্র বিক্রয় হইতেছে। পাণ্ঢারপুরকে পশ্চিম ভারতের লোকে কাশীর তুল্য তীর্থস্থান বলিয়া মানে। সেইজন্য প্রত্যহ সেখানে বহু-যাত্রীর সমাবেশ হয়। আর পর্বাদি উপলক্ষে লক্ষ লোক একত্র হইয়া নামকীর্তন করে। দেবমূর্তি বিট্‌ঠল বা বিঠোবা। তাঁহার দুই পাশে দুই ঘরে দুই দেবীমূর্তি। পাণ্ডা বলিলেন—একজন রুক্মিণী, অন্যজন রাধা। জানি না আমাকে বাঙালী দেখিয়া খুশী করিবার জন্য ঐ মূর্তিকে রাধা বলিলেন কিনা। পুনায় আসিয়া মারাঠী ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, রাধামূর্তি পাণ্ঢারপুরে নাই। মন্দিরের বৈশিষ্ট্য দেখিলাম দুইটি। প্রথমতঃ প্রত্যেকেরই শ্রীমূর্তি স্পর্শ করিয়া মাল্যদান করিবার ও পদধূলি লইবার অধিকার আছে। দ্বিতীয়তঃ এই তীর্থস্থানের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, তাঁহার মূর্তি মন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির তলায়। তিনি স্বয়ং ঐ স্থানে তাঁহার মূর্তি স্থাপন করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন—যাহাতে মন্দিরে গমনেচ্ছু ভক্তজনের চরণধূলি তাঁহার মাথায় পড়ে। আমরা অতি সাবধানে পাশ কাটাইয়া মন্দিরে উঠিলাম।

ঐ মহাপুরুষের নাম নামদেব। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া আনুমানিক ১৩৫০ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। যে জ্ঞানেশ্বরের গীতার ব্যাখ্যা 'উদ্বোধনে' মারাঠী

হইতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে,* সেই জ্ঞানেশ্বরের তিনি ছিলেন সমসাময়িক। জ্ঞানেশ্বরের সঙ্গে তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে উত্তর ভারতে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। পাঞ্জাবে তাঁহার অনেক মন্দির আছে এবং শিষ্যসংখ্যাও কম নহে। গুরু নানকের গ্রন্থ-সাহেবে তাঁহার 'অভঙ্গ' উদ্ধৃত হইয়াছে। নামদেব ছিলেন জাতিতে দর্জি। কথিত আছে, তিনি নাকি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন একশত কোটি অভঙ্গ রচনা করিবেন। তাঁহার বাড়ীর সকলেই, এমনকি দাসী জনাবাঈও অভঙ্গ রচনা করেন। এখনও নামদেবের কয়েক হাজার অভঙ্গ পাওয়া যায়। আমরা যেমন এখন অনেকগুলি চণ্ডীদাসের সন্ধান পাইয়াছি, মারাঠী পণ্ডিতেরা তেমনি বলেন যে, ঐ অভঙ্গগুলি একাধিক নামদেবের রচনা। একজনের নাম নামদেব ; অন্যজন বিষ্ণুদাস-নামা ; তা ছাড়াও চক্রধরের শিষ্য এক নামদেব ছিলেন ; অন্য এক নামদেবের নাম ছিল নামা পাঠক—তিনিই জ্ঞানেশ্বরের সমসাময়িক, কাম্বো পাঠকের পৌত্র। ঐ সব নামদেবের রচিত পদ নাকি মিশ্রিত হইয়া এক নামদেবের নামে চলিতেছে।

যাহা হউক জ্ঞানেশ্বর নামদেব প্রভৃতি যে সম্প্রদায় স্থাপন করেন সেই সম্প্রদায়ের ভক্তদিগকে বলা হয় 'বারকরী'। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে আজ পর্যন্ত অসংখ্য ভক্ত জ্ঞানেশ্বরের সমাধিস্থান আলন্দী (পুনা হইতে ১৪ মাইল দূরে) হইতে পাণ্ঢারপুর পর্যন্ত নামকীর্তন করিতে করিতে অনবরত যাতায়াত করেন। পাণ্ঢারপুর-মন্দিরে এখনও প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা নামসঙ্কীর্তন হয়। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রোক্ত নবধা ভক্তির অনুষ্ঠান ইঁহারা নিষ্ঠার সঙ্গে করিয়া থাকেন। সেইজন্য বিশ্বরূপ, শ্রীরঙ্গপুরী ও শ্রীচৈতন্য স্বয়ং এই তীর্থক্ষেত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মধ্যযুগের প্রেমভক্তির অন্যতম উৎসরূপে পাণ্ঢারপুর গৌড়ীয় মহাপুরুষদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু এখন কদাচিৎ কোন বাঙালী এই তীর্থে গমন করেন। মন্দিরের নিকটেই ভীমা নদী—কাশীর গঙ্গার ন্যায় অর্ধ-চন্দ্রাকারে পাণ্ঢারপুরকে বেষ্টন করিয়া আছে। নদীতে প্রত্যহ বহু নরনারী স্নান করিয়া ধন্য হয়। নদীর স্রোত অতি প্রবল।

শ্রীচৈতন্যের পাণ্ঢারপুরে যাত্রার প্রভাব 'মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি' শ্লোকের উপর পড়িয়াছে। কেননা আমরা নামদেবের 'হেচি দেবা পায় মাগত' শীর্ষক অভঙ্গে পাই :

তোমার পায়ে আমার এই এক প্রার্থনা—তোমার পদসেবা যেন আমি করি। আমি যেন পাণ্ঢারিতেই থাকি, তোমারই সাধুসন্তদের পাশে। উচ্চ বা নীচ যোনিতে আমার জন্ম হয় হউক, আমি যেন হরি, তোমারই ভজন করি। হে কমলাপতি, 'নাম' প্রার্থনা করে যেন সে সারাজীবন তোমার নাম করিতে পারে। ১

নামদেব তাঁহার 'দেহ যাবো অথবা রাহো' শীর্ষক অভঙ্গে গাহিয়াছেন : দেহ যাউক অথবা রহুক, হে পাণ্ডুরং! তোমাতেই আমার বিশ্বাস। প্রভু! তোমার চরণ আমি কখন ছাড়িব না—এই শপথ আমি তোমার নিকট করিতেছি। তোমার পবিত্র নাম আমার ওষ্ঠে, আর তোমার প্রেম আমার হৃদয়ে চিরদিন রহিবে। কেশব! এই তোমার নামে আমি ব্রত নিলাম, তুমি ইহা পালন করিতে সাহায্য

* গত বৎসর পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, এ বৎসরে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে।—উঃ সঃ

১ Psalms of the Maratha Saints হইতে অনুবাদ—১৫ সংখ্যক কবিতার।

কর প্রভু! পাণ্ঢারপুরের পাণ্ডুরং বিগ্রহ বিঠোবা।[২]

'সর্বভূতি পাহে এক বাসুদেব' শীর্ষক অভঙ্গে নামদেব বলিয়াছেন: অহংবুদ্ধি থেকে মুক্ত হ'য়ে যিনি বাসুদেবেই সব কিছু দেখতে পান, তাঁকেই তুমি সাধু ব'লে জেনো; আর সবাই বদ্ধ জীব। সাধুর চোখে টাকাপয়সা ধূলি ছাড়া কিছু নয়, রত্নরাজি পাথর ছাড়া কিছু নয়; তাঁর অন্তর থেকে কামক্রোধ দূরে গিয়েছে, ক্ষমা প্রশান্তি সেখানে বাস করে। আমি 'নাম', যা বলছি শোন—তিনিই সাধু, যিনি গোবিন্দের নাম ছাড়া একক্ষণও থাকেন না, দিনরাত নাম গ্রহণ করেন।[৩] এই ভাবের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' উপদেশের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়।

২ ঐ—১৪ সংখ্যা।

৩ ঐ—২১ সংখ্যা।

'দক্ষযজ্ঞ'—এখনও ঘটছে

ডক্টর শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ

গুরু। পুরাণে দক্ষযজ্ঞের কথা আছে। পুরাণের কথা কিন্তু পুরানো নয়। এটি এখনও ঘটছে। দক্ষ মানে কর্মকুশল, expert; আমরা প্রত্যেকেই দক্ষ। আমরা প্রত্যেকেই মনে করি, আর কেউ সংসারে শান্তিলাভ ক'রে থাকুক না নাই থাকুক, আমি নিশ্চয়ই শান্তিলাভ ক'রব। নিজের কর্মক্ষমতায় আমাদের এত প্রগাঢ় বিশ্বাস যে শিব অর্থাৎ মঙ্গলকে বাদ দিয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করেছি।

শিষ্য। কিন্তু দক্ষযজ্ঞে শিব উপস্থিত না থাকলেও বিষ্ণু যজ্ঞরক্ষার ভার নিয়েছিলেন।

গুরু। সংসার-যজ্ঞেও কি সদাচার, সদ্ধর্ম নেই? তবে 'আমি করেছি', 'আমি করছি' এই সব দাম্ভিকতা থাকেই। 'আমি যজ্ঞ ক'রব', 'আমি দান ক'রব'—এই সব ভাবকে শ্রীভগবান গীতায় তামস আখ্যা দিয়াছেন। যেখানে তমঃ, সেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকার—অহংকার। সেখানে ধর্মকে কেমন ক'রে ধ'রে রাখা যাবে বল? সতী—যিনি সত্যস্বরূপা, তাঁর প্রাণত্যাগ হ'ল, অর্থাৎ কিনা সংসারে সত্য পালন করা যায় না। আর কী হ'ল? ভূত প্রেত সব যজ্ঞ পণ্ড ক'রল। সংসারেও ত্যাখো না—ছেলে বাপ-মাকে মানছে না, বাপ-মাও ছেলেকে দেখছে না, স্ত্রী স্বামীকে মানছে না, স্বামী স্ত্রীকে মানছে না, এইরূপই তো সর্বত্র দেখা যায়। এ-কে ভূত-প্রেতের নৃত্য ছাড়া আর কী বলি বলো? অবশেষে নিজ মুখের পরিবর্তে দক্ষের ছাগমুণ্ড হ'ল। জীবনের শেষাশেষি আমাদের নির্বুদ্ধিতা দেখে আমাদের মনেও ধিক্কার আসে, মনে হয় আমাদের বিচারবুদ্ধি ছাগলেরই অনুরূপ।

শিষ্য। এর প্রতিকার কি?

গুরু। শিবকে—মঙ্গলকে এনে তবে যজ্ঞ আরম্ভ করতে হবে, 'ঠাকুর, তুমি সর্বশক্তিমান্। সব শক্তি তোমারই শক্তি। যে শক্তিটা এতক্ষণ ঘুমের সময় নিষ্ক্রিয় ছিল এবং যে শক্তিটা আমার ব'লে এখন কাজে লাগাতে যাচ্ছি, সেটি আমার নয়—প্রকৃত প্রস্তাবে তোমারই। ঠাকুর, তোমার শক্তি নিয়ে কাজ হবে, অতএব কাজগুলি তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ীই হওয়া উচিত। এই করো ঠাকুর! আমার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি ব্যবহার যেন তোমার মনোমত হয়। ঠাকুর, আর কারো পানে চেয়ে চলার থেকে, আর কারো মন জোগানো থেকে আমাকে বাঁচাও। আমাকে তোমার নিত্যদাস করো প্রভু!' এই প্রার্থনার রেশ যেন সারাদিন আমাদের মনের মধ্যে থাকে।

বাঙলা শাক্ত সঙ্গীত

ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর ভিতরে কতগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মিল রহিয়াছে; কিন্তু এই মিল সত্ত্বেও উভয়বিধ পদাবলীর মধ্যে আকারগত ও প্রকারগত মৌলিক পার্থক্যও রহিয়াছে।

প্রথমেই লক্ষ্য করিতে পারি, বৈষ্ণব কবিতার সহিত সমজাতীয়ত্ব লক্ষ্য করিয়া আমরা শাক্ত কবিতাগুলিকেও 'পদাবলী' নাম দিয়াছি বটে, আসলে কিন্তু শাক্ত পদাবলী সবই মূলতঃ শাক্ত সঙ্গীত। বৈষ্ণব পদাবলীও অবশ্য সবই গান; তথাপি তাহার একটা নিজস্ব কবিতার দিক্‌ও আছে। শুধু গানরূপে আস্বাদ না করিয়া গীতি-কবিতা-রূপেও বৈষ্ণব পদাবলীকে আস্বাদ করা যাইতে পারে। শাক্ত পদাবলীর এই গীতি-কবিতার দিক্ অতি অপ্রধান। গান ও গীতি-কবিতার মধ্যে একটা মৌলিক তফাৎ আছে; রবীন্দ্রনাথ গানও রচনা করিয়াছেন, গীতি-কবিতাও রচনা করিয়াছেন। যেগুলি গীতি-কবিতা তাহাদের সঙ্গে সুর-সংযোগ করিলে সেগুলি গানের রূপ ধারণ করে; কিন্তু সুর-সংযোগ ব্যতীতও কবিতার ছন্দে আবৃত্তি দ্বারা তাহার অর্থ গ্রহণ এবং আস্বাদন সম্ভব। কিন্তু যেগুলি মূলতঃ গান সেগুলি হইতে সুর বাদ দিয়া দিলে সেগুলি কবিতা হইয়া ওঠে না; সুর-সংযোগ ব্যতীত তাহাদের অর্থেরই সম্যক্ স্ফুরণ নাই; সুর-সংযোগের দ্বারাই তাহাদের ভিতরে স্ফুট-অস্ফুট সূক্ষ্ম-সুকুমার অর্থসকল ব্যঞ্জিত হইতে থাকে—সুরের মাধ্যমেই তাহাদের যথার্থ আস্বাদন। আমরা যাহাকে 'শাক্ত পদাবলী' নাম দিয়াছি তাহার ক্ষেত্রেও সেই কথা। গীতি-কবিতার প্রকৃতি অপেক্ষা গানের প্রকৃতিই ইহাদের বেশি; এই কারণেই বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে এগুলিকে বিচার করিতে গেলে ইহাদের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যায় না। বৈষ্ণব কবিতার বিচার বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবেও চলে। মূলতঃ গান বলিয়া অধিকাংশ শাক্ত কবিতাই আকারে সংক্ষিপ্ত। গানের ভাব সংহত গাঢ়-বদ্ধ বলিয়াই তাহার পরিধিও স্বাভাবিক ভাবেই সংহত।

দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাই, শাক্ত সঙ্গীতগুলি মূলতঃ সাধন-সঙ্গীত। বৈষ্ণব কবিতারও একটা সাধন-সঙ্গীতের দিক্ আছে; কিন্তু সব বৈষ্ণব কবিতার প্রেরণাই মূলতঃ একটা সাধন-প্রেরণা, এমন কথা মনে করিতে পারি না। চৈতন্য-পরবর্তী কালে লীলার স্মরণ-মনন-কীর্তনই বৈষ্ণব-গণের একটা প্রধান সাধনারূপে স্বীকৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণও কৃষ্ণ-লীলার বা গৌরাঙ্গ-লীলার পরিকরত্ব লাভ করিয়া দূর হইতে লীলা-শুকের ন্যায় লীলা-সঙ্গীতের দ্বারাই লীলা আস্বাদন করিতেন। কিন্তু সকল বৈষ্ণব কবির কাব্য-প্রেরণার মূলেই এই সাধন-স্পৃহা বলবতী ছিল, এ কথা বলা যায় না। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবিগণের সম্বন্ধে তো বলা আরও শক্ত। রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনাস্থলে চৈতন্য-পরবর্তী কালেও কবি-প্রেরণা সাধক-প্রেরণা অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে বেশি সক্রিয় ছিল—এই কথাই মনে হয়। অবশ্য যাঁহারা বৈষ্ণব সাধক তাঁহারা সব পদই লীলা-সাধনের সহায়রূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু বৈষ্ণব প্রার্থনার পদগুলি ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে এই সাধনার দিকটি প্রত্যক্ষ

নহে। কিন্তু শাক্ত পদাবলীগুলি মুখ্যতঃ সাধন-সঙ্গীত। অবশ্য কিছু কিছু গান কবিওয়ালা বা পাঁচালিওয়ালা এবং পরবর্তী কালের কবি-নাট্য-কারগণকর্তৃকও রচিত হইয়াছে—সে ক্ষেত্রে সাধারণ ভক্তি-আকৃতি-প্রকাশের প্রথাবদ্ধতা প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সঙ্গীতগুলি সাধন-প্রেরণা-প্রসূত। অন্ততঃ শাক্ত-সঙ্গীতের প্রবর্তক রামপ্রসাদ সম্বন্ধে এই সত্যটিকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করিতেই হইবে।

অবশ্য শাক্ত গানগুলিকেও আবার দুই ভাবে ভাগ করা যাইতে পারে, লীলা-গীতি ও বিশুদ্ধ সাধন-গীতি। আগমনী ও বিজয়া-সঙ্গীতগুলি মুখ্যভাবে লীলা-গীতি। এই লীলা-গীতিগুলিরও একটি সাধনার দিক্ রহিয়াছে—যেমন রহিয়াছে বৈষ্ণব লীলা-গীতির সাধনার দিক্। আগমনী-বিজয়া ব্যতীত অন্য গীতিগুলি বিশুদ্ধ সাধন-গীতি। আমরা একটু পরেই এই শাক্ত লীলা-গীতির ভিতরকার সাধনা এবং অন্য প্রকারের সাধন-সঙ্গীতগুলির অন্তর্নিহিত সাধন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

একটি জিনিস আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—পরিমাণ, বৈচিত্র্য ও সাহিত্য-সমৃদ্ধির দিক্ হইতে বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত শাক্ত পদাবলীর ঠিক ঠিক তুলনা হয় না; কিন্তু বাঙলা ধর্মসঙ্গীতের ক্ষেত্রে শাক্ত পদাবলীর প্রবর্তক রামপ্রসাদের একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে বাঙলা দেশের বৈষ্ণব চেতনা ক্রমে ক্রমে একটা গোষ্ঠী-চেতনার রূপ লাভ করিয়াছিল। মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে বা ভগবৎ-চৈতন্যরূপে বিগ্রহীভূত হইলেন, তখন মহাপ্রভু-প্রভাবিত জন-সমাজে ভগবৎ-সত্তা ও ভগবৎ-কৃপা একরূপ স্বতঃসিদ্ধরূপেই গৃহীত হইতে লাগিল। ভগবৎ-সত্তা ও ভগবৎ-কৃপা তখন ক্রমে বৈষ্ণব সমাজে একটা গোষ্ঠী-চেতনারূপে দেখা দিল। এই ভগবৎ-নিষ্ঠা ও ভগবৎ-লীলায় আসক্তির মধ্যে কোনও রূঢ় ব্যক্তি-জীবনের জিজ্ঞাসা ছিল না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত কবিগণের মধ্যে কাজ করিয়াছে এই গোষ্ঠী-চেতনা, অন্যান্য ছোট ছোট কবিগণ ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন একটা সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে। বৈষ্ণবতা তাহার প্রসিদ্ধি ও ব্যাপকতা দ্বারা যখন এই জাতীয় একটা সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে দেখা দিল, তখন বৈষ্ণব কবিতার মধ্যেও দেখা দিয়াছে অনেক-খানি প্রথাবদ্ধতা এবং রীতি-প্রবণতা।

কিন্তু রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত গান-গুলিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, রামপ্রসাদের মাতৃ-বিশ্বাস কোনও গোষ্ঠী-চেতনালব্ধ জিনিস নহে; রূঢ় বাস্তব জীবনের অগ্নিদাহে ইহার খাদ পোড়ান হইয়াছে, জীবন-জিজ্ঞাসা-জনিত ঘনীভূত সংশয়ের কষ্টি-পাথরে ইহার সারবত্তা বার বার পরীক্ষিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকের বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সমগ্র জীবনব্যাপী বাঁচিবার সংগ্রামের সমস্ত আঘাতকে সহ্য করিয়া তবে রামপ্রসাদকে এই 'মা' নামে অটল থাকিতে হইয়াছে। রামপ্রসাদের একটি প্রসিদ্ধ গানে দেখিতে পাই, জীবনের দুঃখ লইয়া রামপ্রসাদ মাকে রীতিমত 'চ্যালেঞ্জ' দিতেছেন—

আমি কি দুখেরে ডরাই?
দুখে দুখে জন্ম গেল,
আর কত দুখ দেও দেখি তাই।[১]
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥……
প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই॥

১ ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই—পাঠান্তর।

কিন্তু মুখে বড়াই করিলে কি হইবে, বেশ বুঝিতে পারি এই লোকটি বাস্তব জীবনের দুঃখে দুঃখে বড় শ্রান্ত। এত দুঃখের বোঝা বহিয়া-চলা-জীবনের পশ্চাতে কোনও মঙ্গলময়ী চৈতন্য-শক্তি রহিয়াছে কিনা—এ লোকটি তাহাকে কল্পনায় নয়, একান্ত বাস্তবভাবে অনুভব করিতে চায়। বিশ্বাসের ভিতর দিয়া বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসা-জনিত সংশয় বার বার উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। প্রথম জীবনে লোকটিকে কৃষ্ণচন্দ্র রাজার জমিদারিতে মুহুরীগিরি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হইয়াছে, পরবর্তী জীবনে শুধু কিঞ্চিৎ রাজ-অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইয়াছে। সুতরাং দুঃখ-দারিদ্র্যের বোঝাভরা জীবন—তাহার মধ্যেই হৃদয়ে আঁকড়াইয়া রাখিতে হইয়াছে পরম-মঙ্গলময়ী মাতৃ-চেতনা। এই চেতনায় বার বার প্রতিকূল কম্পন দেখা দিয়াছে। কোনও শুভ মুহূর্তে হয়ত এই সাংসারিক সকল তুচ্ছতা—ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করিয়া মন অনেক উর্দ্ধে এক সীমাহীন মহা-চৈতন্যের মধ্যে বিচরণ করিবার সুযোগ পায়—'কালীপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল!' কিন্তু সেখানে শাশ্বত স্থিতি লাভ করা যায় কই? তাই ত পরমুহূর্তেই আবার—'কলুষ-কুবাতাস পেয়ে ঘুড়ি গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল'[২] তত্ত্বকথার বাঁধাবুলিতে বাস্তব দারিদ্র্যের জ্বালা ভুলিতে না পারায় একদিন রামপ্রসাদকে দারিদ্র্য লইয়া তাঁহার 'মায়ের' সহিত রীতিমত জবাবদিহি করিতে দেখি—

আমি তাই অভিমান করি,
আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ বলিয়ে শিব ভিখারি

২ পদটি রামপ্রসাদের বলিয়াও গৃহীত হয়, আবার নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ভণিতাতেও গৃহীত হয়।

এই জবাবদিহি শুধু রামপ্রসাদের জবাবদিহি নয়; ধর্মকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে বনাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে অষ্টাদশ শতকের যে নিম্নমধ্যবিত্ত দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট সম্প্রদায় তাহাদেরই চেতনায় একটি চেতনা-দ্বন্দ্বের ভিতরে দেখা দিয়াছে এই জবাবদিহির ইচ্ছা। রামপ্রসাদের ধর্মবোধের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাহার গানের অদ্ভুত একটি পদে, যেখানে তিনি বলিয়াছেন,

এ সংসারে এনে মাগো করলি আমায় লোহাপেটা।
আমি তবু কালী ব'লে ডাকি
সাবাস্ আমার বুকের পাটা ॥

কালী মঙ্গলময়ী আনন্দময়ী মা বলিয়া সমস্ত জীবনটা শুধু মঙ্গলে আর আনন্দেই ভরা—এমন ছেঁদো বুলিতে রামপ্রসাদের মন ওঠে নাই; রামপ্রসাদ সারা জীবনই দেখিয়াছেন, বাস্তব সংসারের ক্ষেত্রে আনিয়া মা নিরন্তর 'লোহা-পেটা'ই করিয়াছেন; কিন্তু রামপ্রসাদ 'সাবাস্' পাইবার দাবি রাখেন কোথায়? এই সমস্ত 'লোহাপেটা'কে এড়াইয়া গিয়া বা অস্বীকার করিয়া তিনি মাকে স্বীকার করিবার চেষ্টা করেন নাই, সেই সমস্ত 'লোহাপেটা'র ভিতরেই তিনি ব্যক্তিজীবন এবং বিশ্বজীবনের পিছনে একটি মহাশক্তিতে বিশ্বাসকে অটুট রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার রক্তাক্ত দেহমন লইয়া। রামপ্রসাদের এই গানের সুরে মানুষের আধুনিক ধর্মবোধের আভাস ফুটিয়াছে। বাস্তব জীবন সংগ্রাম মনকে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, ধর্মবোধকে তাই প্রকাশ পাইতে হইয়াছে সংশয়-মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আভাসিত বিশ্বাসের বর্ণচ্ছটায়।

রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে বাস্তব-জীবন-জিজ্ঞাসা যেরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেখিতে পাই তাঁহার পরবর্তী শাক্ত সঙ্গীতকারগণের

গানের মধ্যেও ধর্মবিশ্বাসের এই বাস্তবে প্রতিষ্ঠা আমরা নানাভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। আর বাস্তব জীবনের সঙ্গে শাক্তগণের সঙ্গীত এইরূপ ওতপ্রোতভাবে মিলিত ছিল বলিয়াই দেখিতে পাই, শাক্ত সঙ্গীতের ভাষাও হইল সাধারণ জীবনের ব্যাবহারিক ভাষা। তালুক-জমিদারি, বিষয়-সম্পত্তি, মামলা-মোকদ্দমা, লেন-দেন, দলিল-দস্তাবেজ, ঋণ-বন্ধক, নায়েব-তফিলদার, ব্যাপারী-ব্যবসায়ী, কলু-কৃষক—কাহারোই এই সঙ্গীতের মধ্যে অনায়াসে স্থান পাইবার কোনও বাধা ছিল না।

পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যাপকভাবে সকল শাক্ত সঙ্গীতগুলিকেই সাধন-সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারিলেও সঙ্গীতগুলিকে আবার দুই-ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—লীলা-সঙ্গীত বা লীলাশ্রিত সাধন-সঙ্গীত, আর বিশুদ্ধ সাধন সঙ্গীত। বিশুদ্ধ সাধন-সঙ্গীতগুলিতে তৎকালে প্রচলিত বাঙলাদেশের বিবিধ মাতৃ-সাধনারই বিবরণ দেখিতে পাই। ভক্তি ও যোগাশ্রিত তান্ত্রিক গুহ্য সাধনার বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে এই সাধকগণের বিবিধ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরও আভাস মেলে। এই সাধনা ও সাধনালব্ধ অনুভূতির বর্ণনায় শাক্ত কবিগণের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি এবং বিশিষ্ট ভঙ্গির ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম সাধন-সঙ্গীত চর্যাপদগুলির সহিত এই শাক্ত সাধন-সঙ্গীতগুলির একটা মিল অতি সহজেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সাধনার গুহ্য রহস্য ও সাধন-লব্ধ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসকলের বর্ণনায় চর্যাকারগণ সর্বদাই কতগুলি রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আর এই রূপকগুলিও সংগৃহীত চর্যাকারগণের বাস্তব সমাজ-জীবনের আশেপাশে ছড়ানো সকল দৃশ্য ও ঘটনা হইতে। শাক্ত সাধন-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক সেই জিনিসটিই লক্ষ্য করিতে পারি। এখানেও যে সকল রূপক ব্যবহৃত হইতে দেখি তাহা সমাজ-জীবনের চারিদিকে ছড়ানো দৃশ্য ও ঘটনা হইতেই সংগৃহীত। চর্যাপদের মধ্যে একটি পদে দেখি দাবাখেলার রূপকে সাধন-রহস্য প্রকাশ করা হইয়াছে। পদটি এই—

'করুণাকে পিড়ি করিয়া নয়বল (দাবা) খেলিতেছে; সদ্‌গুরুর বোধে ভববল জিতিলাম।...প্রথমে তুড়িয়া বড়িয়া মারিলাম, গজবরকে তুলিয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করিলাম। মন্ত্রী দ্বারা ঠাকুরকে (রাজাকে) পরিনিবৃত্ত করিলাম, অবশ করিয়া (কিস্তিমাৎ করিয়া) ভববল জিতিলাম।'[৩]

ইহার সহিত তুলনা করিতে পারি রামপ্রসাদের একটি পদ: এবার বাজী ভোর হলো।

মন কি খেলা খেলবে বল॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘরে ভর ক'রে
মন্ত্রীটি বিপাকে মলো॥
... ...
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে
অবশেষে এই কি ছিল!
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে
পিলের কিস্তি মাত হইল॥[৪]

রামপ্রসাদ পাশাখেলার রূপকও গ্রহণ করিয়াছেন, যথা:

ভবের আশা খেলব পাশা,
বড়ই মনে আশা ছিল।
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি প'লো
প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল,

৩ করুণা পিহাড়ি খেল হুঁ নঅ বল। ইত্যাদি, ১২ নং।
৪ ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ' গ্রন্থে সঙ্কলিত।

শেষে কচ্চা বার পেয়ে মাগো

পাঁজা ছক্কায় বদ্ধ হলো ॥[৫]

একটি চর্যাগানে দেখিতে পাই সূর্যকে লাউ করিয়া এবং চন্দ্রকে তন্ত্রী (তার) করিয়া এবং অনাহতকে মধ্যবর্তী দণ্ড করিয়া একটি বীণা-যন্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং সেই যন্ত্র হইতে যে সুমধুর ধ্বনি বাহির হইতেছে, তাহা শুনিয়া চিত্ত সমরসে প্রবেশ করিয়াছে।[৬] গোবর্ধন চৌধুরীর একটি শাক্ত সঙ্গীতে দেখি—

মন-সেতারে বাজরে তার, তারা তারা ব'লে।

তোমার দেহরূপী লাউ ছিল, বহুদিনে জীর্ণ হ'ল,
জ্ঞান-পর্দা ছিন্ন ভিন্ন হোল তোর দোষে ॥
ভৈরবী রাগিণী ধ'রে বসাও পর্দা সুরে সুরে,
বাজা রে গৎ মধুর স্বরে, হবে পার এ ভব-দুস্তরে ॥[৭]

একটি চর্যাপদে আমরা শুঁড়ীর ভাঁটিতে মদ চুয়াইবার রূপক দেখিতে পাই।[৮]

রামপ্রসাদের একটি গানে দেখি—

গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি-মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটি,
পান করে মোর মন-মাতালে ॥

ডোম্বীপাদের একটি চর্যায় নৌকা বাহিবার রূপকে সাধন-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে পঞ্চতথাগতরূপ পঞ্চ কেড়ুয়াল (দাঁড়), সৃষ্টি-সংহার-রূপ দুই চাকা ও মাঝখানে অদ্বয়-রূপ মাস্তুলের কথা দেখিতে পাই।[৯] কমলাকান্তের একটি গানেও অনুরূপ সাধন-বর্ণনা দেখিতে পাই :

মন-পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।
মন মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে ॥
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল ;
সুজন কুজন আছে যারা,
তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে ॥[১০]

ইহা ব্যতীত আমরা কোথাও জমিদারির রূপক,[১১] কোথাও তবিলদারের রূপক,[১২] কোথাও মামলা-মোকদ্দমার রূপক,[১৩] কোথাও দিনমজুরের রূপক,[১৪] কোথাও 'কুয়োর ঘড়া'র রূপক,[১৫] কোথাও রোগের রূপক,[১৬] কোথাও কূপের রূপক,[১৭] কোথাও আবার ঘুড়ি উড়াইবার

৫ তুলনীয় রসিকচন্দ্র রায়ের গ্রাবুখেলার রূপক—
সাধন-রূপ গ্রাবুখেলা এই বেলা মন খেলিয়ে নে রে।
জিৎ হবে ভবের বাজি, কালীনামের টেক্কা মেরে ॥
শাক্ত পদাবলী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

৬ সুজ লাউ সসি লা গেলি তান্তী। ১৭ সং

৭ শা. প. (ক. বি.)

৮ এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ
চীঅণ বাকল অ বারুণী বান্ধঅ ॥ ৩ সং

৯ ১৪ সং।

১০ শা প. (ক.বি.)

১১ শুনরে মন জমিদার, ভাল এবার করলি রে তুই জমিদারি !
যত সব জুয়াচোরে আমলা ক'রে উশুল তহশীল দিলি ছাড়ি।
কবি অজ্ঞাত শা. প (ক. বি.)।

১২ আমায় দেও মা তবিলদারী,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।
পদ রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি ॥ রামপ্রসাদ শা. প.।

১৩ মা গো তারা ও শঙ্করি,
কোন্ অবিচারে আমার প'রে করলে দুখের ডিক্রী জারি ?
রামপ্রসাদ, শা. প.

১৪ ম'লেম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে। রামপ্রসাদ, শা. প.

১৫ আর কত কাল ভুগবো কালী হ'য়ে আমি কুয়োর ঘড়া।
এই ভবকূপে কোনরূপে নিবৃত্তি নাই উঠা-পড়া।
প্যারীমোহন কবিরত্ন, শা. প.

১৬ তারিণি ভবরোগে ব্যথিত জীবন, করি কি এখন ?
কলুষ-পৈত্তিকে অঙ্গ করিছে দহন।
বাসনা বাত প্রবল, টুটাইয়ে জ্ঞান-বল,
প্রবৃত্তি-কফেতে কণ্ঠ করিছে রোধন ॥ রামচন্দ্র রায়, শা.প.

১৭ দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা !
ষড়্‌রিপু হ'ল কোদণ্ডস্বরূপ,
পুণ্য ক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে ব্যাপিল কালরূপ জল—কাল-মনোরমা !
দাশরথি রায়, শা. প.

রূপক,[১৮] কোথাও বা কাপড় ধোপ দিবার রূপক[১৯] দেখিতে পাই। এই সকল রূপকের মধ্যে রামপ্রসাদের দুই একটি রূপক জন-প্রিয়তার দ্বারা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, একটি হইল কৃষির রূপক :

মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা॥

১৮ শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি, ভব-সংসার-বাজারের মাঝে।
ঐ যে মন-ঘুড়ি, আশা-বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া-দড়ি॥
রামপ্রসাদ, শা. প.

১৯ বাসনাতে দাও আগুন জেলে, ক্ষার হবে তায় পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ্ বালাই,
মনের ময়লা যাবে কাটি॥
কালীদহের জলে চল, সে জলে ধোপ ধরবে ভাল।
(আর) পাপকাষ্ঠের আখা জ্বালো,
চাপাও রে চৈতন্য-ভাঁটি॥ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, শা.প.

অপরটি হইল ডুবুরীর রূপক :

ডুব দে রে মন কালী ব'লে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দু-চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে॥

গৃহীর ন্যায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার-যাত্রার একটি রূপকও জন-প্রিয়তা লাভ করিয়াছে :

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরু-তলে গিয়া চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক-নামে জ্যেষ্ঠপুত্র,
তত্ত্ব-কথা তায় সুধাবি।

পূজোর দিনে

শ্রীনবগোপাল সিংহ

অপরাজিতার নীল শাড়ীখানা
পূজোর বাজারে কে দিল কিনে?
জবার মেয়েও রক্ত চেলিটি নিয়েছে চিনে।
শিল্পী শিউলী রঙীন বোঁটায়
ঘাসের জাজিমে বুটি তুলে যায়
সবুজ ধানের ওড়না উড়িয়ে
কে এল ধরায় এ আশ্বিনে?

আলো-ঝলমলো আকাশের নীলে
হালকা মেঘের পানসী চলে
রাতের আঁধারে লক্ষ তারার জোনাকি জ্বলে।
কাশ ফোটে আর মাঠে জোটে বক্
যে দেখে সে চেয়ে থাকে অপলক,
সারা রাত ধরে সাপলা ঘুমায়,
জাগে শতদল সকাল হ'লে।

ড্যাম কুড় কুড় তালে তোলে ঢাক
তার সাথে বাজে কাঁইনানা কাঁসি।
গৌরী, বিভাস, ভাঁয়রো ধ'রেছে ভোরের বাঁশী।
কোনদিন যারা ওঠেনাকো ভোরে
সেই ছেলে মেয়ে জুটলো কি ক'রে?
মা এসেছে শুনে মাতৃহারার
আশা-আশ্বাসে ফুটেছে হাসি।

এলো ওই এলো আনন্দময়ী
এলোরে বাহিয়া সোনার তরী—
শূন্য ধরণী সোনার ফসলে পূর্ণ করি।
সাজায়ে অর্ঘ্য, বন্দনা গেয়ে
জননীর কাছে কি নিবি নে চেয়ে,
শক্তির কাছে চেয়ে নে শক্তি,
সবার হৃদয় উঠুক ভরি।

বাংলার দুর্গোৎসব

শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়

সবাই জানেন ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জায় রয়েছে ধর্মের প্রবাহ। সুতরাং শিক্ষা-দীক্ষায় সংস্কৃতির প্রবাহে যতই সে গা ভাসিয়ে দিক, তবু নিজের অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধর্মকে সে কোন কালেই বিদায় দিতে পারবে না। কিন্তু এ তো গেল সারা ভারতের কথা; তার মধ্যে এই বাংলা দেশে—যেখানে একদিন মরাই-ভরা ধান, গোয়াল আলো-করা দুগ্ধবতী গাভী থাকত, সেখানে ছিল বার মাসে তের পার্বণ। এদের মধ্যে অনেকগুলি অবশ্য আজ আর টিকে নেই, তবু আজও বরষা-শেষে প্রকৃতি যখন শান্ত স্নিগ্ধ হ'য়ে যায়, পরিষ্কার নীল আকাশের কোলে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ দেখা যায়, বৃক্ষলতা নব সাজে সজ্জিত হয় আর নবীন মঞ্জরীর ভারে ধানক্ষেত-গুলি সুশোভিত হ'য়ে ওঠে ঠিক সেই সময়েই বাঙালী করে দুর্গাপূজার আয়োজন। এই দুর্গোৎসব বাংলায় যেভাবে সম্পাদিত হয়, সেভাবে আর কোথাও হয় না। তাছাড়া প্রবাসী বাঙালীর বাস যেখানেই আছে, সেখানেই আজকাল দুর্গোৎসবের আয়োজন হয়। ফলে ভারত-বর্ষের প্রায় সর্বত্র দুর্গাপূজা প্রচলিত। তবু বাংলার আকাশ-বাতাসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দুর্গোৎসব যেভাবে জমজমাট হ'য়ে ওঠে, বাংলার বাইরের দুর্গোৎসব সেভাবে জমে উঠতে পারে না।

তাছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে দুর্গা-পূজায় যে মূর্তি কল্পনা করা হয় তাও অন্য প্রকার দেখা যায়। যেমন—কলিঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশে দেবী অষ্টভুজা; অযোধ্যা, সৌরাষ্ট্র, শ্রীহট্ট ও কোশলে দেবী অষ্টাদশভুজা; মথুরা, কেদার ও কুরুদেশে দেবী দ্বাদশভুজা; নেপাল, কচ্ছ ও কঙ্কণে দেবী চতুর্ভুজা।

দশভুজা সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী দেবী, তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ এবং তাঁদের বাহনের পূজা বাংলার নিজস্ব। এই ভাবের প্রতিমা তৈরী ক'রে মাতৃ-আরাধনা বাংলাদেশে কতকাল প্রচলিত, তা সঠিক নির্ণয় ক'রে বলা সহজ নয়।

এর ওপর বাংলার দুর্গোৎসব আবার বাৎসল্য রসে অভিষিক্ত হ'য়ে আরও মধুর হ'য়ে উঠেছে। শরৎসমাগমে দেবীপক্ষের বহু পূর্ব থেকে দেবীর 'আগমনী' সঙ্গীত বাংলার প্রতি নগরে ও গ্রামে যেন নব জীবন দান করে:

গিরি গৌরী আমার এসেছিল
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল!

রাণী মেনকার সঙ্গে বাংলার মাতৃহৃদয়ের অপূর্ব যোগাযোগ; তাঁর মনটিও যে প্রকৃতির এই প্রাচুর্য-সম্ভারের মধ্যে দূরপ্রবাসী কন্যার জন্য আকুল হ'য়ে ওঠে! তাই ঘরের দরজায় ভিখারী যখন গায়—

গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
এল বুঝি তোর ঈশানী—

তখন ভিখারীর ভিক্ষাপাত্র ভ'রে উঠতে আর বিশেষ সময় লাগে না।

বৎসরান্তে মাত্র তিনদিনের জন্য পিতৃগৃহে কন্যা আসবে—আনন্দের আর সীমা নেই। তাই মহামায়ার সম্বর্ধনা ও পূজায় বাঙালী যে আনন্দ করে, তার তুলনা ভারতের অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। বাঙালীর দুর্গোৎসবে

বাৎসল্য-রসের প্রাধান্যই তাকে অতুলনীয় ক'রে তুলেছে। সিংহারূঢ়া মহিষমর্দিনী শুম্ভ-নিশুম্ভ-ঘাতিনী দশভুজা অপেক্ষা সন্তান-পরিবৃতা স্নেহ-শীলা মাতৃরূপটি, সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্রী জগজ্জননী অপেক্ষা মেনকারাণীর প্রাণসমা আদরিণী কন্যা উমাই বাঙালীর অধিক আকাঙ্ক্ষিত। চৈতন্য-রূপিণী মা 'স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে' আবার না লুকায়, এই তার ভয় ও ভাবনা। বাৎসল্য-রসজ স্নেহপ্রীতিভক্তিকে ব্রহ্মানন্দে পরিণত করাই ভক্তের সাধনা।

মা আমার শুদ্ধ-সনাতনী মূলা প্রকৃতি। তিনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপিণী, দেবতাদিগেরও উপাস্যা। তিনিই মাহেশ্বরী শক্তিতে দুর্গারূপে, বৈষ্ণবী শক্তিতে লক্ষ্মীরূপে, ব্রহ্মাণী শক্তিতে সরস্বতীরূপে বার বার দেখা দেন; অর্থাৎ একই শক্তির ত্রিমূর্তি—জ্ঞান, ইচ্ছা, কর্ম। সকলকে একত্র করেই বাঙালীর পূজা। তারও পর ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমার কার্তিকরূপে ও ভগবান বিষ্ণু গণেশরূপে পার্বতীনন্দন নামে খ্যাত হ'য়ে এ পূজার অংশভাগী। প্রতিমায় সিংহবাহিনী দশপ্রহরণধারিণী দেবী দুর্গারূপে মহিষাসুর-নিধনে পরিদৃশ্যমানা।

বাঙলা দেশ যখন ধনধান্যে পরিপূর্ণ এবং বিদ্যা-বুদ্ধি শৌর্যবীর্যে ও ধর্মে কর্মে অতুলনীয় হ'য়ে উঠেছিল, জাতীয় জীবনের সেই গৌরবময় অতীতেই ধনদায়িনী লক্ষ্মী, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী শৌর্যশালী কার্তিক এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তিসহ মহামহিমময়ী দুর্গামূর্তির পরিকল্পনা করা হয় ব'লে আজ অনেকেরই বিশ্বাস।

ভক্তের কাতর আহ্বানে ভগবান চিরকালই সাড়া দিয়ে থাকেন। তাই মাতৃভাবের সাধনায় ভক্ত এমন তন্ময় হ'য়ে যায় যে সে জোর ক'রে বলতে পারে: আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে যদি মরি

আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে

দেখা যাবে গো শঙ্করি!

ভক্তের সার কথা: আবাহনও জানি না, পূজাও জানি না, বিসর্জনও জানি না; জানি আমার ভার তোমারই। তাই সে বলতে পারে—

কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখন নয়।

মাতৃনামে এই বিশ্বাসই ভক্তকে কোন মন্ত্র-তন্ত্রের বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারেনি।

তা-ছাড়া বাংলার দুর্গাপূজা কেবল পূজা-মাত্রই নয়, অথবা উৎসব করেই এর সমাপ্তি হয় না। পরন্তু দশে মিলে প্রাণ ভ'রে মেলামেশার সুযোগ মেলে এই দুর্গাপূজায়। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সমাজের সকলে একত্র হ'য়ে করে এক অপূর্ব জাতীয় উৎসব। তাই শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—'জাতিরূপেণ সংস্থিতা।' তিনিই আছেন আমাদের মধ্যে—'শক্তিরূপেণ'। সুতরাং অর্চনা 'বিধিহীনা ভক্তিহীনা ক্রিয়াহীনা' হলেও দেবী তাঁর প্রসাদ আমাদের দেবেন, এ বিশ্বাস বাঙালীর অন্তরে চিরকাল জাগরূক হ'য়ে আছে ও থাকবে। এই হ'ল বাংলার দুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্য।

মাতৃজাতি ও বেদাধ্যয়ন

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

ত্রৈবর্ণিক পুরুষের ন্যায় ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির বেদে সম অধিকার

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যে পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য বলিয়াছেন—'ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োঃ অলৌকিকম্ উপায়ং যঃ গ্রন্থঃ বেদয়তি, সঃ বেদঃ'—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তির এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু পরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ বিজ্ঞাপিত করে, তাহার নাম বেদ। আমার মঙ্গল হউক, অমঙ্গল না হউক, সকল অভীপ্সিত বস্তু আমার হউক, অনভীপ্সিত বস্তু চিরকাল আমা হইতে দূরেই থাকুক—প্রত্যেক মনুষ্যেরই ইহা শাশ্বত কামনা। কিন্তু তাহার ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানবলে সে ইহা প্রাপ্তির নির্ভুল উপায় নিরূপণ করিতে পারে না। উপায় সে যে কিছু একটা নিরূপণ করে না, তাহা নহে; অহরহঃ সে দুঃখ-পরিহারের ও সুখপ্রাপ্তির উপায় নিরূপণ করিতেছে, প্রাণপণে সেই উপায়কে 'রূপদান' করিতেছে, কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দুর্লভই থাকিয়া যায়। অভীষ্ট বস্তু যে সে মোটেই প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে; কিন্তু প্রথমে না বুঝিলেও ফলপ্রাপ্তিকালে সে বুঝিতে পারে, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সহিত অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুও তাহার ভাগ্যে জুটিতেছে। ইহা হইতে নিষ্কৃতির কোন উপায় সে অনুসন্ধান করিয়াও পায় না; ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান তাহাকে এই বিষয়ে সহায়তা করিতে পারে না। তখন ভগবতী শ্রুতি তাহাকে বলেন: তুমি যাহা চাও, তাহার উপায় আমি বলিতে পারি। তোমার ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানলব্ধ যাবতীয় লৌকিক উপায় তো তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ, আমি তোমাকে এই বিষয়ে 'অলৌকিক' উপায়ের কথা বলিব। এই সুখ প্রাপ্তির ও দুঃখনিবৃত্তির অভ্রান্ত অলৌকিক উপায় যাহা হইতে অবগত হওয়া যায়, তাহাই আমাদের ধর্মশাস্ত্র 'বেদ'।

আচার্যগণ নিরূপণ করিয়াছেন, যাহার 'অর্থিত্ব' অর্থাৎ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের আকাঙ্ক্ষা আছে—বেদ তাহার জন্য যে উপায় সকলের কথা বলেন, তাহা সম্পাদন করিবার 'সামর্থ্য' যাহার আছে, সেই ব্যক্তি যদি 'পর্যুদস্ত' না হয়, অর্থাৎ কোন বিশেষ উপায় অবলম্বনে শ্রুতিকর্তৃক নিবারিত না হয় [যেমন—ব্রাহ্মণজাতি রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে নিবারিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি সত্রযজ্ঞানুষ্ঠানে নিবারিত হইয়াছে—ইত্যাদি], তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বেদকর্তৃক উপদিষ্ট সেই উপায়ের অনুষ্ঠানে অধিকারী। এইরূপে প্রাপ্ত হওয়া গেল যে—অর্থিত্ব, সামর্থ্য এবং অপর্যুদস্তত্ব (শ্রুতিকর্তৃক নিবারিত না হওয়া) এইগুলি অধিকারীর গুণ। এই গুণসকল যাহার থাকে, সেই ব্যক্তি বেদবিহিত সেই অলৌকিক উপায়ের অনুষ্ঠানে অধিকারী।

নারীও মনুষ্য, তাঁহারও সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখ পরিহার বিষয়ে অর্থিত্ব আছে, তাহার অনুষ্ঠান বিষয়ে তাঁহার সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে। কিন্তু ইদানীন্তন শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতৃগণ বলেন: নারীগণ পর্যুদস্ত, শ্রুতিই তাঁহাদিগকে সম্যক্‌ভাবে না হইলেও কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত করিয়াছেন, বেদই তাঁহারা অধ্যয়ন করিতে পারেন না, কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, 'ন পত্নীং বেদে বাচয়তি' (শাঙ্খায়ন ব্রাঃ ৭।৩) ইহার অর্থ অনেকে করেন, স্ত্রীজাতিকে বেদাধ্যয়ন করাইবে না। এই প্রকার

অন্যান্য শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্যও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—'ন স্ত্রীশূদ্রৌ বেদম্ অধীয়াতাম্' (?) স্ত্রীজাতি ও শূদ্রজাতি বেদাধ্যয়ন করিবে না। 'সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তি' (নৃসিংহ পূর্বতাঃ উপঃ ১।৩)—গায়ত্রী প্রণব ও যজুর্লক্ষ্মী মন্ত্র স্ত্রী ও শূদ্রকে বলিবার ইচ্ছা করেন না (পণ্ডিতেরা)। 'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা' (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২৫)—ত্রয়ী (বেদ) স্ত্রীজাতি, শূদ্রজাতি ও দ্বিজবন্ধুগণের কর্ণগোচর হন না, অর্থাৎ বেদ-শ্রবণে তাঁহাদের অধিকার নাই ইত্যাদি। পূর্ব মীমাংসাদর্শনে (৬।১।৪) 'দম্পত্যোঃ সহাধিকারাধি-করণে' পতির সহিত পত্নীর কর্মানুষ্ঠানে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং পতিসহ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের শ্রুতি-নির্দিষ্ট উপায়ের অনুষ্ঠান তাঁহারা করিতে পারেন, ফলও তাঁহাদের লব্ধ হইয়া থাকে; বেদাধ্যয়ন কিন্তু তাঁহারা করিতে পারেন না—ইহাই ইদানীং হিন্দুসমাজে প্রচলিত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

কেহ কেহ আবার বলেন: পূজ্যপাদ আচার্য শঙ্কর নারীজাতিকে নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন, যথা—'দ্বারং কিমেকং নরকস্য? নারী।' (মণিরত্ন-মালা ২৪)—নরকের একমাত্র দ্বার কি? নারী। সুতরাং যাহারা নরকের দ্বারস্বরূপ, তাহাদের যে বেদরূপ পবিত্র বস্তুর অধ্যয়নে অধিকার নাই, এই বিষয়ে আর বলিবার কি আছে?

কর্মানুষ্ঠানে 'দম্পতির সহাধিকার'—এই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই নাই, ইহা যে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, ইহা আমরা অঙ্গীকার করি। কিন্তু বেদাধ্যয়নে মাতৃজাতির অধিকার নাই, ইহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কেন এই ধৃষ্টতা? তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

'ন বেদে পত্নীং বাচয়তি' এই বাক্য হইতেই মাতৃজাতির বেদে অধিকার প্রতিপাদন

মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার-নিরাকরণের জন্য 'ন বেদে পত্নীং বাচয়তি' (শাঙ্খায়ন ব্রাঃ ৭।৩) এই যে শ্রুতিবাক্যটি উদাহৃত হইতেছে, তাহা তাঁহাদের বেদাধ্যয়নে-অধিকারের নিবর্তক নহে, পরন্তু তদ্বিষয়ের সাধক—ইহাই আমরা প্রথমে প্রদর্শন করিতেছি। ন্যায়বিদ্‌গণ বলেন, 'অনন্য-লভ্যঃ শব্দার্থঃ'—যাহা লক্ষণাদি অন্যবৃত্তির দ্বারা লব্ধ নহে, পরন্তু শব্দের শক্তিবৃত্তির দ্বারাই লব্ধ হয়, তাহাই শব্দের অর্থ। এই সর্বসম্মত ন্যায়ানুসারে 'পত্নী' শব্দের অর্থ হয়—'দাম্পত্যসম্বন্ধে পুরুষ-বিশেষের সহিত সম্বদ্ধ স্ত্রী-বিশেষ'। পত্নীশব্দের অর্থ স্ত্রীজাতি নহে, সেই হেতু উক্ত বাক্যটি স্ত্রী-জাতির বেদাধ্যয়ন-অধিকারের নিবর্তক, ইহা অঙ্গীকার করা যায় না। আর এখানে লক্ষণা-বৃত্তিবলে 'পত্নী'শব্দের অর্থরূপে স্ত্রীজাতিকে গ্রহণ করিবার প্রতি কোন প্রকার অনুপপত্তিও (লক্ষণাবীজও) পরিদৃষ্ট হইতেছে না।

শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের যে প্রকরণে উক্ত বাক্যটি পঠিত হইয়াছে, তাহাতে সোমযজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির জন্য কতকগুলি ব্যবহার বিহিত হইয়াছে, যথা: 'অস্য নাম ন গৃহ্লাতি' (ঐ ৭।২)—ইহার নাম কেহ গ্রহণ করিবেন না; 'সঃ অন্যস্য নাম ন গৃহ্লাতি' (ঐ ৭.৩)—তিনি অপরের নাম গ্রহণ করিবেন না; 'যঃ সত্যং বদতি সঃ দীক্ষিতঃ' (ঐ) —যিনি সত্য কথা বলেন, তিনি দীক্ষিত (দীক্ষিত ব্যক্তি সত্য কথা বলিবেন); 'দীক্ষিতঃ অগ্নিহোত্রং ন জুহোতি' (ঐ), 'দীক্ষিতস্য অশনং নাশ্নন্তি' (ঐ)—দীক্ষিতের অন্ন কেহ ভক্ষণ করিবে না, ইত্যাদি। এইরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে—যাহা মনুষ্যের পক্ষে নিত্যপ্রাপ্ত, অথবা কোন ব্যক্তি যাহা করিয়াই থাকেন বা প্রায়ই করেন, এই প্রকার কোন কোন বিষয়ই এখানে দীক্ষিত

ব্যক্তির পক্ষে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। 'অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না'—ইহা একটি সর্ববাদিসম্মত যুক্তি, কারণ যাহার ধনই নাই এমন ব্যক্তি ধন দান করিবে না, কেহ তাহাকে এরূপে নিষেধ করে না—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কোন ব্যক্তি প্রায়ই যদি কিছু করে, বা তাহা অনুষ্ঠান করিবার সামর্থ্য তাহার থাকে, তবে তাহাকেই সেই কার্য হইতে নিবৃত্ত করা হয়।

প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ 'মনুষ্য মিথ্যা কথা প্রায়ই বলিয়া থাকে', 'অগ্নিহোত্র গৃহস্থের নিত্য-প্রাপ্ত', 'নাম ধরিয়াই পরস্পর পরস্পরকে প্রায় আবাহন করে', ইত্যাদি এই প্রকারে যে বিষয়-গুলি মনুষ্যের পক্ষে নিত্যপ্রাপ্ত, অথবা যাহা সে প্রায়ই অনুষ্ঠান করে, উক্ত শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণবাক্যে এতাদৃশ কতকগুলি বিষয়ই দীক্ষিত ব্যক্তির প্রতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত বাক্যগুলি সহ একত্রই 'ন বেদে পত্নীং বাচয়তি' এই বাক্যটি পঠিত হইয়াছে। তাহাতে 'অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না'—এই ন্যায়বলে ইহাই নির্ণীত হয় যে, ধার্মিক পতি যে পত্নীর সহিত বেদ বিষয়ে আলোচনা করেন, বা তাঁহাকে যে বেদ পড়ান, দীক্ষাকালে তাহাই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এখন দেখুন, পত্নীর যদি বেদাধ্যয়নে অধি-কারই না থাকিত, তাহা হইলে স্বধর্মনিষ্ঠ পতি, যিনি সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তিনি কোন সময়েই পত্নীর সহিত বেদালোচনা করিতেন না বা তাঁহাকে বেদও পড়াইতেন না। আর শ্রুতিরও দীক্ষাকালে তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিবার কোন আবশ্যকতা থাকিত না। অতএব 'অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না', এই ন্যায়পুষ্ট 'ন বেদে পত্নীং বাচয়তি' এই শ্রৌতনিষেধ-লিঙ্গবলে (নিষেধাত্মক উক্ত শ্রুতিবাক্যের সামর্থ্যবলে) স্ত্রী-জাতির বেদাধ্যয়নে অধিকারই সিদ্ধ হইয়া পড়ি-তেছে। অথবা 'অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ' না হওয়ায় 'ন বেদে পত্নীং বাচয়তি' এই শ্রুতিবচনটি অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে স্ত্রী-জাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হইয়া পড়ে।

নৃসিংহতাপনীবাক্যও মাতৃজাতির বেদে অধিকারের নিবর্তক নহে

'সাবিত্রীং প্রণবং স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তি'—এই নৃসিংহপূর্বতাপনীবাক্য হইতেও মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার নিবারিত হয় না, কারণ উক্ত উপনিষদের ৪।২ কণ্ডিকা ও তাহার ভাষ্য আলোচনা করিলে প্রতিভাত হয় যে—উক্ত শ্রুতিবাক্যটিতে বিশেষদেবতা-সম্বন্ধী একপ্রকার গায়ত্রী মন্ত্র এবং প্রণবসংযুক্ত 'মহালক্ষ্মী যজু-র্গায়ত্রী' নামক মন্ত্র স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। রাজসূয়যজ্ঞে অধিকার না থাকায় ব্রাহ্মণজাতির বেদে অনধিকার কল্পনার ন্যায়—কোন মন্ত্রবিশেষে অনধিকারবশতঃ মাতৃজাতির বেদে অনধিকার উক্ত বচনবলে কল্পনা করা হাস্যাস্পদ কল্পনামাত্র। 'ন স্ত্রীশূদ্রৌ বেদমধীয়া-তাম্' এবং 'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাম্' ইত্যাদি বচন-দ্বয়ের ব্যবস্থা পরে প্রদর্শন করিতেছি।

'স্ত্রীজাতি নরকের দ্বার' এই আচার্যবাক্যের তাৎপর্য

কেহ কেহ যে আচার্যপাদ শঙ্করের 'দ্বারং কিমেকং নরকস্য? নারী'—এই বাক্যাবলম্বনে মাতৃজাতির বেদে অধিকারহীনতা ও আচার্য-পাদের মাতৃজাতিদ্বেষিত্ব প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করেন; সসম্মানে বলিব—ইহা তাঁহাদের দুঃসাহসমাত্র। তাঁহাদের এই সাহস সর্বথা উপেক্ষণীয় হইলেও আধুনিক শিক্ষিত সমাজে, বিশেষতঃ শিক্ষিতা মাতৃমণ্ডলীর মধ্যে আচার্য-পাদের এই উক্তিটি অবলম্বনে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহা নিরাকৃত হওয়া উচিত।

আচ্ছা, উক্ত মতাবলম্বিগণকে জিজ্ঞাসা করি: 'স্ত্রীজাতি নরকের দ্বার'—ইহাই আচার্য বলিয়াছেন;

কাহার পক্ষে নরকের দ্বার, তাহা কি বলিয়াছেন?' আধুনিকগণকে আরও জিজ্ঞাসা করিতেছি: 'বল, স্ত্রীজাতি কাহার নরকের দ্বার? তাহার নিজের?—একথা বলিতে পার না; কারণ নিজের অনিষ্ট কেহ নিজে করে না। আর স্ত্রীজাতি যদি নিজের নরকের দ্বার নিজেই হয়, তবে আচার্যের তাহা মুমুক্ষু শিষ্যকে বলিবার আবশ্যকতা কি? অনপেক্ষিত বিষয় অজিজ্ঞাসুকে বলা তো উন্মাদের লক্ষণ। আচার্য শঙ্কর উন্মাদ ছিলেন না নিশ্চয়ই। আচ্ছা, স্ত্রীজাতি কি অপরের নরকের দ্বার?—তাহাও বলিতে পার না; কারণ যে মাতৃজাতি আমাদিগের শরীর নির্মাণ ও তাহা পালন করিয়া আমাদিগের চতুর্বর্গলাভের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা আবার আমাদের নরকের দ্বার হইবেন কি প্রকারে? তাহা স্বীকার করিলে মাতৃজাতি আজ পর্যন্ত যত সন্তান প্রসব করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নরকে গিয়াছেন এবং আমাদেরও যাইতে হইবে; রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ প্রভৃতিও বাদ যাইবেন না, ইহাই অঙ্গীকার করিতে হয়। ইহা হাস্যাস্পদ ও উপেক্ষণীয় কল্পনা। সুতরাং আচার্যবাণীর মর্মজ্ঞানহীন তুমি বলিতে পারিলে না—নারী কাহার নরকের দ্বার?

আবার দেখ, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'মায়া না মেয়ে, ত্রিভুবন দিলে খেয়ে'। বলতো, সন্ন্যাসী শঙ্কর না-হয় নারীজাতির উপর দ্বেষবশতঃ উক্ত প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু মাতৃমূর্তির পূজক মাতৃগতপ্রাণ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ এ কি বলিলেন! স্ত্রীজাতি তো উক্ত প্রকারে নিজদিগকেও খান না, আমাদিগকেও না। সুতরাং এই বাক্যসকলের তাৎপর্য কি? আচার্য শঙ্কর নিজের বাক্যের তাৎপর্য নিজেই বলিয়াছেন। তোমরা চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিয়াছ, কিছুই দেখিবে না। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, মুমুক্ষু শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কোঽস্তি ঘোরঃ নরকঃ?'—ঘোর নরক কি? আচার্য উত্তর দিতেছেন, 'স্বদেহঃ'—নিজের শরীরই ঘোর নরক। আচ্ছা, 'দ্বারং কিমেকং নরকস্য?' —সেই নরকের একমাত্র দ্বার কি? আচার্য বলিলেন, 'নারী'। নারীই সেই দেহরূপ নরকপ্রাপ্তির, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পতিত হইবার একমাত্র দ্বার। আচার্য এখানে কি বলিলেন? দেখ, স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, 'কামিনীতে করে স্ত্রী-বুদ্ধি যে জন, হয় না তাহার বন্ধন-মোচন' (সন্ন্যাসীর গীতি)। এতদ্দ্বারা তিনি কি বলিলেন? ভোগ্যাবুদ্ধিতে রমণীতে যে আসক্তি, তাহাই বন্ধনের কারণ। বন্ধন কি? পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণ করিয়া জন্মমৃত্যু ভোগ করা। এই শরীর কি? আচার্য শঙ্কর বলিলেন, 'নরক'। সুতরাং শরীরপ্রাপ্তিরূপ যে নরক, তাহার দ্বার কি? রমণীতে ভোগ্যাবুদ্ধিতে আসক্তি। ইহাই পুনঃ পুনঃ শরীরধারণরূপ নরকের কারণ। শ্রীরামকৃষ্ণের 'ত্রিভুবন দিলে খেয়ে' এই বাক্যের অর্থও এই প্রকারই বুঝিতে হইবে, যথা—নারীতে ভোগ্যাবুদ্ধিই মোক্ষমার্গ অবরুদ্ধ করিতেছে। স্বামীজী তো শ্রীশ্রীঠাকুরেরই ব্যাখ্যা। অতএব দেখা যাইতেছে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভঙ্গীতে হইলেও পূজ্যপাদ লোকগুরুগণ একই কথা বলিয়াছেন, 'সব শিয়ালের এক রা'। মাতৃভক্ত আচার্য শঙ্করের উপর যে নারীদ্বেষিত্বের আক্ষেপ, তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। আচার্য শঙ্করের এই বাক্যকে অবলম্বন করতঃ যাঁহারা মাতৃজাতিকে বেদে অনধিকারী প্রমাণ করিতে প্রয়াস করেন, তাঁহাদিগকে আমরা অজ্ঞ বলিয়াই মনে করিতেছি। এই বিষয়ে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার-প্রতিপাদক শ্রুতি স্মৃতি ও যুক্তিপ্রদর্শন

কিন্তু মাত্র পরপক্ষ কর্তৃক প্রদর্শিত প্রমাণসকলের নিরাকরণ করিলেই নিঃসন্দিগ্ধভাবে স্বপক্ষ সিদ্ধ হয় না। সেই হেতু মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকারের সমর্থক কি কি প্রমাণ আছে, এক্ষণে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব। উপনয়ন-সংস্কারে যাঁহাদের অধিকার আছে, বেদাঙ্গবিহিত ক্রম ও স্বরাদিসহ বৈধ বেদাধ্যয়নে তাঁহারাই অধিকারী, ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার-বোধক সাক্ষাৎ কোন শ্রুতিবাক্য আমরা পাইতেছি না। সম্ভবতঃ তাদৃশ কোন বাক্য শ্রুতিতে নাই, কারণ তাহার কোন আবশ্যকতাও নাই। কেন নাই? বলিতেছি। শাস্ত্রে অবিশেষভাবে সকলের জন্যই শ্রেয়স্কর পদার্থ বিহিত হয় এবং অশ্রেয়স্কর বিষয় নিষিদ্ধ হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। যদি তাহাতে কাহারও পক্ষে কোন বিশেষ বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে শাস্ত্রে তাহা বিশেষ বাক্যে পঠিত হয়। যেমন অর্থিত্ব ও সামর্থ্যরূপ অধিকারীর গুণযুক্ত হওয়ায় উপনয়ন-সংস্কারে শূদ্রেরও অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পড়িলে 'বসন্তে ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত, গ্রীষ্মে রাজন্যম্, শরদি বৈশ্যম্' (তৈঃ ব্রাঃ ১।১।২।৬) ইত্যাদি বাক্যবলে উপনয়ন-সংস্কার বর্ণত্রয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, শূদ্রজাতি নিরাকৃত হইয়া পড়ে। অর্থিত্বাদিপ্রযুক্ত রাজসূয়-যজ্ঞ সকলের জন্য প্রাপ্ত হইয়া পড়িলে 'রাজা রাজসূয়েন যজেত' (আপস্তম্ব শ্রৌঃ ১৮.৮।১।৪) ইত্যাদি বাক্যবলে তাহা ক্ষত্রিয় জাতিতে সঙ্কুচিত হয়, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য নিরাকৃত হইয়া পড়ে। ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কার-পক্ষে এতাদৃশ কোন বিশেষ নাই। সেই হেতু বর্ণত্রয়ের জন্য উপনয়ন-সংস্কার যে সাধারণ বচনসকলের বলে সিদ্ধ হয়, সেই সাধারণ বচনসকলের বলেই তত্তৎ বর্ণান্তর্গত স্ত্রীজাতিরও উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার সিদ্ধ হইয়া পড়ে।[১] সূত্রকার কাত্যায়নও বলিয়াছেন, 'স্ত্রী চাবিশেষাৎ' (১।১।৭ স্ত্রীজাতিও অধিকারী, কারণ (তাঁহাদের পক্ষে) কোন বিশেষ নাই।

যদি বলা হয়, 'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত', 'তম্ অধ্যাপয়ীত' ইত্যাদি বাক্যে 'তম্' পদটি পুংলিঙ্গ 'তদ্' শব্দের রূপ। তাহা হইতে পুরুষেরই বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হয়[২], স্ত্রীজাতির নহে। সেই হেতু এই প্রবল শ্রুতিবাক্য-বলে 'স্ত্রী চাবিশেষাৎ' (কাঃ শ্রৌঃ ১।১।৭) এই পৌরুষেয় ব্যবস্থা বাধিত হইয়া পড়ে। ফলে তাহার বলে মাতৃজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার স্থাপিত হইতে পারে না। তদুত্তরে বলা যায়, 'তম্ অধ্যাপয়ীত', ইহার অর্থ—'পুরুষকে বেদ অধ্যাপন করিবে' ইহাই উক্ত বেদবাক্যের সাক্ষাৎ অর্থ। 'স্ত্রীজাতিকে বেদ অধ্যাপন করিবে না'—ইহা তো উক্ত বেদবাক্যটির অর্থতঃ লব্ধ অর্থ; সাক্ষাৎ অর্থ নহে। একই বাক্যের উভয় প্রকার সাক্ষাৎ অর্থ অঙ্গীকার করিলে বাক্যভেদে দোষ হইয়া পড়িবে।[৩] আর এই যে বেদবাক্যের

১ শাস্ত্রদীপিকা-কারের মত আলোচনাকালে ইহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব।

২ 'তম্ অধ্যাপয়ীত' এইস্থলে পুংলিঙ্গ তদ্‌শব্দ প্রযুক্ত হইলেও পুংলিঙ্গ বিবক্ষিত কি না—এই বিষয়ে ভট্টদীপিকা-কার ও শাস্ত্রদীপিকা-কারের মতভেদ আছে। ভট্টদীপিকা-কার বলেন—পুংলিঙ্গ বিবক্ষিত, সুতরাং পুরুষেরই অধিকার সিদ্ধ হয়, স্ত্রীজাতির নহে। শাস্ত্রদীপিকা-কার তাহা অঙ্গীকার করেন নাই। ইহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

৩ একই বেদবাক্যের নানাপ্রকার অর্থ স্বীকার করাকে বলে 'বাক্যভেদ'। পৌরুষেয় বাক্যে ইঙ্গিতাদির দ্বারাও অর্থ প্রকাশিত হয় বলিয়া একই বাক্যের নানা অর্থ দোষাবহ নহে। অপৌরুষেয় বেদে ইঙ্গিতাদির কোন সম্ভাবনা না থাকায় একই বাক্যের নানা অর্থ অঙ্গীকৃত হয় না। কারণ তাহা হইলে কোনটি বেদের যথার্থ অর্থ, তাহা নির্ণীত হইবে না, ফলে বেদই ব্যর্থ হইয়া পড়িবেন। এইহেতু বেদার্থনিরূপণে বাক্যভেদ একটি গুরুতর দোষ, ইহা উভয়মীমাংসাশাস্ত্রসম্মত।

অর্থতঃলব্ধ অর্থ, ইহা পৌরুষেয় অর্থ, কারণ বেদ-বাক্যের অর্থ বিচার করিয়া এই প্রকার প্রাসঙ্গিক অর্থ পুরুষই কল্পনা করে। এই পৌরুষেয় অর্থ এবং মহর্ষি কাত্যায়ন কর্তৃক কথিত উক্ত পৌরুষেয় ব্যবস্থা, উভয়ই সমবল হইয়া পড়ে বলিয়া কেহ কাহাকেও বাধিত করিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে যাহার সমর্থনে অন্য প্রমাণ থাকিবে, তাহাই অপরকে বাধিত করিবে। ইহা পরে আলোচিত হইবে।

প্রসঙ্গতঃ এইস্থলে পুনরায় আশঙ্কা হয়—ইহাই যদি পরিস্থিতি হয়, অর্থাৎ বেদবাক্যের সাক্ষাৎ অর্থরূপে সমর্পিত না হইলে, তাহা যদি কোন কিছুর ব্যবস্থাপক, অথবা নিবর্তক না হয়, তাহা হইলে পূর্বোদ্ধৃত 'বসন্তে ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত' ইত্যাদি উপনয়নবোধক বাক্যের অর্থতঃ লব্ধ—সুতরাং পৌরুষেয় অর্থবলে শূদ্র-জাতিকে উপনয়ন-সংস্কার, তথা বৈধ বেদাধ্যয়ন হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে কেন? শূদ্রজাতির উপনয়ন-সংস্কারের ও বেদাধ্যয়নের নিষেধপর সাক্ষাৎ কোন শ্রুতি-বাক্য তো নাই। তদুত্তরে বলা যায়—'বেদসন্ন্যাসতঃ শূদ্রঃ' (বাসিষ্ঠ সং ১০) —বেদত্যাগ করিলে [ব্রাহ্মণাদি জাতিরই] শূদ্রত্ব-প্রাপ্তি হয়। সুতরাং যে স্বেচ্ছায় বেদত্যাগ করিয়াছে, বেদাধ্যয়নের পক্ষে আবশ্যক উপনয়ন-সংস্কারে তাহার অধিকার শ্রুতি কি প্রকারে ব্যবস্থা করিবেন? আর যে ব্যক্তি বেদই ত্যাগ করিয়াছে, পিষ্টপেষণের ন্যায় বেদাধ্যয়নে তাহাকে নিষেধ করিবারই অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতির আবশ্যকতা কি? উপরন্তু শূদ্রের উপনয়ন-নিরাকরণপর 'শূদ্রঃ...একজাতিঃ' (মনু সং ১০। ১২৬), 'ন চ সংস্কারম্ অর্হতি' (ঐ ১০।৪) বহু স্মৃতিবচন আছে। উক্ত বাসিষ্ঠ বচন, এই সকল মনুবচন এবং 'বসন্তে ব্রাহ্মণম্' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থতঃ লব্ধ অর্থ, এই সকল মিলিত হইয়া শূদ্রের উপনয়ন সংস্কারের অধিকারকে নিরাকরণ করে। পক্ষান্তরে মাতৃজাতির উপনয়ন-সংস্কারের সমর্থক বহু স্মৃতি এবং শ্রৌত লিঙ্গপ্রমাণ আছে, তাহা আমরা পরে প্রদর্শন করিতেছি। সেই সকল প্রমাণপুষ্ট উক্ত 'স্ত্রী চাবিশেষাৎ' এই কাত্যায়নোক্ত পৌরুষেয় ব্যবস্থা 'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, তম্ অধ্যাপয়ীত' এই বেদবাক্য হইতে লব্ধ উক্ত পৌরুষেয় অর্থ হইতে বলবান্ হইয়া পড়িতেছে। ফলে তাহার বলে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার অবশ্যই সিদ্ধ হয়; এবং উপনয়নের উদ্দেশ্য বেদাধ্যয়ন।

(ক্রমশঃ)

আবির্ভাব

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

আনন্দের দীপ্ত ছটা বিকিরিয়া নিঃসীম আকাশে,
আসিয়াছ বিশ্বমাতা এ বিশ্বের সন্তানেরে স্মরি'!
তোমার বক্ষের স্নেহ দিকে দিকে মধুর আশ্বাসে,
মন্দাকিনী-ধারা সম ধরণীতে পড়িতেছে ঝরি'!

সন্তান-বৎসলা তুমি, দূরে কভু পার না রহিতে,
তাই ছুটে আসিয়াছ, জুড়াইছ মরু-তপ্ত প্রাণ !
করুণার মধু-স্পর্শ অজানিতে প্রাণে জাগাইতে,
আবেগে আকুলা হ'য়ে আপনারে করিয়াছ দান !

সংসারের কীর্ণতায় ভুলে থাকি তোমার মহিমা,
তবু নাই অভিমান, তবু নাই কিছু তব রোষ ;
ল'য়ে থাকি পঙ্ক-গ্লানি—বক্ষভরা কলুষ-কালিমা,
তবু ক্ষমা করিয়াছ, ভুলিয়াছ সন্তানের দোষ !

তোমার সমান কেহ নাহি মাগো, বিপুল ভুবনে,
তাই তব এত স্নেহ, তাই এত প্রাণের প্রেরণা !
প্রাণের সম্পদ তাই বিলাইতে চাহ জনে জনে,
তোমার বিপুল বক্ষে তাই এত জাগে উন্মাদনা !

তোমারে ভুলি মা মোরা, আমাদের তুমি নাহি ভোল',
বিশ্বময় রূপ ধ'রি আসো তুমি মোদের নিকটে !
আসো তুমি কত কাছে—করুণার দ্বার তব খোল',
জাগো তুমি অনিবার সুখে দুঃখে সম্পদে সংকটে !

মা তুমি, সন্তান মোরা—আসিয়াছ দানিতে আশ্রয়,
আসিয়াছ সুধা-সিন্ধু—সুধা-স্বাদ মোরা যাতে পাই !
দাঁড়ায়েছ পুরোভাগে করে ধরি বর ও অভয়,
চরণ বাড়ায়ে দে'ছ সকলেরে দিতে শান্তি-ঠাঁই !

জাগিয়াছ বিশ্বমাতা, আসিয়াছ মহাবিশ্ব জুড়ি',
আপনারে প্রকাশিছ স্থলে জলে নিঃসীম গগনে !
ডুবাইছ স্নেহ-রসে পাছে মোরা দুঃখানলে পুড়ি',
হইয়াছ অধিষ্ঠিতা সন্তানের জীবনে জীবনে !

প্রভাত যেমন হয়, কেটে যায় রাত্রির তিমির,
তেমনি সহজ হ'য়ে আসিয়াছ তুমি মা অধরা !
আসিয়াছ জগন্ময়ি, টুটি' সর্ব বাধার প্রাচীর,
নন্দনের রম্য দৃশ্যে ধন্যা তাই মৃত্তিকার ধরা !

কৃপার পথ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমার কৃপা, তোমার দয়া—
দয়াল, যে পথ দিয়ে আসে।
সেই পথই যে সরল সহজ
ঘুরি তাহার আশে পাশে।
মধুর তোমার বাঁশীর স্বরে
শুনি সকল বেদন হরে,
সুদূরকে হায় করতে নিকট—
সেই পথই তো ভালবাসে।

সাধন ভজন তপস্যাতে—
তোমার কাছে কঠিন যাওয়া,
তাহার চেয়ে ডাকাই ভাল,
তোমার তরে এ পথ চাওয়া।
সকল শক্তি যায় যে ক্ষয়ে,
কেউ ডাকে না, যায় না লয়ে,
কঠিন বড় জটিল বড়
জপ করিয়া তোমায় পাওয়া।

বলে, ও-সব দুর্গম পথ
হেঁটে খেটে দিবস গোঙা।
সারা পথই কৃচ্ছ্র সাধন
উপবাস আর হোমের ধোঁয়া
দুর্বলের পথ নয় ও মোটে
পদে পদে পাথর ফোটে,
ক্লান্ত কাতর দেহ ও মন—
পরশ-পাথর দেয় না ছোঁয়া।

পথ চিনি না, পথ জানি না—
বাজে না তো কই বাঁশরী?
অন্ধ বিল্বমঙ্গলের পথ—
হাত ধর, হাত ধর হরি!
এ পথে ভার আর কে লবে,
ডাকি তাই সর্ব-সম্ভবে,
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হে—
অধমে লও আপন করি।

নব-উদ্বোধন

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সে বিশ্বাস কোথা গেল—শ্রেয় লাগি আত্মনিবেদন,
সে আশ্বাস কর্মযাগে ইষ্টনাম স্মরিয়া অন্তরে—
ক্ষণিক সুখের মোহ সবলে করিয়া বিসর্জন
আপনারে দেওয়া বলি সকলের কল্যাণের তরে।
কোথা গেল ব্রহ্মনিষ্ঠ স্থিতপ্রজ্ঞ সেই বীরগণ—
আশা ও ভরসা সব সমর্পিয়া যাহাদের 'পরে
দুর্গম জটিল পথ পার হব মোরা সাধারণ
যাদেরে চিনিয়া মোরা চিনে নেব পরম ঈশ্বরে।

স্বার্থের নিবিড় মেঘ অন্তরাল করেছে আকাশ,
তাই এত আত্মঘাত, পরস্পর তাই এ কলহ—
যাদের আদর্শে মোরা ভুলে যাব আত্ম-অবিশ্বাস,
কোথা তারা? চারিদিকে ঘনাইছে তম ভয়াবহ।
অভী-মন্ত্র দিয়ে যারা ভয়ার্তের ঘুচাইবে ত্রাস,
তাদের অভাব আজ বঙ্গদেশে হয়েছে অসহ।

* * *

কোথা নব ভারতের পথিকৃৎ শ্রীরামমোহন,
বেদান্তের মহাবাণী কে শোনাবে মায়ের ভাষায়,
পঞ্চোপনিষৎ-স্রুত ক্ষীরধারা করিয়া দোহন
ভারতে প্রতিষ্ঠা পুনঃ কেবা দিবে ব্রহ্মমহিমায়!

কোথায় ঈশ্বরচন্দ্র নিবারিতে নারীর পীড়ন,
কে সরাবে আবর্জনা অভিনব বিজ্ঞান-শিক্ষায়—
বামনের দেশে আজ কোথা পাব শালপ্রাংশু মন,
নির্ভয় করিবে সবে কাঁধে নিয়ে সকলের দায়।

কোথা প্রভু, রামকৃষ্ণ, বিদ্বানের সন্দেহ, সংশয়,
কুতর্কের বাক্যজাল কে ছেদিবে সরল বিশ্বাসে?
কে শিখাবে সেই ধর্ম, ঘোচে যাতে সর্বদ্বিধাভয়—
শুধু আত্মসমর্পণে পৌঁছে ভক্ত দেবতাসকাশে!
প্রচণ্ড জ্ঞানের বহ্নি হয় যবে চিত্তে জ্বালাময়
নিভে যাবে সব জ্বালা, কে শিখাবে, ভাল যদি বাসে॥

* * *

কোথায় বঙ্কিমচন্দ্র, মাতৃমন্ত্র কে গাহিবে আজ,
মৃন্ময়ে চিন্ময়-জ্ঞানে বন্দিবে কে দেশ-জননীরে—
শিখাবে সন্তান-ধর্ম পতিতের ঘুচাইতে লাজ,
'বন্দে মাতরং'-ডাকে মজ্জমানে ভিড়াইবে তীরে!

কোথায় শ্রীঅরবিন্দ দিব্যজীবনের অধিরাজ,
কার যোগ-তপস্যায় মর্ত্যভূমি স্বর্গ হবে ধীরে—
ক্রমশঃ দেবতা হ'য়ে উঠিবে এ মানব-সমাজ
কে বলিবে—দিব্য দীপ্তি শোভা পাবে মানুষের শিরে!

কোথায় বিবেকানন্দ, দিগ্বিজয়ী সে মহাসন্ন্যাসী,
'ওঠ, জাগ' যে বলিবে, 'প্রেয় ছেড়ে শ্রেয় কর সার'।
জীমূতনির্ঘোষে কার যুগান্তের জড়তা বিনাশি'
বহু রূপে জীব রূপে এক ব্রহ্মে চিনিয়া আবার
সেবাধর্মে দিব প্রাণ পতিত-অন্ত্যজে ভালবাসি;
পুনঃ নব-উদ্বোধনে ধন্য হবে এ বঙ্গ-সংসার॥

ভিড়িল কি ?

'বনফুল'

আকাশের অন্তহীন নীল পারাবারে
দেখিয়াছি দূর হ'তে আসিছে তরণী,
অন্ধকারে নিস্তব্ধ
শুনেছি দাঁড়ের শব্দ
উষায় দেখেছি তারে অরুণ-বরণী!

আধো-আলো-আঁধারিতে
সাগ্রহে উৎসুক চিতে
সন্ধ্যার আকাশে
দেখেছি নয়ন ভরি'
সে অপূর্ব আশা-তরী
সোনার সাগরে যেন ভাসে।

গভীর নিশীথকালে
লাগায়ে জ্যোৎস্নার পালে
দক্ষিণা পবন
সে তরণী ভেসে ভেসে
এসেছে মানস দেশে
পুলকিয়া সর্ব দেহমন।

ভেবেছি উন্মুখচিতে
এল কি আশ্বাস দিতে
সিদ্ধিদাতা প্রসন্ন গম্ভীর?
শক্ররে করিয়া জয়
আনিল কি বরাভয়
কার্ত্তিকেয় বীর?

আনন্দে আশায় মগ্ন
দেখেছি যাহার স্বপ্ন
আকাশ-বিরাটে,
সে স্বপ্ন-তরণীখানি
লয়ে শক্তি, লক্ষ্মী, বাণী
ভিড়িল কি আমাদেরই ঘাটে?

'জ্যান্ত দুর্গা'

শ্রীমতী শোভা দুই

শ্রীভগবান যখন নররূপে অবতীর্ণ হন তখন শক্তিও প্রায়ই নারীবেশে তাঁহার সহগামিনী হন, শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকা, বুদ্ধদেবের সহিত যশোধরা, শ্রীচৈতন্যের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার আগমনই ইহার প্রমাণ। শক্তিরই লীলা। শক্তিকে বাদ দিলে অবতারের জীবন ও বাণী আমাদের নিকট অবোধ্য হইয়া পড়ে। অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তির ন্যায় অভিন্ন ঈশ্বর ও ঈশ্বর-শক্তির শরীর-গ্রহণ একই উদ্দেশ্যে, একই কালে, একই নিয়মে হইলেও উহার কার্য পুরুষ-দেহাবলম্বনে একপ্রকার এবং নারী-দেহাবলম্বনে অন্যপ্রকার হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী আশ্বাস দিয়াছেন ঃ

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।

তদা তদাঽবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।

—এইরূপে যখনই দানবগণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তখনই আমি আবির্ভূতা হইয়া শত্রু বিনাশ করিব। পুরাকালে অত্যাচারী দানবকুলের ধ্বংস-সাধন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু অসুরদিগের তাণ্ডবলীলা শুধু বহির্জগতে সীমাবদ্ধ নয়; অন্তর্জগতে অবিরাম কুবৃত্তি ও সুবৃত্তির যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহাও দেবাসুর-সংগ্রাম।

বর্তমান যুগে ভোগপরায়ণতা, অশ্রদ্ধা, জড়বাদপ্রিয়তা, পরধনলিপ্সা, প্রভৃতি আসুরিক প্রবৃত্তি বাড়িয়াই চলিয়াছে। যাহার ফলে ধর্মের গ্লানি, অধর্মের বৃদ্ধি, হিংসা, দ্বেষ, লোকক্ষয়কারী যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদিতে মানবকুল আতঙ্কিত, হত-চকিত, বিভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মের অধোগতি যেমন চরম হইয়াছে, শক্তির অবতরণও তেমনি এবার সর্বোত্তম হইয়াছে। এই সাক্ষাৎ শক্তির পূজার ভিতর দিয়াই নবীন সভ্যতার ভিত্তিপত্তন হইবে—শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাহাই দেখাইয়া গেলেন।

*　　*　　*

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সেই মহাশক্তির মানবী মূর্তি; মা আনন্দময়ী, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'জ্যান্ত দুর্গা'।

শ্রীশ্রীমা সংসারলীলায় দুহিতা, ভগিনী, বধূ, গৃহিণী, মাতা রূপে আদর্শের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহ্যশক্তি, ধৈর্য, ক্ষমা এবং করুণার অন্ত ছিল না।

শ্রীশ্রীমায়ের সাংসারিক জীবন ছিল অবিশ্রান্ত কর্মপ্রবাহে গতিময়। তাঁহার লৌকিক সংসার ছিল না, কিন্তু জগৎ তাঁহার আপনার—অতএব সকলকে লইয়াই তাঁহার সংসার।

ভাই-ভাজের সংসারে ঝগড়া-ঝাঁটির অন্ত ছিল না, পাগলী ভাজ—যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিত। শ্রীশ্রীমায়ের অর্থ সাহায্যেই সংসার চলিত, অথচ তাঁহাকেই সকলে কথা শুনাইত; আর রাধুর জ্বালার তো অন্ত ছিল না। সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণা শ্রীশ্রীমা নীরবে সহ্য করিয়া গিয়াছেন।

কেবলমাত্র একদিন জয়রামবাটীতে উত্ত্যক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'দ্যাখ্, তোরা আমাকে বেশী জ্বালাতন করিসনি, এর ভেতর যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন তো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—কারও সাধ্য নেই যে তোদের রক্ষা করে।'

আর একবার কোয়ালপাড়ায় রাধুর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'দেখ, এ শরীর (নিজের শরীর দেখাইয়া) দেব-

শরীর জেনো, এতে আর কত অত্যাচার সহ্য হবে? মানুষ কি এত সহ্য করতে পারে?... দেখ, আমি থাকতে এরা কেউ আমাকে জানতে পারবে না, পরে বুঝবে সব।'

দেবী হইয়া মানবীরূপে অবতীর্ণা শ্রীশ্রীমাকে সাধারণ লোকে কি করিয়া বুঝিবে, যদি তিনি স্বয়ং না বুঝাইয়া দেন? ভগবতী এসেছেন নর-লোকে মানুষকে প্রেম-ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি অল্প, এই জন্যই তাঁহার পূর্ণ ভগবৎ-সত্তা আবৃত রাখিতে হয় তাহাদেরই কল্যাণে। সৌভাগ্যবান্ দু-চার জনের নিকটেই তিনি ধরা দেন।

শুধু কি সংসার? ভক্তের উৎপাতও তিনি বহু সহ্য করিয়াছেন। দূর দেশ হইতে আগত কোন ভক্ত আসিয়াই আবদার ধরিলেন, ধূলাপায়ে মায়ের পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিবেন না। অতএব সকল কর্ম ফেলিয়া মাকে পিঁড়ির উপর দাঁড়াইতে হইল। ভক্তটি ভক্তি-অর্ঘ্য অর্পণ করিলেন। তাহার পর মা ছুটিলেন তাঁহারই আহারের ব্যবস্থা করিতে।

একজন আবদার ধরিলেন, মায়ের প্রসাদ তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে হইবে। মা খাওয়াইয়া দিলেন, আবদার রক্ষা হইল।

আর এক ভক্ত মাকে ধরিলেন, মৃত্যুসময়ে তিনি যেন নিজে আসেন। ভক্তের পীড়াপীড়িতে মা সম্মত হইলেন।

এক ভক্ত প্রণামের সময় মায়ের পায়ের আঙুলে জোরে মাথা ঠুকিয়া দিলেন, উদ্দেশ্য মা যেন তাঁহাকে মনে রাখেন। সদানন্দময়ী মা পর-বর্তীকালে এই কথা লইয়া পরিহাস করিতেন।

উদ্বোধনে একবার এক ভক্ত লজ্জাপটাবৃতা মাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিতেছে, স্তব-স্তুতি করিতেছে, এদিকে মা গরমে ঘামিয়া গিয়াছেন। গোলাপ-মা আসিয়া ভক্তটিকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'এ কি মাটির না পাথরের ঠাকুর পেয়েছ?'

নানা রকম ভক্তের নানা প্রকার অত্যাচার! একটি ভক্ত মায়ের অন্নপ্রসাদ শুকাইতে দিয়া বাহিরের ঘরে ঘুমাইয়া পড়িলেন, আর মা বিশ্রাম না করিয়া দ্বিপ্রহরে বসিয়া বসিয়া কাক তাড়াই-লেন। বেলা তিনটার পর ভক্তটির ঘুম ভাঙিল। তিনি আসিয়া দেখেন, মা সেই ভাবে বসিয়া আছেন। ইহাতে মায়ের কোন অসন্তোষ নেই। ভক্তটি আসিতে বলিলেন, 'বাবা, তোমার ঐটি নিয়ে বসে আছি।'

করুণাময়ী মা করুণায় বিগলিতা। পাপী, তাপী, ব্যাধিগ্রস্ত—যে কেহ তাঁহার সামনে আসিয়াছে, নির্বিবাদে, নির্বিচারে সকলকে তাঁহার পদে স্থান দিয়াছেন, অসুস্থ শরীরেও তিনি কাহা-কেও কৃপা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। ইতরপ্রাণী, পশু-পক্ষীও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত নয়; কাহারও কষ্ট তিনি দেখিতে পারিতেন না। উচ্চ নীচ তাঁহার নিকট ভেদ ছিল না। সন্তানের মঙ্গলের জন্য অসুস্থ শরীরেও অধিকাংশ সময় জপ করিতেন। সেবক অনুযোগ করিলে বলিতেন, 'কি ক'রব বাবা, ওদের জন্যে না ক'রে থাকতে পারি না। আমারই সন্তান—কে কোথায় আছে, কিছু হয়তো করতে পারছে না, আমাকেই তো দেখতে হবে।'

এই সব লক্ষ্য করিয়া স্বামী প্রেমানন্দ (বাবু-রাম মহারাজ) বলিয়াছিলেন, 'তোমরা দেখেই তো এলে, রাজরাজেশ্বরী মা কেমন সাধ ক'রে কাঙালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, ভক্তদের এঁটো পরিষ্কার করছেন। তিনি অত কষ্ট করছেন গৃহীদের গার্হস্থ্যধর্ম শেখাবার জন্য। কি অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা, আর সম্পূর্ণ অভিমান-রাহিত্য।' এক পত্রেও তিনি লিখিয়াছিলেন: শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? ঐশ্বর্যের লেশ নেই।......

শুদ্ধচিত্ত আধার কোন কোন ভাগ্যবান্ শ্রীশ্রীমাকে জগদ্ধাত্রীরূপে, গৌরীরূপে, কালীরূপে দর্শন করিয়াছেন। কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত এক ভক্তকে মা তাহার ইষ্ট-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শুনাইতে বলিলেন। মায়ের আদেশ পালন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তাঁহাকে অশেষমহিমান্বিত শ্রীদুর্গারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

কলিকাতার পথে শ্রীশ্রীমা বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, এমন সময় এক পশ্চিমা কুলি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিল এবং বলিল : 'তু মেরী জানকী' —কতদিন ধরে তোমায় খুঁজছি, এতদিন কোথায় ছিলে ?

কখন কখন শ্রীশ্রীমায়ের মুখে স্বীয় ভগবৎ-স্বরূপ ব্যক্ত হইয়া পড়িত। একদিন এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান্ হন, আপনি তাহলে কে ?' মা বলিলেন, 'আমি আর কে, আমিও ভগবতী'। জগদম্বা আশ্রমে কেদার-দাদা একদিন মায়ের সঙ্গে কথা বলিতেছেন, অদূরে বটতলায় ঢাক পিটাইয়া ষষ্ঠীপূজা দিতে লোকজন আসিয়াছে, কথাবার্তার অসুবিধা হওয়ায় কেদার-দাদা, বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'আঃ থাম্ না রে বাপু'। অমনি মা বলিয়া উঠিলেন, 'ওকি কেদার, সবই যে আমি, তুমি বিরক্ত হচ্চ কেন ?'

একদিন মা পুরাতন বাড়ীর বারান্দা ঝাঁট দিতেছিলেন, এমন সময় এক ভিখারী হাঁকিল, 'মাগো, ভিক্ষা পাই গো'। ভিখারীর কণ্ঠ শুনিয়া মা আপন মনে 'আর পাচ্চি না, অনন্ত হাতে কাজ করেও শেষ করতে পাচ্চি না'— বলিয়াই থামিয়া গেলেন। অদূরে বসিয়া এক ভক্ত জলখাবার খাইতেছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'ঢ্যাখ তো, আমার দু হাত, আমার আবার অনন্ত হাত বলচি' ? হাসিতে হাসিতে মা আবার ঝাঁট দিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমা না আসিলে গিরিশবাবুর দুর্গাপূজা হইত না। বাবুরাম মহারাজের মাতা আঁটপুরে দুর্গাপূজা করিতেছেন শুনিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 'বাবুরাম-দার মায়ের কি বুদ্ধি! জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির প্রতিমাপূজা !'

'ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিঃ'

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

তুমি বৈষ্ণবী পালনী শক্তি
বিশ্বের বীজ পরমা মায়া ;
তুমিই তৃষ্ণা, তুমিই তৃপ্তি,
তুমিই রৌদ্র, তুমিই ছায়া !

তোমার খড়্গ শুভ হোক মাগো
অসুরদলনে ত্রিশূল হানো ;
হে বরদাত্রি হে মহারাত্রি
নিখিল বিশ্বে অভয় দানো।

ষষ্ঠীদেবী

অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার দে

বাংলার দেবদেবীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান সহজ নয়। শুধু বাংলার কেন জগতের সর্বত্রই দেবদেবীর রূপ ও কল্পনার পিছনে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে যুগ-যুগান্তের কত ধ্যান-ধারণা, কত বিশ্বাস; জড়িয়ে আছে কত বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাবধারার মিলন-সংঘাতের ইতিবৃত্ত।

ষষ্ঠীদেবী ষোড়শ-মাতৃকার অন্যতমা। শিশুদের প্রতিপালনই এই দেবীর কাজ। এঁরই প্রসাদে মর্ত্যবাসীদের পুত্রপৌত্রাদি লাভ হ'য়ে থাকে। ইনি কার্ত্তিকের ভার্যা এবং প্রকৃতির ষষ্ঠীকলা। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে ষষ্ঠীদেবীর পরিচয় সম্বন্ধে আছে :

প্রধানাংশস্বরূপা যা দেবসেনা চ নারদ।
মাতৃকাসু পূজ্যতমা সা ষষ্ঠী পরিকীর্তিতা॥
শিশূনাং প্রতিবিম্বেষু প্রতিপালনকারিণী।
তপস্বিনী বিষ্ণুভক্তা কার্ত্তিকেয়স্য কামিনী॥
ষষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেস্তেন ষষ্ঠী প্রকীর্তিতা।
পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রী চ ধাত্রী ত্রিজগতাং সতী॥

সূতিকাগারে শিশু জন্মাবার ষষ্ঠদিন রাত্রে ষষ্ঠীদেবীর পূজার বিধি আছে। একে সূতিকা ষষ্ঠী বা গ্রামাঞ্চলে 'ষেঠের বা ষেঠেরা পূজা' বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার একুশদিন বা একত্রিশ দিন পরে, আবার কোথাও বা মাসান্তে সূতিকাশৌচ অপনোদনের পর ষষ্ঠী-পূজা হ'য়ে থাকে। বিবিধ উপচার, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি সহ ষষ্ঠীদেবীর পূজাপদ্ধতি বিস্তৃতভাবে অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করবার অবকাশ নেই; কৃত্যতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব প্রভৃতিতে তা বিশদ লিপিবদ্ধ আছে। দেবীর পবিত্র রূপ সম্বন্ধে ধ্যানমন্ত্রে আছে :

ষষ্ঠাংশাং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ সুপ্রভাং
সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎপ্রসূং।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাং
পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনামহং ভজে॥

নানা বিঘ্ন থেকে শিশুদের রক্ষা করবার শক্তিও দেবীর কম নয়; এর পরিচয় প্রণাম-মন্ত্রের মধ্যে অনেকখানি পরিস্ফুট। মন্ত্রের এক স্থানে আছে :

ওঁ ধাত্রী ত্বং কার্ত্তিকেয়স্য ষষ্ঠীদেবীতি বিশ্রুতা।
দীর্ঘায়ুষ্টঞ্চ নৈরুজ্যং কুরুষ্ব মম বালকে॥
জননীং সর্বভূতানাং সর্ববিঘ্নক্ষয়ঙ্করী।
নারায়ণস্বরূপেণ মৎপুত্রং রক্ষ সর্বতঃ॥
ভূতদৈত্যপিশাচেভ্যো ডাকিনীভ্যোঽপি সঙ্কটাৎ।
সুতং মেঽস্য শুভং দত্বা রক্ষ দেবী নমোঽস্তুতে॥

দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ ষষ্ঠীর নাম : বৈশাখে চন্দনষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী, আষাঢ়ে কর্দমষষ্ঠী, শ্রাবণে লুণ্ঠনষষ্ঠী, ভাদ্রে চাপেটি ষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গাষষ্ঠী, কার্ত্তিকে নাড়ীষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে মূলক-ষষ্ঠী, পৌষে অন্নষষ্ঠী, মাঘে শীতলষষ্ঠী, ফাল্গুনে গোরূপিণী ষষ্ঠী এবং চৈত্রে অশোকষষ্ঠী। এদের মধ্যে কতকগুলি আবার খুবই প্রচলিত। যেমন জ্যৈষ্ঠে অরণ্যষষ্ঠী, এই ষষ্ঠী সাধারণতঃ জামাই-ষষ্ঠী নামেই সুপরিচিত। ভাদ্রে শুক্লাষষ্ঠী অক্ষয়-ষষ্ঠী নামেই প্রসিদ্ধ। এই দিনে স্নানদানাদি অনুষ্ঠান অক্ষয় হ'য়ে থাকে। চৈত্রে অশোকষষ্ঠীর অপর নাম স্কন্দষষ্ঠী; এই তিথিতে কার্ত্তিকপূজা করলে শুধু সৌভাগ্যই নয়, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি পর্যন্ত হয়।

সাধারণতঃ ষষ্ঠীদেবীর মূর্তির পূজার কোন বিধি নেই। তবে কোথাও প্রতিমা পূজা হ'লে প্রতিমা জলে বিসর্জন দিতে বড় দেখা যায় না; অশ্বত্থগাছের তলায় ঐ প্রতিমা রেখে

আসবার প্রথা প্রচলিত। দেবীর পূজার শেষে, দেবীর বাহন কৃষ্ণমার্জার ও অশ্বত্থগাছের পূজারও বিধি আছে।

ষষ্ঠীদেবীর পূজার প্রথম প্রবর্তনা সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে সুন্দর একটি উপাখ্যান পাওয়া যায়: স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তপস্যানিরত রাজা প্রিয়ব্রত ব্রহ্মার আদেশে দারপরিগ্রহ করেন। ক্রমে পত্নীর সন্তান-সম্ভাবনায় আশাহীন হ'য়ে তিনি কশ্যপ মুনির দ্বারা 'পুত্রেষ্টি' যজ্ঞ ক'রে যজ্ঞের চরু পত্নীকে ভোজন করান। যথাসময়ে রাণী পুত্র প্রসব করলেন, কিন্তু মৃতপুত্র। শিশুকে শ্মশানে নেওয়া হ'লে সহসা উজ্জ্বল বিমানে ক'রে এক দেবী আবির্ভূতা হলেন। রাজার প্রশ্নে দেবী উত্তর দিলেন যে তিনি ব্রহ্মার মানস-কন্যা, কার্ত্তিকের ভার্যা, মাতৃকার মধ্যে শ্রেষ্ঠা, এবং প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ সম্ভূতা ব'লে ভূমণ্ডলে ষষ্ঠীদেবী নামেই সুপরিচিতা। দেবী মৃত শিশুকে সঞ্জীবিত করলেন এবং রাজা প্রিয়ব্রত, ত্রিলোকের মধ্যে তাঁর পূজা প্রতিষ্ঠা করবেন—এই শর্তে রাজাকে পুত্র সমর্পণ ক'রে দেবী অন্তর্হিতা হলেন। সেই থেকেই প্রতি মাসে শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠীপূজা হ'য়ে আসছে।

পুরাণাদির মধ্যে, নানা দেবদেবীর সঙ্গে ষষ্ঠীদেবীকে সগৌরবে অবস্থান করতে দেখা গেলেও এঁকে কিন্তু বৈদিক বা পৌরাণিক দেবদেবীর গোষ্ঠীভুক্ত করা সঙ্গত হবে না। সম্ভবতঃ ইনি প্রাক্-আর্যসমাজ-সম্ভূতা মনসা, শীতলা, জাঙ্গুলী, বনদুর্গা, সুবচনী, বাসুলী, করমপুরুষ প্রভৃতি দেবদেবীদেরই সমগোত্রীয়া। দেশে দেশে লৌকিক দেবদেবীর পূজা-প্রচলনের ইতিহাস অনুসন্ধান ক'রে দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের দুর্বলতাকে আশ্রয় ক'রে নানা লৌকিক দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। এই ভাবেই সন্তান-কামনায় এবং সন্তানের মঙ্গলার্থে মাতা বা মাতামহীর দুর্বলতা আশ্রয় ক'রে ষষ্ঠীদেবীও হয়তো একদিন প্রকৃতির প্রজনন-শক্তির উপাসক বাংলার অনার্য আদিবাসীদের সমাজে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

ক্রমে খৃঃ পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতকে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবাহ যখন প্রবলতর হ'য়ে বাংলায় প্রবেশ ক'রল, তখন আর্য সংস্কৃতি তৎকালীন বাংলার অনার্য সংস্কার ও দেবদেবীদের মেনে নিতে প্রথমতঃ অস্বীকারই করেছিল। তবে সেই আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংঘাতের মধ্যেও যে সব লৌকিক দেবদেবীরা আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ক্রমশঃ তাদের স্বীকার না ক'রে পারেনি। এইভাবে অনুমান করা যায় যে খৃঃ তৃতীয় শতক থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গড়ে-ওঠা পুরাণগুলির মধ্যে বাংলার আদিবাসীদের যে-সব দেবদেবীরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ ক'রে ঐ ধর্মের কুক্ষিগত হ'য়ে পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ষষ্ঠীদেবীও একজন। ষষ্ঠীদেবী যে বাংলারই নিজস্ব দেবী—তার ইঙ্গিত ষষ্ঠীদেবীর ব্রতানুষ্ঠান ও পূজার উপচারগুলির মধ্যেও অনেকখানি লক্ষ্য করা যেতে পারে। বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু ক'রে পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রাদির মধ্যেও এ জাতীয় ব্রতানুষ্ঠানাদির সন্ধান পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে আবার সাংস্কৃতিক জনতত্ত্বের গবেষণায় এই তথ্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, বর্তমানে বাংলার নারীসমাজের মধ্যে যে-সব ব্রতানুষ্ঠান ও স্ত্রী-আচার আজও বর্তমান, সেগুলির অধিকাংশই অবৈদিক ও অব্রাহ্মণ্য এবং বাংলার গ্রাম্য সংস্কৃতির সঙ্গে একান্ত সম্পৃক্ত। এ প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ষষ্ঠীদেবীর পূজা ও ব্রতানুষ্ঠান অধিকাংশ ক্ষেত্রে

মেয়েরা নিজেরাই ক'রে থাকেন। ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য অপরিহার্য নয়। পুরাণে অনার্য দেবদেবীদের স্বীকৃতির সময় থেকেই হয়তো ব্রাহ্মণেরা ষষ্ঠীপূজাদিতে হস্তক্ষেপ করেছেন। এ অনুমান যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ: যে সকল ব্রাহ্মণ প্রথম অনার্য দেবদেবীদের পূজা-অনুষ্ঠানাদিতে পৌরোহিত্য করতেন, আর্য সংস্কৃতি তাদের ব্রাত্য বলেই একঘরে করতে চেয়েছিল এবং মনুও তাঁদের 'পতিত' বলেই আখ্যা দিয়েছেন। এটি অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক তথ্য।

সে যাই হোক, ষষ্ঠীদেবী বাংলাদেশের বহু-পূজিতা সুপ্রাচীন দেবদেবীদেরই একজন। শুধু তাই নয়, বাহ্য আড়ম্বর না থাকা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের সম্প্রদায়-নির্বিশেষে তিনি যেভাবে বাংলার ঘরে ঘরে অধিষ্ঠিতা হ'য়ে আছেন, তাতে তাঁর কম গৌরব বা প্রতিষ্ঠার কথা নয়, এবং মানুষের যে বিশিষ্ট বিশ্বাসবোধের উপর তিনি প্রতিষ্ঠিতা, তাতে তাঁর আসন যে সহজে বিচলিত হবে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।*

* কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের সৌজন্যে

পঞ্চায়ুধ-জাতক

শ্রীমতী বেলা দে

দান, দয়া, প্রেম ও অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন ভগবান বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধদেব; তিনি পূর্ব পূর্ব জীবনের বহু ঘটনাই তাঁর শিষ্য-দের গল্পচ্ছলে বলতেন। এগুলিকে 'জাতক' বলা হয়। সেই ধরনের একটি জাতকের গল্প পঞ্চায়ুধ-জাতক।

একবার বোধিসত্ত্ব বারাণসী-রাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। জাতকের নামকরণ-দিনে রাজা আট-শ ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে প্রচুর খাদ্য ও মহামূল্য দানসামগ্রী উপহার দিলেন এবং জাতকের ভাগ্য কেমন হবে, জানতে চাইলেন। ব্রাহ্মণগণ জাতকের দেহে সর্ববিধ সুলক্ষণ দেখে বললেন, 'এই কুমার সর্বগুণান্বিত রাজা হবেন। পঞ্চবিধ আয়ুধ বা অস্ত্রের প্রভাবে সমস্ত জম্বু-দ্বীপে কেউ আর এঁর সমকক্ষ ব'লে গণ্য হবে না।' ব্রাহ্মণদের মুখে কুমার-সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্-বাণী শুনে পিতামাতা কুমারের নাম রাখলেন পঞ্চায়ুধকুমার।

কুমার যখন বড় হ'তে লাগল, রাজা একদিন পুত্রকে ডেকে বললেন, 'গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে এক সুবিখ্যাত আচার্য আছেন। তুমি হাজার মুদ্রা দক্ষিণা নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে বিদ্যাভ্যাস ক'রে এস।

পিতার কথায় পঞ্চায়ুধকুমার তক্ষশিলা চলে গেলেন। কিছুকাল তথায় বিদ্যাভ্যাস ক'রে সর্ববিদ্যানিপুণ হ'য়ে যখন তিনি বারাণসী ফিরে আসবেন, তখন আচার্য তাঁকে পঞ্চবিধ আয়ুধ দান করলেন। পঞ্চায়ুধকুমার গুরুর আশীর্বাদ এবং পঞ্চবিধ আয়ুধ নিয়ে এক বনপথ দিয়ে বারাণসীর দিকে এগোতে লাগলেন। ঐ বনে এক ভীষণ যক্ষ বাস ক'রত। পথিকরা পঞ্চায়ুধ-কুমারকে বারবার সাবধান ক'রে দিল; তারা ব'লল, 'এই বনে যে যক্ষ বাস করে সে মানুষ দেখলেই মেরে ফেলে; কাজেই এই বনপথে এগোবেন না।' পঞ্চায়ুধ তাদের কথায় ভয় না পেয়ে, নিজের শক্তির কথা মনে রেখে সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দুঃসাহসী মানুষকে একাকী বনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে ভীষণ মূর্তি ধ'রে যক্ষ এগিয়ে এল। তার দেহ শাল-গাছের মতো, মাথা চিলেকোঠার মতো, চোখ

দুটি গামলার মতো, উপরের দাঁত দুটো মূলোর মতো, মুখ বাজপাখীর মতো, হাতপায়ের রং নীল আর উদরের রং বিচিত্র।

এই বেশে পঞ্চায়ুধকুমারের সামনে এসে যক্ষ ব'লল, 'কোথায় যাচ্ছ, দাঁড়াও, তুমি তো আমার খাদ্য।' যক্ষের কথায় পঞ্চায়ুধকুমার ভয় পেলেন না। তিনি বললেন, 'তুমি যক্ষ হ'তে পার, কিন্তু সাবধানে আমার কাছে এস। আমি আমার বল বুঝেই এই বনে ঢুকেছি। মনে রেখ, আমার যে কোন একটি তীর দ্বারা তোমায় আঘাত করলে এখুনি তোমার মৃত্যু হবে।'

এই ব'লে কুমার যক্ষের দিকে এক অতি বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য—এই তীর যক্ষের দেহ স্পর্শও ক'রল না। বরং তা যক্ষের দেহের রোমের সঙ্গে আটকে রইল। কুমার তখন একে একে পঞ্চাশটি শর নিক্ষেপ করলেন; কিন্তু সব তীরই আগের মতো যক্ষের রোমের মধ্যে আটকে রইল। তখন যক্ষ একবার গা ঝাড়া দিল, আর ঝর্‌ঝর্ ক'রে সব তীরগুলি তার দেহ থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

এদিকে যক্ষ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে—কুমারকে সে খাবে। কুমার তাঁর যে সমস্ত অস্ত্র সম্বল ছিল, একে একে সবগুলিরই ব্যবহার করলেন, কিন্তু কিছুই হ'ল না; তখন তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন যক্ষের উপর। ডান হাত দিয়ে যখন আঘাত করলেন, তখন তাঁর ডান হাত যক্ষের রোমে আটকে গেল। তারপর বাঁ হাত, ডান পা, বাঁ পা এবং শেষ পর্যন্ত মাথা দিয়ে আঘাত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত, পা, মাথা সমস্ত যক্ষের রোমে আটকে গেল। কুমার যক্ষের দেহে ঝুলতে লাগলেন। কিন্তু তখনও তাঁর মনে ভয় জাগেনি।

কুমারের এই অদ্ভুত সাহস দেখে যক্ষ অবাক্ হ'ল। এতদিন ধ'রে সে মানুষ ধ'রে ধ'রে খাচ্ছে, কিন্তু কোন মানুষই তো এতটা সাহস দেখায়নি। যক্ষের নিজের মনেও একটু ভয় হ'ল—সে পঞ্চায়ুধকুমারকে খেতে সাহস ক'রল না; তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রল, 'তোমার প্রাণে ভয় নেই কেন? মৃত্যুকেও কি তুমি ভয় কর না?' নির্ভয়চিত্তে কুমার উত্তর দিলেন, 'মরণকে ভয় ক'রে লাভ কি? জন্ম হলেই মরণ হবে—এ তো নিশ্চিত, তবে আর ভয় কেন? আর তুমিও মনে রেখ, আমাকে খেলেও তুমি নিষ্কৃতি পাবে না। আমার উদরে যে বজ্রায়ুধ আছে, তা হজম করবার ক্ষমতা তোমার নেই। ঐ অস্ত্রগুলি তোমার পেটের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলবে, কাজেই আমার মৃত্যু হ'লে তোমারও মৃত্যু হবে।' কুমারের কথা শুনে যক্ষ ভয় পেল। তার মনে হ'ল কুমারের কথাই সত্যি। এই ভেবে সে কুমারকে ছেড়ে দিয়ে ব'লল, 'তোমাকে মুক্তি দিলাম, তুমি দেশে ফিরে যাও।' তখন কুমার বললেন, 'আমি তো মুক্তি পেলাম, কিন্তু তোমার মুক্তির উপায় কি হবে? এমনি ক'রে যদি জীবন কাটাও আর তবে কোন জন্মেই তুমি মুক্তি পাবে না।

এই ব'লে কুমার যক্ষকে দান, দয়া, অহিংসা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিলেন। যক্ষ হিংসা, ক্রোধ আদি ত্যাগ ক'রে সংযমী হ'ল। এর পর সে বনের দেবতারূপে অধিষ্ঠিত হ'ল। যক্ষের পরিবর্তনের কাহিনী সবাইকে ব'লে কুমার সানন্দে বারাণসীতে ফিরে এলেন।

গীতার শিক্ষা

ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল

শ্রীভগবান বলেছেন: এই জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়—নিষ্কাম কর্মযোগ আমি পূর্বে বিবস্বান্‌কে বলি, তিনি মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে এই উপদেশ দেন। এইভাবে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের মধ্যে এই যোগরহস্য জ্ঞাত ছিল। কিন্তু কালক্রমে তা লুপ্ত হয়েছে। ক্ষত্রিয়কুলতিলক অর্জুন, আজ তোমাকে আমি সেই সর্বোত্তম যোগরহস্য জানালাম।

শ্রীভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়েই অর্জুনকে বলেছিলেন, 'বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ'—যাঁরা বলেন যে বেদের কর্মকাণ্ড ও মন্ত্রাদি ছাড়া আর কিছু ধর্তব্য নয়, উপনিষদ্‌-ভাগ বা জ্ঞানকাণ্ডকে তাঁরা প্রাধান্য দেন না; সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা স্বর্গসুখকামনায় বেদের কর্মকাণ্ডের যে সব উপদেশ দিয়েছেন, হে অর্জুন, তুমি তাঁদের সে সকল উপদেশ গ্রহণ ক'র না। তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও, নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বস্থ হও।'

শ্রীভগবানের এই গুহ্য বিদ্যা প্রবল রজোগুণী কর্মবীর ক্ষত্রিয়দের দ্বারাই আচরিত ও উপদিষ্ট হ'ত। আর যখনই অধর্মের অভ্যুত্থানে—দুষ্কৃতকারী-দের প্রতাপে সাধুসজ্জনেরা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছেন, তখন ভগবান নিজে অবতীর্ণ হ'য়ে ধর্ম সংস্থাপন করেছেন, দুষ্কৃতির উচ্ছেদ করেছেন। নিষ্কাম কর্ম-যোগ সংসারীদের পক্ষে পালনের কথা মনে হ'লে আমরা শিউরে উঠি। 'নিরাশীর্নির্মমঃ' হওয়াই এর আদর্শ। স্থিতপ্রজ্ঞের স্বরূপের কথায় ভগবান্‌ বলেছেন, 'প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌ আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ'। বহু শিক্ষিত ব্যক্তির অভিমত এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিলে আমাদের সমস্ত পুরাণ-ইতিহাসে এক রাজর্ষি জনক ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উদাহরণ মিলবে না।

মহাভারতের যুগেও অশ্বমেধাদি যজ্ঞবিহ্বল আড়ম্বরে স্বর্ণরৌপ্যগবাদি ধনরত্ন ব্রাহ্মণদের দান ক'রে স্বর্গে স্থান সুদৃঢ় করা চলিত ছিল। সেই সময়ে অর্জুনকে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ যে নিষ্কাম কর্মযোগ-রহস্য শুনিয়েছিলেন, কতকাল তা ভারত-সন্তানদের কানে বেজেছিল, তা সঠিক জানা যায় না। তবে এক হাজার বছর যে গীতা-সিংহনাদ শ্রুত হয়েছিল, তা অনুমান করা যায়।

আমাদের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসমন্বয়ের বাণী প্রচার ক'রে গিয়েছেন; খৃষ্ট ও বুদ্ধের মতো তাঁর সরল কথাগুলি যে জ্ঞানী ও মূর্খের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে সমভাবে রেখাপাত করেছে, তা সকলেই স্বীকার করেন। কালে তাই যে সর্বত্র সম্মতি ও আদর লাভ করবে, এখনই তার শুভচিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্ষুরধার বুদ্ধি, বাগ্মিতা ও তর্কযুক্তির সহায়ে উপনিষদের শুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের অমূল্য হৃদয়স্পর্শী বাণীর সংমিশ্রণে যে বীজ বপন ক'রে গিয়েছেন, পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে তার ফল ক্রমশঃ ফলছে। বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, ক্রমে তা বিশাল মহী-রুহের আকার ধারণ করবে।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্ব বহুকাল ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। মুসলিম ও ইংরেজ রাজত্বে জাতি-বৈষম্য, পৌরোহিত্য-প্রভাব, বর্ণাশ্রম-বিভাগ প্রায় বিলুপ্ত। সামান্য যেটুকু এখনও আছে তা বর্তমান আর্থনীতিক সংকটে অন্ন-বস্ত্রের অভাবে একেবারে দূর হ'তে চলেছে।

গত দুহাজার বছরের বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে দেখা যায়—সামন্ত স্বেচ্ছাচারী রাজন্যবর্গ, তারপরে ধর্মযাজক ও পুরোহিতকুলের দ্বারা শাসিত জনসাধারণ বরাবরই শোষিত ও কুসংস্কারে জর্জরিত। ধনী-দরিদ্রের, উচ্চ-নীচের ভেদ, বিষয়ের প্রতি লোভ, পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ-হিংসা, এই পরিবেশেই পৃথিবীর শতকরা ৯০ জন জীবনযাত্রা নির্বাহ ক'রে এসেছে। এই আবহাওয়ার মধ্যে নিষ্কাম কর্মযোগ হাসির কথা।

নিষ্কাম কর্মযোগ প্রাচীন ভারতে শুধু ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বারাই আচরিত হ'ত। বহু শতাব্দী পরে বর্তমানের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ঘোষিত নীতি ও কর্মধারার বিবরণ পাঠে মনে হচ্ছে, এ যুগেও নিষ্কাম কর্মযোগের বাণী বিস্মৃত নয়। শ্রীভগবানের বাণী পুঁথির কথা নয়, ব্যাপকভাবে, সমাজগতভাবে তার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ সম্ভব। সমাজসেবার ভেতর দিয়ে আমরা এর পৃথিবীব্যাপী প্রয়োগ দেখতে পাব। নিষ্কাম কর্মযোগের ভিত্তি এ যুগেও স্থাপিত হয়েছে—একথা জোর করেই বলা যেতে পারে।

সমুদ্র-সৈকতে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মহামিলনের অন্তরালে
মিশেছে আকাশ যেন সমুদ্রের সাথে।
গেল সূর্য অস্তপারে, রাঙা মেঘ দিক্-চক্রবালে
করে খেলা। ফিরে-চলা ঢেউগুলি ডাকিছে সন্ধ্যাতে
কারে যেন! থেমে গেছে পাখীর কূজন,
রাত্রির স্পন্দন জাগে।
এ কুণ্ঠা-বিহীন ডাক শুনে
তুষার পড়েছে গলে,—প্রপাতের ধারা
নেমে এলো সিন্ধুবুকে। মরুভূমি কাঁদে কাল গুনে
সমুদ্রসঙ্গম লাগি, নিশীথে সান্ত্বনা দেয় তারা
ছায়াপথ হ'তে, মরু যেন বন্দী রহে
দুঃখ ব্যথা স'য়ে থাকে।

এক প্রান্তে দুষ্প্রাপ্যের তরে
চিরন্তন দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে তার
সাগরের ধ্যান সৃষ্টি করি মরীচিকা উত্তপ্ত অন্তরে
বালু-ঝড় বহে অহরহ আর ওঠে হাহাকার।
এ পথে নাহিক মেঘ, বহ্নি-শিখা জ্বলে
ডাকে মরু বিধাতাকে।
আমারো জীবন মরুভূমি সম।
বেলা-শেষে সমুদ্র-সৈকতে
বসি ভাবিতেছি সেই কথা, কাছে নাই কেহ,
প্রাণের প্রাঙ্গণে মোর, আর হৃদয়ের পথে পথে
কই, কারো নয়নের বারিবিন্দু পড়ে নাই কভু!
এ সংসারে—কেবা কারে মনে রাখে?

সাধু শ্রীসুন্দরর্

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

এর আগে আমরা দু'জন বিখ্যাত শৈবসাধক শ্রীজ্ঞানসম্বন্ধর্ ও শ্রীআপ্পার্ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।* তেষট্টি জন শৈবসাধক বা নয়নারের মধ্যে চারজন সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এখন যে বাকী দুজনের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী বর্ণনা করতে চেষ্টা ক'রব, তাঁরা শ্রীসুন্দরর্ ও শ্রীমাণিক ভাসগর্। এই প্রবন্ধে সুন্দররের কথা আলোচনা করছি।

শ্রীসুন্দররের পুরা নাম শ্রীসুন্দরমূর্তি স্বামী—কিন্তু 'সুন্দরর্' এই নামেই তিনি সকলের কাছে বেশী পরিচিত। মাদ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ আরকট জেলার তিরুনাভালুর্ গ্রামে এক প্রসিদ্ধ আদিশৈব ব্রাহ্মণবংশে শ্রীসুন্দরর্ খৃঃ নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন। সাধু জ্ঞানসম্বন্ধর্ ও আপ্পার্ তাঁর পূর্বগ। চেরামন পেরুমল নামে এক রাজা তাঁর বিশেষ বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন।

কথিত আছে, তিনি মাত্র আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, কারণ এত অল্প বয়সের মধ্যে তাঁর প্রায় একশতটি তীর্থস্থান দর্শন এবং দুইবার বিবাহ সম্ভব কিনা তা ভাববার বিষয়। তখনকার দিনে পদব্রজেই সব তীর্থ দর্শন করতে হ'ত। তাঁর বয়স নিয়ে এই যে মতদ্বৈধ—এর কোনও সুষ্ঠু মীমাংসা আজ পর্যন্ত হয়নি।

বাল্যকালে তাঁর নধর গৌরকান্তি চেহারা দেখে সে দেশের রাজপুত্র নরসিংহ অত্যন্ত আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে রাজপ্রাসাদে এনে রাখেন। উপযুক্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে তিনি শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা হয় এবং পুত্তুর গ্রামে এক আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহ নির্ধারিত হয়।

বিবাহবাসরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। যখন পাত্র ও পাত্রী বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট, তখন হঠাৎ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে দাবি করলেন যে সুন্দর তাঁর ক্রীতদাস, সুতরাং স্বাধীনভাবে বিবাহ করার তার কোনও অধিকার নেই। বাধ্য হ'য়ে বিবাহ স্থগিত রাখতে হ'ল এবং ঠিক হ'ল যে দাবিদার ব্রাহ্মণের গ্রাম তিরুভেন্নাইনালুরে নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণদের এক পঞ্চায়েৎ দাসখৎ পরীক্ষা ক'রে দেখবেন যে ওটি আসল বা নকল। তাঁরা যে রায় দেবেন উভয় পক্ষ তা মেনে নেবেন। পুঁথিপত্র দস্তখৎ ইত্যাদি পরীক্ষা ক'রে সাব্যস্ত হ'ল যে দাসখৎ আসলই বটে।

বিবাহ আর হ'ল না। সুন্দর অতঃপর কোথায় থাকবেন, তা জানবার জন্য তাঁর প্রভু ব্রাহ্মণের অনুসরণ করেন। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সুন্দরকে নিয়ে গ্রামের বিখ্যাত শিবমন্দিরে প্রবেশ করেই অন্তর্হিত হ'য়ে যান। শিবের নাম তিরু আরুল তুরাই। সুন্দর বুঝতে পারলেন যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর কেহই নন, তিনি তাঁরই ইষ্টদেব স্বয়ং শিব। ভূমিতে নতজানু হ'য়ে সুন্দর ভাবাবেগে ব'লে উঠলেন, 'হে চন্দ্রশেখর ভোলানাথ, হে প্রভু, হে দয়াল ভগবান!' সুন্দর বুঝলেন যে তিনি মানুষের দাস হ'তে চলেছিলেন, দয়াল প্রভু কৃপা ক'রে তা নিবারণ করেছেন। জনমে জনমে তিনি যে ঈশ্বরেরই দাস' এ জ্ঞানও তাঁর জাগ্রত হ'ল।

* উদ্বোধন আষাঢ় শ্রাবণ, ১৩৬৪ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫

যে মেয়েটির সুন্দরের সঙ্গে বিবাহ হবে ঠিক হয়েছিল, তিনি তাঁর বাকী জীবন সুন্দরকেই তাঁর আরাধ্য দেবতারূপে পূজা ক'রে অন্তিমে স্বর্গলাভ করেন, এইরূপ কথিত আছে।

সুন্দর প্রচার করলেন যে সত্যই তিনি আজীবন ঈশ্বরের ক্রীতদাস। কিছুকাল সেখানে থাকার পর সুন্দর তীর্থভ্রমণে নির্গত হন। প্রতি মন্দিরে গিয়ে মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশ্যে স্তব রচনা করেন। অতঃপর তিনি তিরু-ভাটিগাই বিরাট্টনম্ গ্রামের বিখ্যাত শিবমন্দিরে গমন করেন। সাধু আপ্পার্ পূর্বে অশেষ ভক্তি সহকারে বহুপূর্বে ঐ শিবের আরাধনা করে-ছিলেন। সুন্দরের প্রতি কৃপাবিষ্ট হ'য়ে ভগবান সেখানে রাতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে দর্শন দান ক'রে তাঁকে ধন্য করেন।

অতঃপর তিনি বিখ্যাত নটরাজের মন্দির চিদাম্বরমে যান। এদেশের শিবভক্তেরা চিদাম্ব-রম্‌কে দক্ষিণ কৈলাস ব'লে অভিহিত করেন। সেখানে তাঁর প্রতি বিখ্যাত শৈবতীর্থ তিরুবালুর যাওয়ার জন্য দৈবাদেশ হয় এবং অচিরেই তিনি তথায় পৌছেন। তিরুবালুরের শিবমন্দিরে তিনি সাধনায় ডুবে যান এবং কঠোর সাধনার ফলে ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। এর পর থেকেই তিনি ঈশ্বরাবিষ্ট মহাপুরুষরূপে পরি-চিত হন।

অতঃপর সুন্দরর্ ভানমিকানাথার মন্দিরে পারাভাই নাচিয়ার নামে এক দেবদাসীর পাণিগ্রহণপূর্বক কিছুকাল বিবাহিত জীবন যাপন করেন। তখনকার দিনে দাক্ষিণাত্যে প্রায় প্রত্যেক বিখ্যাত শিবমন্দিরে দেবদাসী থাকত। অনেক জায়গায় এখনও তাদের বংশধরেরা বিদ্যমান।

সুন্দররের কোন স্থায়ী আয় না থাকাতে তিনি কঠোর দারিদ্র্যের সম্মুখীন হন। ভক্তাধীন ভগবান দৈব উপায়ে তাঁকে প্রচুর ধান্য ও মণিমুক্তাদি প্রেরণ করেন। যখনই সুন্দর কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তখনই বিপদভঞ্জন ভগবান অলৌকিক উপায়ে তাঁর দুঃখ দূর করেছেন। ভক্তকে রক্ষা করা যেন ভগবানের এক দায়!

কিছুকাল পরে আবার সুন্দরর্ তীর্থভ্রমণে নির্গত হন এবং মাদ্রাজ শহরের সন্নিকটে তিরুবাত্তীয়ূর্ নামক স্থানের বিখ্যাত শিবমন্দিরে গমন করেন। এখানে তিনি সাঙ্গলি নাচিয়ার নামে এক কৃষক-কন্যার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। কথিত আছে—সুন্দররের এই দুই স্ত্রী পার্বতীদেবীর দু-জন সহচরী। এই বিবাহের পূর্বে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে কখনও তিনি নূতন পরিণীতা পত্নীর সঙ্গ পরিত্যাগ করবেন না। কিন্তু তীর্থদর্শনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়।

তিনি তিরুবালুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত অন্যায়ের দরুন তাঁর দুই চক্ষু অন্ধ হ'য়ে যায়। এতে নিস্তেজ না হ'য়ে তিনি ভগবানের গুণকীর্তন করতে করতে তাঁর যাত্রাপথে অগ্রসর হ'তে থাকেন। কয়েকদিন পথ চলার পর একজন তাঁকে একখানি লাঠি দিয়ে গেল। তার সাহায্যেই তিনি এগোতে লাগলেন—মুখে অহরহঃ ভগবানের গুণগান, তাঁরই চিন্তায় মন প্রাণ ভরপুর, জগৎ যেন সব ভুল হ'য়ে গেছে। কাঞ্চীপুরমে পৌছে সেখান-কার বিখ্যাত একাম্বরনাথের মন্দিরে প্রার্থনার পর তিনি দৈবানুগ্রহে বাম চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান এবং তিরুবালুরে পৌছে স্তব দ্বারা সেখানকার দেবতাকে প্রসন্ন ক'রে তিনি ডান চোখের দৃষ্টিও লাভ করেন।

সুন্দরের দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা শুনে তাঁর প্রথমা স্ত্রী তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেননি।

কিন্তু দেবতার ইচ্ছা ও অনুগ্রহে আবার তাঁরা মিলিত হন।

পুনরায় সুন্দরর্ ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে যান। তাঁর মহত্বের কথা শুনে তদানীন্তন চেরা রাজা চেরামন পেরুমল তাঁর প্রতি খুব আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে নিজ রাজধানীতে নিয়ে যান। পেরুমলও ভক্ত লোক ছিলেন। উভয়ে একসঙ্গে বহু তীর্থস্থান দর্শন করেন। পথে তাঁরা শুনলেন যে একটি ছোট ছেলেকে কুমীরে মেরে ফেলেছে। পিতামাতার দুঃখ দেখে সুন্দররের হৃদয় দ্রবীভূত হয়। ঈশ্বরোদ্দেশ্যে হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি দিয়ে তিনি এক স্তব রচনা করেন। প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হ'য়ে ভগবান ছেলেটিকে পুনর্জীবন দেন।

এরপর তাঁরা তিরুবানচিয়াকুলমে আসেন। সেখানে সুন্দরর্ ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করার জন্য এক তীব্র প্রেরণা অনুভব করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ (?) বছর। ভক্তের আকুল প্রার্থনায় ভগবানের সিংহাসন টলে ওঠে এবং তাঁর কৃপায় সুন্দরর্ চিরবাঞ্ছিত শিবলোকে গমন করেন।

শ্রীসুন্দরর্ প্রায় এক শত স্তব রচনা করেন, তন্মধ্যে পনরটি বিশেষ খ্যাত। এঁর রচিত স্তবগুলিও তেবারম্ নামে পরিচিত এবং কতকগুলি স্তব মন্দিরে বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে গীত হ'য়ে থাকে। শেষের দিকে তাঁর বৈরাগ্যের জোয়ার যখন পরিপূর্ণ, তিনি তখন সুন্দর একটি স্তোত্রের মাধ্যমে জগতের ও জীবনের অনিত্যতা বর্ণনা করেছিলেন, তার অর্থ:

জীবন ও অভিজ্ঞতার কোন মূল্য নাই; উহা একান্তই অলীক। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, এই অনিত্য সংসারে তিনিই একমাত্র আশ্রয়। জীবনের পরিণতি ধুলায়—জন্মের পরিণতি ধ্বংসে, যন্ত্রণায় ও মোহে; কাজেই সৎকাজ করতে মোটেই দেরি করা উচিত নয়। একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেবের ভজনা কর, যাঁর ঊর্ধ্ব ও অধের ইতি করতে গিয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ও রক্ষাকর্তা বিষ্ণু পর্যন্ত বিফল পরিশ্রম করেছিলেন।

তেষট্টি জন নয়নারের মধ্যে সুন্দরই সকলের শেষে এসেছিলেন, তাঁর রচিত স্তোত্রেই পূর্বগ বাষট্টি জন নয়নারের প্রশংসা দেখতে পাওয়া যায়। সুন্দরের প্রতি শিবের বিশেষ কৃপা ছিল, কথিত আছে একবার তিনি নটরাজের বিশ্বনৃত্য তাঁর নিজ হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন। সংসারে প্রবেশ করলেও সংসারের কালিমা তাঁকে কোনও দিন স্পর্শ করতে পারেনি, কারণ তাঁর অন্তর ছিল ইষ্টচিন্তায় অহরহঃ ভরপুর

তোমারে প্রণাম

শ্রীনরেন্দ্র দেব

তোমার করুণা নিখিল বিশ্বে অহরহ বহমান,
প্রভাত সন্ধ্যা আনে সুন্দর তোমার অমিত দান।
করুণা তোমার আকাশে বাতাসে,
অরুণ আলোর মধুর প্রকাশে;
প্রাবৃট্-ধারায় করুণা-ঝারায় তৃপ্ত তৃষিত প্রাণ।

বহে নদীজলে করুণা-লহরী কল্লোলে স্তবগান,
চন্দ্রতারায় জ্যোতির ধারায় ধরণী দীপ্যমান।
কৃপায় তোমার হে করুণারাজ,
মর্ত্য ধরেছে অমর্ত্য সাজ;
অণুতে রেণুতে মিশে আছ তুমি 'অণোরপি অণীয়ান্'!

তোমার করুণা-ধারাই জাগায় শাখায় শাখায় প্রাণ,
তরু-তৃণলতা নব কিশলয়ে সবুজের অভিযান;
জীব-জীবনের স্পন্দন মাঝে
তব সকরুণ করুণা বিরাজে,
শরণাগতেরে বিপদবারণ, কৃপায় কর হে ত্রাণ।

নাম-যশ-খ্যাতি-প্রীতির প্রসাদ আশাতীত ধনমান,
না চাহিতে পাই, ওগো দয়াময়, তব দয়া অফুরান।
পথের কাঙালে রাজা করো নাথ,
প্রসারিত সদা বরাভয় হাত,
দেখা দাও প্রভু, ধ্যানলোকে তুমি, ভক্তের ভগবান।

অনন্ত তব করুণা অপার, নাহি তার অবসান,
কীট পতঙ্গ প্রতি প্রাণী লভে তব প্রেমকল্যাণ;
করুণা তোমার মাখা ফলে ফুলে,
বর্ণে গন্ধে গানে ওঠে দুলে;
রূপের তোমার সীমা কেবা পায়; হে অরূপ রূপবান্!

তুমি নাই যেথা ত্রিভুবন মাঝে, নাহি তো এ হেন স্থান,
সকল হৃদয়ে জানি সুগোপনে তোমার অধিষ্ঠান।
হ'লেও অবাঙ্-মনসোগোচর
তুমি চরাচরে চিরনির্ভর,
তোমার করুণা যে লভে সে পায় অমৃতের সন্ধান।

কেউ চেনে, কেউ চেনে না তোমায়, কেউ বা সন্দিহান,
কারো বা হৃদয়ে তব রূপ-শিখা নিয়ত অনির্বাণ!
করুণা যাচিয়া ফেরে যেবা কেঁদে
তারে তুমি নাও প্রেম-ডোরে বেঁধে,
পলে পলে সে যে অনুভব করে তোমার স্নেহের টান।

মাটির প্রতিমা, শিলা-বিগ্রহ, নহে জড়, না পাষাণ!
কত নাম তব, রূপ নব নব, কে জানে সে অভিধান?
জনমে জনমে জীবনে মরণে,
ঠাঁই দিও তব অভয় চরণে;
প্রণাম তোমারে, তোমারে প্রণাম, হে চির জ্যোতিষ্মান্!

দক্ষিণের বৃন্দাবন

[গুরুবায়ুর শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির]

স্বামী ধর্মেশানন্দ

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে কেরল প্রদেশে গুরুবায়ুর-মন্দির একদা রাজনীতিক কারণে বিখ্যাত হইয়াছিল। এই স্থানের পৌরাণিক পটভূমিকা বঙ্গদেশে প্রায় অজ্ঞাত; তাই এই ভ্রমণকাহিনীর মুখবন্ধে তাহা সংগৃহীত হইল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় উদ্ধবকে দিয়া একবার গুরু বৃহস্পতির কাছে সংবাদ পাঠান: সমুদ্র শীঘ্র দ্বারকা গ্রাস করিবে, তৎপূর্বেই তিনি যেন বসুদেব-দেবকী-পূজিত শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তিটি কোন সুরক্ষিত পবিত্র স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভগবান্ আরও বলিয়া দিলেন, এই মূর্তি সাধারণ নহে, সৃষ্টির পূর্বে ভগবান্ বিষ্ণু ইহা ব্রহ্মাকে দেন, শ্রেষ্ঠ পুত্রপ্রাপ্তির জন্য তপস্যারত প্রজাপতি সুতপাকে ব্রহ্মা ইহা দান করেন। কঠোর তপস্যাসহ ঐ মূর্তিকে পূজা করার ফলেই ভগবান্ প্রথম জন্মে সত্যযুগে সুতপা ও পৃশ্নির কাছে পৃশ্নিগর্ভরূপে, দ্বিতীয় জন্মে কশ্যপ ও অদিতির কাছে বামনরূপে, তৃতীয় জন্মে দ্বাপরে বসুদেব ও দেবকীর কাছে কৃষ্ণরূপে আসিয়াছেন, সমাগত কলিযুগে এই মূর্তি পরম কল্যাণদায়ক হইবে।

সংবাদ পাইয়া দেবগুরু বৃহস্পতি দ্বারকা গিয়া দেখেন সব শেষ; তখন তাঁহার শিষ্য বায়ুর সাহায্যে সমুদ্র হইতে ঐ মূর্তি উদ্ধার করিলেন। উহা প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে ভারতভূমির দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়া দেবগুরু দেখিলেন, এক কমল-সরোবরে শিব-পার্বতী ক্রীড়ারত। তাঁহারা ভগবানের এই মূর্তির জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মহাদেবের আদেশে দেবগুরু বায়ুর সহায়তায় উপযুক্ত স্থানে ঐ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই দিন হইতে ঐ স্থানের নাম গুরুবায়ুর; দেবতার নাম গুরুবায়ুরাপ্পা। নিকটেই মমীয়ুর নামক স্থানে শিবও শক্তির সহিত বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীআদ্য-শংকরাচার্য কিছুকাল এখানে ছিলেন ও তাঁহারই প্রবর্তিত পূজাপদ্ধতি এখনও চলিতেছে। শ্রীলীলাশুক (বিল্বমঙ্গল) সাধনাকালে বহুদিন এখানে ছিলেন, ভগবান্ বালকরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত খেলা করিতেন। বহু সাধু সন্ত ও ভক্তসেবিত পুণ্যতীর্থ—দক্ষিণের এই বৃন্দাবন। —উঃ সঃ

দক্ষিণ মালাবারে পুন্নানী তালুকে সমুদ্র হইতে ৩ মাইল দূরে সর্বজনপ্রিয় গুরুবায়ুর-মন্দির। উহা শোরনুর জংশন হইতে ৩০ মাইল ও ত্রিচুর হইতে ২০ মাইল দূরে; বাসে যাওয়া যায়। ১৯৫৭ খৃঃ ৮ই মে বুধবার জনার্দন নামক কিশোরকে গাইড করিয়া সকালেই ত্রিচুর হইতে বাস্-এ গুরুবায়ুর আসিলাম, ৯৷৷টার মধ্যে দেব-স্থান চৌলট্রীতে দ্বিতলে দুটাকা দিয়া একদিনের জন্য একটি ঘরভাড়া ও জলের ব্যবস্থা করিয়া মন্দিরে চলিলাম, সঙ্গে শুদ্ধ মহারাজ। যে গুরুবায়ুর-মন্দিরের বর্ণনা শুনিয়া একদিন শ্রীবৃন্দাবনের বাঁকেবিহারীর কথাই মনে হইয়াছিল, আজ সেই দক্ষিণের বৃন্দাবন গুরুবায়ুর-তীর্থে কত কল্পনা লইয়া সত্যসত্যই উপস্থিত! এতদূর আশা করি নাই; কারণ কোথায় কাশীধাম, কোথায় বৃন্দাবন, আর কোথায় দক্ষিণ-পশ্চিমের সমুদ্রতীরে দুই হাজার মাইল দূরে—উত্তর ভারতে প্রায় অজ্ঞাত 'গুরুবায়ুর'।

গোপুরমের সম্মুখে গরুড়-স্তম্ভটি বেশ বড়। তারপর ৩টি মহল বা দেউড়ি অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির। মন্দির ছোট, কিন্তু সর্বদা ভক্তের স্রোত বহিতেছে। সকালের পূজা তখন হইয়া গিয়াছে। কর্পূর-আরতি দেখিলাম। পরে বেলা ১২টা হইতে ১টার পূজা ভোগরাগ ও আরতি দর্শন করিলাম। ভারতের সর্বত্র ভোগ-রাগের সময় মন্দিরের দ্বার বন্ধ করা হয়। মূর্তি ছোট; আমরা দেখিলাম ৬৷৭ বৎসরের শিশু, বালগোপাল বেশ; কোমরে লাল কৌপীন। কেরলদেশে শিশুদের কোমরে ঐরূপ লাল কৌপীন থাকে। মস্তকে মুকুট টোপরের মতো, মণি জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে, এত উজ্জ্বল যে মুখ দেখা যায় না। বক্ষেও একটি রত্ন এবং চারিটি স্বর্ণস্তবক, উহাও খুব উজ্জ্বল। দক্ষিণ হস্তে নাড়ু ও বামহস্তে পদস্পর্শ মুদ্রা। ১টায় মন্দির বন্ধ হইল। দ্বিতীয় মহলে দেখিলাম ব্রাহ্মণ-মণ্ডপে অনেক ভক্ত ভাগবত পাঠ করিতেছে, বেশির

ভাগ দশম স্কন্ধ, কেহ বা কাত্যায়নীর স্তবটি পড়িতেছে। আর্ত ও অর্থার্থী ভক্তের ভিড়ে কাতরকণ্ঠে ধ্বনিত 'গুরুবায়ুরাপ্পা' এই নামই কানে বেশী আসিতে লাগিল। ডান দিকে খানিকটা গিয়া উঠান (মথিলকম্) পার হইয়া দেখিলাম কুণ্ডের নিকট বিরাট ব্রাহ্মণ-মণ্ডপে ২।৩ শত ব্রাহ্মণ শ্রোতা ভাগবতপাঠ শ্রবণ করিতেছেন। দুর্গাদেবীর ক্ষুদ্র মন্দিরের সম্মুখে ছোট মণ্ডপে একজন স্থূলকায় পণ্ডিত হাত-মুখ নাড়িয়া বেশ ভাবভক্তির সহিত ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। একটি ২১।২২ বৎসর-বয়স্ক ছিপ্‌ছিপে সুপুরুষ ব্রাহ্মণযুবক আমার সম্মুখে বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। পরে তাহার সঙ্গ করিয়া জানিলাম, সে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। ভগবানে ভক্তি হইবে বলিয়া কালিকট হইতে এই মন্দিরে আসিয়া রহিয়াছে। বন্ধুর বাড়ীতে থাকে। তাহার প্রকৃতি বড় মধুর।

চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি মনোরম। শ্রীকৃষ্ণের বেশ, চন্দনচর্চিত, কেবল মুখটি দেখা যাইতেছে, গলায় দুইটি স্বর্ণহার, কোমরে কোমর-পাটা, গলায় ৩।৪টি গোড়েমালা; রঙ্গন ও তুলসীর স্তবকমালা, রঙ্গন ও পদ্মের পাপড়ির মালা, রঙ্গনের গোড়েমালা। সকালে—যেন নাড়ু-গোপাল-মূর্তি। বৈকাল ৫টায় মন্দির খুলিলে দেখিলাম যেন বিষ্ণুমূর্তি, যুবকের বেশে সজ্জিত, মুখটি খোলা, সর্বাঙ্গ চন্দনে ঢাকা। তারপর সন্ধ্যাবেলা যেন প্রৌঢ়বেশ, সর্বাঙ্গে চন্দন, বক্ষে স্বর্ণ ও রত্ন জল্‌জল্ করিতেছে। গলায় ২টি রঙ্গনফুলের গোড়েমালা। দুপুরে ও সন্ধ্যায় আরতির পর এবং বড় ২টি পূজার পর জয়দেবের অষ্টপদী কীর্তন হয়, নহবৎ বাজে। সন্ধ্যার পর একদল গায়ক কীর্তন করেন, মৃদঙ্গ ও করতাল সহ। ঢাকের মতো মৃদঙ্গ। পরদিন ভোরে ৪টার সময় মন্দিরে গিয়া অনাবৃত মূর্তির অভিষেক দর্শন করিলাম। মূর্তি কৃষ্ণপ্রস্তরের চতুর্ভুজ বিষ্ণু।

শুনিলাম—পুরাণে আছে, উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঐ মূর্তি দিয়া যান, উদ্ধব দেবগুরু বৃহস্পতিকে দেন। তিনি বায়ুর (মরুৎগণের) সাহায্যে ঐ স্থানে লোককল্যাণে ঐ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন; সেজন্য নাম গুরুবায়ুর গুরু+বায়ু+উর; 'উর্' অর্থে স্থান।

ভোরে অভিষেকে যে সুগন্ধি তৈলে স্নান করানো হয়, উহা যাত্রী-গণকে বিক্রয় করা হয়। উহাতে কুষ্ঠ, পক্ষাঘাত, সর্পদংশনবিষ নষ্ট হয়।

এই স্থানে আসিয়া পাণ্ড্য বংশীয় কোন রাজা নির্ঘাত সর্পদংশন হইতে গুরুবায়ুরাপ্পার কৃপায় রক্ষা পাইয়া ছিলেন। ৪০০ বৎসর পূর্বে মেল পাথুর নারায়ণ ভট্টগিরি নামে একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ পক্ষাঘাত ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া 'নারায়ণীয়ম্' নামক স্তুতিতে পরম কারুণিক গুরুবায়ুর-শ্রীকৃষ্ণে নিজ হৃদয়ের ভক্তি ও আর্তি নিবেদন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ভক্ত-সমাগম বৃদ্ধি পায়—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। 'নারায়ণীয়ম্' স্তবের বই কিনিতে পাওয়া যায়

পূর্ব দিকের গোপুরম্ দিয়া গেলে দেবমন্দির সম্মুখে পড়ে। পশ্চিম দিকের গোপুরম্ হইতে বাহির হইলে বাজার। পূর্বেও কিছু দোকান-পাট আছে। প্রতিদিন দুইবেলা ব্রাহ্মণ-মণ্ডপে প্রায় ১৫০ ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হয়।

হস্তী-পৃষ্ঠে উৎসব-বিগ্রহ বসাইয়া প্রতিদিন রাত্রে মন্দিরের চারিদিকে অর্থাৎ 'নালম্বলমে' ভক্তগণ গীতবাদ্যসহ তিনবার প্রদক্ষিণ করে। ইহাকে 'শিবেলি' বলে। বহুদিন পরে কীর্তন ও নৃত্যে যোগদান করিয়া শিশুসুলভ আনন্দ অনুভব করিলাম। কার্তিকের একাদশী এবং সারা বৈশাখে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। দক্ষিণের সর্বদেশের ভক্ত-সমাগমে ১২ মাস

মন্দির উৎসবময়। একবার মন্দিরে গমন করিলেই মনস্তাপ ও অশান্তি কোথায় পলায়ন করে প্রতি বৎসর মন্দির-প্রতিষ্ঠার উৎসব-দিবসে মন্দিরের দুই পার্শ্বে একাদশটি হস্তীকে সজ্জিত করিয়া পূর্বে গোপুরমের সম্মুখে ধ্বজ-স্তম্ভে পতাকা উড্ডীন করা হয়। উহা পৌষ মাসে পড়ে। ১০দিন উৎসব চলে; পূজা, ভজন, ভোজন, শোভাযাত্রা প্রভৃতিতে 'গুরুবায়ুর' মুখরিত হইয়া থাকে। দশম দিনে আরাত (স্নান) উৎসবে তীর্থে (পুষ্করিণীতে) মন্দিরের বিগ্রহের স্নান হয়। কার্তিক একাদশী ও পৌষের এই উৎসবের ৬ষ্ঠ দিবসে মন্দিরে উদয়াস্ত পূজা হইয়া থাকে। একাদশী উৎসব অষ্টাদশ-দিবসব্যাপী হয়। ইহার প্রধান বিশেষত্ব—'ভিলাক্কু' অর্থাৎ আলোকসজ্জা। ঐ 'ভিলাক্কু'র খরচ ভক্তগণ বহন করে। উহার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়,—কে অগ্রে ঐ সৌভাগ্য লাভ করিবে। ৬।৭ হাজার বড় বাতি দেওয়া হয়। ২৫০৲ টাকা খরচ পড়ে। এ ছাড়া অসংখ্য ছোট প্রদীপ দেওয়া হয়।

ক্ষুদ্র মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে একটি অল্প-পরিসর ব্রাহ্মণ-মণ্ডপ (কেবল ব্রাহ্মণগণ ওখানে বসিতে পারিবেন—অপর জাতি স্পর্শ করিতে পারিবেন না) থাকায় পুলিশের সাহায্যে ভিড় কমানো হয়। প্রধান পুরোহিত 'মেল শান্তি' পালাক্রমে নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ-পরিবার হইতে গৃহীত হয়। এক বৎসরের জন্য তিনি ব্রহ্মচর্য-পালনে ব্রতী হন ও মন্দির-চত্বরের বাহিরে গমন করিতে পারেন না। তাঁহার স্বতন্ত্র বাসস্থান মন্দিরমধ্যে নির্দিষ্ট ঘরে। পুরোহিতগণ ৪টি নম্বুদ্রী পরিবার হইতে নির্বাচিত হয়; তন্মধ্যে মন্দিরের ভিতরে মাত্র ৪জন বিশিষ্ট পুরোহিত প্রবেশ করিতে পারেন।

মন্দিরমধ্যে রৌপ্যপাত্রে অসংখ্য দীপাবলী প্রতিদিন প্রজ্বলিত থাকে। উহার গাওয়া ঘিয়ের গন্ধে চারিদিক সুবাসিত। ভোর হইতে বেলা একটা পর্যন্ত কতবার যে পূজা হয়! পুরোহিতেরা সর্বদা পূজায় ব্যাপৃত এবং মাঝে মাঝে চন্দন, পুষ্প, প্রসাদ দর্শনার্থিগণকে দিতেছেন।

পুষ্পাঞ্জলিকে 'অর্চনা' বলে। অনেক রকম অর্চনা আছে—তন্মধ্যে সহস্রনাম, অষ্টোত্তর, পুরুষসূক্ত ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। ১ টাকা খরচ করিয়া আমরা অষ্টোত্তর অর্চনা করিলাম। তজ্জন্য দেবস্থান হইতে টিকিট কিনিতে হয়। নিবেদিত পুষ্প আশীর্বাদ পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রসাদ গ্রহণের জন্যও টিকিট কিনিতে হয়। আমরা বৈকালে 'পরমান্ন' টিকিট কিনিয়া সকালে বিতরণ-গৃহ হইতে গরম গরম পায়েস-প্রসাদ একটি বাটি করিয়া লইয়া আসিলাম। বেশ সুমিষ্ট প্রসাদ। খুব তৃপ্ত হইলাম। মন্দিরের মধ্যে একটাকা দিলে অন্নপ্রাশন ও ৭॥০ দিলে বিবাহ সম্পাদিত হয়। ১২ আনায় প্রায় ১পোয়া অভিষেকের তিল তেল পাওয়া যায়। শোনা যায়, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আচার্য শঙ্করকে ঐখানে আসিতে হয় ও তিনি শুদ্ধ তান্ত্রিক পূজার প্রচলন করেন।

১৯৩১খৃঃ হরিজন মন্দির-প্রবেশ আন্দোলনের সময় হইতে গুরুবায়ুর সর্বভারতে সুপরিচিত হয়। হরিজন যদিও মন্দিরে এখন প্রবেশ করে, তথাপি ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য যায় নাই। কেরলের কথা-কলির মতো জামুরিন-রাজের খরচে প্রতি বৎসর যে কৃষ্ণনাট্যম্ হয় তাহা উপভোগ্য

টিপুর রাজত্বকালে মন্দির আক্রমণের ভয়ে ত্রিবাঙ্কুরে (Trivandrum) শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতি-বিগ্রহ আনীত হয়। কিন্তু টিপু সুলতান মন্দির আক্রমণ করেন নাই, দেবাদিষ্ট হইয়া রাজকোষ হইতে মন্দিরে স্বর্ণমুদ্রা দিতেন। যাহা হউক মন্দিরমধ্যে আরও তিনটি দেবালয় আছে, যথা—দুর্গা, শাস্তা, গণপতি। শাস্তার একাধারে ভীম বিক্রম ও পরম দয়া। যাহা হউক ২৪ ঘণ্টা গুরবায়ুর-মন্দিরে অধিকাংশ পূজা ও নৃত্যগীত দর্শন করিয়া পরদিন ১০টায় আমরা ত্রিচুর শহর হইতে ৪ মাইল দূরে আমাদের ভিলাঙ্গন আশ্রমে ফিরিলাম, শ্রীমান্ জনার্দন সঙ্গে। সেখান হইতে পালপুরম্ হইয়া উটকামণ্ডের পথে যাত্রা করি।

মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

স্বয়ং মহাপ্রভুর যিনি দীক্ষাগুরু, তাঁর গৌরবের তুলনা কোথায়? কবি কর্ণপুর গোস্বামী সেজন্যই ঈশ্বরপুরীর মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে আত্মহারা হ'য়ে বলেছেন :

ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্ ॥

ঈশ্বরপুরী কৃষ্ণপ্রেম-কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর অন্যতম শিষ্য।

ঈশ্বরপুরীর নিবাস ছিল কুমারহট্ট বা হালিসহরে। তাঁর পিতার নাম শ্যামসুন্দর আচার্য। তিনি বেদবেদান্তাদি সর্ববিদ্যায় ছিলেন নিষ্ণাত। 'প্রেম-বিলাসে' উক্ত হয়েছে :

পরম পণ্ডিত ঈশ্বর ছাড়ি গৃহবাস।
মাধবেন্দ্র-শিষ্য হৈঞা করিলা সন্ন্যাস ॥
ঈশ্বরপুরী নাম হৈল সন্ন্যাস-আশ্রমে।
মাধবের সদা করে চরণে সেবনে ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যখন নবদ্বীপে বিদ্যাবিলাসে মত্ত, তখন ঈশ্বরপুরী একদিন অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে উপস্থিত হন। এই প্রসঙ্গে চৈতন্যভাগবতে :

অদ্বৈত বলেন বাপ তুমি কোন্ জন।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন ॥
বলেন ঈশ্বরপুরী আমি ক্ষুদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ ॥

ঈশ্বরপুরীর প্রেম দেখে সকলে 'হরি হরি' ধ্বনি করতে লাগল।

একদিন মহাপ্রভুর সঙ্গে পথে ঈশ্বরপুরীর দেখা হ'লে তিনি তাঁকে তাঁর বাড়ীতেই ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। গৌরাঙ্গের সঙ্গে ঈশ্বরপুরীর এই প্রথম সম্ভাষণ। চৈতন্য ভাগবতে :

ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ প্রভু করিলেন তানে।
সমাদরে গৃহে সেই বসিলা আপনে ॥

নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্যের গৃহে ঈশ্বরপুরী এর পরে কিছুকাল বাস করেছিলেন। সে সময় তিনি 'কৃষ্ণলীলামৃত' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ তিনি নিমাইয়ের বন্ধু গদাধর পণ্ডিতকে শোনাতেন। 'ভক্তিরত্নাকর' বলেন :

শ্রীঈশ্বরপুরী কিছুদিন এথা ছিলা।
কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থ এথাই রচিলা ॥
গদাধরপণ্ডিতে পরম স্নেহ করে।
তার প্রেমচেষ্টা দেখি পড়াইলা তারে ॥

ঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরাঙ্গকে নিজের পুস্তক সংশোধন করার জন্য বার বার অনুরোধ করায় শ্রীগৌরাঙ্গ একটি উত্তর দিলেন, কৃষ্ণের বর্ণনে যে দোষ দেখে সে পাপী। ভক্তের কবিত্বে ভগবান্ কোন দোষ নেন না—

অতএব তোমার যে কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে দোষিবে কোন্ সাহসিক জন?

ভক্তিরসে উচ্ছল ঈশ্বরপুরী অতঃপর 'ক্ষিতি পবিত্র' ক'রে পর্যটনে চললেন।

'উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থে শ্রীল রূপগোস্বামী ঈশ্বরপুরীর 'রুক্মিণীস্বয়ংবর' নামক গ্রন্থ[১] থেকে দুটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। এ গ্রন্থ কখন কিভাবে লেখা হয়েছিল, তা আজ জানবার উপায় নেই। এই গ্রন্থ ও 'কৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ এক কিনা, তাও বিবেচ্য।

শচীমাতার নিকট ঈশ্বপুরীর ভিক্ষাগ্রহণের বৎসর দুই তিন পরে মহাপ্রভু গয়াতীর্থে গমন করেন। সেখানে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম-দর্শনে মহাপ্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হয়। দৈবক্রমে ঈশ্বরপুরী ঐ সময়ে গয়াতে ছিলেন; তাঁকে দেখে মহাপ্রভুর

১ এই গ্রন্থ এখনও অনাবিষ্কৃত। শ্লোকদুটির জন্য 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের সাত্ত্বিক প্রকরণ দেখুন (১২।১২, ১৭)।

সংজ্ঞা ফিরে এল; নিমাই তাঁকে প্রণাম করলেন। 'অদ্বৈত-প্রকাশ' বলছেন :

তিঁহো সসম্ভ্রমে গৌরচন্দ্রে আলিঙ্গিলা।

মহাপ্রভু নিজে স্বহস্তে রন্ধন করলেন, এমন সময় ঈশ্বরপুরী সেখানে উপস্থিত হওয়ায় তাঁকেই খাদ্য প্রদান করলেন। পুরী গোস্বামী বললেন, 'যে অন্ন রাঁধা হয়েছে, তাই দু-ভাগ ক'রে দু-জনে খেলে বেশ হবে।' মহাপ্রভু তাতে রাজী হলেন না। স্বয়ং পুনরায় রন্ধন ক'রে ভক্ষণ করলেন। এই সময়েই গয়াধামে মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'অদ্বৈত-প্রকাশ'-মতে ঈশ্বরপুরী নিমাই-এর ভগবত্তা তখনই জানতে পেরেছিলেন। যথা :

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুঁহু চিদানন্দময়।
তব মায়া-নাটে কার ভ্রম নাহি হয়?

ঈশ্বরপুরী এর পর গয়াধাম ত্যাগ ক'রে বের হ'য়ে গেলেন। নিমাইও ফেরার পথে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান পরিদর্শন ক'রে নবদ্বীপে যান;

'তবে কুমারহট্টে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
পুরীরাজের জন্মস্থান অতি পুণ্যতর॥'

গয়া থেকে ঈশ্বরপুরী বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে অবধূত নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'লে তিনি তাঁকে বৃন্দাবনে 'কানাই'এর খোঁজ না ক'রে নবদ্বীপে তাঁর অনুসন্ধানে যেতে বললেন।

ঈশ্বরপুরীর তিনটি কবিতা রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'র নামমাহাত্ম্য-প্রকরণে (১৮নং কবিতা), ভক্তগণের দৈন্যোক্তি-প্রকরণে (৬২নং শ্লোক) এবং ভক্তগণের নিষ্ঠা-প্রকরণে (৭৫নং শ্লোক) উদ্ধৃত হয়েছে। প্রথম শ্লোকে তিনি বলছেন : 'দ্বিজাতিগণ যোগ, বেদানুশীলন, নির্জন বনে ধ্যান ও তীর্থভ্রমণাদি দ্বারা নির্ভয়ে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে মুক্ত হ'তে চান—তা ভাল; আমরা কিন্তু কদম্বকুঞ্জে বিদ্যমান 'ইন্দিবর নিন্দি' শ্যাম-সুন্দরের নামসেবক। আমাদের জন্মের ভয় নেই, লক্ষ লক্ষ জন্ম হ'ক—

যোগশ্রুত্যুপপত্তি-নির্জনবনধ্যানাধ্বসংভাবিতাঃ
স্বারাজ্যং প্রতিপদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ।
অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহর-প্রোন্মীলদিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলধামনাম জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি॥

কাতর দৈন্যোক্তি সহকারে ঈশ্বরপুরী দ্বিতীয় কবিতায় বলছেন :

'হে মুকুন্দ! তোমার স্মরণে ব্রজের আম্রবৃক্ষও বায়ুবিঘূর্ণিত শাখায় করছে নৃত্য, ভ্রমরগুঞ্জনের মাধ্যমে করছে গান, মকরন্দবিন্দুর ছলে করছে অশ্রুপাত এবং নব অঙ্কুর উদ্গমের ছলে হচ্ছে তার রোমাঞ্চ—এভাবে সেও মূর্ছিত হচ্ছে, কিন্তু হে প্রাণসম! বল দেখি. তোমার নামটিও কেন আমার মনে আসছে না?

নৃত্যন্ বায়ুবিঘূর্ণিতৈঃ স্ববিটপৈর্গায়ন্নলীনাং রুতৈঃ
মুঞ্চন্নশ্রুমরন্দবিন্দুভিরলং রোমাঞ্চনবাঙ্কুরৈঃ।
মাকন্দোঽপি মুকুন্দ মূর্চ্ছতি তব স্মৃত্যা নু বৃন্দাবনে
ব্রূহি প্রাণসমান চেতসি কথং নামাপি নায়াতি তে॥

তৃতীয় কবিতায় তাঁর ভক্তহৃদয়ের অগাধ নিষ্ঠা হয়েছে সূচিত—এখানে ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষা শ্রবণ-স্মরণাদি ভক্তি-অঙ্গের প্রাধান্যই হয়েছে সুপ্রকট :

ধন্যানাং হৃদি ভানতাং গিরিবরপ্রত্যগ্রকুঞ্জৌকসাং
সত্যানন্দরসং বিকারবিভবব্যাবর্তমন্তর্মহঃ।
অস্মাকং কিল বল্লবীরতিরসো বৃন্দাটবীলালসো
গোপঃ কোঽপি মহেন্দ্রনীলরুচিরশ্চিত্তে মুহুঃ ক্রীড়তু॥

অর্থাৎ পর্বতগুহাবাসী ধন্য পুরুষদের হৃদয়ে সত্যানন্দরসঘন বিকার-বিরহিত পরম ব্রহ্ম স্ফুরিত হউন। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে যেন বৃন্দাবনপ্রিয় গোপী-রতিরস ইন্দ্রনীলকান্তি শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করেন।

'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটকে বর্ণিত আছে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ পণ্ঢারপুর-নামক তীর্থস্থানে গমন করেন এবং সেখানে অদ্ভুতভাবে অন্তর্হিত হন।

অন্তর্ধানকালেও শ্রীকৃষ্ণরূপী গৌরহরির কথা ঈশ্বরপুরীর হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তাঁর অন্তর্ধানের পর তাঁর ভক্ত গোবিন্দদাস একদিন

মহাপ্রভুর নিকটে এসে বললেন যে ঈশ্বরপুরীর আদেশেই তিনি তাঁর কাছে এসেছেন—কেননা পুরীজী তাঁকে ব'লে গেছেন, 'কৃষ্ণচৈতন্য নিকট রহি সেব যাই তারে।' আর এও বললেন যে কাশীশ্বরও তীর্থ দেখে ফিরবেন, প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দদাস নিজে ছুটে এসেছেন (—চৈতন্য-চরিতামৃত)। সেখানে সার্বভৌম ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

'পুরী গোসাঞি শূদ্রসেবক কাঁহাতে রাখিলা?'

এই প্রশ্নের উত্তরে

'প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥'

এই বলেই ভক্তমানপ্রবর্ধন গৌরহরি গোবিন্দ-দাসকে আলিঙ্গন ক'রে ভট্টাচার্যকে ছোট ছেলের মতোই জিজ্ঞাসা করলেন,

'গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার।
ইহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায়?'

তদুত্তরে সার্বভৌম বললেন, 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া'। সেই থেকে গোবিন্দ সেখানে স্থিত হলেন। কাশীশ্বরও কিছুদিন পরে এসে উপস্থিত হলেন। কাশীশ্বর মহাপ্রভুর নৃত্যের সময় রথের অগ্রভাগে লোকের ভিড় বারণ করতেন।

মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য অদ্বৈতপ্রভু, পুণ্ডরীক, ঈশ্বরপুরী। এঁদের প্রত্যেকের গুণের সীমা নেই। এক একটি যুগে ভগবানের অশেষ কৃপা দৃষ্ট হয়। শুধু তিনি নিজে অবতীর্ণ হন না—তাঁর পরিপার্শ্বস্থ সকলকে নিয়েই তিনি ভূতলে আগমন করেন। ঈশ্বরপুরীর অলৌকিক জীবন অধিকাংশই অজ্ঞাত। সাধু-সন্ন্যাসীর জীবন প্রায়ই তাই। তা হলেও যেটুকু আমরা জানতে পারি, তা থেকেই তাঁর অপরিসীম মাহাত্ম্য আমাদের অভিভূত করে।

মুরারি গুপ্তের পদাবলী

ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন

শ্রীচৈতন্যের সুহৃদ ও অনুচর কেহ কেহ দুই-চারিটি করিয়া গান রচনা করিয়াছিলেন। দুই-একজন ধারাবাহিক পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহারাই চৈতন্য-পদাবলী রচনার পথপ্রদর্শক। চৈতন্যের মহিমাপূর্ণ পদ প্রথম রচনা করিয়া প্রকাশ্যে নীলাচলে গাহিয়াছিলেন অদ্বৈত আচার্য।

চৈতন্যের আদ্য অনুচরদের মধ্যে মুরারি গুপ্তকেই প্রথম পদাবলী-রচয়িতা রূপে পাই। ইঁহার লেখা চৈতন্যজীবনীর আলোচনা যথাস্থানে করিয়াছি। মুরারি গুপ্তের কড়চা যাহা ছাপা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে মুরারি আগে গান লিখিতেন। দামোদর পণ্ডিত তাঁহাকে গান রচনা ছাড়িয়া দিয়া জীবনী রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বাংলায় ও ব্রজ-বুলিতে মুরারি সাত-আটটির বেশী গান (পদাবলী) লিখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।[১] তাহার মধ্যে দুইটি[২] খুব ভালো,

১ History of Brajabuli Literature পৃষ্ঠা ১৮ দ্রষ্টব্য।
২ পদকল্পতরু ৭৫১,১৬৯৯।

বৈষ্ণব-পদাবলীর শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। পূর্বগামী পদাবলী-রসিকেরা, বোধ করি ভনিতায় পরিচিত নাম না দেখিয়া পদদুইটিকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন; এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম গানে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নাই, দ্বিতীয় গানে শুধু "রাই" আছে।

প্রথম গানে প্রেম বিপন্নার সর্বত্যাগী দুঃসাহসের অভিব্যক্তি :

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও
জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও।
নয়নপুতলী করি লইলোঁ মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ
পিরীতি-আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান।
না জানিয়া মূঢ়লোকে কি জানি কি বলে লোকে
না করিয়ে শ্রবণগোচরে
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে।
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায়॥

দ্বিতীয় গানটিতে বিরহিণীর গভীর মর্মপীড়া প্রকাশিত। কবি যে চিকিৎসক-ব্যবসায়ী তাহাও জানা যায়।

কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই
শফরী সলিল বিন গোঙাইব কত দিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই।
ঘৃত দিয়া একরতি জ্বালি আইলা যুগবাতি[৩]
সে কেমনে রহে অযোগানে[৪]
তাহে সে পবনে পুন নিভাইলো বাসোঁ হেন[৫]
ঝাট আসি রাহ পরাণে।
বুঝিলাম উদ্দেশে[৬] সাক্ষাতে পিরীতি তোষে[৭]
স্থান-ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়
তার সাক্ষী পদ্ম-ভানু জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পিরীতি না রয়।
যত সুখে বাড়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদবন্ধু-ভাতি[৮]
গুপ্ত কহে একমাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহূ-রাতি॥[৯]

৩ যে বাতি এক যুগ ধরিয়া জ্বলিবে, অর্থাৎ সুবৃহৎ প্রদীপ। অথবা যুগ্ম বর্তিকা, যুগল বাতি।

৪ তৈল না যোগাইলে। ৫ এমনি বুঝিতেছি।

৬ প্রকারান্তরে। ৭ দেখাদেখি হইলে প্রেম তৃপ্তি দেয়।

৮ চন্দ্রের দশা করিলে। চন্দ্র যেমন এক পক্ষ ধরিয়া বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহার পরপক্ষে আবার ক্ষয় পাইতে থাকে, সেইরূপ পূর্বে তুমি আমাকে (রাধাকে) স্নেহ করিয়া বাড়াইয়া এখন বিরহে পোড়াইতেছ।

৯ একমাসের মধ্যে চন্দ্র দেশ ছাড়িল, অর্থাৎ লুপ্ত হইল। আর নিদানে অর্থাৎ রোগের সঙ্কটাবস্থায় অমাবস্যা আসিল। পীড়ার সঙ্কটাবস্থায় অমাবস্যা পড়িলে রোগীর জীবনের আশঙ্কা থাকে। এই উৎপ্রেক্ষাটি হইতে বোঝা যায় যে কবি চিকিৎসক বৈদ্য ছিলেন।

স্বামী সদানন্দ

[সেবাকার্য-প্রসঙ্গে]

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর অনেকেই জানেন যে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সর্বপ্রথম সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী সদানন্দ। সাধারণতঃ গুপ্ত মহারাজ নামেই তিনি অভিহিত হইতেন। তাঁহার আকৃতি ছিল উন্নত, দীর্ঘ শরীরের অবয়ব--অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ, সতেজ পেশীবহুল, প্রসারিত বক্ষঃস্থল —গায়ের রং শ্যামবর্ণ, ঈষৎ উজ্জ্বল। কথাবার্তায় মাঝে মাঝে হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিতেন। স্বামীজী তাঁহাকে ডাকিতেন হিন্দীভাষীর মতো 'সদানন্দ্!' তিনিও হিন্দীতে উত্তর দিতেন, 'জী মহারাজ!' স্বামীজীর পোষাক-পরিচ্ছদ আবশ্যকীয় বিষয়ে যাহা করিবার, তাঁহাকে উপদেশ দিতেন; তিনিও তাহাই করিতেন। গুরু-শিষ্যের ব্যবহার আমাদের চোখে আকর্ষণীয় ছিল।

এই সময়েই স্বামী সদানন্দ মহারাজের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ হয় কলিকাতায় প্লেগের সেবা-কার্যের সময়। রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগের সেবা-কার্যের ইতিহাসে স্বামী সদানন্দের নাম চির-স্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে এই সেবাকার্যের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আমি প্রতিদিন বাগবাজারে বলরাম-মন্দিরে যাইতাম। এই সেবাকার্য-প্রবর্তনের জন্য স্বামীজীর আবেগপূর্ণ উৎসাহ বাক্য, কার্যের নির্দেশ এবং প্রতিরোধকল্পে তাঁর প্রাণের ব্যাকুলতা নিরীক্ষণ করিতাম; তবুও আমি সেবাকার্য করিতে আরম্ভ করি নাই।
সদানন্দই আমাকে তাঁহার সহিত কার্য করিতে আহ্বান করেন এবং তাহার সঙ্গে আমিও সেবাকার্য করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করি।

একদিন প্রাতঃকালে গ্রে স্ট্রিটে মেথরপাড়ায় দেখি স্বামী সদানন্দ কয়েকজন মেথর ছোকরাকে ডাকিতেছেন; আমি তখন বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া। তিনি আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এটা কি তোমাদের বাড়ী? আমি উত্তরে বলিলাম, 'হ্যাঁ মহারাজ'। তিনি আমাকে কখন 'ভেইয়া' কখন 'ভাই' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি আমাকে বলিলেন, 'চল আমার সঙ্গে'। পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীতে ভিতরের পায়খানা নর্দমা Disinfectant (রোগ-জীবাণুনাশক) ঔষধগুলি বালতির জলে গুলিয়া মেথর ছোকরা-দের দিয়া সাফ করাইতে আদেশ করিলেন।

কয়েকজন ভদ্র গৃহস্থ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাদের ভিতরে লইয়া গেলেন। স্বামী সদানন্দ আমার উপর উক্ত পল্লীর ভার দিয়া একটি মেথরদলকে সঙ্গে লইয়া অন্যত্র কাজ করিতে গেলেন। আমি কার্যকালে দেখি—অনেক ভদ্রলোক ব্যঙ্গ বা তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাদের জ্যাঠামি করতে হবে না। ঔষধগুলি আমাদের দিয়ে দাও, তোমাদের বাড়ীতে ঢুকতে হবে না।' কেহ বলিলেন, 'যাও যাও ছোকরা বাড়ীতে গিয়ে পড়াশুনা করগে যাও, তোমার এখানে মুরুব্বিগিরি করতে হবে না' ইত্যাদি। কিন্তু আমরাও নাছোড়-বান্দা—তর্ক আলোচনা করিয়া কতক বাড়ীতে কাজ করিলাম, আবার কতক বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেয় নাই।

এই সব কাজ করিয়া ফিরিয়াছি, তখন বেলা প্রায় দুইটা—দেখি গুপ্ত মহারাজ আমাদের

বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া আছেন। তাঁকে সব কথা জানাইলাম। তিনি সব শুনিয়া বলিলেন, 'ওতে ভয় পেও না। সমাজের এই অবস্থা! আমাদের তথাকথিত শিক্ষিতেরা নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝতে শেখেনি। কাজ ক'রে যাও।'

পরদিন তিনি আমাদের দরজীপাড়ায় যাইতে বলিলেন। সেখানেও সেই এক অবস্থা! ধনী লোকেরা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। গুপ্ত মহারাজ শুনিয়া বলিলেন, 'কাল বস্তিগুলি দেখতে হবে। চল, কাঠমার বাগানে কাল ভোরে কাজ করতে হবে—আমিও তোমাদের সঙ্গে কাজ ক'রব।' অতি প্রত্যূষে মেথর-জমাদার যোগাড় করিয়া তিনি আমাকে ডাকিলেন।

কাঠমার বাগানের বস্তি—প্রকাণ্ড বস্তি, মসজিদবাড়ী স্ট্রিটে। বাইরে মুদিখানার আর খাবারের দোকান ইত্যাদি। ভিতরের দৃশ্য ভয়াবহ দুর্গন্ধময়, আর দরিদ্র শ্রমজীবীদের দারুণ দারিদ্র্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছিল। যেদিকে উৎকট দুর্গন্ধ, গুপ্ত মহারাজ সেইখানে আমাদের ডাকিয়া লইলেন। বস্তির সংলগ্ন একটা সংকীর্ণ খালি জমি—সেখানে স্তূপাকার আবর্জনা। এই খালি জমির পাশেই দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকাশ্রেণী। যতকিছু আবর্জনা সব পচিয়া দুর্গন্ধ!

গুপ্ত মহারাজ দুঃখ ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হিন্দীতেই বলিতে লাগিলেন—উক্ত অট্টালিকা-বাসীদের উদ্দেশ্য করিয়া গালিগালাজ দিয়া বলিলেন: দেখছ—এই তো ভদ্র সমাজের কাণ্ড। এই সব রোগের বীজ এই গরীবদের বাসস্থানে ফেলে মহামারীর বীজ ছড়াচ্ছে। প্লেগ বসন্ত কলেরা—যতকিছু ব্যারাম এই আবর্জনা পচে হয়।

মেথরদের তিনি কোদাল-ঝুড়ি নিয়ে ময়লা-গুলি বড় রাস্তায় ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন, —তাহারা উহা পরিষ্কার করিতে অস্বীকার করিল। গুপ্ত মহারাজ তখন তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন: বেশ ভেইয়া—তোমরা ব'সে ব'সে দেখ, আমরা সাফ করছি।

তাদের একটা বড় ঝুড়ি আমাকে আনিতে বলিলেন এবং তিনি নিজে কোদাল লইয়া উহা ভরতি করিয়া আমাকে রাস্তায় ফেলিতে বলি-লেন। আমি তাঁহার আদেশে একটা চাদর মাথায় বাঁধিয়া ঝুড়ি বহিয়া ময়লা রাস্তায় ফেলিয়া দিলাম। মেথরেরা হাঁ করিয়া দেখিতেছে! দুই তিনবার এইরূপ করিবার পর দেখি, তাহারা বসিয়া পরস্পর কি বলাবলি করিতেছে। আমি আসিতে না আসিতেই গুপ্ত মহারাজ আর একটা ঝুড়ি ভরতি করিয়া রাখিয়াছেন!

এই রকম ৮।১০ বার করিবার পর দেখি, মেথরের দল স্বামী সদানন্দের পায়ে ধরিতেছে এবং কাঁদকাঁদভাবে বলিতেছে, 'বাবাজী মহা-রাজ—আমাদের ক্ষমা করুন, কোদাল আমাদের দিন, আমরা সব পরিষ্কার করছি।'

তিনি হিন্দীতে বলিতেছেন: না—না আমরা সাফ ক'রব, তোমরা ব'সে ব'সে দেখ—আমি তোমাদের যে মজুরি দেব বলেছি তা সন্ধ্যাবেলায় প্রতিদিনের মতো দেব।

কিন্তু তারা স্বামী সদানন্দের পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'না-না বাবাজী, তুমি যখন ক'রছ তখন আমরা করতে পারব না কেন?' শেষে কোদালটি একরকম কাড়িয়া লইল এবং আমার হাত হইতে ঝুড়িটি লইতে গেল। আশ্চর্য তাহারাও তখন মহা উৎসাহে কাজ করিতে লাগিল।

স্বামী সদানন্দ মহারাজ আমাকে একপাশে লইয়া বলিলেন: দেখছ ভেইয়া—ভদ্রলোকদের চেয়ে এদের প্রাণ কতটা তাজা। তুমি ক'রছ তো ক'রছ—তারা গ্রাহ্যও করে না। মুখে হয়তো কেউ বলবে, 'বেশ মশায়—বেশ কাজ করছেন'।

এই পর্যন্ত। দেখ প্রাণে লাগলো বলেই হাত থেকে ঝুড়িকোদাল কেড়ে নিয়ে এরা কাজ আরম্ভ ক'রে দিলে।

আমি বলিলাম, 'এতো পাহাড়প্রমাণ আবর্জনার স্তূপ কতদিনে শেষ হবে?' তিনি বলিলেন, 'এই বস্তির কাজ শেষ হ'তে ৮।১০ দিন লাগবে। এস আমরা দাঁড়িয়ে থাকি কেন? রোগজীবাণুনাশক ঔষধগুলি বালতিতে গুলে ছড়িয়ে দিই।'

বস্তিবাসীরা এই সব দেখিয়া নির্বাক্, বিস্ময়াবিষ্ট। তাহারা একে একে তাহাদের দুঃখদুর্দশার কথা জানাইতে লাগিল। স্বামী সদানন্দের মুখ-চোখ দেখিয়া বোধ হইল—সমবেদনায় তিনি ব্যথিত। তখন তিনি কাহাকেও চাউল বা পথ্যাদির জন্য সাহায্য করিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় যখন আমরা ফিরিতেছি, তখন সেই সব মেথরদের জন্য খাবার ও মিঠাই আনিয়া দিতে লাগিলেন, কাহাকেও ছোট ছেলেদের পিঠ চাপড়াইবার মতো আদর করিতেছেন, কাহাকেও বকসিস দিতেছেন—তাহাদের দিনমজুরির টাকা দিবার পর।

এই অপূর্ব ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—আপনি তো কিছু খাননি। কিছু আহারের ব্যবস্থা করি। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'নেই ভেইয়া, বেশ ঠাণ্ডা জল আন—তুমিও স্নান ক'রে কিছু খাও, সারাদিন উপবাসে রয়েছ।' আমি তাঁকে এক গ্লাস ডাবের জল আনিয়া দিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, 'স্বামীজীর কথা কাজে পরিণত করাই—তাঁকে দর্শন করার ও তাঁর উপদেশ শোনার সার্থকতা।'

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে

ভক্ত নলিনীকান্ত বসু

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন পাই জয়রামবাটীতে বাংলা ১৩১৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। ইতিপূর্বে শ্রীমায়ের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতাম না; তখনকার মনের অবস্থায় জানারও বিশেষ কারণ ছিল না। তখন ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া তাঁহাদের ভাবেই ভাবিত হইতেছিলাম। দেবদেবীর পূজা-অর্চনা পৌত্তলিকতা, উহাতে কোন সত্য নাই এইরূপই ধারণা ছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তদের পৌত্তলিক বলিয়াই ভাবিতাম। শ্রীভগবানের অপার কৃপায় এই মোহ দূর হইতে বেশী দেরী হয় নাই।

একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত একজন অন্তরঙ্গ ভক্তের দর্শন পাই। তাঁহার কথায় এবং ভক্তোচিত আকৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া প্রায়ই তাঁহার নিকট যাইতাম। তাঁহারই উপদেশে মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বর এবং বেলুড় মঠে যাতায়াত আরম্ভ করি। ক্রমশঃ সাধুদের স্নেহ করুণা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি টান অনুভব করিতে থাকি। সাধু ভক্তদের সঙ্গগুণে ঠাকুরকেই আপনার মনে হইতে থাকে। নিশিদিন ভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা, কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী, সত্যনিষ্ঠ, সরলতা ও করুণার মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভক্তেরা যে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা ঠিক বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। একাধারে এত গুণ কোন মানুষে সম্ভব নহে।

এইরূপে ধীরে ধীরে দীক্ষার জন্য মন ব্যাকুল হয়। শুনিয়াছিলাম—ঠাকুরের সময়-কার যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। আরও যখন শুনিলাম যে শ্রীমা কোন কোন ভাগ্যবান্‌কে দীক্ষাও দিয়া থাকেন, তখন শ্রীমাকে দর্শন করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল। শ্রীমায়ের উদ্বোধন-বাড়ী তখনও হয় নাই। অধিকাংশ সময়ই তিনি জয়রামবাটীতে থাকেন। সেখানে যাওয়ার একাধিক রাস্তা ভক্তদের নিকট জানিয়া লইয়া বিষ্ণুপুর হইয়া যাওয়াই স্থির করিলাম।

সেই সঙ্কল্পানুসারে একদিন হাওড়া হইতে ট্রেনে চাপিয়া রাত্রি ১২টা।১টার সময় বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। বিষ্ণুপুর হইতে জয়রাম-বাটীতে যাওয়ার তখন কোন বাস বা অন্য কোন যানবাহন ছিল না। হয় পদব্রজে, না হয় গরুর গাড়ীতে যাইতে হইত। ভাগ্যক্রমে একজন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান পাওয়া গেল। সে আমাকে কোতলপুর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে রাজী হইল। তখনই বিছানাপত্র সহ তাহার গাড়ীতে উঠিলাম। খুব সকালে কোতলপুর পৌঁছিয়া, এই গাড়োয়ানের সাহায্যে একটি কুলী ঠিক করিয়া তাহার মাথায় বিছানাপত্র দিয়া জয়-রামবাটী রওনা হইলাম। কুলীটি জয়রামবাটীর অনেক কিছু সংবাদ জানে, বুঝিলাম।

আজ শ্রীমায়ের দর্শন পাইব—এই আনন্দে মন ভরপুর। পথের দুধারে গাছপালা ঘরবাড়ী যাহা যাহা দেখিতেছি—তাহাতেই যেন আনন্দ! মনে মনে একটু শঙ্কাও হইতে লাগিল, শ্রীমাকে কিভাবে কি বলিব, তিনি কি ভাবিবেন, আমার যাওয়াতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইবে না তো—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চলিতে চলিতে জয়রামবাটী আসিয়া গেলাম।

এই সেই জয়রামবাটী—যেখানে শ্রীমা এখনও নরদেহে বর্তমান, শ্রীমা তখন বড়মামার (প্রসন্ন মামার) বাড়ীতে থাকেন, নিজের বাড়ী তখনও হয় নাই। পূর্বদিকের দরজা দিয়া কুলীটি আমাকে একেবারে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।

আমাদের দেখিয়া একটি প্রশান্ত করুণাময়ী মূর্তি কাছে আসিলেন, দেখিয়াই মনে মনে বুঝি-লাম ইনিই আমাদের মা। আরও কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা থেকে আসছ?'

—কলকাতা থেকে, আমাদের মা এখানে থাকেন, তাঁকে দর্শন করতে এসেছি।

—আমিই তো তোমাদের মা, বাবা!

সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করিলাম।

—তোমার বিছানা বৈঠকখানা ঘরে রেখে এস, পরে সব শুনব।

শ্রীমায়ের জন্য কলিকাতা হইতে আনীত মিষ্টি তাঁহার হাতে দিয়া, বিছানা বৈঠকখানা-ঘরে রাখিয়া কুলীকে বিদায় করিয়া পুনরায় মায়ের কাছে গেলাম। শ্রীমা ততক্ষণ দরজার ধারেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। কাছে যাইতেই বলিলেন, 'এবার বলো কিজন্য এসেছ?'

—আপনাকে দর্শন করতে, আর জয়রামবাটী ও কামারপুকুর দর্শন করতে।

মায়ের প্রসন্ন দৃষ্টি, মৃদু মৃদু হাসিমুখ। অপূর্ব এবং অবিস্মরণীয় দৃশ্য! জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কিছু?' বুঝিলাম, আমার দীক্ষা লওয়ার গোপন ইচ্ছাটি বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। বলিলাম, 'মা, শ্রীশ্রীঠাকুরের একটু নাম করার ইচ্ছা হয়, কিন্তু কেমন ক'রে করতে হয় তা তো জানি না। আপনি যদি দয়া ক'রে ব'লে দেন, তা হ'লে বেশ হয়।' 'আচ্ছা তালপুকুরে স্নান ক'রে এস'—এই কথা বলিয়া পথ দেখাইয়া দিলেন। কিছু দূর গিয়াই একটা পুকুর পাইলাম। এইটি তালপুকুর কিনা জানি না। নিকটে লোকও

নাই যে জিজ্ঞাসা করি। পুকুরের পাড়ে কয়েকটি তালগাছ দেখিয়া ঐটিই তালপুকুর ভাবিয়া তাহাতে স্নান করিলাম, পরে শুনিলাম—ঐটিই তালপুকুর।

বৈঠকখানা-ঘরে ভিজা কাপড় ছাড়িয়া মায়ের কাছে যাইতেই মা আমাকে তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে দুখানা আসন পাতা ছিল, মা একখানাতে বসিয়া আমাকে অন্যখানায় বসিতে বলিলেন; বসিলে মা আমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর শুনিয়া 'ঠিক হয়েছে' বলিয়া মহামন্ত্র দান করিলেন; এবং কি করিয়া জপ করিতে হয়—নিজ করে জপিয়া দেখাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকার পর মায়ের আদেশে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সামনের ঘরের দাওয়ায় গিয়া বসিলাম।

একটু পরে মা মুড়ি আনিয়া খাইতে দিয়া বলিলেন, 'বাবা, এখানে এ ভিন্ন ভাল জলখাবার কিছু পাওয়া যায় না। এই খাও।' আমি বলিলাম, 'কলকাতার কথা আলাদা, দেশে পাড়া-গাঁয়ে আমরা ঐ সবই তো খাই, মা।'

লক্ষ্য করিলাম শ্রীমা যেন পা একটু টান করিয়া হাঁটিলেন। মনে মনে ভাবিতেছি, মায়ের পা একটু বাঁকা বোধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাইলাম, 'বাবা, অনেকদিন বাতে ভুগে ভুগে ঠিক ভাবে চলতে পারি না।' আমি তো অবাক্! কি করিয়া মা আমার মনের কথা বুঝিলেন। বাতের ঔষধ পাঠাইতে চাহিলে মা বারণ করিয়া বলিলেন যে তিনি অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কোন উপকার পান নাই। মুড়ি খাইবার কিছুক্ষণ বাদে ঐ একই দাওয়ায় বসিয়া ভাত খাইয়া সেই বৈঠকখানায় যাইয়া একটু বিশ্রাম করার পর গ্রামের এদিক ওদিক একটু ঘুরিয়া আসিলাম।

মনে মনে ভাবিতেছি যে মা তো এত কৃপা করিলেন, দয়া করিয়া এখন যদি তাঁহার পায়ে একটু হাত বুলাইয়া দিতে বলেন তবে কৃতার্থ হই। সন্ধ্যার পর শ্রীমা তাঁহার শয়ন-ঘরে পূর্বদিকে মাথা রাখিয়া শুইয়া আমাকে ডাকাইলেন। যাইতেই বলিলেন, 'বাবা, আস্তে আস্তে একটু পা টিপে দাও তো!' আমি তো স্তম্ভিত! শুনিয়াছিলাম মা অন্তর্যামী। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ একই দিনে তিনবার পাইলাম। তক্তাপোশের নীচে পশ্চিম দিকে বসিয়া মায়ের পা টিপিতেছি; তাঁহার অপার কৃপার কথা ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ধারা বহিতেছে। কখনও পা টিপিতেছি, কখনও পায়ে হাত বুলাইতেছি, কখনও বা সেই পা-দুখানি নিজের মাথায় ঠেকাইতেছি, কেমন যেন হইয়া গিয়াছি! কিছু সময় বাদে মা বলিলেন, 'হয়েছে, আর না।' পরে মাকে বলিলাম, 'এবার আমার দেরি করবার উপায় নেই; কালই কামারপুকুর দর্শন ক'রে আসার ইচ্ছা।' মা বলিলেন, 'বেশ, তাই হবে।'

পরদিন সকালে মাকে প্রণাম করিয়া কামারপুকুর রওনা হই। কলিকাতা হইতে মায়ের জন্য যে মিষ্টি আনিয়াছিলাম, তাহা হইতে আমার হাতে কিছু দিয়া মা বলিলেন, 'রঘুবীরকে দিও এবং সেখানে রাত্রিবাস কোরো।'

ডোঙায় আমোদর পার হইয়া হাঁটা পথে কামারপুকুর যাইতে যাইতে মানিকরাজার আম্রকানন দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তখন ইহার স্বাভাবিক দৃশ্য অতি সুন্দর ছিল। দেখিলেই চক্ষু জুড়াইত। এখানেই শ্রীশ্রীঠাকুর খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে কতভাবে লীলাখেলা করিয়াছেন। এখন আর মানিকরাজার সে আম্রকানন নাই। গাছ কাটিয়া এখন জমি করা হইয়াছে। বিক্ষিপ্তভাবে ৩।৪টি আমগাছ মাত্র এখনও আছে।

তারপর ভূতির খাল। এই শ্মশানে ঠাকুর রাত্রে কত রকম সাধন-ভজন করিয়াছেন। এখন খালে পুল হইয়াছে; তখন ছিল না।

ভূতির খালের অনতিদূরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাড়ী। বেলা আন্দাজ ৯টায় সেখানে পৌঁছি। পূজনীয় রামলাল দাদা, লক্ষ্মীদিদি, শিবুদা তখন দক্ষিণেশ্বরে; বাড়ীতে থাকিতেন এক বৃদ্ধা মামীমা। তিনি মন্দিরে ভোগরাগাদির বন্দোবস্ত করিতেন। শ্রীশ্রীরঘুবীরের জন্য শ্রীমায়ের দেওয়া মিষ্টি তাঁহার হাতে দিয়া প্রথমে রঘুবীরকে এবং পরে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। শান্ত নির্জন স্থান। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি-বিজড়িত লীলা-স্থান দর্শনে মন আনন্দে আপ্লুত হইল।

একটু বিশ্রাম করিয়া তখনই ঠাকুরের জন্মস্থান (ঢেঁকিশাল—এখন যেখানে তাঁহার মন্দির হইয়াছে), তাহার পূর্বদিকে ছোট পুকুর, যাহার পাড়ে ঠাকুরের নিজহাতে রোপিত একটি আমগাছ আছে, যুগীদের শিবমন্দির, হালদারপুকুর ইত্যাদি স্থান—একে একে দর্শন করিতে লাগিলাম। মন অনির্বচনীয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল! ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার এবং একটু বিশ্রাম করিয়া ধারে-কাছে কতক কতক স্থান দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রে আহারের পর মামীমা আমাকে ঠাকুরের ঘরেই রাত্রিবাস করিবার নির্দেশ দিলেন। শুইয়া শুইয়া ঠাকুরের নানা লীলা-খেলার কথা চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে জয়রামবাটী ফিরিয়া মাকে সব কথা বলিলাম। সেদিন জয়রামবাটীতে থাকিয়া পরদিন সকালে ফিরিবার পালা। শ্রীমা ঘরের দাওয়ায় চরণযুগল মাটিতে রাখিয়া বসিয়া আছেন। যাত্রাকালে মাকে প্রণাম করিতেছি; এই দুদিনেই মা বড় আপনার হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে মনে খুব কষ্ট হইতেছে! প্রণাম করিবার সময় মা যে আমার মাথায় কর জপ করিতেছেন—তাহা প্রথমে বুঝি নাই; মাথা তুলিতেই তাঁহার পদ্মহস্ত যখন মাথায় ঠেকিল তখন বুঝিলাম। মা মধ্যে মধ্যে চিঠি দিতে বলিলেন, বিশেষ করিয়া বলিলেন, 'যা ব'লে দিয়েছি তা (অর্থাৎ মহামন্ত্রটি) কাউকে ব'লো না।' তখন বিষয়-বুদ্ধি খুবই কম ছিল, তাই বুঝি মা সতর্ক করিয়া দিলেন। আমি কুলীর সঙ্গে অগ্রসর হইতেছি, আর মা একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া আছেন! কি করুণ সে চাহনি! ক্রমে তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।

ইহার পর প্রায় আড়াই বৎসরের মধ্যে আর শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পাই নাই। চিঠিপত্রাদি তাঁহাকে লিখিতাম, উত্তরও পাইতাম। ১৯০৯ খৃঃ বাংলা ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে উদ্বোধন-বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা প্রথম পদার্পণ করেন। তখন প্রায় প্রত্যহই ঐ বাড়ীতে যাইতাম এবং সুবিধামত দোতলায় গিয়া মাকে প্রণাম করিতাম; কোনদিন বা নীচে থেকেই তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতাম।

বিজ্ঞপ্তি ঃ

কার্তিকের পত্রিকা ঐ মাসের মাঝামাঝি পেঁৗছিবে। তৃতীয় সপ্তাহেও না পাইলে জানাইবেন।—**কার্যাধ্যক্ষ**

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

বোম্বাই ঃ রামকৃষ্ণ মিশন শাখা-কেন্দ্রের ১৯৫৭ ও '৫৮ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৩ খৃঃ প্রতিষ্ঠা-কাল হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ ও বেদান্তের সার্বভৌম ভাব শিক্ষা ও সেবামূলক কর্মের মাধ্যমে বোম্বাই শহরে ও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই কেন্দ্র কর্তৃক প্রচারিত হইতেছে। গত দুই বৎসরে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্‌গণের দ্বারা গীতা, বেদান্ত-দর্শন, উপনিষৎ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বাণী, বাল্মীকি-রামায়ণ ও বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে ৩৩৮টি ('৫৭ খৃঃ ১৬১টি) আলোচনা ও বক্তৃতা-সভার ব্যবস্থা হয়। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বোম্বাই শহরে এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও পাকিস্তানে জনসভায় ১৬০টি ('৫৭ খৃঃ ৫৯টি) বক্তৃতা দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব এবং শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট ও শংকরাচার্যের জন্মতিথি যথারীতি অনুষ্ঠিত ও উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাও সাড়ম্বরে এবং শুচিসুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্তমানে শিবানন্দ-গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৭,৪০০ ; '৫৮ খৃঃ ২,০০০ বই পঠনার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল। পাঠাগারে ৭০টি দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা লওয়া হইয়া থাকে। ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ ছাত্রাবাসে ৮০ জন ছাত্র ভরতি করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৬৫ জন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা দেয় এবং ৪১ জন উত্তীর্ণ হয়।

আশ্রমের দাতব্য চিকিসালয়ে চিকিৎসিতের

সংখ্যা :	১৯৫৭	'৫৮
হোমিওপ্যাথিক বিভাগ	১,৬৬,৯৭৯	১,৩৪,৬৯২
অ্যালোপ্যাথিক "	৪৫,৩৪৭	৩১,১০২
আয়ুর্বেদিক "	১১,৪৮৭	১১,৯০০
বহির্বিভাগে মোট	২,২৩,৮১৩	১,৭৮,৬৯৪
অন্তর্বিভাগে	৫১	২৮

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে রোগনির্ণয়-পরীক্ষাগারে ৮১০ ও ৯১৪টি নমুনা পরীক্ষা এবং এক্স্-রে বিভাগে ৯,৩১৭ ও ৫,০৪৬ জন রোগী পরীক্ষা করা হয়। সাধারণ অস্ত্রচিকিৎসা—২,০৭১ ও ২,৪৪৪টি এবং বিশেষ অস্ত্রচিকিৎসা—১২ ও ৮টি। চক্ষু ও দন্ত বিভাগে '৫৮ খৃঃ ৫,৪৪৮ ও ৪০২ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-জন্মোৎসব

মাদ্রাজ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ২রা ও ৯ই আগষ্ট পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর ৯৭তম শুভ জন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২রা আগষ্ট রবিবার জন্মতিথি-দিবসে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ও ভজনের পর রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ গীতা ও উপনিষদ্ আবৃত্তি করে। অতঃপর নবনির্মিত রান্নাঘর ও প্রশস্ত ভোজনাগারে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ভোগা-রতি ও হোমের পর নরনারায়ণ-সেবা হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজনের পর আয়োজিত সভায় বক্তাগণ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জীবনের বিভিন্ন দিক্ তামিল ও ইংরেজীতে আলোচনা করেন।

৯ই আগষ্ট রবিবার সকালে নূতন ভোজনাগারে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত হয় ; পূজা ও রামনাম-সংকীর্তনের পর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে উহার উদ্বোধন করেন এবং সমবেত ভক্ত নরনারীকে আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন সম্বন্ধে সারগর্ভ একটি ভাষণ দেন।

অপরাহ্নে তামিলে প্রহ্লাদচরিত্র-বিষয়ক হরি-কথার পর স্বামী চিদ্ভবানন্দ বাংলায়, বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরাঘবশাস্ত্রী ইংরেজীতে এবং সভাপতি স্বামী মাধবানন্দজী তাঁহার ব্যক্তিগত স্মৃতি হইতে পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর জীব-নের অনেক ঘটনা বিবৃত করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। সভার কার্য সমাপনান্তে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা এমেচার্স' সুমধুর ভজন গান করেন। সভায় প্রায় এক হাজার নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

সানফ্রান্সিস্কো: প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় বেদান্ত-সোসাইটির নিজস্ব ভাষণগৃহে স্বামী অশোকানন্দ, স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন:

এপ্রিল: মন—চেতন ও অধিচেতন; ধ্যানের ফল; প্রেমের মাধ্যমে জ্ঞান; ধর্ম—ঈশ্বরানুভূতির কলা ও বিজ্ঞান; অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগ; খৃষ্টীয় বনাম বৈদান্তিক দৃষ্টিতে মানুষ; বৈদান্তিক দৃষ্টিতে মৃত্যু; 'আমি'র স্বরূপ; চঞ্চল মন শান্ত করিবার উপায়।

মে: মন ও ইহার অবস্থাসকল; বেদান্তের মহান্ আচার্য শঙ্কর; কিভাবে অনাসক্তি অভ্যাস করিতে হয়; মানুষ ও ঈশ্বরের অজ্ঞাত সম্বন্ধ; তুমিও ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট হইতে পার; ধর্মের বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানের ধর্ম; বিশ্বাস ও ভক্তির গূঢ় অর্থ; আমিই পথ, সত্য এবং জীবন।

জুন: পবিত্রতালাভের উপায়; অনাসক্তি অভ্যাস; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, স্বজ্ঞা; বুদ্ধ ও তাঁহার মানব-ধর্ম; বিশ্বাস যখন শক্তিতে পরিণত হয়। মন কেন তার গতি অনুযায়ী চলে? বেদান্ত ও খৃষ্টধর্ম; মহাজাগতিক জ্ঞান।

জুলাই: স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব; অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্বরূপ; কিরূপে আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারি? ঈশ্বরানন্দের মাধ্যমে জীবনানন্দ; গুরু ও দীক্ষা; মানবীয় চেতনা-রহস্য।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে নলিনীকান্ত বসু

গত ৫ই ভাদ্র, শনিবার সকাল ৭টা ১২মিঃ সময় ৭৯ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য নলিনীকান্ত বসু বাগবাজারে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ৩।৪ মাস যাবৎ শ্বাসকষ্টে এবং বার্ধক্যজনিত পীড়ায় তিনি ভুগিতেছিলেন। শেষ দিন সকালে নিত্যকর্ম সারিয়া তিনি সযত্নে সংরক্ষিত শ্রীশ্রীমায়ের চরণধূলি ও চরণামৃত গ্রহণ করেন এবং ইষ্টনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

১৮৭৯ খৃঃ আশ্বিন মাসে যশোহর জেলার কোলা-দিঘলিয়া গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মাতা পরম ভক্তিমতী ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার মধ্যে বাল্যকাল হইতেই ধর্মভাব লক্ষিত হইত। কলেজে শিক্ষাকালেই তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। জীবিকাহিসাবে কোন চাকরি গ্রহণ না করিয়া তিনি শাল ও সেগুনের কাঠের ব্যবসা করেন। ১৯০৫।৬ খৃঃ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। ইহার পর তিনি শ্রী'ম'-এর সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁহার পুণ্য সঙ্গলাভে ধন্য হন।

এই সূত্রে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের সহিতও পরিচিত হন। ১৯০৭,৮ খৃঃ তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। এই সংখ্যায় অন্যত্র তাঁহার স্মৃতিকথা 'শ্রীশ্রীমায়ের কাছে' প্রকাশিত হইল।

পরলোকে প্রভাময়ী মিত্র

গত ১০ই শ্রাবণ, সোমবার (ইং ২৭শে জুলাই, ১৯৫৯) ভূতপূর্ব জেলা জজ ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের পত্নী সুলেখিকা প্রভাময়ী মিত্র পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের কৃপাধন্যা। ত্যাগ ও সেবার আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিতা ছিলেন।

পরলোকে প্রহ্লাদচন্দ্র বসু

'বসু ব্যানার্জি এণ্ড কোং' নামক কলিকাতার সুপরিচিত অডিট ফার্মের অন্যতম অংশীদার, চার্টার্ড একাউণ্টেণ্ট ও অডিটার প্রহ্লাদচন্দ্র বসু প্রায় দুই মাস কঠিন মূত্রবিকার রোগে ভুগিয়া গত ১-া সেপ্টেম্বর ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মূলকেন্দ্রের এবং বহু শাখা-কেন্দ্রের তিনি হিসাব পরীক্ষক ছিলেন। তাঁহার সরল সুন্দর সহজাত ভক্তিভাব, বন্ধুবাৎসল্য, অমায়িকতা ও সেবাপরায়ণতার জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। তাহার পূর্বনিবাস ছিল ঢাকা জিলার কেওটখালি গ্রামে, দেশবিভাগের পর তিনি হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরে নবনির্মিত সারদাপল্লীতে বসবাস স্থাপন করেন। পল্লীর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করিতে ছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্তা সহধর্মিণী ও পুত্রকন্যাকে আমাদের অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করত প্রার্থনা করি, ভক্তের আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিদেশে ভারতীয় ছাত্রসংখ্যা

ব্রিটেনে :

বিদেশী ছাত্র	৪০০,০০	(কমনওয়েলথ ২৭,০০০)
বিভিন্ন বিভাগে	মোট	ভারতীয়
যন্ত্রশিল্পে	৬ ৬০০	১,১৩৪
শিক্ষাবিজ্ঞানে	৭৩০	৫২
পুরা ছাত্র বা গবেষণায়	৭,০১৩	১,৪৫৭

যুক্তরাষ্ট্রে :

বিদেশী ছাত্র	৪৭,০৪৫	৩,১৯৮

বিষয়ানুযায়ী—ইঞ্জিনিয়রিং ২৩%, হিউ-ম্যানিটিজ ২০%, অবশিষ্ট প্রাকৃতিক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এবং ব্যবসা-পরিচালনায়।

হরপ্পা-ধাঁচের গ্রাম আবিষ্কার

বোম্বাই রাজ্যের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের উদ্যোগে রাজকোট জেলার শ্রীনাথগড়ের নিকট সম্প্রতি একটি হরপ্পা-ধাঁচের গ্রাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাদর নদীর তীরে ১০০০ ফুট × ৩০০ ফুট পাথরের প্রাচীরঘেরা গ্রামটি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান এখানে মিলিবে। নদীর তীরে এরূপ অনেকগুলি ছোট ছোট বসতি ছিল।

সর্বপ্রাচীন বসতির ও কৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায় উচু মৃত্তিকা প্রাচীরের অভ্যন্তরে, সম্ভবতঃ এই প্রাচীর বাঁশের সাহায্যেই খাড়া করা হইত। মাটির উপর চাটাইএর ছাপ দেখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন বাঁশের চাটাইএ মাটি মাখাইয়া এই সব ঘরের ছাদ করা হইত।

এই প্রাচীন অধিবাসীরা নরম পাথরের দানা প্রস্তুত করিয়া তাহার মালা গাঁথিতে পারিত, শঙ্খ ও তামার বালা পরিত, একটু ভারী পাথরের চৌরা আধারের বাটখারা ব্যবহার করিত। বাটি থালা ও কলসীর কানাগুলি দুটিদার। আর এ বিশেষ ধরনের মাটির প্রস্তুত পাত্র দেখা যায়, এক গোছা সোনার আংটি ও এক জোড়া সোনার ইয়ারিং এস্থানে পাওয়া গিয়াছে।

খননের দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নততর সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়: বাড়ীঘর মাটি ও পাথরের, স্নানাগার রান্নাঘর এবং বারান্দা দেখা যায়, জ্যামিতিক আকৃতি বিশিষ্ট মাটির বাসন, ছোট ছোট পাথরের ফলা, তামার অস্ত্র—যথা বাটালি বঁড়শি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

তৃতীয় পর্যায়ে দেখা যায়—বাড়ীঘর সম্পূর্ণভাবে পাথরের তৈয়ারী এবং বাসনপত্র প্রভাস পাটনে সোমনাথের নিকট আবিষ্কৃত বাসনপত্রের অনুরূপ।

উৎসবে ও নিত্যপ্রয়োজনে
শতাব্দীর সুপরিচিত
লক্ষ্মীবিলাস
সর্ব্বঋতুর উপযোগী তৈল
এম,এল,বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস • কলিকাতা-৯

Get more strength
out of your
FOOD
BE WISE TO PICK UP
Vanasda
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMIN A & D
BERAR OIL INDUSTRIES
AKOLA
BOMBAY
MADE FROM VEGETABLE OILS ONLY

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সরল রাজযোগ—৪র্থ সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি বুলের বাড়ীতে কয়েক জন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্ত্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ০'৫০।

পত্রাবলী—১ম ভাগ। অভিনব পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। প্রায় ৫৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামিজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজান হইয়াছে। পরিচয় এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবিসম্বলিত। মূল্য ১ম ভাগ ৫৲; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪'৫০।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৩শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামীজির ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৬৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ৫৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪'৬৫।

দেববাণী—৮ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান' নামক স্থানে কয়েক জন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন তাহার একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১'৯০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৩য় সংস্করণ। শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিক-ভাবে সন্নিবেশিত। ১৭০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'৫০।

বিবেক-বাণী—১৬শ সংস্করণ। আচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজীর উপদেশাবলী। স্বামীজির বাষ্টসম্বলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। মূল্য ০'৪০।

কথোপকথন—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামীজির ছবি-যুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১'১৫।

মদীয় আচার্য্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১০ম সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষাসম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামিজীর বিবৃতি। মূল্য ০'৭৫; উঃ-গ্রাঃ-পক্ষে ০'৭০।

ভারতীয় নারী—১২শ সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান আদর্শ, পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজির মনোরম ছবি-সম্বলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১২০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১'১৫।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান—৭ম সংস্করণ, ১৩১ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদান্ত-মত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে আর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ—যেগুলি না বুঝিলে ধর্ম জিনিষটাকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ১'২৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১'১৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৪শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়ভরতের-উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট ও ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। মূল্য ১'২৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১'১৫।

সন্ন্যাসীর গীতি—১৩শ সংস্করণ। স্বামীজি-রচিত 'Song of the Sannyasin' নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ০'১৫।

পওহারী বাবা—৯ম সংস্করণ। গাজীপুরের বিখ্যাত মহাত্মা পওহারী বাবার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। স্বামীজির হাফটোন ছবিযুক্ত। মূল্য ০'৫০।

হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ—৫ম সংস্করণ, ৮৮ পৃষ্ঠা। ইহাতে হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা, হিন্দুধর্মের ক্রমাভিব্যক্তি, ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর ও ডাঃ পল ডয়সেন সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মূল্য ০'৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ০'৭০।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৪র্থ সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০'৪০, উদ্বোধন গ্রাহক-পক্ষে ০'৩৫ আনা।

অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৪র্থ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। এই পুস্তক পাঠে চরিত-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ১.২৫।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য প্রণীত—৪র্থ সংস্করণ; আচার্য্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲ মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা—৫ম সংস্করণ। স্বামী অরূপানন্দ প্রণীত। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা পুস্তক হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। মূল্য ০.৪০।

ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন কথা। মূল্য ২৲ টাকা।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—২য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। প্রায় ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩.৫০।

শিবানন্দ-বাণী—১ম ভাগ—৪র্থ সংস্করণ, ২য় ভাগ—২য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ সঙ্কলিত মূল্য প্রতি ভাগ ২.৫০।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। প্রথম ভাগ—(ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর) ৫ম সংস্করণ। দ্বিতীয় ভাগ—(ছান্দোগ্য) ৪র্থ সংস্করণ। তৃতীয় ভাগ—(বৃহদারণ্যক) ৩য় সংস্করণ। ইহাতে উপনিষদের মূল, সংস্কৃত, অন্বয়মুখে বাংলা প্রতিশব্দ, সরল বঙ্গানুবাদ এবং আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যানুযায়ী দুরূহ বাক্যসমূহের টীকা প্রভৃতি আছে। সুদৃশ্য ছাপা, কাপড়ের মনোরম বাঁধাই, ডবল ক্রাউন—১৬ পেজি, প্রায় ৪৬৫ পৃষ্ঠা। মূল্য—প্রতি ভাগ ৫৲ টাকা।

সাধু নাগ মহাশয়—৯ম সংস্করণ। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ১.৫০ মাত্র।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ প্রণীত (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত) অতুলনীয় সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত 'গোপালের মা' এর আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ০.৫০।

নিবেদিতা—১৩শ সংস্করণ। শ্রীমতী সরলা বালা দাসী প্রণীত। স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা। মূল্য ০.৭৫।

সৎকথা—স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক সংগৃহীত—৩য় সংস্করণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ (শ্রীলাটু) মহারাজের উপদেশাবলীর সংকলন। মূল্য ২৲ টাকা।

যোগচতুষ্টয়—স্বামী সুন্দরানন্দ প্রণীত। জ্ঞান; কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগের সংক্ষিপ্ত সরল বিবরণ। মূল্য ২৲ টাকা।

বেদান্তদর্শন—১ম খণ্ড—চতুঃসূত্রী। শাঙ্কর ভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ, রত্নপ্রভা টীকা, ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্বলিত। প্রায় ২৪৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ টাকা।

স্তবকুসুমাঞ্জলি—৫ম সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত—বৈদিক শান্তিবচন, সূক্ত, প্রার্থনা ইত্যাদি বিবিধ সংস্কৃত স্তোত্রাদির অপূর্ব্ব সঙ্কলন। সংবাদপত্রসমূহে উচ্চ প্রশংশিত। মূল সংস্কৃত, অন্বয়, অন্বয়মুখে সংস্কৃতের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং মূলের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৩৲ টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৬ষ্ঠ সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ০.৬৫।

আগে চলো—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। কিশোরদের জন্য লেখা। তরুণমনে সুনীতি, দেশাত্মবোধ, সেবা, আদর্শনিষ্ঠা এবং ধর্মপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক যৌবনোন্মুখ ছেলেমেয়েদের এই বইখানি পড়িতে দেওয়া উচিত। মূল্য ১.৫০।

হিন্দুধর্ম পরিচয়—১ম ও ২য় ভাগ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সরল কথায় হিন্দুধর্মের মুখ্য বিষয়গুলির সহিত পরিচিত চেষ্টা এই বই দুখানিতে করা হইয়াছে। মূল্য ১ম ভাগ ০.৫০, ২য় ভাগ ০.৭৫।

দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য ও পূজা-পদ্ধতি—স্বামী কৈবল্যানন্দ প্রণীত। মূল্য ১ম ভাগ (পরিবর্দ্ধিত ৪র্থ সংস্করণ ০.৮৮, ২য় ভাগ (৩য় সংস্করণ) ১.৫০।

ঠাকুর এবার এসেছেন

ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। এবার বাঁশ ও ঘাস ছাড়া যার ভেতরে একটু সার আছে সেই চন্দন হবে। তোমাদের ভাবনা কি? ..

সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ-মন ভাল থাকে। কাজ করতেই হয়। কর্মেই কমপাশ কাটে। কাজ ছাড়া থাকা ঠিক নয়। ....

—শ্রীমা

• • •

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী অদ্বয়ানন্দ; ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, এম. আই. প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক— স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা—৩

৬১তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৬৬

বার্ষিক মূল্য ৫৲
প্রতি সংখ্যা ০·৫০

দীপ্তি
লক্ষ লক্ষ গৃহ আলোকিত করে
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উদ্বোধন, কার্ত্তিক, ১৩৬৬

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বর্ষারম্ভ। বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হইলে ভাল হয়। **বার্ষিক মূল্য** (ডাক মাশুল সহ) **৫৲ ও ষাণ্মাসিক ৩৲**। প্রতি সংখ্যা ০·৫০।

বিশেষ কারণ না থাকিলে প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণের নিকট পত্রিকা প্রেরিত হইয়া থাকে। পত্রিকা না পাইলে সেই মাসের ২০ তারিখের মধ্যেই সংবাদ দিবেন।

রচনাঃ—ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, ইতিহাস, সামাজিক উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। **পত্রোত্তর ও প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত পাঠানো হয় না। সাধারণতঃ ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। ঠিকানাসহ স্বাক্ষরিত প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 'উদ্বোধনে' **সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক** পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপন ঃ—বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু মনোনয়নের সম্পূর্ণ অধিকার কার্যাধ্যক্ষের উপর থাকিবে। বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের পর পরবর্তী মাসে প্রকাশের জন্য কোন বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না। বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছান দরকার। "উদ্বোধনে"র চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।**

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের
কতিপয় গ্রন্থ

প্রত্যক্ষদর্শী গ্রন্থকারের রচনাবলী বর্ণনামাধুর্যে জীবন্ত, মৌলিকত্বে বিশিষ্ট, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-যুগ ইতিহাসের পক্ষে অপরিহার্য—একটি অমূল্য জাতীয় সম্পদ।

১। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান (২য় সংস্করণ) ৩'৫০
২। মাতৃদ্বয় (গৌরী মা ও গোপালের মা) '২৫
৩। জে. জে. গুডউইন ১'০০
৪। দীন মহারাজ '৫০
৫। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ ১'০০
৬। গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) '৫০
৭। মাষ্টার মহাশয় '৭৫
৮। তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান ২'০০
৯। শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান (২য় সংস্করণ) '৫০
১০। শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী ৩'০০
১১। গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান ৫'০০

স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী

গ্রন্থকার বাল্যে অগ্রজের মনোগতির কথা ও বংশের বিশেষ ভাবধারা যাহা বীরেশ্বর বিবেকানন্দ চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল সেই সকল বিষয়ে এই গ্রন্থে বহু নূতন তথ্য সন্নিবেশ করিয়াছেন। মূল্য: ১'২৫

১২। কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ) ২'০০
১৩। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ) ২'৭৫
২য় খণ্ড (২য় সংস্করণ) ২'৭৫
১৪। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ) ৩'২৫
১৫। বদরীনারায়ণের পথে ২'২৫
১৬। মায়াবতীর পথে ১'০০
১৭। ব্রজধাম দর্শন ১'৫০
১৮। নিত্য ও লীলা ১'০০

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

নূতন ছবি !! নূতন ছবি !!

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত বড় সাইজের ছবি

বিখ্যাত অষ্ট্রিয়ান চিত্রকর ফ্র্যাঙ্ক ডোরেক অঙ্কিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ২০" × ১৫" সাইজের ছবি

মূল্য—০'৭৫

ঐ ছোট ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ১০" × ৭½" সাইজের ছবি

মূল্য—০'২৫

উদ্বোধন কার্যালয়

১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা—৩

ডায়া-পেপ্সিন্
হজমশক্তি বজায় রেখে স্বাস্থ্যের উন্নতি করে
ইউনিয়ন ড্রাগ · কলিকাতা

কে তুমি মা?

কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে
আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোর্মিভঙ্গৈঃ।
শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাম্
মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে॥

[স্বামী বিবেকানন্দ-কৃত 'অম্বাস্তোত্রম্'—১ম শ্লোক]

কে তুমি মা, মঙ্গলময়ি, কল্যাণকারিণি! এক হাতে সুখ,
আর এক হাতে দুঃখ বিতরণ করিতেছ,—কে তুমি?

সংসার ও সমাজ অভাবনীয় ঘটনাস্রোতে নব নব প্রবল
চিন্তাতরঙ্গসম্পাতে মুহুর্মুহুঃ আঘূর্ণিত—বিপর্যস্ত!

সর্বদা নানা প্রকারে ভগ্ন শান্তিকে জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত
করিতেই কি তুমি আজ এত যত্নপর হইয়াছ?

* * *

বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্বাঘাতজনিত বৈষম্য দূরীভূত করিয়া
সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই কি শান্তি?

শুভ ও অশুভ শক্তির অফুরন্ত সংগ্রাম—
সেও কি তোমারই ইচ্ছা?

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গকে আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

বিজয়া

জীবন সংগ্রাম এবং সংগ্রামই জীবন। সংগ্রাম শেষে হয় সিদ্ধি, নয় মৃত্যু! সিদ্ধি—সে তো এক উচ্চতর জীবনের সূচনা, আর মৃত্যু—সে তো নবতর এক জীবনের প্রস্তুতি।

যে জীবন আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে বিস্তৃত, তার সবখানিই সংগ্রাম; কোথাও এতটুকু শান্তি নাই, এতটুকু স্বস্তি নাই। সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন ঘোষণা করে তার সংগ্রাম পৃথিবীর এই পরিবেশের সহিত, প্রতিকূল আবহাওয়ার সহিত; প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের আস্ফালন—সে তার রণহুঙ্কার,—বীরভোগ্যা বসুন্ধরাকে জয় করিয়া ভোগ করিবার! অভিজ্ঞ প্রৌঢ়ের ধীর পদবিক্ষেপ জীবনযুদ্ধে জয়লাভেরই শেষ কৌশল!

*　　　*　　　*

ব্যক্তিগত জীবনে যাহা সত্য বলিয়া অনুভূত জাতিগত জীবনেও তাহার সত্যতা প্রতিভাত! নবীন জাতিসমূহের মনে শৈশবের আশা ও ভয়, তরুণ জাতিগুলি দুর্বার, পরপীড়া-পরায়ণ, যৌবনমদে মত্ত; প্রবীণ জাতিসমূহ ধীর স্থির, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি একাধারে তাহাদের দুর্বলতা ও শক্তি!

জীবন যখন সংগ্রাম, তখন অবশ্যই সেখানে দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষ ঘটিতেছে। এই বিপরীত শক্তিদ্বন্দ্ব কখনও বাহিরে শীতাতপরূপে দেখা দিতেছে, কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগরূপে, বন্যা মহামারীরূপে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে; কিন্তু মানুষ স্বীয় শক্তিবলে বুদ্ধিবলে সে সকল নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রতিকূলকে অনুকূলে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

অন্তর্জগতেও এই সংগ্রাম দেখা দেয় সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তিরূপে—ইহাই পুরাণাদিতে দেবাসুর সংগ্রামরূপে বহুভাবে রূপায়িত! সত্ত্বগুণান্বিত দেবতাশক্তি রজস্তমোগুণাশ্রয়ী অসুর-শক্তির নিকট পরাভূত। ইহা তো পুরাণের কোন বিস্মৃত ঘটনা নয়, ইহা তো আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত ঘটনা! কি সংসারে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে—সর্বত্রই দেখা যায় সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে অন্যায়েরই জয়, ন্যায় পরাজিত! অধর্মেরই অভ্যুদয়, ধর্ম রাহুগ্রস্ত! কিন্তু দেব-স্বভাবের মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে উচ্চতর এক শক্তিতে বিশ্বাস—অসুর-প্রকৃতিতে যাহা অজ্ঞাত! ন্যায়ানুগ-রোষপরায়ণ (righteous indignation) দেবগণের সম্মিলিত শক্তি অবশেষে দম্ভ-দর্প-অভিমানযুক্ত অসুরশক্তিকে বিপর্যস্ত করিতে সমর্থ হয়! কখন বা দেখা যায়—উৎপীড়িত দেবগণের কাতর আহ্বানে স্বয়ং মহাশক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন দুর্ধর্ষ অসুরশক্তি বিধ্বস্ত করিতে। উচ্চতর শক্তির কাছে নিম্নতর শক্তি হয় পরাজিত; সূক্ষ্ম শক্তির কাছে স্থূল শক্তি হয় পরাভূত।

জয় পরাজয় বারংবার হয়, কিন্তু সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে আসে বিজয়োৎসব, সিদ্ধির মহানন্দ; তাহারই জন্য প্রয়োজন শক্তির সাধনা।

মানুষের যাবতীয় দুঃখের মূলে অজ্ঞতা, তাই জ্ঞানকেই বলা হইয়াছে শক্তি! জ্ঞানের

সহায়েই মানুষ পারে দুঃখজয়ের অভিযানে অগ্রসর হইতে। জ্ঞান তাহার মনের বল, হাতের অস্ত্র। জ্ঞানের সহায়ে মানুষ জয় করে জীবন-পথের সকল বাধা, সকল বিপদ। জগতের ও প্রকৃতির নিয়মানুসারেই দিনের পর রাতের মতো, জোয়ারের পর ভাঁটার মতো আসে সুখের পর দুঃখ; এই জ্ঞান যাহার আছে, সে কি রাত্রি আসিলে কাঁদিতে বসে, না ভাঁটার সময় হাল ছাড়িয়া দেয়, না দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হইলে সে জীবনের সকল আশা ছাড়িয়া দেয়?

জ্ঞানশক্তি-সম্পন্ন মানুষ বিপদের সময়ই বেশি হুঁশিয়ার হয়, এবং পৌরুষ-সহায়ে সংগ্রাম করিয়া বিপদ অতিক্রম করে।

নৈরাশ্য নয়—অনন্ত অফুরন্ত আশা যে জীবনের জয় অনিবার্য, ইহাই মানুষকে জয়ের পথে আগাইয়া লইয়া যায়।

এই জ্ঞানের সাধনাই, এই জিগীষা ও আশা-শীলতাই হিংস্রজন্তু-ভীত মানবকে গুহা হইতে টানিয়া আনিয়া নদী-উপত্যকায় কৃষ্টির ও সভ্যতার পত্তন করাইয়াছে; শুধু মাত্র পশুবৎ প্রাকৃতিক জীবনে তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে দেয় নাই, সাংস্কৃতিক জীবনের উচ্চতর গতির অভি-মুখে লইয়া গিয়াছে। জয় হইতে জয়ের পথেই তাহার এই জয়যাত্রা! পরাজয় শুধু তাহার জয়ের পথ দীর্ঘতর করিয়াছে।

যে মানব আজ সূক্ষ্ম বিজ্ঞান ও জটিল যন্ত্রের সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ জয় করিয়া চন্দ্রলোকে গ্রহলোকে পঁহুছিবার সাধনায় সিদ্ধপ্রায়, সে কি পারিবে না সূক্ষ্মতর বিজ্ঞান-সহায়ে মনের নিম্নাভিমুখী পাশব প্রবৃত্তি জয় করিয়া শান্ত উর্ধ্বলোকে উঠিতে? সে কি পারিবে না শক্তি-সহায়ে শান্তিলাভ করিতে? বিজাতীয় জন্তুভয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সে কি চিরদিন সজাতীয় জন্তুভয়ে ভীত হইয়া জীবন যাপন করিবে? সে কি কোন শক্তিবলে মানুষের অন্তর্নিহিত সেই পশুকে নির্জিত করিয়া সংসারে সমাজে ও রাষ্ট্রে চির শান্তি স্থাপন করিতে পারিবে না?

শক্তি ও শান্তি—বিপরীতধর্মী, সমধর্মী না পরিপূরক? না কি শক্তিরই অপর নাম শান্তি? ক্ষমতা যাহার আছে ক্ষমাগুণ তো তাহারই অলঙ্কার। বাম করে যাঁহার অসিমুণ্ড, তাঁহারই দক্ষিণ করে শোভা পায় বরাভয়।

কল্যাণশক্তি-সহায়ে বিপরীত অশান্তিকারী শক্তি বশীভূত করিয়া মানুষ শান্তির অধিকারী, সিদ্ধির অধিকারী হইতে পারে। মহাশক্তি সংগ্রামে অজিতা—অপরাজিতা, তাঁহারই সহস্র নামের দুটি নাম জয়া, বিজয়া! যে কেহ শুদ্ধভাবে সাত্ত্বিকভাবে এই মহাশক্তির আরাধনা করে অন্তরের ও বাহিরের সংগ্রামে সে অজিত ও অপরাজিত। বিজয়ার এই মহাভাব—'মহাশক্তির শরণাগত' ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমরা অগ্রসর হই জীবনের বিজয়াভিযানে

রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যাসেবাকার্য ও আবেদন

সম্প্রতি অত্যধিক বৃষ্টির ফলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বন্যায় ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বন্যাপীড়িতদের যে সেবা করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মুখ্যকেন্দ্র বেলুড়ের অর্থসাহায্যে মিশনের শিলং শাখাকেন্দ্র জুলাইএর প্রথম সপ্তাহ হইতে আগষ্টের শেষ পযন্ত আসামের কামরূপ জেলার রঙ্গিয়া বরখোলা অঞ্চলে বন্যাসেবাকার্য চালাইয়াছেন। শিলচর কেন্দ্রও ঐ শহরে জুনের শেষ হইতে জুলাইএর শেষ পর্যন্ত উক্ত সেবাকার্য করিয়াছেন। মিশনের করিমগঞ্জ কেন্দ্র কাছাড় জেলার শনবিল অঞ্চলে বন্যার্ত গরীব চাষীদের মধ্যে জুলাই মাস হইতে টেষ্ট রিলিফ কার্য সফলতাপূর্বক করিতেছেন।

মিশনের বোম্বাই শাখা রাজকোট আশ্রমের সহযোগে জুলাইএর শেষ সপ্তাহে কচ্ছের ৪টি তালুকে সেবাকার্য করিয়াছেন। ভুজ শহরকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া ৪টি শহর ও ৪১১টি গ্রামে এই সেবাকার্য চলিতেছে। কিছুদিন খাদ্যসামগ্রী বিতরণের পর সেপ্টেম্বর হইতে ঘর মেরামত বা পুনর্নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। সমগ্র কাজটিতে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ইতিমধ্যে বোম্বাই রাজ্যের সুরাট জেলা ভীষণভাবে বন্যাক্রান্ত হওয়ায় সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে সেখানেও ব্যাপকভাবে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

বাংলায় মিশনের ২৪ পরগনা জেলায় রহড়া, বেলঘরিয়া, নরেন্দ্রপুর শাখাগুলি ঐ ঐ অঞ্চলে বেলুড়ের আর্থিক সাহায্যে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হইতে বন্যার্তদিগের সাময়িক সেবা করিয়াছেন। বালি থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তা উদ্বাস্তু কলোনীতেও মিশনের সারদাপীঠ শাখা সেবাকার্য করিয়াছেন। বর্তমানে হাওড়ার ডোমজুড় অঞ্চলে, ২৪ পরগনার বোড়াল, নালুয়া বেড়গুম এবং পানাকো ইউনিয়নে এবং মেদিনীপুরের কুকড়াহাটী ইউনিয়নে অনুরূপ সেবাকার্য চলিতেছে।

বন্যার ধ্বংসলীলার তুলনায় আমাদের লোক ও অর্থবল অকিঞ্চিৎকর। তাই সহৃদয় দেশবাসিগণের নিকট আমরা এই কার্যের জন্য অর্থভিক্ষা করিতেছি। সাহায্য—'সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া'—এই ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে।

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ, ১৫.১০.৫৯

চলার পথে

'যাত্রী'

৺পুরীধাম থেকে ভুবনেশ্বরে পৌঁছলাম।

শরতের আকাশ নীলে নীল। মাঝে মাঝে বিরাট হংসবলাকার মতো সাদামেঘ আকাশের দূরবিসারী বিস্তৃতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তা ছাড়া, এক অপূর্ব প্রসন্ন আনন্দ এখানকার পুরাতন স্মৃতির সঙ্গে বিস্ময়ে জড়িয়ে রহস্যময়! মন, রুচি ও প্রবণতা থাকলে এই সবের অনন্য স্বাদ, মনকে কেমন এক অর্থ-ব্যাপ্তিতে ভ'রে তোলে। এদের সঙ্গে আত্মীয়তাও গ'ড়ে ওঠে। তবে এ ছবি দেখার চোখ চাই—অনুরাগ চাই। পৃথিবী সবচেয়ে যে রঙে বেশী রঙীন তা হচ্ছে অনুরাগের রঙে। অনুরাগ বাদ দিয়ে দেখ, সব কিছুই তা'হলে আলুনি লাগবে।

ভাবছিলাম, আমার দুদিকেই তো হাজার, দু হাজার বছরের পুরাকীর্তি ও ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে। পুরাতন স্মৃতির এই আদিহীন, অন্তহীন অস্তিত্বের মহাসমুদ্রে আমি তো এক নগণ্য বুদ্বুদ। আমার এই ক্ষণিকের জীবন ও নিমেষের অস্তিত্ব রেখে পলকে কোথায় মিলিয়ে যাব! তবুও এই দিগন্ত ছোঁয়া সুপ্রাচীন মঠ-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের দেশে কি আহ্বানে এলাম, তা কে জানে? ঐ তো সুমুখেই 'ধবলগিরি', স্থানীয় লোকের কাছে যা 'দউলি' নামে পরিচিত। ওর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক সর্বস্বপণ ও পূর্ণাহুতির ইতিকথা। ইতিহাসের সেই বাস্তব স্বপ্নটাকেই এখানে একটু নিংড়ে দিই :

কলিঙ্গ বিজয় ক'রে অশোক ফিরছেন। পর পর যুদ্ধজয়ের উন্মাদনায় রক্তে তাঁর কেমন এক নেশা ধরেছে। তাঁকে স্থির থাকতে দেয় না, ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আবার মাঝে মাঝে, যুদ্ধের মর্মান্তিক হাহাকার অশোককে বিমনা ক'রে তোলে। কিন্তু ঐ ক্ষণিক ঔদাসীন্য মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। দেহের রক্তে মরণ-মারণের লেলিহান জিহ্বা পরক্ষণেই আবার রক্তাস্বাদনের জন্য জেগে ওঠে। চণ্ডাশোক তাই ছোটেন রণোন্মাদনার ঘোরে—দেশ থেকে দেশান্তরে। সেই চণ্ডাশোক আজ পৌঁছেছেন 'ধবলগিরির' প্রান্তরে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। রক্ত-রশ্মির তপ্ত আভা সন্ধ্যার কোমলতায় তার প্রখরতা হারাল। 'বেদনার আবির মেখে সূর্যের আহ্নিক যাত্রা' সেদিনের মতো হ'ল শেষ। আত্মভুক হিংসার আগুন সব মন থেকেই বোধ হয় ঐ সময়ে নিভে যেতে চায়। অশোকের মনেই বা ঐ ক্ষণের সন্ধ্যা কি খবর জানিয়েছিল, তা কে জানে! কিন্তু এই সন্ধিক্ষণেই আশ্চয এক ব্যাপার ঘটে গেল :—

অশোক তাঁর সমস্ত সৈন্যদের সে-রাতের মতো বিশ্রাম নিতে ব'লে নিজেও বিশ্রামের জন্য তাঁর তাঁবুর মধ্যে যাবেন এমন সময় শুনতে পেলেন, অপূর্ব সন্ধ্যা-আরাধনার সুর—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।'—চমকে উঠে, পাশেই দণ্ডায়মান

সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কি সুর ভেসে আসছে?' সেনাপতি বললেন—কাছেই বৌদ্ধবিহারের শ্রমণদের গান।

অশোক—'ওরা ওখানে কি করে? আমি এসেছি, আমি দুর্ধর্ষ সম্রাট অশোক! আমার পৌরুষের, আমার বীরত্বের কথা, আমার ধ্বংসের রুদ্র-মূর্তি ওদের জানা নেই বুঝি? চল, ওদের প্রধানের সঙ্গে কথা ব'লে ওদের ঐ বিহার ধ্বংস ক'রে দেবার ব্যবস্থা ক'রে আসি।'

অশোক ও তাঁর সেনাপতি চললেন। তাঁর জীবনের এ এক অদ্ভুত অভিযান! এই অভিযানই অশোকের মনে তাঁর অতীত কীর্তির জন্য আক্ষেপ ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য এক আনন্দময় প্রস্তুতির প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই জীবন্ত কাব্যের আখ্যায়িকার আবার সূত্র টানি:

অশোক এসে দাঁড়ালেন সঙ্ঘস্থবিরের সম্মুখে। বিশাল প্রান্তরে বাতাস ব'য়ে চলেছে হু হু ক'রে। আকাশে চাঁদ নেই। তারাভরা আকাশের বুকে কেমন এক আন্তর জ্যোতি প্রকাশ পাচ্ছে। আর চারিদিকের নিবিড় প্রশান্তি প্রকৃতিকে রেখেছে পেলব ক'রে। এমন সময়ে দুর্দান্ত অশোকের আহ্বানে সঙ্ঘ-নেতা এসে দাঁড়ালেন। এতটুকু ভয়ও তাঁকে স্পর্শ করেনি। আর ঐ ধীর, স্থির, স্মিতহাস্যে ভরা, ভাস্বর-তনু সঙ্ঘনেতাই তাঁদের প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙলেন। ঊর্ধ্বে একবার কাকে যেন দেখলেন, একবার অন্তরের অনুমতিও নিলেন, তারপর মধুক্ষরা ভাষায় প্রশ্ন তুললেন:

"আচ্ছা সম্রাট, তোমার এই বিধ্বংসী লোকক্ষয়কারী অভিযানে তুমি তোমার নিজের মনে আনন্দ পেয়েছ তো? পেয়েছ তো এরই মাঝে তোমার জীবন-জিজ্ঞাসার সব ক'টি প্রশ্নের উত্তর? মনুষ্যদেহের রক্ত বন্যায় তোমার অন্তর-পদ্ম সৌন্দর্যে লাল হ'য়ে ফুটে উঠেছে তো?"

এ কি প্রশ্ন! অশোক নিস্তব্ধ; তাঁর ঔদ্ধত্য নিশ্চল, তাঁর আসুরিক বীরত্বও আজ কেমন এক ক্লীবত্বায় নির্জীব। তাঁর তখন মনে হচ্ছে, কে যেন তাঁর অন্তরের এতদিনের চাপা-কান্নার উৎসকে দিয়েছে খুলে! তিনি যেন এই শ্রমণের কাছে হয়েছেন বালক, শিশু—একেবারে অসহায় শিশু! অশ্রু ঝরানো চোখে কেমন এক অস্ফুট শব্দ উঠল অশোকের কণ্ঠে—কিন্তু তা আর স্পষ্ট ক'রে বোঝা গেল না। শ্রমণ তখন এগিয়ে এসে অশোককে জড়িয়ে ধরলেন—এক অনাস্বাদিত আত্মিক দ্যুতি অশোকের সমস্ত মন উদ্ভাসিত ক'রে দিল। চণ্ডাশোক সেই মুহূর্তেই হ'য়ে গেলেন ধর্মাশোক!

তাই বলি পথিক, এই মাহেন্দ্রক্ষণ না এলে আমরাও আমাদের সত্যকার মূল্য, যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পারি না। ঐ সত্য-স্বরূপ বুঝবার জন্যই তো আমাদের সর্বদাই চলতে হবে—তাই চল পথিক; তোমার জীবনের ঐ মৃত্যু-তীর্থ পর্যন্ত অনলস ভাবে চল। চল, আশ্বাস নিয়ে, ভরসা রেখে। দেখবে তোমার মধ্যেকার চণ্ডাশোকও একদিন ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

পথ-নির্দেশ

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

ঠাকুর এবার এসেছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয় করতে। তিনি বলেছেন, যে নামেই তাঁকে ডাকো সবই সেই এক জায়গায় পৌঁছায়। সংসারী মানুষকে তিনি আবার আশ্বাস দিয়ে বলেছেন: ঈশ্বরকে আরাধনা করার জন্য সকলের পক্ষে সংসার ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না, কর্মের মধ্যে থেকেও তাঁকে লাভ করা যায়, যদি তুমি আসক্তি-মুক্ত হ'য়ে খানিকটা মন তাঁর দিকে দিতে পার! একটি হাতে তাঁর চরণ ছুঁয়ে থেকে আর এক হাতে কাজ ক'রে যাও। ঠাকুর আবার কত সহজ ক'রে তাই বলেছেন—যখন তুমি কাঁঠাল ভাঙো, তখন যদি হাতে একটু তেল মেখে নাও, তাহলে যেমন হাতটায় আঠা লাগতে পারে না, তেমনি মনটাকে যদি তাঁর দিকে ফিরিয়ে রেখে আসক্তিশূন্য ভাবে শুধু কর্মের জন্যই কর্ম ক'রে যাও তাহলে জানবে তিনি তোমার সহায় আছেন, এই জাগতিক সুখ দুঃখ তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না।

তিনি তো আমাদের নিয়ত আকর্ষণ করছেন, যেমন চুম্বক একটা ছুঁচকে টানে; কিন্তু সেটাতে যদি মাটি মাখানো থাকে, কিছুতেই সে তখন চুম্বকের কাছে যেতে পারবে না, তেমনি মহামায়ার মায়ায় রজঃ ও তমোগুণ আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে থাকে ব'লে আমরা সে ডাক শুনতে পাই না, সে আনন্দময় জ্যোতি দেখতে পাই না।

সংসারে যা কিছু আমরা 'আমার আমার' ব'লে মনে করি—যেমন এই স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সুখ, ঐশ্বর্য—এ সবের এতটুকু ক্ষয়-ক্ষতিতে কত ব্যথা পাই; কিন্তু সবই যদি তাঁর জিনিস ব'লে মনে করতে পারি! এ সবের জন্য যা করছি সবই তাঁর কাজ ক'রে যাচ্ছি, আমার কিছু নয়, একমাত্র তিনি আমার,—একান্ত আমার, আমার প্রিয় হ'তে প্রিয়তম! এই অনুভূতির যে অখণ্ড আনন্দ, সেই আনন্দের নেশায় মন তখন ডুবে থাকে, তখন নশ্বর জগতের ক্ষয়-ক্ষতি সামান্য ধূলা-মাটির মতো ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায়।

সন্তান কোন অন্যায় কাজ করলে মা যেমন তারই মঙ্গলের জন্য কঠিন ভর্ৎসনা করেন, আঘাত করেন; আবার সেই মায়েরই গলা জড়িয়ে ধ'রে সন্তান মাকেই 'মা, মা' ব'লে ডাকে, মায়েরই কাছে কাছে থাকে। তেমনি ঈশ্বরও আমাদের মনের জড়তাকে আঘাতে আঘাতে ভেঙে দেন, নয়তো সুখের মধ্যে মজে থেকে আমরা সেই চরম চাওয়া পাওয়াকে ভুলে যাই, তাঁর থেকে বহু দূরে সরে যাই, তাই তিনি মায়ের মতন আমাদের ব্যথা দিয়ে তাঁকে স্মরণ করান, কাছে ডাকেন।

ঠাকুর এবার তাই মাতৃভাবেই সাধনা করেছিলেন, এই ভাবেই তাঁকে সহজে কাছে পাওয়া যায়। সাধক রামপ্রসাদও মধুরতম মাতৃভাবে তাঁকে ডেকেছেন, তাঁকে কাছে পেয়েছেন! সেই 'মায়ের' সঙ্গেই যত মান অভিমান, হাসি কান্না, ছিল সাধক রামপ্রসাদের। কখন তাই অভিমান ক'রে বলছেন, 'মা, আমায় লোহা পেটা করলি কত।' আবার কখন পরম বিশ্বাসে বলছেন: আমি 'জয় কালী জয় কালী' ব'লে যাব চলে। শমন তোরে ভয় করিনে।—এই যে ঈশ্বরকে একান্ত আপন জন ব'লে মনে প্রাণে উপলব্ধি

করতে পারা, এ কি সবার হয়? তবে চেষ্টা করো, নিশ্চয় তাঁর কৃপা পাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সকলভাবে তাঁর উপাসনা ক'রে, ঈশ্বরের শাশ্বত সত্তা উপলব্ধি ক'রে তবে সকলকে সেই অমৃত বিতরণ করতে দু হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জ্ঞানী, মূর্খ—সকলের জন্য ঠাকুরের উদার অভয়-বাণী: ওরে তোরা যে পথ দিয়েই চলিস, সকল পথ মিলেছে শেষে একই জায়গায়।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। তিনি বুদ্ধাবতারে এসেছিলেন মানবকে দুঃখ, শোক, জরা, মৃত্যুর ভয় থেকে ত্রাণ পাবার পথের নির্দেশ দিতে। আবার যখন ঈশ্বরকেই দূরে রেখে শুষ্ক তর্ক বিচার নিয়ে মানুষ নিজেদের মধ্যে হানাহানি করছিল, তখন তিনি এসেছেন প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যরূপে। প্রেমের বন্যায় তাদের মনের ক্লেদ ধুয়ে দিয়ে, কঠিন মাটিকে ভক্তিরসে সিক্ত ক'রে তাতে এমন বীজ তিনি বপন করলেন, যাতে তাঁকে পাওয়া সহজ হয়। 'ভজ গোবিন্দ, জপ গোবিন্দ, লহ গোবিন্দের নাম রে'—নামজপই জীবের মুক্তির পথ। তাই তিনি নিজে ধূলায় লুটিয়ে, চোখের জলে ভেসে, নামের মহিমা পথহারা মানবকে জানিয়ে গেছেন।

আর এবার এসেছিলেন সামান্য পূজারী ব্রাহ্মণের বেশে, কাছের মানুষটি হ'য়ে, যাতে ভয়ে তাঁকে দূরে রাখতে না হয়। তিনি পুঁথির ভাষায় উপদেশ দেননি, নিজে আগে ঈশ্বরকে জেনে সবাইকে ডেকে ডেকে বলেছেন: ওরে সত্যি বলছি তিনি আছেন, ডাকার মতো ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়। অজ্ঞান, তমসাচ্ছন্ন মানুষকে এমন ক'রে পথের সন্ধান, মুক্তির বাণী এর পূর্বে কেউ শোনায়নি। তিনি বলেছেন, 'আমি ষোল টাং করেছি, তোরা এক টাং কর্।' সকল কাজের মধ্যে তাঁকে স্মরণ কর, তাতেই তাঁর কৃপা পাবে। সকলের জন্য ঠাকুরের এত কৃপা, এত প্রেম! নরেনের জন্য ঠাকুর পথ চেয়ে থাকেন, কেশব সেনের অসুখে তিনি ডাবচিনি মানত করেন মায়ের কাছে। এই অহেতুকী কৃপা, ভালবাসা—এর আগে কি কেউ দেখেছে?

তাই বলছি, ঈশ্বরকে মায়ের মত ভালবাসো, তাঁকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে কাজ ক'রে যাও।*

* রাঁচি মোরাবাদি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের ধর্মপ্রসঙ্গ—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী অনুলিখিত।

বিজয়া-প্রণাম

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

জননি গো, তোমার পরশ আজকে যে পাই সর্ব ঠাঁই,
কে বলে গো চ'লে গেছ, মোদের মাঝে তুমি নাই?
উঠেছিলে উজ্জ্বলিয়া, ভ'রেছিলে সকল হিয়া,
তোমার দিব্য রূপের দ্যুতি সবার মাঝে তাইতো পাই!

সকল জনে প্রণাম করি, সবারে দিই আলিঙ্গন,
জননি গো, তোমার স্নেহে ভ'রে ওঠে আমার মন!
এই তো তুমি আছ শিবে, জনে জনে নিখিল জীবে,
সবার মাঝে আজকে মাগো তোমায় করি দরশন!

উদার ধর্মবোধ

অধ্যাপক রেজাউল করীম

বহুযুগ ধরে পৃথিবীতে ধর্মের নামে মারামারি রক্তারক্তি ও তর্কবিতর্ক হ'য়ে আসছে। এক একটা ধর্মের ধ্বজা তুলে মানুষ মনে ক'রে বসে যে আসল সত্য সেই পেয়েছে, যত সত্য সব কেবল তার ধর্মের মধ্যে আছে; আর অন্য সব ধর্ম একেবারে বাতিল। যারা তার পতাকার তলে সমবেত হ'তে সম্মত হ'ল না, তাদের বলা হল অবিশ্বাসী, পথভ্রষ্ট; এবং সেই বিপথগামীদের সুপথে (?) আনবার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে বহু উদ্যোগ-আয়োজন করা হয়েছে।

এই ভাবে একে একে নানা ধর্মমতের আবির্ভাব হ'ল। এক একটা ধর্মের মধ্যে আবার সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা দিল। একই ধর্মের বিভিন্ন শাখা দাবি ক'রল যে তার ব্যাখ্যা ও ভাষ্যই ঠিক; অপর শাখার ব্যাখ্যা ও ভাষ্য ঠিক নয়। মানুষ যদি কেবল অপরের আদর্শের সমালোচনা করেই ক্ষান্ত থাকত, তবে হয়তো পৃথিবীতে খুব বেশী গণ্ডগোল হ'ত না। কিন্তু সমালোচনা থেকে এল প্রতিবাদ, প্রতিবাদের প্রতিবাদ, তস্য প্রতিবাদ। তারপর প্রত্যেকে মারমুখী হ'য়ে সাজ-সাজ-রবে অপরের বিরুদ্ধে রণ-হুঙ্কার তুলে অস্ত্র উঁচিয়ে এগিয়ে এল। এই ভাবে ধর্মকে নিয়ে পৃথিবীতে ঘোর বিবাদ-বিসম্বাদ হ'য়ে আসছে। তর্ক-বিতর্ক, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তারক্তিতে সারা পৃথিবী টলমল ক'রে উঠল। ঐতিহাসিকদের মতে—ধর্মের নামে যত রক্তপাত হয়েছে, রাজনৈতিক কারণে না কি তত রক্তপাত হয়নি।

আজ যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে পট-পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারাতেও এসেছে পরিবর্তন ও বিবর্তন। সঙ্কীর্ণতার স্থানে এসেছে উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা। আজকের যুগের মানুষ স্থিরভাবে শান্ত হ'য়ে ধীর-মস্তিষ্কে বিভিন্ন ধর্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানতে চাইছে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কোথায় পার্থক্য আছে, কোথায় ঐক্যসূত্র আছে, তা জানবার আগ্রহ তাদের বেড়ে চলেছে। ধর্মের তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা তাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়ের সূত্র খুঁজে বের করতে চাইছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যারা ধর্মালোচনা করছে, তারা দেখে স্তম্ভিত হচ্ছে যে, ধর্মে ধর্মে মূলের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই; তবে কেন সেখানে ধর্মের নামে এত রক্তপাত হয়েছে, কেন এক ধর্মের অনুবর্তী লোক অপর ধর্মের অনুবর্তী লোককে ঘৃণা করতে, হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না?

মানুষ পশু নয় যে, সে সব বিষয়ে অপরের সঙ্গে একই রূপ হবে। একজনের চিন্তার সঙ্গে অপরের চিন্তার পার্থক্য তো থাকবেই। মানুষের চিন্তাশক্তি আছে, বিবেক আছে, বিচারবুদ্ধি আছে। নিজ নিজ বিবেক ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে মানুষ চলতে জানে। সুতরাং পরমার্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রকার ধারণা তো থাকবেই। আজ ধর্মকে নূতন ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে হবে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে মৌলিক ঐক্য আছে—সেটা আবিষ্কার ক'রে জন-সমাজকে দেখিয়ে দিতে হবে।

ধর্মের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সকল ধর্ম মূলতঃ এক। সকল ধর্মের মূল নীতি, শিক্ষা ও লক্ষ্য এক। এখানে কোন পার্থক্য নেই। সমস্ত ধর্মের মধ্যে

একটা আভ্যন্তরীণ ঐক্যভাব বিদ্যমান। অবশ্য কতকগুলি আচার-পদ্ধতি ও খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। কিন্তু সেগুলি আসল বা মৌলিক নয়। যারা এই সব পার্থক্যকে বড় ক'রে দেখে, তারা ধর্মের মূলে প্রবেশ করতে পারেনি। সার সত্য সকল ধর্মে আছে,—এটা এত স্পষ্ট ও এত সর্বজনীন শাশ্বত সত্য যে এ বিষয়ে কারো মনে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সমাজে কেবল যে ধর্ম নিয়েই বিবাদ হয়, তা নয়। ধর্ম ব্যতীত আরও বহু বিষয়ে মানুষে মানুষে ঝগড়া-বিবাদ বাগ্‌বিতণ্ডা হ'য়ে থাকে। পার্থিব নানা বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে মানুষ ঝগড়া ক'রে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ হয় হ'ক, মতান্তর হ'ক; কিন্তু মতান্তর থেকে মনান্তর কেন হবে?—মারামারি, কাটাকাটি কেন হবে? বড় বড় মৌলিক ব্যাপারে—যেখানে সত্যই ঐক্যসূত্র আছে, সেখানে বিবেকবান্ মানুষ যদি আত্মকলহে লিপ্ত হয়, তবে এ-দুঃখ কোথায় রাখব? সহস্র সহস্র বছর পরেও কি মানুষ তার আদিম পশু-প্রবৃত্তির বশীভূত হয়েই চলতে থাকবে? সুতরাং যেমন করেই হ'ক, ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষকে পরস্পরের সহিত ঐক্যসূত্রে বন্ধনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। যাঁরা এ চেষ্টা করেছেন, তাঁরা সকল সম্প্রদায়ের নমস্য।

ধর্মবিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, অন্ততঃ তিনটি বিষয়ে প্রচলিত ধর্মগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই,—(১) ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস; (২) উপাসনা, (৩) প্রেম ও সৎকর্ম।

সকল ধর্ম শুধু যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাই নয়,—ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের মৌলিক ধারণাও এক ও অভিন্ন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্, তিনি প্রেমময়, তিনি করুণার আধার। তিনি সর্বব্যাপী, তিনি জ্ঞান ও চৈতন্যস্বরূপ; তিনি সর্বলোক জুড়ে অবস্থিত; তাঁর সাম্রাজ্য স্বর্গ মর্ত্য পাতাল পর্যন্ত বিস্তৃত; তিনি ত্রিকালজ্ঞ—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই তিনকাল তাঁতে বিধৃত। ঈশ্বরের এই বিরাট্ স্বরূপ সম্বন্ধে কোন ধর্মে কোন মতভেদ নেই। তিনি অনন্ত শক্তির মালিক, সমগ্র সৃষ্টির মূলীভূত কারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে এই বিশ্বাস সকল ধর্মেই স্বীকৃত।

ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলে, তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করলে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হয় উপাসনার প্রয়োজনীয়তাকে। আর সকল ধর্মই ঈশ্বর-উপাসনায় বিশ্বাসী। যত গণ্ডগোল পদ্ধতি নিয়ে, কিন্তু পদ্ধতি তো বড় কথা নয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতি যাই হ'ক না কেন, উপাসনার প্রয়োজনীয়তা তো কেউ অস্বীকার করে না। কেউ সাকারবাদী, কেউ নিরাকারবাদী; কেউ মূর্তি গড়ে ঈশ্বরের উপাসনা করে, কেউ করে মূর্তিহীন উপাসনা। কিন্তু যে-ভাবে যে-কোন প্রকারে উপাসনা করুক না কেন, সব উপাসনার লক্ষ্যস্থল সেই অনাদি অনন্ত ঈশ্বর। লক্ষ্য যখন এক, তখন পদ্ধতির জন্য কেন মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি ক'রব?

ধর্মের আর একটা অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে—সৎকর্ম। সৎকর্মের মধ্যে আছে প্রেম ও জীবসেবা। ঈশ্বর মান্‌ব, উপাসনাও ক'রব, কিন্তু সৎকর্ম ক'রব না,—এ হতেই পারে না। সৎকর্ম ব্যতীত ধর্মের কোন অনুষ্ঠানই পূর্ণ হ'তে পারে না।

এই তিনটি বিষয় যখন সকল ধর্ম স্বীকার করে, তখন তো আমরা এই তিনটির উপর লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করতে পারি। ঈশ্বর দেখতে কেমন? সাকার না নিরাকার? মূর্তি গড়ে

তাঁর উপাসনা ক'রব, না বিনা মূর্তিতে তাঁর ধ্যান ক'রব ?—এ-সব নিয়ে তো বহু মত আছে ও চিরকাল থাকবে! এই সব বিভিন্ন মতের জন্য দুঃখ করার কোন কারণ নেই। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করাই তো মানুষের সাধনা। এই সব পার্থক্য মানুষের স্বাধীন চিন্তার পরিচায়ক। মানুষ যে পশু নয়, এ তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

সর্বধর্ম-সমন্বয়ের প্রধান ঐক্যসূত্র হচ্ছে—ঈশ্বরে বিশ্বাস। ঈশ্বর আছেন, যে নামেই তাঁকে ডাকি না কেন, যে ভাবেই তাঁর উপাসনা করি না কেন, তিনি আছেন। তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত, তিনি অনাদি অনন্ত কাল থেকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা ক'রে আসছেন, ও বরাবর তা করতে থাকবেন—এই সত্য যখন স্বীকার করি, তখন ধর্মে ধর্মে বিবাদ ও বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত। ঈশ্বরই হচ্ছেন যোগসূত্র, সোনার সুতা (Golden thread)—যা সকল ধর্মকে, সকল মানুষকে এক করতে পারে, এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে দিতে পারে। এই সত্যকে যখন আমরা জীবনের প্রধান মৌলিক বিষয় ব'লে গ্রহণ করতে পারব, তখন দেখা যাবে যে, পার্থক্যের সামান্য কারণগুলি গুরুতর ব'লে মনে হবে না। তখন সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার এবং আরও বিবিধ প্রকার হাস্যাস্পদ আচার-অনুষ্ঠানগুলি একেবারেই অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে হবে। তারপর অবস্থা এমন হ'তে পারে যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মন্দির, মসজিদ, গির্জাগুলিতে আর সাম্প্রদায়িকতার ছাপ থাকবে না। সেগুলি হবে সকল সম্প্রদায়ের মিলন-কেন্দ্র, এবং পরম শান্তির সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায় বাস করবে। যে নামেই হ'ক না কেন, যে পদ্ধতি-তেই হ'ক না কেন, সর্বত্র সকলেই নির্বিঘ্নে ঈশ্বরোপাসনা করতে পারবে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আর মানবীয় আত্মায় বিশ্বাস থাকলে সমস্ত মানব-সমাজ ভায়ের মতো একত্র মিলিত হ'তে পারবে। দেশ, ধর্ম, ভাষা, জাতির পার্থক্য—কোন কিছুই আর মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারবে না। রামকৃষ্ণের কাছে এ যুগের মানুষ বিশেষভাবে ঋণী—এইজন্য যে তিনি সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যটি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাদের মূলগত ঐক্যটি সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন।

যারা ধর্ম মেনে চলে, তারা তো এই বিশ্বাসই পোষণ করে যে তাদের ধর্ম ঈশ্বর-প্রদত্ত। ধর্ম মানুষের মাধ্যমে প্রচারিত হ'তে পারে, কিন্তু ধর্ম মানুষের রচনা নয়। মানুষ আরও বিশ্বাস করে যে মূল ধর্মশাস্ত্রগুলি অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রের আদি উৎপত্তি-স্থান ঈশ্বর। যাঁরা ঈশ্বরভক্ত, যাঁরা ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁদেরই কণ্ঠে মানব-কুলের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের বাণী ধরাধামে প্রচারিত হয়েছে। সুতরাং সেই এক ঈশ্বর থেকে পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব, বিভিন্ন আদর্শ বা নীতি কি ক'রে সম্ভব ?

অবশ্য দেশকালপাত্রভেদে ধর্মাচারের খুঁটি-নাটি বিষয়ে কিছু তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু মূল নীতির দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। আদর্শ সব ক্ষেত্রেই একই মৌলিক বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের এতদূর সঙ্কীর্ণ ও অন্ধ হওয়া উচিত নয় যে আমরা সিদ্ধান্ত ক'রব—ঈশ্বর কেবল মুষ্টিমেয় লোককে উদ্ধার করবার জন্য তাদের নিকট একটা বিশেষ ধরনের বাণী পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর অপর সকল লোকের জন্য তিনি সরাসরি নরকবাসের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। করুণাময় ঈশ্বরের দ্বারা এরূপ অসম ব্যবস্থা হ'তে পারে না। এ ভাবে তিনি পক্ষপাতপূর্ণ কাজ করেন না।

তিনি যেমন বিরাট্ বিশাল, তাঁর কাজও তেমনি বিরাট্ বিশাল।

বিভিন্ন ধর্ম আলোচনা ক'রে একটি সত্য এই বুঝেছি যে ঈশ্বর সকলের জন্য সমান। তিনি বিশেষভাবে কারো খাতির করেন না, আবার বিশেষভাবে কারো ক্ষতিও করেন না। যে-কোন ব্যক্তি তাঁকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে, সেই ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত হবে। সুতরাং বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের ধর্মই কেবল সত্য হবে—এরূপ ব্যবস্থা বা বিধান ঈশ্বরের হ'তে পারে না।

আমরা যদি এইভাবে ধর্মকে গ্রহণ করতে পারি, ধর্মের সার সত্যকে অকপটে উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্যগুলি আর ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। যে কোন মানুষ, যে কোন ধর্ম পালন ক'রে চলুক না কেন—সাকার উপাসনাই করুক, আর নিরাকার উপাসনাই করুক না কেন—তাতে কিছুই যায় আসে না। বরং এইটাই দেখতে হবে যে মানুষ যে ধর্মকে আশ্রয় করেছে, সে যেন তার আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রে চলে। আমরা যে-পরিমাণে স্বার্থের কথা কম চিন্তা ক'রব, যে-পরিমাণে মূল সত্যকে ভালবাসব—সেই পরিমাণে আমরা মনুষ্যত্ব ও সত্য অর্জন করতে পারব। আজ অপরকে ধর্মান্তরিত করার কথা কম ক'রে ভাবতে হবে। আমরা যেন এইটাই বেশী ক'রে লক্ষ্য করি, যেন নিজের অবলম্বিত ধর্মাদর্শকে অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রব। নিজের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস থাকলেই অপরের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস জাগবে। হৃদয়ের পবিত্রতা, আচরণে শুচিতা, কর্মে নিষ্ঠা, সত্যের প্রতি আগ্রহ ও সকলের সহিত উদার ও অপক্ষপাত ব্যবহার—এইগুলি হবে আমাদের চলার পথে আলোক-বর্তিকা। সকল ধর্মের (great fundamental Truth) মহান্ ও মৌলিক সত্য এক ও অভিন্ন। তার মধ্যে কোন ভেজাল নেই, কোন গরমিল বা অসামঞ্জস্য নেই। তাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা আমাদের সর্বজনীন সত্য পেতে দেয় না। আর যাকে সত্য বলি, তা যদি সর্বজনীন না হয়, তবে তা সত্য হ'তে পারে না। সুতরাং মনে করতে হবে, জগতে ধর্ম একটিই আছে—যে পথ ধরেই চলি না কেন, সেই একই লক্ষ্যে সকলকে যেতে হবে,—সেই লক্ষ্য হচ্ছেন ঈশ্বর। তাই রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'যত মত তত পথ।' —সত্যই তো মত আলাদা, পথও আলাদা; কিন্তু লক্ষ্য সকলের এক। বিভিন্ন পথ ধ'রে সেই একই লক্ষ্যে সকলকে পৌছতে হবে।

ধর্মে বিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষকে ঘোষণা করতে হবেঃ আমার ধর্মবোধ—উচ্চনীচ, ছোটবড়, ধনী-দরিদ্র—কারো মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করে না;—আমার ধর্ম আকাশের মত বিশাল, উদার, মহান্—এতে সকলের স্থান আছে। আমার ধর্ম জলের মতো—এ সকলকে ধৌত করে, পবিত্র করে, এ সকলকে আনন্দ দেয়, সকলকে আপন ক'রে তোলে। কাউকে আলাদা করে না।

বাস্তবিক যারা উদারচিত্ত, তারা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র আছে, সেইটাকেই দেখতে চায়; আর যারা সঙ্কীর্ণমনা তারাই কেবল ধর্মের বিভিন্নতা ও পার্থক্যটাকে বড় ক'রে দেখে। সঙ্কীর্ণমনা বলে, 'ঐ লোকটাকে অপর সম্প্রদায়ের লোক ব'লে মনে হচ্ছে'; আর নিজ সম্প্রদায়-ভুক্তকে দেখলে ব'লে উঠে, 'হ্যাঁ এই লোকটা আমার নিজের লোক'। কিন্তু যাদের মনে প্রেমের বসতি, যারা উদারভাবে ধর্মকে উপলব্ধি করতে শিখেছে তারা এমন কথা বলে না, তাদের নিকট সমস্ত পৃথিবী এক পরিবারভুক্ত। বাস্তবিকই, পূজার বেদীতে যে ফুল থাকে, তা নানা রকমের ও নানা রঙের, কিন্তু সমস্ত পূজাই একই মহান্ প্রভুর উদ্দেশ্যে।

আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে স্বর্গের অনেক দ্বার আছে, যে পথে যার সুবিধা সে সেই পথ দিয়ে স্বর্গের দিকে যাত্রা করবে। প্রত্যেকে তার নিজের নিজের পথ দিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। পৃথিবীর সকল মানবই তো একই ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর একই উপাদান থেকে সমস্ত মানব-জাতি সৃষ্টি করেছেন। জীবতত্ত্ব তো এই কথাই বলে যে মানব-জাতি আদিযুগে একই মূলবস্তু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সেই মানব-সমাজ আজ ধর্মের নামে কেন ভিন্ন ভিন্ন হ'য়ে পরস্পর মারামারি করবে?

ধর্ম আনন্দময়; ধর্ম মনে আনে শান্তি, প্রাণে দেয় তৃপ্তি, অন্তরে জাগায় ভক্তি। মানুষ যখন খাঁটি ধর্মকে বুঝবে তখন সে দেখবে, ধর্ম তাকে দেবে শান্তি আনন্দ ও সুখ। ধর্ম কখনও (gloomy-dark-faced sadness) গোমড়ামুখের বিষণ্ণতা আনে না,—আনে আনন্দ ও প্রীতি। ধর্মের এই মহান্ ভাবটা মনে জাগ্রত হ'লে দেখা যাবে যে ধর্ম সকলের নিকট আকর্ষণের বস্তু হ'য়ে উঠেছে; কারো নিকট অপ্রীতিকর মনে হবে না। ধর্মকে এইরূপ উদারভাবে বুঝতে পারলে মানুষ পরস্পরের বন্ধু হবে এবং অনন্ত ঈশ্বরের আস্বাদ পাবে। তখনই সাম্প্রদায়িক দেওয়াল ভেঙে যাবে এবং মানব-সমাজে অবিরত প্রবাহিত হবে আনন্দের সুরলহরী। আজ একান্ত প্রয়োজন এইরূপ উদার ধর্মবোধের, যা পৃথিবীকে এক স্বর্গরাজ্যে পরিণত করবে।

বেদান্ত-প্রচারের ক্ষেত্র—জাপান

ডক্টর শ্রীসচ্চিদানন্দ ধর

স্বামীজী জাপান দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন। জাপানকে দেখে এশিয়ার পরাধীন জাতির জন্য অনেক আশা পোষণ করেছিলেন। সত্যি, জাপান প্রাচ্যের বিস্ময়,—পাশ্চাত্যের ঈর্ষা। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার কলাকৌশল তার আয়ত্ত। অশ্রান্ত ও দ্রুতগতিতে চলছে তার আবিষ্কার ও গবেষণা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ক'রে এগিয়ে চলেছে—জাপানী জাতি। এই অগ্রগতি একদিকে যেমন যন্ত্র ও শিল্পকে আশ্রয় ক'রে—তেমনি অপরদিকে শিল্প, সাহিত্য ও সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে অবলম্বন করেও সমান তালে চলেছে। একই পীঠে পূজা চলেছে যন্ত্র-ভৈরবের আর সৌন্দর্যলক্ষ্মীর। বিরাট ইস্পাতের কারখানার ভিতর সুন্দর একটি উদ্যান,—প্রশান্ত একটি বুদ্ধমন্দির! এমনি কঠোর-কোমলের, রুদ্র-শিবের সমন্বয় দেখা যাবে জাপানী ব্যক্তিচরিত্রে আর প্রকৃতিতে! অন্তরে তপ্ত আগ্নেয়গিরি, কিন্তু বাইরে শান্ত-সমাহিত শুভ্র হিমানী।

মহাযুদ্ধ ও জাপান—জাপান কি শান্তিকামী?

জাপান যুদ্ধে লিপ্ত ছিল বহুদিন। সাম্রাজ্য-লিপ্সা নিয়ে জাপান ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ-রুশ প্রভৃতি জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে এসেছে প্রায় একশ' বছর। চীন, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে জাপান সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে দীর্ঘকাল শাসন ও শোষণ করেছে। তাই বিগত মহাযুদ্ধে জাপানের মহাপতন (!) প্রতিবাসী রাষ্ট্রের পক্ষে আনন্দ ও কল্যাণের ব্যাপারই হয়েছে। জাপানের পরাজয় দ্বীপময় এশিয়া ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জাতির স্বাধীনতা

লাভের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। তবু জাপানের পরাজয় যেন এশিয়াবাসীর মনে কেমন একটা গোপন অজ্ঞাত বেদনার সঞ্চার করে, যেমন করে মহাকাব্যের প্রতিনায়কের পতন! কারণ মনে হয়, জাপান ছিল সমগ্র এশিয়ার মুখপাত্র-হিসাবে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ, যন্ত্রসভ্যতা ও দাম্ভিকতার যথার্থ প্রত্যুত্তর। তাই জাপানের পতনে আজ আমাদের স্বস্তিবোধের সঙ্গে সঙ্গে বেদনাময় দীর্ঘশ্বাস! শত্রু হ'লেও জ্ঞাতি তো!

গত মহাযুদ্ধের বিয়োগান্ত পরিণতিতে জাপানের যে শিক্ষা হয়েছে—তাকে সে ভবিষ্যতের স্থায়ী কল্যাণে লাগাবার চেষ্টা করছে। আজ জাপান সত্যি সমগ্র এশিয়াবাসীর আন্তরিক সৌহার্দ্য চায়। যুদ্ধের সমগ্র খেসারত দিয়েও জাপান আজ সব রকম শিল্পে স্বাবলম্বী, তথা 'মহাজন' হয়েছে। এশিয়ার সব দেশকে জাপান যান্ত্রিক উন্নতির জন্য সাহায্য দিচ্ছে—যন্ত্রপাতি দিয়ে, দক্ষ কারিকর ও উপদেষ্টা দিয়ে। জাপানের এ শুভেচ্ছাকে সন্দেহ না ক'রে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। আর দেখতে হবে কি ক'রে এ সম্পর্ককে লৌকিকতার পরিবর্তে যথার্থ 'আন্তরিক' করা যায়। ভারতবর্ষ নৈতিক বলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি,—এটা শুধু আমাদের আত্মম্ভরিতা নয়, সচেতন বিশ্বাস—পৃথিবীও তা স্বীকার করছে। আর্থিক সম্পদেও ভারতের অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষ বিশ্বকে যদি কিছু দিতে চায়, তবে বিশ্ব শ্রদ্ধার সঙ্গেই তা গ্রহণ করবে। শক্তিমান্‌কে সকলেই খাতির করে। জাপান আজ অন্তরে বাহিরে শান্তিকামী। ভারত এই শুভেচ্ছাকে কাজে লাগাক্।

পঞ্চশীল ও সহ-অস্তিত্বের বাণী—বেদান্তের সুরে

পঞ্চশীলের 'ফরমুলা' আজকাল উচ্চস্তরের রাজনীতির বাণীতে বেশ জায়গা ক'রে নিয়েছে। 'সকলের সঙ্গে ভাগ ক'রে দুনিয়াটাকে ভোগ করতে হবে'—এই সাধারণ কথাটা বিশ্বের কাছে একটা 'বাণী'র মতো! অথচ বেদান্ত-শাসিত ভারতের কাছে 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্'—কথাটা অতি সরল,—অর্থটা জীবনে সুপরিস্ফুট। 'কেন সকলের সঙ্গে ভাগ ক'রে খাব, কেন একলা সম্ভোগ ক'রব না ?'—এর সদুত্তর রাজনীতি দিতে পারে না। এর যথার্থ উত্তর বেদান্তে—বিশ্বের সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা সংস্থাপনের প্রচেষ্টায়। আধুনিক সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদীরা শুধু আইনের দ্বারা সাম্য প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা করছেন। সাম্যবাদের, সহ-অস্তিত্বের একমাত্র ভিত্তি হ'তে পারে বেদান্ত। জোরগলায় বিনা-দ্বিধায় বলা যেতে পারে, 'ইহা ছাড়া নাই অন্য পথ—নান্যঃ পন্থাঃ।' তবু আনন্দের কথা সহ-অস্তিত্বের বাণী ভারতীয় নেতার মুখ-নিঃসৃত। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির বংশধর ব'লেই—নিজের সাধনার উপলব্ধি না থাকলেও তাঁর পঞ্চশীলের মন্ত্রটা আজ কাজ করছে। অন্ততঃ বিশ্বের রাজনৈতিক নেতারা কথাটা নিয়ে ভাবছেন।

যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও আধুনিক ভোগ-বিলাসের প্রচুর উপকরণ সত্ত্বেও ক্লান্তি এবং অবসাদবোধ জাপানী জাতিকে সহজেই বেদান্তের পথে শান্তির সন্ধানে অনুপ্রাণিত করবে। যুদ্ধ-শ্রান্ত ভোগক্লান্ত যন্ত্রদানব-পীড়িত জাপান আজ সত্যকারের শান্তি চায়। পাশ্চাত্যে স্বামীজীর নির্ধারিত কর্মধারায় বেদান্ত-প্রচারের কেন্দ্র আছে। জাপানেও সেইরূপ কেন্দ্র শীঘ্রই খোলা দরকার। জাপান-প্রবাসকালে আমার সেখানকার কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তাশীল অধ্যাপক ও

যুবক ছাত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদান করার সৌভাগ্য হয়েছিল। দেখলাম, কয়েকজন অধ্যাপক নিজেদের প্রচেষ্টায় সেখানে ভারতীয় দর্শন ও বেদান্তের বাণী প্রচার করতে চেষ্টা করছেন। প্রাচ্যবিদ্যা, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা জাপানের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বহুকাল ধ'রে আছে। অনেক ছাত্র ভারতের দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য ভারতে আসতে ইচ্ছুক। এই শ্রেণীর চিন্তাশীল অধ্যাপক, সমাজসংস্কারক, মঠাধ্যক্ষ ও ছাত্রেরা ভারতের বেদান্তের বাণীকে সহজেই গ্রহণ করতে উৎসাহী।

সাধারণ লোকের ভারত সম্পর্কে আগ্রহ

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও অধ্যাপক-শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ছাড়া সাধারণ লোকের মধ্যেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ দেখা যায়। ভারত শান্তিপ্রিয় অহিংস এবং প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ—এই ধারণা সাধারণ লোকের মধ্যেও বদ্ধমূল। ভারতে অতি অল্প শ্রমে জীবিকা অর্জন করা চলে—এইরূপ ধারণা জাপানী শ্রমিকদের আছে। ভারতের বর্ণভেদ, বাল্যবিবাহ, গোপূজা, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণাও সাধারণ লোকের মধ্যে আছে। ভারতের দূতাবাস ও জাপানস্থ ভারতবাসীরা যথার্থ প্রচারের দ্বারা জাপানীদের ভারত সম্পর্কে ভ্রান্তি দূর করতে পারেন। সব মিলিয়ে ভারতকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ভারতের সঙ্গে জাপানের ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত সংযোগ আছে ব'লে, গর্ববোধ করে।

জাপানের সাধারণ লোক ও ধর্মচর্চা

জাপানের অধিকাংশ লোক ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। বৌদ্ধ, সিন্টো ও খৃষ্টান—এই তিন ধর্মমতের লোক জাপানে আছে। প্রাত্যহিক জীবনে অনুষ্ঠানমূলক ধর্মীয় আচার বলতে বিশেষ কিছু নেই। কোন কোন গৃহে পূজার বেদী আছে। সাধারণতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সিন্টো পুরোহিতরাই ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন। বৎসরের বিশেষ বিশেষ ঋতুতে ঋতু-উৎসব বা প্রকৃতির বিশেষ কোন শক্তির স্থানীয় পূজা ও উৎসব হয়। বৌদ্ধেরা এবং সিন্টোরা অনেক লৌকিক দেবতার পূজাও করেন। ধর্ম সম্বন্ধে কারও মনে গোঁড়ামি নেই। ধর্মের জন্য বিবাহ সম্পর্ক বা সামাজিকতা আটকায় না। একই পরিবারে খৃষ্টান বৌদ্ধ এবং সিন্টো মতের লোক আছেন। উহাতে পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট হয় না। পুনর্জন্মবাদে ও কর্মফলে অনেকেই বিশ্বাসী। পূর্বপুরুষদের সমাধির প্রতি ও পরলোকগত আত্মার প্রতি সবাই শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। কোন বিশেষ ধর্মমতের উপর এদের বিরাগ বা আসক্তি নেই

জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিবোধ

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান কম হলেও জাপানীদের মধ্যে এক অসাধারণ নীতিবোধ দৃষ্ট হয়। চুরি, ভিক্ষাবৃত্তি, প্রতারণা, মিথ্যাভাষণ, খাদ্যে ভেজাল দেওয়া—খুব কমই দেখা যায়। কাজে কর্মে ফাঁকি নেই। জাতি বা সমাজের নামে তারা অতি সহজেই বড় রকমের স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে। জীবনকে খুব সহজভাবেই নেয়। খুব বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও হা-হুতাশ নেই। প্রয়োজনবোধে অনায়াসে আত্মহত্যা করতে পারে। 'হারাকিরি' নামক আত্মহত্যার কথা আমরা সবাই জানি। আগ্নেয়গিরির গহ্বরে বা জলপ্রপাতে ঝাঁপ দিয়েও অনেকে আত্মহত্যা করে। জীবনটা ও মৃত্যুটা যেন একটা খেলা! নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। বিধবা-বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন-সম্মত। নারী-পুরুষের

সমান অধিকার আইনতঃ স্বীকৃত, বাস্তবে রূপায়িত।

আধুনিক শহর ও শিল্পাঞ্চলে ভোগবিলাসের প্রাচুর্য। নৃত্যশালা, পানশালা, টেলিভিসন ও বহু প্রকারের ভোগবিলাসের উপকরণ বিদ্যমান। সবাই আপ্রাণ পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন করে, দুই হাতে খরচও করে। 'খাও, দাও, স্ফূর্তি কর'—এই যেন ভাব! কিন্তু অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ভোগোপকরণের প্রাচুর্য জাপানী মনকে ক্লান্ত, রিক্ত ও নূতন পথের সন্ধানী করেছে মনে হয়।

বেদান্তের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র

জাতিগত ভাবে জাপান যুদ্ধের চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে—হিরোসীমা আর নাগাসাকির ধ্বংসে। বহু বিধবার ও পুত্রহারা জননীর হাহাকার এখনও জাপানের আকাশে বাতাসে। যুদ্ধের বাহ্য ক্ষয়ক্ষতি আর ধ্বংসকে পূরণ ক'রে জাপান আবার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে উঠেছে। জাপানী যুবকযুবতী আজ সত্যি যুদ্ধ বা সাম্রাজ্য-বিস্তার চায় না। সবাই চায়—শান্তি। ভোগের উপকরণ, কর্মে নিয়োগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সামাজিক ক্ষেত্রে অবাধ মেলামেশা, প্রচুর ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও সবাইকে শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন মনে হয়। সাধারণ মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি কর্মক্ষমতা, সততা, উন্নত ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এদের মনে কেন যে শান্তি নেই—এর উত্তর দিতে পারে একমাত্র বেদান্ত।

স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল—এশিয়ার অনুন্নত জাতিরা জাপানের যান্ত্রিক উন্নতির দক্ষতাকে গ্রহণ ক'রে নিজেদের জীবনযাত্রাকে সহজতর করবে। যুদ্ধোত্তর এশিয়া জাপানের কাছ থেকে তার শিল্পকৌশল নিচ্ছে। এই লেনদেনের যুগে ভারত জাপানকে বেদান্তের বাণী দিয়ে সাহায্য করতে পারে। জাপানী মনে কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি বা দৃঢ় পূর্বসংস্কার নেই। সুতরাং এই পরিস্থিতি বেদান্তপ্রচারের পক্ষে সহায়ক। বৌদ্ধ দর্শনের মাধ্যমেও বেদান্তকে সহজেই জাপানী জাতির গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলা যায়।

সুখের বিষয় কয়েকজন জাপানী চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ও রামকৃষ্ণ মিশনের দু' এক জন সন্ন্যাসীর উপদেশে ও অনুপ্রেরণায় টোকিও ও ওসাকায় বেদান্ত-কেন্দ্র গড়ে উঠছে। এ কাজকে আরও ত্বরান্বিত করা যায় না কি? প্রাচ্যের সর্বপেক্ষা শিল্পোন্নত দেশ জাপানে, ভারতের প্রাচীন ভাবধারাপুষ্ট জাপানে বেদান্ত মূর্ত হয়ে উঠলে একটি আদর্শ মানব-সমাজের বাস্তব রূপায়ণ দেখে মানুষ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হ'তে পারবে।

I would wish that every one of our young men could visit Japan once at least in his life time......The Japanese think that everything Hindu is great, and believe that India is a holy land.

Japanese Buddhism is entirely different from what you see in Ceylon. It is the same as Vedanta. It is positive and theistic Buddhism, not the negative atheistic Buddhism of Ceylon.

—*Swami Vivekananda*

বিজ্ঞানের বল

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

এ বিশ্বের আদ্যাশক্তি সৃষ্টিকর্ম করি সমাপন—
মানুষ, তোমার হাতে এ ধরারে করেছে অর্পণ।
পূর্ণরূপে অধিকারি' নতুন করিয়া তারে গড়ো,
অথবা বিজ্ঞানবলে বিধ্বংস করিবে, তাই করো।

ধরারে সর্ষপকণা ভাবি চিরদিন
মহাশক্তি রবে উদাসীন।
যতই বিস্তার করো মানবমহিমা
তোমার ও বিজ্ঞানের ক্ষমতার আছে পরিসীমা।

ক্ষণজীবী পতঙ্গ মানুষ!
যতই উড়াও তুমি লুনিকে ও স্পুটনিকে খেলার ফানুস
বিহিত সীমারই মাঝে তার লীলা চলে,
সীমার লঙ্ঘন কভু তারে নাহি বলে।

যে বুদ্ধিতে কর তুমি দুঃসাধ্য সাধন,
তার বীজ মহাশক্তি—তব দেহে করিল রোপণ।
এ অসীম ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহান্তর জিনিবার আশা
জেনো তারে বিজ্ঞানের বকাণ্ড-প্রত্যাশা।

জীবলোক সংহারিতে পারে তব বিজ্ঞানের বল
সাধিতে মানসলোকে পারে সার্বজনীন মঙ্গল?
বিশ্বজিৎ, তবু তুমি জীবনান্ত সীমার অধীন,
বিজ্ঞান লঙ্ঘিতে সেই সীমা শক্তিহীন।

প্রকৃতিরে জিনিয়াছ, ধরণী তোমার ক্রীড়াভূমি,
মৃত্যুবিজয়ের কথা ভেবেছ কি তুমি?
বিজ্ঞানের বলে নয়, লভি বল অন্য সাধনার
মানুষই জিনিয়া মৃত্যু রথী হয় সারথ্যে তাহার—
যুগে যুগে, দেশে দেশে, গ্রহে গ্রহে অভিযান যার।

প্রাচীন ভারতে স্বরের সাধনা

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

প্রাচীন ঋষিগণ শব্দব্রহ্ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শব্দের অন্তর্নিহিত যে স্বর আছে এবং স্বরের পশ্চাতে যে অনির্বচনীয় উৎস আছে তাহা তাঁহারা স্বরের সাধনা করিয়া অবগত হইয়াছিলেন। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে একটি কাহিনী আছে, তাহা আলোচনা করিলে এই তত্ত্বটি আরও বিশদ হইবে। কাহিনীটি এই :

মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দেবতারা স্বরশূন্য 'ঋক্-মন্ত্রে' প্রবেশ করিলেন। মৃত্যু বুঝিতে পারিলেন যে দেবতারা ঋক্-মন্ত্রের মধ্যে নিজেদিগকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, যেমন একটি রত্নের মালার মধ্যে সূত্রটি লুক্কায়িত থাকে। মৃত্যুর ভয়ে তখন দেবতারা মন্ত্রের মধ্যে যে 'স্বর' আছে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মৃত্যু তখন স্বরের মধ্যে ঢুকিয়া দেবতাদের আক্রমণ করিবার প্রয়াস পাইলেন। দেবতারা তখন স্বরের মধ্যে যে শাশ্বত অমর 'ওঁ' আছে তাহার মধ্যে আশ্রয় লইলেন। মৃত্যু তখন আর কিছুই করিতে পারিলেন না।

এই কাহিনীতে শিক্ষণীয় এই যে 'ওঁ' সমস্ত শব্দ এবং স্বরের পশ্চাতে মৃত্যুহীন শব্দাতীত, এবং স্বরাতীত সত্তাভাবে বর্তমান আছেন। গৌতমীয় তন্ত্রে আছে যে স্বরযুক্ত শব্দের অসীম শক্তি এবং ইহা আকাশের মতো সর্বব্যাপী —

'ব্যাপিনী ব্যোমরূপা স্যুরনন্তাঃ স্বরশক্তয়ঃ'।

ঋষিগণ ঋক্-মন্ত্রের মধ্যে স্বরযুক্ত সঙ্গীত যোগ করিয়া সামবেদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেইজন্য অধিকাংশ সামবেদের মন্ত্র ঋগ্বেদে পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্‌বেদ ও সামবেদে এই প্রভেদ যে সামমন্ত্রের মধ্যে সঙ্গীতের সুর দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত বেদের মধ্যে সামবেদকে এই-জন্যই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'বেদানাং সামবেদোঽস্মি।' তিনি সামবেদের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রকটিত আছেন।

ঋষিগণ যোগসহায়ে শব্দের ও সঙ্গীতের শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই সমগ্র বিশ্ব বিধাতার চিন্তা হইতে উদ্‌ভূত হইয়াছে। তাই বেদে আছে, 'যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।' বিধাতা পূর্ব পূর্ব যুগের ন্যায় তাঁহার চিন্তা হইতে এই বিশ্ব উৎপাদন করিয়াছেন। চিন্তা মানস ব্যাপার— 'সঙ্কল্পঃ কর্ম মানসম্।' চিন্তা বা সঙ্কল্প মানসিক কর্ম হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। চিন্তা কি? কতকগুলি বর্ণের সমষ্টিমাত্র। বর্ণ ব্যতিরেকে কোন চিন্তা সম্ভব নয়। আর বর্ণগুলি কি? কতকগুলি ধ্বনিমাত্র। অতএব সমগ্র বিশ্বটি বর্ণ ও ধ্বনি লইয়া সংগঠিত। 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্'—অর্থাৎ যাহা কিছু বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, সে সকল বর্ণ ব্যতীত কিছুই নহে।

তন্ত্রানুসারে শব্দ চতুর্বিধ। আমরা মুখে বা বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে শব্দ করি তাহা 'বৈখরী'। বর্ণসমষ্টির উচ্চারণ না করিয়া আমরা যে চিন্তা করি তাহা 'মধ্যমা'। 'মধ্যমা'র ভিতরে সূক্ষ্ম শব্দ যাহা ধ্বনিত হয় অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গে— তাহার নাম 'পশ্যন্তী'। 'পশ্যন্তী'কে যোগিগণ ধ্যানসহায়ে অনুভব করিয়া থাকেন। 'পশ্যন্তী'র পশ্চাতে এক অনির্বচনীয় সূক্ষ্মতম শব্দতরঙ্গ আছে, উহার নাম 'পরা'।

ভগবান্ বিষ্ণুর করে যে শঙ্খ আছে তাহা শব্দের প্রতীক। ইহা দ্বারা এই প্রদর্শিত হয়

যে বিধাতার করে অনন্ত শব্দের শক্তি বর্তমান আছে। এই শব্দ সর্বব্যাপী এবং বিশ্বসৃষ্টির আদিকারণ ও অনাদি। যোগিগণ গভীর ধ্যানে হৃদয়-গহ্বরে এই শব্দের অনুভূতি লাভ করেন। অনাহত চক্রের মধ্যে উহা অনাহত ধ্বনি বলিয়া খ্যাত।

সাধারণতঃ শব্দ দুই ভাগে বিভক্ত: একটি ধ্বন্যাত্মক, যাহা শঙ্খ ভেরী প্রভৃতি হইতে উত্থাপিত হয়। অন্যটি শব্দাত্মক যাহা কেবল বর্ণ-সমষ্টি হইতে উদ্‌ভূত হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের নিনাদিত শঙ্খ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল,—শব্দের এমনই শক্তি! শব্দশক্তি সৃজনশীল, পালনশীল এবং ধ্বংসক্ষম।

ঋষিগণ স্বরের বা সঙ্গীতের সাধনা করিয়া সামবেদ গাহিতেন। সামগানের দ্বারা লৌকিক নানা বিপদ্ দূরীভূত করিতেন। অদৃষ্টজনিত আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাপ সামসঙ্গীতের দ্বারা দূরীকৃত হইত। আধি ও ব্যাধি সামগানে বিনষ্ট হইত। ইহা ছাড়া মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত আত্মশক্তি আছে তাহাও সামগানের দ্বারা জাগ্রত হইত।

বাত, পিত্ত এবং কফের বৈষম্যে মানুষের মেজাজ ও শরীর মলিন হইয়া থাকে। সামগানের সাহায্যে মালিন্যযুক্ত মন ও দেহ মালিন্যমুক্ত হইয়া প্রশান্ত হইত। প্রাচীন ভারতে ঋষিগণ এই তত্ত্ব বিশেষভাবে অবগত ছিলেন বলিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয়

ত্রিপুরতাপিনী উপনিষদে উক্ত আছে, 'স্বরেণ সংলয়েদ্ যোগী'—যোগী সুরের দ্বারা নিজের মনকে সমাহিত করিবে। ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদে আছে, 'স্বরেণ সন্ধয়েদ্ যোগী'—যোগী সুরের দ্বারা যোগ-সন্ধান করিবে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, 'প্রাণো বৈ স্বরঃ'—যখন মন্ত্র স্বরসংযুক্ত হয় তখনই উহা প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। তখনই মন্ত্রে প্রাণ জাগিয়া উঠে। যোগোপনিষদে আছে, 'সদা নাদানুসন্ধানাদ্ সংক্ষীণা বাসনা ভবেৎ'—সর্বদা নাদ বা সুরের চর্চা করিলে মানুষের বাসনানিচয় ক্ষীণ হইয়া নষ্ট হইতে থাকে।

আজকাল সঙ্গীতের সাহায্যে ব্যাধির চিকিৎসাও হইতেছে। এ তত্ত্বটি ঋষিগণ কত সহস্র বৎসর পূর্বে শুধু আলোচনা নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারও করিয়াছিলেন। শুধু আধি ও ব্যাধির ব্যাপারে নয়, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ব্যাপারেও সামবেদের প্রচেষ্টা কম নয়। অধুনা এইসব সাধনা মন্দীভূত এবং বিরল বলিয়া অনেকের ইহাতে আস্থা নাই।

সামগানে বিক্ষিপ্ত মন সমাহিত হয়। বিষয়-লোলুপ ইন্দ্রিয়গুলি সামগানে সংযত হয়। সুপ্ত আত্মশক্তি সামগানে উদ্‌বুদ্ধ হয়। দৈব উৎপাত—যথা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প এবং প্লাবনাদি সামগানে প্রশমিত হয়। মানবের কল্যাণে যদি পরমাণু-শক্তি ব্যবহৃত হইতে পারে, পরীক্ষিত এবং ঋষি-দৃষ্ট সামগানের শক্তির প্রয়োগ কি চলিতে পারে না? যেহেতু ইহা ধর্মগ্রন্থের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে এবং যেহেতু ইহা বর্তমান বিজ্ঞানাগারে উদ্ভূত হয় নাই, বা যেহেতু ভারতীয় ঋষিদের দ্বারা ইহা আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছিল, সেই হেতুই কি স্বরের সাধনা ও প্রয়োগ অবহেলিত হইবে?

তন্ত্রোক্ত মহাবিদ্যা

অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার

তন্ত্রশাস্ত্রে 'বিদ্যা' শব্দের অর্থ মন্ত্র। মন্ত্রবিশেষের কথা বলিতে গিয়া বিশ্বসারতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 'একাক্ষরী সমা নাস্তি বিদ্যা ত্রিভুবনে প্রিয়ে।' এখানে 'বিদ্যা' শব্দটি 'মন্ত্র' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

মন্ত্র, যন্ত্র এবং দেবতা অভেদ। মন্ত্রে যে শক্তির সূক্ষ্মতম রূপ, তাহারই স্থূলতর প্রকাশ যন্ত্রে এবং স্থূলতম প্রকাশ দেবতার মূর্তিতে। এইজন্য তন্ত্রে—যন্ত্র থাকিতে প্রতিমা স্থাপন নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং যন্ত্র সত্ত্বেও প্রতিমা স্থাপন করিলে দ্বিগুণ পূজা, জপ হোমাদি বিহিত হইয়াছে।

বাংলা তন্ত্রের দেশ। এইজন্য এদেশে সকলেই দশ মহাবিদ্যার নামের সহিত পরিচিত। শাক্তগণ যে নামাবলী ব্যবহার করেন, তাহাতে দশ মহাবিদ্যার নাম অঙ্কিত থাকে যথা ঃ

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধ-বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

এই দশ মহাবিদ্যা ব্যতীত তন্ত্রে আরও অষ্ট মহাবিদ্যার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, ত্রিপুরা, সরস্বতী প্রভৃতি আদ্যাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশও মহাবিদ্যারূপে কথিত হইয়াছে।

এই সমস্ত মহাবিদ্যার মন্ত্র-সাধনায় সাধারণ ক্ষেত্রে করণীয় বিচারাদির কোন প্রয়োজন নাই। আদ্যাবিদ্যা শ্যামামায়ের মন্ত্রের কথা বলিতে গিয়া ভৈরব তন্ত্রে শ্রীশিব বলিতেছেন ঃ

অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাঃ কালিকায়াঃ সুদুর্লভাঃ।
যাসাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥
নাত্র চিন্তা-বিশুদ্ধিঃ স্যান্ন বা মিত্রাদিদূষণম্।
ন বা প্রয়াসবাহুল্যং সময়াসময়াদিকম্।

—অনন্তর কালিকাদেবীর সুদুর্লভ মন্ত্রাদির কথা বলিতেছি। এই সকল মন্ত্রের জ্ঞানমাত্র মানুষ জীবন্মুক্ত হইতে পারে। এই সমস্ত মন্ত্রগ্রহণে মন্ত্রশুদ্ধি বিবেচনা ও অরিমিত্রাদি বিচার নাই। এই মন্ত্রের উপাসনাতে প্রয়াসবাহুল্য অথবা সময়-অসময় বিবেচনা নাই।

মহাদুর্গা মন্ত্রের মাহাত্ম্যকীর্তনে বর্ণিত হইয়াছে, 'চতুর্বর্গপ্রদং সাক্ষান্মহাপাতকনাশনম্'। এই বিদ্যার সাধনায় গন্ধ, পুষ্প, হোম প্রভৃতি আয়াস গ্রহণের প্রয়োজন নাই। 'জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা' কেবলমাত্র জপের দ্বারাই—সিদ্ধিলাভ হয়। সমস্ত সিদ্ধবিদ্যার মন্ত্রেরই এইরূপ মাহাত্ম্য তন্ত্রশাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে।

দশ মহাবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে 'প্রাণ-তোষিণী'কার কয়েকটি আখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন। আদ্যাবিদ্যা কালীদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-কথিত বৃত্তান্ত তন্ত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে। হিমালয়সুতা পার্বতী জাহ্নবী স্নানে গিয়াছেন। এদিকে দেবতারা শুম্ভনিশুম্ভের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া জাহ্নবীতীরে দেবীর স্তব করিতেছেন। পার্বতী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন?' তখন পার্বতীর শরীরকোষ হইতে এক দেবী নির্গতা হইয়া বলিলেন, 'ইঁহারা আমারই স্তব করিতেছেন।' সেই দেবী কৌষিকী নামে খ্যাত। গৌরবর্ণা পার্বতী তখন কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকা নামে হিমালয় পর্বতে অবস্থান করিলেন।

তারা ছিন্নমস্তা ধূমাবতী—মহাবিদ্যার আবির্ভাব সম্বন্ধে তন্ত্রে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহাদুর্গা জগদ্ধাত্রী দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে

কাত্যায়নীতন্ত্রে যে আখ্যান কথিত হইয়াছে, তাহা কেনোপনিষদ্-কথিত উমা হৈমবতী দেবীর আবির্ভাবের কাহিনী-সদৃশ।

পুরাকালে দেবতারা অসুরদিগকে জয় করিয়া মনে করিলেন, 'আমরাই ঈশ্বর। আমাদের অতিরিক্ত ঈশ্বর কেহ নাই।' দেবতাদের এই অভিমান দেখিয়া আদ্যাশক্তি জগন্মাতা তাঁহাদের সংযত করিবার জন্য 'কোটিসূর্যসমপ্রভ' 'কোটি-চন্দ্রসুশীতল' বিরাটরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। দেবতারা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'ইনি কে?' তাঁহারা বায়ু ও অগ্নিকে তাঁহার পরিচয় লইবার জন্য পাঠাইলেন। অগ্নি ও বায়ু হৃতগর্ব হইয়া, তাঁহাকে জানিতে না পারিয়াই ফিরিয়া আসিলেন। তখন ইন্দ্র বুঝিলেন যে ইনি মহাদেবী। পূজাস্তবাদির দ্বারা ইন্দ্র তাঁহার প্রসন্নতা বিধান করিলেন। দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই মহাদেবী তাঁহার সুগোপ্য মঙ্গলময়রূপ ধারণ করিয়া তাঁহা-দিগকে দর্শন দিলেন:

মৃগেন্দ্রোপরি সুস্মেরা সর্বালংকারভূষিতা।
চতুর্ভুজা মহাদেবী নাগযজ্ঞোপবীতিনী॥
ত্রিনেত্রা কোটি-চন্দ্রাভা দেবর্ষিমুনিসেবিতা॥

তন্ত্রোক্ত মহাবিদ্যার পূজায় প্রত্যেক দেবীর ভৈরবের পূজারও বিধান আছে। যিনি যে দেবীর মন্ত্রের ঋষি, তিনি তাঁহার ভৈরব। এই-রূপে আদ্যাবিদ্যা কালিকাদেবীর ভৈরব মহাকাল, তারাদেবীর ভৈরব অক্ষোভ্য, মহাদুর্গার ভৈরব নারদ, ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্র তাহার 'অন্নদামঙ্গলে' দশ-মহাবিদ্যার আবির্ভাবের একটি অপূর্ব কাহিনী লিখিয়াছেন। ইহা সাধারণে প্রচলিত, কিন্তু ইহার মূল কোন তন্ত্রে আছে কিনা, ঠিক জানা যায় না।

দক্ষকন্যা সতী নারদের মুখে শুনিলেন যে তাঁহার পিতা একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন; তাহাতে দেবতারা সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, শুধু শিবের নিমন্ত্রণ হয় নাই। দেবী শিবের নিকট পিতৃগৃহে যাইবার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু শিব বিনা-আমন্ত্রণে যাইবার অনুমতি দিতে সম্মত হইলেন না। তখন দেবী একে একে দশ মহাবিদ্যার মূর্তি ধারণ করিয়া শিবকে আপন মাহাত্ম্য জানাইয়া দিলেন। শিব যে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই দিকেই একটি নূতন মূর্তি দেখিতে পাইলেন। ভারতচন্দ্রের সেই মনোজ্ঞ বিবরণ হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি দিতেছি:

সতী কন মহাপ্রভু, হেন না কহিবা।
বাপ-ঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা॥
যত কন সতী, শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥
মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা।
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপুরা॥
গলিতরুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে।
গলিতরুধির মুণ্ড বামকরতলে॥
আর বামকরেতে কৃপাণ খরশান।
দুই ভুজ দক্ষিণে অভয় বরদান॥
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে॥

এই বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে দেবীর ধ্যানানুগা এবং ইহা ভারতচন্দ্রের তন্ত্রশাস্ত্রে নৈপুণ্য সূচিত করে।

দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইল মুখ।
তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবন্ধা উর্ধ্ব এক জটা বিভূষণা॥
অর্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘ ছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর।
চারিহাতে শোভে, আরোহণ শিবপর॥

ক্রমে ক্রমে এইরূপে মহাদেব কর্তৃক ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও কমলারূপের দর্শন বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত বর্ণনার ভিতর দিয়া ভারতচন্দ্রের তন্ত্রশাস্ত্রে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

তন্ত্রশাস্ত্র রহস্যশাস্ত্র। ইহার তত্ত্ব ও সাধনা গুরুগম্য। মন্ত্রসমূহও রহস্যভাষায় বর্ণিত, তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিই এই সকল মন্ত্রোদ্ধার করিতে পারেন। তন্ত্রসার-রচয়িতা ৺কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশ মহোদয় তাঁহার নিবন্ধে এই সমস্ত রহস্য-মন্ত্র স্ফুটভাবে ব্যাখ্যা করিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন তাহার স্খালনের জন্য জগন্মাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন:

বেদার্থশাস্ত্রবিপরীতবিলোকনেন
প্রায়ো ভবদ্ধনলোপমবেক্ষ্য মাতঃ।
তদ্‌গূঢ়কূটবিশদীকরণেষু জাতান্
মাতঃ ক্ষমস্ব তব পাদযুগেষু যাচে॥

—মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছি, পাছে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া তোমার পূজা লোপ পায়, এই ভয়ে আমি নিতান্ত গূঢ় কূটস্থানের ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতে গুহ্য বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে। মা, তজ্জনিত আমার দোষ তুমি ক্ষমা কর।

তন্ত্রোক্ত দেবীর মূর্তিসমূহ রহস্যাবৃত। সাধন-সিদ্ধ রহস্যবিদ্ আচার্যই এই রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারেন। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী তাঁহার 'জপসূত্রম্' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে যে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, পাঠককে তাহার কিঞ্চিৎ উপহার দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তন্ত্রোক্ত ছিন্নমস্তা বা প্রচণ্ডচণ্ডিকা দেবী আপাতদৃষ্টিতে অতি ভয়ঙ্করী। ভারতচন্দ্রের ভাষায়:

বিকসিত-পুণ্ডরীক-কর্ণিকার মাঝে
তিনগুণে ত্রিকোণমণ্ডল ভাল সাজে।
বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি।
কোকনদবরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী॥
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে॥
কণ্ঠ হইতে রুধির উঠেছে তিন ধার।
একধারা নিজ মুখে করেন আহার॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুই ধারে গিয়ে তারা শব-আরোহণী॥
চন্দ্রসূর্য-অনলশোভিত ত্রিনয়ন।
অর্ধ চন্দ্র কপালফলকে সুশোভন॥

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ দেবীর ছিন্নমস্তা-মূর্তির রহস্য নিম্নোক্ত শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন:

ব্রহ্মাস্মীতি প্রমাণাৎ
পদতলদলিতা বিপ্রতীপা রিরংসা,
প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম পূর্ণা-
দিতিপদ-গমনাচ্ছাস্তিকৃন্মন্ত্রবর্ণৈঃ।
আত্মায়ং ব্রহ্ম চেতি
শ্রুতিষু নিগমনাৎ **তত্ত্বমস্যাদি**তত্ত্বম্,
নাদৈর্ম্‌গ্যস্তদর্থঃ
স্ফুটিতপরিচয়া ছিন্নমস্তাহস্ত গুহ্যা॥

মায়ের একটি রহস্যমূর্তি ছিন্নমস্তা; ইহার মধ্যে বেদান্তের চারিটি প্রসিদ্ধ মহাবাক্য লুকাইয়া রহিয়াছে, সংক্ষেপে তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে:

'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যে বিপ্রতীপ রিরংসা পদদলিত, কারণ ঐ বোধ নিশ্চয় হইলে পরমাত্মাতেই পূর্ণ রতি হয়। ভূমা আত্মাই আত্মার নিরতিশয় প্রিয়, অল্প অনাত্মবস্তুতে প্রিয়বুদ্ধি স্বাভাবিক নহে, অথচ তাহাতেই জীবের ভোগেচ্ছা—ইহাই বিপরীত রিরংসা। ছিন্নমস্তার পদতলে ইহাই দলিত। 'আমি স্বরূপতঃ আনন্দ-ব্রহ্মই, এবং ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নাই'—এই ভাব নিশ্চয়

হইলে বিপরীত রতি দূর হইয়া আত্মরতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

শান্তিপাঠের মন্ত্র 'ওঁপূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং…' ইত্যাদি পদের দ্বারা লক্ষিত 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' ছিন্নমস্তার প্রতীকে প্রকাশিত। আপন মস্তক আপনি ছেদন করিয়া, আপন রক্ত আপনি পান করিয়া তিনি দেখাইতেছেন—ইহাও পূর্ণ, উহাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণকে লইলে পূর্ণই থাকে; পূর্ণ ব্যতীত অপূর্ণ কোথায়?

'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে এইভাবে—দেবীর দিব্য শরীরে যে আত্মা 'রুধির'রূপে রহিয়াছে, তাহাই অন্তর্বহিঃ সর্বত্র।

শ্রুতি যেভাবে নিঃশেষে প্রমাণ করিয়াছেন, সেইভাবে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যরূপ অসি দ্বারা দেবী আপন ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। করের অসি সেই 'অসি'রই প্রতীক। দেহের নিম্নাঙ্গ জীবভাব 'ত্বং' পদার্থ, উত্তমাঙ্গ 'তৎ' পদার্থ, 'অসি' পদটি এতদুভয়ের ভাগত্যাগলক্ষণ প্রদর্শন করিতেছে। উভয়ের বিশেষ ধর্ম ত্যাগ করিয়া উভয়ের সাধারণ 'রুধির' অভিন্ন সত্তারূপে গৃহীত হইতেছে। দেহ হইতে যাহা নির্গলিত, মুণ্ডে তাহাই সমর্পিত। আপন স্বরূপ-পরিচয়ে ছিন্নমস্তা আমাদের বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হউন। মহাবাক্য-চতুষ্টয়ের এরূপ অর্থ—নাদানুসন্ধান বা ওঁকারের অর্থনির্ণয় দ্বারাই সাধককে লাভ করিতে হইবে।

পূর্বোক্ত গ্রন্থে লেখক এইভাবে কালী, তারা, ধূমাবতী প্রভৃতি মহাবিদ্যার তত্ত্বও উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তন্ত্রাচার্যেরা বলেন, বেদান্ত-সাধনার ব্যাবহারিক পদ্ধতি তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বেদান্তের অদ্বৈতানুভূতি ও তন্ত্রের শিবত্ব-জ্ঞান একই বস্তু। মহাবিদ্যাগণের সাধনা এই চরম বস্তুলাভের উপায়। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। তন্ত্রোক্ত সাধনার দ্বারা জীব যখন ঘৃণা, লজ্জা, জাতি, কুল, মান প্রভৃতি অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হয় তখনই সে অনুভব করে, 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।'

জয়তু জয়তু মাতর্বিশ্বসৌভাগ্যদাত্রী
জয়তু জয়তু মাতর্নিখিল-প্রেরয়িত্রী
বিতর বিতর ভক্তিং সর্বদা তে পদাব্জে
লুঠতু লুঠতু চেতো ভৃঙ্গকস্তে পদাব্জে ॥

এল ঐ

শ্রীকালীপদ সর্খেল

বেগে বয় ভরানদী উচ্ছল ছল ছল,
শারদ শশীর হাসি মধুময় উজ্জ্বল,
মধুর চাঁদিনী রাতে মাতোয়ারা দিখিকুল
তুলিতেছে কলতান, ফুল্ল কানন-ফুল,
দোদুল্ দোদুল্ দুল্, কাশফুল দুলিছে,
শ্যামল ধরণীতলে হিল্লোল তুলিছে,
সুনীল সরসীজলে বিকশিত শতদল,
গাহিছে ভ্রমর সুখে, সমীরণ চঞ্চল।
বিল্ব-বিটপী-মূলে শঙ্খ বাজিল ঐ
মৃন্ময়ীরূপে মোর চিন্ময়ী এল ঐ।

স্বর্ণমুকুট মাথে কানে দোলে কুণ্ডল
সুহাসিনী মুখখানি সুন্দর ঢল ঢল
কোমল কমল-আঁখি করুণায় টলটল,
সমরে শরমহারা আলুথালু অঞ্চল।
লম্বিত কুঞ্চিত এলায়িত কুন্তল
মঙ্গলা দশ হাতে আনিয়াছে মঙ্গল।
করুণা-কাতর হিয়া স্নেহের তুলনা নাই,
দুষ্ট দানব, তবু চরণে দিয়েছে ঠাঁই।
মাটির দেউলে মোর নাশি ঘন-তম-ঘোর
অরুণ উদিল আজি দুখ-নিশি হ'ল ভোর।

প্রার্থনা

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনে জমেছে অনেক দুঃখ গ্লানি
ব্যথাহত প্রাণে আজি পরাজয় মানি।

এতদিন মনে ছিল এ অহংকার
পেতে পারি সবই শক্তিতে আপনার।
কিন্তু দেখিনু ধরিতে গিয়েছি যারে
কালের প্রবাহে হারায় তা বারে বারে।
এই কাছে টানি, এই পুন দূরে ঠেলি
চাওয়া পাওয়া নিয়ে কতই না খেলা খেলি।

কী যে চাই তাহা নিজেই বুঝি না হায়
খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন যে কেটে যায়।
জ্ঞানে অজ্ঞানে চেয়েছি কতনা কিছু
ছুটিয়া চলেছি মায়া-হরিণের পিছু।
যতই চেয়েছি সম্পদ্ সম্মান
বেড়েছে যাতনা লভিয়াছি অপমান।

সীমাহীন এই চাওয়ার বিরতি করি
চরণে টানিয়া লও দয়াময় হরি।

আমার যা কিছু সকলি তোমার হোক্
ঘুচুক দ্বন্দ্ব বেদনা দুঃখ শোক।

কবে?

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

কতবার চাহিয়াছি ওগো ভগবান্!
তোমার দুয়ারে,
করিয়াছ দান, তাতে নাহি প্রতিদান,
দিয়েছ আমারে
—কুবেরের সম।

আবার চেয়েছি আমি দু'হাত বাড়ায়ে
ফুরায়েছে যবে,
সে চাওয়া হয়নি শেষ, হবে না কখনো,
চিরদিন রবে--
চাতকের সম॥

তোমার আমার মাঝে চাওয়া আর পাওয়া
কবে হ'বে শেষ?
কবে এসে খুলে দেবে প্রাণের দুয়ার
ওগো পরমেশ?
বল দয়া ক'রে।

কবে এসে ভালবেসে বসিবে আমার
হৃদয়-কমলে?
পূজিব তোমায় কবে আঁখিজল দিয়ে
প্রিয়তম ব'লে
চিনিব তোমারে?

প্যারীচাঁদ মিত্র ও বাংলা সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

ডিরোজিওর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় আসন লাভ করেছেন। পূর্বগামী সাহিত্যিকদের মধ্যে কবিতায় মধুসূদন এবং গদ্যে প্যারীচাঁদকেই বঙ্কিমচন্দ্র সবচেয়ে বেশী অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'[১] বাংলা গদ্যের শৈলী ও বিষয়বস্তু—উভয়ক্ষেত্রেই দিক্-পরিবর্তনের পরিচায়ক। সাহিত্য-স্রষ্টারূপে তাঁর কৃতিত্বের চেয়ে সাহিত্যের পথিকৃৎরূপেই তাঁর সার্থকতা বেশী। অবশ্য আজ অবধি আমরা তাঁর 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামটিকেই বিশেষভাবে স্মরণ করি এবং 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রাক্-বঙ্কিম সাহিত্যের বিস্ময়কর সৃষ্টি ; তবু সাহিত্যকে পণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করার কৃতিত্বের জন্যই তিনি আজ অবধি স্মরণীয়। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের বিচারে একমাত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' ছাড়া প্যারীচাঁদের আর কোন রচনাই উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু প্যারীচাঁদের সমগ্র রচনাবলী অন্য কারণে আমাদের কাছে আগ্রহের বস্তু।

ডিরোজিওর যুগটিকে অনেকে ভুল ক'রে ভাঙনের যুগ বলেই মনে করেন। কিন্তু ডিরোজিও-শিষ্যদের পরবর্তী জীবনের কর্মধারা অনুধাবন করলেই বুঝতে পারা যায় যে, সমগ্র দেশের চিন্তায় ও কর্মে নূতন উদ্যম ও সংগঠনের প্রেরণা নিয়ে আসাই তাঁদের ব্রত ছিল। রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, তাঁর ছোট ভাই কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির জীবনকাহিনীর মধ্য দিয়ে নবযুগের বাংলা গড়ে উঠেছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের এই চিন্তা ও কর্মনায়কেরা বাঙালীমানসে কী সম্পদ এনে দিয়েছিলেন, তার কিছুটা পরিচয় মেলে প্যারীচাঁদের রচনাবলীতে। এই প্রবন্ধে আমরা বিশেষভাবে সেদিকটির আলোচনাই ক'রব।

প্রথম জীবনে প্যারীচাঁদ তিনজন মনীষীর নিকট সংস্পর্শে এসেছেন—ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও এবং রামমোহন। প্যারীচাঁদের মননভূমি এই তিনটি মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে গড়ে উঠেছে। ডেভিড হেয়ারের বাংলা ও ইংরেজী দুটি জীবনী তিনি লিখেছেন। 'জীবনী' হিসাবে তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও হেয়ার সাহেবের উদ্দেশ্যে প্যারীচাঁদের স্বতঃ-উৎসারিত ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিচায়ক গ্রন্থ দুটি পড়ে আমরা বুঝতে পারি যে 'পরহিতায়' উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হেয়ার সাহেবের প্রভাব কত গভীরভাবে তাঁর অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে ডিরোজিওর আকর্ষণে অন্যান্য অনেক ছাত্রের মতো প্যারীচাঁদও যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানসাধনার নূতন জগতের সন্ধান পেলেন। দু-বৎসরেরও কম সময় (১৮২৯-এর জুলাই থেকে ১৮৩১-র এপ্রিল)[২] প্যারীচাঁদ এই অসাধারণ শিক্ষকের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পরবর্তী জীবনের জ্ঞানসাধনা ও জ্ঞানবিস্তারের প্রচেষ্টার মূলে এই 'নব্যবঙ্গে'র অন্যতম শিক্ষাগুরুর প্রেরণাই সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে।

হিন্দুকলেজের এই তরুণ অধ্যাপক ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনার মধ্য

১ খৃঃ ১৮৫৮

২ কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র—মন্মথনাথ ঘোষ পৃঃ ১৩-১৬

দিয়ে তাঁর ছাত্রদের অন্তরে যে স্বাধীন চিন্তা-শক্তির প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন, তার ফলেই পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে মানসমুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়। ডিরোজিওর ছাত্রদের সত্যানুরাগ ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা শিক্ষিত সমাজে মনুষ্যত্বের নূতন মানদণ্ড সৃষ্টি করে। সেইসঙ্গে তাদের পাশ্চাত্যমুখী ইহজীবনসর্বস্ব মনোভাবও এদেশের চিন্তাশীল মানুষের কাছে উদ্বেগের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। অবশ্য প্রথম জীবনের উন্মাদনা কেটে যাবার পর ডিরোজিওর শিষ্যেরা অনেকেই ভারতীয় চিন্তাধারার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রতি আবার মনোযোগী হন। প্যারীচাঁদের রচনাবলীতে সে মনোযোগের ফল দেখতে পাওয়া যায়, ডিরোজিওর চির অতৃপ্ত জ্ঞানতৃষ্ণার উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন প্যারীচাঁদ।

প্যারীচাঁদের কর্মজীবন তাঁর এই জ্ঞানচর্চার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। সে যুগের ইংরেজী শিক্ষিতদের কাছে সরকারী উচ্চপদের যে লোভনীয় আকর্ষণ ছিল, প্যারীচাঁদ অনায়াসে সেই আকর্ষণ জয় ক'রে গ্রন্থাগারিকের কাজ গ্রহণ করেছিলেন। কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরির সহকারী গ্রন্থাগারিক থেকে ক্রমে তিনি প্রধান গ্রন্থাগারিকের পদে উন্নীত হন। এই গ্রন্থাগারটিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলার সঙ্গে সঙ্গে প্যারীচাঁদ তাঁর নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডারটিও পূর্ণতর ক'রে তোলেন। কর্মক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ এই গ্রন্থাগারের কাজ ছাড়া কিছুকাল বহির্বাণিজ্যের কাজও করেন। সেকালের অনেক বড় বড় ইংরেজ কোম্পানীতে তিনি অন্যতম ডিরেক্টরও ছিলেন। তবে শেষ অবধি ব্যবসায়ে তাঁর প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়। জ্ঞানার্জনের সাধুতা অর্থোপার্জনের ব্যাবসায়িক ক্ষেত্রে সুফলদায়ী হয়নি। কিন্তু এই ক্ষয়ক্ষতির ঊর্ধ্বে ছিল প্যারীচাঁদের চিত্তপ্রশান্তি। জীবনের প্রধান ব্রতটি তিনি সাধকের মতোই উদ্‌যাপন ক'রে গেছেন। সে ব্রত জ্ঞানার্জনের ও জ্ঞান-বিতরণের।

স্বদেশসেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সেকালের নব্যবঙ্গের তরুণদের সহায়তায় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' ধীরে ধীরে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে' পরিণত হয়। প্যারীচাঁদ সেই এসোসিয়েশন বা সমিতির একজন প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের মতো প্যারীচাঁদ দেশের উৎপাদন থেকে শুরু ক'রে শাসনপদ্ধতি অবধি সর্ববিষয়েরই মনোযোগী এবং উন্নতিকামী সমালোচক ছিলেন। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৮ খৃঃ স্থাপিত) প্যারীচাঁদের মতো জ্ঞানান্বেষীকে স্বভাবতই আকর্ষণ করেছিল। 'কলিকাতা রিভিউ' এবং 'এগ্রিহর্টিকালচ্যারাল সোসাইটি'র মুখপত্রে তিনি যে বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন, সেগুলি স্বদেশ-কল্যাণে ব্রতী প্যারীচাঁদের মানস প্রবণতার পরিচায়ক।

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে 'জ্ঞানান্বেষণ,' 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' এবং 'মাসিক পত্রিকা'র সঙ্গে প্যারীচাঁদের স্মৃতি বিজড়িত। শেষোক্ত পত্রিকাটির প্রকাশক প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ শিকদার। ১৮৫৪ খৃঃ যখন এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, তখন বাংলা গদ্যের আর একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীও আবির্ভূত; বিদ্যাসাগর ঐ বৎসরেই তাঁর 'শকুন্তলা' প্রকাশ করেন। প্যারীচাঁদের পত্রিকা-প্রকাশের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার। উদ্দেশ্যের এই মহত্ত্বের জন্য তিনি আজও আমাদের নমস্য। 'মাসিক পত্রিকা'র আদর্শ ছিল:

> 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাবসকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।'

১৮৬০ খৃঃ প্যারীচাঁদের পত্নীবিয়োগ হয়। এই সময় থেকে তিনি পরলোক-রহস্য সম্বন্ধে আগ্রহশীল হন। কিন্তু অধ্যাত্মপ্রবণতা প্যারীচাঁদের নিজস্ব সংস্কারের মধ্যে আগে থেকেই ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁর 'On the Soul'[৩] (১৮৮১) গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন:

ছোটবেলায় আমি মূর্তিপূজকরূপেই গড়ে উঠেছিলাম। হিন্দু কলেজে আমি শিক্ষালাভ করি। একদল মনোমত বন্ধু পেয়ে আমি তাদের সঙ্গে প্রায়ই দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি এবং অন্যান্য নানা বিষয়ের আলোচনা করতাম। ভগবান ও ভগবৎ-বিধান সম্বন্ধে আমার আন্তরিক আগ্রহ ছিল, সেজন্য আর্য ও খৃষ্ট ধর্মের নানা শাস্ত্রগ্রন্থ এবং সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থাদি পড়েছি। এ সমস্ত পঠন-পাঠনের ফলে আমার অন্তরে এই বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে যে এক অনন্ত পূর্ণতাময় ভগবানই আছেন। আমি তখন একেশ্বরবাদী (theist) বা ব্রাহ্ম হ'লাম।

শুধু প্যারীচাঁদ নন, ডিরোজিওর অনেক শিষ্যই রামমোহন-প্রবর্তিত ও দেবেন্দ্রনাথ-বর্ধিত ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজকে আপন ব'লে গ্রহণ করেন। কারণ—দেশাচার ও কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন তদানীন্তন হিন্দুসমাজ নবযুগের বাণীকে তখন অবধি গভীরভাবে গ্রহণ করেনি। তাই প্রচলিত ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে একটি শোভন ও যুক্তিসঙ্গত অধ্যাত্মচিন্তার রূপ দেখা দিয়েছিল ব্রাহ্মধর্মে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ অবধি ব্রাহ্মধর্ম ছিল হিন্দুধর্মেরই যুগোপযোগী সংস্করণ। ব্রাহ্ম ও হিন্দুর কষ্ট-কল্পিত পার্থক্য তখন অবধি দেখা দেয়নি। প্যারীচাঁদও সেই অর্থে হিন্দুধর্মেরই ব্রাহ্মশাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্যারীচাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির মূল প্রেরণা ছিল স্বদেশ ও সমাজের কল্যাণচিন্তা। আধুনিক কালে কল্যাণচিন্তা গৌণ হ'য়ে শিল্পসৌন্দর্যই লক্ষ্য হ'য়ে উঠেছে। যথার্থ সাহিত্য কল্যাণ ও সৌন্দর্যের সমন্বয়। প্যারীচাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টির পটভূমিতে কী ধরনের চিন্তাধারা কাজ ক'রত, তার নিদর্শন পাওয়া যাবে তাঁর গ্রন্থগুলির ভূমিকায়। 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভূমিকায় ইংরেজীতে তিনি লিখেছেন:

The above original novel in Bengali being the first work of the kind, is now submitted to the public with considerable diffidence. It chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks on the existing system of education...and is illustrative of the condition of the Hindu society, manners and customs, etc. and partly of the state of things in the moffussil. The work has been written in a simple style and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language and and an acquaintance with Hindu domestic life, it will perhaps be useful.

বাংলা সাহিত্যের সভায় প্যারীচাঁদ তাঁর এই উপন্যাসটি উপস্থিত করতে একটু কুণ্ঠাবোধ করেছিলেন। হয়তো বাংলা সাহিত্যে এই জাতীয় রচনা এই প্রথম বলেই তাঁর সঙ্কোচ। এ গ্রন্থ-রচনায় তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং হিন্দুসমাজের আচার আচরণ ও জীবনযাত্রার একটি ছবি ফুটিয়ে তোলা। সেই সঙ্গে বিদেশীদের বাংলা শেখানোর 'ফোর্ট উইলিয়ম'-কলেজীয় সংস্কারও ছিল। তাই প্রবাদ-প্রবচনের দ্বারা 'আলালী' ভাষাকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্ম নামে প্যারীচাঁদের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়?' (১৮৫৯); বইটির নামকরণেই এর উদ্দেশ্য প্রকাশিত। সেকালের কলকাতার চিত্র-

৩ মূল ইংরেজীর পুরো নাম—On the Soul: Its nature and Development দ্রষ্টব্য—প্যারীচাঁদ মিত্র: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিসাবে এ বইটিরও অসাধারণ মূল্য। মদ খাওয়ার যে জোয়ার নব্যবঙ্গের দল এদেশে এনেছিলেন, তার ফলহিসাবে এই বইয়ের 'ভবানীবাবু' চরিত্রটি লক্ষণীয় :

ভবানীপুরের ভবানীবাবু কালেজে পড়াশুনা করেন। লেখাপড় শিখিলে সকলেরই একটু হিতাহিত বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু নীতি-বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান জন্মাইতে হইলে বিশেষ উপদেশের আবশ্যক হয়, সেরূপ উপদেশ কালেজে হয় না। একে এই ব্যাঘাত, তাতে অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়াতে কতকগুলা বেলেল্লা ছোঁড়ার সঙ্গে সহবাস করিয়া ভবানীবাবু কপ্‌চাতে না শিখিতে শিখিতে মদ খেতে আরম্ভ করিলেন।[৪]

শুধু ভবানীবাবুই নয়—'কলিকাতায় যেখানে যাওয়া যায় সেইখানেই মদ খাইবার ঘটা। কি দুঃখী—কি বড় মানুষ, কি যুবা—কি বৃদ্ধ, সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে।'[৫]

এ যুগের কলিকাতায় মদের জায়গায় 'সিনেমা' কথাটি বসালে খুব ভুল হবে না। সে যাই হোক, প্যারীচাঁদের উদ্দেশ্য এই পানাসক্তির মূলোচ্ছেদ। ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও সহৃদয় সাবধানবাণীর মধ্য দিয়ে প্যারীচাঁদ যে উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন।

সম্পূর্ণভাবে নারীজাতির মানসিক উন্নতির জন্য লেখা প্যারীচাঁদের 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০) এবং 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৮) বই দুটি শিক্ষামূলক। 'রামারঞ্জিকা'র ভূমিকায় প্যারীচাঁদ লিখেছেন, 'হিন্দু নারীদের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব লক্ষ্য ক'রে লেখক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থরচনায় ব্রতী হয়েছেন'।[৬]

এ বইটিতে স্বামীস্ত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সংসারজীবন থেকে অধ্যাত্ম জীবনের আদর্শ তিনি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। মেয়েদের কথা বলার বিশেষ ভঙ্গীটি প্যারীচাঁদ নিপুণভাবে ফুটিয়েছেন। নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় যে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করছিলেন, তার প্রমাণ এ গ্রন্থে 'স্বামী'র কথাবার্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা'-র ভূমিকায় প্যারীচাঁদ লিখেছেন :

আর্যবংশীয় মহিলাগণ! আপনাদিগের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচিত হইল। ইহা পাঠে প্রতীয়মান হইবে যে, পূর্বকালে এতদ্দেশীয় অঙ্গনাগণ সর্বপ্রকারে সম্মানিত ও পুজিত হইতেন, এজন্য অদ্যাবধিও এই সংস্কার যে স্ত্রীলোক দেবীস্বরূপ—স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ ভগবতী। পূর্বকালের অঙ্গনাগণের শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা হইত না—প্রকৃত অন্তর-শিক্ষা হইত, এই কারণ তাঁহাদিগের ঈশ্বরজ্ঞান ও আত্মার অমরত্ব হৃদয়ে জাজ্বল্যমান ছিল। তাঁহারা অন্তঃপুরে রুদ্ধ থাকিতেন না ও বৈবাহিক বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহ করিতেন না। এক্ষণে স্ত্রীলোক-বিষয়ক অনেক প্রণালী বিবেচিত হইতেছে, কিন্তু আসল শিক্ষা ঈশ্বরকে আদর্শ না করিয়া হইতে পারে না। স্ত্রীলোক যে অবস্থাতেই থাকুন—বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা, সধবা কিম্বা বিধবা, সম্পদে কিম্বা বিপদে, আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত না হইলে ঐহিক কিম্বা পারত্রিক মঙ্গল বা উন্নতিসাধন কখনই হইতে পারে না।

এই ছিল প্যারীচাঁদের স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ।

ভারতীয় নারীত্বের আদর্শরূপে অধ্যাত্ম-সংযম যে সুদূর অতীত থেকেই গৃহীত হয়েছে, সে কথা বৈদিক ও পৌরাণিক নারীদের সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনার মধ্য দিয়ে প্যারীচাঁদ প্রমাণ করেছেন। এই আদর্শের অনুসরণেই এ দেশের মেয়েরা ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করতেন, পুনর্বিবাহে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং সহমরণকে শ্রদ্ধেয় জ্ঞান করতেন।[৭]

এ বইয়ের উপসংহারে প্যারীচাঁদ লিখেছেন :

বাহ্য আড়ম্বরীয় শিক্ষাতে সমাজ সুশোভন হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরপরায়ণত্বের ব্যাঘাত, আত্মবলের হ্রাস ও প্রকৃতির

৪ মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়?—১ম পরিচ্ছেদ।

৫ ঐ—২য় পরিচ্ছেদ।

৬ বঙ্গানুবাদ।

৭ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা (২য় সং)—পৃঃ ১২-১৩ (প্রথম প্রকাশ—১৮৭৮)।

প্রাবল্য। ঈশ্বরপরায়ণত্ব ও আত্মবলের জন্য এ দেশের মহিলাগণ পূর্ব্ব হইতেই বিখ্যাত। কোন্ দেশে পতির জন্য স্ত্রীলোক অগ্নিতে গমন করে ও সর্বত্যাগী হইয়া ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করে? সামাজিক বিবেচনায় ইহা যদিও প্রসিদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু আত্মবলের পক্ষে ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ। আর্য্যজাতীয় মহিলাগণ! সতী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি ঈশ্বরপরায়ণা নারীদের চরিত্র সর্বদা স্মরণ কর। তাঁহাদিগের ন্যায় শম, যম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর, ও সমাহিত হইয়া উপরতিতে পূর্ণ হও।'[৮]

প্যারীচাঁদের এই আদর্শবাদের পাশাপাশি নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল। অতীতের উপনিষদ্-পুরাণেই তিনি এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদাহরণ পেয়েছেন। তাই আধুনিক কালেও 'বিবাহ', 'স্ত্রীলোকের বাহিরে গমন' প্রভৃতি বিষয়ে স্ত্রীলোকের স্বাধীন অভিরুচিকে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে জোর দিয়েছেন অন্তরের পবিত্রতার উপর।

প্যারীচাঁদের কল্পনায় যে আদর্শ নারী ছিলেন, তাঁর বিভিন্নরূপ দেখতে পাই 'রামারঞ্জিকা'র দ্রবময়ী, 'অভেদী'র অভেদী, এবং 'আধ্যাত্মিকা'র আধ্যাত্মিকা চরিত্র তিনটিতে। হিন্দু নারীর জীবনে একটি পবিত্র ও গতিশীল আদর্শ সঞ্চারিত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। 'বামাতোষিণী' (১৮৮১) গ্রন্থের ভূমিকায় দেখি, প্যারীচাঁদের ইচ্ছা ছিল, যেন এই বইগুলি মেয়েদের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়। শৈশব থেকেই মেয়েদের অধ্যাত্ম শিক্ষার উপরে ভিত্তি ক'রে উপযুক্ত কন্যা, ভগ্নী ও মাতা হ'তে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন—এ কথাটি প্যারীচাঁদ উপলব্ধি করেছিলেন।[৯]

নারীজাতির উন্নতিপ্রচেষ্টায় রামমোহন ও রাধাকান্তদেবের প্রচেষ্টার সঙ্গে ডিরোজিও-শিষ্যদের আন্তরিক সহযোগিতা এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্যারীচাঁদের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হওয়ার যুগেই বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দোলন এবং স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রচেষ্টা বাংলাদেশের সমাজ-চিত্তকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। সেই সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের নারী-স্বাধীনতার আদর্শও ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজকে স্পর্শ করতে থাকে। এ বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের দল। প্যারীচাঁদের রচনায় আমরা অন্তরের ধর্মনিষ্ঠা ও বাহিরের স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনের শুভ প্রচেষ্টা দেখতে পাই। তবে প্যারীচাঁদের মধ্যবয়স অবধি এ দেশে নারী-স্বাধীনতার বহির্মুখী দিকটি তত প্রবল হয়নি। প্যারীচাঁদের আদর্শ নারীচরিত্রগুলি অধ্যাত্ম উপলব্ধির আলোকে ইহজীবনকে সার্থক ও সমুজ্জ্বল ক'রে তুলতে প্রয়াসী, কিন্তু স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ নয়।

প্যারীচাঁদের অধিকাংশ রচনাতেই আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অধ্যাত্ম-সংস্কারের দিক থেকে প্যারীচাঁদ ঔপনিষদিক জ্ঞান-সাধনার পক্ষপাতী। যদিচ অধিকারী-ভেদে ভক্তি-সাধনার প্রয়োজনও তিনি স্বীকার করতেন। এ বিষয়ে তাঁর মত:

'উপনিষদের জ্ঞানসুধা, পুরাণের ভক্তিসুধার সহিত মিলিত হইয়া ভক্তির প্রবলতায় আত্মার শুদ্ধ জ্ঞান, প্রকৃতি হইতে অতীত হয় নাই, সুতরাং ভক্তির প্রাবল্য ও আত্মার অনন্ত জ্ঞানের খর্বতা করা হইয়াছিল।'[১০]

জ্ঞানযোগের পথিক হলেও প্যারীচাঁদ ভক্তিযোগের মহিমা একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি। তাই অন্যত্র মন্তব্য করেছেন, 'পুরাণাদিতে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানের প্রশস্ততা

৮ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা (২য় সং)—ঐপৃঃ ১৯-২০।

৯ বামাতোষিণীর Preface (ভূমিকা)

১০ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা (২য় সং)—পৃঃ ১১

অনেক খর্ব হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের বৃদ্ধি হইয়াছে।'[১১]

পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্র পৌরাণিক ভক্তিবাদকে আরও মর্যাদা দিয়েছেন। ব্রাহ্ম-সমাজ নিরাকার সাধনার জন্য পুরাণকে প্রায় অস্বীকার ক'রে উপনিষদকেই একমাত্র অবলম্বন ক'রে তুলেছিল।

সাকার ও নিরাকার উপাসনাপ্রসঙ্গে প্যারী-চাঁদের মন্তব্য লক্ষ্যণীয়:

'সাকার উপাসকেরা হস্তনির্মিত দেবতা অর্চনা করে। নিরাকার উপাসকেরা দেবতা পূজা করে, উভয়ের ঈশ্বর ফলতঃ সগুণ ঈশ্বর—পৌত্তলিক এবং অপৌত্তলিক উপাসনা সাকার ও নিরাকার ঈশ্বর-অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আত্মার উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অভ্যাসে সাকার উপাসক অধিক পৌত্তলিক, ও নিরাকার উপাসক অধিক পৌত্তলিক হইতে পারে।'[১২]

ব্রাহ্ম সমাজের যে উদার ও অপক্ষপাতী মনোভাব সেযুগে ছিল, উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যটি তারই পরিচায়ক।

প্যারীচাঁদের অধ্যাত্ম-আদর্শের একটি সামগ্রিক রূপ 'অভেদী' গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে 'অভেদী'-র আত্মকাহিনীর মধ্যে পাই—··· 'ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানা জীবনের লক্ষ্য।··· ঈশ্বরের কৃপাতে এক্ষণে পাপ, পুণ্য, নরক, স্বর্গ হইতে আত্মা অতীত—ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক অভ্যাসে আত্মার মুক্ত শক্তি অনেক প্রাপ্ত হইয়াছি। শরীর বিগত হইলে আত্মার কি কার্য হইবে তাহাও বুঝিতেছি। ঈশ্বর জ্ঞান এক্ষণে যে কি মধুময় তাহা আত্মাতে প্রচুর-রূপে জানিতেছি; বাক্যেতে তাহা বলিতে পারি না। 'যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'।'[১৩]

১১ যৎকিঞ্চিৎ (২য় সং)—পৃঃ ৫৪ (১৮৬৫)
১২ অভেদী (১৮৭১)—পৃঃ ৪০
১৩ ঐ —পৃঃ ৪১-৪২

'যৎকিঞ্চিৎ' আর একটি তত্ত্বালোচনা-প্রধান গ্রন্থ। প্যারীচাঁদ এ গ্রন্থে তাঁর ধর্মচর্চা ও চিন্তার সারসংক্ষেপ দেবার চেষ্টা করেছেন 'জ্ঞানানন্দে'র কথোপকথনে। অধ্যাত্মসাধনার পাশাপাশি ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষার বিস্তার এবং জনহিতব্রতের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মসমাজের যে প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল 'যৎকিঞ্চিৎ' এবং 'বামাতোষিণী' বই দুটিতে তার পরিচয় মেলে। 'যৎকিঞ্চিৎ' প্রধানতঃ আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যাত্মচর্চার পটভূমিতে লেখা। 'বামাতোষিণী'-তে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নব্যশিক্ষিতদের নবপ্রচেষ্টার বিবরণ মেলে। এই বইটির সপ্তম পরিচ্ছেদটির নাম 'সাধারণ জ্ঞান-উপার্জিকা সভা'। এই সভার একটি অধিবেশনের ছবি আঁকতে গিয়ে প্যারীচাঁদ তাঁর সহপাঠী ও সমকালীন মনীষীদের পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। ডিরোজিও-শিষ্য রামতনু লাহিড়ী সে সভার সভাপতি, রসিককৃষ্ণবাবু মুখ্য বক্তা, শিবচন্দ্র, কৃষ্ণমোহন প্রভৃতিও যোগদানকারী। প্রধান আলোচ্য বিষয় যুগোপযোগী স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা। কাহিনীর শেষ দিকে এক ব্রাহ্মবিবাহ-সভায় রামতনুবাবু আচার্যের কাজ করছেন।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শিক্ষিত সমাজে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানপ্রচারের যে আগ্রহ ও প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল, প্যারীচাঁদের রচনাবলীতে আমরা এতক্ষণ সেই পরিচয়-লাভের চেষ্টা করেছি। সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ এই পরিবর্তনশীল জীবন-ধারার যে বিচিত্র পরিচয় নানা চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, সেদিক থেকে বিচার করলেও তাঁর কৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু কৃতিত্বের পরিসর সীমাবদ্ধ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর চরিত্র-সৃষ্টি রেখাঙ্কনের বেশি অগ্রসর হয়নি। যে ক্ষেত্রে হয়েছে সে ক্ষেত্রেও ভালোকে

অবিমিশ্র ভালো এবং মন্দকে অবিমিশ্র মন্দ রঙে আঁকতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ভারসাম্য হারিয়েছেন। তবু ছোট ছোট রেখাচিত্রে মানবচরিত্রের একটি দিক[১৪]—সমকালীন সমাজের আংশিক পরিচয় অথবা বাঙালীর বিভিন্ন ভাষাভঙ্গীর বৈচিত্র্য—এ সবই প্যারীচাঁদের সাহিত্যিক নৈপুণ্যের আশ্চর্য নিদর্শন। দু'চারিটি উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে।

'আলালের ঘরের দুলালে'র বাবুরামবাবু—'বাবুরামবাবু' চৌগোঁপ্পা, নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতি-পরা—ফুলপুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মত—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—এক গাল পান—এ হেন বাবুরামবাবু একদিন—

'এক ছিলিম তামাক খাইয়া একখানা ভাড়া গাড়ি অথবা পাল্কির চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভাড়া বনিয়া উঠিল না—অনেক চড়া বোধ হইল। রাস্তায় অনেক ছোঁড়া একত্র জমিল। বাবুরামবাবুর রকমসকম দেখিয়া কেহ কেহ বলিল, 'ওগো বাবু ঝাঁকামুটের উপর বসে যাবে? তাহা হইলে দুপয়সায় হয়?' 'তোর বাপের ভিটে নাশ করেছে'—বলিয়া যেমন বাবুরামবাবু দৌড়িয়া মারিতে যাবেন, অমনি দড়াম করিয়া পড়িয়া গেলেন…।'

এ জাতীয় বর্ণনার সরসতায় প্যারীচাঁদ সিদ্ধহস্ত। এই বইটির 'ঠকচাচা' ও 'ঠকচাচীর' বর্ণনা তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ঈশ্বরগুপ্ত যে 'পক্ষীর দলে'র উল্লেখ করেছেন, সেই নেশাখোর পক্ষীর দলের নিখুঁত বর্ণনা 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়?'-এর দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য। এই সামাজিক অসঙ্গতিগুলির বর্ণনায় প্যারীচাঁদের বর্ণনাভঙ্গী এত সজীব ও উচ্চাঙ্গের হাস্যরসময় যে আধুনিক কালের সাহিত্যিকেরাও এ ভঙ্গী থেকে শিক্ষণীয় উপাদান পেতে পারেন।

সুতরাং প্যারীচাঁদের রচনাবলীতে যে জ্ঞানগাম্ভীর্যের পরিচয় আমরা আগে পেয়েছি, সেটি তাঁর রচনার একাংশ; প্যারীচাঁদের আদর্শনিষ্ঠাই তাঁকে অন্যদিকে অসঙ্গতি-সচেতন ও পরিহাস-নিপুণ ক'রে তুলেছে। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে প্রহসনের প্রাচুর্যও অনেকটা এই কারণে।

প্যারীচাঁদের রচনাবলী পাঠে এ কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে প্যারীচাঁদের সাহিত্যপ্রতিভা বাস্তবজীবনের অসঙ্গতি যতটা নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে, জীবনের সুসমঞ্জস চিত্রাঙ্কনে ততটা সার্থক হয়নি। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলালে'র নায়ক মতিলাল বিশেষভাবে সে যুগের প্রতিনিধিই নয়। বড়লোকের অশিক্ষিত খামখেয়ালী ও কুসংসর্গী ছেলের এ ধরনের অধঃপতন চিরকালই হয়। মতিলালের অধঃপতনের কারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাবসংঘাত নয়। সে হিসাবে 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'সধবার একাদশী' প্রহসন দুটি উল্লেখযোগ্য। তবে ইংরেজ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পরোক্ষ প্রভাবে এবং কলিকাতার হঠাৎ-ধনীদের নাগর-সংস্কৃতির বিকৃত সংসর্গে এসে মদ খাওয়া, উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার, নাস্তিকতা এবং জীবনের মহত্তর আদর্শে শ্রদ্ধাহীনতা কীভাবে একটি শ্রেণীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছিল, আলালের ঘরের দুলালদের কীর্তিকাহিনী তারই পরিচায়ক। অন্যদিকে চিন্তার জগতে যে নূতন আলোড়ন নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা, যুক্তিবাদ, কুসংস্কার-বর্জনের প্রতিজ্ঞা এনে দিয়েছিল সে দিকেও প্যারীচাঁদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নবযুগের আদর্শরূপে এই চরিত্রগুলি ('আলালের ঘরের দুলালে' রামলাল ও বরদাবাবু, 'বামাতোষিণী'র গোপাল ও শান্তিদায়িনী, 'আধ্যাত্মিকা'র হরদেব তর্কালঙ্কার ও আধ্যাত্মিকা প্রভৃতি) প্রাচীন ও নবীন যুগের সদ্‌গুণসমন্বয়ে গঠিত। চরিত্রহিসাবে এরা 'ঠকচাচা'দের মতো জীবন্ত নয়, কিন্তু প্যারীচাঁদ যে মনুষ্যত্বের সন্ধানী ছিলেন—এই চরিত্রগুলি

১৪ প্যারীচাঁদের রচনাবলীতে অজস্র 'টাইপ' চরিত্র সৃষ্টির উদাহরণ মেলে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে উপন্যাসের জীবনজিজ্ঞাসা ব্যাপকতর—তাই চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে টাইপের পরিবর্তে গোটা মানুষের দেখা পাই।

তারই পরিচায়ক। পাশ্চাত্য সভ্যতার সদ্গুণাবলীর প্রতি প্যারীচাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল—তাই এই সব চরিত্রের মধ্যে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যা কিছু মহৎ ও গ্রহণীয় তার সমাবেশ দেখতে পাই।[১৫] বরদাবাবু বা গোপালবাবু-জাতীয় চরিত্রেরা নিজেদের ভালোটুকু নিয়ে আত্মস্থ হ'য়ে বসে থাকেননি, সংসারসমাজে সেই কল্যাণের আদর্শ সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছেন। এই কল্যাণপ্রচেষ্টা পাশ্চাত্য রজোগুণের দ্বারা সঞ্চারিত, অন্যদিকে আত্মোপলব্ধির যে আদর্শ প্যারীচাঁদের বিভিন্ন নারী ও পুরুষ-চরিত্রে দেখতে পাই, সে আদর্শ আমাদের সনাতন উত্তরাধিকার।

সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে মননশীলতার উপাদান-গুলি সৃষ্টির মধ্যে এমন ভাবে আত্মলীন ক'রে থাকা প্রয়োজন যাতে শিল্পের চেয়ে দর্শন বড় না হ'য়ে দাঁড়ায়। প্যারীচাঁদের রচনাবলীর প্রধান ত্রুটি এইখানে। প্যারীচাঁদ মানবজীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং সংশিক্ষাপ্রচারের জন্য যতটা চিন্তিত, সাহিত্যসৃষ্টির জন্য ততটা নয়। তাঁর সমগ্র রচনাবলী পাঠ ক'রে বিশুদ্ধ নৈতিক জীবনযাপনের প্রেরণা যতটা পাওয়া যায়, জীবনের বহু বিচিত্র ভাবলীলার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-রস ততটা অনুভব করা যায় না। বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রবণতা কেমন ক'রে মহৎ শিল্প-সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে, প্যারীচাঁদের রচনাবলী তার উদাহরণ। অথচ সে সম্ভাবনা যে ছিল, একমাত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'ই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

বাংলা গদ্যের শিল্পরূপ ও বিষয়-বস্তুর ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের দান আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল ছায়াতল থেকে বাংলা সাহিত্য-তরুটিকে তিনি আপন আকাশ-বাতাসে শাখা মেলবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন।[১৬]

কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্যের অন্য একটি দিকেও প্যারীচাঁদের প্রভাব রয়েছে। 'আধ্যাত্মিকা' 'অভেদী' প্রভৃতি চরিত্রে প্যারীচাঁদ নারীজাতির মধ্য দিয়ে যে আদর্শ মনুষ্যত্বের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' তারই পূর্ণাঙ্গ রূপ। বস্তুতঃ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য নারীজাতির যে সশ্রদ্ধ বন্দনায় মুখর, প্যারীচাঁদের রচনাবলীতেই তার সূচনা। যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজের পক্ষে এই উদ্বোধন-মন্ত্রের প্রয়োজন ছিল।

১৮৮৩ খৃঃ এই সাহিত্য-সাধকের লোকান্তর ঘটে। এ প্রসঙ্গে তাঁর সতীর্থ রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে-ছিলেন, প্রবন্ধপ্রান্তে এসে তা বিশেষভাবে উদ্ধৃতিযোগ্য—

> 'ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমাজের মধ্যে তিনি ছিলেন যোগসূত্রস্বরূপ। আজ সেই যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার বেদনা উভয় সম্প্রদায়ের হৃদয়ে আঘাত করবে। ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর মত উচ্চতম পদপ্রাপ্তির যোগ্য লোক আর কেউ ছিলেন না, তবু জাগতিক উন্নতি ও ব্যক্তিগত স্বার্থকে অনায়াসে অবহেলা ক'রে স্বদেশের উন্নতির জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে গেছেন।'[১৭]

বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই সে কথা স্মরণ ক'রে একাধারে কৃতজ্ঞ ও গৌরবান্বিত।

১৫ এই প্রসঙ্গে উৎসাহী পাঠক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় কৃত 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'র প্যারীচাঁদ-প্রসঙ্গ দেখতে পারেন।

১৬ দ্রষ্টব্য—'বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান'—বঙ্কিমচন্দ্র; 'লুপ্তরত্নোদ্ধার' বা 'প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী' (১৮৯২) ক্যানিং লাইব্রেরী প্রকাশিত।

১৭ 'প্যারীচাঁদ মিত্র'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্ধৃতিটি ইংরেজীর অনুবাদ। অন্যান্য বাংলা উদ্ধৃতি 'লুপ্তরত্নোদ্ধার' থেকে নেওয়া।

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

(ভাদ্র-সংখ্যার পর)

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥১১

অধিক আর কি বলিব? যদি সংসারের ভয় হয় এবং যথার্থই আমাকে পাইবার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি এই উপপত্তি (বিচার-পদ্ধতি) সম্বন্ধে যত্নবান্ হইবে; (১৪০)

নতুবা চক্ষু পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইলে যেমন চাঁদনিকেও হলুদবর্ণ দেখায়, তেমনি আমার নির্মল স্বরূপেও দোষ দেখা যায়; অথবা জ্বরে মুখ বিস্বাদ হইলে যেমন দুধও বিষের ন্যায় কটু লাগে, তেমনি লোকাতীত আমাকে মর্ত্য মানুষ বলিয়া মনে হয়, সেইজন্য হে ধনঞ্জয়, আমি বারংবার বলিতেছি—এই অভিপ্রায় যেন ভুলিও না, স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা বৃথা হইবে; যদি আমাকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখ, তবে তাহা দেখাই হইবে না। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে স্বপ্নে লব্ধ অমৃত দ্বারা অমর হওয়া যায় না; সাধারণতঃ মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখিয়া সঠিক জানিয়াছে মনে করে, পরন্তু এই জানা তাহাদের যথার্থ জ্ঞানের অন্তরায় হয়—যেমন (জলে) নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব দেখিয়া, তাহাকে রত্ন মনে করিয়া তাহা পাইবার আশায় হংস জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং প্রাণ হারায়; বল দেখি, মৃগজল (মরীচিকা)-কে গঙ্গা মনে করিয়া তাহার কাছে আসিলে কি কোন ফল হয়? বকুল-বৃক্ষকে কল্পতরু মনে করিয়া হাতে ধরিলে কি কিছু লাভ হয়? নীলমণির (দোস্থতী) হার মনে করিয়া বিষাক্ত সর্পকে হাতে ধরিলে, কিংবা রত্ন মনে করিয়া শ্বেতপ্রস্তর সংগ্রহ করিলে কী লাভ হয়? অথবা গুপ্তধনের ভাণ্ডার প্রকট হইল বলিয়া খদির-বৃক্ষের অঙ্গার ঝোলায় ভরিলে, কিংবা (নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া) ছায়া না বুঝিয়া সিংহ যদি কূয়ায় লাফাইয়া পড়ে তাহার ফল কি হয়? যাহারা এই প্রপঞ্চে আমি আছি এ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া এই প্রপঞ্চেই নিমগ্ন হয় তাহাদের কি হয়? জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের প্রভাকে ধরিতে গেলে যেমন হয়, তাহাদের চেষ্টা তেমনি নিষ্ফল হয়। (১৫০)

যেমন কেহ কাঁজি পান করিয়া মনে করে অমৃত পান করিলাম, তেমনি বিনাশী রূপ দর্শন করিয়া অবিনাশী আমাকে দেখিল মনে করে। পূর্বদিকের পথে গেলে কি পশ্চিম সমুদ্রের তটে পৌছানো যায়? কিংবা হে বীর অর্জুন, তুষ কুটিলে কি শস্যকণা পাওয়া যায়? তেমনি এই বিকারী বিশ্বপ্রপঞ্চকে জানিয়া কি আমার নির্দোষ স্বরূপ জানা যায়? ফেন খাইলে কি জলপান করার ফল হয়? এই ভাবে মনোবৃত্তি মায়ামোহিত হইলে ভ্রমে পড়িয়া লোকে মনে করে, এই বিশ্বই আমি এবং এই সংসারের জন্ম কর্ম আমাতেই আরোপ করে; এই প্রকারে অনামী আমাকে নাম দেয়, ক্রিয়ারহিত আমাতে কর্ম ও বিদেহী আমাতে দেহধর্ম আরোপ করে; নিরাকার আমাকে আকার প্রদান করে, উপাধিরহিত আমাকে উপাধিভূষিত করে, বিধিবর্জিত আমাতে আচারাদি ব্যবহার আরোপ করে; বর্ণ-হীনের বর্ণ, গুণাতীতের গুণ, চরণবিহীনের চরণ, অপাণির পাণি, অপরিমেয়ের পরিমাণ, সর্বব্যাপকের

স্থান কল্পনা করে,—যেমন শয্যায় নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে বন দেখা যায়, তেমনি কর্ণ-রহিতের কর্ণ, অচক্ষুর নেত্র, অগোত্রের গোত্র, অরূপের রূপ; (১৬০)

অব্যক্তের ব্যক্তি, অনার্তের (ইচ্ছাহীনের) আর্তি, স্বয়ংতৃপ্তের তৃপ্তি কল্পিত হয়। নিরাবরণকে আবরণ দেয়, ভূষণাতীতকে ভূষণে সজ্জিত করে, সকল বিশ্বের কারণ আমারও কারণ নির্দেশ করে; সহজাত আমার মূর্তি তৈয়ারী করে, স্বয়ংসিদ্ধ আমাকে প্রতিষ্ঠা করে, অখণ্ড ও সর্বব্যাপী আমাকে আবাহন করে ও বিসর্জন দেয়; আমি সর্বদা স্বতঃসিদ্ধ ও একরূপ, আমাতে বাল্য, তারুণ্য ও বৃদ্ধত্ব এইসব অবস্থার সম্বন্ধ স্থাপন করে; অদ্বৈত আমাকে দ্বৈত, ক্রিয়ারহিত আমাকে কর্তা, অভোক্তা আমাকে ভোক্তা মনে করে; কুলগোত্রহীন আমার কুলের বর্ণনা করে, নিত্যস্বরূপ আমার মরণে শোক করে, অন্তর্যামী আমাকে অরিমিত্ররূপে কল্পনা করে; স্বানন্দাভিরাম আমাতে নানা সুখের বাসনা আছে বলিয়া কল্পনা করে, সর্বভূতে সমভাবে স্থিত আমাকে একদেশী বলে; যদিও আমি চরাচরের আত্মা, তথাপি আমি একের পক্ষ লইয়া ক্রোধে অপরকে বধ করি—ইহাই প্রচার করে; কিংবহুনা, এই যে সমস্ত প্রাকৃত মনুষ্যধর্ম—ইহা আমারই স্বরূপ বলিয়া মনে করে, এমনই ইহাদের বিপরীত জ্ঞান। যদি সম্মুখে কোন আকার দেখে—তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে, পরন্তু ভাঙিয়া গেলে তাহার দেবত্ব নাই বলিয়া ফেলিয়া দেয়; (১৭০)—এইভাবে নানা প্রকারে আমাকে মনুষ্যের আকারে কল্পনা করে এবং সত্যকে অন্ধকারের ন্যায় আচ্ছাদিত করে।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥১২

এইজন্য তাহাদের জন্মগ্রহণই ব্যর্থ হয়, যেমন বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য ঋতুর মেঘ বা মৃগজলের তরঙ্গ দূর হইতেই দেখিবার যোগ্য; অথবা 'কোম্বেরী' গ্রামের (মাটির খেলনার) ঘোড়সওয়ার, কিংবা যাদুকরের (প্রদর্শিত) অলঙ্কার, কিংবা গন্ধর্বনগরের প্রাকার যেমন দেখা যায়, শাল্মলী বৃক্ষ যেমন সোজা বাড়িয়া যায়—পরন্তু তাহার ফল হয় না এবং তাহা অন্তঃসার শূন্য, কিংবা ছাগলীর গলায় স্তন যেমন—তেমনি সেই মূর্খ ব্যক্তিগণের জীবন (নিষ্ফল), তাহাদের কৃতকর্মে ধিক—শাল্মলীর ফল গ্রহণ ও দানের অযোগ্য। তাহারা যাহা কিছু পাঠ করে, তাহা মর্কটের নারিকেল পাড়িবার ন্যায়, অথবা অন্ধের হাতে মুক্তা পড়িলে যেমন হয়, তেমনি (নিষ্ফল); কিংবহুনা, তাহাদের (অধীত) শাস্ত্র—শিশুর হাতে অস্ত্র দিলে যেমন হয়, কিংবা অশুচি লোককে বীজমন্ত্র দিলে যেমন হয় তেমনি হে ধনঞ্জয়, তাহাদের সমস্ত জ্ঞান—তাহারা যাহা কিছু আচরণ করে সে সমস্তই ব্যর্থ হয়, কারণ তাহারা 'চিত্তহীন' (তাহাদের চিত্তে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব); যে তমোগুণরূপী রাক্ষসী সুবুদ্ধিকে গ্রাস করে, যে নিশাচরী বিবেকের ভিত্তি পর্যন্ত পুঁছিয়া ফেলে—সেই প্রকৃতির অধীন হইয়া তাহাদের মনের রক্ষা-কপাট খুলিয়া যায়, এবং তাহারা এই তামসী রাক্ষসীর মুখগহ্বরে পড়ে; (১৮০)

যে রাক্ষসীর মুখবিবর হইতে আশার লালাযুক্ত হিংসারূপ জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এবং যে (রাক্ষসী প্রকৃতি) নিরন্তর অসন্তোষরূপ মাংসখণ্ড চর্বণ করিতেছে, যাহার জিহ্বা ওষ্ঠ চাটিতে অনর্থরূপ কান পর্যন্ত বিস্তৃত হইতেছে, যে প্রমাদ পর্বতের গুহায় সর্বদা মত্ত হইয়া

আছে, যাহার দ্বেষরূপ দংষ্ট্রা জ্ঞানকে চিবাইয়া চূর্ণ করে, যাহার অস্থি ও চর্ম মূর্খের স্থূল বুদ্ধিকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে ; এইরূপ আসুরী প্রকৃতির মুখে যাহারা ভূতবলির ন্যায় পতিত হয়, তাহারা ব্যামোহের (ভ্রান্তির) কুণ্ডে ডুবিয়া যায় ; এইভাবে যাহারা তমোগুণের (অজ্ঞানের) গর্তে পড়ে, বিচারের হাত তাহাদের ধরিয়া তুলিতে পারে না। শুধু ইহাই নহে, তাহারা কোথায় যায় কেহই জানে না ; সুতরাং এই নিষ্ফল কথা থাকুক,—মূর্খের বিষয়ে এই বৃথা বর্ণনা শুধু বাণীর কষ্ট বাড়াইবে। এই কথা শুনিয়া অর্জুন বলিলেন—যথা আজ্ঞা। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এখন বাণী যাহাতে বিশ্রাম সুখ লাভ করিবেন সেই প্রকার সাধুদের কথা শুন :

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩

আমি ক্ষেত্রসন্ন্যাসী হইয়া যাহার নির্মল অন্তঃকরণে বাস করি, নিদ্রিত অবস্থাতেও যাহাকে বৈরাগ্য সেবা করে, যাহার শ্রদ্ধাযুক্ত সদ্ভাবনার মধ্যে ধর্ম রাজত্ব করে, যাহার মন বিবেকের আর্দ্রতায় পূর্ণ, যে জ্ঞানগঙ্গায় স্নান করিয়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যে শান্তির নব পল্লব, (১৯০) যে ব্রহ্মস্বরূপ হইতে নির্গত--পরিণত অঙ্কুর, যে ধৈর্যমণ্ডপের স্তম্ভ, যে আনন্দ-সাগরে ডুবাইয়া তোলা পূর্ণকুম্ভ-সদৃশ, যাহার ভক্তির প্রাপ্তি (গভীরতা) এত বেশী যে সে মোক্ষকে দূরে সরিয়া যাইতে বলে, যাহার লীলার মধ্যেও নীতি জীবিত (জাগ্রত) থাকে দেখা যায়, যাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় শান্তির অলঙ্কারে সজ্জিত, যাহার চিত্ত সর্বব্যাপক আমাকেও আবরণ করিয়া আছে, এইরূপ মহানুভব ব্যক্তি দৈবীপ্রকৃতিসম্পন্ন সৌভাগ্যবান্—যে মহাত্মা আমার সর্বস্বরূপ পূর্ণভাবে জানিয়া ক্রমবর্ধমান প্রেমে আমাকে ভজনা করে, পরন্তু যাহার মনোধর্মে দ্বৈতভাব স্পর্শও করে না—হে পাণ্ডব, এই ভাবে মদ্রূপ হইয়া সে আমার সেবা করে ; পরন্তু ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য কথা আছে, শুন :

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪

এইরূপ ভক্ত কীর্তনের নৃত্যানন্দে প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার চুকাইয়া দেয়, কারণ ঐ কীর্তনে তাহার পাপ নষ্ট হইয়া যায়, যম-দমকে নিস্তেজ করিয়া দেয়, তীর্থে বাস উঠিয়া যায়। যমলোকের সর্বব্যাপার বন্ধ হইয়া যায় ; যম বলে, 'কি নিয়ন্ত্রণ করিব ?' দম বলে, 'কাহাকে দমন করিব ?' তীর্থ বলে, 'কোন্ দোষ ক্ষালন করিব ? পাপের লেশ মাত্র নাই।' এই ভাবে আমার নামকীর্তনের শব্দ বিশ্বের দুঃখ নাশ করে, এবং জীবন মহাসুখে ভরিয়া যায়। (২০০)

(এই প্রকার ভক্ত) প্রভাত বিনাই জ্ঞানালোক দর্শন করায়, অমৃত বিনাই লোকের জীবন দান করে, যোগ বিনাই কৈবল্য দর্শন করায় ; পরন্তু রাজা ও দরিদ্রের মধ্যে ভেদ করে না, ছোট বড় বিচার করে না, (এই ভাবে) জগতের সকলের পক্ষে সে একেবারে আনন্দের মন্দির হইয়া যায়। ক্বচিৎ কখনও কেহ বৈকুণ্ঠে যায়, পরন্তু ইহারা সারা জগৎকেই বৈকুণ্ঠ করিয়া ফেলে—নামকীর্তনের গৌরবে এমনি ভাবে সারা বিশ্ব শুভ্র আলোকে প্রকাশিত করে (পবিত্র করে); তেজে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, পরন্তু সূর্যেরও অস্ত যাইবার দোষ আছে ; চন্দ্র কেবল এক সময়ে সম্পূর্ণ কলাযুক্ত হয়, এই ভক্ত সর্বদা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; মেঘ উদার বটে, পরন্তু বর্ষণে নিঃশেষিত হয়, এইজন্য উপমার যোগ্য নহে ; নিঃসন্দেহে এই ভক্ত মহাবিক্রম সিংহের ন্যায়।

যে-নাম একবার উচ্চারণ করিতে সহস্র জন্ম ধারণ করিতে হয়, সেই আমার নাম তাহার মুখাগ্রে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে; আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, ভানুমণ্ডলেও আমাকে দেখা যায় না, আমি যোগিগণেরও মন উল্লঙ্ঘন করিয়া যাই; পরন্তু হে পাণ্ডব, আমাকে যদি আর কোথাও না পাওয়া যায়, তবে যেখানে প্রেমসহকারে আমার নামসঙ্কীর্তন করা হয়, সেখানে আমাকে নিশ্চয় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে; এইরূপ ভক্ত আমার গুণে এমনই তৃপ্ত হয় যে দেশ কাল বিস্মৃত হইয়া কীর্তনসুখে সে আত্মসুখ প্রাপ্ত হয়; কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি, গোবিন্দ—এই নামের অখণ্ড গাথার মধ্যে বিশদভাবে অধ্যাত্মচর্চা করিয়া নিরন্তর আমার নাম গান করে। (২১০)

যথেষ্ট বলা হইল, হে পাণ্ডুকুমার শুন, এই ভাবে এই ভক্তগণ আমার (নাম) কীর্তন করিয়া চরাচরে বিচরণ করে; হে অর্জুন, অপর কেহ কেহ অত্যন্ত যত্নপূর্বক মন ও পঞ্চপ্রাণকে সঙ্গে লইয়া, বাহিরে যমনিয়মের কাঁটার বেড়া দিয়া, অন্তরে বজ্রাসনের দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহার উপর প্রাণায়ামের কামান সাজাইয়া দেয়; উর্ধ্বমুখী কুণ্ডলিনীর প্রকাশে মন ও প্রাণ-বায়ুর সহায়তায়, কৈবল্য (সপ্তদশকলা)-রূপ চন্দ্রামৃতের সরোবর প্রাপ্ত হয়; তখন প্রত্যাহারের চরম বিকাশে সর্বপ্রকার বিকারের অন্ত হয়, এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বাঁধিয়া হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া ফেলে; তখন ধারণারূপ ঘোড়সওয়ার পঞ্চমহাভূতগণকে একত্র করিয়া সঙ্কল্পের চতুরঙ্গ সেনা (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার)-কে বধ করে; তাহার পর 'জয় জয়' শব্দে ধ্যানের ডঙ্কা বাজিতে থাকে, ব্রহ্মের সহিত ঐক্যের একচ্ছত্র পতাকা ঝক্‌মক্ করিয়া উড়িতে থাকে; তদন্তর সমাধি-লক্ষ্মীর অখণ্ড রাজ্যসুখের ব্রহ্মৈকরসে পট্টাভিষেক হয়; হে অর্জুন, আমার ভজন এমনি গহন (দুরূহ)। এখন অন্য এক প্রকার ভক্ত কি করে—তাহাই বলিতেছি শুন; বস্ত্রের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যেমন এক তন্তুই থাকে, তেমনি চরাচরে আমাকে ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। (২২০)

আদিতে ব্রহ্মা হইতে অন্তে মশক পর্যন্ত মধ্যস্থলের সমস্ত ভূতসৃষ্টি আমারই স্বরূপ বলিয়া সে জানে; ছোট বড় ভেদ করে না, সজীব নির্জীব বিচার করে না, যে বস্তু দৃষ্টিতে পড়ে—আমারই স্বরূপ মনে করিয়া সরলভাবে তাহাকেই সে দণ্ডবৎ প্রণাম করে; আপনার উত্তমত্ব ভুলিয়া যায়, সম্মুখস্থ বস্তুর যোগ্যাযোগ্য বিচার করে না, ব্যক্তি বা বস্তু-মাত্রকেই সে নমস্কার করিতে ভালবাসে; জল যেমন উঁচু হইতে পড়িয়া নীচের দিকেই যায়, তেমনি ভূতমাত্রকে দেখিলেই সে প্রণত হয়, ইহাই তাহার স্বভাব; কিংবা দেখ, তরুর শাখা ফলভারে সহজেই ভূমির দিকে অবনত হয়, তেমনি সেও সমস্ত প্রাণীকেই নত হইয়া প্রণাম করে। এরূপ ভক্ত নিরন্তর গর্বরহিত, বিনয় ইহার সম্পত্তি, 'জয় জয়' মন্ত্রে সে সব কিছু আমাকে অর্পণ করে; প্রণাম করিতে করিতে তাহার অভিমান অহঙ্কার দূর হয়, এবং সে অপ্রত্যাশিতভাবে মদ্রূপ হইয়া যায়, এইভাবে নিরন্তর আমার সহিত মিলিত থাকিয়া সে আমাকে উপাসনা করে; হে অর্জুন, তোমাকে শ্রেষ্ঠ ভক্তের কথা বলিলাম, এখন জ্ঞানযজ্ঞে যে আমাকে ভজনা করে, সেই ভক্তের কথা শুন। পরন্তু হে কিরীটী, এই ভজনার রীতি তুমি অবগত আছ, কারণ ইহার কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। তখন অর্জুন কহিলেন, হাঁ এই দৈব প্রসাদ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, পরন্তু অমৃত সেবন করিবার সময় কি কেহ বলে, 'যথেষ্ট হইয়াছে'? (২৩০)

অর্জুনের এই কথা শুনিয়া শ্রীঅনন্ত তাঁহার ঔৎসুক্য বুঝিতে পারিয়া চিত্তের সন্তোষের জন্য দুলিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'হে পার্থ, তুমি ভালই বলিয়াছ, বাস্তবিক পক্ষে ইহা

অপ্রাসঙ্গিক হইবে, কিন্তু তোমার আগ্রহই আমাকে বলিতে প্রবৃত্ত করিতেছে।' তখন অর্জুন বলিলেন, —'এ কেমন কথা, চকোর বিনা কি জ্যোৎস্না থাকিতে পারে না? জগৎকে শীতল করাই তো জ্যোৎস্নার স্বভাব। চকোর শুধু আপন গরজেই চঞ্চু খুলিয়া চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া থাকে, তেমনি হে দেব কৃপাসিন্ধু, আমি আপনার কাছে সামান্য প্রার্থনা করিতেছি; মেঘ আপনার সামর্থ্যেই জগতের আর্তি দূর করে, নতুবা মেঘের বর্ষণের কাছে চাতকের তৃষ্ণা আর কতটুকু? পরন্তু এক অঞ্জলি জলের জন্য যেমন গঙ্গায় যাইতে হয়, তেমনি শ্রবণের ইচ্ছা অল্প হউক বা বেশী হউক, আপনাকেই তাহা পূরণ করিতে হইবে।' তখন ভগবান বলিলেন, 'ক্ষান্ত হও, আমার সন্তোষ হইয়াছে—ইহার পর আর স্তুতি সহ্য করিতে পারিব না। তুমি যে আমার কথা মনোযোগপূর্বক শুনিতেছ ইহাই আমার বলিবার উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছে'—এইভাবে শ্রীহরি বলিতে আরম্ভ করিলেন:

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥১৫

জ্ঞানযজ্ঞ এইরূপ: ইহাতে আদি সঙ্কল্প যজ্ঞস্তম্ভ (যূপ), মহাভূত যজ্ঞমণ্ডপ এবং ভেদ (দ্বৈতভাব) যজ্ঞের পশু; পঞ্চমহাভূতের বিশেষ গুণ অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাম ও প্রাণ এই যজ্ঞের উপচার (যজ্ঞোপকরণ), এবং অজ্ঞানই ঘৃত; (২৪০)

মন ও বুদ্ধির কুণ্ডের মধ্যে জ্ঞানাগ্নি ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলে, সাম্য ঐ যজ্ঞের সুন্দর বেদী জানিবে; সবিবেক বুদ্ধিকুশলতা তাহার মন্ত্র; বিদ্যা, গৌরব ও শান্তি স্রুক্ এবং স্রুব (যজ্ঞপাত্র), জীব এই যজ্ঞের (যজ্ঞকারী) হোতা; এই জীব অনুভবরূপ পাত্রে বিবেকরূপ মহামন্ত্র দ্বারা জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া দ্বৈতভাবকে নাশ করে; যখন অজ্ঞানের নাশ হয়, তখন যজ্ঞকর্তা ও যজনকার্য এক হইয়া যায় এবং জীব আত্মানন্দরসে অবভৃত-স্নান করে, তখন ভূত বিষয় ও ইন্দ্রিয়গুলি পৃথক মনে হয় না, আত্মবুদ্ধি তখন সমস্তই একরূপ (ব্রহ্মরূপ) বলিয়া জানিতে পারে; হে অর্জুন, জাগ্রত হইলে মনুষ্য যেমন বলে, 'নিদ্রাবশে আমি স্বপ্নের বিচিত্র সেনা হইয়াছিলাম; এ সৈন্য তো সৈন্যই নহে, আমি একাই সে সমস্ত হইয়াছিলাম' তেমনি জ্ঞানযজ্ঞকারী সারা বিশ্বে একত্বই দেখে। তখন জীবভাবও নষ্ট হইয়া যায়, আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত পরমাত্মবোধে ভরিয়া যায়। এইভাবে, ইহারা একত্ববোধে জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমার ভজনা করে; অথবা জগৎ অনাদি, পরন্তু অনেক (ভিন্ন ভিন্ন রূপের), একটি অন্য একটির সমান হইলেও তাহা হইতে ভিন্ন, তাহাদের নামরূপও ভিন্ন; এইজন্য বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ থাকিলেও জ্ঞানযজ্ঞকারী তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদ দেখে না—ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব হইলেও তাহারা একই দেহে থাকে; (২৫০)

যেমন একই বৃক্ষে ছোট বড় শাখা থাকে, অথবা রশ্মি বহু হইলেও সব একই সূর্যের রশ্মি; তেমনি নানাবিধ ব্যক্তির নাম বিভিন্ন ও বৃত্তি পৃথক্ হইলেও এই ভেদের মধ্যে অভিন্ন আমাকেই সে দেখিতে পায়; হে পাণ্ডব, এইভাবে তাহারা ভিন্নতার মধ্যেও উত্তম জ্ঞানযজ্ঞ করে, কারণ তাহারা জানে সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ এবং এইজন্য তাহাদের জ্ঞানে ভেদভাব হয় না; কিংবা তাহাদের এমনই জ্ঞান হয় যে যখন যেখানে যাহা কিছুই দেখুক না কেন, তাহা আমা ভিন্ন কিছুই নহে—ইহাই বুঝিতে পারে; দেখ—বুদ্বুদ যেখানেই উঠুক না কেন, সেখানেই উহা জলের সহিত একরূপ, উহা গলিয়াই যাউক, কি থাকুক, উহা জলের মধ্যেই থাকে; পবন

যে ধূলিকণা উড়ায়, তাহাতে উহার মাটিত্ব নষ্ট হয় না, উহা যখন পুনরায় পড়িয়া যায়, তখন পৃথিবীর উপরই পড়ে; তেমনি যেখানে যেভাবে যাহাই উৎপন্ন হউক বা নষ্ট হউক না কেন, সে সমস্তই মদ্রূপ হইয়া থাকে; আমার যতখানি ব্যাপ্তি ততখানিই ব্রহ্মানুভূতি,—এইভাবে বহুবিধ আকারের মধ্যে জ্ঞানী মদ্রূপ হইয়া থাকে; হে ধনঞ্জয়, সূর্যবিম্ব যেমন দ্রষ্টার সম্মুখেই আছে মনে হয়, তেমনি তাহারা সর্বদা এই বিশ্বকে তাহাদের সম্মুখে দেখিতে পায়; হে অর্জুন, তাহাদের জ্ঞানে অন্তর-বাহির—এই ভেদ নাই, বায়ু যেমন গগনের সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া আছে—সেইরূপ; (২৬০)

আমার পূর্ণ স্বরূপের ন্যায় তাহাদের সদ্ভাবের (ব্রহ্মবোধের) ব্যাপ্তি,—এইজন্য হে পাণ্ডব, ভজন না করিলেও আমার ভজন করা হয়; সর্বত্র সর্বভূতে যখন আমিই আছি, তখন কে কোথায় আমার উপাসনা করে না? শুধু অজ্ঞানী—যাহার এ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই, সেই আমাকে প্রাপ্ত হয় না; যথেষ্ট হইয়াছে। উচিত (যোগ্য) জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া যাহারা আমার উপাসনা করে, তাহাদের কথা বলা হইল; নিরন্তর যে সকল কর্ম সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা সর্বদা এক আমাকেই অর্পণ করা হয়, মূর্খ ব্যক্তিগণ ইহা না জানিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয় না।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥১৬

এই জ্ঞানের উদয় হইলে বুঝিতে পারা যায় যে বেদ, বেদোক্ত বিধিবিধান ও যজ্ঞ সমস্তই আমি। হে পাণ্ডব, সমস্ত কর্মানুষ্ঠানের সহিত যে যথাবিধি যজ্ঞ প্রকট হয় তাহা আমি; আমিই স্বাহা, আমিই স্বধা—সোমলতাদি বিবিধ ঔষধ, আজ্য (ঘৃত), সমিধ, মন্ত্র ও হবি (হোম দ্রব্য); আমিই হোতা, হোমাগ্নি আমারই স্বরূপ, যে যে বস্তু দ্বারা হবন করা হয় তাহাও আমি।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥১৭

যাহার সহবাসে অষ্টধা প্রকৃতি হইতে জগৎ জন্মগ্রহণ করে, আমিই সেই পিতা; অর্ধনারী নটেশ্বররূপে যিনি পুরুষ তিনিই নারী—অতএব আমি এই চরাচর বিশ্বের মাতাও; (২৭০) জগৎ উৎপন্ন হইয়া যাহাতে অবস্থান করে এবং যাহাদ্বারা তাহার জীবন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা নিশ্চিত আমা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; এই দুই বস্তু—প্রকৃতি ও পুরুষ—যে নির্গুণ স্বরূপ হইতে উৎপন্ন, ত্রিভুবন বিশ্বের সেই পিতামহও আমিই; আর হে অর্জুন, সকল জ্ঞানের পথ যে গ্রামে গিয়া মিলিয়াছে—বেদ তাঁহাকে 'বেদ্য' বলিয়া আখ্যা দেন, যেখানে নানা মতের ঐক্য, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের পরস্পর পরিচয় হয়, ভ্রান্ত জ্ঞান যেখানে দূরীভূত হয়, যাহাকে 'পবিত্র' বলা হয়; ব্রহ্মবীজের যাহা অঙ্কুর, নাদাকার ঘোষ-ধ্বনির মন্দির যে 'ওঁকার' তাহাও আমি; সেই 'ওঁকারের' কুক্ষি হইতে 'অ' 'উ' ও 'ম' অক্ষরত্রয় বেদত্রয়ের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে; আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ঋক্ যজুঃ সাম, এই তিনটি বেদ আমিই এবং এই বেদের 'কুলক্রম' (বংশ-পরম্পরা)ও আমি। (ক্রমশঃ)

নবদ্বীপের রাস-উৎসব

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু

[লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-শাখার পরিচালনায় 'বাংলার লোকধর্ম' বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন, বর্তমান প্রবন্ধটি স্থানীয় অনুসন্ধানের ভিত্তিতে রচিত। উঃ সঃ]

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি ও সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্থল—নবদ্বীপ। যুগে যুগে ভক্ত ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাগম নবদ্বীপের ধূলিকে করেছে ধন্য। আজও শ্রীগৌরাঙ্গের নামে নবদ্বীপের আকাশ বাতাস মুখরিত

রাসলীলা বলতে আমাদের মানসচক্ষে ফুটে ওঠে গোপিনী-সমাবৃত শ্রীকৃষ্ণের এক অভিরাম লীলার পরিবেশ। কিন্তু নবদ্বীপের রাসলীলা অন্য। এ রাস-লীলায় বৈষ্ণব চিন্তাধ্যানের কোন সংস্পর্শ নেই নবদ্বীপের রাসলীলা একটা উৎসব সন্দেহ নেই, তবে তা বীর-ভাব প্রধান। লীলার নামে যে জিনিস আত্মপ্রকাশ করে তা উৎকণ্ঠিত শক্তির লীলা। এই শক্তিমূর্তি ও পূজার পেছনে কিন্তু লুকিয়ে আছে ছোট্ট একটু ইতিহাস—যার সঙ্গে মিশেছে কিংবদন্তী। নবদ্বীপের রাসলীলা-প্রসঙ্গে সেই গল্পেরই অবতারণা ক'রব।

নবদ্বীপের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই। হাণ্টার সাহেব বলেছেন: 'Nadia (Navadwip) is the ancient capital of Nadia district and the residence of Laxman Sen. According to local legend the town was founded in 1063 by Laxman Sen. Here in the end of the 15th century was born the great reformer Chaitanya.' (Hunter's Imperial Gazetteer, 1880).

নয়টি দ্বীপের সমাবেশ 'নবদ্বীপ' নামের উৎস। গঙ্গা ও সরস্বতী (জলাঙ্গী বা খড়িয়া) এবং তাদের শাখা-প্রশাখা এক সময় স্থানটিকে এমনভাবে বেষ্টন ক'রে রেখেছিল যে নদীবেষ্টিত নয়টি দ্বীপ স্পষ্টই দেখা যেত। কালের আবর্তনে নদীর গতি ধরেছে ভিন্ন পথ, দ্বীপের আকারও হয়েছে পরিবর্তিত; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের স্থান নির্ণয় করা আজও দুঃসাধ্য নয়। অপর মতে চতুর্দিকে জলধারা-বেষ্টিত ভূমিকে যেমন দ্বীপ বলে, তেমনি শ্রবণ-কীর্তনাদি নয় প্রকার সাধনাঙ্গের নবধাভক্তি-জলধারা-পরিবেষ্টিত এই চিন্ময়ভূমির নাম 'নবদ্বীপ'।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মে—'শান্তিপুর ডুবু ডুবু, (প্রেমে) নদে ভেসে যায়'। সেই প্রেমস্রোতে উন্মত্ত হ'য়ে অধিবাসীরা গার্হস্থ্য ধর্মের সঙ্গে ভুলেছিলেন—শক্তির চর্চা। সমাজ হারিয়ে ফেলছিল প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। কলসীর কাণার পরিবর্তে প্রেম বিতরণ করতে গিয়ে কপালে জুটছিল লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা। এই অবস্থার মাঝে এক পক্ষ এই ধর্মের বিরুদ্ধে করলেন বিদ্রোহ। তাঁরা কলসীর কাণার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। আরম্ভ করলেন শক্তির চর্চা—আরম্ভ হ'ল শক্তির পূজা। অতীতের দিকে তাকালে আমরা দেখি সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রচারের ফলে যখন জগৎ ও জীবনের প্রতি মানুষের নিষ্ক্রিয় ও ঔদাসীন্যের ভাব পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তখনই তার প্রতিক্রিয়া-রূপে সমাজে দেখা দিয়েছিল শক্তিপূজা।

বৈষ্ণবদের সঙ্গে শাক্তদের কলহ বহুদিনের। বৈষ্ণবদের সঙ্গে নবদ্বীপে তান্ত্রিক পণ্ডিতদের প্রাধান্য থাকায় শক্তিপূজার সমারোহও খুব বেশী। চৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম বঙ্গীয় রাজা ও পণ্ডিত-মণ্ডলীকে আকর্ষণ করতে পারেনি। বিশেষ ভাবে কৃষ্ণনগরের রাজারা শক্তিপূজারই সমর্থক ছিলেন। 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত'-কার লিখে-ছেন, 'তৎকালে এ প্রদেশস্থ প্রায় যাবতীয় লোক শক্তির উপাসক ছিলেন। তন্মধ্যে অনেকে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানোপলক্ষে পানাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইতেন।' অন্যত্র—'নবদ্বীপের রাজা বা পণ্ডিতগণ চৈতন্যকে অবতারের মধ্যে কখন গণ্য করেন নাই।' এ কথার সত্যতা নবদ্বীপে তান্ত্রিক শাক্তদের প্রাধান্য হ'তে আজও উপলব্ধি করা যায়। পূর্বেই বলেছি, কৃষ্ণ-নগরের রাজারা শক্তিপূজারই সমর্থক ছিলেন। শোনা যায় যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথমে নবদ্বীপে জাঁকজমকের সঙ্গে শক্তিপূজার প্রেরণা দেন; এবং তার দিন স্থির করেন বৈষ্ণবদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব—রাসপূর্ণিমার দিন। বিখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় এই উৎসবের পুরোধা হন। নবদ্বীপের গঙ্গার তীরে বিরাট এক শক্তিমূর্তির পূজা হয়। এই পূজা 'নটহটি' পূজা নামে খ্যাতি লাভ করে। মূর্তির চালচিত্রে যে বিভিন্ন শক্তির লীলা দেখানো হয় তা 'পট' নামে পরিচিত। তার থেকেই কাল-ক্রমে এই উৎসব 'পটপূর্ণিমা' নামেও খ্যাতিলাভ করে। কালের আবর্তনে সেই শক্তিপূজার প্রচার ও প্রচলন হয়েছে বেশী। আজও নবদ্বীপে রাসপূর্ণিমার দিন ছোট বড় প্রায় চারশো শক্তিমূর্তির পূজা হয়। এই উপলক্ষে বহু দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ হয়। সুতরাং রাসপূর্ণিমায় কৃষ্ণ ও রাধা উপেক্ষিত!

দশ মহাবিদ্যার মধ্যে তারা, ধূমাবতী, ও ছিন্নমস্তা[১] ব্যতীত অপর সকলেরই আরাধনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ পার্থসারথি-বেশে স্থান ক'রে নিয়েছেন এই শক্তিপূজার মধ্যে। এই শক্তিপূজার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ দেবদেবীদের মূর্তির উচ্চতা ও পরিধি। ৩৫ফুট থেকে ৬ইঞ্চি পর্যন্ত উচ্চ মূর্তির পূজা হয়; তার মধ্যে ২০।২৫ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট দেবদেবীদের মূর্তির সংখ্যাই বেশী। এই সকল মূর্তির পরিকল্পনায় ও গঠনচাতুর্যে শিল্পীর শিল্পিজনোচিত ভাব বেশ পরিস্ফুট। এই সকল বিরাট মূর্তি মাচা বেঁধে শিল্পীরা যেভাবে যেরূপ কুশলতার সঙ্গে স্তরে স্তরে গঠন করেন, তা বর্ণনা ক'রে বোঝানো সম্ভব নয়। কোন কোন মূর্তির সঙ্গে ডাকের সাজও থাকে।

পূজার পরদিন এই সকল বিরাট বিরাট মূর্তির শোভাযাত্রা একসঙ্গে বাহির হয়। এই শোভাযাত্রা 'আড়ং' নামে পরিচিত। 'পোড়ামা-[২] তলা' ব'লে খ্যাত অঞ্চলে এই সকল বিরাট মূর্তির একত্র সমাবেশ দর্শকদের ও ভক্তদের প্রচুর আনন্দ দান করে এবং বিচারকদেরও বিচার করবার সুবিধা দেয়। বিচারে শ্রেষ্ঠ মূর্তির শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়

বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার শক্তিমূর্তির মধ্যে বঙ্গপাড়ার রণকালী, আগমেশ্বরী পাড়ার (আমড়াতলা) রণচণ্ডী ও মহিষমর্দিনী

১ কয়েক বৎসর পূর্বে সংসারত্যাগী একটি যুবক শাস্ত্রোক্ত মতে ছিন্নমস্তার পূজা করে। কিন্তু পূজার এক বৎসরের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হওয়ায় অদ্যাপি ছিন্নমস্তার পূজায় আর কেহ অগ্রসর হয়নি।

২ পোড়ামাতা বা বিদগ্ধ জননী। এইরূপ নামকরণের পশ্চাতে বিভিন্ন যুক্তি দেখা যায়। (ক) পড়ুয়া বা ছাত্রদের মাতৃস্থানীয়া ব'লে পড়ুয়ার মাতা বা পোড়া মা। তাঁর স্থান ব'লে 'পোড়ামা-তলা' (খ) ভিন্ন এক কাহিনী অনুসারে এক সাধকের একটি মাতৃমূর্তি আগুনে দগ্ধ হয়; সেইজন্য ইহার নাম 'পোড়ামা-তলা'।

('মোষমর্দা'—অঞ্চলস্থ অধিবাসীদের চল্‌তি কথায়), হরিসভা-পাড়ার ভদ্রকালী, যোগনাথ-তলার দুইটি সিংহের উপর দণ্ডায়মানা দেবী দুর্গা ('গৌরাঙ্গিনী' নামে এই মূর্তি খ্যাত)। ব্যাধরা-পাড়ার শব-শিব-শিবা মূর্তি, ও মালঞ্চপাড়ার বামাকালী[৩] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চারচারি-পাড়ার ভদ্রকালী উচ্চতায় প্রায় ৩৪ ফুট। এত বড় প্রতিমা ভারতে কোন স্থানে তৈরী হয় ব'লে শোনা যায় না।

আগমেশ্বরী পাড়ার বিশিষ্ট অধিবাসী শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে শিল্পীদের মূর্তি তৈরী করবার কৌশল থেকে বিসর্জন পর্যন্ত—প্রতিটি স্তর দেখবার সুযোগ ক'রে দেওয়ায় আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই সকল মূর্তি রথের মতো চাকার উপর স্থাপন ক'রে মোটা দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকে বাহক নিয়োগ করেন; মূর্তির ওজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ৮০ থেকে ১৫০ জন পর্যন্ত বাহক নিয়োগ করা হয়। কিছুকাল আগেও এই বিসর্জনের দিন উদ্যোক্তাদের মধ্যে পঞ্চ 'ম'-কারের সেবা ও দলগত বা পারিবারিক কলহ এমন চরমে উঠত যে ভক্ত বা দর্শকদের জীবন নিয়ে টানাটানি হ'ত; কিন্তু সুখের বিষয় পুলিশের তৎপরতায় এ বিপদের এখন অবসান হয়েছে। আজও অনেকেই বাংলার এই প্রাচীন নগরীর ঐতিহ্যময় গৌরবের অবশেষ দেখে চোখের ও মনের তৃপ্তি সাধন করতে পারেন।

৩ সাধক বামাক্ষেপা সর্বপ্রথম এখানে একটি মূর্তি তৈরী ক'রে পূজা করেন। সেইজন্য এখানে পূজিত কালী 'বামা কালী' নামে পরিচিত। একটি বাঁধানো বেদী আছে, তার ওপরই মূর্তি স্থাপনা ক'রে পূজা হয়। কিন্তু প্রত্যহ এই বেদীর ওপর স্থাপিত ঘটের পূজা হ'য়ে থাকে।

শক্তি ও সত্তা

শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ

সৃজনের আদি হ'তে যে প্রবাহ চলিছে ছুটিয়া
মরণের পরপারে হয় না তো তার অবসান!
তোমার অনন্তরূপ প্রকাশিছে তারি মধ্য দিয়া
বহুর মাঝারে যেন একই সত্য রহে অনির্বাণ।

কারো মতে মহাশক্তি, কেহ বলে প্রকৃতি চঞ্চলা,
অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তা—আর কিছু নাহি এ ধরায়;
জীবন-বিজ্ঞান হ'তে কল্পনার চতুঃষষ্টি কলা
তোমার শক্তির খেলা—হৃদিপদ্মে বিস্ময় জাগায়।

বারে বারে তবু যেন মনে হয় পার্থিব জগৎ—
এই সব; ইহার অপর প্রান্তে আর কিছু নাই;
প্রকৃতির সোনালি আভায় তব মহিমা মহৎ!
জড়ের চৈতন্যঘন ছবিখানি ধরিবারে চাই।

মায়ামরীচিকাসম এ জগৎ চৈতন্য-সত্তায়
মরু জল হয় যে বিলীন অন্ধ কুজ্ঝটিকা মাঝে;
আবার সহসা ভাসে অধিষ্ঠান উজ্জ্বল বিভায়!
পুরুষ প্রকৃতি কই? সেই এক অদ্বৈত বিরাজে।

পল্‌নীর দণ্ডায়ুধ-স্বামী

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

দাক্ষিণাত্যের প্রধান কয়টি তীর্থস্থানের মধ্যে পল্‌নীর শ্রীদণ্ডায়ুধ স্বামীর মন্দির অন্যতম। মাদ্রাজ শহর হইতে ৩০৪ মাইল দূরে কোয়েম্বাতুর-ডিণ্ডিগল (Dindigul) রেল লাইনে কোয়েম্বাতুর হইতে ৬৭ মাইল দূরে পল্‌নী অবস্থিত। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী প্রতি বৎসর এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীদণ্ডায়ুধস্বামীকে দর্শন করিতে আগমন করেন। দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র কার্ত্তিকেয়ই এখানে শ্রীদণ্ডায়ুধস্বামী নামে পরিচিত। দক্ষিণ অঞ্চলে কার্ত্তিকের সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত নাম 'মুরুগা'। তিনি সুব্রহ্মণ্য, আরুমুগম্ ও ভেলায়ুধম্ নামেও পরিচিত। তামিলে 'মুরুগা' অর্থ সৌন্দর্য, যৌবন ও সুগন্ধি। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় সৌন্দর্যে অতুলনীয়, তিনি চিরযুবা এবং তাঁহার শরীর হইতে নির্গত সুগন্ধি সকলকে পরিতৃপ্ত করে। 'আরুমুগম্' অর্থে ছয়টি মুখ-বিশিষ্ট; পুরাণে কার্ত্তিক ষড়ানন বলিয়াও পরিচিত। 'ভেলায়ুধম্' অর্থ বর্শা-অস্ত্রধারী; 'ভেল' অর্থ বর্শা। 'সুব্রহ্মণ্য' নামটি এদেশে খুবই সাধারণ।

মাদ্রাজ প্রদেশে মুরুগার অসংখ্য মন্দির থাকিলেও তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টি প্রধান। তামিলে উহাদিগকে 'আরুপাডাইভিডু' বলা হয়, ('আরু' ছয়, 'পাডাই' ছাউনি, 'ভিডু' বাসস্থান) অর্থাৎ মুরুগার ছয়টি প্রধান ছাউনি বা বাসস্থান। ইনি দেবতাদের সেনাপতি ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ছাউনি তাঁহার বাসস্থান। ঐ ছয়টি স্থানের নাম--(১) পল্‌নী, (২) তিরুচেন্দুর, (৩) তিরুপারাংকুণ্ডরম্, (৪) পলমুদিরশোলই, (৫) তিরুভিরগম্ ও (৬) স্বামীমালাই।

'তিরুচেন্দুর' তিরুনেলভেলী জেলায় একেবারে সমুদ্রতীরে, তিরুনেলভেলী শহর হইতে ট্রেনে যাওয়া যায়। অতি সুন্দর মন্দির, মনোরম স্থান এবং মূর্তি নয়নাভিরাম। তিরুপারাংকুণ্ডরম্ ও পলমুদিরশোলই মাদুরা শহরের সন্নিকটে অবস্থিত। কুম্ভকোণম্ শহরের চারি মাইলের মধ্যে 'তিরুভিরগম্' ও 'স্বামীমালাই' মন্দির। উপরোক্ত ছয়টি বিখ্যাত মুরুগার মন্দিরের মধ্যে 'পল্‌নী' সর্বপ্রধান। এদেশে কার্তিককে দুই রূপে দেখিতে পাওয়া যায়—আকুমার ব্রহ্মচারীরূপে এবং দুই ভার্যা-সমন্বিতরূপে। তাঁর দুই স্ত্রীর নাম 'বল্লী' ও 'দেবযানী'। দেবযানী দেবরাজ ইন্দ্রের কন্যা, বল্লী অর্থে লতা। কোনও শিকারী জঙ্গলে লতামূলে তাঁহাকে পাইয়া কন্যারূপে লালনপালন করেন, সেজন্য ইনি শিকারী-কন্যা নামেও পরিচিতা। ইঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া কার্তিক ইঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। একমাত্র পল্‌নীতেই কার্ত্তিকের ব্রহ্মচারী মূর্তির পূজা হয়, অন্যত্র ইনি দুই ভার্যা-সহিত অধিষ্ঠিত। দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান শিব-মন্দিরের সীমানার মধ্যেও সুব্রহ্মণ্যের মন্দির আছে। পাহাড় মুরুগার অতিশয় প্রিয়, সেজন্য বহুস্থানে ইঁহার মন্দির পাহাড়ের শিখরদেশে অবস্থিত।

পল্‌নী শহর

পল্‌নীও একটি ছোট পাহাড়—৪৫০ ফুট উঁচু। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার এক শাখায় পল্‌নী পাহাড় অবস্থিত—এখান হইতে বিখ্যাত কোডাইকানাল ও বরাহগিরি পর্বতশ্রেণীর দূরত্ব মাত্র পাঁচ মাইল। বায়বীপুরী নামে বিরাট

হ্রদ পল্‌নী-পাহাড়ের পাদদেশ বিধৌত করিতেছে। চারিদিকে ছোট ছোট অনেক পাহাড় ইহাকে যেন অহরহঃ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ইহা সত্যই অতুলনীয়, দর্শনে চক্ষু সার্থক হয়।

পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত শহরের নামও পল্‌নী। সমুদ্র-বক্ষ হইতে ইহার উচ্চতা ১০৬৮ ফুট। শহরটি ক্রমবর্ধমান, যানবাহনের কোন অভাব নাই। পল্‌নী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে শহরের দূরত্ব এক মাইলের কিছু বেশী। যাত্রীরা শহরে অবস্থিত চৌলট্রিতে (ধর্মশালায়) রাত্রিযাপন করেন। মন্দির-পরিচালিত সুন্দর দ্বিতল চৌলট্রিতে অল্প ব্যয়ে বেশ আরামে থাকা যায়। শহরের লোকসংখ্যা ৫০,০০০ হইবে। এই শহর প্রথমে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৯২ খৃঃ ইহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। শহরের মধ্যেও কয়েকটি মন্দির বিদ্যমান—তন্মধ্যে পেরিয়ানায়কী-আম্মন নাম্নী দেবীর মন্দির খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত। এতদ্ব্যতীত কৈলাসনাথ মন্দির ও সুব্রহ্মণ্যের মন্দিরও আছে। সম্প্রতি শ্রীনটরাজের মন্দিরও নির্মিত হইয়াছে। এই শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম 'মরিয়াম্মন্'। তাঁহারও মন্দির আছে এবং প্রতি বৎসর মার্চ মাসে বিরাট ধুমধাম সহকারে দেবীর পূজা ও তদুপলক্ষে উৎসব হয়। রোগমুক্তির আশায় অনেকে এই দেবীর বিশেষ পূজাদির ব্যবস্থা করেন।

'পল্‌নী' নামের সার্থকতা

তামিল ভাষায় খ, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ফ, ভ প্রভৃতি বর্ণ নাই; ঐগুলি পূর্ব বর্ণের দ্বারাই উচ্চারিত হয়। বাংলা ভাষায় যাহা 'ফল' তামিলে তাহা 'পড়ম্' বা 'পলম্'। তামিলে 'নী' অর্থে তুমি। 'পল্‌নী' কথাটির অর্থ—'তুমিই ফল'। শিব ও পার্বতী কনিষ্ঠ পুত্র কার্ত্তিককে এই কথা বলিয়াছিলেন; তদবধি তিনি এবং এই শহর ও পাহাড় 'পল্‌নী' নামেই পরিচিত।

পুরাণে আছে: একদিন শিব ও পার্বতী কৈলাসে গণেশ ও কার্ত্তিককে বলেন—তাদের দুজনের মধ্যে যে প্রথমে ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারিবে, তাহাকে একটি ডালিম ফল পুরস্কার দেওয়া হইবে। কার্ত্তিক সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ক্ষিপ্র বাহন ময়ূরের পিঠে চড়িয়া তীরবেগে যাত্রা করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনিই পুরস্কার লাভ করিবেন। গণেশের শরীরের মধ্যদেশ কিঞ্চিৎ স্থূল এবং বাহনও মূষিক, কাজেই তাঁহার আর জয়ের আশা কোথায়? কিন্তু বুদ্ধিতে গণেশ বৃহস্পতি-তুল্য। কার্ত্তিক রওনা হওয়ার পর গণেশ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে তাঁহার পিতামাতা তো ত্রিলোকেশ্বর ও ত্রিলোকেশ্বরী, তাঁহারাই তো বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিত, কাজেই তাঁহাদের পরিক্রমা করিলেই তো ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ করা হইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি একটু বিশ্রাম গ্রহণ পূর্বক ধীরে ধীরে তাঁহার পিতামাতাকে পরিক্রমা করিয়া পুরস্কার দাবি করিলেন। তাঁহার যুক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া শিব ও পার্বতী তাঁহাকেই ডালিম ফলটি প্রদান করিলেন এবং মাতা পার্বতী প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রান্ত ক্লান্ত কার্ত্তিক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া দেখেন যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূর্বেই ফলটি লাভ করিয়া মায়ের ক্রোড়ে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ক্রোধাকুলিতচিত্ত কার্ত্তিক তখনই কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন। মাতা ও পিতা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, 'পল্‌নী—অর্থাৎ তুমিই তো ফল, তুমি আবার অন্য ফলের কি

আকাঙ্ক্ষা করিতেছ? তোমাকে লাভ করিলেই লোকে মোক্ষ ফল পাইবে।'

কিন্তু কার্তিক ইহাতে শান্ত হইতে পারিলেন না। তিনি দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া প্রথমে পাহাড়ের সন্নিকটে তিরুআভিনান্‌কুডিতে আসেন এবং তথা হইতে পল্‌নী পাহাড়ের উপর যাইয়া স্থায়িভাবে অবস্থান করেন। তদবধি এই পাহাড় পল্‌নী পাহাড় ও তিরুআভিনান্‌কুডি পল্‌নী শহর নামে পরিচিত হয়।

পল্‌নী পাহাড়

পল্‌নী পাহাড়ের পাদদেশে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য পথ আছে, দৈর্ঘ্যে তাহা এক মাইল আন্দাজ হইবে, ইহাকে গিরি-বিধি বলা হয়। তামিলে 'বিধি' শব্দের অর্থ পথ। চারিদিকে চারিটি মণ্ডপ আছে এবং চারিটি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্মিত ময়ূরের মূর্তি আছে; কার্তিকের প্রিয় বাহন ময়ূর। পথিপার্শ্বে গণেশ ও অন্যান্য দেবতার ছোট ছোট মন্দির এবং বহু সমাধি বিদ্যমান।

অল্প দূরেই ছয়টি শাখাবিশিষ্ট ষণ্মুখ নদী। পাহাড়ের উপর দেবদর্শনে গমনের পূর্বে অনেকেই এই পবিত্র নদীতে অবগাহন স্নান করেন। ঘাটের পাশেই সুন্দরবিনায়ক (গণেশ), কৈলাসনাথ দক্ষিণামূর্তি ও নবগ্রহের ছোট ছোট মন্দির আছে। মে মাসের অগ্নি-নক্ষত্রে গিরি প্রদক্ষিণ অতি পুণ্যকার্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং হাজার হাজার যাত্রী ভক্তিপরিপ্লুত হৃদয়ে শ্রীমুরুগার স্মরণ করিতে করিতে ঐ পবিত্র পল্‌নী পাহাড় প্রদক্ষিণ করেন। এখানকার স্থলবৃক্ষ কদম্ব, উহার পুষ্প মুরুগার অতিশয় প্রিয়। গিরিবিধির দক্ষিণে কদম্বকুঞ্জ বিদ্যমান।

স্থলপুরাণে পল্‌নী পাহাড় ও ইহার নিকটস্থ ইড়ুম্বনমালাই নামক ছোট পাহাড়ের ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। উহাতে লেখা আছে যে পল্‌নী পাহাড় কৈলাস পর্বত হইতে এখানে আনীত হইয়াছিল। স্থলপুরাণে কথিত:

ঋষি অগস্ত্য দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিবার জন্য কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন, আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে শিবগিরি ও শক্তিগিরি নামক দুইটি পাহাড় প্রদান করেন এবং উহাদিগকে অগস্ত্যের বাস-স্থান দাক্ষিণাত্যে পোডিগাইতে লইয়া যাইতে বলেন। পাহাড় দুইটি বহন করিবার জন্য ঋষি তাঁহার শক্তিশালী শিষ্য অসুর-গুরু ইড়ুম্বনকে নিযুক্ত করেন, এবং যাহাতে সে সহজেই পাহাড় দুইটি বহন করিতে পারে, তজ্জন্য ঋষি তাঁহাকে বিশেষ মন্ত্র প্রদান করেন। বাংলাদেশে বাঁকে করিয়া যেরূপ ভার বহন করে ইড়ুম্বনও তদ্রূপ পাহাড় দুইটিকে একটি দণ্ডের দুইদিকে ঝুলাইয়া উহা কাঁধে করিয়া বহন করিতে থাকেন। বর্তমান পল্‌নী শহরের নিকটে আসিলে ইড়ুম্বন অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করত বিশ্রামের জন্য পাহাড় দুটিকে ভূমির উপর স্থাপন করেন। পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিবার প্রাক্কালে তিনি পাহাড় দুটিকে উঠাইতে অসমর্থ হইয়া শিবগিরি পাহাড়টির উপর উঠিয়া দেখেন যে তথায় কৌপীনমাত্র পরিহিত দণ্ডায়ুধধারী এক সুন্দর যুবাপুরুষ পাহাড়টিকে নিজের বলিয়া দাবি করিতেছেন। যুবক আর কেহই নহেন, ইনিই দেবসেনাপতি মুরুগা, ছদ্মবেশে এখানে রহিয়াছেন।

পাহাড়ের অধিকার লইয়া স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের মধ্যে প্রথমে বচসা ও পরে যুদ্ধ শুরু হইল এবং কিছুক্ষণ পরেই ইড়ুম্বনের প্রাণহীন দেহ মুরুগার পদতলে পতিত হইল। ধ্যান-যোগে সর্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঋষি অগস্ত্য ইড়ুম্বনের পত্নী ইড়ুম্বী সমভিব্যাহারে অচিরেই তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেবসেনাপতির কৃপা ভিক্ষা করিলেন। মুরুগা ইড়ুম্বনকে

পুনর্জীবিত করিলে তিনি করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, যেন তিনি চিরকাল ঐ পাহাড়ের দ্বারপাল নিযুক্ত থাকেন, এবং যে সব দর্শনার্থী ভক্ত বংশখণ্ড (বাখারি) ও কাগজ নির্মিত কাবাডী স্কন্ধে করিয়া পূজা করিবার জন্য তথায় আগমন করিবেন তাঁহাদের মনস্কামনা যেন পূর্ণ হয়। মুরুগা প্রীত হইয়া ইড়ুম্বনকে প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন।

এখনও সহস্র সহস্র যাত্রী প্রত্যহ কাবাডী স্কন্ধে মুরুগার দর্শনার্থ পল্‌নী পাহাড়ে আরোহণ করেন। কাবাডীর মধ্যে পূজাদ্রব্য রাখা হয়। শ্রীমুরুগা 'দণ্ডায়ুধপাণি স্বামী' নামে তখন হইতে এই শিবগিরি পাহাড়ের শিখরদেশেই অবস্থান করিতেছেন। ক্রমশঃ স্কন্ধে কাবাডী করিয়া পূজাদ্রব্য বহন করিবার রীতি মুরুগার অন্যান্য মন্দিরেও প্রচলিত হয়।

পল্‌নী পাহাড়ের শিখরদেশে উঠিতে হইলে ৬৫৯টি পাথরের সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হয়। প্রায় মাঝামাঝি উঠিলে একটি ছোট মন্দিরে দেখা যায় যে ইড়ুম্বন মুরুগার পদতলে নতজানু হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন—পার্শ্বে শিব- ও অগস্ত্যমুনির মূর্তিও বিদ্যমান। পৌরাণিক কাহিনীকে সঞ্জীবিত রাখাই যেন ইহার উদ্দেশ্য। সিঁড়ি ছাড়া পাহাড়ী রাস্তাও আছে। বিশেষ বিশেষ পর্বে অভিষেকের জন্য পাহাড়ী পথে হাতী উপরে জল বহন করিয়া লইয়া যায়। সিঁড়ির মাঝে মণ্ডপ আছে, তাহার তলায় যাত্রীরা বিশ্রাম করিতে পারে। ছোট ছোট অনেক মন্দিরও রহিয়াছে। পাহাড়ের উপর পঞ্চবর্ণ-পাতুকা নামে একটি সুন্দর গুহা আছে। রাত্রে সমস্ত রাস্তা প্রচুর বিজলী বাতির দ্বারা আলোকিত হয়। অন্ধকার রাত্রে পল্‌নী শহর হইতে বিভিন্ন রঙের আলোকমালায় সজ্জিত সমগ্র পাহাড়টি অতি মনোরম শোভা ধারণ করে।

শ্রীদণ্ডায়ুধ স্বামী

পাহাড়ের শিখরদেশে উঠিলেই চারিদিকের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে দর্শকের মন এক দিব্যভাবে আবিষ্ট হয়। মন্দিরের চারিদিকে সুউচ্চ প্রাচীর। কয়েকটি প্রাকার অতিক্রমপূর্বক গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিলে হস্তে দণ্ড ও আয়ুধবিশিষ্ট কৌপীন-পরিহিত মুণ্ডিতমস্তক নয়নাভিরাম অষ্টধাতু-নির্মিত শ্রীমুরুগার ব্রহ্মচারী মূর্তি ভক্তযাত্রীর অন্তরে এক দিব্যভাবের প্রেরণা জাগায়। ভক্তের ইচ্ছানুযায়ী দিনে একাধিকবার দুধ, চন্দন, মধু, গুড়, বিভূতি প্রভৃতির দ্বারা মুরুগার অভিষেক হয়। মূর্তি প্রায় সাড়ে তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট। বিভিন্ন প্রকার অভিষেকের জন্য বিভিন্ন দক্ষিণা নির্ধারিত আছে। কয়েক শতাব্দী যাবৎ প্রত্যহ বহুবার মধু, গুড় প্রভৃতি দ্রব্যাদির দ্বারা অভিষেক করানোর ফলে মূর্তির কোন কোন অঙ্গ সামান্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। কখনও কখনও সমস্ত শরীরই চন্দনচর্চিত ও বিভূতি-ভূষিত করা হয়। অনেকে সোনা রূপা ও নানারূপ মণিমুক্তাও নিবেদন করেন। এই দেবস্থানের আর্থিক অবস্থা খুবই সচ্ছল। রোগমুক্তি কামনায়ও বহুলোক এখানে আগমন করিয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে প্রসাদী অভিষেকদ্রব্য ভক্ষণ করিলে রোগমুক্ত হওয়া যায়; উহা কিনিতেও পাওয়া যায়। জানুআরি এপ্রিল মে জুন ও নভেম্বর মাসে এখানে বিশেষ উৎসব হয়। ইহার মধ্যে এপ্রিল মাসে দশদিনব্যাপী 'পঙ্গুনী-উত্তিরম্' উৎসব সর্বাপেক্ষা প্রধান। ছিয়াত্তর হাজার টাকা ব্যয়ে বহুদিন পূর্বে নির্মিত রূপার রথ বছরে তিনবার বাহির করা হয় এবং দেবতার উৎসব-বিগ্রহ উহাতে বসাইয়া ঐ রথ মন্দিরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করানো হয়।

কথিত আছে, শ্রীমুরুগা বহুকাল যাবৎ অসুরাধিপতি সুরপথের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাহাকে পরাভূত করত স্ববশে আনয়ন করেন। ইহার রূপক অর্থ এই যে 'সুরপথ' হইতেছে আমাদের অহংভাব। শৈবসিদ্ধান্ত শাস্ত্রে বলা হয় যে অহংকারকে একেবারে বিনাশ করা যায় না, তবে উহাকে দাবাইয়া স্ববশে আনা যায়। উহাকে স্ববশে আনিবার জন্য তিনটি শক্তির প্রয়োজন—জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি। মুরুগা ঐ তিন শক্তির আশ্রয় লইয়া সুরপথ বা অহংভাবকে পরাভূত করিয়া বশে আনিয়াছিলেন। মুরুগার হস্তস্থিত ভেল বা দণ্ড জ্ঞানশক্তির প্রতীক এবং তাঁর দুই পত্নী দেবযানী ও বল্লী যথাক্রমে ক্রিয়া ও ইচ্ছাশক্তির প্রতীক।

অহংভাব একটি বহুশিরবিশিষ্ট দৈত্যবিশেষ। উহার একটি শির কাটিলে আর একটি প্রভাব বিস্তার করে। শ্রীমুরুগা বহুশিরবিশিষ্ট দৈত্যকে পরাভূত করিলে সে অবশেষে ময়ূররূপ ধরিয়া চিরকাল তাঁহার বাহনে পরিণত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করে।

ষড়াননের ছয়টি মুখের নিম্নরূপ ছয়টি কার্য :

প্রথম মুখ দ্বারা এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে আলোকিত করে।

দ্বিতীয় মুখ প্রিয় ভক্তদের স্তুতিগানে সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দিতচিত্তে তাহাদিগকে বর প্রদান করিয়া থাকে।

তৃতীয় মুখ বৈদিক বিধানানুযায়ী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক আরব্ধ যজ্ঞসমূহের যাহাতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখে।

চতুর্থ মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, চারিদিকে স্নিগ্ধ আলোক সম্পাতে মহর্ষিদের কষ্টসাধ্য শাস্ত্র-নিহিত সত্য শিক্ষাপ্রদানপূর্বক তাঁহাদের সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত করে।

পঞ্চম মুখ যুদ্ধযজ্ঞে আততায়ী শত্রুকুল সমূলে বিনাশ করে।

ষষ্ঠ মুখ লতার ন্যায় ইচ্ছাশক্তির প্রতীক-রূপিণী বল্লীকে ভার্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া বিমল আনন্দে হাস্যযুক্ত।

বিভিন্ন পুরাণে মুরুগার অসংখ্য স্তোত্র রচিত হইয়াছে এবং প্রারম্ভে যে ছয়টি বিখ্যাত তীর্থ-স্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সব স্থানে মুরুগার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তব তামিল ভাষায় পাঠ হইয়া থাকে। ভাবের গাম্ভীর্যে, ভাষার সৌকর্যে ও ভক্তির আতিশয্যে স্তবগুলি অতুলনীয়। একটি মাত্র স্তবের কয়েক পঙ্‌ক্তি অনুবাদ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি :

বিজয়িনী ও জয়দায়িনী দুর্গার দুলাল তুমি,
সুশোভিতা-বনদেবতা-সমুদ্ভূত তুমি,
প্রার্থনাপরায়ণ দেবগণের সেনাপতি তুমি,
যুদ্ধে অজেয়, তারুণ্যে বিজয়ী তুমি,
ব্রাহ্মণদের সম্পদ্ ও জ্ঞানীদের বাগ্‌বিভূতি তুমি,
অশুভবিদারক মহাশক্তিশালী প্রভু তুমি,
সুললিত সঙ্গীতে চারণ-কীর্তিত বীর তুমি,
অপ্রাপ্য স্থাননিবাসী মুরুগা তুমি,
দুঃখদুর্দশাগ্রস্তকে কৃপাবর্ষণ কর তুমি,
পরম জ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী তুমি।

শাক্ত পদাবলী

শ্রীমতী ঊষাদেবী সরস্বতী

শাক্ত পদাবলী বাংলার মানসচিত্রের সুন্দর ও নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। এই সাহিত্য খুব পুরাতন নয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বরাহপুরাণ, দেবী-ভাগবত, মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত 'চণ্ডী' শাক্ত-দিগের প্রাচীন গ্রন্থ। সুপ্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্র শাক্ত-দের অবলম্বন। যাঁরা কালী তারা প্রভৃতি শক্তি-মন্ত্রের উপাসনা করেন, তাঁদের শাক্ত বলা হয়। প্রাচীনকালে প্রকৃত শাক্তগণ জাতিভেদের উর্ধ্বে বিরাজ করতেন। তাঁরা সাধারণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে সম্মানিত হতেন।

চণ্ডালা ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যসম্ভবাঃ।
এতে শাক্তা জগদ্ধাত্রি ন মনুষ্যাঃ কদাচন॥
পশ্যন্তি মানুষান্ লোকে কেবলং চর্মচক্ষুষা।

তন্ত্র-উপাসনা কোন্ সময় হ'তে ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়, তা সঠিক জানা যায় না। তন্ত্রের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে শাক্ত মত ভারতে প্রচলিত হয়েছিল—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অথর্ববেদই তন্ত্রশাস্ত্রের মূল, এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। সম্ভবতঃ গায়ত্রী-উপাসনা হতেই শক্তিপূজার প্রথম ধারণার উৎপত্তি। নির্বাণ-তন্ত্রে গায়ত্রী-উপাসক ব্রাহ্মণগণকে শাক্ত বলা হয়েছে।

শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্॥

মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে 'হ্রীং শ্রীং গার্গীঞ্চ গান্ধারীং যোগিনাং যোগদা সদা' প্রভৃতি দেবী-স্তোত্রের আভাস পাওয়া যায়। উপনিষদেও উমা-হৈমবতীর উল্লেখ রয়েছে। মৃচ্ছকটিকের প্রথমেই শিব-শক্তির বর্ণনা আছে :

পাতু বো নীলকণ্ঠস্য কণ্ঠঃ শ্যামাম্বুদোপমঃ।
গৌরীভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে॥

স্কন্দগুপ্তের শিলালিপি হ'তে জানা যায় যে, তিনি শাক্ত ছিলেন। তন্ত্র বেদকে কোথাও কোথাও অস্বীকার করেছে, তাই অনেকের মত—ব্রাহ্মণগণ এই শাক্ত মত উদ্ভাবন করেন নি। বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুন যে সংশোধিত মহাযান-মত প্রচার করেন তাতে শক্তিধর্মের বীজ নিহিত আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয়েরই শাক্ত সমাজের প্রধান আরাধ্যা—তারা বা আদ্যাশক্তি। 'চীনা-চার' প্রভৃতি তন্ত্রে পাওয়া যায় যে বশিষ্ঠদেব চীন দেশে বুদ্ধের উপদেশে তারার দর্শন পেয়েছিলেন। ইহা হ'তে অনেকেই অনুমান করেন যে তারা বা আদ্যাশক্তির পূজা ভারতের বাহির—উত্তর দেশ থেকে এসেছে। অনেকে আবার অনুমান ক'রে থাকেন যে শকজাতির একটি শাখা ভারতবর্ষে 'শাক্ত' নামে পরিচিত হয়েছিল। তাদের আচার-ব্যবহারের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে তারা মদ্য মাংস প্রভৃতি পঞ্চ ম-কারের পক্ষপাতী ছিল। মহারাজ কণিষ্কের সময়ে সমস্ত এশিয়ায় মহাযান-মত প্রচারিত হয়। মহাযানেরাই সর্বত্র শক্তিপূজা প্রচার করেছিলেন। বেদমার্গ-পরায়ণ ব্রাহ্মণ-গণ প্রথমে এই মত গ্রহণ করেননি। পরে অবশ্য কেহ কেহ শাক্ততন্ত্রে দীক্ষিত হন।

বেদান্ত-মতে মায়া দ্বারা ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। এই মায়াকেই আদ্যা শক্তি বলা হয়। বৈজ্ঞানিকগণ যাকে বিশ্বশক্তি বলেন, দার্শনিকগণ তাকেই মনঃশক্তি বলেন। মার্কণ্ডেয় পুরা-ণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে সেই চিন্ময়ী জগন্ময়ী অজ্ঞেয় মহাশক্তির অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আবার কোন কোন পণ্ডিত বলে থাকেন,

কালী চণ্ডী এঁরা সব অনার্যদের দেবতা। স্ত্রী দেবতার পূজা বিশেষ ক'রে আর্যদের বাইরে প্রচলিত ছিল। আর্যগণ পরে এঁদের স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন।

*　　*　　*

বাংলায় চণ্ডীর মাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্যগুলির মধ্যে মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল', বলরাম চক্রবর্তীর 'কালিকামঙ্গল' উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন বাংলা গানগুলির মধ্যে শাক্তগান ভক্তি ও ভাবমাধুর্যের দিক থেকে বাঙালী জাতির অমূল্য সম্পদ। প্রায় শতাধিক বাঙালী কবি ও ভক্ত শাক্ত গান রচনা ক'রে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। ভক্তের অন্তরের ব্যাকুলতা এই গানগুলিতে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। ভক্ত আপন অন্তরের মাধুরী মিশিয়ে ভগবানে মাতৃত্ব আরোপ ক'রে কতই না অভিমান ও আবদার করেছেন। এই অভিমান বা আবদারের মধ্যে কোন কষ্টকল্পনা নেই—এর ভঙ্গী সারল্যে ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ। কবি শ্যামা-মাকে গালাগালিও দিতে ছাড়েন না—কত অভিমান, অভিযোগ, সংশয়, বিশ্বাস, ক্রোধ, দুঃখ, হর্ষ; অথচ মায়ের কাছে কি অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন! এই গানগুলির মধ্যে একটা সর্বজনীনতার সুর ফুটে উঠেছে। উপমা অলংকার এত সাধারণ যে নিরক্ষর পাঠকও তা অনায়াসে বুঝতে পারে। এই গান-গুলিতে কোন দার্শনিক জটিলতা নেই—অথচ একটা করুণ বৈরাগ্যের আহ্বান এই গানগুলিকে চমৎকারিত্ব দান করেছে। এই মাতৃভাবের সাধনা ও সঙ্গীত বাঙালীর নিজস্ব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই ভাবের গীতি-কাব্য রচিত হ'তে আরম্ভ হয়। তবুও মনে হয় রামপ্রসাদই এই নতুন সাহিত্যের প্রথম প্রবর্তক। এখানে কয়েকজন পদ-রচয়িতার পদ উল্লেখ করছি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর দুই পুত্র শিব-চন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র এইরূপ গান রচনা করেছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রচিত একটি পদ:

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজ্জুরূপিনী।
ন:সরে নিশ্বাস-পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী॥
চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিনলোক,
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমো-রজোতে ব্যাপিনী।
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি।

দেওয়ান নন্দকুমারের রচিত পদ:

কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে।
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসার-বাসনা সনে॥
মূলাধারে বরাসনে, ষড়দল লয়ে জীবনে,
মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমা দে হেরি নিস্তারি,
পাব ব্রহ্মদ্বার, শক্তি আরাধনে॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায় অনেক সঙ্গীত রচনা ক'রে গিয়েছেন। তাঁর একটি:

তারা কত রূপ জান ধরিতে
জননী গো জালামুখী গিরি-দুহিতে॥
লোমকূপে ধরাধর, হৈমবতী পরাৎপর,
অসুর বিনাশ কর মা আঁখির নিমিষে।
তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া মহাবিষ্ণু,
তুমি গো মা রামরূপিণী, তুমি অসিতে॥

বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের গুরু কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্যও একজন বিখ্যাত শাক্ত পদকর্তা। এই বিষয়ে রামপ্রসাদের পরই তাঁর স্থান। তাঁর রচিত একটি পদ:

যখন যেমনরূপে রাখিবে আমারে।
সকলি সফল যদি না ভুলি তোমারে॥
জনম, করম, দুঃখ, সুখ করি মানি।
যদি নিরখি, অন্তরে শ্যামা জলদবরণী॥

*　　*　　*

কমলাকান্ত উভয় সম সাধন জননী,
নিবস যদি হৃদয় মন্দিরে গো মা॥

তবে এই কাব্যগুলিতে মন্ময়তার অভাববশতঃ ভক্তিরসের ধারা প্রবাহিত হয়নি। এই অনু-ভূতির রসধারা প্রবাহিত করেন রামপ্রসাদ সেন। শাক্তধর্মসংগীত রচনাকারিগণের মধ্যে তাঁর স্থান সর্বোচ্চে। কবি ও সাধক রামপ্রসাদ ভাবে

বিভোর হ'য়ে মাতার কাছে শিশু যেমন অভিমান ও আবদার করে মা কালীর কাছে তিনি তেমনই আবদার করেছেন। আরাধ্যা দেবী ও আরাধনাকারী ভক্তের মধ্যে ব্যবধান ছিল না। রামপ্রসাদের গানগুলি এক বিশেষ নতুন সুরে গীত হ'য়ে থাকে। এই সুরের নাম 'রামপ্রসাদী সুর'। মনকে আহ্বান ক'রে তিনি অসংখ্য পদ গেয়েছেন, তার মধ্যে একটির আরম্ভ :

মন তোর এত ভাবনা কেনে ?
একবার কালী ব'লে বসরে ধ্যানে।

রামপ্রসাদের পর অসংখ্য পদকর্তার আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সাধকও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রামলাল দাসদত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাবের মৌলিকতায় ও বিশুদ্ধ পদ-সংযোজনায় তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল।

শাক্ত পদকর্তাদের মধ্যে মুসলমান সাধকও পাওয়া যায়। আলোয়াল ও মৃজা হুসেন আলীর নাম প্রসিদ্ধ। আলীর রচিত একটি পদ :

বলে মৃজা হুসেন আলী, যা করেন মা জয় কালী।
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি।
যাবে শমন এবার ফিরি !
এসো না মোর আঙিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরারি ॥

সাধক 'প্রেমিকে'র গানগুলি শাক্ত পদাবলীর ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছে ; এবং নজরুলের কালী-বিষয়ক সঙ্গীতগুলি বাঙালীর সুর-সাধনায় শক্তি সঞ্চার করেছে !

সাধক কবি রামপ্রসাদ

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

মায়ের নামে ভাসিয়েছিলে এ সংসারে তরীখানি।
মা তোমারি মুখ দিয়ে তাই শুনিয়েছে যে অমর বাণী !
বিষয় সে তো সামান্য ধন, অভয় চরণ চেয়েছিলে।
জমিদারের তবিলদার তো চাওনি হ'তে কোন কালে।
প্রসাদী সুর এমন মধুর, এই নিখিলে আর কোথায় ?
তোমার গানের গঙ্গাধারায় কতই মানুষ শান্তি পায় !
ধরাতলে ধন্য হ'ল তোমার সাধনপীঠের গ্রাম।
ছায়াশীতল পঞ্চমুণ্ডীর আসনটি যে পুণ্যধাম।

'খোদা' ব'লে ডাকে যারে মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী
'কালী' নামে তারেই ডেকে দেখালে কী ভোজের বাজি !
বিমাতা নয় আপন কভু, চাওনি যেতে তাইতো কাশী ;
ধ্যানের কালে কালীপদেই দেখ দেখেছ রাশি রাশি।
মন মাতালে মেতেছে যার, মদ-মাতালে বুঝবে কি তায় ?
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ 'কালেরে কলা দেখায়'।
ছিয়াত্তরের হাহাকারে গাইলে, যখন মরণ নাচে—
'অন্ন দে মা অন্নদে ! গরিবের বল্ কি দোষ আছে ?'
মানব-জমিন আবাদ ক'রে তুললে ফসল, ফল্‌ল সোনা।
মায়ের রাঙা চরণতলে চিরমুখর ঐ রসনা।

সমালোচনা

গদাধর (দ্বিতীয় খণ্ড)—লেখক : 'অজ্ঞাত শত্রু'; প্রকাশক : শ্রীকমলেশ চক্রবর্তী, কল্পতরু প্রকাশনী, ৮, কে. কে. রায়চৌধুরী রোড, কলিকাতা ৮; পৃষ্ঠা : ৩২৬; মূল্য : টাকা ৫·৫০।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনের বাল্য-কৈশোর অংশের অলৌকিক ঘটনাধারার সংগ্রহ দেখি এই পুস্তকে। পুস্তকখানির প্রথম খণ্ড প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই দ্বিতীয় খণ্ড দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণের কৈশোর লীলার একখানি মনোরম চিত্রণ সন্দেহ নাই। বালক গদাধরের পিতৃবিয়োগের পর হইতে ভ্রাতা রামকুমারের সহিত কলিকাতা আগমনের প্রাক্‌কাল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় দশ বৎসরকালের (১৮৪৩—১৮৫৩খৃঃ) কামারপুকুরের বৈচিত্র্যময় জীবনকাহিনী লেখক খুব প্রাণস্পর্শী ভাষায় ও সহজ ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। কাহিনী-গ্রন্থ হিসাবে বর্তমান পুস্তকখানিও ইহার পূর্ববর্তী খণ্ডের অনুরূপ সুখপাঠ্য হইয়াছে। তথাপি একথাও অনস্বীকার্য যে লেখকের কল্পনাশ্রয়ী তুলির আঁচড়ে জীবনী-চিত্রের ইতিহাস-ধর্ম অনেকাংশেই ব্যাহত হইয়াছে। যাহা হউক, গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠক-পাঠিকার মনে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের মূল গ্রন্থাদি পাঠের আগ্রহ জাগাইয়া তুলিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কাগজ ও মুদ্রণ ভাল। প্রচ্ছদপটে রুচির পরিচয় আছে। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করিয়া আমরা ছদ্মনামা লেখককে অভিনন্দিত করিতেছি। —অক্ষজানন্দ

Sri Sri Sarada Devi—by P. B. Junnarkar—Published by Presidency Library, 15, College Square. Calcutta 12, Pp. 394+6, Price : Rs. 5·50.

মহান্ জীবনচরিত পরিক্রমার মধ্যে একটা সত্যকারের আনন্দবোধ আছে—বিশেষতঃ তা যদি সুলিখিত ও সুগ্রথিত হয়। আলোচ্য পুস্তকটিতে এইরূপ রূপায়ণের সার্থকতা দেখা যায়।

সহজ সুন্দর ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-আলেখ্য লেখক ভালভাবেই ফুটিয়েছেন। 'জুন্নারকর' নিজে ভক্ত, তাই লেখার মধ্যে একটি ভক্তির ফল্গু-নদী প্রবহমাণ। তা ছাড়া, এই পুস্তকটির ছত্রিশটি পরিচ্ছেদের মধ্যে শেষ পরিচ্ছেদটিতে লেখক কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্বমাতৃত্বরূপের ব্যাখ্যান নিছক স্বকপোলকল্পিত নয়, তা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের নানা ঘটনা ও উক্তির ভিত্তির উপরেই গড়ে তোলা হয়েছে। এক কথায় পুস্তকটি আমাদের ভাল লেগেছে, এবং অনেকেরই লাগবে।

পুস্তকটির ছাপায় অনেক ভাঙ্গা অক্ষর থাকায় পুস্তকটির সৌষ্ঠব কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে প্রকাশককে এদিকে একটু অবহিত হ'তে অনুরোধ করি। আমাদের চির পরিচিত 'বেলুড়'-এর ইংরেজী বানান লেখক Belur না ক'রে 'Belud' করেছেন; এতে অবশ্য তিনি 'ড়'কে রীতি-অনুযায়ী 'd' দিয়ে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু প্রচলিত বানান 'Belur' রাখলেই চ'লত। —মহানন্দ

ভারতীয় তর্কবিদ্যা প্রবেশিকা—লেখক : শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী, তর্কবেদান্ততীর্থ ; প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার, নগেন্দ্র গ্রন্থামন্দির, বাঘা যতীন পল্লী, সি ব্লক। মূল্য দুই টাকা ; পৃষ্ঠা ৬৭+৭।

আকারে ক্ষুদ্র হইলেও পুস্তিকাটিতে যেরূপ প্রাঞ্জলরূপে ও সংক্ষেপে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা ভারতীয় দর্শনের প্রবেশিকা হইবার একান্ত উপযোগী। কলেজে অধ্যয়নকারী দর্শনের ছাত্রগণও ইহার আলোচনায় উপকৃত হইবেন। গ্রন্থের শেষাংশে 'অন্নংভট্টবিরচিতঃ তর্কসংগ্রহঃ' প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকটির বাঁধাই-বিষয়ে আরও যত্ন লওয়া প্রয়োজন।

দীপশিখা : (আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বিবিধার্থসাধক বিদ্যালয়ের সাময়িক পত্রিকা)—সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীআলোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৮ (ডবল ক্রাউন)।

সুনির্বাচিত সুমুদ্রিত চল্লিশটি প্রবন্ধ কবিতা সম্ভারে পত্রিকাটি সম্পাদক-মণ্ডলীর সুরুচির স্বাক্ষর বহন করছে। দুতিনটি ইংরেজী প্রবন্ধ, একটি সংস্কৃত এবং একটি হিন্দী কবিতা বিদ্যালয়-পত্রিকাটির রূপ সম্পূর্ণ করেছে। 'মহাকাশ অভিযান' প্রবন্ধটি যদিও ডায়াগ্রাম-সহ, তথাপি অসম্পূর্ণ। পত্রিকাটির উন্নতি কামনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

Adventures in Religious Life : by Swami Yatiswarananda, Published by Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras 4. Pp. 443+xxi (including Introduction, Index, Glossary and Bibliography.) Price : Board Rs. 4, Calico Rs. 5.

স্বামী যতীশ্বরানন্দ প্রণীত 'ধর্মজীবনের অভিযান'—তাঁহার প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে ধর্মপ্রচারের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল পুস্তকাকারে রূপায়িত। আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে প্রয়াসী মানবের মনে যে সকল প্রশ্ন ওঠে, তাহা এখানে ব্যাবহারিক ভাবে এবং বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তুই পুস্তকটির প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে। প্রতিটি অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলিও বিষয়সূচীতে থাকায় পাঠকের পক্ষে নিজ নিজ প্রশ্ন-অনুযায়ী বিষয়-নির্বাচনের সুবিধা হইবে। অধ্যায়-পরিচয় :

1. Harmony and universalism in true religious life.
2. The adventures of spiritual seekers.
3. The pursuit and attainment of happiness.
4. The type of salvation we want.
5. The control of the subconscious mind.
6. Indian Yoga and Western Psychology.
7. Destiny, Human effort & Divine grace.
8. The Hygiene of a peaceful mind.

9-10. Overcoming obstacles in religious life.

11. The significance of religious symbols.
12. The secret stairs to superconscious.
13. How to dehypnotise ourselves.
14. The mystery of religious experience.
15. The power of spiritual vibration.
16. The reality beyond time and space.
17. God and problem of evil.
18. God in everything.
19. How illumined souls live in the world.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে ও নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রসমূহে প্রতিমায় এ বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে :

আসানসোল, কামারপুকুর, কাঁথি, জয়রামবাটী, জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বরিশাল, বারাণসী (অদ্বৈতাশ্রম), বালিয়াটী, বোম্বাই, ময়মনসিংহ, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, শিলচর, শিলং, শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ।

বন্যায় সেবাকার্য

এবার প্রচণ্ড বর্ষার দরুণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বন্যার প্রকোপ দেখা দিয়াছে। অন্যত্র প্রকাশিত আবেদনে ভুজকচ্ছ, সুরাট ও আসামে মিশন-পরিচালিত সেবাকার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। যথাসময়ে বিস্তারিত বিবৃতি প্রকাশিত হইবে।

নিম্নে পশ্চিমবঙ্গে মিশন-পরিচালিত সেবাকার্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদত্ত হইতেছে।

জেলা	থানা	ইউনিয়ন	গ্রাম
২৪ পরগনা		বোড়াল	৩
		বেড়গুম	৪+
		মসলন্দপুর	১
		নালুয়া	২
		পানাকো	২
মেদিনীপুর		কুকড়াহাটী	৩+
বর্ধমান			৩+
হাওড়া	উলুবেড়িয়া		১৪
	ডোমজুড়		৭

বন্যার্তগণকে চিঁড়া, চাল, ডাল, গম, আটা, গুঁড়া দুধ, কাপড়, ঔষধ ও ঘরনির্মাণের জন্য কিছু খরচ দেওয়া হইতেছে। এখনও বহু গ্রাম হইতে ডাক আসিতেছে। ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলার সেবাকার্য নরেন্দ্রপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে, এবং হাওড়া ও বর্ধমান জেলার সেবাকার্য যথাক্রমে বেলুড় সারদাপীঠ ও আসানসোল মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ৫৪৮ পৃষ্ঠায় আবেদন দ্রষ্টব্য।

উদ্বোধন-অনুষ্ঠান

পাটনা : গত ৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় একটি বিরাট ও বিশিষ্ট সভায় পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের আবেষ্টনীর মধ্যে ছাত্রাবাসের নবনির্মিত বিরাট ভবন উদ্বোধন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী প্রভৃতি অনেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই ছাত্রবাসে ৩০টি ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান হইবে, তন্মধ্যে ১৬টি স্থান দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য। ভবন-নির্মাণে ১,০২,০০০৲ খরচ হইয়াছে; তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৪৫,০০০৲ ও রাজ্যসরকার ৪০,০০০৲ দিয়াছেন, বাকী টাকা পাটনার বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীললি সেন দান করিয়াছেন।

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহিত পূর্ব সম্পর্ক স্মরণ করিয়া রাষ্ট্রপতি বলেন : অনেক বছর আগে যখন এই আশ্রম স্থাপিত হয়, তখন আমি প্রায় আসতাম। যদিও আজ পাটনা থেকে দূরে আছি—তবু এই আশ্রমটির কথা সর্বদা আমার মনে হয়। মিশনের কাজ আজ দেশের সর্বত্র এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। সপ্তাহখানেক আগে মিশনের রাজকোট কেন্দ্রে অনুরূপ একটি ভবন উদ্বোধন ক'রে এসেছি। যেখানে মানুষের দুঃখকষ্ট সেখানেই এই সন্ন্যাসীদের সেবা, আমিও এঁদের পাশে দাঁড়িয়ে একদিন সেবা করার সুযোগ পেয়েছি।

আশ্রম-সম্পাদক স্বামী বীতাশোকানন্দজীর বিবরণী উল্লেখ ক'রে রাষ্ট্রপতি বলেন : আশ্রমের সেবাকার্য আজ বহুদিকে বিস্তৃত। আজ চারিদিকে দেখি—চরিত্রের অভাব; এই অভাব দূর করবার যেটুকু চেষ্টা হচ্ছে—তা এই স্বামীজীরাই করছেন। দেশে ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার,

শিক্ষক চাই—নিঃসন্দেহ, কিন্তু সবার উপরে চাই চরিত্রগঠন, উৎকৃষ্ট মানুষ! স্বাধীনতা লাভের পর যত অভাব-অভিযোগের কথা শোনা যাচ্ছে, তার মধ্যে প্রধান—চরিত্রের অভাব। স্বাধীনতা-লাভের আগে যে চরিত্র আমাদের ছিল, স্বাধীনতালাভের পর তা আর নেই। যদি দেশকে আলস্য ও নৈরাশ্য থেকে রক্ষা করতে হয়, তবে প্রথম প্রয়োজন চরিত্রগঠন—যাতে সমাজে ভাল ভাল মানুষের আবির্ভাব হয়। এ বিষয়ে পিতামাতারও দায়িত্ব আছে, তাঁরা মিশনের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে ছেলেদের জীবন গড়ে নিতে পারেন।

পরিশেষে রাষ্ট্রপতি বলেন: আমি চাই আমাদের দেশের সব স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশনের আবহাওয়া প্রবাহিত হোক; আরও চাই মিশন এমন এক উচ্চতর নৈতিক ভাব বিকীরণ করুক, যাতে চরিত্রবান্ যুবকেরা দেশসেবায় আগিয়ে আসে।

নরেন্দ্রপুর: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্কুল-কলেজ যুক্তগৃহের (বাণীভবন) দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় ডক্টর শ্রীমালী গত ২৯শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে আশ্রমে উপস্থিত হইলে ছাত্রেরা তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানায়, প্রথমে তিনি কলেজ-ছাত্রদের হষ্টেল (ব্রহ্মানন্দ-ভবন) পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁহাকে মাল্য ও তিলকের দ্বারা অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং একজন ছাত্রই তাঁহাকে ছাত্রাবাসের সব কিছু ঘুরাইয়া দেখায়, আশ্রমিকদের জন্য ১৮টি শয্যা-যুক্ত হাসপাতাল (আরোগ্য-ভবন), স্কুলের ছাত্রদের হষ্টেলগুলি, নির্মীয়মাণ লাইব্রেরী-গৃহ, খেলার মাঠ, জিমনেসিয়াম প্রভৃতি ঘুরিয়া দেখিয়া সাড়ে পাঁচটায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী স্কুল-কলেজ যুক্তগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হন। এখানে প্রধান শিক্ষক তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতির মাঙ্গলিক ধ্বনির মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী 'বাণীভবন'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে আশ্রমে একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীর সব চেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল ছাত্রদের হাতের তৈরী জিনিষগুলি, শিক্ষামন্ত্রী বিশেষ মনোযোগ সহকারে প্রদর্শনীটি দেখেন এবং ছাত্রদের এই উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর ডক্টর শ্রীমালীর সভাপতিত্বে আশ্রমের বহুমুখী বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও অন্যূন দুই সহস্র অতিথি এই সভায় যোগদান করেন। মাননীয় অতিথিদের মধ্যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, জাপান ইংলণ্ড ও আমেরিকার দূতাবাসের কর্মচারিবৃন্দের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। ছাত্রেরা গান, আবৃত্তি ও অভিনয় করিয়া অতিথিদের আনন্দ দান করে। একটি অন্ধ ছাত্রের বেহালা-বাদন সকলকে মুগ্ধ করে। পুরস্কার-বিতরণের পর সভাপতি তাঁহার ভাষণ-প্রসঙ্গে আলোচনা করেন—শিক্ষার কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং সেই উদ্দেশ্য কিভাবে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রূপায়িত হইতেছে।

কার্যবিবরণী

রেঙ্গুন: রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ভারতের বাহিরে মিশনের একটি উল্লেখযোগ্য শাখাকেন্দ্র; ইহা জাতিধর্ম-নির্বিশেষে আর্ত মানবের সেবারত। এখানে সাধারণ ও দুরারোগ্য রোগসমূহের চিকিৎসা করা হয়। ১৯৫৮ খৃঃ বিস্তৃত কার্য-বিবরণীতে প্রকাশিত: হাসপাতালে মোট শয্যা-সংখ্যা ১৬২; আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগে ৩,৬৮৩

রোগী চিকিৎসিত হয়; তন্মধ্যে পুরুষ—২,৩৫০, নারী—১,১০৫ এবং শিশু—২২৮।

বহির্বিভাগ চিকিৎসালয়ের ছয়টি শাখা। সার্জিক্যাল ও মেডিক্যাল ওআর্ড ছাড়া পৃথক্ ক্যান্সার, চক্ষু, দন্ত, E.N.T. এবং এক্স্-রে ওআর্ড আছে। বহির্বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ২,২২,৮২৭ (নূতন ৬৮,৬৮৬), দৈনিক গড়ে ৭০০ রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

অন্তর্বিভাগে ও বহির্বিভাগে অস্ত্রচিকিৎসা করা হয় যথাক্রমে ৪,২২১ এবং ২,৪৭০ রোগীর।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত ফিজিওথেরাপি বিভাগে বিভিন্ন প্রণালীতে বৈদ্যুতিক চিকিৎসা করা হয় ৪,৮৯০ জনের, ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ১১,২৭৬টি নমুনা পরীক্ষা হয়।

দেশবাসী হিসাবে রোগীর সংখ্যা

বর্মী	১,২২,২৬৯
ভারতীয়	৯১,৮৭৬
পাকিস্থানী	১০,৭৮৪
অন্যান্য	১,৫৮১

আলোচ্য বর্ষে বদান্য জনসাধারণের অর্থে একটি আধুনিক অস্ত্র-চিকিৎসাগার নির্মিত ও সুসজ্জিত হইয়াছে। ৭ই অক্টোবর (১৯৫৮) বিশিষ্ট একটি সভায় বর্মার রাষ্ট্রপতি (President) উহার উদ্বোধন করেন। এই নবনির্মিত ভবনে দুইটি অস্ত্রোপচার-গৃহ (তন্মধ্যে একটি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত), ১টি রোগী-বহনের লিফ্‌ট্, ৪টি আরোগ্য কক্ষ এবং আলোবাতাসযুক্ত হলে ৪৪টি শয্যা আছে। এজন্য বর্মী মুদ্রায় ব্যয় হইয়াছে K. 4,50,000.

আলোচ্য বর্ষে সাধারণ তহবিলে ব্যয়—K 3,51,810, ঘাটতি K. 56,826, পরবর্তী বর্ষে প্রধানতঃ নূতন কয়েকটি বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য ঘাটতি দাঁড়াইবে প্রায় K. 1,29,575; হাসপাতালের উন্নতির জন্য ইহা অপরিহার্য।

শ্যামলাতাল: শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম আলমোড়া জেলায় হিমালয়ের পাদদেশে প্রকৃতির শান্তিময় লীলানিকেতনে অবস্থিত। ১৯১৪ খৃঃ পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ এই আশ্রম স্থাপন করেন। আশ্রমটি উত্তরপূর্ব রেলপথের টনকপুর ষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল দূরে ৪,৯৪৪ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

আশ্রমের ১৯৫৮ খৃঃ (৪৪তম বার্ষিক) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য গ্রামগুলির অসহায় অধিবাসিগণকে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া আশ্রমের অন্যতম কার্য। বহু দূর হইতে দিনের পর দিন দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া দরিদ্র পার্বতীয়েরা এখানে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ঔষধ লইতে আসে, কারণ ঐ অঞ্চলে ইহাই একমাত্র সেবা-প্রতিষ্ঠান যেখানে পীড়িতেরা বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পায়। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এ যাবৎ এই সেবাশ্রমে মোট ১,৮৫,৮০১ রোগী চিকিৎসা লাভ করিয়াছে। ১২টি শয্যা-সমন্বিত অন্তর্বিভাগটিতে রোগীরা বিশেষ চিকিৎসা লাভ করিয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ও অন্তর্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৮,৩৮৮ (নূতন ৬,৫৬৪) ও ১৮৮।

সেবাশ্রমের অপর একটি প্রয়োজনীয় বিভাগ হইল পশুচিকিৎসালয়; ইহা স্থাপিত হয় ১৯৩৯ খৃঃ। এখানে এযাবৎ গরু, মহিষ, ঘোড়া, কুকুর, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি ৪৮,১৭৩টি গৃহপালিত পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১,৯৬৭টি পশুর চিকিৎসা করা হয়।

বার্লোগঞ্জ: মুসৌরীর নিকট ৫৫০০ ফুট উচ্চে হিমালয়ের ক্রোড়ে বার্লোগঞ্জ সারদাকুটির আশ্রমটি অবস্থিত। সংঘের কর্মক্লান্ত সাধুগণ ও ভজনপিপাসু ভক্তগণ যাহাতে এখানে আসিয়া কিছুদিন থাকিয়া সাধন ভজন করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই আশ্রমটি স্থাপিত।

১৯৫৮ খৃঃ বিভিন্ন সময়ে ৩২ জন সাধু আসিয়া এখানে বাস করিয়া গিয়াছেন। আশ্রমে ১২ জন সাধুর বসবাসের স্থান আছে, কিন্তু অর্থাভাবে এখনও সকলের বাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। আশ্রমে একটি ক্ষুদ্র পাঠাগার আছে ও প্রতিদিন সাধু ও ভক্তগণের জন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠাদি করা হইয়া থাকে।

আলোচ্যবর্ষে আশ্রমের আয় টাকা ৪৬২৯'৭৫ ও ব্যয় টাকা ৩৫১৬'২৮। আশ্রমের সুষ্ঠু পরিচলানার জন্য আরও আয়বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন।

বক্তৃতা-সফর

গত জানুআরি মাস হইতে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ আসাম ও বাংলায় হোজাই, লামডিং, ধুবড়ী, কলিকাতা, হাওড়া, বর্ধমান, কামারপুকুর, সারগাছি, জিয়াগঞ্জ, কুচবিহার, মেখলীগঞ্জ এবং যুক্ত প্রদেশে কাশী, এলাহাবাদ, লখনৌ, আলমোড়া, রাণীক্ষেত, দ্বারাহাট, শ্যামলাতাল, মায়াবতী, লোহাঘাট, সাহাজাহানপুর, বেরেলী এবং কাশ্মীরে—শ্রীনগর ইত্যাদি স্থানে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে 'শিক্ষার আদর্শ,' 'হিন্দুধর্ম' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে ছায়াচিত্র সহযোগে মোট ৮১টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৪৫টি বাংলায় ও ৩৬টি হিন্দীতে প্রদত্ত।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

স্যাণ্টা বারবারা: গত আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ার অন্তর্গত স্যাণ্টা বারবারায় অবস্থিত শ্রীসারদামঠে পাঁচজন আমেরিকান ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। বেলুড় মঠের অনুমতি-অনুসারে তাঁহাদের গুরু দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়া বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দই বেলুড় মঠে অনুসৃত পদ্ধতি-অনুযায়ী তাঁহাদের সন্ন্যাস দীক্ষা দেন। এতদুপলক্ষে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত অন্যান্য কেন্দ্রের ছয়জন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন; যথা: স্বামী পবিত্রানন্দ (নিউ ইয়র্ক), স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ (সেন্ট লুই), স্বামী বিবিদিষানন্দ (সিএট্‌ল্), স্বামী অশেষানন্দ (পোর্টল্যাণ্ড), স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (স্যানফ্রান্সিস্কো), স্বামী ঋতজানন্দ (প্রাক্তন, নিউইয়র্ক)।

ষাট বৎসরেরও আগে স্বামী বিবেকানন্দ নিউ ইয়র্কে একজন নারী ও একজন পুরুষকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন। তাহার পর পাশ্চাত্ত্যে এরূপ অনুষ্ঠান এই প্রথম। স্বামী প্রভবানন্দ-সহ নবদীক্ষিতা সন্ন্যাসিনীগণ ভারত-তীর্থ দর্শনে আসিয়াছেন। গত দুর্গাপূজার সময় তাঁহারা বেলুড় মঠের নবনির্মিত আন্তর্জাতিক অতিথি-ভবনে ছিলেন, এবং সাগ্রহে পূজা দর্শন করেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে যুগলকিশোরী দেবী

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬-২০ মিঃ সময় শ্রীমতী যুগলকিশোরী দেবী ৬২ বৎসর বয়সে জয়রামবাটীতে সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

অল্প বয়সেই তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কৃপা লাভ করেন এবং তাঁহার অন্যতমা সেবিকারূপে কোয়ালপাড়া ও জয়রামবাটীতে এবং কখন কখন বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে ও নিবেদিতা বিদ্যালয়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মহিলা-আশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে তিনচার বৎসর তিনি বাঙ্গালোরে ছিলেন। জীবনের শেষ ৩০ বৎসর তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির-সংলগ্ন মায়ের বাড়ীতে থাকিয়া সাধন ভজন ও সমাগত মহিলাভক্তদের সাধ্যমত সেবাযত্ন করিতেন। তাঁহার সলজ্জ ও সরল ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হইত। স্বামী সারদানন্দ মহারাজের তিনি বিশেষ স্নেহপাত্রী ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শান্তি লাভ করুক।

পরলোকে মতীশ্বর সেন

গভীর দুঃখের সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি যে গত ১৯শে অক্টোবর বেলা ১টার সময় ৬৯ বৎসর বয়সে হৃদ্রোগের আক্রমণে শ্রী মতীশ্বর সেন (শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে 'টাবুবাবু' নামে পরিচিত) দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি পৈতৃকভূমি বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বাল্যকালেই বাগবাজার বসুপাড়ায় স্বামী সদানন্দ (গুপ্ত মহারাজের) সঙ্গলাভ করেন। তাঁহারই মাধ্যমে সতীশবর শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে উপনীত হন এবং তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হন। সতীশবর বা টাবুবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পার্ষদদের প্রায় সকলেরই সান্নিধ্যলাভ করেন এবং তাঁহাদের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। অগ্রজ (বর্তমানে আলমোড়া-নিবাসী বৈজ্ঞানিক) শ্রীবশীশ্বর সেনের সাহচর্যে তিনি স্বামী সদানন্দ মহারাজের অনেক সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রোগ-নিরাময়ে সঙ্গীত

অসুস্থ দেহ ও মনের উপর সঙ্গীতের যে একটা বিশেষ প্রভাব আছে, এটা সুদূর অতীত থেকেই মানুষের জানা। এই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষণা শুরু হয় মাত্র গত ৩০ বছর আগে।

গত দশ বছর ধরে আমেরিকার বেশ কয়েকটি হাসপাতালে সহায়ক চিকিৎসারূপে সঙ্গীতের প্রচলন শুরু হয় এবং রোগীর দেহ ও মনের উপর সঙ্গীতের প্রভাব সম্পর্কে গভীরভাবে নজর দেওয়া হয়।

আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিষদ গান-বাজনা শুনিয়ে কেবল মানসিক রোগই নয়, অন্যান্য রোগও নিরাময়ের জন্য বহু বছর ধরে চেষ্টা ক'রে এসেছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও অনুরূপ প্রচেষ্টা করেছে।

মূক, বধির ও অন্ধ শিশু এবং মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত, শিশু-পক্ষাঘাত, হৃদ্‌রোগাক্রান্ত এবং বিকলাঙ্গ শিশুদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে গান-বাজনা শুনিয়ে সুফল পাওয়া গিয়েছে। যে সব শিশু তোতলা বা যারা দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে পূর্ণতা লাভ করেনি, তাদের চিকিৎসায়ও গান-বাজনা শুনিয়ে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। যক্ষ্মারোগী এবং বিকলাঙ্গদের চিকিৎসায়ও গান-বাজনা শুনিয়ে খানিকটা সুফল পাওয়া গিয়েছে। আধুনিক ধরনের অনেক হাসপাতালে দেহের কোনও অঙ্গ বা মেরুদণ্ড অবশ ক'রে দেবার সময় রোগীকে গান-বাজনা শোনানো হ'য়ে থাকে। কোন কোন বড় হাসপাতালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার কালে প্রসূতিদের গান-বাজনা শোনানো হয়।

সঙ্গীত ও ঔষধ সম্পর্কে গবেষণার এখনও বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে এবং এই সম্পর্কে সামান্য মাত্রই গবেষণা করা হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, আড্রেনালিন এবং পিত্তরসের নিঃসরণের উপরে গান-বাজনার প্রভাব কতটা—তা পরিমাণ করা সম্ভব। কোন কোন গান-বাজনা শোনবার পর অস্ত্রোপচারের তীব্র যন্ত্রণাও রোগী ভুলে যায়। মানুষের মনের উপর গান-বাজনার অসীম প্রভাব রয়েছে। প্রার্থনা-সঙ্গীতে মন ভক্তিতে আপ্লুত হ'য়ে পড়ে, তেমনি কোনও আনন্দ-উৎসবে গান-বাজনা মনকে মাতিয়ে তোলে।

যে সব শিশুর দৈহিক বা মানসিক কোন রকম ত্রুটি আছে এবং কোন চিকিৎসাতেই যেখানে সুফল পাওয়া যায়নি, গান-বাজনা শুনিয়ে সে সব ক্ষেত্রেও সুফল পাওয়া গিয়েছে। দৈহিক বা মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন যে সব শিশু কোন শব্দের অর্থ বুঝে উঠতে পারে না, তারাও সঙ্গীতের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারে। শব্দের ক্ষেত্রে তার অর্থটাই প্রধান, কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তা নয়। কাজেই দৈহিক ও মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন রোগীর চিকিৎসায় তার সহজাত ধারণাটা জাগিয়ে তোলাই প্রধান কাজ এবং গান-বাজনার সাহায্যে সেটা সম্ভব হয়।

['আমেরিকান রিপোর্টার' থেকে সংকলিত]

উৎসবে ও নিত্যপ্রয়োজনে
শতাব্দীর সুপরিচিত
লক্ষ্মীবিলাস
সর্ব্বঋতুর উপযোগী তৈল
এম,এল,বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস • কলিকাতা-৯

Get more strength
out of your
FOOD
BE WISE TO PICK UP
Vanasda
VANASPATI
ENRICHED WITH VITAMIN A & D
BERAR OIL INDUSTRIES
AKOLA
BOMBAY
MADE FROM VEGETABLE OILS ONLY
F.P.S/BL2./97

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সরল রাজযোগ—৪র্থ সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি বুলের বাড়ীতে কয়েক জন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্ত্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ০.৫০।

পত্রাবলী—১ম ভাগ। অভিনব পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। প্রায় ৫৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামিজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজান হইয়াছে। পরিচয় এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবিসম্বলিত। মূল্য ১ম ভাগ ৫৲; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪.৫০।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৩শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামীজির ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৬৪৬ পৃষ্ঠা মূল্য ৫৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪.৬৫।

দেববাণী—৮ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান' নামক স্থানে কয়েক জন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন তাহার একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১.৯০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৩য় সংস্করণ। শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিক-ভাবে সন্নিবেশিত। ১৭০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১.৫০।

বিবেক-বাণী—১৬শ সংস্করণ। আচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজীর উপদেশাবলী। স্বামীজির বাষ্টসম্বলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। মূল্য ০.৪০।

কথোপকথন—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামীজির ছবি-যুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১.২৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১.১৫।

মদীয় আচার্য্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১০ম সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষাসম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামিজীর বিবৃতি। মূল্য ০.৭৫; উঃ-গ্রাঃ-পক্ষে ০.৭০।

ভারতীয় নারী—১২শ সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান আদর্শ, পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজির মনোরম ছবি-সম্বলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১২০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১.২৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১.১৫।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান—৭ম সংস্করণ, ১৩১ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদান্ত-মত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে আর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ—যে গুলি না বুঝিলে ধর্ম জিনিষটাকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ১.২৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১.১৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৪শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়ভরতের-উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্য গণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট ও ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। মূল্য ১.২৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১.১৫।

সন্ন্যাসীর গীতি—১৩শ সংস্করণ। স্বামীজি-রচিত 'Song of the Sannyasin' নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ০.১৫।

পওহারী বাবা—৯ম সংস্করণ। গাজীপুরের বিখ্যাত মহাত্মা পওহারী বাবার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। স্বামীজির হাফটোন ছবিযুক্ত। মূল্য ০.৫০।

হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ—৫ম সংস্করণ, ৮৮ পৃষ্ঠা। ইহাতে হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা, হিন্দুধর্মের ক্রমাভিব্যক্তি, ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর ও ডাঃ পল ডয়সেন সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মূল্য ০.৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ০.৭০।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৪র্থ সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০.৪০, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ০.৩৫ আনা।

অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৪র্থ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। এই পুস্তক পাঠে চরিত-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ১·২৫।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য প্রণীত—৪র্থ সংস্করণ; আচার্য্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲ মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা—৫ম সংস্করণ। স্বামী অরূপানন্দ প্রণীত। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" পুস্তক হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। মূল্য ০·৪০।

ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য ২৲ টাকা।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—২য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। প্রায় ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩·৫০।

শিবানন্দ-বাণী—১ম ভাগ—৪র্থ সংস্করণ, ২য় ভাগ—২য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ সঙ্কলিত মূল্য প্রতি ভাগ ২·৫০।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। প্রথম ভাগ—(ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর) ৫ম সংস্করণ। দ্বিতীয় ভাগ—(ছান্দোগ্য) ৪র্থ সংস্করণ। তৃতীয় ভাগ—(বৃহদারণ্যক) ৩য় সংস্করণ। ইহাতে উপনিষদের মূল, সংস্কৃত, অন্বয়মুখে বাংলা প্রতিশব্দ, সরল বঙ্গানুবাদ এবং আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যানুযায়ী দুরূহ বাক্যসমূহের টীকা প্রভৃতি আছে। সুদৃশ্য ছাপা, কাপড়ের মনোরম বাঁধাই, ডবল ক্রাউন—১৬ পেজি, প্রায় ৪৬৫ পৃষ্ঠা। মূল্য—প্রতি ভাগ ৫৲ টাকা।

সাধু নাগ মহাশয়—৯ম সংস্করণ। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ১·৫০ মাত্র।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ প্রণীত (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত) অতুলনীয় সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত 'গোপালের মা' এর আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ০·৫০।

নিবেদিতা—১৩শ সংস্করণ। শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত। স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা। মূল্য ০·৭৫।

সৎকথা—স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক সংগৃহীত—৩য় সংস্করণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ (শ্রীলাটু) মহারাজের উপদেশাবলীর সংকলন। মূল্য ২৲ টাকা।

যোগচতুষ্টয়—স্বামী সুন্দরানন্দ প্রণীত। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগের সংক্ষিপ্ত সরল বিবরণ। মূল্য ২৲ টাকা।

বেদান্তদর্শন—১ম খণ্ড—চতুঃসূত্রী। শাঙ্কর ভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ, রত্নপ্রভা টীকা, ভাব-দীপিকা ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্বলিত। প্রায় ২৪৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ টাকা।

স্তবকুসুমাঞ্জলি—৫ম সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত—বৈদিক শান্তিবচন, সূক্ত, প্রার্থনা ইত্যাদি বিবিধ সংস্কৃত স্তোত্রাদির অপূর্ব্ব সঙ্কলন। সংবাদপত্রসমূহে উচ্চ প্রশংশিত। মূল সংস্কৃত, অন্বয়, অন্বয়মুখে সংস্কৃতের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং মূলের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৩৲ টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৬ষ্ঠ সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ০·৬৫।

আগে চলো—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। কিশোরদের জন্য লেখা। তরুণমনে সুনীতি, দেশাত্মবোধ, সেবা, আদর্শনিষ্ঠা এবং ধর্মপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক যৌবনোন্মুখ ছেলেমেয়েকে এই বইখানি পড়িতে দেওয়া উচিত। মূল্য ১·৫০।

হিন্দুধর্ম পরিচয়—১ম ও ২য় ভাগ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সরল কথায় হিন্দুধর্মের মুখ্য বিষয়গুলির সহিত পরিচিত চেষ্টা এই বই দুখানিতে করা হইয়াছে। মূল্য ১ম ভাগ ০·৫০, ২য় ভাগ ০·৭৫।

দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য ও পূজা-পদ্ধতি—স্বামী কৈবল্যানন্দ প্রণীত। মূল্য ১ম ভাগ (পরিবর্দ্ধিত ৪র্থ সংস্করণ ০·৮৮, ২য় ভাগ (৩য় সংস্করণ) ১·৫০।

ঠাকুর এবার এসেছেন

ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। এবার বাঁশ ও ঘাস ছাড়া যার ভেতরে একটু সার আছে সেই চন্দন হবে। তোমাদের ভাবনা কি ?...

সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ-মন ভাল থাকে।...কাজ করতেই হয়। কর্মেই কর্মপাশ কাটে। কাজ ছাড়া থাকা ঠিক নয়।............

—শ্রীমা

● ● ●

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী অন্বয়ানন্দ ; ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, এম. আই. প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

Udbodhan-Phone : 55-2447 : October 1959 : Regd. No. C, 295

সম্পাদক—স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা—৩

৬১তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

বার্ষিক মূল্য ৫৲
প্রতি সংখ্যা ০·৫০

উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

ডায়া-পেপসিন
হজমশক্তি
বজায় রেখে
স্বাস্থ্যের
উন্নতি করে
ন্ন্যাশনাল? ড্রাগ • কলিকাতা

প্রকৃত দর্শন

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—১৩।২৭, ২৮)

জগৎ সংসার বিনাশশীল, পরিবর্তনশীল—ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত সত্য; কিন্তু তাহারই মধ্যে সর্বভূতে সমভাবে রহিয়াছেন অবিনাশী পরমাত্মা, সর্বভূতের আধাররূপে, উদয়-বিলয়ের অধিষ্ঠানরূপে। ধ্বংস হইয়া গেলে সব কিছু কোথায় যায়?—যেখান হইতে আসিয়াছিল, যেখানে রহিয়াছে, সেইখানেই লয় পায়—ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ হয়। এই পরিবর্তনের মাঝে যিনি সেই অপরিবর্তনীয়কে অপরোক্ষভাবে দেখেন, অন্তরের অন্তরে অনুভব করেন, তাঁহারই দর্শন প্রকৃত দর্শন।

সর্বস্থানে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি অন্তর্যামিরূপে আত্মস্বরূপে অনুভব করেন, তাঁহার আত্মভাব সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়, সকলের প্রতিই তিনি আত্মীয়তা অনুভব করেন, সকলকেই ভালবাসেন, কাহাকেও ঘৃণা বা হিংসা করিতে পারেন না। এই সম্যক্ সমদর্শনের ফলেই সাধক শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন, ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া বিরাট বিশ্বের সহিত যুক্ত হন। তরঙ্গ যেন তখন বুঝিতে পারে, সমুদ্রই আমার স্বরূপ?

কথাপ্রসঙ্গে

মহাজাতির শক্তি

শান্তির জন্যই শক্তির প্রয়োজন, ইহাই বিংশ শতাব্দীর জটিল সভ্যতার প্রধান শিক্ষা। শান্তির প্রস্তাবের পশ্চাতে যদি শক্তির সমারোহ থাকে, তবেই সে প্রস্তাব বিবেচনার যোগ্য হয়, নতুবা উহা যে পত্রে লিখিত হইয়াছে তাহারই মূল্য অবনমিত করে।

এ যুগের সংকট-স্রোতে জাতীয় জীবন-তরণীর যাঁহারা নাবিক—তাঁহাদের সর্বদা সাবধানে চলিতে হয়। একদিকে আন্তর্জাতিক ঘূর্ণাবর্ত, অপরদিকে আভ্যন্তরীণ বিরোধের গুপ্ত শৈল; এই সংকটের মধ্য দিয়া শান্ত সংযত বীর ইউলিসিসের মতো অদম্য আশা লইয়া তরণী বাহিতে হইবে। তবেই সংকট উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব, নতুবা নৌকা—হয় ঘূর্ণাবর্তে ডুবিয়া যাইবে, নয় গুপ্তশৈলের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাসিয়া যাইবে।

আন্তর্জাতিক সমস্যার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত জাতীয় সম্মান, সীমান্তরক্ষা ও বহির্বাণিজ্য। সুদীর্ঘকাল পরাধীনতার পর এগুলি আজ ভারতের কাছে অভিনব সমস্যা। তদপেক্ষা কঠিনতর সমস্যা—এতদিনের অধঃপতিত এই জাতিকে সমগ্রভাবে যথার্থ উন্নতির পথে আগাইয়া লইয়া যাওয়া!

আজ যখন কল্যাণমূলক উদ্যোগসমূহের জন্য ঐক্যবদ্ধ কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন, তখন দেখা যায় জনগণ নেতাদের আবেদনের ভাষা বুঝিতে পারে না। জাতীয় উন্নতির জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে বলার পূর্বে অবশ্যই তাহাদের অন্ন বস্ত্র আশ্রয়ের অভাব দূর করিতে হইবে। শুধু আর্থিক মান উন্নয়নই যথেষ্ট নয়, সমানাধিকারের প্রতিশ্রুতিই সব নয়; ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও অভিরুচি যদি অবজ্ঞাত হয়, অসংখ্য মানুষের সুখ-সুবিধা যদি অবহেলিত হয়, তবে জাতীয় জীবন ভাঙিয়া পড়িবে।

মহাজাতির শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য অবয়ব জাতিগুলির প্রত্যেকটির পরিপুষ্টি প্রয়োজন। জাতীয় শক্তি-সংহতির জন্য শৃঙ্খলা একান্ত প্রয়োজন হইলেও শৃঙ্খলার নামে যান্ত্রিক জীবন মানুষের স্বচ্ছন্দ সচেতনতাই নষ্ট করিয়া দেয়, ইহা কখনও কোন মানুষের কাম্য হইতে পারে না। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার যেমন বর্জনীয়, শৃঙ্খলার নামে যান্ত্রিকতাও তেমনই পরিত্যাজ্য। এত কথা আসিয়া পড়িতেছে কারণ আজ মানুষের সম্মুখে দুইটি বিকল্প : গণতন্ত্র অথবা একনায়কত্ব! পৃথিবীর সকল নরম ও গরম লড়াই বিশ্লেষণ করিলে এই দুই বিপরীত ভাবাদর্শেই পর্যবসিত হয়। সমাধানের উপায়স্বরূপ অদূর ভবিষ্যতে তৃতীয় বিকল্প কিছু উপস্থিত হইবে কি না—মহাকালের মৌন মুখেই তাহার উত্তর অনুসন্ধান করিতে হইবে।

* * *

ইতিহাসের বিচারে আমরা—ভারতবাসীরা যে কোন্ যুগে বাস করিতেছি, তাহা বলা বড় শক্ত! অর্থনীতির দিক দিয়া অবশ্যই আমরা বিংশ শতাব্দীতে বাস করিতেছি, শিল্পোন্নতির হিসাবে এখনও আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে। মনোভাবের বৈচিত্র্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন শতাব্দীতে বাস করিতেছে। কোথাও এখনও রামচন্দ্রের রাজত্ব চলিতেছে, কোথাও বা বিভীষণের। কেহ বা অশোক-শিবাজীর, কেহ বা আকবর-আরংজীবের স্বপ্ন দেখিতেছেন।

এই সমস্ত সংঘাত-সংঘর্ষের শেষে কবে ও কিভাবে আমরা যে জাতি হিসাবে ঠিক ঠিক বর্তমানের স্রোতে আসিয়া পড়িব—তাহাই আজ আমাদের প্রথম প্রশ্ন। কবে আমরা এক

মন লইয়া ভাবিতে শিখিব—এক প্রাণ হইয়া কাজ করিতে শিখিব, ইহাই আজিকার চরমপ্রশ্ন। এই একপ্রাণতার অভাবেই আমরা স্বাধীন হইয়াও পরমুখাপেক্ষী, এক দেশের অধিবাসী হইয়াও মনে প্রাণে বিচ্ছিন্ন। ধর্ম আমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছে, ভাষা আমাদিগকে বিভক্ত করিতেছে, ভূগোল আমাদের পৃথক্ করিয়াছে, ইতিহাসও আমাদের এক হইতে দিতেছে না। উপায় কি? তবে কি বিদেশী পণ্ডিতেরা যাহা বলেন তাহাই সত্য?—আমাদের কোনদিন একতা ছিল না? ভারতে শাসনতান্ত্রিক একীকরণ ব্রিটিশের প্রয়োজনে তাহাদেরই কীর্তি!

এ কথার খুঁটিনাটি বিচারে আমরা যাইব না, ভারতের ঐক্যের স্বপক্ষেও সচরাচর যাহা বলা হয় তাহা না বলিয়াও শুধু এইটুকু বলিতে পারি, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব দর্শন ভারতীয় কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য; বহুর মধ্যে—বিপরীতের মধ্যে মিলন-সাধনই ভারতীয় সাধনার লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই, জাতীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াই আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে সকল সমস্যার সমাধানে।

ধর্ম বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় সে হিসাবে একটি মাত্র ধর্মসাধনা ভারতে কোন দিন ছিল না, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মহাভারতের প্রসিদ্ধ উক্তি: 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।' মত ও পথ, চিন্তাধারা ও বিশ্বাস ভিন্ন হইলেও কতকগুলি প্রাথমিক আচার-আচরণ এবং শেষ লক্ষ্য সকলেরই এক ছিল।

ভাষার দিক দিয়াও সহস্র আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষার বিস্তীর্ণ অঙ্গন প্রসারিত ছিল, যেখানে সকল ভাষা স্বচ্ছন্দে পরিপুষ্ট হইয়াছে।

স্বভাবেরই নিয়মে জাতীয় জীবনে যে রজনী আসিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে সুপ্তির ঘোরে আমরা আমাদের ঐতিহ্যের অনেক কিছুই বিস্মৃত হইয়াছি। যেটুকু বা অবশিষ্ট আছে, আজ তাহাও আমরা আমাদের বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি, কারণ তাহা সত্য হইলেও আধুনিক নহে। কি করিয়া তাহা স্বীকার করি! উত্তরে বলিতে হয়—মাতা যখন বৃদ্ধা হন, তখন কি কেহ তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া কোন আধুনিকাকে তাঁহার স্থানে বসাইবার জন্য ব্যগ্র হন? অবশ্য মাতাকে আধুনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া সন্তানের কর্তব্য, সাম্প্রতিক বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করাও সন্তানের সাধ। সে হিসাবে অবশ্যই আমরা আমাদের প্রাচীন কৃষ্টির এই দেশকে নবীন যুগের ভাবে সম্পদে ভূষিত করিব, কিন্তু কখনই তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া নহে।

এই অস্বীকার করিবার প্রবৃত্তিই আজ আমাদের জাতীয় শরীর ব্যবচ্ছিন্ন করিতেছে। এ প্রবৃত্তি প্রধানতঃ তাহাদেরই, যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আধুনিকতার মোহে অন্ধ তাহারা বোঝে না, তাহাদের এ শিক্ষা বিদেশী ছাঁচে ঢালা; জাতির মৌলিক প্রয়োজনে—ঐক্য সংস্থাপনে ইহা কার্যকরী হইতেছে না। দেখা যায়, উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় যুবক একজন অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত ভারতীয়ের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিতে পারে না। উভয়ের মধ্যে যেন সমুদ্রের ব্যবধান, একে অপরের নিকট অপরিচিত; ভাবে ভাষায় ভূষায় শিক্ষিত ভারতবাসী অর্ধবিদেশী! এ ক্ষেত্রে কি করিয়া তাহারা অশিক্ষিত দরিদ্র ভারতবাসীকে নিজেদের স্বজাতীয় মনে করিবে? যথার্থ জাতীয় শিক্ষা সহায়ে এই পার্থক্য বোধ দূরীভূত করিতে না পারিলে এই বিরাট জাতির সর্বাঙ্গে শক্তি সঞ্চালিত হইবে না।

জাতীয় জীবনকে সঠিক ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে দুচার জন উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়র, অথবা পাঁচদশ জন সুসমৃদ্ধ ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিকে সম্মুখে রাখিয়া গর্ব ও গৌরব বোধ করিলে চলিবে না; প্রত্যেকটি মানুষের জীবন সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে।

জাতির প্রতিটি অঙ্গ একটি মহান্ উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হইলে তবেই বলা যায়—জাতীয় জীবন সার্থকতার পথে চলিয়াছে। যখনই দেখা যায়—কোন জাতি তাহার নিজস্ব আদর্শটিকে ধরিতে পারিয়াছে, তখনই সেই জাতি সর্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া বিকশিত হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসেও দেখা যায়—মানসিক শক্তির স্ফুরণের সহিত জাতীয় গৌরবের যুগ মিলিত হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত প্রেমের বাণী দেশ দেশান্তরে বিকীরণ করিয়াই একদিন ভারত গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছিল।

আজ তাহা কোথায় দূর দিগ্বলয়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে! এখনও সেই প্রাচীন ভারতের মহিমার সামান্য স্ফুরণ দেখা যায়—অশিক্ষিত অর্ধাহারী শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে। দারিদ্র্য, মলিনতা তাহাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে, তবু তাহাদেরই মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ভারতীয় কৃষ্টির সহজ বৈশিষ্ট্য, শত দুর্গতির মধ্যেও তাহাদেরই কুটিরে জ্বলিতে দেখা যায় মানবতার দীপশিখা; তাহাদের অন্তরে অনুভব করা যায় মনুষ্যত্বের তাপটুকু।

তাহাদের বাদ দিয়া ভারতের অগ্রগতি অসম্ভব! বিদেশের অতটা মুখাপেক্ষী না হইয়া, পাশ্চাত্যের অতটা অন্ধ অনুকরণ না করিয়া, হঠাৎ আধুনিক হইবার এই প্রাণপণ প্রচেষ্টা না করিয়া যদি আমরা স্বাধীনতা-লব্ধ সুযোগ সকলকে দিতে পারি, তবেই সৃজনশীল চিন্তা ও কর্ম-ধারা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জাতীয় জীবন উর্বর করিবে। যদি অগণিত জনগণকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের পথে—শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনার মতো উন্নতির পথে অগ্রসর হই, তবেই মনে হয় একদিন দেখিব—সমগ্র জাতি এক সঙ্গে বহু উচ্চ স্তরে উঠিয়া আসিয়াছে, যেখান হইতে আর সহসা পদস্খলন হইবে না; শুধু আর্থিক মানের দিক দিয়া নয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া, আশা ও আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়া, আত্মশক্তি ও বিশ্বাসের দিক দিয়া সমগ্র জাতি উন্নত হইয়াছে—এবং এক মহান্ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া এক মন এক প্রাণ লইয়া চলিয়াছে এক মহান্ জাতি।

মনোভাবের ভিতর এই ঐক্যবাধ না আনিতে পারিলে বিভেদ, বিভাগ, বিরোধ ও ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী; আজ দলগত বিরোধিতা, কাল ভাষা-ভিত্তিক দেশ-বিভাগ, তারপর দিন জাতি-উপ-জাতির বিভেদ, সর্বশেষ আর্থনীতিক ব্যর্থতা ও মানসিক নৈরাশ্য সব কিছু ছাইয়া ফেলিবে।

মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন সফল করিতে হইলে সর্বপ্রচেষ্টায় দূর করিতে হইবে উচ্চ-নীচের, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ক্রম-বর্ধমান বিকট ব্যবধান! জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে—যাহাতে সকলে অনুভব করে, আমরা একটি দেশের অধি-বাসী—একটি কৃষ্টির উত্তরাধিকারী, একসূত্রে গাঁথা আমাদের মন প্রাণ; আমাদের উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি একই সঙ্গে হইয়াছে ও হইবে। এই একত্বের অনুভূতিই আমাদিগকে মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এই একত্ব বোধই মহাজাতির সকল অঙ্গে শক্তি সঞ্চারিত করিবে।

চলার পথে

'যাত্রী'

অগ্রহায়ণ শুক্লা-একাদশী। গোধূলি মায়ায় স্বপ্ন-বলাকা উড়াবার দিন এটা নয়। এই দিনের কথা মনে হ'লেই আজও হৃদয়-সাগরে ঢেউ ওঠে, প্রাণের অন্ধকার-ঘরে দীপ জ্বালাবার শিখা পাওয়া যায়—ঠাণ্ডা বারুদ-মনেও কর্মপ্রেরণার আগুন লাগে।

মানব-সভ্যতায় এক অভিনব বার্তা এই দিনটিতেই সূর্য হ'য়ে ফুটেছিল;—তার আলো, তার দীপ্তি, তার প্রখরতা মানব-মনের অনেক ছায়াকেই দিয়েছে সরিয়ে। এ দিনটার কথাই আজ বড় বেশী মনে পড়ছে:

উত্তর ভারতের এক বিশাল প্রান্তর ধূসর-দিগ্বলয়ের সঙ্গে আলিঙ্গনে জড়িয়ে একাকার। মাথার উপরে নীলাকাশেও দু-এক টুকরো মেঘ কি যেন সব বারতা বয়ে নিয়ে এদিকে-ওদিকে ভেসে যাচ্ছে। শীতের হিমেল স্পর্শে চারিদিকে ঘাসের সবুজতাও ধীরে ধীরে যাচ্ছে মুছে। প্রায়-বৃক্ষহীন এই প্রান্তরে তবু জেগেছে অগণিত মানবের পদধ্বনি;—কত অশ্ব, কত গজ, কত রথ-রথী, কত মহারথী আজ এই বিশাল কুরুক্ষেত্রে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে!

আশা-নিরাশার এক অভিনব তরঙ্গ-ভঙ্গ এই প্রান্তরের মৃত্যুনীল সমুদ্রের ফেনিল বেলাকে করেছে উদ্বেলিত। মনের তটরেখায় জয়-পরাজয়ের ঢেউগুলোও আজ অনবরত আছাড় খাচ্ছে। এ যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফলাফল রয়েছে নিঃশব্দ-প্রতীক্ষায় কুতূহলী হ'য়ে। কি হবে, আর কি হবে না —এমনি একটা উৎসুক ভাব সবার মনেই দোলায়মান। এমন সময়—ঐ মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে, দুই দলের উদ্‌গ্রীব নয়নের সম্মুখে বেগবান্-অশ্বচালিত একখানি কপিধ্বজ-রথ এসে থামল। সকলের দৃষ্টি হ'ল সেই দিকেই আকৃষ্ট:

ঐ, ঐ এলেন অর্জুন! আর ঐ, তাঁর রথের উদ্ধত ঘোড়াকে বল্গাকর্ষণে সংযত ক'রে ঐ, ঐ যিনি রূপচ্ছটায় চারিদিক মাধুরীতে ভরে তুলেছেন, উনিই তো শ্রীকৃষ্ণ! উনিই তো সকলকে চালান, সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করেন; আর তিনিই আজ অর্জুনের রথ চালাচ্ছেন! জগতে এ এক অবিশ্বাস্য সত্য! ভক্তের টানে ভগবানের এ এক অদ্ভুত কৃপা-মনোহর রূপ!

তেজস্বান্ অর্জুনের ঋজু বীর্যবান শরীর কি এক মহাশক্তিতে যেন ফেটে পড়ছে। তাঁর দিকে তাকালেই বোঝা যায়—এ যুদ্ধে জয়ী হবে কে? পরাজয়ের সকল গ্লানি তাই অপর পক্ষের মনে স্বপ্নবৎ ক্ষণিক কুহক তুলে আবার মিলিয়ে যায়। মোহময় আশা-আলেয়ার পেছনে ছুটে অপরপক্ষের মনে আবার যুদ্ধজয়ের মরীচিকা জাগে। যুদ্ধ আরম্ভ হবার তখন আর বেশী দেরী নেই।

সকলেই ভাবছেন, এবার অর্জুন তাঁর বিখ্যাত গাণ্ডীবে টঙ্কার তুলে যুদ্ধের উদ্বোধন করবেন। স্মৃতির পুরাতন পাতা উল্টিয়ে সকলেই দেখছেন—ঐ সেই শ্রেষ্ঠ দ্রোণশিষ্য অর্জুন, যিনি অসংখ্য রাজগণ সমক্ষে লক্ষ্যভেদ ক'রে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলেন; ঐ সেই ধনুর্ধর-শ্রেষ্ঠ

অর্জুন, যিনি স্ববিক্রমে সুভদ্রাকে হরণ ক'রে দিয়েছিলেন নিজের শক্তির পরিচয়; ঐ সেই অর্জুন' যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও দিব্য-শরজাল বিস্তার ক'রে, খাণ্ডব-বন দহনে সহায়তা ক'রে অগ্নিকে করেছিলেন পরিতৃপ্ত; ঐ সেই অর্জুন, যিনি কিরাতরূপী ভগবান মহাদেবকে যুদ্ধে প্রীত ক'রে পাশুপত মহাস্ত্র করেছিলেন সংগ্রহ; ঐ সেই অর্জুন, যিনি বরদানদৃপ্ত ও দেবতাদিগের অজেয় পুলোমপুত্র কালকেয়দিগকে করেছিলেন পরাজিত; ঐ সেই অর্জুন, যিনি ইন্দ্রলোকে গিয়ে দুর্দান্ত দানবদলকে দমন করেছিলেন; আর ঐ সেই অর্জুন, যিনি কৌরবগণকর্তৃক অপহৃত বিরাট রাজার গোধন একাই কৌরবগণকে পরাজিত ক'রে তা সব আবার বিরাটরাজাকেই দিয়েছিলেন ফিরিয়ে।

কিন্তু এ কি! ধনুর্বাণ ছেড়ে অর্জুন অমন ক'রে রথের ওপরে বসে পড়লেন কেন? মহাবীরের আজ কেন এই ক্লীবতা! বিষণ্ণস্বরে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান ক'রে জানালেন—তিনি যুদ্ধ করবেন না, করবেন না স্বজন হত্যা, ছুড়বেন না একটিও বাণ লোকহত্যার উদ্দেশ্যে! সেই অর্জুনের আজ এ কি পরিবর্তন!

বাহ্যিক বিচারে মনের এই অহিংসভাবের উন্মেষে আমরা আনন্দিত হই—সত্যই একটি সুন্দর পরিণতি হয়েছে ভেবে তার প্রশংসায় হই পঞ্চমুখ। সত্যদ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই আপাতমনোহর আন্তর বিকার দেখে হলেন শঙ্কিত। নিঃশঙ্ক অর্জুনের এই ক্লীবভাব দেখে তিনি তাঁর ভুল ভাঙবার জন্য তাঁর সুমুখে ভাস্বর জ্ঞানের যে উৎসমুখ খুলে দিলেন, তাতে মহাকালও যেন থমকে দাঁড়াল। শুধু সেদিনের সেই কুরুক্ষেত্রে নয়, আজিকার পৃথিবীতেও ঐ অগ্নিমন্ত্র দেহের রক্তে বহ্নি জ্বালায়।

অর্জুনের জন্য সেদিন শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান-গৃহের সবকটি দরজাই একে একে দিলেন খুলে। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, বিভূতিযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি অনেক অপরূপ গুহ্য কথাই তিনি একে একে অর্জুনকে শোনালেন—নিজের বিশ্বরূপও দেখালেন তাঁকে। প্রায় চারদণ্ড পরিমিত সময়ের এই অপরূপ কথা শুনে অর্জুনের মোহ গেল ঘুচে, তাঁর ভুলও গেল ভেঙে। মহতের ভুল ভাঙার অবদানস্বরূপ ভগবদ্গীতার হ'ল সৃষ্টি। আজও সেই গীতার বাণী শুনলে মনে হয় অন্তরে কে যেন গাইছে—'নিশার স্বপন ছুটল রে এই ছুটল রে, টুটল বাঁধন টুটল রে।'

চল পথিক, আমরাও আমাদের জীবনে গীতোক্ত কর্মপ্রেরণার হোমানলে নিজেদের আহুতি দিই—জীবনের কুরুক্ষেত্রে বিবেক-গাণ্ডীব ধরে যুদ্ধ করি—জয়ী হই। শ্রীকৃষ্ণ-সারথি তাহলে এসে আমাদেরও জীবনরথের বল্গা ধরে দেখা দেবেন। তাই বলি ক্লীবতা ছেড়ে জেগে ওঠ, এগিয়ে চল। শুনছ না কি সেই উদাত্ত আহ্বান—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ, নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।' চল, চল, আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

বর্তমান জগতে বেদান্তের দাবি

স্বামী বিবেকানন্দ

এ যুগের মানুষকে বেদান্তের চিন্তাধারা বিচার ক'রে দেখতেই হবে। মানবজাতির এক বৃহদংশ এরই দ্বারা প্রভাবিত। বারংবার কোটি কোটি মানুষ ভারতের বেদান্ত-ধর্মাবলম্বী-দের ওপর হানা দিয়েছে, প্রচণ্ড শক্তিতে তাকে চূর্ণ করতে চেয়েছে, তবু এই ধর্ম বেঁচে আছে।

সারা পৃথিবীতে এ রকম আর একটি চিন্তা-পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যাবে কি? অন্যান্য ধর্ম ও দর্শন উঠেছে—এরই ছায়াতলে আশ্রয় নেবার জন্যে। ব্যাঙের ছাতার মতো তারা জন্মেছে, একদিন তারা সব ছেয়ে ফেলেছে, পরদিন তারা শূন্যে মিলিয়ে গেছে! যোগ্যতমই কিন্তু আজও জীবন্ত!

এই দর্শনের চিন্তাপদ্ধতি পূর্ণ পরিণতি লাভ করেনি এখনও। সহস্র বছর ধরে এটি গড়ে উঠছে, এখনও এ গড়তে থাকবে।...ভারতে যখন এই 'দর্শন' উদ্ভূত হয়েছিল, তার আগেই কিন্তু ভারত 'ধর্ম'কে একটি পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছে। অনেক দিন ধরেই এর দানা-বাঁধা চলছিল। আচার-অনুষ্ঠান, জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় নীতি-পদ্ধতিও একটি সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ রূপ নিয়েছিল। কালক্রমে বহু ধর্মেই দেখা দেয় মৃতের উপাসনা, অনেক হাস্যোদ্দীপক অনুকরণের ভাব, তাই তার বিরুদ্ধে জেগে উঠল বিদ্রোহ। দেখা দিলেন মহামানবের দল, বেদের ভাষায় তাঁরা প্রচার করলেন প্রকৃত ধর্ম।

এঁরা আসবার আগে লোকপ্রিয় ধারণা ছিল: বিশ্বের শাসনকর্তা একজন ঈশ্বর আছেন, আর মানুষ অমর!......এইখানেই চিন্তাধারা থেমে গিয়েছিল, মানুষ ভাবত—এর পর আর কিছু জানা যায় না। এমন সময় দেখা দিলেন বেদান্তের সাহসী ব্যাখ্যাতা-রা! তাঁরা জানতেন—যে ধর্ম শিশুদের উপযোগী, তার দ্বারা চিন্তাশীল মানুষের কোন উপকার হবে না।

নৈতিক নিরীশ্বরবাদী বাইরের মৃত জগৎ-টাকেই জানেন। তার থেকেই তিনি বিশ্বের নিয়ম-পদ্ধতি রচনা করেন। তিনি হয়তো আমার নাকটুকু কেটে নিয়ে তার থেকেই আমার শরীর সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'রে বসবেন!

তাঁকে ভেতরের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আকাশে সঞ্চরমান গ্রহ-নক্ষত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে একটি বিন্দুমাত্র! নিরীশ্বরবাদী সেই ভূমা ব্রহ্মকে দেখে না, ব্রহ্মাণ্ড দেখেই ভয় পায়।

অধ্যাত্ম জগৎ সকলের চেয়ে বড়!...... সাধারণতঃ যাকে আমরা জগৎ বলি সেটা কি? —চারিদিকে দুঃখ! শিশু জন্মাচ্ছে কান্না নিয়ে, ক্রন্দনই তার প্রথম ভাষা! শিশু বড় হয়, দুঃখের আঘাতে আঘাতে সে এমন অভ্যস্ত হ'য়ে যায় যে দেখা যায় হৃদয়ের ব্যথা সে মুখের হাসি দিয়ে ঢেকে রাখে!

এই জগতের সমস্যার সমাধান কোথায়? যারা বাইরে খুঁজছে—তারা কখনও এর সমাধান পাবে না। ভেতরে দেখতে হবে, সেইখানে সত্যকে পাবে! ধর্ম যে রয়েছে অন্তরের অন্তরে।

'মাথাটা কেটে ফেল, তাহলেই মুক্তি পাবে', এ রকম ভাব যে প্রচার করে, তার কি কোন কালে শিষ্য জোটে? যিশু বললেন, 'গরীবদের

সব দিয়ে আমার অনুসরণ কর!' ক'জন তা করেছ? তোমরা তাঁর কথা শোননি, অথচ তিনিই তোমাদের ধর্মগুরু! তোমরা হচ্ছ ইহজীবনে করিতকর্মা, তোমরা জানো—তাঁর এ উপদেশ জীবনে পরিণত করা যায় না।

বেদান্ত কিন্তু এমন কিছু বলে না, যা জীবনে পরিণত করা যায় না। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব বিষয়বস্তু আছে, যা নিয়ে তার কাজ; সর্বত্রই প্রয়োজন খানিকটা প্রাথমিক জ্ঞান ও অনুশীলন; শুধু ধর্মের বেলাতেই যে কোন লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে পারে!

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা কর, ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই করতে হবে। ঘটনার সম্মুখীন হও, প্রত্যক্ষ অনুভূতির ওপর গড়ে তোল অত্যাশ্চর্য সৌধ! প্রকৃত ধর্মের ক্ষেত্রেও চাই উপযুক্ত যন্ত্রপাতি। বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে কিছু হবে না, যে কোন জিনিসই বিশ্বাস করা যেতে পারে।

বিজ্ঞানে আমরা জানি গতি বাড়লে বস্তুমান কমে যায়, বস্তুমান বাড়লে গতি কমে যায়। অতএব আছে—জড় বস্তু আর গতি। জানি না কেমন ক'রে বস্তু শক্তিতে লয় পায়, আর শক্তি বস্তুতে নিহিত হয়, অতএব এমন একটা কিছু আছে যা শক্তিও নয়, বস্তুও নয়;…একেই আমরা বলি মন—বিশ্বমানস!

তোমার শরীর ও আমার শরীর পৃথক্, কিন্তু আমি মানবজাতির সমুদ্রে একটি ঘূর্ণি মাত্র; একটি ঘূর্ণি—তবে বিরাট সমুদ্রের অংশ!

প্রবাহে প্রতিটি জলকণা পরিবর্তিত হ'য়ে যাচ্ছে, তবু তাকে বলছ—একটি নদী। নদীর জল চঞ্চল বটে, কিন্তু তার তটরেখা স্থির—অপরিবর্তিত! মন বদলাচ্ছে না, শরীরই বদলাচ্ছে—দ্রুত বদলাচ্ছে। শিশু ছিলাম, বালক হলাম, যুবক হলাম, শীঘ্রই প্রৌঢ় হব, তারপর বুড়ো হ'য়ে বেঁকে যাব! শরীর বদলাচ্ছে, মন বদলাচ্ছে না? ছেলেবেলা এক রকম চিন্তা করতাম, বড় হয়েছি—বৃহৎ হয়েছি, তার কারণ মন এখন ভাব ও ধারণার একটি সমুদ্র।

প্রকৃতির পশ্চাতে আছে বিরাট বিশ্বমন! আত্মাই একটি সহজ সরল 'একক', আত্মা জড় বস্তু নয়! মানুষ আত্মাই! 'মানুষ মরে কোথায় যায়?' এ প্রশ্নের উত্তর হবে বালকের সেই প্রশ্নের উত্তরের মতো, 'পৃথিবী পড়ে যায় না কেন?' প্রশ্ন দুটি এক রকম, সমাধানও একই প্রকার—আত্মা যাবে কোথায়?

তোমরা অমৃতত্বের কথা বল; আমি বলি: আজ বাড়ী ফিরে গিয়ে কল্পনা করতে চেষ্টা করো, তুমি মরে গেছ, তোমার মৃত শরীরটার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে একবার স্পর্শ কর তো! পারবে না, কারণ তুমি তোমার বাইরে যেতে পার না। তোমাদের প্রশ্নটা অমৃতত্বের নয়, তোমাদের আসল প্রশ্ন হ'ল: মৃত্যুর পর প্রিয় তার প্রিয়াকে দেখতে পাবে কিনা!

ধর্মের একটি বড় রহস্য হচ্ছে: তুমি নিজে অনুভব কর—তুমি আত্মা! 'আমি কীট, আমি কিছু না'—এই ব'লে চীৎকার ক'রে কেঁদ না। উপনিষদের কবি বলেছেন, 'আমি সৎ চিৎ, সত্যংজ্ঞানমনন্তম্।'

'আমি এ জগতের জঞ্জাল'—এ কথা ব'লে কেউ কখনও ভাল কাজ করতে পারে না। নিজে যত পরিপূর্ণ (সিদ্ধ) হবে ততই তুমি কম অপূর্ণতা (দোষ-ত্রুটি) দেখতে পাবে।*

*'The Oakland Enquirer' পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯০০ খৃঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ওকলাণ্ডে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার বিবরণী হইতে অনূদিত ও সংকলিত। Ref : Complete Works Vol VIII—Swami Vivekananda.

বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

(১)

শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে আমরা দেখেছি, বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনে ধর্মের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সমাজ-দর্শনকে আধ্যাত্মিক-বৈজ্ঞানিক সমাজ-দর্শন নামে অভিহিত করলে সর্বাপেক্ষা সঙ্গত হয়। তাঁর যে বাণী আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদীদের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ব'লে মনে হবে তা হ'ল: The work of Advaita Philosophy is to break down all privileges. —অদ্বৈত বেদান্তের উদ্দেশ্য হ'ল সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটানো। সমাজ-জীবনে ধর্মের এই ভূমিকা মার্ক্সীয় চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত।

হেগেলের দর্শন-ব্যাখ্যায় যুক্তির যে গলদ আছে, তার দরুনই মার্ক্স তাকে খণ্ডন ক'রে বস্তু-বাদী ইতিহাস-ব্যাখ্যায় দাঁড় করাতে পেরেছেন। হেগেলের মতে সত্য অর্থাৎ Absolute Idea ইতিহাসের বিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হচ্ছে। কিন্তু যে বস্তুর বিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণতা সংঘটিত হয়—তা কখনই পূর্ণ-স্বরূপ হ'তে পারে না, তা স্বরূপতঃ অপূর্ণ, কারণ অপূর্ণ বস্তু কখনও পূর্ণত্ব অর্জন করতে পারে না। যুক্তির এই গলদের জন্য হেগেলের তত্ত্ব বিশ্বাসযোগ্য হ'য়ে ওঠেনি এবং ধর্ম সম্বন্ধে হেগেলের চিন্তাধারাও সর্বত্র সমর্থনযোগ্য নয়। এই সকল কারণে আদর্শবাদী বা idealistic ইতিহাস-ব্যাখ্যা ত্যাজ্য হয়েছে। মার্ক্স তাঁর সমাজ-দর্শনে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে ধর্মের উৎপত্তি শোষণের যন্ত্ররূপে, মানুষের মনে ভীতির আসনে তার গোপন প্রতিষ্ঠা। মার্ক্স-এর এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, কিছু সত্য এর মধ্যে অবশ্যই আছে। মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রধান ত্রুটি এই যে এ হ'ল আংশিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এর মধ্যে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে সব দেশেই ধর্মকে শোষণের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে—বিভিন্ন সময়ে। বিবেকানন্দও অনু-রূপ মত প্রকাশ করেছেন তাঁর 'বর্তমান ভারত' পুস্তিকায়। অন্যত্রও এ সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত আমরা পেয়েছি:

Priestcraft is in its nature cruel and heartless. That is why religion goes down where priestcraft arises.

কিন্তু পুরোহিত-তন্ত্রের আবির্ভাবে ধর্মকে যখন শোষণের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়, তখন প্রকৃত ধর্মের অবলুপ্তি ঘটে—এই তাঁর সিদ্ধান্ত। অতএব প্রকৃত ধর্মের সঙ্গে পুরোহিত-তন্ত্রের বা শোষণের কোনও সম্পর্ক নেই। মার্ক্স-এর দৃষ্টি এই প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান পর্যন্ত প্রসারিত হয়নি। তাই ধর্মকে তিনি কেবলমাত্র শোষণের যন্ত্ররূপেই ধরে নিয়েছেন এবং ঘৃণার সঙ্গে তাকে 'opium of the people' ব'লে অভিহিত করেছেন। তাঁর শ্রেণীবিহীন সাম্য-সমাজে ধর্ম থাকবে না, কারণ সে সমাজ হবে শোষণবিহীন সমাজ; শোষণবিহীন সমাজে শোষণের যন্ত্রের প্রয়োজন থাকে না, সেইজন্য ধর্মেরও প্রয়োজন থাকবে না। অথচ বিবেকানন্দের সাম্য-সমাজের ভিত্তিমূলই হবে ধর্ম।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বিবেকানন্দের মতে প্রকৃত ধর্ম শোষণ-অবসানের উপায়, মার্ক্স-এর মতে ধর্ম শোষণের উপায়। এই দুটি মতের

কোন্‌টি যুক্তি-সিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য তাই এখন আমাদের বিবেচ্য। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'লে দেখা যায় যে বিবেকানন্দ নিজ আধ্যাত্মিক অনুভূতির দরুন ও অদ্বৈত বেদান্ত-তত্ত্বের উপর দাঁড়ানোর জন্য মানুষের ধর্ম-চেতনার স্বরূপ ও তার ধর্ম-জিজ্ঞাসার উৎপত্তি সম্বন্ধে মৌলিক অথচ সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ এবং সেজন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন।[১]

ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকৃতি-উপাসনা ও মৃতের উপাসনা—এই দুই তত্ত্বের বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষের ধর্ম-চেতনার উৎপত্তি ভয় হ'তে নয়, তার উৎপত্তি বরঞ্চ মানুষের এক স্বাভাবিক বৃত্তি—দুর্নিবার প্রকৃতি-জয়ের বাসনা হ'তে। মানুষ প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা মেনে নেয়নি, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক বিপর্যয় মেনে নিয়ে হার স্বীকার করেনি। প্রকৃতির সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতেই সে একদিন সত্যের সম্মুখীন হয়েছে, ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম ক'রে অপরোক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে। তারই প্রথম বিকাশ আমরা দেখি বৈদিক প্রকৃতি-উপাসকদের মধ্যে, দেখি প্রাচীন মিশরীয় মমী-রক্ষকদের মধ্যে। প্রকৃতির বিচিত্র শোভা, দিবারাত্রির অনিবার্য সন্নিধান, জন্ম-মৃত্যুর অমোঘ বিধান—এ সকল দেখে বিস্ময়াহত আদিম মানুষ প্রশ্ন তুলেছিল: এ সকল কেমন ক'রে আছে, কেমন ক'রে এ সৃষ্টি সম্ভব হ'ল? প্রথম বিস্ময়ের দ্যোতনা দেবতায় মূর্ত হ'য়ে উঠল—তার মুগ্ধতা রূপ নিল ঋক্-ছন্দে—বরুণ-ইন্দ্র-চন্দ্র-অগ্নি-বায়ু-যম-সাবিত্রী-রুদ্র-বিষ্ণুরূপে। ক্রমে তার বুদ্ধি-প্রগতি চেতনার সুপ্তি থেকে তার আত্মার জাগরণ ঘটাল—সে দেখল প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের অন্তরালে আছেন তার পরমদেবতা, জীবন ও বল যথায় বিচ্ছুরিত, অমরত্ব ও মৃত্যু যাঁর ছায়া, সৃষ্টির পথ যাঁর নয়নসম্পাতে বিকশিত।

বস্তুতঃ এর থেকে এই সিদ্ধান্তই গঠন করা যায় যে মানুষের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রবণতাই ধর্ম; ধর্মের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, দেব-দেবীর উপাসনা—এ গুলিই ধর্ম নয়, যদিও এগুলি ধর্মাচরণের অঙ্গ। ধর্মের অবনতি যখন ঘটে, তখন এই আঙ্গিকগুলি প্রধান হয়, ধর্মচেতনা বিলুপ্ত হয়। কতগুলি রীতিনীতি ও অর্থহীন বিধিনিষেধের কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ সমাজ-জীবনে তীব্র ভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ভারতের ইতি-হাসে এর প্রমাণ আছে। জাতিভেদের প্রাচীর অনড় হ'য়ে উঠেছে তখনই, যখন ধর্মের গ্লানি বেড়েছে এবং এ তো দেখা গিয়েছে যে যখনই ধর্মের গ্লানি-অবসানের জন্য ধর্মনেতা আবির্ভূত হয়েছেন, তখনই জাতিভেদের নিগড় শিথিল হয়েছে। শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে জাতিভেদের প্রাকার আকাশচুম্বী হয়েছিল, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেও তাই; এবং দেখা যায় যে শ্রীবুদ্ধ জাতিভেদের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছেন, আঘাত করেছেন শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্য ধর্মনেতাগণ। ইতিহাসের এই সাক্ষ্য থেকেও আমরা দেখি যে ধর্মের প্রাদুর্ভাবেই বিশেষ সুবিধার অবসান, শোষণের অবসান, প্রকৃত ধর্মের অভাবের উপরেই বিশেষ সুবিধার প্রতিষ্ঠা, সেইজন্যই দেখি যে ভারতে ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে সমাজ-বিপ্লব—ভেদ-বৈষম্যের নিগড় ভেঙে ফেলবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। শ্রীবুদ্ধকে স্ত্রী-শূদ্রের মুক্তিদাতা-রূপে এইজন্যে স্তুতি করা হয়েছে নানাস্থানে। ধর্মের এই ভূমিকা মার্ক্স-পন্থীদের দৃষ্টিপথে পড়েনি; এবং সেজন্য ইতিহাস-ব্যাখ্যায় তাঁদের অনেক সময়ই তথ্যকে বিকৃত ক'রে নিতে হয়, না হ'লে সমাজ-বিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে মার্ক্স-এর

১ 'Necessity of Religion'—Jnana Yoga, Swami Vivekananda.

নির্ধারিত তত্ত্বের সঙ্গে প্রকৃত তথ্য মেলে না। সেইজন্য আধুনিক মার্ক্সপন্থী ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় পাই: যাজ্ঞবল্ক্য জনক-রাজসভায় গার্গীকে হত্যা করবার ভয় দেখিয়ে তাকে জড়-বাদ প্রতিষ্ঠা করতে বিরত করেছিলেন; হর্ষবর্ধন পরম অত্যাচারী, অতিশয় ভোগবিলাসী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও শোষক সম্রাট্ ছিলেন; উপনিষদের যুগের রাজন্যবর্গ বহু ফন্দী এঁটে জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে শোষণ করবার উদ্দেশ্যে অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ ও অতীন্দ্রিয় সত্য-তত্ত্ব রচনা করে-ছিলেন।[২] ধর্ম-চেতনার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে যে অভিমত আমরা বিবেকানন্দের বিশ্লেষণে পাই তাতে ইতিহাসকে বিকৃত ক'রে দেখবার প্রয়োজন হয় না। ইতিহাসকে অবিকৃত রেখেই সমাজ-বিকাশের ধারা ব্যাখ্যা করা চলে।

বাস্তবিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই আমরা সমাজ-জীবনে ধর্মের যথার্থ ভূমিকার পরিচয় পাই ধর্ম সভ্যতার প্রসারের সহায়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে বলছেন: 'অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের বার্তা ও সহায়তার জন্য সর্বমানব-প্রাণ সদাই ব্যাকুল। সাধারণের সেথায় প্রবেশ অসম্ভব, জড়ব্যূহ ভেদ করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমী, সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষেরাই সে রাজ্যে গতিবিধি রাখেন, সংবাদ আনেন ও প্রদর্শন করেন। ইঁহারাই পুরোহিত, মানব-সমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক।... পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার-বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত তাহার প্রথম বিকাশ।'

বস্তুতঃ আদিম কৌম সমাজের ক্রম-পরিণতির অন্তরালে বুদ্ধি ও চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-চিন্তার বিকাশ এবং তারই সঙ্গে উন্নত সমাজের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। অতি গুরুত্ব-পূর্ণ সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশের এই লক্ষণীয় দিকটি আধুনিক বস্তুবাদী সমাজ-শাস্ত্রবিদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। তাঁরা উৎপাদনের যন্ত্রের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে জীবিকা-নির্বাহের উপায়ের অনিবার্য কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখেছি যে অতি আধুনিক সমাজ-শাস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে অনেকে এই বিশ্লেষণের ত্রুটি দেখিয়েছেন।[৩] তাঁদের মতে সমাজজীবনের বিকাশের অনেকগুলি মৌল উপা-দান আছে যথা—উৎপাদনের ও জীবিকা-নির্বাহের উপায়, ধর্মকর্ম, ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা ইত্যাদি। মার্ক্সবাদীদের এই ভ্রান্তির দরুন তাঁরা সমাজ-জীবনে ধর্মের ভূমিকা সম্বন্ধে নানারকম ভুল ধারণা পেয়েছেন। যেমন ব্যাবহারিক জীবনে তাঁরা বললেন যে অর্থের (money) একাধিপত্য হ'তে দার্শনিকদের চিন্তার ক্ষেত্রে অদ্বৈত-তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে তা নয়; অদ্বৈত-তত্ত্বের আবির্ভাব বুদ্ধি-প্রগতির দরুন ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফলেই ঘটেছে।

এইজন্য আমরা দেখছি যে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে আর্থিক শক্তিকে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়েও বিবেকানন্দ সভ্যতার বিকাশে সক্রিয় শক্তিরূপে ধর্মকেই প্রধান স্থান দিয়েছেন। ধর্মের বিকাশ ঘটলেই বহু মানবের মধ্যে সকল সুপ্ত শক্তির জাগরণ ঘটবে এবং সেজন্যই ব্যাবহারিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও ঘটবে জাগরণ। সোরো-কিনও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন:

২ From Volga to Ganga—Rahul Sankrityana.

৩ Sorokin, Ogburn, Mannheim, Max Weber প্রভৃতি সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌দের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

Despite its negative position regarding economic well-being and wealth, Ideationalism (আধ্যাত্মিক প্রভাবসম্পন্ন ভাবধারা) generates forces which often work toward an improvement of the economic situation. For example, such in fact was the history of accumulation of wealth and growth of economic functions in many a centre of Ideational Christian, Buddhist, Taoist, Hindu religion.[৪]

ভারতে বৌদ্ধযুগেই আমরা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই। বৌদ্ধযুগ ব্যাবহারিক জগতে—আর্থিক, রাজনৈতিক, শিল্পকলা, সাহিত্য, স্থাপত্য, বিজ্ঞান-চর্চা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতির যুগ। সমাজে অধঃপতিত ও পদদলিত মানব-সাধারণের মধ্যে যে সৃজনী-শক্তি সুপ্ত ছিল তাই জাগরিত হয়েছিল শ্রীবুদ্ধের প্রভাবে; দেব-ভাবের বিকাশে সামান্য মানুষও তার সকল সম্ভাবনা উন্মোচিত ক'রে পূর্ণ বিকশিত হ'তে পেরেছিল। এ সকলই সম্ভব হয়েছিল ধর্মের শক্তির দ্বারা। এইজন্যই বিবেকানন্দ বলেছেন, 'Civilisation means manifestation of spirituality in man'—বলেছেন, 'প্রত্যেক জাতির প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিহিত থাকে, আধ্যাত্মিকতা বিলীন হইয়া বস্তুবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে এই প্রাণশক্তি শুকাইতে থাকে'[৫]; এবং তখনই ধর্ম পরিণত হয় শোষণের যন্ত্ররূপে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ দেখাচ্ছেন যে 'উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক্ প্রযুক্ত ছিল, অবনতির পূর্বকালে তাহাই আবার ভোগ্য-সংগ্রহে বা আধিপত্য-বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত।'[৬] অর্থাৎ জড়বাদের প্রাদুর্ভাব যখন ঘটে—তখন ভোগের উপকরণ-সংগ্রহার্থে নামসর্বস্ব, আকার-সর্বস্ব ধর্মকেও ব্যবহার করা হয় এবং তখনই ধর্ম শোষণের যন্ত্র। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মার্ক্সবাদীর তথ্যসংগ্রহ অসম্পূর্ণ, বিশ্লেষণও সম্পূর্ণ নয়, তত্ত্বও সঙ্কীর্ণতা-দোষযুক্ত। ফলে ধর্মসাধনার দেশ ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্ক্সবাদী অত্যন্ত বিভ্রান্তির পরিচয় দেন। যেমন তাঁরা বলেন যে 'যজ্ঞ এককালে দেবতাদের কাছে অন্ন-লাভের উপায় মাত্র ছিল বলেই বৈদিক মানুষদের জীবনে যজ্ঞের স্থান অমন অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরকালে, এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হ'য়ে যজ্ঞ পরিণত হ'ল নিছক ধর্মানুষ্ঠানে'।[৭] এ সিদ্ধান্ত কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহলে বিশ্বাস করতে হয় যে যজ্ঞানুষ্ঠানই ছিল (খাদ্য) উৎপাদনের উপায়, তারই দ্বারা বাস্তবে উৎপাদন সম্ভব হ'ত, যখন উৎ-পাদনের উপায়ের পরিবর্তন ঘটল তখনই তা নিছক ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হ'ল। এ অসম্ভব কথা বিশ্বাস করা যায় কি ক'রে? যজ্ঞানুষ্ঠান ক'রে দেবতাদের সন্তোষ উৎপাদন ক'রে অলৌকিক ভাবে অন্ন-সংগ্রহ কি কোন সময়েই সম্ভব ছিল? তাছাড়া যজ্ঞ যাঁরা অনুষ্ঠান করেছেন, তাঁদের মনোভাব বিশ্লেষণ করেই কি আমরা এ যুক্তির সমর্থন পাই? যথা যজ্ঞকর্তাগণ বলছেন—'যিনি চিত্তের নির্মলতা সম্পাদন করেন, যিনি বলের বিধান করেন, সকল প্রাণী—এমনকি দেবগণও যাঁর শাসন অনুসরণ করেন, অমৃতত্ব ও মৃত্যু যাঁর ছায়াস্বরূপ, সেই প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশ্যে আমরা হবিঃ প্রদান করি' (ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১২১ সূক্ত)। এর মধ্যে নিষ্কাম মনোভাবের পরিচয়ই তো আমরা পাই, অন্ততঃপক্ষে মনে হয় না উৎপাদনের উপায় ব'লে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও মার্ক্সবাদীর যুক্তিঃ

৪ Sorokin—Social and Cultural Dynamics—p. 520

৫ জ্ঞানযোগ

৬ বর্তমান ভারত

৭ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—লোকায়ত দর্শন।

'ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান হ'ল সেই সব আচার-বিচারেরই আধার, যেগুলি এক-কালে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করবার জোরেই জীবনোপায়ের সহায়ক ছিল বলেই মানুষের চেতনায় এবং মানব-সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পেরেছিল।'[৮] শুধু তাই নয়, মার্ক্সবাদীর আরও অভিমত যে 'সমাজের নীতিবোধও নিরালম্ব নয়, অর্থনৈতিক জীবনের উপর, ধনোৎপাদন-পদ্ধতির উপর তা নির্ভরশীল।'[৯] এই সিদ্ধান্তের পিছনে তথ্য-প্রমাণের জোর দৃঢ় নয়, যথা পূর্বোক্ত ঋক্-মন্ত্রটি এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না, অনুরূপ আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মার্ক্সবাদীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব সত্য থেকে এক্ষেত্রে বিচ্যুত।

তবে জড়বাদের প্রাধান্যের কালে কখনও কখনও ধর্মানুষ্ঠান নীতিবোধ অর্থনৈতিক কারণ দ্বারা নির্ধারিত হ'তে পারে। বৈদিক যুগেও তার দৃষ্টান্ত মেলে নানারূপ যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়ানুষ্ঠান সহকারে যেখানে সম্পদ্লাভ, ভোগোপকরণ-সংগ্রহের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। পুরোহিত-তন্ত্রের শেষ পরিণাম এইরূপ ব'লে বিবেকানন্দ অভিমত প্রকাশ করেছেন 'বর্তমান-ভারতে' (পৃঃ ১৯-২১)। এ সম্পর্কে সমাজশাস্ত্রবিৎ সোরোকিনের গবেষণা প্রভূত আলোক সম্পাত করছে। অতএব এখানে সোরোকিনের তত্ত্বের বিশদ আলোচনা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক বে না ব'লে মনে হয়।[১০]

সোরোকিনের মতে সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ তিনটি স্তরের মাধ্যমে ছন্দাকারে (Rhythm) প্রবাহিত : এই স্তরগুলি—Ideational, Idealistic ও Sensate। প্রথমটি হ'ল আধ্যাত্মিকতা-প্রাধান্যের যুগ, তৃতীয়টি জড়বাদের প্রাধান্যের যুগ, দ্বিতীয়টি এ উভয়ের সংমিশ্রণ। প্রথমোক্ত যুগে ধর্মে-কর্মে, ধ্যান-ধারণায়, আচার-আচরণে, শিল্পকলায়, সাহিত্য-ইতিহাস-রচনায়—সর্বত্র অধ্যাত্ম-প্রবণতার ছাপ পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়টিতে কিছু তার মালিন্য ঘটবে ও ইন্দ্রিয়ানুগতার ছাপ পরিস্ফুট হবে, আর তৃতীয়টিতে পুরোপুরি ইন্দ্রিয়ানুগ মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন উপরোক্ত গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে সোরোকিন দেখিয়েছেন যে প্রথমোক্ত যুগের চিত্রকলার ক্ষেত্রে অঙ্কনের বিষয়বস্তু দেখা যায়—

'God, The virgin, The Soul, The Spirit, The Holy Ghost and other religious and mystical topics'.

তৃতীয় বা Sensate যুগের চিত্রকলায়—

'The topic is empirical and visual......In content they represent character-painting'.

আর মধ্যবর্তী যুগের চিত্রকলা সম্বন্ধে সোরোকিন দেখাচ্ছেন—

Though the subject-matter is super-empirical, the form in which it is rendered attempts to embody some visual resemblance to what is considered to be its empirical aspect e.g. pictures of Paradise, Inferno, The Last Judgment.

সোরোকিন এমনি ক'রে সাহিত্য, দর্শন, নীতিবোধ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তব দৃষ্টান্ত সহায়ে এই যুগ-বিভাগ প্রমাণিত করেছেন এবং তারপর দেখিয়েছেন যে চক্রাকারে Ideational, Idealistic এবং Sensate—এই তিন যুগ আবর্তিত হয়, এবং সমাজ-সংস্কৃতির গতিপথ এই চক্রপথ। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের প্রাদুর্ভাব ক্রমান্বয়ে ঘটে থাকে। মার্ক্সীয় ইতিহাস-ব্যাখ্যা বর্তমান Sensate যুগেরই অভিব্যক্তি মাত্র। এ সম্পর্কে সোরোকিনের নিম্নলিখিত উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

৮, ৯ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—লোকায়ত দর্শন।

১০ Sorokin—Social and Cultural Dynamics.

Just as the mentality of the truth of faith spiritualises everything, even the inorganic material phenomena and their motions or happenings, so the mentality of the truth of senses, which by definition perceives and can perceive only the material phenomena materialises everything, even the spiritual phenomena like the human soul. Empiricism, materialism, mechanisticism and determinism are positively associated and go together, while the truth of faith, idealism, indeterminism, and non-mechanism go together.

অর্থাৎ কোন একযুগের ধ্যান-ধারণা, জীবন-যাত্রা, দর্শন-চিন্তা সবই সে যুগ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিরূপিত; বর্তমান Sensate যুগে জড়বাদের প্রাধান্য-হেতু এ সকল অর্থনৈতিক ব্যাপারের দ্বারা নিরূপিত।

বিবেকানন্দও বলেছিলেন (এবং সোরোকিনের বহু পূর্বেই বলেছিলেন) যে 'Materialism and spiritualism prevail in turn in society' (অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদ পর্যায়ক্রমে সমাজে আধিপত্য করে) কারণ মানুষের মধ্যে স্বরাস্থরের সংগ্রাম চলছে। 'বর্তমান ভারতে' বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন যে ধর্ম সূক্ষ্ম মানসিক শক্তির ব্যাপার যার থেকে অলৌকিক ও গূঢ় প্রক্রিয়া ও কার্যের উদ্ভব। এবং এই সকল অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ দ্বারা ক্রমে মানুষ প্রলোভনের কবলে পড়ে এবং তখনই তার প্রচেষ্টা হয় এর দ্বারা ভোগ্যবস্তুর উপর অধিকার-অর্জন। ক্রমে বিদ্যা-চর্চার বিলোপ হয় এবং তখনই ধর্মের সম্পূর্ণ অবনতি ঘটে। এবং তারপর বিদ্যাহীন, পুরুষকারহীন, পূর্বপুরুষদের নামমাত্রধারী পুরোহিত-কুল পৈতৃক অধিকার, পৈতৃক সম্মান, পৈতৃক আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য 'যেন তেন প্রকারেণ' চেষ্টা করেন, অন্যান্য জাতির সহিত কাজেই বিষম সজ্ঘর্ষ। এ সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনা ক'রে সোরোকিন বলছেন :

The sensate society is turned toward this world and in this world particularly toward the improvement of its economic condition as the main determinant of sensate happiness. To this purpose it devotes its chief thought, attention, energy and efforts....In an over-developed sensate mentality, everybody begins to fight for a maximum share of happiness and prosperity. This leads often to conflicts between sects, classes, states, provinces, unions, etc., and often results in revolts, wars, class-struggles, over-taxation, which ruin security and in the long run make economic prosperity impossible.

অর্থাৎ এই Sensate যুগে বিষম শ্রেণী-সজ্ঘর্ষ অনিবার্য। শুধু তাই নয় এই প্রকার সজ্ঘর্ষের ফলে অতি দ্রুত আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত আর্থিক উন্নতিও সুদূরপরাহত হয়, এবং পরিশেষে মানুষের দুর্গতির সীমা থাকে না। সেইজন্য সোরোকিনের অভিমতে Sensate যুগের অবসান এই পথে আসে। পরবর্তী কালের উপযোগী পরিবর্তনে ধীরে ধীরে দেখা দেয়—এবং ইন্দ্রিয়-সুখভোগে বিরক্তি উৎপন্ন হয়, মানুষের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়, আসে Ideational যুগ। সোরোকিনের এইরূপ গবেষণার ফলে বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়েছে যে আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদ ক্রমান্বয়ে চক্রপথে আবির্ভূত হয়, দ্বিতীয়তঃ আধ্যাত্মিকতার বিকাশেই প্রকৃত সভ্যতার উন্নতি।

মোটের উপর আমরা দেখছি যে শোষণের যন্ত্ররূপে ধর্মের যে অবনতি তার জন্য দায়ী জড়বাদ বা বস্তুবাদ, অন্য কিছুই নয়। ধর্ম নিছক শোষণের যন্ত্র হ'লে ধর্মশাস্ত্রের নিদান হ'ত না সমাজ ও অর্থনীতিগত ব্যবস্থাতে সমানাধিকার স্থাপন। অথচ ভাগবত গ্রন্থে আমরা তাই-ই দেখতে পাচ্ছি। ভাগবতকার বলেছেন, 'সকলেই ক্ষুধার অন্ন পেতে পারে, প্রয়োজনের বেশী ছু'লে বলে ;

যে অধিকার করে সে চোর, সামাজিক ভাবে সে দণ্ডনীয়।[১১] ধর্মশাস্ত্রের এই নীতি তো কোনও ক্রমেই শোষণের উদ্দেশ্যানুগ নয়। এ সকল কথা স্মরণ না রাখলে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত ইতিহাসও হ'য়ে দাঁড়ায় মনগড়া অবাস্তব অসত্য কাহিনী। সেদিক থেকে এবম্বিধ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার হাত থেকে ইতিহাসের মুক্তি আজ একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ, ইতিহাসের একটি মহান্ উদ্দেশ্য আছে তা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত, সে উদ্দেশ্য—"অতীতের আলোতে বর্তমানের পথ দেখানো, সমাজ ও গোষ্ঠীর চলাচলের পথ ও বিপথ দেখিয়ে মানুষকে সাবধান করা। সমাজ ও সভ্যতার অভ্যুদয় ও পতনের বন্ধুর পথে মানুষের যাত্রা ও যাত্রাশেষের দিগ্‌দর্শন হচ্ছে ইতিহাস।"[১২] সেই-জন্যই তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে বা অসম্পূর্ণ সন্নিধান ক'রে কোন তত্ত্ব-প্রদর্শনের স্থান ইতিহাসে নেই, কারণ তার দ্বারা (তা যতই বৈজ্ঞানিক রীতি-সম্পন্ন হোক না কেন) ইতিহাসের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

মার্ক্সবাদীদের বিভ্রান্তির প্রধানতম কারণ যে মার্ক্স অতিমাত্রায় অষ্টাদশ শতকের শিল্প-বিপ্লব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি উক্ত ঘটনার অল্পকাল পরে জন্মেছিলেন।[১৩] তিনি সমাজ-জীবনে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সম্পূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করবার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে-ছিলেন। কিন্তু তার দ্বারা তাঁর দৃষ্টি ছিল আচ্ছন্ন হ'য়ে। ফলে ইতিহাস-ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক রীতি তিনি গঠন করতে প্রভূত সহায়তা করলেও ইতিহাসের মুক্তি ঘটেনি তাঁর হাতে। তাঁর মস্ত বড় ভ্রান্তি ঘটেছে সেইখানে, যেখানে তিনি মনে করেছেন অর্থ-ব্যবস্থাই সমাজ-জীবনের ভিত্তি। আর ধর্ম-কর্ম, শিল্প-কলা, সাহিত্য এ সকল তার সৌধচূড়া; এবং এই সৌধচূড়ার আকৃতি ও গঠন তার ভিত্তিমূল দ্বারাই নিরূপিত। মার্ক্স-এর কিছুকাল পরে জন্মেছিলেন বিবেকানন্দ, শিল্প-বিপ্লব দ্বারা তিনিও ছিলেন যথেষ্টই প্রভাবান্বিত। বিবেকানন্দের এ সম্বন্ধে অতিশয় সচেতনতার প্রমাণ পাই তাঁর এই অভিমতের মধ্যে যে অনুরূপ শিল্প-বিপ্লব ব্যতীত ভারতের মুক্তি নেই। কিন্তু ধর্ম-সাধনার লীলাভূমি ভারতবর্ষে জন্মে, ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার প্রতিভূ হ'য়ে দাঁড়িয়ে সমাজ-জীবনে ধর্মের ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি কোনও ভ্রান্তমতের বশীভূত হননি, এ সম্বন্ধে তাঁর বিচারশীল মন কোন ভুল করেনি। কাজেই মার্ক্স-এর অল্পকাল পরে জন্মালেও এ সম্বন্ধে তাঁর ছিল যথার্থ জ্ঞান।

১১ ভাগবত—৭।২৪।৮

১২ অতুলচন্দ্র গুপ্ত—ইতিহাসের মুক্তি

১৩ Mannheim—Systematic Society: Chapter on 'Social Change.'

চির-পথচারী

শ্রীমতী বসুধারা গুপ্ত

অজ্ঞাতের আমন্ত্রণে আমি
বারংবার করি পরিক্রমা
এই পৃথিবীরে।
পুনর্বার শ্লথ গতি,
মিশে যাই নিস্তরঙ্গ নৈঃশব্দের নিগূঢ় তিমিরে।

আবার জাগিয়া উঠি সৃজন-মায়ায়
ঘন ঘোর কুজ্ঝটিকা ভেদি
সুপ্তি-লোক হ'তে,
হাসিকান্না-বিধ্বনিত বৈচিত্র্যের নব মায়ালোকে।

পার হ'য়ে যাই কত নদী গিরি বন,
সাহারার রিক্ত বক্ষ করি অতিক্রম
উদ্বেলিত প্রতীক্ষার ভারে
কার লাগি? চিনি না তাঁহারে।
কখনো বা শ্বাপদসঙ্কুল
গভীর অরণ্য-বুকে করেছি ভ্রমণ
অবহেলে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে
কুশাঙ্কুরে বিক্ষত শরীর,
তবু নহি স্থির—
চঞ্চল অস্থির মন কার অন্বেষণে?

যুগে যুগে বৈচিত্র্যের ঘাটে ঘাটে করি উত্তরণ
ঈপ্সিত বস্তুর লাগি
বিনিদ্র রজনী জাগি,
মেলে না সন্ধান,
অফুরান হ'য়ে চলে এ পথ-চারণ।
চিত্তে মোর নিদারুণ বিস্ময় যে জাগে
কোন লীলা-বিলাসীর কৌতুক-লীলায়
ঘূর্ণি সম ঘোরে পৃথ্বি, ঘুরি আমি,
ঘোরে গ্রহতারা দুরন্ত আবেগে।

কে সেই অদৃশ্য চক্রী?
যাঁর চক্র ঘোরে অবিরাম
কক্ষে কক্ষে তালে তালে
কালের মন্দির পানে
আবর্তিছে এ বিশ্বেরে অনিবার্য টানে॥

কেবা সেই মহাশিল্পী, কি তাঁর স্বরূপ?
অন্তহীন রূপধারী, তাই কি অরূপ?
নাই নাই নাই সেই অমিতের সীমা;
তাঁরই লাগি রাত্রিদিন মানব-যাত্রীর
এই পরিক্রমা?

মৃত্যুর তিমির-দ্বার করি অতিক্রম
জ্যোতির্ময় লোকে আত্মা চাহে জাগরণ;
পরিত্যজি বর্ণময়ী ধরিত্রীর ক্ষণিক নির্মোক
সর্বহারা হ'য়ে করে পথ পর্যটন॥

হে অবেদ্য, তোমারি যে মহা আকর্ষণে
বিভ্রান্ত এ বিশ্ববাসী চলিয়াছে ছুটি
খণ্ড হ'তে অখণ্ডের সাগর-সঙ্গমে।
তাই আজো মৃত্যুময়ী ধরিত্রীর বুকে
অমৃতের অদম্য অভীপ্সা
জেগে রয় অন্তরের অন্তরালে
সীমাহীন তৃষা।

ওগো স্রষ্টা, কোথা তুমি?
অন্বেষিয়া তোমারে যে জন্ম জন্ম ধরি
বিবাগী এ আত্মা মোর চির-পথচারী॥

মহাশক্তিরূপে ঈশ্বরের উপাসনা

স্বামী সুন্দরানন্দ

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের সর্বত্র বিশেষতঃ শরৎকালে পরমেশ্বর মহাশক্তিরূপে বিভিন্ন প্রকারে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। শাক্তদর্শন-মতে সর্বব্যাপিনী শক্তিই পরমেশ্বরী—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মহাশক্তি। জননী হইতে সকল জীব সাক্ষাৎভাবে জাত হয়; সুতরাং পিতা অপেক্ষা মাতাই সৃষ্টির অধিকতর নিকটবর্তিনী। এজন্য শাক্ত দার্শনিকগণ—যাঁহা হইতে সর্ব জীব উদ্ভূত হইয়াছে, সেই মূলকারণ-সনাতনী আদ্যাশক্তিকে জগন্মাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মহানির্বাণ তন্ত্র 'বহুত্বে একত্বে'র উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলিয়াছেন: একই চন্দ্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলরাশিতে প্রতিবিম্বিত হয়, সেরূপ জগজ্জননীই সমস্ত দেব-দেবীতে প্রতিবিম্বিত; তিনিই তাহাদের শক্তির উৎস। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, স্থিতিকর্তা বিষ্ণু এবং প্রলয়কর্তা মহাকাল রুদ্র ও তাঁহাদের শক্তি তাঁহার মধ্যেই বিদ্যমান। কালী, তারা প্রমুখ দশমহাবিদ্যা, দুর্গা, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা ও অন্যান্য দেবী তাঁহারই বিভিন্ন শক্তি ও রূপ এবং তাঁহারা সকলেই এক ও অভিন্ন।

দার্শনিক বিচারে জগজ্জননী বা মহামায়া ব্রহ্মের ক্রিয়াশীলা শক্তি। নিষ্ক্রিয়া তুরীয়া জগজ্জননী, আগমশাস্ত্রে বর্ণিত নিষ্কল শিবের শক্তি এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য নির্গুণ ব্রহ্মের শক্তি অভিন্ন। নির্গুণ ব্রহ্ম ও নিষ্কল শিব এক—নির্বিকার চৈতন্যশক্তি; কিন্তু কর্তৃত্ব বা ক্রিয়া-শক্তি-রহিত। সেইরূপ সগুণ ব্রহ্ম ও স-কল শিব অভিন্ন; উভয়ই সর্বভূতে অনুস্যূত ও ক্রিয়াশক্তিমান্। নির্গুণ ব্রহ্ম ও নিষ্কল শিবে শক্তি অব্যক্ত, আর সগুণ ব্রহ্ম ও স-কল শিবে শক্তি ব্যক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা একই সত্তার দুইটি দিক। এইরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। জড় দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন এই মহাশক্তিরই অভিব্যক্তি।

পুরাণ-মতে শিব পুরুষ এবং শক্তি স্ত্রী। কিন্তু দার্শনিক বিচারে তাঁহারা একই ভগবৎ-সত্তার দুইটি দিক মাত্র—পুরুষ বা স্ত্রী কোনটিই নন। ব্রহ্মের ন্যায় সর্বভূতে অনুস্যূত সত্তাই শক্তি। কুলচূড়ামণি-নিগমশাস্ত্রে ভৈরবী (শক্তি) ভৈরবকে (শিব) বলিতেছেন, "তুমি সকলের গুরু। আমি শক্তিরূপে তোমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছি, তজ্জন্যই তুমি প্রভু হইয়াছ। আমি ছাড়া আর কেহই সৃজনকারিণী জননী বা 'কার্যবিভাবিনী' নাই। অতএব, সৃষ্টি-ব্যাপারে মাতৃত্ব আমারই, তুমি 'কার্যবিভাবক' পিতা; অর্থাৎ, নিত্যানন্দ হইতে যে অমৃত নিস্যন্দিত হয়, তাহা ধারণ করিবার পাত্র—শক্তি। শিব-শক্তির মিলনেই সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। যেহেতু পৃথিবীর সকলই শিবশক্ত্যাত্মক, অতএব হে মহেশ্বর, তুমি সকলের মধ্যে আছ, আমিও সকলের মধ্যে আছি।" এইরূপে জীব-জগৎ সেই মহাশক্তি হইতেই প্রসূত হইয়াছে।

মহাসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বীয় জীবনে তন্ত্রশাস্ত্রের জটিল দার্শনিক তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিয়া অতি সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার ভাবার্থ: অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তির ন্যায় ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই।...একই শক্তির বিকাশ বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন, কারণ বহুত্বই

সৃষ্টির নিয়ম, একত্ব নহে। ঈশ্বর সর্বভূতে অনুস্যূত—পিপীলিকাতেও তিনি আছেন। পার্থক্য কেবল বিকাশের তারতম্যে। · তন্ত্রের জগদম্বা বেদান্তের ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহ নহেন। তিনি নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মেরই সবিশেষ সাকার রূপ। জগজ্জননী এক ও বহু, আবার তিনি এক এবং বহুর অতীত।···যে সত্যসত্যই ভগবানের একটি রূপ বা একটি দিক দেখিতে পাইয়াছে, সে তাঁহার অন্যান্য রূপ বা দিকও অনায়াসে দেখিতে পারে।····· যিনি সগুণ সাকার, তিনিই নির্গুণ নিরাকার। যিনি শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণজ্ঞান-লাভের পর সকল ভেদ তিরোহিত হয়।

এই আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রসমূহ জগতের বিভিন্ন শক্তি-প্রকাশের মূলে একই মহাশক্তির অধিষ্ঠান বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও বলেন---সমস্ত বস্তুর মূলে রহিয়াছে একই মহাশক্তি ; জড়েরও মূলে চৈতন্য অনুভূত হইতেছে। মানুষ ও জড় বস্তুর এবং জন্তু ও বৃক্ষলতা প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য—এই শক্তি-প্রকাশের তারতম্যে পর্যবসিত হইয়াছে। একই পরমা শক্তি আত্মারূপে সকলের মধ্যে বিদ্যমান। দেখা যাইতেছে—প্রাচীন দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞান এই চরম সিদ্ধান্তের অভিমুখে চলিয়াছে।

ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অতীত

ডাঃ শ্রীপীযূষকান্তি লালা

ভূমিকা

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস মানবজাতির ইতিহাসে অতি পুরানো, ভারতীয় সভ্যতার গোড়ার দিকে গেলে যে আর্যসভ্যতার মহিমা আমাদের মুগ্ধ করে, তারও আগে যে ভারতীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সুপরিণত ছিল--দাক্ষিণাত্য আজও তার সুপ্রচুর সাক্ষ্য বহন করছে। সেটা ছেড়ে দিয়েও আর্যসভ্যতা থেকেই যদি শুরু করি, তাহলেও সে যুগকে অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির সমসাময়িক পরিণতির সঙ্গে তুলনা করলে অবাক্ হ'তে হয়। পাশ্চাত্য মানবগোষ্ঠী যখন জাতিহিসেবে প্রতিষ্ঠিতই হয়নি, পূর্বের দিগ্বলয় তখন ভারতীয় মনীষীদের জ্ঞানসাধনার জ্যোতিতে হ'য়ে উঠেছে ভাস্বর। এ আর্য সভ্যতার সঠিক কালনির্ণয় এখনও সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য সব ক্ষেত্রেই ভারতীয় সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছিল এবং সুপ্রাচীন কাল হতেই বিজ্ঞানের যে সব শাখা আবিষ্কৃত ও অবদান-পরিপুষ্ট হয়েছিল, চিকিৎসা-বিজ্ঞান তাদের মধ্যে শুধু অন্যতম নয়, একটি প্রধান শাখা।

বর্তমানে প্রধানতঃ যে কয়টি চিকিৎসা-পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত তারা হ'ল: আয়ুর্বেদনির্দিষ্ট পদ্ধতি (কবিরাজী চিকিৎসা নামে যা প্রসিদ্ধ), য়ুনানী চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি (স্বনামধন্য হ্যানিমান যার আবিষ্কর্তা) এবং আধুনিকতম বিজ্ঞানপরিপুষ্ট পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালী (লোকমুখে যা এলোপ্যাথি নামে সু-পরিচিত)। ভারতীয় নিজস্ব চিকিৎসা-বিজ্ঞান বলতে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাই বুঝায়, যদিও পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও আজ ভারতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

এ আয়ুর্বেদসম্মত চিকিৎসা যদিও মূলতঃ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালীর সঙ্গে তার বিজ্ঞানগত বিরোধ নেই, তবুও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার বর্তমান রূপ নৈরাশ্যব্যঞ্জক এবং কল্পনা করতেও কষ্ট হয় যে এ আয়ুর্বেদই এককালে উৎকর্ষের চরমতা লাভ করেছিল। এর মূল কোথায়? এবং বর্তমান ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধনের উপায়ই বা কি?—এ সব প্রশ্নের উত্তর জানতে হ'লে আগে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের স্বরূপ এবং ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস মোটামুটি জানা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক পটভূমি ও ক্রমবিবর্তন

হিন্দু বা আর্যসভ্যতায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিকাশ এক আশ্চর্য ব্যাপার। বিজ্ঞানের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখা হিসেবে চিকিৎসা-বিজ্ঞান কবে রূপ নিয়েছিল, তা এখনও সঠিক নির্ণীত হয়নি। মোটামুটিভাবে পাঁচটি অধ্যায়ে এর ক্রমবিবর্তনকে ভাগ করা যায়—

প্রথম অধ্যায় : বৈদিক যুগ,
দ্বিতীয় অধ্যায় : ক্রমোন্নতির বা সংহিতার যুগ,
তৃতীয় অধ্যায় : সংস্করণের যুগ,
চতুর্থ অধ্যায় : সঙ্কলনের যুগ,
পঞ্চম অধ্যায় : ক্রমাবনতির যুগ।

(১) বৈদিক যুগ

চরকসংহিতায় বৈদিক যুগকে আয়ুর্বেদের উষাকাল ব'লে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুশ্রুত-সংহিতার সূত্রস্থানে আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের 'উপাঙ্গ' ব'লে বিশেষিত করা হয়েছে। আবার কোথাও একে 'পঞ্চম বেদ' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)। বৈদিক যুগের কাল-নির্ণয় প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোন মনীষীই সঠিক-ভাবে করতে পারেননি। তবে বেদকে পৃথিবীর সর্বপুরাতন গ্রন্থ ব'লে স্বীকার করতে কারও আপত্তি নেই। এ যুগেও আয়ুর্বেদে আটটি প্রধান বিষয় আলোচিত হয়েছে; যথা—

(১) শল্যতন্ত্র: এতে মুখ্য শল্যবিদ্যা বা Major Surgery আলোচিত। 'যে কোন বস্তু শরীরে পীড়াকর হয় তাকেই শল্য বলা যায়। সেই শল্যের উদ্ধরণ, যন্ত্রাদি প্রয়োগ এবং ব্রণ-বিনিশ্চয়করণই শল্যতন্ত্রের উদ্দেশ্য।' —সুশ্রুত

(২) শালাক্যতন্ত্র: এতে গৌণশল্যবিদ্যা (Minor Surgery) আলোচ্য বিষয়। 'শালাক্য অর্থাৎ শলাকাপ্রয়োগরূপ কর্ম যে তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাকেই শালাক্যতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে।'—সুশ্রুত

(৩) কায়চিকিৎসা (Internal Medicine)—'সর্বাঙ্গপ্রসৃত ব্যাধির চিকিৎসাজ্ঞানই কায়চিকিৎসা।'—সুশ্রুত

(৪) ভূতবিদ্যা—গ্রহপ্রকোপের অপনোদনের জন্যে এ বিদ্যার আশ্রয় নিতে হয়।

(৫) কৌমার-ভৃত্য—কুমার (newly born baby)-এর ভরণপোষণ, ধাত্রীর স্তন্য-পুষ্টির সংশোধন, দুষ্টস্তন্যপানজাত ও দুষ্টগ্রহজাত শিশুরোগের চিকিৎসা এতে বর্ণিত।

(৬) অগদতন্ত্র—বিভিন্ন বিষোদ্গীরণশীল জীবের দংশন ও অন্যান্য কারণে বিষক্রিয়া; তাদের লক্ষণ এবং উপশমের উপায় এতে লিপিবদ্ধ।

(৭) রসায়নতন্ত্র (Alchemy)—আয়ু, মেধা ও বলবৃদ্ধি এবং রোগপ্রতিরোধের সামর্থ্য অর্জনের উপায় এ তন্ত্রে আলোচিত।

(৮) বাজীকরণতন্ত্র—এতে পুরুষের যৌন-স্বাস্থ্য বর্ধনের উপায় বর্ণিত।

(২) সংহিতার যুগ

এ যুগ আয়ুর্বেদের নূতন রচনায় ও বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। এ যুগের দুই সুবৃহৎ ও প্রখ্যাত রচনা

হ'ল—অগ্নিবেশকৃত 'অগ্নিবেশ-সংহিতা' (যার বর্তমান রূপ হ'ল চরক-সংহিতা) এবং সুশ্রুত-রচিত 'সুশ্রুত-সংহিতা'।

অগ্নিবেশ-সংহিতা : এর ইতিহাস আলোচনায় অনেক মনীষীর নাম এসে পড়ে। বৃহস্পতিতনয় ভরদ্বাজ ও অগ্নিতনয় আত্রেয়—এঁরা দুজন প্রখ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। দুজনের মধ্যে আত্রেয়ই তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান শিষ্যদের মধ্যে বিতরণ ক'রে গেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা গুরুপ্রদত্ত জ্ঞান কিছু না কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন—তাঁরা হলেন অগ্নিবেশ, ভেল, পরাশর, হারীত ও ক্ষরপাণি। তাঁদের মধ্যে অগ্নিবেশকৃত 'অগ্নিবেশ-সংহিতা'ই ভেষজ-চিকিৎসার প্রধান পথিকৃৎ। তার পরেই হ'ল 'ভেল-সংহিতা' (তাঞ্জোর সরকার লাইব্রেরীতে এর খানিকটা বর্তমান এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি সংস্কৃত হরফে এটা প্রকাশ করেছেন)। আজও যদিও মূল অগ্নিবেশ-সংহিতার পূর্ণরূপ অজানা রয়ে গেছে, চরক-কৃত সংস্করণে 'চরক-সংহিতা'-রূপে তার অনেকটাই জানতে পারি আমরা। অগ্নিবেশের আবির্ভাব—সঠিক জানা না গেলেও খৃষ্টজন্মের হাজার বছর আগে ব'লে অনুমিত হয়। আর চরকের আবির্ভাব খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। এ বিরাট ব্যবধানকালে অগ্নিবেশসংহিতার অনেক বিকৃতি ও অবলুপ্তি ঘটে। তাই চরক নূতন ক'রে একে উজ্জীবিত করেন তাঁর সংস্করণে ('অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রে চরক-প্রতিসংস্কৃতে'—চরক)। চরক তাঁর জীবদ্দশায় অগ্নিবেশ-সংহিতার দুই তৃতীয়াংশ সংস্করণে সমর্থ হয়েছিলেন। অগ্নিবেশ-সংহিতার পরবর্তী কতকগুলি (ভাগবত, বৃন্দ, চক্রপাণি, দলন, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকান্ত প্রভৃতি কৃত) সংকলনে এমন সব উদ্ধৃতি বর্তমান যা চরক-সংহিতায় নেই। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, চরক-সংহিতা অগ্নিবেশ-সংহিতার অপূর্ণ সংস্করণ। দৃঢ়বল (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী) অগ্নিবেশ-সংহিতার শেষাংশ ও চরক-সংহিতার পূর্ণ সংস্করণ করেছিলেন।

কোন কোন পাশ্চাত্য লিপিকার অগ্নিবেশ-সংহিতার যুগকে অনেক পরবর্তী কালের ব'লে অনুমান করেছেন। ক্যাষ্টেলেনী ও গ্যারিসন্ (Castelleni and Garrison)-এর মতে আত্রেয় খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে তক্ষশিলায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান-প্রচারে রত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভ্রান্ত, কারণ বৌদ্ধসাহিত্য থেকে উদ্ধৃত তাঁদের এ আত্রেয় ছিলেন ভিক্ষু—তিনি ছিলেন বুদ্ধ ও বৌদ্ধ নৃপতি বিম্বিসারের চিকিৎসক জীবকের গুরু এবং অগ্নিবেশের শিক্ষক আত্রেয় থেকে ভিন্ন লোক। যদিও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে তক্ষশিলার প্রসিদ্ধি ছিল সুদূর-বিস্তৃত ও আত্রেয় ছিলেন তদানীন্তন প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী, তথাপি চরক-সংহিতায় তক্ষশিলার উল্লেখ নেই একটিবারও; অথচ অগ্নিবেশ ও আত্রেয়ের উল্লেখ রয়েছে প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতে—'ঋষি আত্রেয় এরূপ শিক্ষাদান করেছেন এবং শিষ্য অগ্নিবেশ আপন ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন······'।

সুশ্রুত-সংহিতা—এর রচনাকাল এখনও সঠিক জানা যায়নি, তবে শ্রদ্ধেয় হেস্‌লার সাহেব (Hessler) সুশ্রুত-সংহিতার ল্যাটিন অনুবাদে অনুমান করেন যে খৃষ্টের আবির্ভাবের হাজার বছরেরও আগে এ গ্রন্থ সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। বিশ্বামিত্র-তনয় সুশ্রুত হলেন এ প্রখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা। সুশ্রুত, ভোজ, ভালুক, করবীর্য, বৈতরণ, ঔপধেনব, পৌষ্কলাবত ও গোপুর রক্ষিত এঁরা ধন্বন্তরির কাছে শল্যতন্ত্র শিক্ষা করেন ব'লে কথিত। সুশ্রুতই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেন তাঁর সংহিতায়, বর্তমান সুশ্রুত-সংহিতায় মূল গ্রন্থের অনেকাংশই নেই। কালে অনেক বিকৃতি ও অবলুপ্তি ঘটে সুশ্রুত-সংহিতারও,

এবং নূতন ক'রে এর সংস্করণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগার্জুন (খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক) এ কাজ নিপুণ হাতে সমাধা করেন নাগার্জুন-সংহিতায়, মূল গ্রন্থ থেকে চক্রপাণি-কৃত অনেক সংকলন বর্তমান সুশ্রুত-সংহিতায় (নাগার্জুন-কৃত সংস্করণ) নেই। তবুও বর্তমান সুশ্রুত-সংহিতা অধ্যয়ন করলে আমরা জানতে পারি—কত সুসংহত জ্ঞানের ভিত্তিতে এ পুস্তক লিপিবদ্ধ হয়েছিল। চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুশ্রুতের অবদান অবিস্মরণীয়। খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলে দেখি, এ সংহিতাকে পূর্বতন্ত্র এবং উত্তরতন্ত্র এ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। পূর্বতন্ত্র পাঁচটি স্থান বা বৃহৎ অংশে বিভক্ত, যথা:

সূত্রস্থান: ছেচল্লিশটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং এতে অসংখ্য জিনিস আলোচিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রধান এবং বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে বিভিন্ন চিকিৎসাবিধি, তাদের প্রয়োগ ও গুণ-বর্ণনা, শল্য-চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ শস্ত্রসমূহের আকার বর্ণনা ও তাদের প্রয়োগবিধি, বিভিন্ন দ্রব্য বা ওষধির গুণাগুণ বর্ণনা এবং পথ্যবিজ্ঞান (Dietetics)।

নিদানস্থান: ষোলটি অধ্যায়ে এ স্থান বিভক্ত। এতে রোগসমূহের কারণ ও লক্ষণ-সকল (Etiology, Signs and Symptoms) আলোচিত হয়েছে।

শারীরস্থান: দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এ স্থানে শরীরের উৎপত্তি ও ভ্রূণবিদ্যা (Embryology), শরীরের পুঙ্খানুপুঙ্খ গঠনসংস্থা (Anatomy), শারীরবৃত্ত (Physiology) ও তার অস্বাভাবিক অবস্থায় রোগের উৎপত্তি (Pathology) আলোচিত হয়েছে এবং প্রসূতি-বিজ্ঞান (Obstetrics)-ও এর অন্তর্ভূত হয়েছে।

চিকিৎসিতস্থান: বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা-বিধি ও ক্ষেত্রবিশেষে শস্ত্র প্রয়োগবিধি এখানে বর্ণিত। চল্লিশটি অধ্যায়ে এ 'স্থান' সম্পূর্ণ।

কল্পস্থান: বিষ ও বিষঘ্ন ঔষধসমূহের ব্যবহার (Toxicology) এ স্থানের আলোচ্য বিষয়। আটটি অধ্যায়ে এ 'স্থান' বিভক্ত।

পাঁচটি 'স্থান' মোট একশ' কুড়িটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উত্তরতন্ত্র, এতে ছেষট্টিটি অধ্যায় আছে; শালাক্যতন্ত্র, কৌমারভৃত্য, কায়চিকিৎসা ও ভূতবিদ্যা এবং তন্ত্রভূষণাধ্যায়—এ কয়টি বিষয়ে উত্তরতন্ত্র সমাপ্ত, পূর্বতন্ত্রে বর্ণিত সকল বিষয়ই উত্তরতন্ত্রে আরও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। সে যুগের শস্ত্রসমূহের নিখুঁত বর্ণনা ও বৈজ্ঞানিক ব্যবহারবিধির কথা ভাবলে আজও অবাক্ হ'তে হয়।

এ দুই সংহিতায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান মোটামুটিভাবে দুই বিশিষ্ট প্রণালীতে নির্দিষ্ট হ'ল—চরকের নির্দিষ্ট পথে ভেষজ-চিকিৎসা এবং সুশ্রুত-নির্দিষ্ট পথে শল্য-চিকিৎসা; যদিও সুশ্রুত-সংহিতায় ভেষজ-চিকিৎসাও স্থানলাভ করেছে। দুটো পথই হ'ল একে অন্যের পরিপূরক—কাজেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ হয়েছিল আরও প্রশস্ত। দুটো পথেই চিকিৎসাবিদ্‌গণ বিশেষত্ব অর্জন করতে লাগলেন। সুষ্ঠুভাবে কোন্ প্রণালীর উদ্ভব আগে হয়—এ নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। সুশ্রুত-সংহিতায় যদিও প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে শল্য-চিকিৎসাই আদি এবং শ্রেয়তর, তবুও স্বাভাবিক অনুমান হ'ল ভেষজ-চিকিৎসার প্রচলনই আগে হয়, যুদ্ধ সংঘটনের বৃদ্ধির সঙ্গে শল্য-চিকিৎসার প্রয়োজনও বৃদ্ধিলাভ করে।

এ যুগে এ দুই বৃহৎ সংহিতা ছাড়া আরও অনেক অবদানে সমৃদ্ধ হয় চিকিৎসাশাস্ত্র। যে সব মনীষীর অবদান উল্লেখযোগ্য—তাঁরা হ'লেন

বিশ্বামিত্র, খরনদ, গর্গ, চাক্ষুষ্য, সাত্যকি, শৌনক, কৃষ্ণাত্রেয়, করাল প্রভৃতি। খৃষ্টীয় দশম শতকে রচিত গ্রন্থসমূহে এঁদের লিপির উল্লেখ আছে।

এ যুগকে আয়ুর্বেদের 'স্বর্ণ যুগ' বলা যায়। বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বর্ণিত অসংখ্য রোগের লক্ষণসমূহ ও চিকিৎসা সে যুগেও জ্ঞাত ছিল। শারীরস্থান (Anatomy) সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য শব-ব্যবচ্ছেদের প্রচলন ছিল। শুধু তাই নয়, শব-সংগ্রহ ও তার ব্যবচ্ছেদ-প্রণালীও সুশ্রুত-সংহিতায় বর্ণিত হয়েছে (সুশ্রুত-সংহিতা—শারীরস্থান : ৫ম অধ্যায় —৫০)। শব-ব্যবচ্ছেদ ব্যতীত যে আয়ুর্বেদে ব্যুৎপত্তি-লাভ সম্ভব নয়, তা স্পষ্টই বলা হয়েছে : যিনি শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা শরীরের বাহ্যাভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রে তৎসমস্ত অবগত হইয়াছেন, তিনিই আয়ুর্বেদবিশারদ, প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও শাস্ত্রশ্রুত বিষয় দ্বারা সন্দেহ-নিরাকরণপূর্বক তিনি চিকিৎসা করিয়া থাকেন (সুশ্রুত-সংহিতা, শারীরস্থান, পঞ্চম অধ্যায়—৫১)। বর্তমান যুগের যে মস্তিষ্ক-শল্য-চিকিৎসা (Brain-Surgery) দুরূহ ব'লে উক্ত—কথিত আছে, সুশ্রুত নিজেই ছিলেন তাতে দক্ষহস্ত।

(৩) সংস্করণের যুগ

এ যুগের দু'জন মহামনীষী হলেন চরক এবং নাগার্জুন, দু'জনে যথাক্রমে অগ্নিবেশ-সংহিতা এবং সুশ্রুত-সংহিতার সংস্কার সাধন ক'রে চরক-সংহিতা ও নাগার্জুন-সংহিতা প্রণয়ন করেন—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের এ দু'খানা অমূল্য গ্রন্থ এ ভাবে ধ্বংস ও অবলুপ্তি থেকে রেহাই পেয়ে চিকিৎসা-জগতে নূতনভাবে উপস্থাপিত হয়।

চরকের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকলেও মোটামুটিভাবে প্রমাণিত হয় যে তিনি খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতকের মধ্যে তাঁর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ক্যাষ্টেলেনী ও গ্যারিসন তাঁকে খৃষ্টীয় ২য় শতকের লোক ব'লে বর্ণনা করেছেন। চৈনিক মতে তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতকে জীবিত ছিলেন এবং কেউ কেউ বলেন তিনি শকাব্দ-প্রচলয়িতা সম্রাট্ কণিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন।

বৌদ্ধ মনীষী নাগার্জুন সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। চরক-সংহিতা এবং নাগার্জুন-সংহিতা ছাড়া আরও সংস্করণ হয় এ যুগে। তাদের মধ্যে দৃঢ়বল-কৃত (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতক) অগ্নিবেশ-সংহিতার সংস্করণ উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া কয়েকটি মৌলিক অবদানও আয়ুর্বেদশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করে। খৃষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে রচিত হয় বৌদ্ধ মনীষী ভাগবতের 'অষ্টাঙ্গসংগ্রহ'। আর একজন ভাগবত (খৃষ্টীয় ৮ম-৯ম শতক) প্রণয়ন করেন 'অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা'। এ দু'খানা গ্রন্থই হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অমূল্য অবদান ব'লে স্বীকৃত।

ধীরে ধীরে চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা-প্রবর্তিত চিকিৎসাপ্রণালী ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং খৃষ্টীয় ৯ম-১০ম শতকে পূর্বে কাম্বোডিয়া এবং পশ্চিমে আরব দেশে এ দু'খানা গ্রন্থের প্রচলন হয়। এরও বহু পূর্বে হিপোক্রেতিস্ (Hippocrates) জটামাংসী, তিল, আদা ইত্যাদি ভারতীয় ভেষজের নামোল্লেখ করেন, এবং অনেক ভারতীয় ভেষজের নাম ডিয়োস্-কর্ডিস্ (Dioscordis)-কৃত গ্রন্থে (খৃষ্টীয় ১ম শতক) আছে। ইতিয়াস্ (Actius) চন্দন, নারিকেল ইত্যাদির উল্লেখ করেন (খৃষ্টীয় ৫ম শতক)।

(৪) সংকলনের যুগ

এ যুগের প্রথম ভাগে চিকিৎসাশাস্ত্রে নূতন ও মৌলিক অবদান খুব বেশী না থাকলেও

এ বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন চলতে থাকে। এ যুগকে বিশেষ ক'রে সংকলনের যুগ বলা যায়। এ যুগের পথিকৃৎ ছিলেন মাধব কর। তিনি বাঙালী ছিলেন। ভেষজসমূহের গুণাগুণ বর্ণনা ক'রে 'রত্নমালা' নামে অমূল্য গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এ রচনা থেকে পরবর্তী চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা অনেক উপকৃত হন। হারুন-অল্-রসীদ (খৃষ্টীয় ৮ম-৯ম শতক) মাধব করের 'নিদান' এবং চরক- ও সুশ্রুত-সংহিতার অনুবাদ করেন আর-বীতে। সুতরাং মাধব করের আবির্ভাব খৃষ্টীয় ৮ম শতকের আগেই। মনীষী উইল্‌সন্ (Wilson)-এর মতে এ অনুবাদ মূল গ্রন্থের পারসী অনুবাদ থেকে কৃত। এতে মাধব করের আবির্ভাবকাল আরও আগে ব'লে মনে হয়। বৃন্দ (৯ম শতক) মাধবনিদানের অসংখ্য উল্লেখ করেছেন। সুশ্রুতের ভাষ্যকার মাধব এবং বেদের ভাষ্যকার মাধবাচার্য দুজনে পৃথক লোক ছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য যে সব সংকলয়িতার অবদান চিকিৎসাশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: বৃন্দ (খৃঃ ৯ম শতক), বাণভট্ট (গুপ্তযুগ), চক্রপাণি (১০৬০ খৃঃ—গৌড়রাজ নয়াপালের রাজসভা অলংকৃত করেন), ভগ্নসেনা (খৃঃ ১১শ-১২শ শতক), গয়াদাস (খৃঃ ১১শ শতক), দলন (খৃঃ ১২শ শতক), অরুণ দত্ত (১২২০ খৃঃ), হিমাদ্রি ও বাচস্পতি (১২৬০ খৃঃ), শার্ঙ্গধর ও বিজয় রক্ষিত (১২৪০ খৃঃ), বোপদেব (১৩০০ খৃঃ), শ্রীকান্ত (?), শিবদাস (?), ভাবমিশ্র (১৬শ শতক) প্রভৃতি।

এ অধ্যায়ের শেষাংশেই ক্রমাবনতির সূত্রপাত হয় এবং পরবর্তী যুগে সেটা সম্পূর্ণ হয়; তবে এ যুগেই বিশেষ ক'রে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সাথে সাথে হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বহুল প্রচার হয় বাইরে। আরব ও মিশর হ'ল এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খৃষ্টীয় ৭ম শতকের প্রথম ভাগে আরবীয়গণ যষ্টিমধু, লাক্ষা, গুগ্‌গুল, দারুচিনি, ত্রিফলা, মরিচ, আদা, চন্দন ইত্যাদির ব্যবহার শেখে ও এগুলি আরবীয় ভেষজশাস্ত্রে স্থানলাভ করে। আবার আরব্য ভেষজ গন্ধবোল, সৌবলখর (সৌবর্চল ?), আকরকরা ইত্যাদি হিন্দু ভেষজের অন্তর্ভূত হয়।

হিন্দু শাসনের সময় ভেষজশাস্ত্রের সুপরিণত অবস্থা সম্বন্ধে ক্যাষ্টেলেনীর মত উদ্ধৃত করা যায়:

"ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্‌গণ শুধুমাত্র যে ভেষজচিকিৎসা বা শল্যবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তা নয়, রোগ-প্রতিরোধে এবং ধাত্রীবিদ্যায় অস্ত্রোপচারেও তাঁরা নিপুণ ছিলেন। বহুমূত্র, আমাশয়, ক্ষয়রোগ, উপদংশ, কৃমিজাত এবং আরও বহু রোগের চিকিৎসায় তাঁরা দক্ষ ছিলেন। রোগনির্ণয়ে নাড়ীপরীক্ষা, শরীরের তাপমাত্রা, চামড়ার রং, কণ্ঠস্বর, শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ, চক্ষু-পরীক্ষা, মল-পরীক্ষা—এসবকে তাঁরা মূল্যবান্ তথ্য হিসেবে গণ্য করতেন। রোগের উপসর্গ সম্বন্ধে ছিল তাঁদের প্রভূত জ্ঞান। রোগকে তাঁরা সাধ্য (নিরাময়যোগ্য) ও অসাধ্য (অনারোগ্য) এ দুভাগে ভাগ করতেন। রোগ-প্রতিরোধে বসন্তের টীকাদান-প্রথা প্রচলিত ছিল। পথ্যবিজ্ঞান ও বিষশাস্ত্রে তাঁদের অশেষ জ্ঞান ছিল।

"ভারত ও সিংহলে বৌদ্ধ রাজকুমারগণ অনেক আরোগ্যশালা বা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকেই সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুরে এ রকম একটি আরোগ্য-নিকেতনের বর্ণনা পাওয়া যায়, পরে এ রকম আরও অনেকগুলি স্থাপিত হয় রাজ্যশাসনে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের জন্যে ভিন্ন একটি বিভাগ থাকত; প্রতি দশখানা গ্রামে একজন ক'রে চিকিৎসাব্রতী এই স্বাস্থ্যবিভাগে কাজ

করতেন। এ ছাড়া পঙ্গু, অনাথ, ও গরীবদের জন্যেও আশ্রম ছিল অনেক।"

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও বিচারের প্রয়োজনে 'অস্থমৃতক পরীক্ষা' বা মৃতদেহ-পরীক্ষার (Post-mortem Examination) কথা আছে। মৌর্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের আমলে উচ্চ বিচারালয়সমূহে (কণ্টকশোধন-বিচারালয়) এ পরীক্ষার প্রয়োজন হ'ত, অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে এ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল এবং মৃতদেহ রক্ষার জন্যে আলাদা ঘর থাকত, এ সব মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য তৈলীয় উপাদান ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৫) ক্রমাবনতির যুগ

হিন্দুশাসনের শেষভাগে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গৌরব অনেক স্তিমিত হ'য়ে আসে; তৎকালে রাজনৈতিক ভিত্তির শৈথিল্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সব দিকগুলির উপরেই প্রভাব বিস্তার করে। তারপর থেকে শুরু হয় একের পর এক বহিঃশত্রুর আক্রমণ। ভারতীয় জনসাধারণের জীবন যে এতে শুধু বিপর্যস্ত হয় তা নয়, শিক্ষা ও সম্পদ সবই এতে পর্যুদস্ত হয়। হিন্দুরাজত্বে অর্থ ও খাদ্যের সচ্ছলতা ও রাজনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য গণজীবনে দিয়েছিল নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের ও সেই সঙ্গে নির্বিঘ্ন জ্ঞানসাধনার সুযোগ। তাছাড়া রাজন্যবর্গের সমাদর ও আগ্রহে পুষ্ট হতেন বিজ্ঞানীরা। মুসলমান আক্রমণের সাথে সাথে দেখা দিল বিজ্ঞানের অবনতি, একে একে সুলতান মামুদ (খৃঃ ১১শ শতকের প্রথমভাগ), মহম্মদ ঘোরী (১১৯১ খৃঃ) চেংগিস্ খান্ (খৃঃ ১৩শ শতক), আলাদিন খল্জী (১২৯৬—১৩১৬ খৃঃ), তৈমুর লঙ্গ (খৃঃ ১৪শ শতক), নাদির শাহ্ (১৭৩৯ খৃঃ) আক্রমণ ও লুণ্ঠনের তাণ্ডব সংঘটন ক'রে ভারতীয় হিন্দুদের জাতীয় জীবনকে প্রায় বিধ্বস্ত করেন। মোগল এবং পাঠান রাজত্বে যদিও শিল্পকলা ও বিদেশী সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটে, হিন্দুবিজ্ঞানের গৌরব হিন্দুশাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই স্তিমিত হ'য়ে পড়ে এবং এর পুনরুজ্জীবন আর হয়নি।

তারপর আসে বৃটিশ-শাসন। এ শাসনের প্রথমাংশে হিন্দুবিজ্ঞানের গৌরব আরও ক্ষীণ হয়ে আসে। বৃটিশ-শাসনের মধ্যমে ও শেষভাগেই কয়েকজন গুণগ্রাহী পাশ্চাত্য মনীষীর প্রচেষ্টায় এবং দেশীয় শিক্ষাবিদের প্রেরণায় সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও অনুবাদকার্য আরম্ভ হয়; এতে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের অনেক কিছুই পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে হিন্দু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনেক সম্পদই বিদেশে চলে গেছে—যা এখনও ফিরে আসেনি।

> কেবল একটি মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই শাস্ত্রনির্ণীত অর্থ সঠিক জানা যায় না,
> অতএব চিকিৎসককে অনেক দেখিয়া শুনিয়া সত্য নির্ণয় করিতে হইবে।
>
> (সূত্রস্থান—৪.৬)—**সুশ্রুতসংহিতা**

> সকল প্রাণীর সুখের জন্য চেষ্টা করিবে। প্রতিদিন দাঁড়াইয়া হউক, বসিয়া হউক—
> সমগ্র হৃদয় দিয়া সেবা করিয়া রোগাতুরকে রোগমুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে।
>
> (বিমান—৮ম অধ্যায়)—**চরকসংহিতা**

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১৮

এই সমগ্র চরাচর বিশ্ব যে প্রকৃতির অভ্যন্তরে অবস্থিত, সেই প্রকৃতি ক্লান্ত হইয়া যেখানে বিশ্রাম লাভ করে, সেই পরম গতিও আমি; প্রকৃতি যাহা দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং যাহার অধিষ্ঠানে বিশ্ব প্রসব করে, প্রকৃতির সহবাসে যে গুণ ভোগ করে, হে পাণ্ডুসুত, সেই বিশ্ব-লক্ষ্মীর ভর্তাও আমি,—আমিই সমস্ত ত্রৈলোক্যের স্বামী। (২৮০)

আকাশ সর্বব্যাপী, বায়ু ক্ষণকালও নিশ্চল থাকে না, অগ্নি দহন করে, মেঘ বর্ষণ করে, পর্বত স্থানচ্যুত হয় না, সমুদ্র নিজের সীমা উল্লঙ্ঘন করে না, পৃথিবী ভূতভার বহন করে—এ সমস্তই আমার আজ্ঞায় হইয়া থাকে; আমি বলাইলেই বেদ বলে, আমি চালাইলেই সূর্য চলে; যে প্রাণ জগৎকে চালনা করে, আমি স্পন্দন করিলেই সেই প্রাণ স্পন্দিত হয়; আমারই আজ্ঞায় কাল ভূতগণকে গ্রাস করে। হে পাণ্ডুসুত, সারা বিশ্বই যাঁহার আজ্ঞাধীন, জগতের এইরূপ সমর্থ প্রভু আমি, আর গগনের ন্যায় সাক্ষীভূত আমিই। হে পাণ্ডব, যে এই নামরূপাত্মক বিবিধ পদার্থে ভরিয়া আছে, আর যে নিজেই এই সমস্ত নামরূপের আধার—যেমন জলেই তরঙ্গ আর তরঙ্গের মধ্যেই জল থাকে, তেমনি সারা সৃষ্টির নিবাস বা আশ্রয়স্থল আমিই। যে অনন্যভাবে আমার শরণ লয়, আমি তাহার জন্মমরণ নিবারণ করি; এইজন্য শরণাগতের একমাত্র শরণ্য আমি। আমি এক হইয়াও বহু, প্রকৃতির বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট জীব-জগতের প্রাণ হইয়া অবস্থান করি; সূর্য যেমন সমুদ্র বা ডোবা বিচার না করিয়া সকল জলাশয়েই প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি আমি ব্রহ্মাদি সর্বভূতেরই হৃদয়বাসী সুহৃদ্। (২৯০)

হে পাণ্ডব, আমিই এই ত্রিভুবনের জীবন—উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের মূল; বীজ (বৃক্ষের) শাখাদি উৎপন্ন করে, পরে বৃক্ষত্ব বীজের মধ্যেই সমাহিত হয়, তেমনি (আদি) সঙ্কল্প হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি, পরে জগৎ ঐ সঙ্কল্পেই বিলীন হয়; এই ভাবে জগতের বীজ যে অব্যক্ত বাসনারূপ সঙ্কল্প—তাহা কল্পান্তে যেখানে নিক্ষিপ্ত হয়, সে স্থান আমিই; যখন নামরূপ লয়প্রাপ্ত হয়, বর্ণব্যক্তি নষ্ট হয়, জাতির ভেদ থাকে না এবং আকারেরও লোপ হয়, তখন সঙ্কল্প-বাসনার সংস্কার পুনরায় চরাচর রচনা করিবার জন্য যেখানে অমর হইয়া অবস্থান করে, সেই নিধানও আমি।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥১৯

আমি সূর্যরূপে তাপ প্রদান করি, তাহাতে জগৎ শোষিত হয়; পরে ইন্দ্র বা মেঘরূপে বর্ষণ করি, তাহাতে পৃথিবী পুনরায় (জলে) ভরিয়া যায়; অগ্নি কাষ্ঠকে গ্রাস করিলে কাষ্ঠই অগ্নি হইয়া যায়;

যাহা মরণশীল এবং এবং যাহা মৃত্যু ঘটায়—উভয়ই আমার স্বরূপ ; এইজন্য যাহারা মৃত্যুর কবলে পড়ে, তাহারা আমারই রূপ ; আর যাহারা অমর তাহারা স্বভাবতই আমার স্বরূপ ; এখন আর অধিক কি বলিব ? এক কথায় সদসৎ [ব্যক্ত ও অব্যক্ত] সমস্তই জানিবে আমি ; সুতরাং হে অর্জুন, এরূপ কোন্ স্থান আছে যেখানে আমি নাই ? পরন্তু প্রাণিগণের কেমন দুর্ভাগ্য, তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না ! (৩০০)

তরঙ্গ কি জল বিনা শুকাইয়া যায় ? দীপ বিনা কি সূর্যের রশ্মি দেখা যায় না ? তেমনি ইহারা মদ্রূপ হইয়াও আমাকে জানে না,—কি বিস্ময়কর ব্যাপার দেখ ! এই বিশ্বের অন্তর-বাহির আমিই ভরিয়া আছি, এই নিখিল জীবজগৎ আমারই ঢালাই-করা মূর্তি, অথচ উহাদের কর্ম এমন প্রতিবন্ধক যে উহারা বলে আমি নাই ; যে অমৃতের কূপে পড়িয়া সেখান হইতে আপনাকে বাহিরে আনিতে চায়, সেই দুর্ভাগার জন্য কি করা যায় ? হে কিরীটী, একগ্রাস অন্নের জন্য অন্ধ ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং চিন্তামণি পায়ের কাছে পড়িলে অন্ধত্বের জন্য সে তাহা ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয় ; জ্ঞানের অভাবে এই দশাই হয়, সুতরাং জ্ঞান বিনা কোন কর্ম করিলে তাহা সফল হয় না ; অন্ধ গরুড়ের পাখা কি তাহার কাজে লাগে ? তেমনি জ্ঞান বিনা সৎকর্মের পরিশ্রম বিফলে যায়।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০

হে কিরীটী, দেখ—যাহারা বর্ণাশ্রম-ধর্মের পথে থাকিয়া আপনারাই বিধিমার্গের কষ্টিপাথর হইয়া যায়, যাহাদের যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিয়া বেদত্রয় মাথা নাড়াইয়া সমর্থন করে এবং যাহাদের সম্মুখে যজ্ঞক্রিয়া ফলের সহিত দণ্ডায়মান, এই ভাবে দীক্ষিত হইয়া যাহারা যজ্ঞশেষ সোমরস পান করে, তথাকথিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা পুণ্যের নামে পাপই সংগ্রহ করে, তাহারা বেদত্রয় জানিয়া, শতযজ্ঞ করিয়াও যজ্ঞের ফলদাতা আমাকে ভুলিয়া স্বর্গ কামনা করে ; (৩১০)

হে কিরীটী, দুর্ভাগা লোক কল্পতরুর তলায় বসিয়া (ভিক্ষার) ঝুলিতে গাঁট দেয়, এবং ভিক্ষা করিতে বাহির হয়, তেমনি শত যজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজন করিয়া যদি কেহ স্বর্গসুখ কামনা করে, তাহার সেই যজ্ঞলব্ধ পুণ্য কি যথার্থই পাপ নহে ? আমাকে ছাড়িয়া স্বর্গপ্রাপ্তি অ-জ্ঞানীর কাছেই পুণ্যমার্গ, জ্ঞানী তাহাকে 'উপসর্গ' বা কল্যাণের হানি মনে করে ; বস্তুতঃ নারকীয় দুঃখের তুলনায় স্বর্গকে সুখ বলা হয়, নতুবা নির্দোষ নিত্যানন্দ শুধু আমারই স্বরূপ। হে অর্জুন, আমার দিকে আসিবার পথে দুটি কুটিল (বক্র) মার্গ আছে—স্বর্গ ও নরকে যাইবার এই দুইটি চোরা পথ ; জীব পুণ্যাত্মক কর্মফলে স্বর্গে যায়, পাপাত্মক কর্মফলে নরকে যায় [উভয় কর্মফলই দুঃখের কারণ বলিয়া পাপ], পরন্তু আমাকে যাহাতে পাওয়া যায় তাহাই শুদ্ধ পুণ্য ; হে পাণ্ডুসুত, যাহার জন্য মানুষ আমা হইতে দূরে চলিয়া যায় তাহাকে পুণ্য বলিলে কি জিহ্বা খসিয়া পড়িবে না ? এখন প্রসঙ্গের বিষয় শুন : এইভাবে সকাম কর্মীরা দীক্ষিত হইয়া, আমাকেই যজন

করিয়া স্বর্গভোগ প্রার্থনা করে; এবং যাহা দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই 'পাপরূপ' পুণ্য অর্জন করিয়া তাহারই সামর্থ্যে স্বর্গে যায়—যেখানে অমরত্বই সিংহাসন, ঐরাবত বাহন, ও অমরাবতী রাজধানী; (৩২০)

সেখানে মহাসিদ্ধির ভাণ্ডার অমৃতের কুঠরি, সেখানে কামধেনুর পাল আছে; সেখানে দেবগণ ভৃত্যরূপে সেবা করে, সর্বত্র চিন্তামণি বিছানো, ক্রীড়ার জন্য (চতুর্দিকে) কল্পতরুর উপবন; সেখানে গন্ধর্বগণ গান করে, রম্ভার ন্যায় অপ্সরাগণ নৃত্য করে, উর্বশী প্রমুখ বিলাসিনীগণ (বিরাজ করে); শয়নাগারে মদন সেবা করে, চন্দ্র বদনে চাঁদনি সিঞ্চন করে, বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী ভৃত্যগণ দৌড়াদৌড়ি করে; সেখানে বৃহস্পতি প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচন করে, বহু-সংখ্যক দেবগণ ভাটরূপে স্তুতিগান করে, সেখানে লোকপালগণ পদাতিক সৈন্যের ন্যায় চলে এবং প্রধান নৃপতিগণ (সহিসের ন্যায়) উচ্চৈঃশ্রবাকে হস্তে ধরিয়া অগ্রে গমন করে; অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, যে পর্যন্ত পুণ্যের লেশ মাত্র থাকে, সে পর্যন্ত তাহারা ইন্দ্রের সুখের ন্যায় বহু সুখ ভোগ করে।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
　　ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
　　গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১

পুণ্যের পুঁজি ফুরাইলে ইন্দ্রত্বের তেজ চলিয়া যায়, এবং জীবকে মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়; তাহারই জন্য কপর্দকহীন ব্যক্তিকে বেশ্যা যেমন আর তাহার দ্বারও স্পর্শ করিতে (ঠেলিতে) দেয় না, তেমনি এই কাম্য যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির লজ্জাকর অবস্থার কথা আর কি বলিব? এই ভাবে আমার শাশ্বত স্বরূপ ভুলিয়া যাহারা পুণ্য দ্বারা স্বর্গ কামনা করে, তাহাদের অমরত্ব বৃথা হয়, অন্তে তাহারা মৃত্যুলোকই প্রাপ্ত হয়। (৩৩০)

মাতার উদরগহ্বরে বিষ্ঠার বেষ্টনীর মধ্যে পচিয়া, নয় মাস পর্যন্ত সিদ্ধ হইয়া বার বার জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় ও মরিতে হয়; জাগ্রত হইলেই স্বপ্নে প্রাপ্ত ধনভাণ্ডার যেমন মিলাইয়া যায়, বেদজ্ঞের (যজ্ঞকর্তার) স্বর্গসুখও তেমনি জানিবে; হে অর্জুন, বেদবিদ্ হইলেও—আমাকে না জানিলে সবই ব্যর্থ হয়, শস্য ঝাড়ার পর যে ভূষি পড়িয়া থাকে সেইরূপ; এইজন্য যদি আমার স্বরূপের জ্ঞান না হয়, তবে বেদোক্ত ত্রয়ী ধর্মই নিষ্ফল হয়,—এখন আমাকে জানিলে আর কিছু না জানিলেও তুমি সুখী হইবে।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২

যাহারা সর্বভাবের সহিত আমাতে চিত্ত সমর্পণ করে,—যেমন গর্ভস্থ শিশু কোন (উদ্যমের) ব্যাপারের কিছুই জানে না, তেমনি যাহাদের আমা ভিন্ন অন্য কিছুই ভাল লাগে না, আমার নামেই যাহারা জীবিত থাকে—এই ভাবে যাহারা অনন্যগতি হইয়া আমাকে স্মরণ করিয়া উপাসনা করে, আমিও তাহাদের সেবা করি; একাগ্রচিত্ত হইয়া যখন তাহারা আমার ভজনের মার্গ অবলম্বন করে, তখন তাহাদের সম্বন্ধে সমস্ত চিন্তা আমার উপরই আসিয়া পড়ে; তাহাদের সমস্ত কর্ম

আমাকেই করিতে হয়—যেমন অজাতপক্ষ শাবকের জন্য পক্ষিণী মাতাকেই খাদ্য সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়; আপনার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া মাতাকেই শাবকের কল্যাণের জন্য সব কিছু করিতে হয়, তেমনি যাহারা প্রাণ দিয়া আমাকেই অনুসরণ (ভজনা) করে, তাহাদের সব কিছু আমিই করি; (৩৪০)

তাহারা যদি আমার সহিত সাযুজ্য-লাভের ইচ্ছা করে, আমি তাহাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করি—কিংবা যদি তাহারা সেবা করিতে চায়, তবে তাহাদের হৃদয়ে প্রেম দান করি; এইভাবে তাহারা মনে যে যে ভাব (ইচ্ছা) পোষণ করে, আমাকে বারংবার তাহাই পূর্ণ করিতে হয়; আর তাহাদের যাহা কিছু দেওয়া হয়, আমিই তাহা রক্ষা করি; হে পাণ্ডব, যাহারা সর্বভাবে আমারই আশ্রয় লয়, তাহাদের সমস্ত যোগ-ক্ষেম আমাকেই বহন করিতে হয়।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥২৩

আরও অনেক সাধক সম্প্রদায় আছে, যাহারা আমার সর্বব্যাপক স্বরূপ না জানিয়া অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্রকে যজন করে; বাস্তবিক তাহাদের ঐ যজ্ঞ আমার উদ্দেশ্যেই কৃত হয়, কারণ এই সমস্ত জগৎ আমিই। পরন্তু তাহাদের ঐ উপাসনা-প্রণালী বিধিসিদ্ধ নহে, উহা বিষম (ভুল) পথ; দেখ, বৃক্ষের শাখাপল্লব কি একই বীজ হইতে উৎপন্ন হয় না? পরন্তু (বৃক্ষের) মূলই জল গ্রহণ করে—আর মূলেই জল ঢালিতে হয়; একই দেহে দশটি ইন্দ্রিয় আছে, আর ইহারা যে বিষয় ভোগ করে তাহা একই স্থানে যায়; তথাপি উত্তম আহার্য রন্ধন করিয়া কি কানে ঢালিতে হয়? ফুল আনিয়া কি চক্ষুকে ঘ্রাণ লইতে বলা যায়? রসাস্বাদন মুখ দিয়াই করিতে হয়, সুগন্ধ নাসিকা দ্বারাই আঘ্রাণ করিতে হয়; তেমনি আমার স্বরূপ জানিয়া আমাকেই যজন করিতে হইবে; নতুবা আমাকে না জানিয়া অন্য যে কোন ভাবে আমার উপাসনা করা ব্যর্থ হয়,—এইজন্য কর্মের জন্য যে জ্ঞানদৃষ্টির আবশ্যক, তাহা নির্দোষ হওয়া প্রয়োজন। (৩৫০)

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪

হে পাণ্ডুসুত, দেখ—এই সমস্ত যজ্ঞোপচারের ভোক্তা আমি ভিন্ন আর কে আছে? আমিই সকল যজ্ঞের আদি ও অন্ত, পরন্তু আমাকে ভুলিয়া দুর্বুদ্ধি মনুষ্য দেবতাগণকে ভজনা করে; গঙ্গার জল যেমন (দেব ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে) গঙ্গাতেই অর্পণ করিতে হয়, তেমনি ইহারা আমারই বস্তু আমাকেই দেয়—পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে; এইজন্য হে পার্থ, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয় না। যাহার প্রতি তাহাদের মনের আস্থা (শ্রদ্ধা বিশ্বাস), তাহারা সেখানেই যায়।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫

মন বাক্য ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে দেবতার উদ্দেশ্যে ভজনা করে, শরীরত্যাগের সময় সে সেই দেবরূপই প্রাপ্ত হয়; অথবা যাহার মন পিতৃব্রতে নিযুক্ত (যে পিতৃলোকের উপাসনা করে), দেহত্যাগের পর সে পিতৃত্ব বরণ করে (পিতৃলোকে যায়); কিংবা ক্ষুদ্র দেবতাদি অথবা ভূতগণ

যাহাদের পরম দেবতা, যাহারা অভিচার-মার্গে তাহাদের উপাসনা করে, দেহের যবনিকাপাত হইলে তাহারা ভূতত্বই প্রাপ্ত হয়। এইভাবে সঙ্কল্পবশে ইহারা স্বকর্মের ফল ভোগ করে। পরন্তু যাহারা নয়নে আমাকে দেখে, কর্ণে আমারই নাম শ্রবণ করে, মনে আমাকেই ধ্যান করে এবং বাক্য দ্বারা আমারই স্তুতিগান করে, সর্বাঙ্গে সর্বস্থানে আমাকেই নমস্কার করে, আমারই উদ্দেশ্যে দান-পুণ্যাদি কর্ম করে, (৩৬০)

যাহারা আমার বিষয়ই অধ্যয়ন করে, অন্তরে বাহিরে মদ্রূপ হইয়াই তৃপ্ত হয়, আমারই জন্য জীবন ধারণ করে, শ্রীহরির গুণকীর্তনের জন্যই যাহারা অহংভাব পোষণ করে, আমাকে লাভ করাই যাহাদের জগতে একমাত্র লোভ, যাহারা আমাকে পাইবার ইচ্ছায়ই সকাম, আমার প্রেমেই প্রেমিক, আমারই ভুলে স-ভ্রম হইয়া (আমারই চিন্তায় বিভোর হইয়া) জগৎ ভুলিয়া যায়, আমাকে জানাই যাহাদের শাস্ত্র, আমাকে লাভ করাই যাহাদের মন্ত্র,—এইভাবে যাহারা সর্ব ব্যাপারে আমাকেই ভজনা করে, তাহারা মরণের এপারেই যথার্থভাবে আমার সহিত মিলিয়া যায়, মরণের পরে আমাকে ছাড়িয়া অন্যদিকে কেমন করিয়া যাইবে ? এইজন্য যাহারা আমার যজন করে, সেবা-পূজার অছিলায় আপনাকে আমাতেই অর্পণ করে, তাহারা আমার সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে ; হে অর্জুন, আমাতে আত্মসমর্পণ বিনা কেহই আমার প্রিয় হইতে পারে না, কোন উপচারে আমাকে বশীভূত করা যায় না। যে আপনাকে জ্ঞানী মনে করে; সে কিছুই জানে না ; যে আপন শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করে, সে সত্যই হীন ; যে বলে 'আমার আত্মজ্ঞান হইয়াছে' তাহার কিছুই হয় নাই ; অথবা হে কিরীটি, যজ্ঞ-দান-তপাদি ক্রিয়ার বাহাড়ম্বর ইহার কাছে একটি তৃণের সমানও নহে ; দেখ জ্ঞানের সামর্থ্য দেখিতে গেলে বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ? শেষনাগ হইতে বড় বক্তা আর কেহ আছে ? (৩৭০)

সেও আমার শয্যার নীচে চাপা পড়িয়াছে, বেদও 'নেতি নেতি' বলিয়া পিছু হটে, সনকাদি ঋষিগণও এ বিষয়ে (কিছু নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া) পাগল হইয়া যান ; তাপসদের কথা বিচার করিলে শূলপাণি মহাদেবের সমকক্ষ কে ? তিনিও অভিমান ত্যাগ করিয়া (আমার) চরণ-তীর্থ (গঙ্গাকে) মস্তকে বহন করেন। অথবা সমৃদ্ধির বিচারে লক্ষ্মীর ন্যায় কে আছে ? তিনিও আমার ঘরে দাসীর ন্যায়। তিনি যে অমরপুরী নামে খেলার ঘর নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ কি তাঁহার খেলার পুতুল নন ? তাঁহার সখ মিটিলে যখন এই খেলাঘর ভাঙা হয়, তখন মহেন্দ্রকেও ভিখারী হইতে হয়। তিনি যে বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই বৃক্ষই কল্পতরু হয়। যাঁহার গৃহে এই প্রকার সামর্থ্যসম্পন্না পরিচারিকা, সেই মুখ্য নায়িকা লক্ষ্মী দেবীরও এখানে আমা ভিন্ন কোন প্রতিষ্ঠা নাই। হে পাণ্ডব, সর্বভাবে সেবা করিয়া, অভিমান পরি-ত্যাগ করিয়া তিনি আমার চরণ ধৌত করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইজন্য আপন মহত্ত্ব বা প্রতিষ্ঠা দূরে রাখিয়া বিদ্যার গৌরব ভুলিতে হইবে; এবং যখন জগতে সকলের কাছে ছোট হইবে, তখনই আমার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবে। হে কিরীটী, সহস্রকিরণ সূর্যের দৃষ্টির সম্মুখে চন্দ্রই লোপ পায়, সেখানে খদ্যোত আপনার তেজের কি বড়াই করিবে ? তেমনি যেখানে লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য শোভা পায় না, শম্ভুর তপস্যা বিফল হয়, সেখানে প্রাকৃত অ-জ্ঞানী লোক আমাকে কি করিয়া জানিবে ? (৩৮০)

এইজন্য দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া সকল গুণের প্রতিষ্ঠা 'নিমলোণ'* করিয়া ছাড়িতে হইবে এবং সম্পত্তিমদ (অভিমান) দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬

অসীম প্রেমের উল্লাসে আমাকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত যে কোন একটি ফল—যদি আমার ভক্ত আমার কাছে লইয়া আসে, আমি দু' হাত বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করি, এবং তাহার বোঁটা না ফেলিয়াই অত্যন্ত আদরে তাহা ভক্ষণ করি; আর ভক্তিসহকারে আমাকে যদি কেহ একটি ফুল দেয়, তাহা আমার আঘ্রাণ করাই উচিত, পরন্তু তাহাও আমি মুখে ফেলিয়া দিই; ফুলের কথা থাকুক, যে কোন একটি পত্রও যদি প্রেমের সহিত কেহ অর্পণ করে—তাহা তাজাই হউক কি শুষ্কই হউক—যদি দেখি তাহা (সর্বভাবে) ভক্তির রসে ভরা, তাহা হইলে ক্ষুধিত ব্যক্তি যেমন অমৃত সেবন করিয়া তুষ্ট হয়, তেমনি ঐ পত্রটি সুখে ভোজন করিতে আরম্ভ করি। অথবা এমন যদি হয়, যে একটি পত্রও জোটে না, তবে জলের তো কোন অভাব হয় না? জল যেখানে সেখানে—বিনা মূল্যে বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায়, ঐ জলই যদি সর্বস্ব মনে করিয়া (প্রেমসহকারে) কেহ আমাকে অর্পণ করে, তবে আমি মনে করি সেই ভক্ত আমার জন্য বৈকুণ্ঠ হইতেও বিশাল মন্দির নির্মাণ করিয়া দিল, কৌস্তুভ হইতেও উজ্জ্বল অলঙ্কারে আমাকে সজ্জিত করিল; আমি মনে করি যেন আমার জন্য ক্ষীরাব্ধির ন্যায় মনোহর দুগ্ধের শয্যা রচনা করিল; (৩৯০)

কর্পূর, চন্দন, অগুরু ইত্যাদি সুগন্ধের মহামেরু রচনা করিয়া সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল বর্তিকার দ্বারা যেন দীপমালা সাজাইয়া দিল; যেন গরুড়ের ন্যায় বাহন, কল্পতরুর উদ্যান, কামধেনুরূপ গোধন আমাকে দান করিল; যেন অমৃত হইতেও সুরস (রসাল) বহুপ্রকারের পক্বান্ন আমাকে পরিবেশন করিল—ভক্তের এক বিন্দু জলের অর্ঘ্যে আমার এমনি পরিতোষ হয়! হে কিরীটী, আরও কি বলিতে হইবে? তুমি জানো এক কণা চিপিটকের জন্য আমি সুদামার বস্ত্রের গ্রন্থি খুলিয়াছি। আমি শুধু ভক্তিই জানি, যেখানে ভক্তি আছে সেখানে আমি ছোট বড় বিচার করি না। যে কেহ হউক না কেন, আমি তাহার ভাবই গ্রহণ করি। পত্র, পুষ্প, ফল—এ সব উপাসনার উপকরণ মাত্র; 'নিষ্কল' (নিরুপাধি) ভক্তিতত্ত্বই আমাকে প্রাপ্ত করায়; অতএব হে অর্জুন, শুন, তোমাকে একটি সহজ উপায় বলিতেছি, তুমি কখনও আপন মনোমন্দিরে আমাকে বিস্মৃত হইও না।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭

যে কোন ব্যাপার (কর্ম) করিবে, যে কোন ভোগ্য (বিষয়) উপভোগ করিবে, নানা প্রকার যজ্ঞে যাহা যজন করিবে, অথবা পাত্রবিশেষে যাহা দান করিবে, সেবকদের জীবিকা-নির্বাহের জন্য যাহা প্রদান করিবে, তপাদি সাধন বা ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে, এ সমস্ত ক্রিয়া—যাহা স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া পড়িবে, সে সমস্তই ভক্তিভাবে আমারই উদ্দেশ্যে করিবে। (৪০০)

*ভূতাপসরণের জন্য নিমপাতা ও নুন একত্র করিয়া সন্তানের মুখের চারিদিকে ঘুরাইয়া ফেলিয়া দেওয়া।

পরন্তু এই সব কর্ম করিবার সময় আপনার অন্তরে নিজের স্মৃতিও যেন না থাকে (কর্তৃত্বের অহংকার থাকিবে না), এই ভাবে সেই সমস্ত কর্ম নিঃশেষে আমার হস্তে অর্পণ করিবে।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, তেমনি আমাকে অর্পণ করিলে এই শুভাশুভ কর্ম ফলপ্রদ হইবে না। যেটুকু কর্ম অবশিষ্ট থাকে, তাহা সুখদুঃখরূপ ফল প্রসব করে এবং তাহা ভোগ করিবার জন্য একটি দেহধারণ করিতে হয়; ঐ সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করিলে তখনই জন্মমরণ শেষ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জন্মের সহিত যে কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহারও অন্ত হইবে; সেইজন্য হে অর্জুন, তোমাকে এই সহজ সন্ন্যাস-যুক্তি প্রদান করিলাম—যাহাতে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির বিলম্ব না হয়; ইহাতে দেহবন্ধনে পড়িবে না; সুখদুঃখের সাগরে ডুবিবে না, আমারই সুখ-স্বরূপে অনায়াসে মিলিত হইবে।

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯

যদি প্রশ্ন কর, আমি কেমন? তবে (তাহার উত্তর এই যে) আমি সর্বদা সমভাবাপন্ন, আমার আপন বা পর এরূপ ভেদভাব নাই; যাহারা এইভাবে আমাকে জানিয়া অহঙ্কারের আধার ভাঙিয়া কর্ম করিয়া অন্তরের সহিত আমাকে ভজনা করে, তাহারা দেহ ধারণ করিয়া দেহের ব্যাপার করিতেছে দেখা যায়, পরন্তু তাহারা দেহে থাকে না, আমাতেই অবস্থান করে এবং আমিও সমগ্রভাবে তাহাদের হৃদয় ভরিয়া থাকি। সবিস্তার বটবৃক্ষ যেমন বীজ-কণিকার মধ্যে থাকে, আর বীজ-কণাও যেমন বটবৃক্ষের মধ্যে থাকে, (৪১০)

তেমনি আমার ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ; শুধু বাহিরের নামেই পার্থক্য, নতুবা অন্তরের বস্তুবিচারে আমার ও তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই (তাহারা ও আমি একই); ধার-করা অলঙ্কার যেমন শরীরের উপরেই শোভা পায় (উহাতে কোন মমত্ববুদ্ধি থাকে না), তেমনি তাহারাও উদাসীন হইয়া দেহধারণ করে; ফুলের সৌরভ বায়ুর সঙ্গে চলিয়া গেলে যেমন গন্ধহীন ফুলটি বোঁটার উপর থাকে, তেমনি তাহাদের দেহ আয়ু শেষ হইবার অপেক্ষায় থাকে; হে পাণ্ডব, তাহার সমস্ত অভিমান মদ্ভাবে আরূঢ় হইয়া (মদ্ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া) আমাতেই লীন হয়।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০

এমনিভাবে—প্রেমসহকারে যে আমার ভজনা করে, সে যে কোনও জাতির হউক না কেন—তাহাকে আর শরীর ধারণ করিতে হয় না; হে মহাবীর অর্জুন, আচরণ দেখিতে গেলে, সে নিকৃষ্টতম দুরাচারী হইলেও যদি ভক্তির পথে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকে; অন্তকালের বুদ্ধিই পরজন্মের গতি নির্ধারণ করিয়া থাকে—সেই জন্য যে শেষকালে আপন

জীবন ভক্তিকেই সমর্পণ করিয়া দেয়; সে পূর্বে দুরাচারী হইলেও তাহাকে সর্বোত্তম বলিয়া জানিবে,—যেমন কেহ যদি বন্যার জলে ডুবিয়াও মৃত্যুমুখে না পড়িয়া জীবিত অবস্থায় তীরে উঠিয়া আসে, তাহার যেমন ডুবিয়া যাওয়া নিরর্থক বা নিষ্ফল হয়, তেমনি অন্তে যদি ভক্তিকে আশ্রয় করা যায় তবে পূর্বকৃত পাপ ধৌত হইয়া যায়; এই জন্য পূর্বে দুষ্কৃতিকারী (দুরাচারী) হইলেও অনুতাপতীর্থে স্নান করিয়া ভক্ত (শুদ্ধ হৃদয়ে) সর্বভাবে আমার স্বরূপে প্রবেশ করে; (৪২০)*

তখন তাহার কুল পবিত্র হয়, আভিজাত্য নির্মল হয়, এবং তাহার জন্ম সফল হয়, সে তখন (কিছু না করিয়াও) সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, তপশ্চরণ শেষ করিয়াছে, অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস করিয়াছে; আর অধিক কি বলিব? হে পার্থ, আমার উপর যাহার অখণ্ড আস্থা (প্রেম, বিশ্বাস) সে সর্বথা কর্মের ঝঞ্ঝাট উত্তীর্ণ হইয়াছে; হে কিরীটী, সে সমস্ত মনোবুদ্ধির ব্যাপার একনিষ্ঠারূপ পেটিকায় ভরিয়া আমারই মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে (রাখিয়া দিয়াছে)।

* বন্ধনীস্থ সংখ্যাগুলি মূল 'জ্ঞানেশ্বরী'র অধ্যায়ান্তর্গত শ্লোকসংখ্যা।

'ভূমৈব সুখম্'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমাতে আমার চিত্ত যুক্ত হ'য়ে থাক
অহোরাত্র আর সব দিগন্তে মিলাক্।
তুমি যে অনন্ত! আর আমরা ভূমার
কাঙাল; বুভুক্ষু প্রাণ করে হাহাকার
তাইতো সীমার মাঝে; অল্পে কোথা সুখ?
বিত্ত দিয়ে, খ্যাতি দিয়ে ভরে না তো বুক!
স্নেহে-প্রেমে শূন্য হিয়া পূর্ণ কভু হয়?
মৃত্যুর ছায়ায় কাঁদে মানব-হৃদয়
অমৃতের পিপাসায়। মাটির পিঞ্জরে
স্বর্গের সে কোন্ পাখী গুমরিয়া মরে।
নিজেরে চিনি না ব'লে এত দুঃখ পাই।
নিজেরে জানি না ব'লে ভুল ক'রে চাই
যাহা ছায়া, যার মাঝে মৃত্যুর যাতনা;
জানাও, ভূমাতে শুধু আত্মার সান্ত্বনা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রাচীন ভারত

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

(১)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যচেতনার মূলে সুদূরপ্রসারী ও বিচিত্র কল্পনা; কিন্তু নিছক কল্পনার জাল বুনেই কবি-প্রতিভা নিঃশেষিত হয়নি। কালিদাস ও কীটসের মতো তীব্র সৌন্দর্যানুভূতি তাঁর কবি-কল্পনাকে করেছে সমৃদ্ধ, শেলীর মতো সর্ববন্ধনমুক্ত জীবনের উপলব্ধি তাঁর কাব্যে সঞ্চার করেছে প্রচণ্ড আবেগ, দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনের রহস্য অনুসন্ধানে তাঁর কাব্য হয়েছে তাৎপর্যময়, চিরন্তনী প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভবে তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন কালিদাস ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে, প্রেমের সূক্ষ্ম রহস্য বিশ্লেষণে তিনি ব্রাউনিঙের সমধর্মী, আবার শিশুমনের রহস্য-জগতেও তিনি বিচরণ করেছেন পাশ্চাত্য নাট্যকার মেতারলিঙ্ক ও বেরির মতো। রবীন্দ্র-মনের এ বিপুল প্রসার তাঁর সৃষ্টিতে এনে দিয়েছে বৈচিত্র্য, কিন্তু বৈচিত্র্যই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়; রবীন্দ্র সাহিত্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে অন্তঃস্তব্ধ ভাব-গভীরতা, আর জগৎ ও জীবনের প্রতি ঋষিজনোচিত প্রজ্ঞাদৃষ্টি। সে অনন্তবিস্তারী দৃষ্টি দিয়ে কবি অবিচ্ছিন্ন সেতু রচনা করেছেন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে, স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে, বর্তমান ও অতীতের মধ্যে। প্রাচীন ভারতের বিচিত্র জীবনধারা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কখনও ফিরে আসেন বর্তমান ভারতে, আবার বর্তমান ভারতের কর্মচঞ্চল জীবন-প্রবাহের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি কল্পনায় ফিরে যান প্রাচীন ভারতের সুগভীর শান্তি ও মৌনমহিমায় স্তব্ধ ভাব-জীবনে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে বর্ণিত সে ভারত কর্মে উত্তেজনাহীন, ধর্ম-উপলব্ধিতে প্রশান্ত, শ্রী ও সমৃদ্ধিতে জ্যোৎস্না-স্নাত শারদ প্রকৃতির মতোই মাধুর্যময়। সে স্বপ্নের ভারত রবীন্দ্র-সাহিত্যে কী গৌরবদীপ্তি নিয়ে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল তাই এখানে আমাদের আলোচ্য।

(২)

রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে জীবন যেমন দেশকালের সীমোত্তীর্ণ একটি সক্রিয় সত্তা, তেমনি দেশকেও দেখেছেন কবি একটি বিস্তৃত কালের পটভূমিকায়। অতীত হ'তে বর্তমানের মধ্য দিয়ে দেশ অগ্রসর হ'য়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। প্রাচীন কালে ভারত যখন স্বাধীন ছিল, তখন ভারতবাসীও ছিল অখণ্ড জীবন-দৃষ্টির অধিকারী। কবির সমকালে পরাধীন ভারত হারিয়ে ফেলেছে সে অখণ্ড জীবনবোধ, তার ফলে ভারতের বর্তমান জীবন শত সহস্র তুচ্ছতার আঘাতে ধূল্যবলুণ্ঠিত। একটা মহান্ জীবনাদর্শ হ'তে বর্তমান ভারতবাসীর এ মর্মান্তিক স্খলন রবীন্দ্রনাথের ভারতপ্রেমিক কবিচিত্তে জাগিয়েছে দুঃসহ বেদনা-বোধ। তাই তিনি বার বার পরমশক্তিমান্ বিশ্বপিতার নিকট প্রার্থনা করেছেন—বর্তমান অধঃপতিত ভারতকে প্রাচীন ভারতের অখণ্ড জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। কবির সমগ্র 'নৈবেদ্য'-কাব্যে আধুনিক মোহাচ্ছন্ন ভারতকে প্রাচীন ভারতের সে সম্পূর্ণ জীবন-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত।

নানা লৌকিক সংস্কারে অন্ধ মানুষের জন্যে কবির এ মুক্তিস্বপ্ন বর্তমান যুগে নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী ইংরেজ কবি শেলীও

সংকীর্ণ জীবন-পল্বলে আবদ্ধ মানুষের মধ্যে একটা বন্ধনমুক্ত ভাব-জগতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিপ্লবী কবির সে জগৎ-চেতনা গগনস্পর্শী কল্পনায় সমৃদ্ধ হলেও সাধারণ মানুষের কাছে তা একটা নির্বিশেষ ভাবসত্য বলেই মনে হয়। আবার টেনিসনের কাব্যে স্বদেশের রূপ এত বাস্তব ও এত সংকীর্ণ যে তাতে কাব্যের উন্মুক্ত প্রসার ও বেদনা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে স্বদেশ-চিত্র কবির অখণ্ড জীবনচেতনা ও বেদনায় স্পন্দমান। সে সামগ্রিক জীবনবোধকে কাব্যোচিত উৎকর্ষ দান করেছে বাস্তব জীবনের বর্ণবৈচিত্র্য, আবার মাহাত্ম্য দান করেছে অপরূপ জীবনের সৌন্দর্য।

সে মহাজীবনের অধিকারী হয়েছিল প্রাচীন ভারত ত্যাগ ও বীর্যের সাধনার দ্বারা, সমস্ত তুচ্ছতা ও গ্লানির ঊর্ধ্বে অবস্থান ক'রে; সে শাশ্বত জীবনবোধ যুগে যুগে উদ্বোধিত করেছে ভারতবাসীকে একটা আদর্শ জীবনের পিপাসায়। সে মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের পরিচয় ভোগাকাঙ্ক্ষাহীন ইতিহাস-বিশ্রুত রাজার জীবনে আর ঋষির তপোবনে। বর্তমান ভারতের খণ্ডিত জীবন-চেতনা তাই অনন্ত জীবনের অভিলাষী কবি-চিত্তকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে সে মুক্ত জীবনের জন্যে, তারই ব্যঞ্জনা :

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র
অশোকমন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র
দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব,
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।

(৩)

পরিপূর্ণতার সাধনাই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনার চরমাদর্শ। সেজন্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে কবি জীবনের একমাত্র মুক্তিপথ ব'লে ভাবতে পারেননি। বর্তমান যুগে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে কবি দেখেছিলেন বাস্তবতা ও আদর্শের এক অপূর্ব সম্মেলন।—স্বদেশের পরাধীনতার অসহ্য বেদনা যেমন করেছিল তাঁর বন্ধন-অসহিষ্ণু মনকে বিপ্লবী, তেমনি মানবাত্মার পূর্ণ স্ফূর্তির পথ আবিষ্কারের জন্যে তিনি বরণ করেছিলেন নিঃসঙ্গ-কঠোর তপোব্রত জীবন। ভাব ও কর্মের এ দুর্লভ সমন্বয়ই রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ অন্তরকে সবলে আকর্ষণ করেছিল শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড জীবন-সাধনার দিকে। এ মুক্তি-সাধককে নমস্কার জানাতে গিয়ে কবি বলেছেন :

আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন।
সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হ'য়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।

এ পরিপূর্ণতার আদর্শে প্রত্যয়ী কবি তাই প্রাচীন ভারতে যে স্থির জীবন-মূল্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা প্রধানতঃ ভোগস্পৃহাহীন ধর্মবোধ ও ত্যাগের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আজ এই সভ্যতা-গর্বিত বিংশ শতাব্দীতে শুধুমাত্র সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষমতালোভী জাতির জীবনে নেমে এসেছে বিদ্বেষের কালো ছায়া। আর পরিপূর্ণ মানবতার উপাসক প্রাচীন ভারত বিশ্বের আর্য অনার্য সমস্ত জাতিকে সস্নেহে আহ্বান করেছিল একটা মহাজাতি-গঠনের স্বপ্নে। অতীত ভারতের এ বিশ্বমৈত্রী-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এ

যুগের কবি রবীন্দ্রনাথও সমস্ত বিশ্ববাসীকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এ পুণ্যভূমি ভারততীর্থে। কবি-কল্পনায় ভারতলক্ষ্মীর রূপ-পরিকল্পনাও সংকীর্ণ দেশকালের সীমারেখার বহু ঊর্ধ্বে— ভারত-জননী শুধু ভারতবাসীর বন্দিতা মাতা নন, তিনি বিশ্বেরও জননী।

ভারতবর্ষের এ গৌরবদীপ্ত মূর্তি-কল্পনায় কবি যদি শুধুমাত্র ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হতেন, তাহলে ইতিহাসের সত্যানুসন্ধিৎসুর কাছে তার বিশেষ কোন মূল্য থাকত না। কিন্তু ইতিহাস-পাঠকমাত্রই জানেন, সুদূর অতীতে প্রাচীন ভারতবর্ষই সমস্ত পৃথিবীকে সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রথম আলো দেখিয়েছিল। কবির অনুভূতিতে বিশ্বদেবতা তাই দেখা দিয়েছেন তাঁর স্বদেশের প্রিয়মূর্তিতে :

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে ?
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।

বিশ্বসভ্যতার পথপ্রদর্শক এ প্রাচীন ভারত সাময়িকভাবে আজ অধঃপতিত হলেও কবি ঐতিহ্যগৌরবমণ্ডিত এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হারাননি। যে মঙ্গল-সাধনা ও সত্যোপাসনা প্রাচীন ভারতকে করেছিল বিশ্ববাসীর কাছে বরেণ্য, ভাবীকালে সে ভারত বিরোধ-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর মধ্যে আবার এনে দেবে শান্তির অভয়বাণী :

নয়ন মুদিয়া ভাবীকাল পানে
চাহিনু শুনিনু নিমেষে—
তব মঙ্গল বিজয় শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে।

(৪)

শুধু ইতিহাসের বস্তু-জগতে নয়, সাহিত্যের ভাবঘন রস-জগতেও কবি অনুসন্ধান করেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষের বিচিত্র রূপ। বেদ-উপনিষদের মধ্য দিয়ে যে প্রাচীন ভারতকে দেখা যায়, সে ভারত জ্ঞান ও কর্মে বৃহৎ ; আর ক্লাসিক সাহিত্যে যে ভারতের পরিচয় পাওয়া যায়, সে ভারত সৌন্দর্য ও মাধুর্যে আনন্দঘন। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' ও 'মেঘদূত' কাব্যে সে সৌন্দর্যের জগৎ চিত্রিত হয়েছে বিচিত্র বর্ণা-লিম্পনে। সে হিংসা-দ্বেষহীন, লাভালাভ ও জয়-পরাজয়ের সংগ্রামহীন, শান্তি প্রীতি ও শ্রী পরিপূর্ণ জীবন-পরিকল্পনায় ক্লাসিক কবির কল্পনাতিশয্য যে ছিল না, তা জোর ক'রে বলা চলে না। কিন্তু সে শান্ত ছন্দে প্রবহমাণ জীবন প্রবাহের প্রতি শান্ত রসের কবি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ সহজাত ও দুর্নিবার। রবীন্দ্রনাথের এ কাল্পনিক অতীত-প্রীতির ভেতর আধুনিক সমাজতান্ত্রিক সমালোচক একটা পলায়নী মনোবৃত্তির ভাব আবিষ্কার করবেন, সন্দেহ নেই ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ অতীত জীবন-প্রীতির মধ্যেই নিহিত আছে— রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের একটা অভ্রান্ত সংকেত। কোন সময়ে হাল্‌কা হাসির বুদ্‌বুদের মধ্য দিয়ে, আবার কোন সময় মেঘমন্দ্র-শব্দিত ছন্দ ও গম্ভীর শব্দ-বিন্যাসের মধ্যে কবি তাঁর সে ধ্যানের ভারতকে মূর্ত ক'রে তুলেছেন বহু কাব্য ও কবিতায়।

সুগভীর ঐতিহ্যপ্রীতি নিয়ে এ ধরনের রস-সমৃদ্ধ কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল। একজন রবীন্দ্র-সমালোচক সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন : Longfellowর Divina Commedia বা Keats-এর Ode to the Grecian Urn-এর মত বিখ্যাত রোমান্টিক কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথের এ শ্রেণীর কাব্যের রসের দীপ্তি বা কল্পনার সমগ্রতা নেই। (দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ ॥ ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)

'মানসী'র অন্তর্গত 'মেঘদূত' কবিতার ভেতর কবি জীবন্ত ক'রে তুলেছেন মন্দাক্রান্তা ছন্দে

প্রবাহিত কালিদাসের প্রাচীন ভারতকে, আর 'কল্পনা'র 'স্বপ্ন' কবিতায় প্রাচীন উজ্জয়িনীতে কবির মানস অভিসার অপরূপ কাব্য-সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু উভয় কবিতাতেই দেখি বর্তমানের বাস্তব আঘাতে কবির স্বপ্ন-কল্পনা হয়েছে খণ্ডিত, আর এ স্বপ্নভঙ্গের বেদনা একটা মর্মান্তিক আর্তনাদের মধ্য দিয়ে লাভ করেছে করুণ পরিসমাপ্তি। কবি-অন্তরের এ বেদনার হাহাকার পাঠকের সংবেদনশীল অন্তরেও ফেলে বেদনার একটা দীর্ঘ ছায়া।

রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেমানুভূতিকেও বিস্তৃতি দিয়েছে প্রাচীন ভারতীয় কাব্যপুরাণ-বর্ণিত চিরন্তন প্রেমকাহিনী। প্রথম যুগের কাব্য-কবিতায় কবি সে সুপ্রাচীন প্রেম-কাহিনীকে সবিস্তার রূপ দিয়ে যেন আত্মতৃপ্তি অনুভব করেছেন, আর প্রেমকাব্য-রচনার শেষ পর্যায়ে সে বিস্মৃত অতীতের প্রেমানুভূতিকে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করেছেন শুধুমাত্র সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার সাহায্যে। 'মহুয়া' কাব্যের 'সাগরিকা' কবিতা হ'তে শুধু একটি মাত্র উদাহরণ দেব। সংশয়ের স্তরোত্তীর্ণ বালিসুন্দরী নবাগত ভারত-পুরুষের দিকে যখন অনুরাগের দৃষ্টিতে চাইল, সে দৃষ্টিকে তুলনা করেছেন কবি ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসির সঙ্গে। এ অবস্থায় এর চাইতে চমৎকার ইঙ্গিতময় অনুরাগের বর্ণনা বোধ হয় আর হ'তে পারত না। শুধু এ কবিতায় কেন, কবির শেষ পর্যায়ের আরও বহু প্রেম-কবিতায় কবি প্রেমানুভূতিকে মাধুর্য ও গভীরতা দান করেছেন প্রাচীন ভারতের আরও বহু প্রেম-চিত্রের প্রেক্ষাপটে।

(৫)

প্রাচীন ভারতের সঙ্গে জাগরণোন্মুখ নবীন ভারতের পরিচয়-সাধনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' নামক গ্রন্থে। দেশে তখন জাতীয়তাবোধের উন্মত্ত বন্যা প্রবাহিত হয়েছে। নেতারা 'পোলিটিক্যাল এজিটেশন' ক'রে অত্যাচারী বিদেশী শাসকের কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায় করতে ব্যস্ত। কিন্তু দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ অনুভব করলেন শুধুমাত্র উদ্দীপনা, উত্তেজনা ও আন্দোলনের সাহায্যে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না, প্রকৃত জাতীয় মুক্তির জন্যে চাই—প্রথমে উত্তেজনাহীন গভীর স্বদেশ-চিন্তা ও গঠনমূলক কাজ। ঐতিহ্যভ্রষ্ট জাতির পক্ষে একটা নতুন জাতীয় জীবনের সৌধ নির্মাণ করবার চেষ্টা শূন্যে ফুলের ফসল ফলাবার ইচ্ছার মতোই অর্থহীন। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েও শেষ পর্যন্ত সে আন্দোলন হ'তে সরে দাঁড়ালেন। জীবনের এ পথ-পরিবর্তন কোন ভীরুতার ফলে নয়, বরং নতুন ভাবান্দোলনের সাহায্যে জাতীয় চিত্তে নবজাগ্রত স্বাদেশিকতার প্রেরণাকে একটা বলিষ্ঠ ভিত্তির ওপর স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে। জাতীয় জীবনের শক্তি ও বলের উৎস খুঁজে পেলেন তিনি প্রাচীন ভারতের স্থির জীবনাদর্শের মধ্যে। সে ভারত জ্ঞানে কর্মে ও চিন্তায় মহান্, বীর্যে ক্ষমায় প্রেমে তেজোদীপ্ত, ভোগে সংযমে ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ জীবন-চেতনার আশ্রয়স্থল। সে ভারতের পরিচয় তুলে ধরলেন তিনি 'স্বদেশ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'নূতন ও পুরাতন', 'নববর্ষ', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা', 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি সুচিন্তিত প্রবন্ধে। স্বদেশ-চেতনার একটা নতুন রূপ দেখা গেল এ সমস্ত প্রবন্ধে। শক্তিমান্ প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্য দিয়ে তিনি দেখালেন, কী ধর্মপ্রেরণায়, কী সমাজচিন্তায়, কী রাষ্ট্রচিন্তায়—প্রাচীন ভারত আধুনিক য়ুরোপ হ'তে কোন অংশেই হীন ছিলনা, বরং সে সুদূর অতীতে ভারতীয় সংস্কৃতি আলো বিকীর্ণ করেছে সমস্ত পৃথিবীতে।

বর্তমান য়ুরোপ কর্মসফলতাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য ব'লে অনুভব করেছে, তাই অবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রয়াসেই তার আনন্দ, স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে য়ুরোপের কৌতূহল সীমাবদ্ধ। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন ভারতবর্ষ তদানীন্তন পৃথিবীর চাঞ্চল্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তাই বহিঃসংঘাতহীন অচঞ্চল চিত্তে অন্তর্জগতের গভীর রহস্য অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছিল। ভারতের এ আন্তর সাধনার পরিচয়-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

'জগৎ যেমন অসীম, মানবের আত্মাও তেমনি অসীম, যাঁরা সেই অনাবিষ্কৃত অন্তর্দেশের পথ অনুসন্ধান করেছিলেন তাঁরা যে নতুন কোন সত্য, নতুন আনন্দ লাভ করেননি, তাহা নিতান্ত অবিশ্বাসীর কথা।'

'ভারতবর্ষ সুখ চায়নি, সন্তোষ চেয়েছিল; তাহা পেয়েওছে, এবং সর্বতোভাবে সর্বত্র তার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছে।'

এ সূক্ষ্ম অন্তর্জগতের অনুসন্ধানী প্রাচীন ভারতীয় মন যে জীবনবিমুখ ছিল—পাশ্চাত্য সভ্যতাবিলাসীর এ আধুনিক বিশ্বাস যে শুধু অশ্রদ্ধেয় নয়, অসত্যও—মহাভারতের জীবন-পরিচয় বিশ্লেষণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ তা প্রমাণ করেছেন:

'এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান্ ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজ-বিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। সে সমাজে একদিকে লোভ, হিংসা, ভয়, দ্বেষ, অসংযত অহংকার—অন্যদিকে বিনয়, বীরত্ব, আত্মবিসর্জন, উদার মহত্ত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্য-চরিত্রকে সর্বদা জাগ্রত ক'রে, মথিত ক'রে রেখেছিল।... সেই বিপ্লব-সংক্ষুব্ধ বিচিত্র মনোবৃত্তির সংঘাত দ্বারা সর্বদা-জাগ্রত শক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢ়োরস্ক, শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নত মস্তকে বিহার ক'রত।'

একটা উদার শান্তি ও অচঞ্চল স্তব্ধতাই ছিল প্রাচীন ভারতীয় জীবনের সকল শক্তির মূলে। 'নববর্ষে' কবি নবীন ভারতকে সেই অন্তঃস্তব্ধ প্রাচীন ভারতের বলিষ্ঠ জীবন-চেতনার বাণী উপলব্ধি করবার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছেন সরল ভাষায়:

'যাহা আমাদের সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাস-ব্রতধারী, তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্নি এখনও জ্বলিতেছে। ...এই সঙ্গী-হীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তব্ধ তাহা উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, যাহা বিদেশের বিপুল বিলাস-সামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে—তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না; করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নিঃসন্দেহে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধ-ভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।'

ভারতীয় মুক্তি ও য়ুরোপের freedom-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'এই যে কর্মের বাসনা, জনসংঘের সংঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি—ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে ভয়হীন, শোকহীন, মৃত্যুহীন, পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপ যাকে 'ফ্রীডম্' বলে সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ; সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু; তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর—তাহা পরের প্রতি অন্ধ; তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে।...এই দানবীয় 'ফ্রীডম্' কোন কালে

ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিল না।… এই 'ফ্রীডমের' চেয়ে উন্নততর—বিশালতর যে মহত্ত্ব—যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় আমরা সমাজের মধ্যে আবাহন করিয়া আনি—অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্ন চরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড় বড় রাজমুকুট পবিত্র হইবে।'

এ গৌরবদীপ্ত প্রাচীন ভারতের মাহাত্ম্য উপলব্ধি ক'রে কবি প্রত্যয়ান্বিত হলেন নবীন ভারতের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে। এত প্রাচীন ও মৃত্যুঞ্জয় জীবনাদর্শের অধিকারী যে দেশ, সে দেশের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় সুনিশ্চিত। ১৩০৯ সালের নববর্ষে শান্তিনিকেতনে ভারতের ভবিষ্যৎ বিষয়ে তিনি যে অভয়বাণী প্রচার করলেন, উত্তরকালে রাজনৈতিক মুক্তির দিক দিয়ে অন্ততঃ তা সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছে :

'জয় হইবে, ভারতবর্ষের জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক্, তাহারই জয় হইবে।'

প্রাচীন ভারত-চিন্তা রবীন্দ্রনাথের সুদূর-প্রসারী ও রোমান্টিক ভাব-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত ক'রে শুধুমাত্র তাঁর কাব্যকেই সমৃদ্ধ করেনি, দেশের মননশীল চিন্তাকেও জাগরিত করেছে একটা বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের অভিমুখে।

সূর্য-প্রণাম

শ্রীশুভ গুপ্ত

প্রভাতের স্পর্শ লাগে ঘুম-ভাঙা চোখে,
হে তপন, জীবনের হে স্বর্ণ-দিশারী !
ভাঙো ভাঙো মূঢ় স্বপ্ন অবচেতনার,
এ অসহ ক্লান্তি হ'তে ত্রাণ করো মিতা,
প্রাণের আকাশে দাও গানের আলোক।
কিছু তো বুঝি না বন্ধু, কোথায় বেদনা,
কোথায় মৃত্যুর মন্ত্র জপে অন্ধকার ;
বারংবার পরাজিত অবসন্ন দেহে
দুঃখদাহে প্রদীপের জ্বেলেছি যে শিখা,
তাহারে নিভাতে চায় সে কোন্ নির্মম,
অন্তরের অন্তঃশায়ী কোন্ মৃত্যুদূত !
দেহ হ'তে মন হ'তে উর্ধ্বে তুলে নাও,
তোমারি বিমল জ্যোতি আত্মার আত্মীয়,
মেঘ-ম্লান আবরণ দূর করো তার,
বুকে টেনে করো তারে তোমারি স্বকীয়।

শ্যামপুকুর-বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ৫৫এ, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট-স্থিত ভবনে এসে চিকিৎসার্থ দুই মাস নয় দিন অবস্থান করেন। এই বাটীতে তাঁর দিব্য লীলার বহু বিবরণী 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'পুঁথি' প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে সবিস্তার লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমরা ঐ সকল বিবরণীর মাত্র কয়েকটি এখানে অনুধ্যান ক'রে পরিতৃপ্ত হব।

শুভাগমন

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের প্রথমার্ধে পরমহংসদেবের গলরোগের সূত্রপাত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে রোগ কঠিন আকার ধারণ করে।

ভক্তগণ তখন সুবিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় আনয়নের সংকল্প করেন। ঠাকুরের নির্দেশমত বাগবাজার অঞ্চলে গঙ্গার সন্নিকটে দুর্গাচরণ মুখার্জী ষ্ট্রীটে নবনির্মিত একটি বাড়ি ভাড়া করা হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর (১১ই আশ্বিন, ১২৯২ সন), শনিবার সকালে তিনি এই বাড়িতে আগমন করেন। গঙ্গাতীরে কালীবাড়ির সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ও মনোরম উদ্যান-সংলগ্ন গৃহে বসবাসে অভ্যস্ত ঠাকুর স্বল্পপরিসর এই বাড়িতে প্রবেশ ক'রে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, এবং তৎক্ষণাৎ ঐ বাড়ি থেকে পদব্রজেই ভক্তগণসঙ্গে শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর ভবনে উপস্থিত হন। তখন সকাল প্রায় নয়টা। কলকাতায় মনোমত বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত বলরামবাবুর অনুরোধে ঠাকুর তাঁর ভবনেই থাকতে সম্মত হলেন।

ভক্তগণ উপযুক্ত বাড়ি অনুসন্ধান করতে লাগলেন এবং বলরাম-মন্দিরে প্রসিদ্ধ কবিরাজগণকে আহ্বান করলেন। গঙ্গাপ্রসাদ সেন, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রমুখ বিশিষ্ট বৈদ্যগণ ঠাকুরকে পরীক্ষা করলেন। তাঁদের কাছে বিশেষ আশা না পেয়ে ভক্তগণ হোমিওপ্যাথি-মতে ঠাকুরের চিকিৎসা করানো যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন।

'শ্যামপুকুরের মধ্যে বাড়ী হইল স্থির।
যাহার পশ্চিমে এক শিবের মন্দির॥
দ্বিতল মহল বাড়ী মাস ভাড়া ধার্য।
গৃহস্বামী নামজাদা শিবু ভট্টাচার্য॥'—পুঁথি

এক সপ্তাহের মধ্যেই শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষের চেষ্টায় ৫৫ (বর্তমান ৫৫এ), শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে একটি দ্বিতল বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ২রা অক্টোবর, ১৭ই আশ্বিন শুক্রবার সন্ধ্যার পর ভক্ত-সেবকগণসহ এই বাড়িতে শুভাগমন করেন।

শ্যামপুকুর-বাটী

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থানকালে শ্যামপুকুর-বাটী যেরূপ ছিল তার বিশদ বর্ণনা 'লীলাপ্রসঙ্গে' (দিব্যভাব-খণ্ডে) পাওয়া যায়।

বর্তমানে এই বাড়ির অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ে। বাড়িটি ৫৫এ এবং ৫৫বি—দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমোক্ত ভাগে ঠাকুর থাকতেন। উঠানে দুই ভাগের মাঝখানে এখন টিনের একটি উচ্চ প্রাচীর দেখা যায়। ৫৫এ অংশের দ্বিতলে যাবার জন্য পৃথক্ সিঁড়ি নির্মিত হয়েছে। বাড়িতে প্রবেশ করলে বাম দিকে ঐ সিঁড়ি পড়ে। ঐ সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠে বৈঠকখানা-ঘরে (ঠাকুর এই ঘরে থাকতেন) যাওয়া যায়। এই ঘরটি পূর্ববৎ প্রশস্ত নেই, একাধিক কক্ষে পরিণত হয়েছে।

জ্যোতিঃপথে গমন

শ্যামপুকুর-বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনের পক্ষকাল মধ্যেই শারদীয়া মহাপূজা সমাগত হ'ল। সকলেই আনন্দে মত্ত, কিন্তু ঠাকুরের সেবক-ভক্তগণ গভীর বিষাদগ্রস্ত, কারণ

'জবাব দিয়াছে চিকিৎসকের নিচয়।
প্রভুর অসাধ্য ব্যাধি আরোগ্যের নয়॥'—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ ও আজ্ঞা নিয়ে ভক্তপ্রবর সুরেন্দ্র মিত্র সিমলায় নিজ গৃহে প্রতিমায় দেবীর মহাপূজার সংকল্প করেছেন। মহানবমী-বিহিত পূজাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হ'ল। মহাসমারোহে তিন দিন আনন্দময়ীর পূজা করেও সুরেন্দ্রের চিত্তে আনন্দ নেই। নবমীপূজার দিন সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাত-টার সময় তিনি যুক্তকরে প্রতিমার সম্মুখে বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করছেন। 'মা, মা' ব'লে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদছেন। নয়ন-জলে তাঁর গণ্ডদেশ ভেসে যাচ্ছে। তিনি কেবলই ভাবছেন—ঠাকুর সুস্থ থাকলে তাঁর গৃহে শুভা-গমন করতেন। তাঁকে নিয়ে মহাপূজায় কতই না আনন্দোৎসব হ'ত। কিন্তু হায়! তিনি আজ শয্যাশায়ী, কাছেই আছেন, অথচ আসতে পারছেন না।

'সুরেন্দ্র সমানভাবে আছে দাঁড়াইয়া।
প্রভুর মোহন মূর্তি মনে ধিয়াইয়া॥
এমন সময় তেঁহ দেখিবারে পান।
প্রতিমার মধ্যে প্রভু নিজে অধিষ্ঠান॥'—পুঁথি

এদিকে শ্যামপুকুর-বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তগণসঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গাদি করতে করতে ঠিক ঐ সময়ে হঠাৎ সমাধিমগ্ন হলেন। কিছুকাল পরে সমাধিভঙ্গ হ'লে তিনি উপস্থিত ভক্ত-গণকে আপনার অদ্ভুত দর্শন ও অনুভূতির কথা বললেন: এখান হ'তে সুরেন্দ্রের বাড়ী পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলে গেল। দেখলাম, তার ভক্তিতে প্রতিমায় মার আবেশ হয়েছে! দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমালা জেলে দেওয়া হয়েছে, আর সুরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে 'মা, মা' ব'লে কাঁদছে।

ঐদিন সুরেন্দ্রের গৃহে ভক্তবর্গের নিমন্ত্রণ ছিল। তাই ঠাকুর তাঁদের বললেন, 'তোমরা সকলে এখনই তার বাড়ী যাও তোমাদের দেখলে তার প্রাণ শীতল হবে।'

পরদিবস বিজয়া দশমী, ১৮ই অক্টোবর। সকাল আটটার সময় ঠাকুর বিছানায় উপবিষ্ট। শ্রীযুক্ত মাষ্টার, নবগোপাল প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত উপস্থিত। বাড়ি থেকে সুরেন্দ্র ঠাকুরের নিকট পালিয়ে এলেন। আজ মা দুর্গাকে বিসর্জন দিতে হবে, তাই তাঁর মন খুবই খারাপ। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ঠাকুর বলছেন: 'মা হৃদয়ে থাকুন।' তাঁর তীব্র আর্তি ও ব্যাকুলতা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্রু বিসর্জন করছেন। পূর্বদিনের দর্শনের কথা তিনি সুরেন্দ্রকে বললেন: 'কাল ৭টা ৭॥টার সময় ভাবে দেখলাম, তোমাদের দালান। ঠাকুর-প্রতিমা রয়েছেন; এখানে ওখানে এক হ'য়ে আছে। যেন একটা আলোর স্রোত দু'জায়গার মাঝখানে বইছে!'

সুরেন্দ্র বললেন: আমি তখন ঠাকুরদালানে 'মা, মা' ব'লে ডাকছি। মনে উঠল—মা বলছেন, 'আমি আবার আসবো।'

বিজয়ের দর্শন-কথা

'ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক বিজয় এখন।
নানা দেশ নানা তীর্থ করিয়া ভ্রমণ॥
উপনীত এবে তেঁহ সহর ভিতরে।
আজি হেথা শ্রীপ্রভুর দরশন তরে॥'—পুঁথি

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শ্যামপুকুর-বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করতে এসেছেন। সঙ্গে কয়েকজন ব্রাহ্মভক্ত। গোস্বামীজী ঢাকায়

অনেক দিন ছিলেন। সম্প্রতি পশ্চিমে বহু তীর্থ ভ্রমণ ক'রে কলকাতায় এসেছেন। সেদিন রবিবার, ১০ই কার্তিক, ২৫শে অক্টোবর। বেলা প্রায় ৩টা ৩৷টা। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, মহিমা চক্রবর্তী, নবগোপাল, লাটু, ছোট নরেন্দ্র, মাষ্টার ভূপতি প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত। অনেক দিন পরে গোস্বামীজীর সাক্ষাৎলাভে সকলেই আনন্দিত।

শ্রীযুক্ত মহিমা চক্রবর্তী বিজয়কৃষ্ণকে তাঁর তীর্থভ্রমণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন: মহাশয়, তীর্থ ক'রে এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি দেখলেন, বলুন।

উত্তরে বিজয় বললেন: কি বলবো! দেখছি, যেখানে এখন বসে আছি, এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা! কোন কোন জায়গায় এরই এক আনা কি দু' আনা, কোথাও চার আনা, এই পর্যন্ত। এইখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখছি।

প্রসঙ্গতঃ তিনি আরও বললেন: ঢাকায় এঁকে (পরমহংসদেবকে) দেখেছি! গা ছুঁয়ে!*

ঢাকায় অবস্থানকালে শ্রীযুক্ত বিজয় একদিন ঘরে খিল দিয়ে ধ্যান করছিলেন, সেই সময়ে তিনি অভাবনীয়রূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। তাঁর ঐরূপ দর্শন মাথার খেয়াল না সত্য, তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টিপে ভালভাবে দেখেন এবং ঐ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন।

সেই কথাই তিনি আজ মুক্তকণ্ঠে ভক্তগণ-সমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বললেন: আমি আপনাকে ঢাকাতে এই আকারে দর্শন করেছি, এই শরীরে!—

একদিন নিরজনে ঢাকায় যখন।
আপনারে সশরীরে কৈনু দরশন ॥—পুঁথি

* 'কথামৃত'—১ম ভাগ, ১৬শ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ঠাকুর ঐ কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন—'সে তবে আর একজন।'

বিজয় করযোড়ে বললেন: ধরা না দিলে ধরা শক্ত। এইখানেই ষোল আনা, বুঝেছি আপনি কে? আর বলতে হবে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হ'য়ে গদ্‌গদকণ্ঠে বল-লেন—'যদি তা হ'য়ে থাকে, তো তাই'।

বিজয়কৃষ্ণ—'বুঝেছি'।

এত বলি চক্ষে বারি প্রেমে গদ হ'য়ে।
অভয়-চরণমূলে পড়িলা লুটিয়ে ॥
নিরখিয়া তাহা প্রভু হইয়া কেমন।
বিজয়ের বক্ষে দিলা দক্ষিণ চরণ॥
এখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্য আর নাই।
পুত্তলিকাবৎ জড় জগৎ-গোঁসাই ॥—পুঁথি

ঠাকুরের দিব্য প্রেমাবেশ ও ভাবাবস্থা দর্শন ক'রে উপস্থিত ভক্তগণেরও অনেকের ভাব হ'ল। ভাবে কেউ কাঁদছেন, কেউ বা স্তব করছেন। সকলেই একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে চেয়ে আছেন।

মিশ্রের দর্শন-কথা

আসিয়া জটিল এক ত্যাগী যোগিবর।
শ্যামল বরণ চক্ষু ডাগর ডাগর ॥
কোট-পেণ্টুলন-পরা টুপি আছে শিরে।
চাপ দাঁড়ি হাতে ছড়ি সুহাসি অধরে ॥
ভিতরে কৌপীন তাঁর বাসে আচ্ছাদন।
বাহ্যিক দেখিতে এক বাবুর মতন ॥
স্বভাবে চরিতে কিন্তু যোগীর আচার।
উপাধিতে মিশ্র তিনি প্রভু নাম তাঁর ॥—পুঁথি

৩১শে অক্টোবর, ১৬ই কার্তিক, শনিবার। বেলা প্রায় ১১টা। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, মাষ্টার, ছোট নরেন প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত। লোকমুখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমা শ্রবণ ক'রে শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল মিশ্র তাঁকে শ্যামপুকুর-বাটীতে দর্শন করতে এসেছেন। ইনি একজন খ্রীষ্টান ভক্ত,

—'কোয়েকার' (Quaker) সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁর জন্মস্থান পশ্চিমাঞ্চলে। কয়েক পুরুষ পূর্বে এঁরা কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

প্রভুদয়াল খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী হলেও নিত্য যোগ অভ্যাস করতেন। ঐরূপ যোগ-সাধনের ফলে তাঁর জ্যোতি-দর্শন হ'য়েছিল। পুরুষ-পরম্পরাগত চালচলন তিনি সযত্নে ধরে রেখেছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন এবং স্বপাকে নিত্য হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতেন।

যাহোক, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন ক'রে মিশ্র পরম আহ্লাদিত হলেন। একবার গিরিগুহায় নিভৃতে ধ্যানকালে তিনি এক অপূর্ব সৌম্যমূর্তি মহাপুরুষের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। সেই মূর্তি তাঁর হৃদয়ে সুস্পষ্ট অঙ্কিত ছিল। ঠাকুরকে দর্শনমাত্রই তিনি চিনতে পারলেন ইনিই সেই সৌম্য পুরুষ।

হৃদয়ে অঙ্কিত ছবি সদা জাগে মনে।
আর না দেখিতে পায় বসিলে ধিয়ানে॥
অনিমিষ আঁখি মিশ্র দেখিবারে পায়।
ধ্যানে দেখা সেই মূর্তি এই প্রভু রায়॥—পুঁথি

মিশ্র প্রসঙ্গক্রমে গদ্গদকণ্ঠে সমাগত ভক্তগণকে বললেন: আপনারা এঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) চিনতে পারছেন না। আমি আগে থেকে এঁকে দেখেছি—এখন সাক্ষাৎ দেখছি। দেখেছিলাম—একটি বাগান, উনি উপরে আসনে বসে আছেন; মেঝের উপর আর একজন ব'সে আছেন; তিনি তত advanced (উন্নত) নন।'*

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কিছু দেখতে পাও?'

মিশ্র বললেন—'আজ্ঞা, বাড়িতে যখন ছিলাম তখন থেকে জ্যোতি দর্শন হ'ত। তারপর যিশুকে দর্শন করেছি।'

* 'কথামৃত'—৪র্থ ভাগ, ৩০শ খণ্ড।

যোগিবরে প্রভু রায় করি নিরীক্ষণ।
দাঁড়াইয়া সমাধিতে হইল মগন॥—পুঁথি

ঠাকুর মিশ্রের কথা শুনে যিশুর ভাবাবেশে আবিষ্ট হ'য়ে গভীর সমাধিতে মগ্ন হলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হলেন এবং মিশ্রকে দেখে আনন্দে হাস্য করতে লাগলেন। ঠাকুর ঐরূপ অর্ধবাহ্যদশায় মিশ্রের সঙ্গে করমর্দন (shake hand) করছেন এবং সহাস্যে তাঁকে বলছেন—'তুমি যা চাইছ তা হ'য়ে যাবে।'

মিশ্র তখন যুক্তকরে পরম আবেগ ও ভক্তিভরে ঠাকুরকে বললেন—'আমি সেদিন থেকে মন, শরীর—সব আপনাকে দিয়েছি।'

সরল অন্তরে যেবা চায় ভগবানে।
সেই সে আসিয়া জুটে প্রভুর সদনে॥—পুঁথি,

ডাঃ সরকারকে কৃপা

শ্রীরামকৃষ্ণদেব চিকিৎসার্থ শ্যামপুকুরে আগমন করলে ভক্তগণ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের উপর তাঁর চিকিৎসার ভার অর্পণ করেন। মথুরবাবুর জীবদ্দশায় তাঁর পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য ডাঃ সরকার কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে যান। সেই সূত্রে তিনি সেখানে পরমহংসদেবের দর্শন পান এবং তাঁর সঙ্গে আলাপাদি করেন। ঠাকুরের গলরোগ পরীক্ষা করার জন্যও ডাঃ সরকার দক্ষিণেশ্বরে যান। দক্ষিণেশ্বরে (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) ঠাকুর ঐ প্রসঙ্গে স্বয়ং বলেন—'মহেন্দ্র সরকার দেখেছিল, কিন্তু জিভ্ এমন জোরে চেপেছিল যে ভারি যন্ত্রণা হয়েছিল…'

শ্যামপুকুরে ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে ডাঃ সরকার প্রায় নিত্যই আসতেন, এক একদিন তিনি ঠাকুরের সান্নিধ্যে বহুক্ষণ অতিবাহিত ক'রে যেতেন ও তাঁর কথামৃত পানে তিনি পরম আনন্দ লাভ করতেন। ক্রমশঃ তাঁদের উভয়ের মধ্যে নিবিড় হৃদ্যতা জন্মায়।

'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'পুঁথি' প্রভৃতি গ্রন্থে ডাঃ সরকারের সঙ্গে ঠাকুরের কথোপকথন ও পুণ্য লীলার মনোহর চিত্র অনেকগুলিই দেখা যায়। আমরা এখানে 'কথামৃতে'র মাত্র একটি চিত্র অনুধ্যান করছি :

১৬ই কার্তিক, ৩১শে অক্টোবর—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখতে এসেছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, মাষ্টার মশায় প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত। ঠাকুর ডাক্তারকে দেখতে দেখতে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়লেন। তিনি কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বলছেন, 'কারণানন্দের পর সচ্চিদানন্দ—কারণের কারণ।' ঠাকুর দিব্য-ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে হাসিমুখে গাইছেন :

সুরাপান করি না আমি,
সুধা খাই জয় কালী ব'লে,
মন-মাতালে মাতাল করে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে।

ঠাকুরের শ্রীমুখে সুমধুর সঙ্গীত শুনে ডাঃ সরকার ভাবাবিষ্ট। গান শেষ হ'তে না হতেই আবার ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁর চরণযুগল ডাক্তারের কোলে প্রসারিত করলেন। ডাক্তার সযত্নে আপনার কোলে ঠাকুরের অভয় পাদপদ্ম ধরে রাখেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ঐ ভাব প্রশমিত হ'লে আপনার চরণ গুটিয়ে নিলেন। তারপর তিনি নরেন্দ্রের গান শোনার জন্য ব্যাকুল হলেন। ঠাকুরের আজ্ঞামত নরেন্দ্র গাইলেন—

(১) 'হরিরস-মদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে।'
(২) 'চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।'
(৩) 'চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।'

নরেন্দ্রের সুমধুর গানগুলি শুনে ডাক্তার পরম আনন্দিত হলেন। ডাক্তারকে লক্ষ্য ক'রে ঠাকুর ভক্তগণকে বললেন, 'সেদিন মা দেখালে দুটি লোককে। ইনি তার ভিতর একজন। খুব জ্ঞান হবে দেখলাম,—কিন্তু শুষ্ক। (ডাক্তারকে সহাস্যে) কিন্তু তুমি র'সবে।'

পূজনীয় পুঁথিকার ডাক্তার সরকারের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছেন :

যে কার্য করিলা তেঁহ প্রভুর লীলায়।
বহি যদি শিরে জুতা শোধ নাহি যায়॥
রামকৃষ্ণ-পন্থীমাত্র তাঁর কাছে ঋণী।
বারে বারে বন্দি তাঁর চরণ দু'খানি॥—পুঁথি

বরাভয় মূর্তি ধারণ

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে দুর্গাপূজার মতো কালীপূজার সময়ও এক অপূর্ব ভাবের প্রকাশ লক্ষিত হয়। ভক্ত-বৃন্দ ঠাকুরের আজ্ঞায় ঐ বাটীতে সংক্ষেপে শ্যামাপূজার আয়োজন করেছেন। পূজা-দিবসে (৬ই নভেম্বর) পরমহংসদেব সকাল থেকেই জগন্মাতার ভাবে বিভোর হ'য়ে আছেন। ক্রমে সূর্য অস্তমিত হ'য়ে সন্ধ্যা নেমে এল। সমস্ত বাটী উজ্জ্বল দীপমালায় আলোকিত হ'ল। রাত্রি প্রায় সাতটা। ঠাকুর স্থিরভাবে তাঁর শয্যায় ব'সে আছেন। তিনি জগন্মাতার চিন্তায় নিমগ্ন। পূজার বিবিধ সামগ্রী এনে তাঁর শয্যার পূর্বদিকে রাখা হ'ল। ভক্তগণ দেবীর প্রতিমা, পট অথবা ঘট আনয়ন করেননি। সংক্ষেপে মায়ের পূজার আয়োজন হয়েছে।

ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান রয়েছে অথচ বহুক্ষণ স্থির ভাবে আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। প্রায় ত্রিশ জনেরও অধিক ভক্ত ঐ গৃহে উপস্থিত; কিন্তু গৃহমধ্য একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ। এক অপূর্ব ভাবগম্ভীর পরিবেশ! ভক্তবর রামচন্দ্র দত্ত তখন গিরিশবাবুকে বললেন, 'ঠাকুর আজ কৃপা ক'রে আমাদের পূজা গ্রহণ করবেন।' তাই বোধ হয় অপেক্ষায় উপবিষ্ট রয়েছেন। অমনি ভৈরব ভক্ত গিরিশচন্দ্র পুষ্পপাত্র থেকে

ফুলের মালা নিয়ে 'জয় মা, জয় মা' ব'লে ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্পণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দিব্য আবেশে ঠাকুরের সর্বাঙ্গ পুলকিত হ'য়ে উঠল। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে গভীর সমাধিতে মগ্ন হলেন। তাঁর করদ্বয়ে বরাভয়-মুদ্রা দেখা দিল। তাঁর প্রসন্ন প্রশান্ত মুখশ্রী দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'ল।

ভক্তগণ ঠাকুরের মধ্যে বরভয়করা জগন্মাতা কালিকার পরম আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করলেন। তখন সকলে মহোল্লাসে 'জয় মা, জয় মা' ব'লে তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। কেউ কেউ ভক্তিতে গদ্গদ হ'য়ে জগদম্বার মধুর স্তবস্তুতি পাঠ করলেন। এই ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহে জীবন্ত কালীর পূজার্চনা ক'রে তাঁরা তাঁর শুভাশীর্বাদ লাভে কৃতকৃতার্থ হলেন।

কেবা কালী, কেবা প্রভু, না পারি বুঝিতে।
কালীতে কেবল তিনি, মা কালী তাঁহাতে॥ পুঁথি

বিনোদিনীর কাণ্ড

গিরিশের রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী যত।
সকলেই প্রভুদেবে ভকতি করিত॥
তাহাদের মধ্যে যেবা বিনোদিনী নামে।
বিশেষ তাহার ভক্তি প্রভুর চরণে॥—পুঁথি

শ্যামপুকুর-বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন দেখেন,—তাঁর দেহ থেকে সূক্ষ্ম শরীর বের হ'য়ে গৃহমধ্যে বিচরণ করছে। তিনি ঐ সূক্ষ্মদেহের গলায় ও পিঠে অনেকগুলি ক্ষত লক্ষ্য করেন। জগন্মাতা তাঁকে জানিয়ে দেন—লোকেরা নানা কুকর্ম ক'রে তাঁর চরণকমল স্পর্শ ক'রে পাপ-মুক্ত হ'য়ে যাচ্ছে, তাদেরই অসহ্য পাপভারে তাঁর শরীরে ঐরূপ ক্ষত হয়েছে।

ঠাকুরের ঐ আশ্চর্য দর্শনের কথা শুনে সেবক-ভক্তগণ অতিশয় চিন্তিত ও বিচলিত হন। তাঁরা তখন স্থির করেন যে, তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত কাউকে তাঁর চরণ স্পর্শ করতে দেবেন না এবং নিজেরাও তা করবেন না। সেই হ'তে তাঁরা নতুন লোকদের আগমন নিবারণের চেষ্টা করতে লাগলেন। গিরিশবাবু তাঁদের বললেন, 'চেষ্টা করছ কর, কিন্তু তা সম্ভবপর নয়, কারণ উনি (ঠাকুর) যে ঐ জন্যই দেহ ধারণ করেছেন।'

অবশেষে দেখা গেল যে, ওরূপ করায় অপরিচিতদের আগমন বন্ধ হলেও ভক্তগণের পরিচিত নতুন লোকদের গতায়াত নিবারণ করা সম্ভবপর হ'ল না। শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ একদিন সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে হ্যাট-প্যাণ্ট-কোট-পরা জনৈক বন্ধুসহ শ্যামপুকুর বাটীতে এলেন। কালীপদর ঐ নতুন বন্ধুকে কেউ বাধা দিলেন না। বন্ধুটি তখন সটান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকটে গিয়ে আবেগভরে তাঁর চরণমূলে পতিত হ'য়ে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল।

অনেকের সঙ্গে দেখা পথের মাঝারে।
কেহই চিনিতে নাহি পারিল তাহারে॥
কিন্তু শ্রীগোচরে যেই মুহূর্তেক আসা।
চিনিয়া শ্রীপ্রভু তারে করিল জিজ্ঞাসা॥
কি রে তুই হেথা হেন বেশে কি কারণ।
উত্তরে কহিল-- প্রভু মাত্র দরশন॥—পুঁথি

কালীপদ ঘোষের এই বন্ধুটি আসলে পুরুষ নয়, মেয়ে। পুরুষের বেশে ভক্তদের ফাঁকি দিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছে। তার নাম বিনোদিনী। গিরিশবাবুর থিয়েটারের নাম-করা অভিনেত্রী। রঙ্গমঞ্চে ঠাকুর একবার তার সুনিপুণ অভিনয়-দর্শনে পরম প্রীত হন এবং তার অভিনয়-দক্ষতার প্রশংসা করেন। এ দিনের অভিনয়ও তার কম দক্ষতার পরিচায়ক নয়!

আজি তার ভক্তিভাবে ভরিল অন্তর।
নিরখিয়া দীনবন্ধু লীলার ঈশ্বর॥—পুঁথি

ভক্তমেলা

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ (লীলাপ্রসঙ্গ—দিব্যভাবে) লিখেছেনঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘরূপ মহীরুহ দক্ষিণেশ্বরে অঙ্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে উহা নিজ আকার ধারণপূর্বক এত বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল যে ভক্তগণের অনেকে তখন স্থির করিয়াছিলেন, ঐ বিষয়ে সাফল্য আনয়নই ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির অন্যতম কারণ।'

শ্যামপুকুর-বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থানকালে শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য সেখানে এসেছিলেন। নরেন্দ্রাদি চিহ্নিত পার্ষদগণ, স্ত্রীপুরুষ ভক্তগণ ও অনুরাগিগণ ছাড়া, আরও কত শত নরনারী যে ঠাকুরের পুণ্য দর্শন লাভের জন্য এই বাটীতে এসেছিলেন তা নির্ণয় করা অসম্ভব। দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়া যাদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না, তাদের ধর্মালোক প্রদানের জন্যই যেন ঠাকুর অপার করুণাবশে স্বয়ং তাদের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কাশীপুর যাত্রা

'সশঙ্কিত চিত্ত এবে ডাক্তার প্রধান।
স্থান-পরিবর্তনের দিলেন বিধান॥'—পুঁথি

শ্যামপুকুর-বাটীতে বহু চিকিৎসায় এবং যত্নে যখন আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না, তখন ডাক্তার বললেনঃ কলকাতার রুদ্ধ দূষিত বায়ুর জন্যই এইরূপ ছে। শহরের বাইরে উন্মুক্ত স্থানে কোন বাগানবাড়িতে এখন ঠাকুরকে রাখা আবশ্যক।

ভক্তগণ তখন চেষ্টা ক'রে কাশীপুরে গোপাল চন্দ্র ঘোষের উদ্যান-বাটীটি ঐ উদ্দেশ্যে মাসিক ৮০ টাকায় ভাড়া নেন। ঠাকুর ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৮৫ (২৭শে অগ্রহায়ণ) শুক্রবার, শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্যামপুকুর-বাটী হ'তে কাশীপুর-উদ্যানে যাত্রা করেন।*

* এই প্রবন্ধের তিথি ও তারিখগুলি 'কথামৃত' অবলম্বনে লিখিত।

ধ্রুব-কৃত ভগবৎ-স্তুতি

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥

* * *

যে পুরুষ সকল জ্ঞান শক্তি ধারণ করেন, যিনি আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া প্রসুপ্ত বাক্‌শক্তিকে, কর-চরণ-কর্ণ-ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে এবং প্রাণকেও সঞ্জীবিত করিতেছেন, আপনি সেই পরমপুরুষ ভগবান, আপনাকে নমস্কার। (শ্রীমদ্ভাগবত—৪।৯।৬)

প্রেমানন্দ-পুণ্যস্মৃতি

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

১৯১৪ খৃঃ মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরাট উৎসবে যোগদান করিয়া বিমলানন্দ লাভ করিলাম। আমরা শনিবার দিনই মঠে রাত্রিতে পৌঁছিয়াছিলাম এবং সমস্ত রাত্রি উৎসবের কাজ করিয়াছিলাম। মঠে এই আমার প্রথম যাওয়া, সাধুদের সঙ্গে কোন পরিচয় নাই। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতেছি, এমন সময় পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আসিয়া পাচক ব্রাহ্মণদের বলিতেছেন, 'এ কি! কাঠগুলি পোড়াচ্ছ—কোন কড়া চাপাও নাই, এ কি ক্ষতির মাল পেয়েছ?' আমি তো শুনিয়াই অবাক্। সাধুদের এত কড়া নজর যে সামান্য কাঠ পুড়িয়া যাইতেছে—ইহাও তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে না। সমস্ত দিন উৎসব ও সাধুদের কর্মকুশলতা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। লক্ষ লক্ষ লোক উৎসবে যোগদান করিয়াছেন, সমস্তই অতি নিপুণতার সহিত হইয়া যাইতেছে।

১৯১৬ খৃঃ জানুআরি মাসে দ্বিতীয়বার পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে দর্শন করি ময়মনসিংহে শ্রীযুক্ত জিতেন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে; তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাজের পূত সঙ্গ লাভ করিয়া বুঝিয়াছিলাম, তিনি ভক্তদের মঙ্গলের জন্য সর্বদাই আগ্রহান্বিত। তাঁহার মত সরল ও অহেতুক ভালবাসা জীবনে আর দেখি নাই।

১৯১৭ খৃঃ পুনরায় মঠে আসিয়া তাঁহার পুণ্য দর্শন লাভ করিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তাঁহার নিরভিমানতা দেখিবার মতো ছিল। একদিন তিনি মঠের পশ্চিম দিকের বারান্দায় লম্বা বেঞ্চে বসিয়া আছেন, এমন সময় নোয়াখালি জেলার দুইটি ছেলে মঠে আসিয়া পশ্চিম দিকের বারান্দায় দাঁড়াইল। তাঁহাদের সঙ্গে দুইটি পুঁটলি (বোঁচকা) ও দুইটি বদনা। উপস্থিত কেহ কেহ বদনা দুইটি দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বাবুরাম মহারাজ কিন্তু একটুও হাসিলেন না। মনে হইল ঐ ছেলে দুইটি এই প্রথম মঠে আসিয়াছে। বাবুরাম মহারাজ আমাকে বলিলেন, 'যা, এদের মঠের সব দেখিয়ে নিয়ে আয়।' আমি তাঁহার আদেশানুসারে মঠের সব দেখাইয়া নিয়া আসিলাম। বাবুরাম মহারাজ এইবার উহাদের দুপুরে প্রসাদ পাইবার কথা বলিলেন। তাহারাও প্রসাদ পাইবে জানিয়া আনন্দিত হইল।

তাহাদের লক্ষ্য করিয়া পূজনীয় মহারাজ বলিলেন, 'তোমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের বই পড়েছ?' তাহারা বলিল, 'হাঁ, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বই কিছু কিছু পড়িয়াছি।' মহারাজ আবার বলিলেন, 'দেখ্, একেবারে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তোরা ধরতে পারবি না। ঠাকুরকে বুঝতে হ'লে স্বামীজীকে ধরতে হবে। স্বামীজীর মধ্য দিয়ে ঠাকুরকে বুঝতে হবে। স্বামীজীর বইগুলি খুব ভাল ক'রে পড়্। তাতে মনে খুব জোর আসবে। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি সব কথাই তাঁর বইএ আছে। এ যুগে স্বামীজীই তোদের আদর্শ। এমন আদর্শ তোরা আর কোথাও খুঁজে পাবি না। তিনি জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন—যাতে মানুষ প্রকৃত 'মানুষ' হ'য়ে জীবন কাটাতে পারে। তোদের এখন অনেক কাজ করতে হবে। প্রথমে চাই ব্রহ্মচর্য, তার পরেই সেবাধর্মের কাজ করতে হবে। তবেই ঠিক ঠিক মানুষ হ'তে পারবি।'

কথাগুলি এমনভাবে বলিয়া গেলেন যে সকলেরই প্রাণে কর্মশক্তি আসিল। সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্নান করিতে গেলাম। মহারাজ আমাকে বলিলেন, 'যা, এই নূতন ছেলে দুটির খোঁজখবর কর্, ওরা সবে মঠে নতুন এসেছে. কিছু জানে না।'

*   *   *

১৯১৭ খৃঃ মার্চ মাসে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের দেশে জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। ওখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বাবুরাম মহারাজকে দর্শন করি এবং শ্রীশ্রীমা অসুখ অবস্থাতেও আমাদের কৃপা করিয়াছেন, বিস্তৃত সব বলিলাম। এখন যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির তাহারই নিকট দাঁড়াইয়া মহারাজ মঠের গরুগুলির দেখাশোনা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অহেতুক কৃপার কথা শুনিয়া বলিলেন: কি আর বলব—কৃপা, কৃপা, কৃপা! (এই বলিয়া হাতে জপ করিতে লাগিলেন) দেখ্ মায়ের এই কৃপার কথা যেন তোর মনে থাকে, বেইমান হোস্‌নি। মা যে কি—পরে বুঝবি। এখন আমাদের কারো বুঝবার সাধ্য নেই, তিনি পরে তোদের কৃপা ক'রে বোঝাবেন। এখন কেবল তাঁহার কথা স্মরণ করে যা। আহা! লোক-কল্যাণের জন্য তিনি কিই না করেছেন! নিজের সর্বসুখ বিসর্জন দিয়েছেন।' শ্রীশ্রীমায়ের কথা বলিতে বলিতে একেবারে মাতিয়া গেলেন। আমার মনে হইল, মায়ের মাহাত্ম্য যেন বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মুখে শ্রীশ্রীমায়ের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, শ্রীশ্রীমাই যেন তাঁহার মাহাত্ম্য শুনাইবার জন্য পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বিশ্বময়ী

শ্রীশান্তশীল দাশ

কোথায় মা তোর আগমন, আর কোথায় বিসর্জন!
তুই যে মাগো বিশ্বমাঝে আছিস্ অনুক্ষণ।
আসা-যাওয়া সবার আছে;
মাগো, সেতো তোরই কাছে—
আসনটি তোর নিত্য পাতা, সে যে চিরন্তন;
কোথায় মা তোর আগমন, আর কোথায় বিসর্জন!

আনন্দে গান গেয়ে উঠি, 'এলি মা তুই' ব'লে;
'চলে গেলি' ব'লে আবার ভাসি নয়নজলে।
অলক্ষ্যে তোর আসন থেকে,
হাসিস্ বুঝি এ সব দেখে—
কান্না-হাসি দেখে শিশুর মা হাসে যেমন;
কোথায় মা তোর আগমন, আর কোথায় বিসর্জন!

সমালোচনা

Philosophy and Religion (Revised Edition) by Swami Abhedananda, Published by Ramakrishna Vedanta Math, Calcutta—6. Pp. 209+12, Demy size. Price Rs. 6·50 np.

দর্শন বা ধর্মপুস্তক কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের দ্বারাই রচিত হইলে কোথায় যেন একটা ফাঁক থাকিয়া যায়। কিন্তু ঐ সব পুস্তক রচনায় যদি পাণ্ডিত্যের সঙ্গে নিজস্ব উপলব্ধির গঙ্গাযমুনা সঙ্গম হয়, তাহা হইলে উহা এক তীর্থক্ষেত্রের পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়া পাঠককে সেই তীর্থস্নানে পূত ও পরিচ্ছন্ন করিয়া উপলব্ধির কেমন এক অননুভূতপূর্ব আস্বাদনের রস যোগায়। আলোচ্য পুস্তকটিতে আমরা সেই সঙ্গমস্নানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ (কালী-তপস্বী) একদিকে যেমন তাঁর দিব্য গুরুর সান্নিধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি আবার নিয়ত পাঠে ব্যাপৃত থাকিয়া শাস্ত্রজ্ঞানের আহরণেও যত্নবান্ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে সর্ববিধ জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া বেদান্তকে বর্তমানের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংকলন-গ্রন্থটির ১৪টি অনুচ্ছেদে ও দুইটি পরিশিষ্টে ধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন দিক—যথা: দর্শনের অর্থ, দর্শনের সহিত ধর্মের যথার্থ যোগ, বেদান্তদর্শন, হিন্দুধর্ম কি? দর্শনবিচারে পাপ ও পুণ্য, আমাদের পরিত্রাতা, ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রভৃতি বিষয়-ব্যাখ্যায় নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্য পাঠকচিত্তকে সহজেই মুগ্ধ করে। পুস্তকটির সংকলন-কার্যও সুষ্ঠু এবং সুন্দর হইয়াছে। বিভিন্ন বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে গ্রথিত হইলেও ইহাতে একটি পরিচ্ছন্ন মিলনসূত্র অব্যাহত আছে। সুন্দর ছাপা ও বাঁধাইকরা এই পুস্তকটির আমরা বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

—মহানন্দ

নির্গ্রন্থ-প্রবচন (বঙ্গানুবাদ-সহ): প্রণেতা —ভগবান মহাবীর: অনুবাদক—ধর্মরাজ শর্মা, সাহিত্যরত্ন। প্রকাশক: দিবাকর দিব্যজ্যোতি কার্যালয়, ব্যাবর (আজমীর)। পৃষ্ঠা ১৭৭+৭; মূল্যের উল্লেখ নাই।

ধর্মভূমি ভারতে বিভিন্ন ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছে, যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন ধর্মমত পাশাপাশি রহিয়াছে, ধর্ম লইয়া বিচার-বিতর্কও হইয়াছে, কিন্তু অন্য ধর্মকে লুপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে রক্তারক্তি হয় নাই, কারণ প্রেম ও মৈত্রীই ভারতীয় ধর্মের প্রাণ। ধর্মান্ধতা এদেশের ধর্মে খুবই কম।

বাংলাদেশ এক সময় বৌদ্ধধর্মে প্লাবিত হইয়াছিল, কাহারও কাহারও মতে তৎপূর্বে এখানে জৈনধর্ম প্রসারলাভ করিয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি-স্থল মগধ হইলেও বাংলায় এই দুই ধর্মের বিলক্ষণ প্রসার হইয়াছিল। এই হিসাবে বাংলা ও মগধ একই সূত্রে গাঁথা, সেইজন্য বাঙালী মাত্রেরই এই উদার ধর্ম দুইটির সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

ভগবান মহাবীর-প্রবর্তিত ধর্ম জৈনধর্ম নামে খ্যাত। মহাবীরের দিব্য বাণীর অনুপম সংগ্রহ-গ্রন্থ নির্গ্রন্থ-প্রবচন। হিন্দুগণের নিকট যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আদরণীয়, বৌদ্ধগণের নিকট যেরূপ 'ধম্মপদ' আদরের বস্তু, জৈনধর্মাবলম্বীদিগের 'নির্গ্রন্থ-প্রবচন' তেমনি প্রাণের জিনিস। এই গ্রন্থপাঠে জৈনধর্মের স্বরূপ ও আদর্শ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হইবে। ১৮টি অধ্যায়ে দ্রব্য, কর্ম, ধর্ম, আত্মশুদ্ধি, জ্ঞান, ব্রহ্মচর্য, প্রমাদ, ভাষা, কষায়, বৈরাগ্য, মোক্ষ প্রভৃতি দুরূহ বিষয় আলোচিত। মূল গ্রন্থ পালি ভাষায় রচিত। অনুবাদ সর্বত্র সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলা যায় না, তবে বাংলায় এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ এই প্রথম, সেইজন্য অনুবাদকের এই সাধু প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য, তিনি বঙ্গভাষাভাষীদিগকে মহাবীরের দিব্য বাণীর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।

—জীবানন্দ

নব জ্ঞান-ভারতী ঃ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত, প্রকাশক—জেনারেল প্রিন্টার্স, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ৬১২+৮; মূল্য—রেক্সিন-বাঁধাই ২০৲, বোর্ড-বাঁধাই ১৫৲।

বহুদিন হইতেই বাংলা সাহিত্যে এইরূপ একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সে অভাব দূর করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। এই বৃহৎ গ্রন্থখানি তাঁহার পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

'নব জ্ঞান-ভারতী' বাংলা ভাষায় ভৌগোলিক কোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া। এই গ্রন্থমধ্যে পৃথিবীর নানা দেশ, নদী, হ্রদ, পর্বত, নগর, ঐতিহাসিক স্থান বর্ণানুক্রমিক ভাবে সন্নিবেশিত। ইতিহাসে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, অথচ নূতন নূতন রাজনৈতিক বিপ্লবের কারণে সেই সব নাম পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের নাম আধুনিক মানচিত্রে পাওয়া যায় না—এই শ্রেণীর কতকগুলি নামও পুস্তকে স্থানলাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশের জেলা, মহকুমা, থানা, শহর, নদী, তীর্থ, শিল্পস্থান প্রভৃতির পরিচিতি বিশেষভাবে উল্লিখিত। বাংলা ভাষার ভৌগোলিক অভিধানে বাংলা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ভৌগোলিক বিষয়গুলির স্থান হওয়ায় পুস্তকের মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে একটি ত্রুটি লক্ষণীয়, ভৌগোলিক কোষগ্রন্থে উপযুক্ত স্থানে—অন্ততঃ শেষে কয়েকখানি মানচিত্র থাকিলে খুবই ভাল হইত, অবশ্য সেক্ষেত্রে মূল্যও বৃদ্ধি পাইত; যাহা হউক পরবর্তী সংস্করণে এবিষয়ে গ্রন্থকার ও প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

স্বামী নির্বেদানন্দ—জীবনী ও রচনাদি-সংগ্রহ ঃ প্রকাশক স্বামী সন্তোষানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্ট্‌স্ হোম, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১৮৩+৭৯ ; মূল্য পাঁচ টাকা।

পুস্তকের প্রারম্ভে স্বামী নির্বেদানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী (৫৮ পৃঃ) সন্নিবেশিত, তাহাতে তাঁহার সাধনাময় কর্মজীবনের ও মহৎ চরিত্রের একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ড রচনা-সংগ্রহ, তাহাতে স্বামী নির্বেদানন্দের বাংলায় ১২টি এবং ইংরেজীতে ১২টি রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঃ পথের আলোক, 'আমি'র সন্ধানে, বহিঃপ্রকৃতি ও মন, রসস্বপ্নে রবীন্দ্রনাথ (রম্য রচনা ,) ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, জগতের ভাবী সভ্যতা, Peace or pleasure ? Bearing of Hinduism on International Peace, Sri Ramakrishna (radio script), School Discipline. এতদ্ব্যতীত বাংলায় ও ইংরেজীতে লিখিত কয়েকটি পত্র এবং একটি গান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

Thus spake Sri Krishna—compiled by Swami Suddhasatwananda, Published by the President of Ramakrishna Math, Mylapore, Madras 4, Pp. 102 ; Price : 40 np. ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী গীতা ও ভাগবত হইতে সংগ্রহ করিয়া ইংরেজী এই পকেট সংস্করণ গ্রন্থখানি প্রকাশিত।

Contents : Sri Krishna ; Swami Vivekananda on Sri Krishna ; Jnana-Yoga ; Self ; Signs of Sthitaprajna ; Bhakti-Yoga ; Self-surrender ; Dhyana-Yoga ; Karma-Yoga ; The three Gunas ; The triple Division ; etc.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলা, বোম্বাই ও আসাম রাজ্যে বন্যার জন্য গত মাসে যে সকল কেন্দ্র হইতে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সেবাকার্য আরম্ভ হইয়াছে, অর্থ ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভাবে তাহা এখনও চলিতেছে।

বাংলায়ঃ

সেবাপরিচালন-কেন্দ্র	জেলা	গ্রাম সংখ্যা
নরেন্দ্রপুর	২৪ পরগনা	১৩
	মেদিনীপুর	৬
সারদাপীঠ, বেলুড়	হাওড়া	১৮
আসানসোল	বর্ধমান	১৮

এ পর্যন্ত প্রদত্ত জিনিসপত্র ও তাহার পরিমাণ

চাল ও আটা	৩৬৭ মণ
ডাল	৯৭ মণ
গুঁড়া দুধ	৫,৬৮৭ পাউণ্ড
দেশলাই	১,৬০৬ বাক্স
নূতন ধুতি শাড়ী	৪১৬ খানি

ইহা ছাড়া বহু পুরাতন কাপড়, কম্বল এবং কেরোসিন ও সরিষার তৈল, আলু, লবণ, গুড়, চিঁড়া, রুটি—প্রয়োজনের ক্ষেত্রে গৃহনির্মাণের জন্য বাঁশ, দড়ি, খড় প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে।

সারদাপীঠ-কেন্দ্র ১১৯৪ ব্যক্তিকে T.A.B.C. ইঞ্জেক্শন দিয়াছেন এবং ১০৬ জন রোগীর সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বোম্বাই ঃ বোম্বাই আশ্রম-পরিচালিত এখানকার সেবাকার্যে প্রধানতঃ গৃহনির্মাণ ও পুনর্বাসনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, সমগ্র সেবাকার্যে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

		পরিবার-সংখ্যা	গ্রাম-সংখ্যা
ভুজ (শহরে)	পুনর্বাসন	১০০	×
কচ্ছ	গৃহনির্মাণ	৩,৪৫০	২৭৬
সুরাট	"	৫,০০০	৮০

আসাম ঃ কাছাড়জেলার শোনবিলে টেষ্ট রিলিফ কার্য চলিতেছে করিমগঞ্জ-কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে।

* * *

মাদ্রাজ ঃ মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন রিলিফের সচিত্র বিবরণী পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

(১) ঘূর্ণিবাত্যা-সেবাকার্য ও পুনর্বাসন

৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৫ রাত্রে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যায় মাদ্রাজের তাঞ্জোর ও রমানাথপুরম্ জেলার অধিবাসিবৃন্দ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন রিলিফ-কার্য আরম্ভ করেন। তিনটি তালুকে রিলিফের পর সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে কলোনি নির্মাণ করা হয়। সেতুপতি বিবেকানন্দ-পুরম্ এবং শিবানন্দপুরম্ নামে দুইটি কলোনির নির্মাণকার্যে ২৫,০০০ টাকা ব্যয় হয়। অধিকন্তু রামানাদ জেলায় ১৬২১টি কুটির-নির্মাণে ৩৮,০০০ টাকা লাগে।

বেদারণ্যম্ ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে যে সেবাকার্য করা হয় তাহাতে ২৪০ জন স্বেচ্ছা-সেবক সহ মিশনের কর্মীরা জামাকাপড়, বাসন, গুঁড়া দুধ, বাড়ী তৈয়ারীর জন্য জিনিসপত্র বিতরণ করেন। দুইজন অভিজ্ঞ নার্স ও কয়েকজন কর্মী গ্রামে গ্রামে যাইয়া ঔষধপত্রাদি দ্বারা রোগী-দিগের পরিচর্যা করেন। রিলিফ-ক্যাম্পে একটি অস্থায়ী চিকিৎসালয় খোলা হয়, উহাতে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ৫৮৯ রোগীর চিকিৎসা করেন। ঘূর্ণিবাত্যায় বিশেষভাবে আহত ব্যক্তি-দিগকে তাঞ্জোর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

২,১০০ মণ চাল রান্না করিয়া ৩,৬০,০০০ লোককে খাওয়ানো হয়। ৭৫,৭০০ খানি নূতন এবং ৬৫,৫৪০ খানি পুরাতন কাপড় বিতরণ করা হয়। ৯৮৯টি বিদ্যার্থীকে পোষাক-পরিচ্ছদ, শ্লেট, পেন্সিল প্রভৃতি দেওয়া হয়।

প্রাথমিক রিলিফ শেষ হইলে পুনর্বাসন-কার্য আরম্ভ হয়। এই গ্রামের ২০০টি পরিবারের পুনর্বাসন-ব্যবস্থা মিশনকে করিতে হয়। প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য টালির ছাদবিশিষ্ট ১০´×৮´ ফুটের শয়নগৃহ, ধোঁয়াশূন্য উনানবিশিষ্ট স্বতন্ত্র রান্নাঘর নির্মাণ করা হয়। পানীয় জলের জন্য ১০টি নলকূপ তৈয়ার করা হয়। এই সাইক্লোন রিলিফ-কার্য ও কলোনি-নির্মাণে মোট ৫,২৫,৭৩৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

(২) দাঙ্গা

১৯৫৭, সেপ্টেম্বরে রামনাথপুরম্ জেলায় ভীষণ দাঙ্গার ফলে ৪টি তালুক ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে মিশন ৪.১০.৫৭ হইতে ২৮.১২.৫৭ পর্যন্ত ১২৪টি গ্রামে ৩,২৫২ পরিবারের মধ্যে সেবাকার্য করেন এবং ৪৫টি গ্রামে ১,২২৩ গৃহ পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন।

(৩) বন্যা

নেলোর জেলায় বন্যায় মিশন-পরিচালিত রিলিফ-কার্যে (১৯৫৭-৫৮) ৫৫টি গ্রামে ২,৭০৭ পরিবারকে ৩,৭৯৫ ধুতি, ৩,৯২১ শাড়ী, ২,৪১০ ছোটদের জামা-প্যাণ্ট, ১,২৯১ তোয়ালে, ১৭৭ জ্যাকেট, ১,৮০০ কম্বল, ২,৫৯৬ মাদুর, ৭,৪৪১ পুরাতন কাপড়, ৯,১১৫ এলুমিনিয়াম পাত্র, ৩,৬৬৫ মন চাল এবং ১,৫০০ দেওয়াল-ল্যাম্প বিতরণ করা হয়। জিনিসপত্র ছাড়া এই সেবাকার্যে ৪৫,৭৫৭ টাকা নগদ ব্যয় হয়।

কার্যবিবরণী

এলাহাবাদঃ ৫০ বৎসর পূর্বে ১৯১০ খৃঃ পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ কর্তৃক এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জ এলাকায় এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত সেবাশ্রমের বর্তমান কর্মধারা: (১) বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়, (২) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, (৩) ক্লাস ও বক্তৃতার মাধ্যমে সর্বজনীন ধর্মপ্রচার।

চিকিৎসালয়ে '৫৭ ও '৫৮ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ৩৭,০৭৯ ও ৪১,১১৯ রোগী চিকিৎসিত হয়। পৌর-প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু বার্ষিক সাহায্য করিয়া থাকেন।

লাইব্রেরিতে বর্তমানে ৫৪৬৫ খানি মূল্যবান্ পুস্তক আছে। ১৯৫৮ খৃঃ ৯৫০টি পুস্তক পঠনার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল। পাঠাগারে ২২টি পত্র-পত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়। সম্প্রতি শিশুবিভাগ খোলা হইয়াছে। ১৯৫৭ খৃঃ ৭৫,৪৮৮ টাকা ব্যয়ে লাইব্রেরির নূতন ভবনের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর কর্তৃক ১৯.১০.৫৮ তারিখে ইহার উদ্বোধন হয়

রামনবমী, জন্মাষ্টমী, বুদ্ধজয়ন্তী, খৃষ্ট জন্মদিন যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব বিশেষ পূজা-হোম, ভজন ও কীর্তন সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়।

চিকিৎসালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য দুইটি গৃহের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে, ইহার জন্য ১৭,০০০ টাকা আবশ্যক।

রাঁচিঃ রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা-আরোগ্য ভবনের ১৯৫৮ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই স্যানাটোরিয়ামটি রাঁচি শহর হইতে দশ মাইল দূরে রাঁচি-চাইবাসা রোডের পার্শ্বে অবস্থিত। স্বাস্থ্যকর সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে—২,১০০ ফুট উচ্চতায় প্রায় ২৭৯ একর পরিমিত অরণ্যময় ভূখণ্ডের উপর এই আরোগ্য-ভবন গড়িয়া উঠিতেছে। এখান হইতে কলিকাতা ও পাটনার দূরত্ব যথাক্রমে ২৬০ ও ২২০

মাইল। বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন (রাঁচি ২৪৮) ও জলাধারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৩৯ খৃঃ পরিকল্পিত হইলেও ১৯৫১ খৃঃ ৫২টি শয্যা (bed) লইয়া প্রতিষ্ঠানটির সূচনা হয়। ৮ বৎসরের মধ্যে ইহা আধুনিক একটি পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য-ভবনে পরিণত হইয়াছে। ইহা ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট যক্ষ্মা-চিকিৎসাকেন্দ্র।

১৮টি কেবিন ও ১৪টি কটেজ সহ বর্তমানে মোট শয্যা-সংখ্যা ১৮০ (৩২টি দরিদ্র রোগীদের জন্য সংরক্ষিত)।

এখানে দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগের আধুনিকতম ফুসফুস-অস্ত্রোপচারসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থাদি আছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসাকার্যে নিযুক্ত আছেন। কর্মী, চিকিৎসক ও রোগীসহ এখানে মোট চারশত জন লোক থাকে।

১৯৫৮ খৃঃ ৩৩২টি (পূর্ব বৎসরের ১৫৬) রোগী চিকিৎসিত হয়, ইহার মধ্যে ৬৬টি বিনা ব্যয়ে এবং ৩১টি আংশিক ব্যয়ে।

আলোচ্য বর্ষে নূতন পাকশালা, সংগ্রহ-ভবন কর্মী-ভবন এবং আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের শিল্প-ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে। জল-সরবরাহ ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১০টি শয্যা-সংযোগের কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসায় কঠিন যক্ষ্মা-রোগের কবল হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত আগ্রহশীল কতিপয় ব্যক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া আরোগ্য ভবনেই বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে। রোগমুক্ত ব্যক্তিদিগকে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নির্মীয়মাণ কলোনির সার্থক রূপায়ণে সরকার ও বদান্য ব্যক্তিগণের সহৃদয় সহযোগিতা প্রয়োজন।

সারদাপীঠ (বেলুড়): মিশন পরিচালিত শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যে ও ব্যাপকতায় সারদাপীঠ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। সারদাপীঠের প্রধান ৫টি বিভাগ: বিদ্যামন্দির, শিল্পমন্দির, তত্ত্বমন্দির, জনশিক্ষা-মন্দির, এবং সমাজশিক্ষণকেন্দ্র (S.E.O.T.C)। সারদাপীঠের ১৯৫৮ খৃঃ সুমুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত।

(১) বিদ্যামন্দির

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে স্থাপিত আবাসিক কলেজ বিদ্যামন্দির ইহার প্রতিষ্ঠা-বর্ষ (১৯৪১ খৃঃ) হইতেই উৎকৃষ্ট পরীক্ষাফলের জন্য জনসাধারণের ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিদ্যামন্দিরে ২১৩জন ছাত্র ছিল, ২৬জন অভিজ্ঞ অধ্যাপক (৬ জন সাধু) তাহাদের শিক্ষাদান ও তত্ত্বাবধান করেন। ১৯৬০খৃঃ হইতে বিদ্যামন্দির তিন বৎসরের ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হইবে। সাধারণ শিক্ষানুষ্ঠানের সহিত ছাত্র-পরিষদের উদ্যোগে প্রার্থনা, পূজা, জাতীয় উৎসব, বিতর্ক ও সাহিত্যসভা, পত্রিকা-প্রকাশ, ছুটিতে বিভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ অভিযান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

(২) শিল্পমন্দির

শিল্পমন্দিরের ৩টি বিভাগ: ইঞ্জিনিয়রিং, টেকনিক্যাল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল। ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগে ১৯৫২-৫৫খৃঃ পর্যন্ত জুনিয়র ডিপ্লোমা কোর্স শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ বা তদূর্ধ্ব শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদিগকে উচ্চতর শিল্পশিক্ষা দিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় তিন বৎসরের সিনিয়র ডিপ্লোমা কোর্স বা লাইসেন্সিয়েট ইঞ্জিনিয়রিং চালু করা হইয়াছে। এখানে সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ সিভিল (L.C.E.), মেকানিক্যাল (L.M.E.) ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল (L.E.E.)

ইঞ্জিনিয়রিং শিক্ষা দেন। শিল্পমন্দিরের ছাত্রাবাসে এ বৎসর ১৩৫ জন ছাত্র ছিল।

শ্রমশিল্প-বিভাগে বয়ন ও রঞ্জন-শিল্প, খেলনা-তৈয়ার এবং কাঠের ও দর্জির কাজ শেখানো হয়। শিল্প-বিভাগের বিক্রয়কেন্দ্রে শ্রমশিল্প ও যন্ত্র-শিল্প-জাত দ্রব্যাদি সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

শিল্প-বিভাগে একটি গবেষণাগার আছে, সেখান হইতে উদ্ভাবিত গোময়-গ্যাস প্ল্যাণ্ট, পেট্রল-গ্যাস প্ল্যাণ্ট, ইলেক্ট্রিক ক্লক ও অটো-মেটিক তাঁত উল্লেখযোগ্য; ইহাদের মধ্যে কতক-গুলি সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে প্রশংসিত।

(৩) তত্ত্বমন্দির

ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার উদ্দেশ্যে তত্ত্বমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার চতুষ্পাঠীতে সারদাপীঠের কর্মিগণ বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ভারতের জাতীয় আদর্শ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বাহক সংস্কৃত ভাষাকে মর্যাদা দিবার উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দের মহতী ইচ্ছা রূপায়িত করি-বার জন্য বেলুড় মঠের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করা হই-তেছে। তত্ত্বমন্দিরে মাঝে মাঝে সর্বসাধারণের জন্য ধর্মসভার ব্যবস্থা করা হয়।

(৪) জনশিক্ষা-মন্দির

জনশিক্ষা-মন্দিরের প্রধান কাজ দেশের বিভিন্ন অংশে 'ত্যাগ ও সেবা'র আদর্শে উপযুক্ত কর্মী ও দেশসেবক গড়িয়া তোলা। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, চলচ্চিত্র ও শিক্ষা-শিবিরের মাধ্যমে ইহার কাজ ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে।

স্নাতকোত্তর সমাজ-শিক্ষা-শিক্ষণকেন্দ্র (S.E.O.T.C.) খোলা হইয়াছে (১৯৫৬ খৃঃ); এখানে গ্রাজুয়েট ছাত্রগণ সমাজ, গ্রামোন্নয়ন, স্বাস্থ্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, মনস্তত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষালাভ করেন; প্রায়োগিক শিক্ষার উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে দুইবারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৭৭ জন সমাজসেবী শিক্ষা পাইয়াছে।

(৫) শিক্ষামন্দির

শিক্ষামন্দির বা আবাসিক B. T. Collegeএ আলোচ্যবর্ষে ৪৬ জন শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

* * *

সারদাপীঠের আরও কয়েকটি বিভাগ: ফটোগ্রাফিক, গোপালন, কৃষি ও পুস্তক-প্রকাশন। সারদাপীঠ হইতে প্রকাশিত বার্ষিক ও সাময়িক পত্রিকা: বিদ্যামন্দির (কলেজের), ত্রয়ী (শিল্পমন্দিরের), চরৈবেতি (জনশিক্ষা-মন্দিরের), অনির্বাণ ও মাসিক বুলেটিন (S.E.O.T.C.)।

বলরাম-মন্দির (কলিকাতা):

প্রতি শনিবার পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল—

	বিষয়	বক্তা
আগষ্ট:	গীতা	স্বামী সাধনানন্দ
	যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ	„ জীবানন্দ
	ভারতীয় সংস্কৃতি	„ মহানন্দ
	বিবেকানন্দ	অধ্যাপক প্রমথনাথ দে
	শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	স্বামী দেবানন্দ
সেপ্টেম্বর:	ভাগবত	„ জীবানন্দ
	শ্রীশ্রীমা	ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
	মহাভারত	অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী
	শ্রীশ্রীচণ্ডী-কথকতা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসব

রহড়া: গত ১৬ই অক্টোবর শুক্রবার সকাল ৭-৫৫ মিঃ-এ রহড়া বালকাশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে ১৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার হইতে ২১শে অক্টোবর বুধবার পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। ১৬ই, ১৭ই এবং ১৮ই অক্টোবর তিন দিনই ঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি এবং কাশী হইতে আগত যাজ্ঞিকপ্রবর শ্রীঅগ্নিষাত্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয়গণের সহায়তায় যথাক্রমে বাস্তুযাগ, রুদ্রযাগ এবং সপ্তশতী হোম অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞের জন্য মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথক্ ভাবে বিচিত্র সুসজ্জিত যজ্ঞমণ্ডপ নির্মাণ করা হয়। বৈদিক পদ্ধতি অনুসারে কৃত এই যজ্ঞ দেখিবার জন্য স্থানীয় এবং কলিকাতা হইতে আগত বহু লোকের সমাগম হয়।

এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিত বিচিত্র কার্যসূচী অনুসৃত হইয়াছিল :

১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় অধিবাস পরে কীর্তন।

১৬ই প্রাতঃ—বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা, পূজা হোম ও বাস্তুযাগ।
সন্ধ্যা—শ্যামাসঙ্গীত ও বাউল গান।

১৭ই প্রাতঃ—পূজা হোম ও রুদ্রযাগ।
অপরাহ্ণ—মহাভারতীয় ভাষণ : শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী।
সন্ধ্যা—যন্ত্রসঙ্গীত ; আলী আকবর খাঁ।

১৮ই প্রাতঃ—পূজা ও সপ্তশতী হোম
শ্রীরামকৃষ্ণ-আদ্যলীলা কীর্তন।
দ্বিপ্রহরে—নারায়ণসেবা।
অপরাহ্ণ—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক জনসভা।
বক্তা শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

১৯শে সন্ধ্যা—শ্রীচৈতন্যলীলা যাত্রাভিনয়।
প্রাতঃ—ভাগবত-পাঠ : শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী।
অপরাহ্ণ—ভজন : শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী।
সন্ধ্যা—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।

২০শে প্রাতঃ—শ্রীরামকৃষ্ণ-কিশোরলীলা কীর্তন।
অপরাহ্ণ—তরজা।
সন্ধ্যা—যাত্রাভিনয় : চন্দ্রগুপ্ত।

২১শে প্রাতঃ—নগরকীর্তন।
অপরাহ্ণ—শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা ভজন।
সন্ধ্যা—চলচ্চিত্র : শ্রীরামকৃষ্ণ।

সাতদিনব্যাপী উৎসবে সমস্ত আশ্রম-প্রাঙ্গণ সর্বদাই আনন্দে মুখরিত থাকে এবং হাজার হাজার ভক্ত নরনারী ইহাতে যোগদান করেন। এই মন্দির নির্মাণ করিতে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে, কলিকাতার মার্টিন বার্ণ কোম্পানী ইহা নির্মাণ করিয়াছেন। মন্দির-সংলগ্ন নাটমন্দিরে প্রায় ছয়শত লোক একসঙ্গে বসিতে পারে। বিভিন্নমুখী কর্মধারার সঙ্গে এই মন্দিরটি নির্মিত হইবার ফলে আশ্রমের বহুদিনের একটি অভাব পূর্ণ হইল।

বেদান্ত-সমিতির নূতন মন্দির

সানফ্রান্সিস্কো : গত ৭ই হইতে ১১ই অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী উৎসবের মাধ্যমে স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-সমিতির নবনির্মিত বৃহৎ মন্দির ও বক্তৃতাগৃহের শুভ উদ্বোধন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সন্ন্যাসিগণ এবং বহু ভক্ত এই উপলক্ষে স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোতে আসিয়াছিলেন। প্রথম চারদিন নানাবিধ পূজার্চনা, বেদ উপনিষদ্ গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রাবৃত্তি এবং ধর্মসঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের কাষ্ঠনির্মিত বেদিটির পরিকল্পনা ও কারুকার্যে প্রধানতঃ ভারতীয় শিল্প-কলা অনুসৃত হইয়াছে। বেদির উপর শ্রীরামকৃষ্ণ (মাঝখানে), শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, বুদ্ধ ও যীশুখ্রীষ্ট এই পাঁচজনের পূর্ণাবয়ব ব্রঞ্জ মূর্তি স্থাপিত। প্রথম তিনটি মূর্তির নির্মাতা রবার্ট শিন নামক জনৈক স্থানীয় ভাস্কর। বুদ্ধ ও যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি গড়িয়াছেন মহিলা ভাস্কর মেরী টিলডেন স্ট্রীভী। বেদির শীর্ষে সকল মত ও পথের প্রতীকস্বরূপ স্বর্ণ-মণ্ডিত কাঠের ওঁকার শোভা পাইতেছে। উৎসবের কয়দিন সনাতন হিন্দুধর্মের দেবা-রাধনার বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবগম্ভীর পরিবেশ সমবেত পাশ্চাত্য ভক্তগণকে গভীরভাবে মুগ্ধ

ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। উৎসবের পঞ্চম দিন রবিবারে একটি মহতী সভায় সর্বসাধারণের জন্য মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। সমিতির পরিচালক স্বামী অশোকানন্দ সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে সকল মত ও পথের সত্যানুসন্ধিৎসুগণের জন্য এই মন্দিরের লক্ষ্য ও কর্মপ্রণালী উল্লেখ করিয়া মন্দিরের শুভারম্ভ ঘোষণা করিবার পর পর্যায়ক্রমে স্বামী সংপ্রকাশানন্দ, স্বামী অখিলানন্দ, স্বামী বিবিদিষানন্দ, স্বামী অশেষানন্দ, স্বামী সর্বগতানন্দ ও স্বামী পবিত্রানন্দ বেদান্তের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ প্রারম্ভিক প্রার্থনা এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সমাপ্তিসূচক শান্তিপাঠ করিয়াছিলেন। স্যানফ্রান্সিস্কোর এই নূতন মন্দিরটি বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বেদান্ত-মন্দির। অতঃপর এখানে নিত্য পূর্বাহ্ণে পূজা, সান্ধ্য উপাসনা ও ধ্যানধারণা এবং রবিবার সকালে ও বুধবার সন্ধ্যায় বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইবে। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই জন্য মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত। বাড়িটির একতলায় পুস্তকাগার ও পুষ্পোদ্যান এবং ত্রিতলে সমিতির অফিস। মন্দিরের পাশে একটি পৃথক্ বাড়িতে সমিতির নারীমঠ। পুরাতন বাড়িতে শুক্রবারের উপনিষদ্-ক্লাস, ছাত্রছাত্রীগণের ধর্মশিক্ষার স্কুল এবং সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের মঠ পরিচালিত হইতেছে।

*   *   *

এতদুপলক্ষে ১২ই অক্টোবর প্রত্যূষে ৮জন আমেরিকান যুবক ব্রহ্মচর্য-ব্রত গ্রহণ করেন। বেলুড় মঠের অনুমতিক্রমে স্যানফ্রান্সিস্কো আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দই তাঁহাদের ঐ ব্রতে দীক্ষিত করেন।

বিবিধ সংবাদ

সংস্কৃত নাটকাভিনয়

এবার পূজাবকাশে সংস্কৃত নাটক প্রচারের নিমিত্ত প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের অভিনেতৃবৃন্দ দক্ষিণ ভারতে গমন করেন। ছয়রাত্রে তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত 'শক্তিসারদম্', 'মহাপ্রভু-হরিদাসম্' এবং 'ভারতহৃদয় অরবিন্দম্' অভিনয় করেন। ১৪ই অক্টোবর মাদ্রাজের বিশিষ্ট রঙ্গস্থান 'রসিকরঞ্জণী হলে' 'মহাপ্রভু-হরিদাসম্' অভিনয় করেন। মাদ্রাজের রাজ্যপাল বিষ্ণুরাম মেধী, ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন, অভিনয়ান্তে তাঁহারা এই প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পন্দিচেরীতে ও মাদ্রাজে 'শক্তিসারদম্' নাটকের অভিনয় সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করে। পন্দিচেরী আশ্রমে ডক্টর চৌধুরীর সর্বশেষ সংস্কৃত নাটক 'ভারতহৃদয় অরবিন্দম্' নাটক প্রায় আড়াই হাজার আশ্রমবাসী এবং অন্যান্য সুধীসজ্জন সমক্ষে অভিনীত হয়।

ভারতে শিক্ষায় ব্যয়

শিক্ষাব্যাপারে (কোটি টাকার অঙ্ক)

পঞ্চবার্ষিক	মোট ব্যয়	কেন্দ্রীয় ব্যয়	মোটব্যয়ের
১ম	১৬৯	৪৪	৭%
২য়	২৭৫	৬৮	৬%

বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাখাতে শতকরা ব্যয়

৩টি	,,	শতকরা	২৫ এর বেশি
৭টি	,,	,,	২০ হইতে ২৫
৬টি	,,	,,	১০ ,, ২০
২টি	,,	,,	১০ এর কম

বোম্বাই সর্বাপেক্ষা বেশি, তারপর ক্রমানুসারে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, পশ্চিম বঙ্গ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান:	বোম্বাই	৬৬,২৭৯ গুলি
	উত্তরপ্রদেশ	৪০,৭১৮ ,,

জনসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান:

মণিপুর, ত্রিপুরা	৫০০ জনের জন্য ১টি		
আসাম, আন্দামান	৭০০	,,	,,
বোম্বাই, মহীশূর উড়িষ্যা, পঃ বঙ্গ	৮০০	,,	,,
অন্যান্য ১০টি রাজ্যে	৯০০	,,	,,

১৯৫৮।৫৯খৃঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত টাকা শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে নিম্নলিখিত শতকরা হারে ব্যয়িত হইয়াছিল।

যন্ত্রবিজ্ঞান	২৬%
প্রাথমিক	২১ ,,
মাধ্যমিক	১৮ ,,
বিশ্ববিদ্যালয়	১২ ,,
বিবিধ	৯
ছাত্রদের বৃত্তি	৭
সমাজ কল্যাণ	৭

বিভিন্নপ্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোটসংখ্যার শতকরা পল্লী অঞ্চলে

বুনিয়াদী	৭৭
প্রাথমিক	৮৮ ,,
মাধ্যমিক	৬৮ ,,
কলেজ	৮ ,,

—নিবেদন—

আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনে'র নূতন (৬২তম) বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক নাম ঠিকানা সহ বার্ষিক ৫৲ (পাঁচ টাকা) ১৫ই পৌষের মধ্যে উদ্বোধন কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভিপি তে পত্রিকা পাঠাইবার অতিরিক্ত ডাক-ব্যয় বাঁচিয়া যায় ও অযথা বিলম্ব হয় না। মনিঅর্ডার কুপনে **গ্রাহক সংখ্যা** অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। ইতি—

কার্যাধ্যক্ষ
১, উদ্বোধন লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা ৩

বিখ্যাত স্বর্ণশিল্পী ও
রত্নালঙ্কার
নপূর্ণা জুয়েলারী হাউস
গ্যারান্টী যুক্ত গিনি সোনার গহনার
প্রতিষ্ঠান। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য
১।। টাকার ডাকটিকিট সহ পত্র লিখুন।

উৎসবে ও নিত্যপ্রয়োজনে
শতাব্দীর সুপরিচিত
লক্ষ্মীবিলাস
সর্বঋতুর উপযোগী তৈল
এম, এল, বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস • কলিকাতা-৯

ব্রুক বণ্ড চা
Brooke Bond
Darjeeling
জীবনের
প্রিয় জিনিসের
একটি

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সরল রাজযোগ—৪র্থ সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি বুলের বাড়ীতে কয়েক জন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্ত্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ০'৫০।

পত্রাবলী—১ম ভাগ। অভিনব পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। প্রায় ৫৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামিজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজান হইয়াছে। পরিচয় এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবিসম্বলিত। মূল্য ১ম ভাগ ৫৲; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪'৫০।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৩শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামীজির ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৬৩৬ পৃষ্ঠা মূল্য ৫৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪'৬৫।

দেববাণী—৮ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান' নামক স্থানে কয়েক জন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন তাহার একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১'৯০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ- ৩য় সংস্করণ। শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিক-ভাবে সন্নিবেশিত। ১৭০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'৫০।

বিবেক-বাণী—১৬শ সংস্করণ। আচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজীর উপদেশাবলী। স্বামীজির বাষ্টসম্বলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। মূল্য ০'৪০।

কথোপকথন—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামীজির ছবি-যুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১ ১৫।

মদীয় আচার্য্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১০ম সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষাসম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামিজীর বিবৃতি। মূল্য ০'৭৫; উঃ-গ্রাঃ পক্ষে ০'৭০।

ভারতীয় নারী—১২শ সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান আদর্শ, পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজির মনোরম ছবি-সম্বলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১২০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১'১৫।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান—৭ম সংস্করণ, ১৩১ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদান্ত-মত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে আর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ—যে গুলি না বুঝিলে ধর্ম জিনিসটাকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ১'২৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১'১৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৪শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়ভরতের-উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্য গণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট ও ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। মূল্য ১'২৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১'১৫।

সন্ন্যাসীর গীতি—১৩শ সংস্করণ। স্বামীজি-রচিত 'Song of the Sannyasin' নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ০'১৫।

পওহারী বাবা—৯ম সংস্করণ। গাজীপুরের বিখ্যাত মহাত্মা পওহারী বাবার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। স্বামীজির হাফটোন ছবিযুক্ত। মূল্য ০'৫০।

হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ—৫ম সংস্করণ, ৮৮ পৃষ্ঠা। ইহাতে হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা, হিন্দুধর্মের ক্রমাভিব্যক্তি, ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর ও ডাঃ পল ডয়সেন সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মূল্য ০'৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ০'৭০।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৪র্থ সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০'৪০, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ০'৩৫ আনা।

অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৪র্থ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। এই পুস্তক পাঠে চরিত-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ১·২৫।

শঙ্কর চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য প্রণীত—৪র্থ সংস্করণ; আচার্য্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲ মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা—৫ম সংস্করণ। স্বামী অরূপানন্দ প্রণীত। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা পুস্তক হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। মূল্য ০·৪০।

ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন কথা। মূল্য ২৲ টাকা।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—২য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। প্রায় ৩৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩·৫০।

শিবানন্দ-বাণী—১ম ভাগ—৪র্থ সংস্করণ, ২য় ভাগ—২য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ সঙ্কলিত মূল্য প্রতি ভাগ ২·৫০।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। প্রথম ভাগ (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর) ৫ম সংস্করণ। দ্বিতীয় ভাগ—(ছান্দোগ্য) ৪র্থ সংস্করণ। তৃতীয় ভাগ—(বৃহদারণ্যক) ৩য় সংস্করণ। ইহাতে উপনিষদের মূল, সংস্কৃত, অন্বয়মুখে বাংলা প্রতিশব্দ, সরল বঙ্গানুবাদ এবং আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যানুযায়ী দুরূহ বাক্যসমূহের টীকা প্রভৃতি আছে। সুদৃশ্য ছাপা, কাপড়ের মনোরম বাঁধাই, ডবল ক্রাউন—১৬ পেজি, প্রায় ৪৬৫ পৃষ্ঠা। মূল্য—প্রতি ভাগ ৫৲ টাকা।

সাধু নাগ মহাশয়—৯ম সংস্করণ। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ১·৫০ মাত্র।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ প্রণীত (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত) অতুলনীয় সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত 'গোপালের মা' এর আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ০·৫০।

নিবেদিতা—১০ম সংস্করণ। শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত। স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা। মূল্য ০·৭৫।

সৎকথা—স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত—৩য় সংস্করণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ (শ্রীলাটু) মহারাজের উপদেশাবলীর সংকলন। মূল্য ২৲ টাকা।

যোগচতুষ্টয়—স্বামী সুন্দরানন্দ প্রণীত। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগের সংক্ষিপ্ত সরল বিবরণ। মূল্য ২৲ টাকা।

বেদান্তদর্শন—১ম খণ্ড—চতুঃসূত্রী। শাঙ্কর ভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ, রত্নপ্রভা টীকা, ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্বলিত। প্রায় ২৪৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ টাকা।

স্তবকুসুমাঞ্জলি—৫ম সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত—বৈদিক শান্তিবচন, সূক্ত, প্রার্থনা ইত্যাদি বিবিধ সংস্কৃত স্তোত্রাদির অপূর্ব্ব সঙ্কলন। সংবাদপত্রসমূহে উচ্চ প্রশংশিত। মূল সংস্কৃত, অন্বয়, অন্বয়মুখে সংস্কৃতের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং মূলের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৩৲ টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৬ষ্ঠ ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ০৫।

আগে চলো—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। কিশোরদের জন্য লেখা। তরুণমনে সুনীতি, দেশাত্মবোধ, সেবা, আদর্শনিষ্ঠা এবং ধর্মপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক যৌবনোন্মুখ ছেলেমেয়েকে এই বইখানি পড়িতে দেওয়া উচিত। মূল্য ১·৫০।

হিন্দুধর্ম পরিচয়—১ম ও ২য় ভাগ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সরল কথায় হিন্দুধর্মের মুখ্য বিষয়গুলির সহিত পরিচিত চেষ্টা এই বই দুখানিতে করা হইয়াছে। মূল্য ১ম ভাগ ০·৫০, ২য় ভাগ ০·৭৫।

দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য ও পূজা-পদ্ধতি—স্বামী কৈবল্যানন্দ প্রণীত। মূল্য ১ম ভাগ (পরিবর্দ্ধিত ৪র্থ সংস্করণ ০·৮৮, ২য় ভাগ (৩য় সংস্করণ) ১·৫০।

ঠাকুর এবার এসেছেন

ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। এবার বাঁশ ও ঘাস ছাড়া যার ভেতরে একটু সার আছে সেই চন্দন হবে। তোমাদের ভাবনা কি?...

সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ-মন ভাল থাকে।...কাজ করতেই হয়। কর্মেই কর্মপাশ কাটে। কাজ ছাড়া থাকা ঠিক নয়।............

—শ্রীমা

● ● ●

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী অন্বয়ানন্দ : ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, এম. আই. প্রেস হইতে মুদ্রিত
এবং ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

Udbodhan-Phone : 55-2447 : November 1959 : Regd. No. C. 295

সম্পাদক — স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-৩

৬১তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

পৌষ ১৩৬৬

বার্ষিক মূল্য ৫৲
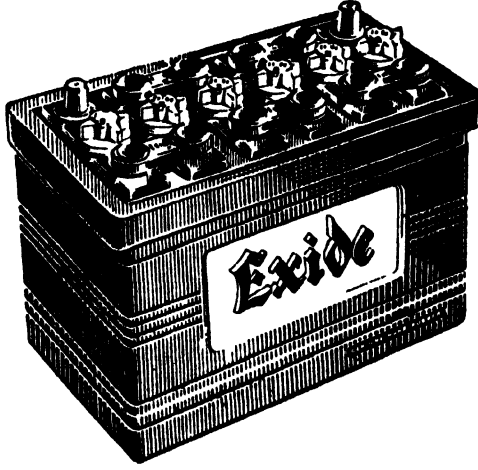
প্রতি সংখ্যা ০·৫০

নিবেদন

বর্ত্তমান পৌষ মাসে 'উদ্বোধনের' ৬১ বর্ষ শেষ হইল। আগামী মাঘ মাস হইতে পত্রিকা ৬২ তম বৎসরে পদার্পণ করিবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের নিকট বিনীত নিবেদন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক পৌষ মাসের ২০শে তারিখের (৫ই জানুয়ারি, ১৯৬০) মধ্যে **পুরা নাম ঠিকানা এবং গ্রাহক-সংখ্যা সহ** তাঁহাদের বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইবেন, নচেৎ ভিঃ পিঃ পিঃতে পত্রিকা পাঠাইলে তাঁহাদের রেজেষ্টারী এবং ভিঃ পিঃ খরচ বাবদ ॥৵০ আনা অনর্থক বেশী লাগিবে এবং মাঘ সংখ্যার কাগজ পাইতে অযথা বিলম্ব ঘটিবে।

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও সৌজন্যের উপরই উদ্বোধনের অস্তিত্ব ও প্রসার বহুলাংশে নির্ভর করে। অতএব পুরাতন গ্রাহকগণ নূতন বর্ষেও যে তাঁহাদের নাম আমাদের গ্রাহক-তালিকাভুক্ত রাখিবেন ইহাই আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা। তথাপি অনিবার্য্য কারণে যদি কাহারও পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে তিনি দয়া করিয়া ২০শে পৌষের মধ্যে আমাদিগকে গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ পূর্বক উহা জানাইয়া দিবেন।

২০শে পৌষের মধ্যে কোন গ্রাহক বা গ্রাহিকার বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা না পৌছিলে অথবা গ্রাহক থাকিবার অনিচ্ছা-জ্ঞাপক পত্রও না পাইলে আমরা যথারীতি তাঁহাকে ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠাইব। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক মনে রাখিবেন যে, **ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিলে আমাদের অযথা ক্ষতি হয়।**

কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন

১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন, পৌষ, ১৩৬৬

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

ভারতে সাইকেল-শিল্প প্রবর্তক
ইণ্ডিয়া সাইকেল
রোডষ্টার ••
সুপার ডি-লুক্স
সামিট •••

জুতা

শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোত্রম্

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

যা দেবী মর্ত্যদেহেঽমরগণ-বিরল-জ্যোতিষা দীপ্যমানা
যস্যাঃ পুণ্যপ্রভাবৈরগণিত-মনুজা দর্শিতা মুক্তিমার্গম্।
যস্যাঃ পীযূষবাণী নিখিল-তনুভৃতাং সর্বসন্তাপ-হন্ত্রী
শ্রীমা-রূপেণ নৃণাং নিয়ত-হিতকরীং **সারদাং** তাং নমামি ॥১॥

পত্যুঃ স্থানং ব্রজন্তী স্বজন-পরিহৃতা প্রান্তরে ভীমদস্যুং
'কন্যাহং সারদা তে ত্বমসি মম পিতা রক্ষণীয়া ত্বয়াহম্।'
ইত্যুক্ত্বা দস্যুচিত্তং কুলিশ-সুকঠিনং কোমলং যা চকার
শ্রীমা-রূপেণ মহ্যাং ধৃততনুমভয়াং **সারদাং** তাং নমামি ॥২॥

ত্যক্ত্বা ভোগস্য মার্গং পতিগত-হৃদয়া তদ্‌ব্রতে চৈকনিষ্ঠা
পূর্ণং কর্তুং ব্রতং তদ্ বিগলিত-চিকুরা মাতৃভাবাশ্রিতা যা।
পত্যুঃ পূজামগৃহ্ণাজ্জগতি নিরুপমাং ষোড়শী সিদ্ধিদাত্রী
শ্রীমা-খ্যাং বিশ্ববন্দ্যাং গিরিবর-তনয়াং **সারদাং** তাং নমামি ॥৩॥

ভক্তানাং মাতৃরূপাং সততমভয়দাং সর্বকল্যাণকামাং
পত্যুরুগ্নস্য সেবামনলস-মনসা কুর্বতীং ক্লান্তিহীনাম্।
আতিথ্যে মুক্তহস্তাং সুনিপুণ-গৃহিণীমদ্বিজাতা-স্বরূপাং
শ্রীমা-খ্যাং বিশ্বরূপামভিমত-বরদাং **সারদামর্চয়ামি** ॥৪॥

লব্ধ্বা মাতৃত্ব-সম্পদ্-বহুসুকৃতিফলং যোষিতঃ পূর্ণকামা-
স্তস্মাৎ সন্তানচিন্তা মনসি সমুদিতা সা তু তত্রৈব লীনা।
সংখ্যাতীতান্ সুপুত্রান্ নিজ-তনুজ-নিভান্ প্রাপ্য যাসীৎ কৃতার্থা
কল্যাণীং শুদ্ধসত্ত্বাং জনগণজননীং **সারদাং** তাং নমামি ॥৫॥

প্রণত-হৃদয়পদ্ম-ন্যস্তপাদাব্জযুগ্মা মধুরবচনগর্ভাং বিভ্রতী কণ্ঠবীণাম্।
রুচিরবিমলকান্তির্জ্ঞানভক্তিপ্রদাত্রী নিখিলভুবনপূজ্যা **সারদা** সারদৈব ॥৬॥

জয়তু জয়তু দেবী ধ্যানগম্ভীরমূর্তির্জয়তু জয়তু দেবী সাধকাভীষ্টদাত্রী।
জয়তু জয়তু দেবী রামকৃষ্ণস্য শক্তির্জয়তু জয়তু দেবী সারদা বিশ্বধাত্রী॥৭॥
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুপার্শ্বে বিহরতি কমলা বিশ্বকল্যাণদাত্রী
কৈলাসে শম্ভুবাসে বিহরতি গিরিজা লোকরক্ষা-বিধাত্রী।
জাহ্নব্যাং পুণ্যতীর্থে মণিময়-ভবনে কালিকা-পাদপদ্মে
রাজেতে ধ্যানমগ্নৌ মম হৃদয়-নিধী সারদা-রামকৃষ্ণৌ ॥৮॥

(বঙ্গানুবাদ)

যিনি মর্ত্যদেহ ধারণ করিয়াও দেবদুর্লভ জ্যোতিতে দীপ্তিময়ী, যাঁহার পুণ্যপ্রভাব অসংখ্য মানবকে মুক্তির পথ দেখাইয়াছে, এবং যাঁহার অমৃতবাণী সমুদয় জীবের সর্বসন্তাপহারিণী, শ্রীমা-রূপে মানুষের নিয়ত হিতকারিণী সেই সারদাকে প্রণাম করি।১।

পতির আলয়ে গমনকালে প্রান্তরে স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া ভীষণ দস্যুকে 'আমি তোমার কন্যা সারদা, তুমি আমার পিতা, আমাকে রক্ষা কর' এই কথা বলিয়া যিনি বজ্রের ন্যায় সুকঠিন দস্যু-হৃদয়কে কোমল করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে শ্রীমা-রূপে দেহধারণকারিণা সেই ভয়শূন্যা সারদাকে (অথবা সারদা-রূপিণী অভয়াকে—অর্থাৎ দুর্গাকে) প্রণাম করি।২।

যিনি ভোগের পথ ত্যাগ করিয়া পতিগতপ্রাণা ও পতির ব্রতে একনিষ্ঠা হইয়া সেই ব্রত পূর্ণ করিবার জন্য আলুলায়িতকেশবিশিষ্ট হইয়া মাতৃভাব আশ্রয় করিয়া সিদ্ধিদাত্রী ষোড়শী-রূপে পতির পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন—জগতে যাঁহার তুলনা মিলে না—'শ্রীমা'-নাম-ধারিণী বিশ্ববন্দ্যা গিরিরাজতনয়া (দুর্গা)-রূপিণী সেই সারদাকে প্রণাম করি।৩।

ভক্তগণের মাতৃস্বরূপা, সতত অভয়দায়িনী, সর্বকল্যাণকামা, অনলসমনে এবং ক্লান্তিহীন-ভাবে মুক্তহস্তা, লক্ষ্মীস্বরূপা সুনিপুণ গৃহিণী, এবং ঈশ্বরী-রূপে অভিমত-বরদায়িনী 'শ্রীমা'-নাম-ধারিণী সারদার অর্চনা করি।৪।

বহু সুকৃতির ফল-স্বরূপ মাতৃত্ব-সম্পদ্ লাভ করিলে নারীগণের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। অতএব (হয়ত 'শ্রীমা'রও) মনে সন্তানচিন্তা উদিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা মনের মধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তনুজ (তনুজাত পুত্র)-তুল্য বহু সুপুত্র (প্রকৃত ভক্ত সন্তান) লাভ করিয়া যিনি যথার্থই 'মা' হইয়াছিলেন—সেই কল্যাণী, শুদ্ধস্বভাবা, জনগণজননী সারদাকে প্রণাম করি।৫।

যিনি ভক্তগণের হৃদয়পদ্মে পাদপদ্মযুগল স্থাপন করিয়াছেন, এবং মধুর বচনপূর্ণ কণ্ঠরূপ বীণা ধারণ করিয়া আছেন, সুন্দর এবং বিমলকান্তি-বিশিষ্টা, জ্ঞানভক্তিপ্রদায়িনী এবং সমস্ত জগতের পূজনীয়া সেই সারদা সারদা (অর্থাৎ সরস্বতী) ব্যতীত আর কেহই নহেন।৬।

ধ্যানগম্ভীর-মূর্তিধারিণী দেবীর জয় হউক, জয় হউক। সাধকের অভীষ্টপূরণকারিণী দেবীর জয় হউক, জয় হউক। রামকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা দেবীর জয় হউক, জয় হউক। বিশ্বজননী দেবী সারদার জয় হউক, জয় হউক।৭।

বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পার্শ্বে বিশ্বকল্যাণদায়িনী লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, কৈলাসে মহাদেবের বামে লোকরক্ষাকারিণী পার্বতী বিরাজ করিতেছেন, জাহ্নবীতটে পুণ্যতীর্থে মণিময় মন্দিরে কালিকা দেবীর পাদপদ্মে ধ্যানমগ্ন হইয়া আমার হৃদয়নিধি সারদা ও রামকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন।৮।

কথাপ্রসঙ্গে

শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা

স্বাধীনতা অর্জন করিবার সাধনা কঠিন, কিন্তু কিন্তু সেই অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করিবার সাধনা কঠিনতর। মুষ্টিমেয় অসাধারণ ব্যক্তির ত্যাগ তপস্যা, বিদ্যাবুদ্ধি, কল্পনা ও শক্তি বিদেশীর শাসনপাশ হইতে একটি দেশকে মুক্ত করিতে পারে, কিন্তু সেই দুর্লভ মুক্তি বা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে অগণিত জনসাধারণের সংহত শক্তি। সেজন্য তাহাদের যে ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, যে কঠোর অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে—তাহার জন্য প্রয়োজন এক নূতন ধরনের শিক্ষা। তাত্ত্বিক তথ্যানুসন্ধিৎসা ও নিছক জীবিকার্জনের শিক্ষা দ্বারা একটি জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। স্বাধীন জাতি মাত্রেই এ বিষয়ে সচেতন, ভারতও এ বিষয়ে অবহিত হইতেছে।

স্বাধীনতার পর এক যুগ (১২ বৎসর) কাটিয়া গেল। শিশু রাষ্ট্র এখন আর নেহাত শিশু নাই, ধীরে ধীরে কৈশোরের পরে যৌবনের পথে পা বাড়াইতেছে। এখন আর শৈশবের চঞ্চলতা, চপলতা বা অভিযোগমূলক ক্রন্দন তাহার শোভা পায় না; তাহাকে এখন শান্ত সংযত হইতে হইবে, শক্তি অর্জন করিতে হইবে। 'স্বাধীনতা' বলিতে এখন আর 'যা খুশি করিবার, যা খুশি বলিবার স্বাধীনতা' ভাবিলে চলিবে না। স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার নয়, স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাও স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা এক চরম ও পরম দায়িত্ব। যে জাতি উপযুক্ত শিক্ষা সহায়ে এই দায়িত্ব পালন করে, সেই জাতিই বড় হয়, বরণীয় হয়; আর যে জাতি সেই শিক্ষার অভাবে বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, সে জাতিকে আবার পরাধীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে আমাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল,—একটি মাত্র সমস্যা ছিল, কিভাবে স্বাধীনতা লাভ করা যায়; কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর দেখা দিয়াছে অগণিত সমস্যা, তন্মধ্যে অবশ্যই প্রধান—কিভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করা যাইবে। তাহার একটি মাত্র উত্তর—শিক্ষা, উপযুক্ত শিক্ষা। স্বাধীনতা রক্ষা করা কোন একজন নেতার বা সেনাধ্যক্ষের কাজ নয়। স্বাধীনতা রক্ষা করা শুধু সৈন্যবিভাগের কর্তব্য নয়। ব্যাপক যুগোপযোগী শিক্ষা পাইলে জনগণই স্বাধীনতা রক্ষা করিবে।

আজ যখন স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, ট্রেনে-সিনেমায় দেখা যায় ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—দেশের যাহারা ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা, তাহাদের এই বিসদৃশ ব্যবহার কেন? সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতা ইহারা কিভাবে রক্ষা করিবে? কে ইহাদের এরূপ বিশৃঙ্খল ব্যবহার শিখাইল? এই প্রশ্ন আজ দেশের নেতাদের বিচলিত করিয়াছে, চিন্তিত করিয়াছে, তাঁহারা ইহার প্রতীকারের চিন্তাও করিতেছেন। শুভ লক্ষণ।

ছাত্রদের এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ একটি সাময়িক অসংযত উচ্ছ্বাস নয়, একটি স্থানীয় বিস্ফোরণ নয়; দূষিত ক্ষতের মতো ইহা বাড়িতেছে; পুরাতন ব্যাধির মতো ইহা সহ্য হইয়া আসিতেছে, কিন্তু জাতির শরীরকে ইহা পঙ্গু করিতেছে। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্রদের অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণের সংবাদ আসিতেছে। কখনও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আস্ফালন—অকৃতকার্য ছাত্রকে পাস করাইয়া দিতে হইবে; কখনও

কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন—অনুপযুক্ত ছাত্রকে ভরতি করিতে হইবে। শুধু উত্তর ভারতে নয়, সেদিন দক্ষিণ ভারত হইতেও সংবাদ আসিয়াছে—একটি সাংস্কৃতিক সঙ্গীতানুষ্ঠানে অবাধ প্রবেশাধিকারের জন্য ছাত্রেরা গণ্ডগোল করিয়াছে। সিনেমায় ও ট্রেনে অনুরূপ ঘটনা সংবাদপত্রে প্রায়ই প্রকাশিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার কখনই সমর্থন করা যায় না; কিন্তু আশ্চর্য, অবস্থা এমন আয়ত্তের বাহিরে কি করিয়া চলিয়া যায় যে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় সরকারকে চরম পন্থা অবলম্বন করিতে হয়!

ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ রোগ বিশেষ, এবং ইহা সংক্রামক রোগ। ইহার কারণ নির্ণয় করিয়া ব্যাপক প্রতিষেধক ব্যবস্থা এখনই অবলম্বন করিতে হইবে। নতুবা জাতীয় জীবন বিপন্ন।

বিভিন্ন মনীষী ও চিন্তাশীল নেতা এই শৃঙ্খলাহীনতার বিভিন্ন কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিষেধক ঔষধ নির্ণয়ে প্রায় সকলেই একমত।

প্রথমে রোগের সম্ভাবিত কারণগুলি উল্লেখ করিয়া আমরা ঔষধের প্রসঙ্গ আলোচনা করিব।

অনেকের ধারণা সংগ্রামশীল বিপরীত আদর্শের সংঘাত—আবার নূতন করিয়া আমাদের দেশে শুরু হইয়াছে। পুরাতন কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা নাই, নূতন কোন আদর্শও ধরিতে পারিতেছে না, শুধু বিজাতীয় ভাবের প্রতি একটা মোহময় আকর্ষণ—এরূপ অবস্থায় ছাত্রগণ বিভ্রান্ত, বিচলিত। যান্ত্রিকতার যুগে, জড়বাদের স্রোতে নিজস্ব চিন্তা করিবার সময় নাই, শক্তিও নাই; যূথচারী মনোবৃত্তির (herd instinct) দ্বারা আজ আমাদের ছাত্রসমাজ চালিত।

আর একদল মনীষী বলেন, এ যুগের আর্থনীতিক অনিশ্চয়তাই ছাত্রদের মনে একটা বিফলতা ও ব্যর্থতার মনোভাব আনিয়াছে, তাহাতেই তাহারা ঐরূপ ব্যবহার করে; দেশের আর্থনীতিক কাঠামো সুদৃঢ় হইলে, বেকারভীতি দূরীভূত হইলে জীবনের একটা নিশ্চয় ভিত্তি ও নিশ্চিন্ত পন্থা পাইলে ছাত্রদের ব্যবহারে একটা সামঞ্জস্য—একটা শান্ত ছন্দ আসিবে।

তৃতীয় আর একটি মতও উপেক্ষণীয় নয়। এ মতের ব্যক্তিরা বলেন, ছাত্রেরা যেমন দেখিতেছে তেমন শিখিতেছে। শিক্ষকদের ব্যবহারই ছাত্রেরা অনুকরণ করে, নেতাদের আচরণই তাহারা অনুসরণ করে। বিধানসভার ও লোকসভার সভ্যদের কথাবার্তা চালচলন হইতেও ছাত্রেরা অনেক কিছু শিক্ষা করিতেছে।

সিনেমার পর্দায় ও পোষ্টারে যে চিত্র ও বিষয়বস্তু পরিবেশিত হয়, স্কুল-কলেজ হইতে যাতায়াতের পথে তাহাও ছাত্রদের জীবন প্রভাবিত করে। বিশেষতঃ ঐগুলির যৌন ও অপরাধমূলক আবেদন হইতে ছাত্রেরা নিজেদিগকে রক্ষা করিতে পারে না।

ছাত্রদের গৃহজীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায়—সেখানেও তাহারা দেখে এবং শোনে, আত্মীয়স্বজনদের অনেকে অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করিয়া বড়াই করিতেছেন। এরূপ পরিবেশে তরুণদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে?

আশাবাদী কোন কোন নেতা বলিয়া থাকেন, অত্যধিক শিক্ষাবিস্তারের জন্যই ছাত্রসমাজে এই বিশৃঙ্খলা। অর্থাৎ যে সকল পরিবারে এতদিন কোন উচ্চ শিক্ষা ছিল না, তাহাদের ছেলেরা স্কুলে কলেজে আসিতেছে; উচ্চশিক্ষার সহিত তাল মিলাইয়া তাহারা চলিতে পারিতেছে না, তাই এই বিশৃঙ্খলা।

এই কারণগুলি বিভিন্ন চিন্তাশীল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উক্তি হইতে মোটামুটি উদ্ধৃতি; এইগুলি লইয়া আলোচনা না করিয়া আমরা প্রতীকার-প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করিতেছি।

অযোগ্য ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষাই যদি এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া থাকে, তবে তো একেবারে প্রাথমিক স্তরে শৃঙ্খলা-শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার

দেওয়া উচিত। শিক্ষাবিদ্‌গণ সকলেই এ বিষয়ে একমত : ছেলেকে যাহা শিখাইতে চাও—তাহা মাতৃ-দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া দাও।

যে কোন কারণেই হউক, একদিন দেশে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার বীজ উপ্ত হইয়াছিল, আজ আমরা তাহার বিষময় ফসল কাটিতেছি। আজ যদি শৃঙ্খলা ও সুনীতির বীজ বপন করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই যথাসময়ে দেশে ঐ দুটি গুণ ব্যাপক ভাবে দেখা দিবে। এ বীজ বপন করিবার ক্ষেত্র অবশ্যই ছাত্রদের হৃদয়ে, প্রাথমিক স্তর হইতে শুরু করিয়া সর্বস্তরে এই শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা আজ সঞ্চারিত করিতে হইবে।

আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে অফুরন্ত শক্তি রহিয়াছে, উপযুক্ত সংগঠনকারীর অভাবে ঐ মহা শক্তি নানাদিকে বিক্ষিপ্ত। দুএকটি 'দুষ্টু ছেলে' বা দুর্বৃত্ত মানব গোলমালের সৃষ্টি করে; দুর্বৃত্ততা কাহারও স্বাভাবিক ধর্ম নহে। সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হইলেই বিভিন্নমুখী শক্তি সংহত হইয়া মহাশক্তিতে পরিণত হইবে; শুধু বক্তৃতা দ্বারা ইহা হইবার নহে।

দেশের সর্বস্তরে—শহরে গ্রামে পল্লীতে আজ চাই যোগ্য নেতা, সহানুভূতিসম্পন্ন নেতা—দেশের মাটিতে যাহার শিকড় আছে, দেশের মানুষের সহিত যাহার নাড়ীর সম্বন্ধ। জনসাধারণের অভাব অভিযোগ বুঝিয়া, সুখ-দুঃখ বুঝিয়া যিনি ত্যাগ-সেবামূলক স্থায়ী কাজ করিবেন, তিনিই বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো তাহাদের হৃদয় জয় করিতে পারিবেন, তিনিই তাহাদিগকে যথার্থ শিক্ষা দিয়া তাহাদের জীবন গঠন করিতে পারিবেন। পল্লীর ভিত্তিতে এরূপ কাজের সূত্রপাত হইলে সুনীতি ও শৃঙ্খলা ক্রমশঃ উচ্চ স্তরে সঞ্চারিত হইবে।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে সৈন্য সহায়ে সীমান্ত রক্ষা করার মতোই প্রয়োজনীয় কাজ দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তি সংহত করা। শারীরিক বলের সহিত চাই মানসিক শক্তি। দুর্বল শরীরে কোন কাজ হয় না; আবার শৃঙ্খলাশূন্য শারীরিক বলও পশু-শক্তি। তাহার দ্বারা মহৎ কিছু করা সম্ভব নয়। আত্মবিশ্বাস ও আদর্শনিষ্ঠাই মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করে।

সম্প্রতি চীনের সহিত সীমান্ত-বিরোধ আমাদিগকে নূতন একভাবে নাড়া দিয়াছে। কোন আত্মসম্মানসম্পন্ন জাতি বৈদেশিক আক্রমণ সহ্য করিতে পারে না। এই বিপদের সম্মুখে সর্বপ্রকার স্বার্থ বিসর্জন দিয়া, ছোটখাট বাদবিসম্বাদ অতিক্রম করিয়া ঐক্যবদ্ধ জাতিরূপে আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বিপদ ছোট হউক, বড় হউক—তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য সর্বদা এই প্রস্তুতির ভাব শৃঙ্খলা-শিক্ষা হইতেই আসিয়া থাকে। এ শৃঙ্খলা সামরিক শিক্ষা হইতে সহজেই জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত হয়। নৈতিক শিক্ষার সহিত সামরিক শিক্ষা ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনে বহু সদ্‌গুণের সৃষ্টি করিবে: প্রথমতঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ আচরণ, দ্বিতীয়তঃ সংঘবদ্ধ কর্মক্ষমতা, তৃতীয়তঃ সর্বত্র সহযোগিতার ভাব; তদুপরি গঠিত হইবে ছাত্রদের বজ্রদৃঢ় শরীরে এক সাহসী, সমবেদনশীল, সক্রিয় মন।

সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন : আজকাল স্কুল-কলেজের ছেলেরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, ধনুকের মতো বাঁকা দেখায়! কি পরিতাপের বিষয়!

সামরিক শিক্ষা পাইলেই যে এখনই যুদ্ধে যাইতে হইবে, তাহা নয়। আজকালকার যুদ্ধে সৈন্যবিভাগের দায়িত্ব যতখানি, জনসাধারণের দায়িত্ব তদপেক্ষা কম নহে। এইজন্য সামরিক শিক্ষা আজ জাতীয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিলে সমগ্র জাতি শরীরের দিক দিয়া যেমন শক্ত ও সমর্থ হইবে, তেমনই মনের দিক দিয়া ঐক্যবদ্ধ ও সদাপ্রস্তুত হইতে শিখিবে। দেশের যে কোন বিপদের মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষ একমন একপ্রাণ হইয়া আগাইয়া আসিবে—বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়া।

চলার পথে

'যাত্রী'

কালস্রোতের উজান বয়ে একটি দিনের কথা স্মরণে আসছে। স্বমহিমায় দিনটি সত্যই অপূর্ব। মহাকালের ধ্বংসের মাঝে আজও যা শাশ্বত শতদল হ'য়ে ফুটে আছে।

ঐ কে যায়? ঐ সুবিস্তৃত মরুপ্রান্তরের রৌদ্রতাপে ঝলসান, পাথর-ঘেরা, উঁচুনীচু পথ ধ'রে ঐ কে যায়?—কি অপরূপ তনু! কি উদ্ভাসিত দেহদীপ্তি! কি অদ্ভুত মৌনমধুরিমা! কি সকরুণ সুস্মিত আনন! ও যে একাই চলতে পারছে না। তার ওপর আবার ওকে ঐ গুরুভার বইতে দেওয়া কেন? ওকে দিয়ে কি বওয়াতে আছে ঐ ভারী ক্রুশ-কাষ্ঠ? ও যে তা বইতে পারছে না—তার ওপর পেছনের ঐ সৈনিকরা ওর ঐ বরতনুকে অমন নৃশংসভাবে চাবুক মারছে কেন? কি নির্মম নিষ্পেষণ! এত অত্যাচারেও সে কিন্তু এক গভীর ভাবে নিবিষ্ট! ও কি মানুষ? মানুষ হ'লে কি কখনো নীরবে এত যাতনা সহ্য করতে পারে!

আজ যার জন্য পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক ছুটে আসতে চায়, যার এতটুকু কষ্ট মুছে দেবার জন্য তারা সহস্র জীবন ডালি দেবার জন্য সদাই উন্মুখ—তাকে এই পদযাত্রায় সাহায্য করবার কি কেউ নেই?—একথা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এই জগতে একদিন এমনি অবিশ্বাস্য ঘটনাই তো ঘটে গেছে!

যেমন ক'রে হোক, ও এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে আরও দুজন দস্যু চলেছে ওরই সাথে, নিজ নিজ ক্রুশ ঘাড়ে ক'রে। ওদের সঙ্গে তুমি কেন চলেছ, ঈশা? তুমি তো নিষ্পাপ; মানব-দরদী তুমি; তুমি ঈশ্বর-পুত্র—তবু তোমার এ লীলা কেন? সবার মনের রাজা হয়েও তোমার মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিল যারা, তাদেরও শেষ পর্যন্ত তুমি ক্ষমা করতে পারলে? ধন্য তুমি!—এ সবের কিছুই বুঝতে পারি না। তন্দ্রাহারা মনেও এই বিচার কূল পায় না। মনে ব্যথা বাজে। ভাবনার ছন্দপতন হয়।

দিনটা বেশ বিষাদমাখা। মরু-প্রান্তরের চারিদিক ঘিরেই এক রহস্যময় আলোক স্তব্ধ হ'য়ে আছে। বৃক্ষহীন উষর প্রান্তরে অতীন্দ্রিয় ইঙ্গিতের আভাস। আকাশের অবয়বও কেমন এক প্রলয়ের কালো মেঘে কবলিত। শীঘ্রই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে, তারই সঙ্কেত ছড়িয়ে রয়েছে।

ঐ, ঐ যে, ঐ শ্রান্ত ক্লান্ত যীশু চলতে চলতে পথের মধ্যে পড়ে গেল। ও কি শেষ পর্যন্ত বধ্যভূমি—'ক্যালভ্যারি'তে বা 'গলগোথা'-য় পৌঁছতে পারবে না? না পারলে, ওর পেছনে মজা-দেখার এত লোক হতাশ হবে যে। তারা যে ওকে ক্রুশে-বিদ্ধ অবস্থায় মরতে দেখতে চলেছে। তাই বুঝে প্রহাররত সৈনিকরাও যীশুকে একটু রেহাই দিলে। এমন কি, সেই জনতার মধ্য থেকে 'সাইমন' এসে যীশুর ক্রুশ বইবার কাজেও লেগে গেল। ধন্য সাইমন, তুমিই ধন্য! দেব-মানবের জন্য তোমার এই শ্রমদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থেকে গেল।

ওগো ঈশা, ওগো দেব-মানব, তোমার ঐশ্বরিক ক্ষমতা আর কিছু অবশিষ্ট নেই কি? যদি থাকে, তাহলে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিচ্ছ না কেন?—অধম আমরা মহামানবের শক্তি বিচার করতে গিয়ে এইরূপ কথাই তো ভাবি। কিন্তু এ কি? 'ভেরোনিকা'র বাড়ির কাছে যীশু আসতেই, সেখানকার এক বালিকা বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে যীশুকে ঐ অবস্থায় দেখে কাঁদতে লাগল।

অসীম করুণায় সে তার রেশমী উত্তরীয় দিয়ে যীশুর মুখের ঘাম দিল মুছে। কি আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে ঐ বালিকার রেশমী উত্তরীয়ে যীশুর মুখচ্ছবি চিরতরে মুদ্রিত হ'য়ে গেল। তাহলে তো সকল ক্ষমতা থাকতেই স্বেচ্ছায় যীশুর এই মৃত্যুবরণ! মানবের পাপহরণের জন্য কি অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার! যিনি যুগ যুগ ধরে মানবকে অনুশোচনার অশ্রুজলে স্নান করিয়ে মুক্তির আলো বিতরণ করবেন, —সহস্র সহস্র লোক 'প্রভু' বলে যাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়বে, তাঁরই তো সাজে এই বিস্ময়কর মৃত্যুবরণ! কত মনে কত দোলাই তো দিয়ে যায়!

মরুভূমির মধ্যাহ্ন সূর্য তখন মাথার ওপর। বধ্যভূমিতে তখন ওরা পৌঁছে গেছে। একে একে তিনজনকেই ক্রুশে বিদ্ধ করা হ'ল। যীশুর হাতের তালুতে মোটা পেরেক ঠুকে দেহটিকে দেওয়া হ'ল ঝুলিয়ে। পা দুটিও এক ক'রে পায়ের পাতার ওপর পেরেক ঠুকে ক্রুশ-সংলগ্ন করা হ'ল। পরার্থে জীবন দানের এই মর্মন্তুদ কাহিনীর কি আর তুলনা মেলে!

ওধারে দিক্‌চক্রবালে ঘনমেঘের আবির্ভাব হয়েছে। ক্রমে ক্রমে আরো অন্ধকার ঘনিয়ে এল। বিদ্যুৎও চমকাতে লাগল। কুয়াশার আবরণে ছোট ছোট পাহাড়ের মাথাগুলো হ'য়ে এল অস্পষ্ট। কেমন এক অজ্ঞাত ভয়ে সকলের দেহ শির্ শির্ করতে লাগল। এমন সময় শোনা গেল প্রভুর শেষ বাণী—'হে স্বর্গীয় পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মাকে ফিরিয়ে দিলাম।' পরক্ষণেই যীশুর শরীর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। তখন বেলা ৪টা, শুক্রবার (৭ই এপ্রিল), ৩০ খৃষ্টাব্দ।

এর পরেই আকাশ ভেঙে ভীষণ দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। জেরুজালেমের প্রধান মন্দিরের চন্দ্রাতপ হ'য়ে গেল দ্বিখণ্ডিত। ভূমিকম্পে মেদিনী উঠল কেঁপে। পাহাড় থেকে প্রস্তর-খণ্ডসকল ভেঙে পড়তে লাগল। কবরসকল হ'ল উন্মুক্ত। কয়েকটি মন্দিরও খান্ খান্ হ'য়ে ভেঙে পড়ল। এই দুর্যোগের পরেই যীশুর স্বশরীরে পুনরাবির্ভাব অনেকেই দেখলেন। সে আবির্ভাব সত্যই রহস্যময়।

এমনি ভাবে, মানুষের হাতেই ঐ দেবমানবের নির্যাতন শেষ হ'ল। এই মহান মৃত্যুর কথা স্মরণ ক'রে আজও শিল্পীর তুলি থেমে যায়, কবির কল্পনা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে, আর ভাবুক অতন্দ্র ধ্যানে তন্ময় হ'য়ে যায়। পৃথিবীতে এই বিরাট তিরোভাব অসীম বুভুক্ষা নিয়ে আজও প্রহেলিকাময়।

এস পথিক, আগত বড়দিনের সময়, এই কালজয়ী অবতারের পূত চরিত্র ও বাণী স্মরণ ক'রে আমরা আমাদের চলার পথের পাথেয় সংগ্রহ করি। তাঁর আশীর্বাদের আগ্নেয় মশাল জেলে শুদ্ধকর্মের পথে এগিয়ে চলি, চল। সবার জন্য তিনি তাঁর প্রাণ দিয়ে গেছেন—সেই প্রাণের আরাধনায় নিজেদের জীবন ধন্য ক'রে নাও। সার্থক হোক সবাকার অগ্রগমন। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

শ্রীশ্রীশিবানন্দস্তবঃ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

নমস্তে গুরবে তুভ্যং শিবানন্দস্বরূপিণে।
সচ্চিদানন্দরূপায় শম্ভবে দুঃখহারিণে ॥১॥
অহৈতুককৃপাসিন্ধো মায়াধ্বান্তবিনাশক।
ত্রাহি মাং ঘোরসংসারাজ্ জন্মমৃত্যুসমাকুলাৎ ॥২॥
দর্শনাদ্বৈ ভবন্মূর্তের্জ্ঞানমুৎপদ্যতে স্বয়ম্।
সাক্ষাল্লব্ধপ্রসাদোঽহং কথং ন ভবপারগঃ ॥৩॥
সাক্ষাচ্ছিবস্বরূপস্ত্বং কাশীবিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ং।
তারকব্রহ্মমন্ত্রেণ মুমূর্ষূংস্ত্বং বিমুঞ্চসি ॥৪॥

শরণাগত-দীনার্ত-ভক্তানাং শরণং প্রভো।
দীনার্তোঽহং প্রপন্নোঽস্মি ত্রাহি মাং ভববন্ধনাৎ ॥৫
মহাজ্ঞানী মহাধ্যানী দেহাত্মবুদ্ধিবর্জিতঃ।
রামকৃষ্ণৈকতাদাত্ম্যস্তন্নামগ্রহণপ্রিয়ঃ ॥৬॥
ত্যাগবৈরাগ্যসংযুক্তঃ সন্ন্যাসিপ্রবরো মহান্।
জীবন্মুক্তঃ সদানন্দশ্চাভিমানবিবর্জিতঃ ॥৭॥
জ্ঞানেন দর্শয়ন্ লোকাংস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
সেবকং ত্রাহি মাং নিত্যমেকান্তং শরণাগতম্ ॥৮॥

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

ভক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন লাহিড়ী

কোয়ালপাড়া মঠে কিছুদিন থাকার পর বাড়ী আসিবার পথে মায়ের সহিত দেখা করিয়া যাইব, মনে করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের জন্য কিছু মিছরি লইয়া যাত্রা করিলাম। তখন সন্ধ্যা। যাওয়ার পথে রাস্তা ভুল হওয়ায় খেয়া ঘাট হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে মা লোকজন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা দূরে লণ্ঠন দেখাইতেছিলেন এবং আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছিলেন; কিন্তু আমি ভয় পাইয়া আরও দূরে চলিয়া যাই।

তখন খুব মেঘ করিয়াছিল। খেয়া না পাইয়া মিছরি ও জুতা একসঙ্গে মাথায় লইয়া মায়ের কৃপায় বহুকষ্টে সাঁতরাইয়া নদী পার হইলাম। ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। বিদ্যুতের আলোকে দুইধারে কণ্টকময় বাবলা গাছের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে আছাড় খাইতে খাইতে চলিলাম এবং একবার বেতের কাঁটার উপর পড়িয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু মায়ের কৃপায় শরীর অক্ষত রহিল।

ঝড়বৃষ্টি কমিয়া গেলে নিকটস্থ গ্রামে একটা বাড়ীতে উঠিলাম। কাপড়ের পুঁটুলি ভিজিয়া গিয়াছে। সেই বাড়ীতে আমাকে খাইবার জন্য খুব সাধিল; কিন্তু মাকে দেখিবার জন্য প্রাণে অত্যন্ত ব্যাকুলতা থাকায় বেশী দামে মুটে ভাড়া করিয়া সেই রাত্রেই মায়ের কাছে পৌছিলাম।

যাইবামাত্র মা আমাকে 'পাগল ছেলে' বলিয়া বলিলেন, 'তোমার জন্য লোক পাঠিয়েছিলাম, তাদের তুমি দেখতে পাওনি?' তখন আমি বলিলাম, 'দেখেছিলাম কিন্তু ভয় পেয়ে কাছে যাইনি।' আমার ভিজা কাপড় দেখিয়া পরিবার জন্য আমাকে মা একখানা কাপড় দিলেন এবং আমার পরিত্যক্ত কাপড় নিজে-হাতে কাচিয়া শুকাইতে দিলেন এবং আমার গা-হাত মুছাইয়া দিলেন।

রাত্রি তখন ১০টা; বলিলাম: 'মা, আমি তোমার জন্য মিছরি এনেছিলাম, কিন্তু জুতা আর মিছরি এক হ'য়ে গেছে, এই মিছরি তোমাকে দেব না, ফেলে দেব।' তখন মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা, এ মিছরি তো আমার জন্য এনেছ?' আমি বলিলাম, 'তোমার জন্যই তো এনেছিলাম, মা।' মা আমার আর কোন কথা না শুনিয়া সযত্নে ঐ মিছরি লইয়া গেলেন।

রাত্রে মা আমাকে পরিতোষপূর্বক খাওয়াইলেন। পরে বলিলেন, 'দেখ বাবা, পরবসতশায়ী ও পরান্নভোজী কখনই হয়ো না। এ বড়ই কষ্ট, না বাবা?' আমি বলিলাম, 'মা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি কখনই তা হবো না।'

মা বলিলেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুরের সংসার মনে ক'রে সংসারে থাকবে এবং নিজে উপার্জন ক'রে খাবে।' আরও অনেক বিষয়ে উপদেশ দিয়া শেষে বলিলেন, 'ধর্মাড়ম্বর কখনও করবে না।'

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

সাধন করতে করতে দেখবে—আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগ্‌দি ডোমের মাঝেও তিনি…।

জীবন ও মৃত্যু

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

মৃত্যু যতক্ষণ সুদূরে, ততক্ষণ মৃত্যুর সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বকথা অনায়াসেই আমাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসে—যেন মৃত্যু একান্তই একটা সাধারণ ঘটনা, উহা আসা বা না আসা দুইই আমাদের নিকট সমান, যেন আমরা কনিষ্ঠ অঙ্গুলি নাড়িয়া মৃত্যুকে এক মুহূর্তে শাসন করিতে পারি! কিন্তু সেই মৃত্যুই যখন একটা ধ্রুব ঘটনা হইবার উপক্রম করিয়া একেবারেই সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন আমাদের মুখ শুকাইয়া যায়, আমাদের সকল আস্ফালন, বীরত্ব উদরের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ-উদাহৃত টিয়া-পাখীর গল্পটি অতিশয় সত্য। মার্জারের ছায়া যেখানে নাই, সেখানেই পাখীর মুখে 'রাম'-নাম মধুর, মার্জার দেখা দিলে উহার কণ্ঠ হইতে আর 'রাম' নাম নির্গত হয় না, বাহির হয় কেবল 'ট্যাঁ ট্যাঁ' শব্দ। এ সংসারে আমরা সকলেই প্রায় টিয়াপাখী। আমাদের ধর্মচর্চা, শাস্ত্রবৈদগ্ধ্য, জপতপ, পূজাপাঠ অনেক সময়েই শুধু শিখানো বুলি। জীবনের চরম পরীক্ষা যখন আসে, তাহার সম্মুখে তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য আমরা খুঁজিয়া পাই না, সেই পরীক্ষার সম্মুখে অতি বড় ধার্মিকও কাপুরুষের মতো ব্যবহার করেন। সহস্রবার যিনি 'অচ্ছেদ্যোঽয়ং অদাহ্যোঽয়ং' গীতার এই উক্তি পাঠ করিয়াছেন, উহা লইয়া কত বক্তৃতা দিয়াছেন, তাঁহারও আত্মা অন্ধকারে ডুব মারে; জীবন-প্রদীপের সলিতা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনিও মৃত্যুসময়ে আতঙ্কে চেঁচাইয়া উঠেন, 'আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও।'

হায় রে, বাঁচাইবে কে? মৃত্যু হইতে আখেরে কেহ বাঁচাইতে পারে কি? মোকদ্দমার মতো এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটিকে সাময়িকভাবে মুলতুবী রাখা চলে, কিন্তু একদিন তো খেলা-শেষের ঘণ্টা বাজিবেই। বুদ্ধদেব মৃত পুত্রের অবোধ জননীকে এই সহজ সত্যটি কেমন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছিলেন!

'হাঁ মা, তোমার সন্তানকে আমি পুনর্জীবিত করিব, তবে কিনা একটা দ্রব্যবিশেষের প্রয়োজন। আনিতে পারিবে কি?'

'নিশ্চয়ই! ছেলের জীবনের জন্য যেমন করিয়া পারি নিশ্চয়ই সংগ্রহ করিয়া আনিব। বলুন প্রভু, কি জিনিস?'

তথাগত একটু হাসিলেন—বড় করুণ হাসি। মানুষের মনের মোহ দেখিয়া ব্যথা পাইয়াছেন। বলিলেন, 'জিনিসটি এমন কিছু দুষ্প্রাপ্য নয়। এক মুঠা সরিষা। তবে সরিষা এমন বাড়ী হইতে আনিবে মা, যে বাড়ীতে কেহ কখনো মরে নাই।'

রমণী ছুটিল। দ্বারে দ্বারে যাচাই করিল, 'ওগো তোমাদের বাড়ীতে কখনো কাহারো মৃত্যু হইয়াছে কি? বল, বল, শীঘ্র বল। এই প্রশ্নের উত্তরের উপর আমার হারানো বুকের মানিককে ফিরিয়া পাওয়া নির্ভর করিতেছে।'

প্রশ্নটির উত্তর তো সকলেই জানে। রমণীও জানিত। তবে উত্তরটি নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন, তাই ভুলিয়া গিয়াছিল। এবার একশত দরজায় ঘুরিয়া নিরাশ হইবার পর প্রশ্নের উত্তর পাকাপাকি হৃদয়ে বসিয়া গেল।—না, এমন সরিষা পাওয়া যাইবে না। সব বাড়িতেই মৃত্যু হানা দিয়াছে এবং দিবে। মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। মৃত পুত্র

বাঁচিতে পারে না। শোক সহিয়া যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

জন্মিলে মরিতে হয়, সকলেই ইহা জানে, তবে নিজের ক্ষেত্রে মানিতে চায় না। বিপদ এইখানেই। নিজেকেও একদিন মরিতে হইবে, ইহা আগে হইতে যদি চিন্তা করা থাকে, তাহা হইলে মৃত্যু আসিলে ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিতে হয় না। কবির ন্যায় বলিতে পারা যায় —'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।'

কই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো 'আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও' বলিয়া সন্ত্রাসে চিৎকার করিয়া ওঠেন নাই। জীবন ও মৃত্যু দুয়ের পারে শাশ্বত সত্যে দাঁড়াইয়া দেহত্যাগের পূর্বে 'ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে' আবিষ্কার করিয়া গেলেন। তিনি সারা জীবন উপনিষদের মন্ত্র গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, তোতাপাখীর মতো আওড়ান নাই, সেইজন্য অমন ধীর প্রশান্তভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারিয়াছিলেন। জীবনের পরপারে কি আছে—তাহার পুঁথিগত পাণ্ডিত্য-পূর্ণ উত্তর রবীন্দ্রনাথ হয়তো বলিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার নিজের প্রজ্ঞাজনিত বিশ্বাস তিনি নিঃসংশয়ে ঘোষণা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। না, ওপারে যাহা আছে তাহা শূন্য নয়, অন্ধকার নয়, তাহা শান্তি-সমুদ্র—'সম্মুখে শান্তি-পারাবার'। তাহা একটা নৈর্ব্যক্তিক অসাড় দার্শনিক তত্ত্ব মাত্র নয়—তাহা চৈতন্যময়, প্রেমময় ভাগবত ব্যক্তিত্ব। জীবনের এপারে পদে পদে যাঁহার সন্ধান পাইয়াছি, তিনিই ওপারে তাঁহার পুঞ্জীভূত মমতা লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন—জীবনের পরম দেবতা, কর্ণধার। এ পারের খেলাঘর ভাঙিল, এই দেহরূপ খেলনাটি পড়িয়া থাকিবে, পুড়িয়া ছাই হইবে, তাহাতে ভয় কি, বেদনা কি? স্থূল দেহ ব্যতিরিক্ত আমার একটি আলাদা সত্তা আছে—আমার আত্মসত্তা। উহা অনন্ত সত্যের পথে যাত্রী। উহা তরণীর মতো হেলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া চলিবে। কর্ণধার রহিয়াছেন। তিনিই উহাকে যথাপ্রয়োজন ভাসাইয়া লইয়া চলিবেন। তাই প্রার্থনা—'ভাসাও তরণী হে কর্ণধার!' এ পারের কল্পনা, বিদ্যাবুদ্ধি দিয়া ওপারের সেই 'চিরসাথী'কে বুঝিয়া ওঠা যায় না। কিন্তু প্রাণ জানে তিনি আছেন। এ পারের মাপকাঠিতে তিনি অজানা হইলেও তাঁহার ঘনীভূত দয়া, ক্ষমা, আলোক লইয়া ধ্রুবতারার মতো তিনি বিরাজ করিতেছেন।

'মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার॥'

ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সংস্কৃতি মৃত্যুকে বাদ দিয়া জীবনকে কখনও বালির বাঁধের উপর গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে নাই। মৃত্যুকে গোঁজামিল দিয়া চাপিয়া রাখিতে গেলে জীবনের সত্যও চাপা পড়িয়া যায়। 'হাঁ, শুনিয়াছি বটে মানুষের একটা আত্মা আছে, মরণের পরে ঈশ্বরের কাছে তাহার বিচার হয়, তাহার পর সে বেহেস্ত বা জাহান্নমে যায়, অনন্ত সুখ বা অনন্ত দুঃখ ভোগ করে।......'—এইটুকু ধারণা যথেষ্ট নয়। আত্মা যদি থাকে তো তাহার সম্বন্ধে গভীরতর জিজ্ঞাসা প্রয়োজন। আত্মার প্রকৃতি কি? কেন আত্মা দেহের মধ্যে ধরা পড়ে, আবার দেহ ছাড়িয়া চলিয়াই বা যায় কেন? দেহের মধ্যে বাঁধা পড়া কি একবারই ঘটিয়াছে, না অতীতকালে আরও অনেকবার? এইবারকার জন্ম শেষ হইলে আর কি জন্ম হইবে না? ভগবানের এ কি বিচার? এই জীবনে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা,

কত ভালবাসা, কত আনন্দ! পঞ্চাশ বা ষাট বা আশী বৎসরে কতটুকুই বা পাওয়া গেল? আরও যে কত পাইবার ছিল। এত তাড়াতাড়ি সব ফুরাইয়া যাইবে? আর সুযোগ আসিবে না? —স্বর্গে যাইয়া মিলিবে? আর স্বর্গ যদি ফসকাইয়া যায় তাহা হইলে? অনন্ত নরক? সর্বনাশ! —এই সকল প্রশ্নের নিঃসন্দিগ্ধ জবাব চাই। তবেই জীবনকে যথার্থ বুঝা যাইবে, বুঝিয়া উহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা চলিবে। জীবনের অতীত ও ভবিষ্যৎ যাহারা মানিতে চায় না—সত্য, ন্যায়, বিবেক, স্বার্থত্যাগ, সংযম, সহানুভূতি প্রভৃতি মানব-ধর্ম তাহাদের নিকট একপ্রকার অর্থহীন। তাহারা 'বর্তমানের' উপাসক। যে কোন উপায়ে বর্তমানের সুখ ও সুবিধা নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য লুটিয়া লওয়াই তাহাদের লক্ষ্য। আশেপাশের লোক-গুলির চোখে ধুলা দিয়া কাজ হাসিল করিতে পারিলেই হইল। অলক্ষ্যে অপর কোনও বিচারকের কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। জীবন বলিতে তাহাদের নিকট ইন্দ্রিয়ভোগৈক-লক্ষ্য এই পৃথিবীর জীবনটুকু বুঝায়। ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যের অন্যতম শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ এই ধরনের লোককে 'অসুর' বলিয়াছেন। তাহারা 'অল্পবুদ্ধি', 'উগ্রকর্মা', দুষ্পূরণীয় কাম, দম্ভ, মান ও মোহ আশ্রয় করিয়া তাহারা শুধু জগতের অমঙ্গলই করিয়া চলে। (গীতা—১৬শ অধ্যায়)

মৃত্যুর কথা ভাবিলে মানুষের চিন্তায় ও কর্মে রূপান্তর আসিতে বাধ্য। বার বার জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া, নানা শরীর পরিগ্রহ করিয়া মানবাত্মা প্রগতির পথে চলিয়াছে। এই সংসার তাহার চিরদিনকার ঘর নয়, যাত্রাপথে একটি পান্থশালা মাত্র; অতএব সংসারের সহিত বেশী জড়াইয়া পড়িলে তো তাহার চলিবে না, অনাসক্তিপুরঃসর তাহাকে কর্তব্য কর্ম করিয়া যাইতে হইবে, জীব-নের চরম লক্ষ্য বিস্মৃত না হইয়া ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, সংযম, সেবার অনুশীলন দ্বারা সংসারাতীত সত্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই সনাতন ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যু কোনটাই মানবাত্মার চরম উপেয় নয়, পরম শ্রেয়োলাভ-রূপ উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র। জীবন লইয়া অনাবশ্যক অশোভন মাতামাতি নয়, মৃত্যু আসিলে ভয়ে চিৎকারও নয়। জীবন হইতে পলায়ন নয়, উহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার; কেননা জীবন পূর্ণতার যাত্রাপথের একটি শুভ সুযোগ। আবার জীবন হইতে বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইলে কান্নাকাটি করিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া উহাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার হাস্যকর চেষ্টাও নয়, মৃত্যুকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা; কেননা মৃত্যু যাত্রাপথের আর একটি কল্যাণ-চিহ্ন।

কঠোপনিষদে দেখিতে পাই—বালক নচি-কেতাকে ধর্মরাজ যম তিনটি বর দিতে চাহিলে নচিকেতা শেষ বরে মৃত্যু-রহস্য জানিতে চাহিতে-ছেন। যম নচিকেতাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; বলিলেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, এত বড় জটিল তত্ত্বজিজ্ঞাসা তোমার জন্য নয়। তুমি বরং অন্য কিছু চাও, পৃথিবীতে যাহা কাজে লাগে—টাকাকড়ি, পরমায়ু, গাড়ীঘোড়া, বন্ধু-বান্ধবী, রাজত্ব—এই সব।' নচিকেতা ভুলিবার ছেলে নয়; কহিল, 'না ঠাকুর, ও সব খেলনায় আমার কাজ নাই। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া খেলিয়া হয়রান হইয়াছি। আর খেলা নয়। কেন খেলি, কোন্ স্বার্থে খেলি, কে খেলায়? এবার এই সেরা প্রশ্নটির উত্তর চাই।' বালকের জিদ দেখিয়া যমরাজ মনে মনে খুশী। পৃথিবীতে তো সকলেই 'কলাই-এর ডালের খরিদ্দার'। সেরা জিনিস চায় কে? ঠিক ঠিক যদি কেহ চায়, তাহাকে দিয়াও সুখ। নচিকেতার মতো জিজ্ঞাসুকে

আত্মবিদ্যা বলিলে আত্মবিদ্যা সার্থক। অতএব যমরাজ নচিকেতাকে জন্মমৃত্যুর রহস্য উপদেশ করিলেন। উপনিষদ্‌ উপাখ্যানের উপসংহার করিয়া ঘোষণা করিতেছেন: মৃত্যুরাজ যমের মুখে আত্মবিদ্যা শুনিয়া নচিকেতা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিলেন, বিরজ এবং বিমৃত্যু হইলেন। অপরেও নচিকেতার মতো আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন। (কঠোপনিষৎ ২।৩।১৮)

আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ—একই বস্তুর এ-পিঠ ও-পিঠ। মানুষ যতক্ষণ অজ্ঞানের মধ্যে রহিয়াছে ততক্ষণ সে নিজেকে দেহের সহিত, মনের সহিত এক করিয়া দেখে। অজ্ঞানের ঘোর কাটিয়া গেলে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা সে বুঝিতে পারে; বুঝিতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বানানো গল্প বলেন নাই, সত্য কথাই বলিয়াছিলেন—আত্মা জন্মান না, মরেন না, চিরকাল রহিয়াছেন, অনন্ত মহাকাশের মতো ব্যাপিয়া রহিয়াছেন সব কিছু, অথচ কোন কিছুর সহিত লিপ্ত নন। —পারাপারহীন মহাসমুদ্রের মতো উদার, গম্ভীর, প্রশান্ত। সমুদ্রবক্ষে ঢেউএর মতো সংসারের বহু বিচিত্র অভিব্যক্তি চৈতন্য-সিন্ধুতে উঠিতেছে, লয় পাইতেছে। আত্মার এই সত্যস্বরূপের নাম ব্রহ্ম। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ বৃহত্তম। যে আত্মা অজ্ঞানবশে দেহের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, নাচিতেছে, কুঁদিতেছে, সেই আত্মাই চোখের ভ্রম কাটিয়া গেলে দেখিতে পায় সে মহাকাশ, সে মহাসমুদ্র, সে ব্রহ্ম। নচিকেতা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই উপনিষদ্‌ বলিলেন, তিনি 'ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুঃ'।

উপনিষদ্‌ বলিতেছেন, রামশ্যাম যদুমধু মালতীমাধবীরও আশা আছে। তাহারাও নচিকেতার মতো নিজের মধ্যে ডুবিয়া নিজেকে খুঁজিয়া পাইতে পারে নিজের মায়ানির্মুক্ত জন্মহীন মৃত্যুহীন সত্তাকে—নিজের বৃহত্তম সত্য ব্রহ্মভাবকে। নিজেকে এইরূপ খুঁজিয়া পাওয়াই মানুষের চরম লক্ষ্য। যতদিন না নিজেকে আবিষ্কার করা যাইতেছে ততদিন মানুষের যাত্রার বিরতি নাই; শরীরের পর শরীর পরিগ্রহ করিয়া, অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া কখনও বেহেস্ত, কখনও জাহান্নম, কখনও এই দুনিয়ায় তাহাকে ক্রমাগত চলিতে হইবে। সে চলা আশার মধ্য দিয়া আবার নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া, উল্লাসের মধ্য দিয়া আবার বেদনার মধ্য দিয়া, সার্থকতার মধ্য দিয়া আবার ব্যর্থতার মধ্য দিয়া। একটানা আলোক নাই, একটানা তৃপ্তি বা সার্থকতা নাই। চলার রীতিই এই প্রকার। তাই অনবরত চলা কখনো মানুষের অভীপ্সিত নয়। ক্ষান্তি চাই। ক্ষান্তি আসে আত্ম-আবিষ্কারে—ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে। রামশ্যাম যদুমধু মালতীমাধবীদের প্রত্যেককে একদিন চলায় ক্ষান্তি দিতে হইবে—দুদিন আগে বা পরে। কিন্তু যে চতুর সে আগে হইতে সাবধান হয়, জন্মমৃত্যুর প্রবাহে গা ভাসাইয়া না দিয়া জন্মমৃত্যুর রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করে, নিজেকে ঐ প্রবাহ হইতে মুক্ত করিতে মনোযোগী হয়।

সহজ কথা অবশ্যই নয়। অনেক পড়িলে, অনেক শুনিলে, অনেক মঠে-মন্দিরে ঘোরাঘুরি করিলেই যে আত্মদৃষ্টি খুলিয়া যাইবে, তাহা বলা চলে না। অতবড় মেধাবী পণ্ডিত রাজর্ষি জনক—তাঁহারই কি সম্যক্‌ বোধ সহজে আসিয়াছিল? বহুদিন ধরিয়া তিনি বেদান্ত শুনিয়াছেন, ধ্যানধারণা করিয়াছেন, জ্ঞানী পুরুষ বলিয়া সর্বত্র তাঁহার খ্যাতি, নিজের মনে একটা গর্বও বোধ করি ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য মুনি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'আচ্ছা মহারাজ, এত তো পড়াশুনা জপ তপ করিয়া-

ছেন, বলিতে পারেন মৃত্যুর পর কোথায় যাইবেন?'

সোজাসুজি এইরূপ প্রশ্নের জন্য রাজর্ষি প্রস্তুত ছিলেন না। ঘাবড়াইয়া গিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, 'না, তাহা ঠিক জানি না।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'মহারাজ, এত বেদ-বেদান্ত পড়িয়াছেন, এত জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, কিন্তু আসল কাজের কথাটিতেই হুঁশ রাখেন নাই? শুনুন তবে শেষবারের মতো। জিজ্ঞাসা করি আপনার কি মৃত্যু আছে? আপনার কি জন্ম হইয়াছিল? জন্মমৃত্যুর প্রসঙ্গ তো দেহের, মনের এবং প্রাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আপনি তো চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঊর্ধ্ব অধঃ—যে দিকে তাকান সেই দিকেই আপনি বিদ্যমান। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ—যে কালের কথাই ভাবুন সেই কালেই আপনি রহিয়াছেন। অতএব মৃত্যুর পর কোথায় যাইবেন—এই প্রশ্নটিই আপনার পক্ষে অবান্তর। আপনার শাশ্বত স্বরূপের দিকে তাকান। এই মুহূর্তে সকল প্রশ্ন, সকল সংশয় মিটিয়া যাইবে।' (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—৪।২)

জনকরাজার সংশয় মিটিয়া গিয়াছিল বই কি! তবে সময় লাগে, শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, বিশেষতঃ যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় তত্ত্বদ্রষ্টা শিক্ষকেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু সংশয় যখন মিটে, তখন ভাগ্যবান্ ভাবে—এত সহজ সরল আলোকময় জিনিসটিকে কি করিয়া এত গভীর অন্ধকারে কবর দিয়া রাখিয়াছিলাম? যে চিরন্তন আত্মার অস্তিত্বে সব কিছুরই অস্তিত্ব, সেই আত্মাকেই খুঁজিয়া পাই নাই! যে জ্ঞানময় আত্মার চৈতন্যালোকে সব কিছু দেদীপ্যমান, তাঁহারই উপর সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভার চাপাইয়া বাহবা লইতেছিলাম! যে রসময় আত্মার আনন্দকণা বিষয়ের শত সহস্র আকর্ষণকে অনুক্ষণ মূল্য দিতেছে, তাঁহাকে বাদ দিয়া হাটে বাটে স্ফূর্তি খুঁজিয়া ফিরিয়াছি! কী মূর্খই ছিলাম! * * * আমি শুধু জীবনই পাই নাই, মৃত্যুও পাইয়াছি, আমার জন্য উহা বাক্সবন্দী হইয়া আছে, সময়মতো আমাকে বরণ করিবে। অতএব মৃত্যুকে ভুলিয়া জীবনের সহিত যেন কায়েমী সম্পর্ক পাতাইতে না যাই। যদি যাই তো কাঁদিতে হইবে, ভয়ে চিৎকার করিতে হইবে, ঠকিতে হইবে।

জীবন ও মৃত্যু—দুয়েরই পারে ঐ দুয়ের বিধাতা রহিয়াছেন,—আমার একান্ত লক্ষ্য, আরাধনার ধন, আমার প্রেমের ভগবান। জীবনে যদি তাঁহাকে ধরিতে পারিয়া থাকি তো মৃত্যুর পরেও তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইব না। অতএব মৃত্যু হইতে ভয় পাইবার আমার কিছুই নাই। মৃত্যুর সময় অবশ্য কিছু এখানে ছাড়িয়া যাইতে হইবে—এই দেহ, এই দেহের পরিবেষ্টনী, এই বন্ধুবান্ধব, এই পৃথিবীর বহু আনন্দস্মৃতি। কিন্তু আমার জীবন-সত্য, আমার জীবন-মরণের নিয়ামক, আমার ভগবানের অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত মাধুর্যের কাছে সেই ছাড়িয়া-যাওয়া বস্তুগুলি খুব বেশী বড় কি? যখন শিশু ছিলাম তখন খেলনাগুলিকে কতই না ভালবাসিতাম, ভাবিতাম উহাদের বিচ্ছেদ কিছুতেই সহিতে পারিব না। মা যখন কোলে নিবার জন্য ডাকিতেন, তখন কাঁদিতাম; বলিতাম, মা, এখন না, আর একটু খেলিয়া লই। মা হাসিতেন। এই জীবনের খেলনাগুলির প্রতি যদি শিশুর মতো অন্যায্য আসক্তি দেখাই, তাহা হইলে আমার চিরন্তনী বিশ্বজননীও হাসিবেন।

জীবন ও মৃত্যুর বিধাতা ভগবানকে মানিয়া, ভালবাসিয়া মনুষ্যত্বকে সার্থক করা যায়। সেই ভালবাসার ভগবানকে যখন জ্ঞানের দিক দিয়া

বিচার করি, তখন তিনি আমার আত্মার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি—পরমাত্মা—ব্রহ্ম। বিচারের দিক দিয়াও আমি জীবন ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া।

ভগবৎপ্রেম ও আত্মজ্ঞান যাহাই আমি বাছিয়া লই না কেন, উহা আমাকে জীবনের পরম সত্যে উপনীত করিবে—যাহা নিঃসন্দিগ্ধ, ভয়-মোহ-ক্ষুদ্রতা-বিমুক্ত, শাশ্বত জ্ঞান ও আনন্দ। উহা আমাকে মৃত্যুর মর্মও বুঝিতে দিবে। মৃত্যু আমার শত্রু নয়, বন্ধু। মৃত্যু আমাকে ধাপে ধাপে সত্যের পথে লইয়া যায়। সত্যে পৌছিলে বলে, 'বন্ধু বিদায়, আর আমি আসিব না, তবে বেশ বদলাইয়া অবিনাশী সত্যের সহিত মিশিয়া চিরদিন তোমার পাশে পাশে থাকিব।'

মরণ-কল্পনায়

'বৈভব'

জীবনের অবেলায়
বিদায় দাও গো ধরণী জননি,
বিদায়, মা গো বিদায়!
কেহ নাহি জানে কোথা কোন দিন
শুধিবার লাগি কার কিবা ঋণ
বেজে উঠেছিল এ জীবন-বীণ;
কেহ জানিবে না হায়,
কেন সে সহসা বাজিয়া থামিল
মরণ-কল্পনায়!

*

আমার আঁখিতে আঁধিয়ার লাগে
আর, কিছু নাহি দেখা যায়;
জীবনের যত প্রিয়তম ছায়া
ম্লান হ'য়ে আসে হায়!
সত্য সে ধরে সত্যের রূপ,
মিথ্যা মিলায়ে যায় চুপিচুপ,
মর্ত্যের মায়া অতি অপরূপ
মৃত্যুর মহিমায়—
আমার চোখেতে ধরা দিতে চায়
সুনিবিড় নীলিমায়!

*

ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বর্তমান রূপ

ডাঃ শ্রীপীযূষকান্তি লালা

[গত মাসে প্রকাশিত লেখকের প্রবন্ধ 'ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অতীত' এই প্রসঙ্গে পঠিতব্য। উঃ সঃ]

ভারতের জাতীয় জীবনে ক্রমাগত যে সব রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে—তাতে জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যে মুছে যায়নি, এটাই আশ্চর্য। কিন্তু ছয়শ' বছরের মুসলমান শাসন ও দুশ' বছরের ইংরেজ শাসনের পরও সনাতন হিন্দুধর্ম যেমন টিকে আছে—তেমনি বেঁচে আছে ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতি। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতোই ভারতের সুপ্রাচীন এবং নিজস্ব চিকিৎসা-পদ্ধতিও বাঁচিয়ে রেখেছে নিজেকে, একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায়নি; বেঁচে আছে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নয়, বা উন্নত বিজ্ঞানের আলোকে দীপ্তিমান্ হ'য়ে নয়—বেঁচে আছে নেহাত এক যান্ত্রিক চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসেবে অধুনালুপ্ত গৌরবদীপ্ত এক বিজ্ঞানের স্মারক চিহ্ন হ'য়ে।

তার এ দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান করলে রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক ছাড়া যে বড় কারণটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানের প্রচণ্ড অগ্রগতি আজ আমাদের পারমাণবিক যুগের যে ধাপে পৌঁছে দিয়েছে, তার প্রধান অবদানসমূহই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের; চিকিৎসা-বিজ্ঞানও এগিয়েছে সমান তালে, প্রথম মহাযুদ্ধে মারণাস্ত্রসমূহের যেমন উন্নতি হ'ল—তেমনি যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগের মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ে শক্তি-পরীক্ষায় এগিয়ে এলেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা, পচনহীন অস্ত্রোপচার (Aseptic Surgery) হ'ল এযুগের মুখ্য আবিষ্কার—যদিও পচন-প্রতিরোধের উপায় এর আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হ'ল অ্যান্টিবায়োটিকস্ (Antibiotics); পেনিসিলিন্ (Penicillin)-এর আবিষ্কার যদিও ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে, তার ব্যবহার শুরু হয় যুদ্ধকালে। তারপর একের পর এক নূতন অ্যান্টিবায়োটিক্ যে শুধু ভেষজ-চিকিৎসাক্ষেত্রে যুগান্তর আন্‌ল তা নয়, শল্য-চিকিৎসাকেও ক'রল আরও সহজ এবং নির্বিঘ্ন। এর সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাক্ষেত্রে প্রাধান্য পেল জৈব রসায়ন (Biochemistry), যা আগে খুব আদৃত হয়নি। ভেষজক্ষেত্রে শীঘ্রই তার আবিষ্কারসমূহ হ'য়ে উঠল অতি প্রয়োজনীয়। তবুও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ হ'তে এখনও অনেক দেরি, এবং তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণাকার্য এখনও সমানেই চলছে।

* * *

ইতিমধ্যে দেখতে পাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাধনা শুরু হ'য়ে গেছে আমাদের দেশেও। চিকিৎসাক্ষেত্রেও আধুনিক বিজ্ঞানের অবদানগুলি সমান ভাবেই আদৃত হ'ল, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধাগুলিকে ভিত্তি ক'রে নূতনভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাধনায় অগ্রণী হলেন বাঙালী মনীষী প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর প্রেরণাতেই রসায়নের গবেষণা দিয়ে এ কাজ শুরু হয়। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন অনেকেই। আবিষ্কার-ক্ষেত্রেও তাঁদের অবদান সারা বিশ্বে আদৃত। স্যার ইউ. এন্. ব্রহ্মচারী, আর. এন্. চোপরা—এঁদের নাম কে না জানে? তবুও একমাত্র গবেষণাকার্যে সুযোগ-সুবিধার অভাবের জন্যেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এখনও ভারত পরমুখা-

পেক্ষী হ'য়ে আছে। এ গেল পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সাধনার মোটামুটি রূপ। সে অবস্থায় বিধ্বস্ত প্রায়াবলুপ্ত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে পেছিয়ে থাকবে ও অনাদৃত হ'য়ে থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। বর্তমানের দুএকটি নামকরা আয়ুর্বেদ-প্রতিষ্ঠানই তার রূপ ফিরিয়ে দেয়নি।

এবারে এ অবস্থার বৈজ্ঞানিক দিকটা বিশ্লেষণ করা যাক। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আসে তার সবদিকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য; এবং বিজ্ঞান-সাধনায় স্বভাবতই বিজ্ঞানীদের আশ্রয় নিতে হয় তার এক একটা দিকের। তার থেকেই শুরু হয় বিশেষ জ্ঞানার্জন বা Specialisation। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি ও সম্প্রসারণেও হ'ল তাই। রোগ-প্রতিরোধ এবং নিরাময়ে তার জনপ্রিয়তাও কাজেই হ'য়ে উঠল অনন্য। বর্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গড়ে উঠেছে অসংখ্য দিক। শুধু ভেষজ-চিকিৎসার কথাই যদি ভাবি, তাহলে অনেকগুলি দিক আপনা-আপনিই চোখে পড়ে। প্রথমতঃ ভেষজ-সমূহের অন্যতম প্রধান উৎস উদ্ভিদ্‌বিদ্যার সাহায্য আসে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী-র (Botanist) কাছ হ'তে; এ সব উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য ভেষজের উৎস বস্তুসমূহের গুণাগুণে অভিজ্ঞ তিনি হলেন ভেষজবিদ্ (Pharmacologist); এসব জৈবিক ও অজৈবিক পদার্থের সংশ্লেষণ ও সংমিলনে ওষুধ হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী পদার্থ হাতের কাছে এগিয়ে দেন রসায়নবিদ্ (Chemist); রোগীর রোগ নির্ণয় ক'রে উপযোগী ওষুধ যিনি ব্যবহার করবেন নিরাময়ের জন্যে—তিনি হলেন চিকিৎসাবিদ্ (Therapeutist)। কাজেই আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রমবিভাগ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের পরিশ্রমের অনেক লাঘব করেছে। সাধারণ চিকিৎসাবিদের যদিও উপরোক্ত বিজ্ঞানের বিভাগগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার, সব বিষয়গুলিতে তাঁর বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

এবার সাধারণ আয়ুর্বেদবিদ্‌গণের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করলে দেখা যাবে, এ শ্রম-বিভাগের অভাবেই তাঁরা কতটা পেছিয়ে আছেন। বর্তমান আয়ুর্বেদে তো শল্যবিদ্যার ব্যবহার উঠে গেছে বললেই চলে। ভেষজ-চিকিৎসাতেই তাঁরা অসুবিধার সম্মুখীন হন পদে পদে। বর্তমান কবিরাজদের অধিকাংশই এ বিষয়ে ভুক্তভোগী। চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হ'লে তাঁদের হ'তে হবে (Botanist, Chemist ও Therapeutist) সব একসঙ্গে, একই লোককে পরিচয় রাখতে হচ্ছে গাছ-গাছড়ার শ্রেণীগোষ্ঠী সম্বন্ধে, সেগুলির গুণাগুণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে, আবার তা থেকে ও অন্যান্য পদার্থ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ওষুধ নিষ্কাশনের কাজটাও তাঁর। এর জন্যে দরকারী সাজসরঞ্জাম মজুত চাই তাঁর কাছে; অল্প খরচায় তা থেকে ওষুধ তৈরীর পদ্ধতিও তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তিতেই নির্ণীত হবে এবং সে ওষুধ তিনি ব্যবহার করবেন রোগনির্ণয়ের পর। এত গুণের অধিকারী হ'তে পারলে তবেই তিনি চিকিৎসক হ'তে পারবেন। কাজেই আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাথে আয়ুর্বেদ পাল্লা দিতে পারবে কেন?

আজকাল অবশ্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের আহৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে আয়ুর্বেদ শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেমন বারাণসী ও ত্রিবান্দ্রম্ প্রমুখ স্থানে, কিন্তু সুসংহত গবেষণা ও শ্রম-বণ্টনের অভাবে তার কতটাই বা কাজে লাগছে?

ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নয়নের উপায়

বর্তমান ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এ অবস্থায় কি ক'রে অল্প সময়ে দেশকে অগ্রণী করা যায়? এ প্রশ্নের জবাব কঠিন নয়। আয়ুর্বেদ-সম্মত ভেষজ-চিকিৎসা এবং পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-অনুসৃত পথে ভেষজ-চিকিৎসা—এ দুয়ের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখতে পাই, মূলতঃ দুয়ে কোন তফাৎ নেই। বর্তমানে যে তফাৎটা গড়ে উঠেছে, তা হ'ল বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বনিয়াদ পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও সিদ্ধান্তের (experiment, observation and inference) ভিত্তিতে আরও সুদৃঢ় হয়েছে, আর আয়ুর্বেদ-শিক্ষাপ্রণালী এতদিন তারই অভাবে আয়ুর্বেদ-চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে পেছিয়ে রেখেছে। পুরাকালের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আয়ুর্বেদ শিক্ষাদান ও আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার গৌরব নিয়ে হা-হুতাশ করলেই সে দিন ফিরে আসবে না। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, শারীরবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদির ভিত্তিতে জ্ঞান আহরণ ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রোগনির্ণয়ের সুযোগগুলিকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদের রত্নভাণ্ডারকে ওগুলির মধ্য দিয়েই কাজে লাগাতে হবে। বর্তমান চিকিৎসা-জগতে আয়ুর্বেদমতে চিকিৎসা ও পাশ্চাত্যমতে চিকিৎসা—এ দুয়ের যে ব্যবধান রচিত হয়েছে, তা হ'ল বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অভাবে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের মধ্য দিয়ে এগুলি একে অন্যকে সমৃদ্ধ করতে পারে। দুটি মোটেই পরস্পরবিরোধী নয়; একে অন্যের পরিপূরক। সংস্কারমুক্ত মনে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এখনকার বিজ্ঞানপ্রদত্ত সুযোগ কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে আমরা আরও সমৃদ্ধ করতে পারি আয়ুর্বেদিক রসায়ন ও ভেষজসমূহের উপযোগী ব্যবহার পুনরুদ্ধার ক'রে।

বর্তমান ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান বলতে আজ শুধু প্রাচীন আয়ুর্বেদকেই বোঝায় না। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ-সম্ভার হ'তে আমাদের দেশ বঞ্চিত হয়নি এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় চিকিৎসা অনেকখানি এগিয়ে গেছে আমাদের দেশে। সেখানে 'ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নয়ন' মানে এ নয় যে আয়ুর্বেদের অগ্রগতি যেখানে এসে রুদ্ধ হয়েছে বা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, সেখান থেকেই কেঁচে গণ্ডূষ শুরু করা। বরং আধুনিক বিজ্ঞানের শক্ত বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আয়ুর্বেদের সদ্ব্যবহার করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আয়ুর্বেদের পুরানো ভেষজশাস্ত্র-সমূহ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের আগ্রহ কেন এত বেশী? কেন আজ আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ বিদেশে চলে গেছে? তার কারণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের জ্ঞানস্পৃহা ও গ্রহণশীল মনোবৃত্তি। বৃটিশ আমলেই হিমালয়-অঞ্চলের নানা ভেষজগুণসম্পন্ন উদ্ভিদ্ চালান হয়েছে বিদেশে—আর তা থেকে নিষ্কাশিত ওষুধ আমাদের দেশে এসেছে অতি দামী পণ্য হিসেবে। প্রচুর দাম দিয়ে সে ওষুধ আমদানি করতে হয়েছে বৃটেন জার্মানি ও আমেরিকা থেকে, আর ভারতের গরীব রোগগ্রস্ত জনসাধারণ তাদের সঞ্চিত অর্থ তুলে দিয়েছে ও দিচ্ছে এসব বিদেশী ওষুধের প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে।

বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সুপ্রচলিত অনেক ওষুধের ব্যবহার আয়ুর্বেদশাস্ত্রেই ছিল এবং তা আয়ুর্বেদশাস্ত্রের সমৃদ্ধিই প্রমাণ করে, যে পারদ (Mercury) ও তার লবণসমূহ (Salts) প্রস্রাব-বৃদ্ধির কাজে সুপ্রচুর ব্যবহৃত হয়—তার ব্যবহার আয়ুর্বেদে রয়েছে বহু প্রাচীনকাল হতেই,

যে সর্পগন্ধা (Rauwolfia Serpentina) ও তজ্জাত ভেষজসমূহ রক্তচাপবৃদ্ধি থেকে শুরু ক'রে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার ব্যবহার স্মরণাতীত কাল হ'তে আয়ুর্বেদে চলে আসছে। এর ব্যবহার প্রথমত উদ্ধৃত হয় আয়ুর্বেদ থেকেই। আশার কথা দু-একটা দেশীয় ভেষজের ব্যবহার পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে সাফল্যের সঙ্গে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে—সজনের মূল থেকে তৈরী আলকালয়েড্ (Alkaloid) স্পাইরোচিন্ (Spirochin)-এর ব্যবহার পুরানো ক্ষতসমূহ নিরাময়ে কার্যকর হচ্ছে

তবুও ভারতীয় ভেষজসম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য কি প্রচেষ্টা আছে—সরকারী বা বেসরকারী? সরকারী প্রচেষ্টা নগণ্য। সারা ভারতে এর জন্যে বিশেষভাবে তৈরী একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান হ'ল Central Institute for Research in Indigenous Systems of Medicine (জামনগর)। বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাবার জন্যে সরকার আজ ভেষজ-দ্রব্যের আমদানি নিয়ন্ত্রিত করেছেন, ও দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহদানের কথা বলছেন। এ প্রচেষ্টা সাধু সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে কি আসল সমস্যার সমাধান হয়েছে? অতি প্রয়োজনীয় বিদেশী ওষুধ কেনার জন্যে আজও গরীব জন-সাধারণকে মূল দামের তিনচারগুণও দিতে হয়, কারণ সব প্রয়োজনীয় ওষুধ-তৈরীতে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং তাদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হ'তে পারে সে রকম ওষুধও বেরোয় নি। ওষুধ-তৈরীর ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টা এবং ভারতের ভেষজসম্পদ্‌কে কাজে লাগানোর প্রয়াস দেশীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে আছে—এটা আশার কথা, কিন্তু এ সব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেরই নিজস্ব কোন গবেষণাগার নেই, বা গবেষণাকার্যে উৎসাহদানের মতো সঙ্গতিও অনেকেরই নেই। সরকারী প্রচেষ্টা অতি সামান্য। দেশীয় ভেষজসম্পদ্ নিয়ে গবেষণা চালাবার মতো গবেষণাগারের অভাব অতি মাত্রায় প্রকট। দেশীয় ভেষজসম্পদ্ নিয়ে গবেষণায় উৎসাহদানের জন্যে কয়টি গবেষণা-বৃত্তির ব্যবস্থা সরকার করেছেন? দেশীয় চিকিৎসকদের মধ্যে বিশেষতঃ নবীনদের মধ্যে গবেষণাকার্যে উৎসুক আছেন অনেকেই। কিন্তু তার উৎসাহদাতা নেই কেউই। এর চাইতে হতাশার কথা আর কি হ'তে পারে? এ কাজ মুখ্যতঃ সরকারী প্রচেষ্টাতেই সম্ভব। দেশজ সম্পদ্ কাজে লাগিয়ে শুধু যে ভেষজ-ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যাবে তা নয়, নিত্য নতুন আবিষ্কারে পাশ্চাত্য দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতি। এ বিষয়ে সকলের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হ'ক।*

* এ নিবন্ধ-রচনায় সহায়তা-গ্রহণে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের কাছে আমি ঋণী :

সুশ্রুতসংহিতা · কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনূদিত,

A Text Book of Pathology—By Dr. D. N. Banerjee,

History of Indian Medicine—Mookhopadhyay.

ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অতীত আলোচনায় সময়গুলি আমি শেষোক্ত দুই গ্রন্থ থেকেই প্রামাণ্য ব'লে ধ'রে নিয়েছি।

মাতৃজাতি ও বেদাধ্যয়ন

[আশ্বিন সংখ্যার পর]

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

যাহা হউক, পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকারকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে ব্যবস্থাপিত করতে পারে না। এক্ষণে আমরা এমন কতকগুলি প্রমাণ শ্রুতি, গৃহ্যসূত্র এবং স্মৃতি প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত করিব, যাহাদের বলে ত্রৈবর্ণিক মাতৃজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার নিঃসন্দিগ্ধভাবে সিদ্ধ হইবে। 'জাতেরস্ত্রীবিষয়াদযোপধাৎ'—(পাঃ সূঃ ৪।১।৬৩) ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রের বৃত্তিতে 'কঠী', 'বহ্বৃচী' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। 'কঠী' শব্দের অর্থ—কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠ-নামক শাখাধ্যয়নকারিণী। বহ্বৃচী শব্দের অর্থ—বহু ঋক্ অধ্যয়নকারিণী, অথবা ঋগ্বেদাধ্যয়নকারিণী। যদি স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকিত, তাহা হইলে বেদের কঠ-নামক শাখা এবং ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করা স্ত্রীজাতির পক্ষে সম্ভব হইত না। ফলে উক্ত স্থলে 'কঠী' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগও পরিদৃষ্ট হইত না। অতএব উক্ত শব্দসকলের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রয়োগ থাকায় অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হয়।

আবার শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে—'গার্গী, বাচক্নবী পপ্রচ্ছ' (বৃঃ ৩।৬।১)—'বচক্নুর কন্যা গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন' ইত্যাদি। এইস্থলে অবেদবিদ্ গার্গী যে বেদবিদ্ আচার্য যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচার করিয়াছিলেন, ইহা করা চলে না। সুতরাং গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের বিচারাত্মক এই শ্রৌতলিঙ্গপ্রমাণবলে মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হয়। প্রসিদ্ধ দেবীসূক্তের দ্রষ্ট্রী অম্ভৃণ ঋষির কন্যা 'বাক্' প্রভৃতি বহু নারী ঋষির নাম[১] পাওয়া যায় এবং মমতা (ঋক্ সং ৬।১০।২), মৈত্রেয়ী (বৃঃ ৪।৫।১) ইত্যাদি বহু ব্রহ্মবাদিনীর (বেদে পারদর্শিনীর) নাম বেদেই আছে। এই সকল প্রমাণকে উপেক্ষা করা চলে না এবং অন্য প্রকারে ব্যাখ্যাও করা চলে না। মৈত্রেয়ী প্রভৃতির নাম অর্থবাদ মধ্যে পঠিত হইলেও বক্ষ্যমাণ অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা পুষ্ট হওয়ায় অর্থবাদগত লিঙ্গপ্রমাণরূপে তাহারা স্ত্রীজাতির বেদে অধিকারেরই সমর্থক হইয়া থাকে।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের ৩।৭।১৩ সূত্রে বেদাধ্যয়নান্তে সমাবর্তনকালে কুমারীর কৃত্যরূপে চন্দন দ্বারা অঙ্গ-লেপনের ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকিলে তাঁহাদের জন্য সমাবর্তন নিশ্চয়ই ব্যবস্থাপিত হইত না। গোভিল-গৃহ্যসূত্রে 'প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীম্' (২।১।১৯) এবং 'পশ্চাদগ্নেঃ পদা প্রবর্তয়ন্তীং বাচয়েৎ' (২।১।২০) ইত্যাদি সূত্রে যজ্ঞোপবীতধারিণী কন্যার বিবাহ এবং তৎকর্তৃক বেদমন্ত্রপাঠ বিহিত হওয়ায় স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন অঙ্গীকৃত হইয়াছে। পারস্কর-গৃহ্যসূত্রের বিবাহপ্রকরণে হরিহরভাষ্যে 'কুমারী ভগায় স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ চতুর্থং জুহোতি'

১ ঋগ্বেদ-সংহিতাতে নিম্নোক্ত নারী ঋষিগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—রোমশা (১।১২৬), লোপামুদ্রা (১।১৭৯), বিশ্ববারা (৫।২৮।১), শশ্বতী (৮।১।৩৪), সুদিতি (৮।৭১), অপালা (৮।৯১), ঘোষা (১০।৩৯-৪০), সূর্যা (১০।৮৫), যমী (১০।১০,১৫৪), ইন্দ্রাণী (১০।১৪৫), শচী (১০।১৫৯), সর্পরাজ্ঞী (১০।১৮৯), সরমা (১০।১০৮), রক্ষোহা (১০।১৬২), বিবৃহা (১০।১৬৩), জুহু (১০।৯), বাক্ (১০।১২৫) ইত্যাদি। যাঁহারা বেদমন্ত্রের ঋষি হইতে পারেন, বেদাধ্যয়নে তাঁহাদের অধিকার নাই, ইহা কল্পনারও অযোগ্য।

(১।৭।৫) এবং 'তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রেণ স্বয়ংপঠিতেন সূর্যমিরীক্ষতে' (১।৮।৭) ইত্যাদি* প্রকারে বেদ-মন্ত্রপাঠে মাতৃজাতির অধিকার পরিদৃষ্ট হইতেছে।

সুপ্রাচীনকালে পুরুষগণের ন্যায় স্ত্রীগণেরও উপনয়ন-সংস্কার হইত, ইহা গোভিল-গৃহ্যসূত্র ২।১।১৯ সূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত যমবচনবলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যথা 'পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে। অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা'।—'পুরাকালে কুমারীগণের মৌঞ্জীবন্ধন, বেদসকলের অধ্যয়ন এবং সাবিত্রীবচন (গায়ত্রী-দীক্ষা) হইত। উপনয়ন-সংস্কারকালে যে কুশনির্মিত উপবীত পরিধান করা হয়, তাহাকে বলে 'মৌঞ্জীবন্ধন'। অত্রস্থ 'পুরাকল্প' শব্দের অর্থ 'পুরাকাল' গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ উপনয়নাদি সংস্কার বেদ-বিহিত বিধিবলে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সেই বেদ যদি এক এক কল্পে এক একপ্রকার হয়, তাহা হইলে বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব ব্যাহত হইবে এবং বেদের বেদত্বই থাকিবে না।

যাহা হউক, এইরূপে দেখা যাইতেছে—সুপ্রাচীনকালে কুমারগণের ন্যায় কুমারীগণেরও উপনয়ন-সংস্কার হইত এবং বেদাধ্যয়নেও তাঁহারা ছিলেন কুমারগণের সম-অধিকারিণী। কালক্রমে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে কুমারীগণের উক্ত অধিকার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে। গোভিল-গৃহ্যসূত্রের ভাষ্যে তৎস্থলেই উদ্ধৃত যম-বচন হইতেই ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা—
'পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা, নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ।
স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষচর্যা বিধীয়তে।
বর্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণমেবচ'॥
—পিতা পিতৃব্য এবং ভ্রাতা ইহাকে বেদাধ্যয়ন করাইবে, অপরে অধ্যয়ন করাইবে না। কন্যা স্বগৃহেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবে (গুরুকুলে বাস করিবে না); মৃগচর্ম, চীরবসন এবং জটাধারণ করিবে না। এখন দেখা যাইতেছে পারি-পার্শ্বিক অবস্থার চাপে গুরুগৃহে বাস এবং পিতা প্রভৃতি অতি নিকট আত্মীয় ব্যতিরেকে অপরের নিকট বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার হেতু—ইদানীন্তনকালেও গৃহশিক্ষক-সংক্রান্ত ব্যাপার হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি। মনুষ্যের স্বভাব কম-বেশী প্রায় সর্বকালেই সমান। ইহার পরবর্তী অবস্থাও গোভিল-গৃহ্যসূত্রভাষ্যে উক্ত স্থলে উদ্ধৃত হারীত-বচন-বলে অবগত হওয়া যায়। স্মৃতিকার পূজ্যপাদ হারীত বলিয়াছেন, 'দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ঃ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ'—স্ত্রী দুই প্রকার, ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যোবধূ। যাঁহারা উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া স্বগৃহে ভিক্ষাচর্যা করতঃ বেদাধ্যয়নাদি করেন, তাঁহারাই 'ব্রহ্মবাদিনী'; আর বিবাহকাল উপস্থিত হইলে কথঞ্চিৎ উপনয়ন-সংস্কারান্তে যাঁহাদের বিবাহ হয়, তাঁহা-রাই 'সদ্যোবধূ'—ইহা উক্ত স্থলেই উদ্ধৃত পূজ্যপাদ মাধবাচার্যের ব্যাখ্যা। এইপ্রকারে দেখা যাইতেছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। এইভাবে সঙ্কুচিত হইতে হইতে কালক্রমে উক্ত ব্যবস্থা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে; এবং স্ত্রীজাতির যে উপনয়ন-সংস্কার ও বেদাধ্যয়নে অধিকারই নাই, ইহার প্রতিপাদকরূপে শাস্ত্রবাক্যসকল ব্যাখ্যাত হইতেছে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা পূর্বেই প্রদান করিয়াছি। পূজ্যপাদ মাধবাচার্য-কৃত 'জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরে' ৬।১।৩ অধি-করণের পাদটীকাতে মাতৃজাতির উপনয়ন-সংস্কার ও বেদাধ্যয়নে অধিকার স্পষ্টভাবেই বর্ণিত

* এইগুলি মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকারের সূচক লিঙ্গপ্রমাণ, কারণ এই সকলের দ্বারা বেদমন্ত্রোচ্চারণে তাঁহাদের অধিকার সূচিত হইতেছে।

হইয়াছে। উক্তস্থলেই 'সীতা ও মহাশ্বেতা প্রভৃতি মহিলাগণ সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন, ইহা প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতিতে পরিদৃষ্ট হয়'—এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বমীমাংসা ৬।১।৪ অধিকরণে শ্রৌতকর্মে দম্পতীর সহাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। আবার এমন কতকগুলি স্থলও শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, যেখানে পতি-নিরপেক্ষভাবেই পত্নীর কর্মে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। বাশিষ্ঠ স্মৃতিতে 'মনসা ভর্তুরতিচারে···সাবিত্র্যষ্টশতেন শিরোভির্বা জুহুয়াৎ' (২১ অঃ)—মনে মনে ভর্তাকে লঙ্ঘন করিলে অষ্টোত্তরশতসংখ্যক গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা, অথবা সশিরস্ক গায়ত্রীর দ্বারা (গায়ত্রীর পূর্বে প্রণব সহ ব্যাহৃতি যোগকরতঃ) হোম করিবে। প্রস্তাবিতস্থলে পতির সহিত সহাধিকারের প্রশ্নই উঠে না, কারণ এই কর্মে অতিচারকারিণী পত্নীই অধিকারিণী, পতি নহে। কেহ কেহ এইস্থলে 'ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম করাইবে'—এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করেন। তাহা সঙ্গত মনে হয় না, কারণ 'এতি প্রাচী বিশ্ববারা ঈড়ানা হবিষা ঘৃতাচী'—বিশ্ববারা স্তব করিতে করিতে ঘৃতাদি হবনীয় দ্রব্যযুক্ত স্রুক্ হস্তে পূর্বাভিমুখে অগ্নির প্রতি গমন করিতেছেন (ঋক্ সং ৫।২৮।১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়, পুরাকালে মাতৃজাতি যে মাত্র বেদাধ্যয়নেই অধিকারিণী ছিলেন তাহা নহে, তৎকালে নিজস্ব হোমকর্মেও তাঁহারা ছিলেন অধিকারিণী।[২] সুতরাং উক্ত শ্রৌতলিঙ্গপ্রমাণ-বলে স্থলবিশেষে মাতৃজাতির পতি-নিরপেক্ষভাবে স্বীয় যজ্ঞকর্মে অধিকার অস্বীকৃত হইলে কোন প্রকার অসঙ্গতি হয় না। এইরূপে গায়ত্রী-মন্ত্রে ও তৎসাধ্য হোমে স্ত্রীজাতির অধিকার থাকায় বেদাধ্যয়নে তাঁহাদের অধিকারও সিদ্ধ হইয়া পড়িতেছে।

শবর-ভাষ্যের সহিত উপস্থাপিত সিদ্ধান্তের অবিরোধ প্রদর্শন

এইস্থলে সংশয় হয়—আশ্বলায়ন, পারস্কর ও গোভিল প্রভৃতি সূত্রকার মহর্ষিগণের ন্যায় পূর্বমীমাংসা-ভাষ্যকার শাস্ত্রতাৎপর্যবিৎ পূজ্যপাদ শবর স্বামীও বেদবিৎ। তিনি কিন্তু পূঃ মীঃ ৬।১।২৪ সূত্রভাষ্যে 'প্রতিসিদ্ধস্য পত্ন্যাঃ অধ্যয়নস্য পুনঃপ্রসবে ন কিঞ্চিদ্ অস্তি প্রমাণম্'—প্রতিষিদ্ধ যে পত্নীর বেদাধ্যয়ন (বেদমন্ত্রোচ্চারণ), তাহা পুনরায় বিধানের প্রতি কোন প্রমাণ নাই—ইত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থে স্ত্রীজাতির বেদে অধিকার নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তদুত্তরে বলা যায়—ভগবান্ ভাষ্যকার উক্তস্থলে মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার নিরাকরণ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা যায় না, কারণ পত্নী শব্দের অর্থ স্ত্রীজাতি নহে, ইহা পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। উক্তস্থলে পঠিত 'পুমান্ বিদ্বাংশ্চ, পত্নী স্ত্রী চ, অবিদ্যা চ'—পুরুষ বিদ্বান্ (বেদবিদ্) এবং [তাঁহার] পত্নী হইতেছেন স্ত্রীজাতি ও অবিদ্যা (বেদবিদ্যাহীনা)—ইত্যাদি ভাষ্যালোচনা করিলে প্রতিভাত হয়, পূজ্যপাদ ভাষ্যকারের সময়ে স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়ন অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইয়াই তাঁহাকে ধর্মব্যবস্থা প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। নতুবা স্ত্রীকে বেদাধ্যয়ন করাইয়া কর্মানুষ্ঠান করিতে হইলে কর্মই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। আর যজ্ঞকালে পত্নীর মন্ত্রোচ্চারণের আবশ্যকতাও নাই, কারণ যজ্ঞকালে পতি ও পত্নী—ইঁহাদের মধ্যে কে কোন্ যজ্ঞাঙ্গ সম্পাদন করিবেন, তাহা ব্রাহ্মণগ্রন্থে ও তদনুসরণকারী শ্রৌতসূত্রসমূহে নির্দিষ্ট আছে। পতি ও পত্নী উভয়েই যদি সকল কর্মাঙ্গেরই অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তত্তৎ ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও শ্রৌত-

২ পূর্বমীমাংসা ১২।৪।১৬ অধিকরণে মাত্র ব্রাহ্মণেরই অপরের ঋত্বিক্‌কর্মে অধিকার ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। 'হোতারং বৃণীত' এই বিধিবাক্যে পুংলিঙ্গ হোতৃশব্দের প্রয়োগ হওয়ায় অপরের ঋত্বিক্‌কর্ম পুরুষই করিতে পারেন।

সূত্রসকল বাধিত হইয়া পড়িবে এবং যজ্ঞাঙ্গের একাধিক প্রয়োগবশতঃ অবৈধ আবৃত্তির প্রসক্তি হইয়া পড়িবে; ফলে অঙ্গবিকলতা-দোষবশতঃ কর্মটিই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আর 'হয় পতি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তত্তৎ কর্মাঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন, অথবা পত্নী তাহা করিবেন'—এই প্রকার পরিস্থিতি স্বীকৃত হইলে অষ্টদোষগ্রস্ত বিকল্পের প্রসক্তি হইয়া পড়িবে। আবার 'পত্ন্যাবেক্ষিতম্ আজ্যম্ ভবতি'—পত্নী হবনীয় ঘৃতে দৃষ্টিপাত করিবেন, পত্নীর জন্য বিহিত এই যজ্ঞাঙ্গ পতিতে প্রসক্ত হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি নানা দোষ হইয়া পড়িবে। সেইহেতু যজ্ঞকালে পত্নীর মন্ত্রপাঠ নিষিদ্ধ হইয়াছে, 'অস্তি হি তস্য পুমান্ নিবর্তকঃ' —তাহার (স্ত্রীর মন্ত্রপাঠের) নিবর্তক পুরুষ বর্তমান আছে—ইত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থের ইহাই তাৎপর্য। শাস্ত্রদীপিকাকারও উক্ত গ্রন্থের ৬।১।৬ অধিকরণে বলিয়াছেন—'সম্পন্নবিত্তেন পুংসা তেষাম্ অনুষ্ঠানসিদ্ধেঃ, অতঃ পুমান্ এব কর্তা' —বেদবিদ্যাসম্পন্ন পুরুষকর্তৃক সেই সকলের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয় বলিয়া পুরুষই কর্তা। এতদ্দ্বারা স্ত্রীজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার নিবারিত হয় না, পরন্তু পুরুষই যজ্ঞাঙ্গসকলের নির্বাহকর্তা, এই যে পূর্বমীমাংসার ৬।১।৬ অধিকরণের সিদ্ধান্ত, ইহাই সমর্থিত হয়। এইরূপে 'প্রতিষিদ্ধস্য পত্ন্যাঃ অধ্যয়নস্য', ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত ভাষ্যবাক্যের অর্থ হইবে—যজ্ঞকালে প্রতিষিদ্ধ যে পত্নীর বেদাধ্যয়ন (বেদমন্ত্রোচ্চারণ) তাহা পুনরায় বিধানের প্রতি কোন প্রমাণ নাই, ইত্যাদি। অতএব মাতৃজাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার অঙ্গীকৃত হইলে পূর্বমীমাংসা-ভাষ্যের সহিত বিরোধ হয় না, ইহাই আমরা মনে করি।

স্ত্রীজাতির বেদে অনধিকারবোধক ভাষ্যসকলের প্রবল প্রমাণ-বলে বাধ

এইরূপে আমরা দেখিলাম—পূঃ মীঃ ৬।১।৬ অধিকরণের যাহা প্রধান প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ 'মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তত্তৎ যজ্ঞাঙ্গের সম্পাদনে পুরুষেরই অধিকার'—এই বিষয়ে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু তত্রস্থ কোন কোন ভাষ্যবাক্য হইতে যদি উক্ত অধিকরণের অবান্তর প্রতিপাদ্যরূপে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকারকে নিরাকরণ করিতে ইচ্ছা করা হয়, তাহা হইলে প্রবলপ্রমাণসকলের বলে সেই অবান্তর প্রতিপাদ্য বাধিত হইয়া পড়িবে। ব্যাস-সংহিতায় (১।৪) পাই:

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং স্যাত্তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা ॥

—শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ যেস্থলে পরিদৃষ্ট হয়, সেইস্থলে শ্রুতিই হয় প্রমাণ। আর পুরাণ ও স্মৃতিবচনের মধ্যে বিরোধ হইলে স্মৃতিবচন হয় শ্রেষ্ঠ॥ শাস্ত্রতাৎপর্যবিদ্‌গণ যখন পুরাণবচন হইতেও স্মৃতিবচনের প্রাবল্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন পূর্বোদ্ধৃত শ্রৌতলিঙ্গ (বৃঃ ৩।৬।১, ঋক্ সং ৫।২৮।১ ইত্যাদি)-সকলের এবং যমস্মৃতি ও হারীতস্মৃতি প্রভৃতিতে পঠিত পূর্বোদ্ধৃত বচনসকলের বলে মাতৃজাতির বৈধ বেদাধ্যয়ন নিরাকরণপর সেই অবান্তর তাৎপর্যের উপস্থাপক পূর্বমীমাংসা-ভাষ্যকার প্রভৃতির তাদৃশ বচনসকল যে বাধিত হইয়া পড়িবে (স্বপ্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করিতে পারিবে না), এই বিষয়ে আর বলিবার কি আছে?

ভাট্টদীপিকাকারের মত নিরাকরণ

পূজ্যপাদ ভাট্টদীপিকাকার উক্ত গ্রন্থের ৬।১।৬ অধিকরণে 'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত, তম্ অধ্যাপয়ীত' ইত্যাদি বেদবাক্যে পুংলিঙ্গ 'তদ্' শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় পুরুষেরই বেদাধ্যয়নে অধিকার অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং 'স্ত্রীজাতিকে বেদ অধ্যয়ন করাইবে না'—এই প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়া মাতৃজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার নিরাকরণ করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। পৌরুষেয় বচন হওয়ায় উপ-

রোক্ত শ্রৌতলিঙ্গাদি প্রমাণসকলের বলে তাহাও বাধিত হইয়া পড়িবে, ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে।

শাস্ত্রদীপিকাকারের মতে উক্ত বেদবচন হইতে বেদাধ্যয়নে স্ত্রীজাতির অধিকার সিদ্ধ হয়

পূজ্যপাদ শাস্ত্রদীপিকাকার কিন্তু 'তম্ অধ্যাপয়ীত' অত্রস্থ 'তম্' পদে পুংলিঙ্গের বিবক্ষা অঙ্গীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'অধ্যয়নম্ অপি অনির্দিষ্টকর্তৃকত্বাৎ প্রকৃতম্ উপনীতং কর্তারম্ আশ্রয়ং স্ত্রিয়াঃ অপি স্যাৎ ইতি অধিকারবুদ্ধিঃ ভবতি' (৬।১।৬ অধিঃ)। ইহার তাৎপর্য এই: 'ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত' এই স্থলে যদি লিঙ্গের বিবক্ষা না থাকে,[৩] তাহা হইলে 'তম্ অধ্যাপয়ীত', এই অধ্যয়ন-বিধিতেও তাহা থাকিবে না, কারণ উপনয়ন-বিধিতে যিনি বিধির বিষয়রূপে বিবক্ষিত, অধ্যয়ন-বিধিতে প্রযুক্ত 'তম্' এই সর্বনাম পদ তাঁহাকেই সমর্পণ করিতেছে। সুতরাং উপনয়নে কর্তার লিঙ্গ নির্দিষ্ট না থাকায় অধ্যয়নেও কর্তার লিঙ্গ নির্দিষ্ট হইবে না বলিয়া প্রস্তাবিত উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত যে কর্তা, তাহাকে আশ্রয়করতঃ স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার আছে, এইপ্রকার বুদ্ধি হয়। অতএব ইহার মতে—'অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত, একাদশবর্ষং রাজন্যম্, দ্বাদশ-বর্ষং বৈশ্যম্' এই বাক্যত্রয়ের বলেই উক্ত বর্ণ-ত্রয়ান্তর্গত স্ত্রীজাতিরও উপনয়নে, সুতরাং বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকার সিদ্ধ হইয়া পড়ে।

শাস্ত্রদীপিকাকার কিন্তু কণ্ঠতঃ স্ত্রীজাতির উপনয়নে অধিকার অঙ্গীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'তথাপি আহত্য স্ত্রীণাম্ অধ্যয়ন-প্রতিষেধাৎ' ইত্যাদি। টীকাকার সোমনাথ

৩ ভাট্টদীপিকাকারও এই বিষয়ে একমত। উক্ত গ্রন্থের ৬।১।৬ অধিকরণ দ্রষ্টব্য। পূঃ মীঃ ৩।৭।১ গ্রহৈকত্বাধি-করণে যেমন গ্রহের (সোমরসাধারের একত্ব বিবক্ষিত নহে, প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ ব্রাহ্মণের পুংত্ব বিবক্ষিত নহে।

'প্রতিষেধাৎ' এই গ্রন্থের বাক্য পূরণ করিয়াছেন —'ধর্মশাস্ত্রে ইতি শেষঃ'। সুতরাং ইহাই প্রতিভাত হয় যে, বেদে স্ত্রীজাতির উপনয়ন সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন প্রতিষিদ্ধ না হইলেও ধর্মশাস্ত্রে অর্থাৎ স্মৃতি ও পুরাণে তাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহাই শাস্ত্রদীপিকাকারের অভিপ্রায়; কোন স্মৃতিবচন ইনি উদ্ধৃত করেন নাই। ভাট্টদীপিকাকার 'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাম্' ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা কিন্তু পুরাণবচন হওয়ায় 'তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা' (ব্যাস সং ১।৪) এই ন্যায়বলে পূর্বোদ্ধৃত যম- ও হারীত-স্মৃতিবচনসকলের ও পূর্বপ্রদর্শিত শ্রৌতলিঙ্গসকলের বলে বাধিত হইয়া পড়িবে। আর এক কথা, 'ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত' ইত্যাদি বেদবচনবলে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কারে ও বৈধ বেদাধ্যয়নে যে অধিকার সিদ্ধ হয়, ধর্মশাস্ত্রের বচন-বলে তাহা বাধিত হইবে—ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ স্মৃতিপ্রমাণাপেক্ষা শ্রুতিপ্রমাণ বলবান্। অতএব ত্রৈবর্ণিক স্ত্রী-জাতির উপনয়নাদিতে অধিকার নিরাকরণ শাস্ত্রদীপিকাকারের হৃদ্‌গত অভিপ্রায় নহে, ইহাই নির্ণীত হয়।

জৈমিনীয় ন্যায়ানুসারে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়নে অধিকার-সিদ্ধি

আর 'তুষ্যতু দুর্জন ন্যায়ে' যদি স্বীকার করি-য়াও লওয়া যায় যে 'ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত' ইত্যাদি বচনত্রয়ে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কার বিহিত হয় নাই, তাহা হইলে বাক্যভেদভয়ে উক্ত বাক্যত্রয়ে তাহা নিষিদ্ধও হয় নাই, ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে **'বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্'** (জৈঃ সূঃ ১।৩।৩) এই জৈমিনীয় ন্যায়বলে ত্রৈবর্ণিক মাতৃজাতির উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার সিদ্ধ হইয়া পড়ে। উক্ত সূত্রে আচার্যপাদ

জৈমিনি বলিয়াছেন, 'শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে স্মৃতি হইবে অনাদরণীয়া। কিন্তু বিরোধ না থাকিলে শ্রুতিকল্পক অনুমানের প্রবৃত্তি অবশ্যই হইবে'। প্রস্তাবিত স্থলে 'ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত' ইত্যাদি শ্রুতির সহিত পূর্বোদ্ধৃত যম ও হারীত প্রভৃতি স্মৃতিবচনসকলের বিরোধ হইতেছে না, কারণ শ্রুতিবাক্যসকলে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়নে অধিকার নিরাকৃত হয় নাই। সুতরাং উক্ত স্মৃতিবাক্যসকলের অনুকূলভাবে ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীজাতির উপনয়ন-সংস্কারের বোধক শ্রুতিবাক্য উক্ত জৈমিনীয় ন্যায়বলে অনুমান করিলে কোন প্রকার অসঙ্গতি হইবে না।

'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাম্' ইত্যাদি অবশিষ্ট বাক্যদ্বয়ের যথার্থ অর্থ

এই প্রকারে দেখা গেল—মাতৃজাতির উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নের বিরোধিগণ কর্তৃক উদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যসকলের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা সম্ভব হওয়ায় এবং উহার সমর্থকগণ কর্তৃক গোভিল, পারস্কর ও আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে ও তাহাদের ভাষ্যাদি হইতে উদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যসকলের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা সম্ভব না হওয়ায় এবং মাতৃজাতির বেদাধ্যয়ন শ্রৌতলিঙ্গপ্রমাণসকলের দ্বারা পুষ্ট হওয়ায় **মাতৃজাতির উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নে অধিকার অবশ্যই সিদ্ধ হয়।** সেইহেতু উক্ত প্রমাণ ও প্রদর্শিত যুক্তিসকলের বলে 'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা:' (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২৫) ইত্যাদি বাক্যের ব্যাখ্যা হইবে এই প্রকার: পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে কালক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় স্ত্রীজাতির, বেদত্যাগ বশতঃ শাস্ত্রকর্তৃক পর্যুদস্ত হওয়ায় শূদ্রজাতির এবং আচারহীন হওয়ায় দ্বিজবন্ধুগণের (ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে অধম ব্যক্তিগণের) বেদ কর্ণগোচর হয় না, সেইহেতু তাহাদের মঙ্গলের জন্য ব্যাসদেব মহাভারত ও পুরাণ রচনা করিয়াছেন—ইত্যাদি। এইরূপে ইহা ইনির্ণীত হইল যে—উক্ত বাক্য স্ত্রীজাতির বৈধ বেদাধ্যয়নে অধিকারের নিবর্তক নহে, কারণ তাদৃশ কিছুই উক্ত বাক্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর আমাদের মনে হয়, 'ন স্ত্রীশূদ্রৌ বেদম্ অধীয়াতাম্' এই বাক্যটি বেদবাক্য নহে, কারণ তাহা হইলে গোভিল, আশ্বলায়ন ও পারস্কর প্রভৃতি সূত্রকার ঋষিগণ অবেদবিদ্ হইয়া পড়িবেন। এই প্রকার মূলনাশিকা কল্পনা সর্বথা অসঙ্গত। তথাপি উক্ত বাক্যকে যদি শ্রুতিবাক্যরূপেই গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রমাণসকলের বলে তাহাকে তৎশাখাতে সঙ্কুচিত করিতে হইবে, অর্থাৎ যে শাখাতে উক্ত বাক্যটি পঠিত হইয়াছে, সেই শাখাধ্যয়নে স্ত্রীজাতির অধিকার নাই, এই প্রকার অর্থকল্পনা করিতে হইবে; অথবা উপনয়ন-সংস্কারবিহীন স্ত্রীগণ ও শূদ্রগণ বেদাঙ্গবিহিত ক্রম ও স্বরাদিসহ বেদ-পাঠ করিবেন না, উক্ত বাক্যটির এই প্রকার অর্থ ই হইবে। পূর্বোদ্ধৃত প্রমাণসকলের বলে উক্ত বাক্যবিহিত ব্যবস্থা কিছুতেই অসঙ্কুচিত হইতে পারে না। উহা যদি স্মৃতিবাক্য হয়, তাহা হইলে পূর্বোদ্ধৃত শ্রৌতলিঙ্গপ্রমাণ ও অন্যান্য স্মৃতিপ্রমাণসকলের বলে তাহা বাধিত হইয়া পড়িবে।

এইরূপে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, ত্রৈবর্ণিক মাতৃজাতির উপনয়ন সংস্কার বেদবিধিসিদ্ধ, সুতরাং বৈধ বেদাধ্যয়নে তাঁহাদের অধিকার আছে, তবে কালক্রমে প্রতিকূল অবস্থার চাপে তাহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের আরও মনে হয়—যজ্ঞকালে বেদমন্ত্রোচ্চারণে যে বিধিবিহিত প্রতিষেধ, তাহাও মাতৃজাতির মধ্যে বেদাধ্যয়ন-বিলুপ্তির অন্যতম হেতু; কারণ 'যাহা না হইলেও চলে' এরূপ বিষয়ে মানুষের আগ্রহ প্রায়ই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

ভারতে সেণ্ট টমাস

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

ভ্রান্ত জীবকুলকে অমৃতের সন্ধান দিবার জন্য শ্রীভগবান বা তাঁহার শক্তি যুগে যুগে মনুষ্যশরীরে অবতীর্ণ হন, সঙ্গে লইয়া আসেন একদল অসাধারণ মানুষ যাঁহারা তাঁহার দিব্যবাণীকে দিকে দিকে প্রচার করেন। ইঁহারা অবতারের লীলাসহচর—অবতার-পুরুষের নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ জীবনের ভাষ্যস্বরূপ।

ভগবান যীশুখৃষ্টও প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন জন্, পিটার, ম্যাথু, টমাস প্রভৃতি দ্বাদশজন লীলাসহচর। যীশুখৃষ্টের দিব্যবাণী তাঁহারা জনসমাজে প্রচার করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে খৃষ্টের দ্বাদশজন শিষ্যের অন্যতম সেণ্ট টমাস সম্বন্ধে কিছু লিখিতে চেষ্টা করিব। বারো জনের মধ্যে তঁাহার সম্বন্ধে কিছু লেখার বিশেষ কারণ এই যে অসংখ্য লোকের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি যীশুখৃষ্টের লোকান্তরিত হওয়ার কিছুকাল পরেই ভগবৎ-নির্দেশে তাঁহার অমৃতময়ী বাণী প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার ভারতে আসা লইয়া মতদ্বৈধ বর্তমান। আবার ভারতে আসিলেও তিনি উত্তর ভারতে আসিয়াছিলেন কি দক্ষিণ ভারতে, তাঁহার কর্মস্থল কোথায় ছিল—ইত্যাদি বিষয়ে সকলে একমত হইতে পারেন নাই। উপরোক্ত সন্দেহ ও বাদানুবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করাও এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

টমাসের অন্য নাম ছিল ডিডিমাস। 'টমাস' অর্থে যমজ। ইঁহাকে জুডাস টমাস বলা হইত। জুডাস ইস্কেরিয়ট, যিনি কৃতঘ্নতা করিয়া সামান্য অর্থের লোভে যীশুখৃষ্টকে ধরাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি অবশ্য অন্য ব্যক্তি। সেইজন্য জন-লিখিত সুসমাচারে (John xiv-22) টমাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 'জুডাস—যিনি ইস্কেরিয়ট নন'। ডঃ ফারকুহার (Farquhar) তাঁর Apostle Thomas in North India নামক প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে টমাসকে জুডাস টমাস বলা সমীচীন হইবে না। ডঃ বার্কিট (Burquit)-ও তাঁহার লিখিত Early Eastern Christianity নামক পুস্তকে এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। যাহা হউক টমাসের নাম সম্বন্ধে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

বাইবেলে সেণ্ট টমাস সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কোন ঘটনা পৃথক ভাবে লিপিবদ্ধ নাই। অপরের নামের সঙ্গে তাঁর নাম ম্যাথু (x 3), মার্ক (iii 18) এবং লুক (vi 15) উল্লেখ করিয়াছেন। জন-লিখিত সুসমাচারে টমাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য—যীশুর প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি, এমনকি প্রভু যীশুর সহিত তিনি মরিতেও প্রস্তুত—এই সব দেখানো হইয়াছে। যীশুখৃষ্ট যখন লাজারাসকে কবর হইতে উঠাইয়া জীবন দান করিবার জন্য জুডাতে যাইতে উদ্যত, তখন অন্যান্য শিষ্যেরা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কারণ ইহুদীরা তথায় তাঁহাকে মারিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, সে সময় টমাস গুরুভ্রাতাগণকে বলিয়াছিলেন, 'আইস, আমরাও তাঁহার অনুগমন করি, যাহাতে তাঁহার সহিত আমরাও মরিতে পারি' (John xi 16)।

পুনরায় যখন শেষ আহারের সময় যীশু শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে শীঘ্রই তিনি তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবেন, এবং তাঁহার পরমপিতার গৃহে তাহাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন, তখন টমাস—যিনি আন্তরিকভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন—বলিয়া উঠিলেন, 'প্রভু, আমরা জানি না আপনি কোথায় যাইতেছেন। কেমন করিয়া আমরা সেই পথ জানিব?' তৎক্ষণাৎ তাঁহার উৎকণ্ঠা ও ভয় প্রশমিত করিয়া যীশু বলিয়া উঠিলেন, 'আমিই যে উপায়, আমিই সত্য এবং আমিই জীবন। কোন মানুষ আমার মধ্য দিয়া ব্যতীত সেই পরমপিতার সান্নিধ্যে পৌঁছিতে পারে না' (John xiv 2-6)।

যীশুর প্রতি এত ভক্তি থাকা সত্ত্বেও যখন অন্যান্য গুরুভ্রাতারা যীশুর পুনরুত্থানের (resurrection) পর তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের বিষয় টমাসকে বলিয়াছিলেন, টমাস তাহা বিশ্বাস করেন নাই। তিনি বলেন, 'যতক্ষণ আমি স্বচক্ষে তাঁহার হাতে পেরেকের চিহ্ন না দেখি এবং তাঁহার গায়ে আমার অঙ্গুলি স্থাপন না করি, ততক্ষণ আমি তাঁহার পুনরুত্থানের কথা বিশ্বাস করিব না।' আটদিন পরে শিষ্যেরা পুনরায় যখন সমবেত হইয়াছিলেন, তৎকালে টমাসও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। তখন যদিও দ্বারসমূহ অর্গলবদ্ধ ছিল, যীশু হঠাৎ তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'সকলের শান্তি হউক!' তারপর টমাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'তোমার অঙ্গুলি দ্বারা আমার হস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখ এবং আমার গায়ে তোমার হস্ত স্থাপন কর। অবিশ্বাসী হইও না, বিশ্বাস কর।' টমাস বলিয়া উঠিলেন, 'হে জীবন-দেবতা, হে প্রভু, আমি বিশ্বাস করিতেছি'। যীশু কহিলেন, 'টমাস, যেহেতু তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ দেখিলে সেইহেতু বিশ্বাস করিতেছ; কিন্তু তাহারাই ধন্য যাহারা আমাকে দেখে নাই, অথচ আমাকে বিশ্বাস করে'। (John xx 20—29)

যীশুর এই মৃদু ভর্ৎসনায় তাঁহার পুনরুত্থান- ও দেবত্ব-বিষয়ে টমাসের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। গির্জার পাদ্রীদের মতে অন্যান্য শিষ্যদের অন্ধ-বিশ্বাস অপেক্ষা এই ঘটনা খৃষ্টানদের খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্বসমূহে অধিকতর বিশ্বাস উৎপাদনে সহায়তা করে।

অন্ধবিশ্বাস না থাকিলেও টমাসের আন্তরিকতায় কাহারও সন্দেহ ছিল না। যতক্ষণ নিজে সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত না হইতেছেন, ততক্ষণ অপরের কথায় তিনি আস্থা স্থাপন করিতেন না। এইজন্য তাঁহাকে 'doubting Thomas' (সংশয়ী টমাস) বলা হইত। যীশুকে অত্যন্ত আপনার মনে করিতেন, সেজন্য তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন না বা ভীত হইতেন না। জনের সমাচারে (xiv 21—23) লিখিত আছে, 'যে আমার উপদেশাবলী শুনিয়াছে এবং তাহা পালন করিতেছে, যে আমাকে ভালবাসে, আমার পরমপিতাও তাহাকে ভালবাসিবেন, আমিও তাহাকে ভালবাসিব এবং তাহার সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিব।' তখন জুডাস—যিনি ইস্কেরিয়ট ছিলেন না—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু, ইহা কিরূপ যে আপনি কেবল-মাত্র আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন, এবং জগদ্বাসীর সমক্ষে নয়?' উত্তরে যীশু তাঁহার পূর্বকথার পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন, 'যদি কেহ আমাকে ভালবাসে, সে আমার উপদেশ পালন করিবে; আমার পরমপিতা তাহাকে ভালবাসিবেন, আমরা তাহার নিকট আসিব এবং তাহার সহিত বাস করিব।' উল্লিখিত জুডাসই সেণ্ট টমাস।

সেণ্ট টমাসের ভারতে আগমন সম্বন্ধে মতামত

সিরিয়া, গ্রীস, লাটিন, আর্মেনিয়া, ইথিওপিয়া ও আরবে সেণ্ট টমাসের কার্যাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বারকিট্ তাঁর Early Eastern Christianity (P. 205)তে লিখিয়াছেন, 'টমাস সম্বন্ধে উপরোক্ত বিবরণীর মধ্যে সিরিয়ার বিবরণই আদি এবং অনেকাংশে সমর্থনযোগ্য।'

যীশুর অন্তর্ধানের পর তাঁহার শিষ্যেরা প্রভুর বাণী প্রচারোদ্দেশে বিভিন্ন দেশে গমন করেন। সিরিয়ায় লিখিত Doctrine of the Apostles গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে জেমস্ জেরুজালেম, সাইমন রোম, জন এফিসাস, মার্ক আলেকজান্দ্রিয়া, এন্‌ড্রু ফ্রিজিয়া, লুক ম্যাসিডোনিয়া এবং টমাস ভারতবর্ষ হইতে পত্রাদি লিখিতেন এবং ঐ সব পত্র গির্জায় গির্জায় পাঠ করা হইত। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে তাঁহারা ঐ সব দেশে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের কার্য-বিবরণী সম্বন্ধে একে অপরকে লিখিতেন।

সিরিয়ার বিবরণীতে আরও লিখিত আছে, যে জেরুজালেমে যীশুর শিষ্যেরা মিলিত হইয়া তাঁহারা কোন্ কোন্ দেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে যাইবেন—তাহা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং জুডাস্ টমাসকে ভারতে যাইতে বলা হইল। কিন্তু টমাস বলিলেন, 'আমি দুর্বল, এ দায়িত্ব পালনে আমি অপারগ। অধিকন্তু আমি হিব্রু, ভারতীয়দের আমি কিরূপে শিক্ষা দিব?' টমাস যখন এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছিলেন, তখন ভগবান যীশু আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'টমাস ভয় পাইও না। আমার কৃপা সর্বদাই তোমার উপর বর্ষিত হইবে'। উত্তরে টমাস বলিলেন, 'প্রভু, একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া আপনি আমাকে অপর যে কোন স্থানে যাইতে আজ্ঞা করুন, আমি ভারতবর্ষে যাইতে চাহি না।' এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময় দক্ষিণ হইতে হাব্বান নামে একজন বণিক তথায় উপস্থিত হইলেন। ভারতবর্ষের রাজা গুণ্ডাফার বা গুজনাফার একজন কৃতী কাঠের মিস্ত্রী আনিবার জন্য হাব্বানকে বলিয়াছিলেন। যীশু ঐ কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, 'আমার একজন ক্রীতদাস আছে, সে খুব ভাল মিস্ত্রী, তুমি তাহাকে কিনিয়া লইয়া যাইতে পার।' দরদস্তুর করার পর মাত্র কুড়িটি রৌপ্যমুদ্রায় যীশু টমাসকে হাব্বানের নিকট বিক্রয় করেন। বিক্রয়-পত্র লেখা হইলে হাব্বানের প্রশ্নের উত্তরে টমাস জানান যে যীশুই তাঁহার প্রভু। অতঃপর তাঁহারা ভারতে আসেন এবং রাজা গুণ্ডাফার টমাসকে দেখিয়া ও তাঁহার কর্মদক্ষতার কথা শুনিয়া সুখী হন ও তাঁহাকে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিতে বলেন এবং ঐজন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। টমাস ঐ অর্থ গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। কালক্রমে রাজাও নূতন ধর্ম গ্রহণ করেন। গুণ্ডাফার উত্তর ভারতে রাজত্ব করিতেন—পেশোয়ার বা পাঞ্জাবে। বহু অনুসন্ধানের ফলে পাঠানকোট, অমৃতসর, কাবুল ও কান্দাহার অঞ্চল হইতে গুণ্ডাফারের নামাঙ্কিত বহু মুদ্রা পাওয়া যায় এবং ১৮৫৭ খৃঃ 'তখত্-ই-বাহী'-নামক শিলালিপিতে গুণ্ডাফারের বিষয় লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি লাহোর যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ডঃ ফ্লীট গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রাজা গুণ্ডাফার খৃষ্টীয় ২০ বা ২১ অব্দে রাজত্ব শুরু করেন এবং খৃঃ ৪৬ অব্দে তাঁহার রাজ্য উত্তর ভারতে বহুদূর বিস্তৃত হয় এবং সেণ্ট টমাস এই সময়েই মারা যান। এ বিষয়ে বহু গবেষক একমত হইয়াছেন।

অন্যমতে রাজা মাজদাই-এর রাজত্বেই তাঁহার প্রচার-কার্যের সমাপ্তি ঘটে। এখন রাজা মাজদাই-এর রাজত্ব কোথায় ছিল এবং তাঁহার প্রকৃত নাম কি, ইহা লইয়া কোন গবেষকই এ পর্যন্ত স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে কয়েকজনের মতামত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

মঃ সিলভ্যাঁ লেভি মনে করেন যে 'মাজদাই' কোনও হিন্দু নামেরই ইরানিয়ান ভাষায় অপভ্রংশ মাত্র। টমাস সম্বন্ধে গ্রীসদেশে বর্ণিত ঘটনায় বাজাদিও বা বাজোদিও নামের উল্লেখ আছে। ডঃ ফ্লীট মনে করেন যে কণিষ্কের পরবর্তী রাজা বাসুদেবেরই উহা অপভ্রংশ। বাসুদেব মথুরায় রাজত্ব করিতেন।

'সিরিয়ান এ্যাক্টে' কথিত আছে যে রাজা মাজদাই টমাসকে বিদেশীয় ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরিতকরণের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। টমাসের ইতিমধ্যে বহু অনুচর হওয়ায় এবং শহরের মাঝখানে তাঁহাকে হত্যা করিলে জনসাধারণের মনে বিরূপ ভাবের উদয় হইবে, এই ভয়ে শহর হইতে দূরে কোনও পাহাড়ের উপর তাঁহাকে রাজাজ্ঞায় হত্যা করা হয়। মৃত্যুদণ্ডের কথা টমাস জানিতেন এবং মৃত্যুর কিছুপূর্বে তিনি প্রার্থনার জন্য কিছু সময় চান এবং প্রার্থনান্তে ঘাতকদের দায়িত্ব সম্পাদন করিতে বলেন।

সিলভ্যাঁ লেভি মনে করেন যে টমাসকে মথুরার নিকটে কোন স্থানে হত্যা করা হইয়াছিল। ডঃ ফ্লীট যদিও এই মত সমর্থন করেন, তথাপি তিনি বলেন যে গুণ্ডাফারের বিষয় যেরূপ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে মাজদাইকে বাসুদেবে পরিণত করার ব্যাপারে ততখানি নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সে যাহা হউক, সিলভ্যাঁ লেভি ও ডঃ ফ্লীটের মত গ্রহণ করিলে অধিকাংশ খৃষ্টান সমাজের দাবি যে সেণ্ট টমাস মাদ্রাজের ময়লাপুরের অল্প দূরে এক পাহাড়ের উপর নিহত হইয়াছিলেন, তাহা শিথিল হইয়া পড়ে। অথচ ময়লাপুরের চার মাইল দূরে যে পাহাড়ের উপর টমাস নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে, উহার নাম সেণ্ট টমাস মাউণ্ট। বহুদিন হইতে এই নামে উহা পরিচিত। উহা হইতেই মাদ্রাজের সব চেয়ে বড় ও প্রধান রাস্তা মাউণ্ট রোডের উৎপত্তি। এবং ময়লাপুরে সমুদ্রের ধারে সেণ্ট টমাস চার্চ খুব বিখ্যাত এবং পুরাতন।

এই সব প্রচলিত প্রবাদকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আর এক দল গবেষক প্রমাণ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন যে টমাস উত্তর ভারত হইতে প্রচার করিতে করিতে একেবারে দক্ষিণে চলিয়া আসেন এবং ময়লাপুরে ঘাঁটি স্থাপন করেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে সেণ্ট টমাস দক্ষিণ ভারতেই প্রথম আসেন এবং মালাবার উপকূলে অবতরণ করেন।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে টমাস কোন্ পথে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন—জলপথে না স্থলপথে? জলপথে আসিলে কি ভাবে ও কোন্ পথে আসিয়াছিলেন? মিঃ রাওলিনসন তাঁহার প্রণীত 'Intercourse between India and the western world from the earliest time till the fall of Rome' (1926) পুস্তকে এবং মিঃ ওয়ারমিণ্টন তৎপ্রণীত 'The commerce between the Roman Empire and India' (1928) পুস্তকে লিখিয়াছেন যে রোমানরা দক্ষিণ ভারত হইতে মুক্তা, মরিচ, হাতীর দাঁত, ময়ূর প্রভৃতি লইবার জন্য প্রায়ই জাহাজ লইয়া আসিতেন এবং তাঁহারা আলেকজান্দ্রিয়া, সুয়েজ ও লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া আসিয়া আরব সাগরে পড়িয়া দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূল মালাবারে আসিতেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে তাঁহারা

আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থিত মাদ্রাজের ময়লাপুর পর্যন্তও আসিতেন। ইহা মোটেই আশ্চর্য নয় যে সেণ্ট টমাস রোমানদের কোন বাণিজ্য-জাহাজে চড়িয়া প্রথমে দক্ষিণ ভারতে আসেন। মিঃ এফ্. এ, ডিক্রুজ তাঁহার St. Thomas, the Apostle in India (1929) নামক পুস্তকে এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।

ময়লাপুর খুব প্রাচীন শহর সন্দেহ নাই। পর্তুগালের বিখ্যাত কবি ক্যামোজ (Camoes)—যাঁহাকে পর্তুগালের সেক্সপিয়ার বলা হয়—তিনি তাঁহার রচিত The Lusiads-এর দশম খণ্ডে লিখিয়াছেন:

Here rose the potent city Meliapore
Named in olden time,—
rich, vast and grand;
In those days stood she far from shore,
When to declare glad tidings
over the land
Thome came preaching............

টমাস সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই ক্যামোজ এই উক্তি করিয়াছেন। প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্বে ক্যামোজ ময়লাপুরে আগমন করিয়াছিলেন। উহার পূর্বে ময়লাপুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে ডঃ মেডলিকট্ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে মিঃ টলেমির (Ptolemy) মালিয়ারফা (Maliarpha)-ই ময়লাপুর।

খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে কোন লেখক ময়লাপুর নাম ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু টলেমির ভৌগোলিক মানচিত্রে বর্তমান ময়লাপুরকেই তিনি মালিয়ারফা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তখন ইহা সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত হইলেও কালক্রমে সমুদ্র উহার নিকটে আসিয়াছে। তামিলে 'ময়লাই' অর্থে ময়ূর। কথিত আছে দেবী পার্বতী ময়ূরের রূপ ধারণ করিয়া এখানে মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। ময়লাপুরের বিখ্যাত কপালীশ্বর শিবের মন্দিরসংলগ্ন স্থলবৃক্ষের কাছে একটি ছোট মন্দিরে ঐ চিত্র দেখানো হইয়াছে। হয়তো তখনকার দিনে এই স্থানে যথেষ্ট ময়ূর ছিল।

টমাসের মৃত্যু সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদে কথিত আছে যে সেণ্ট টমাস যখন ময়ূর-অধ্যুষিত ময়লাপুরের কোন জঙ্গলে ধ্যান করিতেছিলেন, তখন কোন ব্যাধ ময়ূর মারিবার জন্য তীর নিক্ষেপ করিলে উহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া টমাসকে আঘাত করে, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মিঃ জে. কেনেডি তাঁহার রচিত The East and the West (1907) নামক পুস্তকে স্বীকার করেন যে সেণ্ট টমাসের নাম ময়লাপুরের সহিত জড়িত—ইহা অনেকখানি সত্য, কারণ বহু শতাব্দী পূর্বে মার্কো পোলো যখন এখানে আগমন করিয়াছিলেন, তখনও তিনি টমাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত গির্জা তথায় দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন নাই যে ময়লাপুরের গির্জা টমাসের কবরের উপর নির্মিত। তাঁহার ধারণা টমাস পার্থিয়া বা সিন্ধু উপত্যকায় শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে ময়লাপুরের নিকট সেণ্ট টমাসের কবর আবিষ্কার খৃষ্টান পাদ্রীদের কাজ।

আবার ডি. আরসি (D. Arsy) তাঁহার Portuguese Discoveries পুস্তকে বলেন, 'সেণ্ট ক্রিসোষ্টমের মতে বহু প্রাচীন কাল হইতে রোমে সেণ্ট পিটারের গির্জা যেরূপ সম্মানিত হয়, পূর্বাঞ্চলে সেণ্ট টমাসের গির্জাও তদ্রূপ সম্মানিত হয়।' পর্তুগীজরা সেণ্ট টমাস মাউণ্টকে ময়লাপুরের পূর্বাঞ্চল বলিয়া নিরূপিত করিয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে স্মরণাতীত কাল হইতে এখন পর্যন্ত মালাবার উপকূল, সিলোন (লঙ্কা) ভারতবর্ষের সুদূর অঞ্চল এবং এমনকি আরব দেশ হইতেও বহু খৃষ্টান প্রার্থনা করিবার জন্য

ও পূজা দিবার জন্য ময়লাপুরের সন্নিহিত পাহাড়দ্বয়ে (যাহাকে খৃষ্টানরা সেণ্ট টমাস নাম দিয়াছে) আগমন করিয়া থাকেন।'

পূর্বে আমরা রাজা মাজদাই-এর কথা উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাকে মথুরার রাজা বাসুদেবের অপভ্রংশ বলিয়া প্রচার করা হইয়া থাকে, কিন্তু একদল গবেষক মাজদাইকে মহাদেবের অপভ্রংশ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্যে মহাদেবন্ নামের খুব প্রচলন। শেষোক্ত গবেষকগণ বলেন যে টমাস উত্তর ভারতে তাঁহার প্রচারকার্য সম্পন্ন করিয়া দক্ষিণ ভারতে আগমন করেন এবং তথায় রাজা মহাদেবনের সম্পর্কে আসেন। এই মহাদেবন্ই টমাসের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া শহরের কিছু দূরে টমাসকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। যে পাহাড়ের উপর তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে বলা হয়, উহার নাম Big Mountain এবং তামিলে উহাকে 'পেরিয়া মালাই' বলা হয়, 'পেরিয়া' অর্থে বড় এবং 'মালাই' অর্থে পাহাড়। উহা মাদ্রাজের Fort St. George হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। উহার দুই মাইল দূরে মাদ্রাজের দিকে Small Mountain বা 'চিন্না মালাই' নামে একটি পাহাড় আছে। কথিত আছে টমাস প্রথমে ওখানে পলাইয়া যান এবং ওখান হইতে সুড়ঙ্গ পথে পেরিয়া মালাই যাইলে তথায় তিনি ধৃত হন ও বর্শার আঘাতে তাঁহার প্রাণ সংহার করা হয়।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজগণ পুরাতন গির্জার অনুসন্ধানে Big Mountain-এর অংশ বিশেষ খুঁড়িতে আরম্ভ করেন এবং খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাথরের উপর অঙ্কিত রক্তাপ্লুত একটি ক্রস এবং কাষ্ঠের উপর অঙ্কিত মাতা মেরী ও শিশু খৃষ্টের একটি ছবি প্রাপ্ত হন। উহারা ঐ সময় সেখানে একটি শিলালিপি স্থাপন করেন। ঐ শিলালিপি পহ্লবী ভাষায় লিখিত উহার পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কেহই বলেন নাই যে উহাতে ঐ স্থানে টমাসের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ আছে।

মাতা মেরী ও শিশু খৃষ্টের ছবিটি সেণ্ট লুক দ্বারা অঙ্কিত এইরূপ বলা হয়। তিনি নাকি ঐরূপ সাতটি ছবি আঁকিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি ছিল টমাসের সাথে।

সহজেই প্রশ্ন হইবে যে প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরাতন ক্রসে তখনও কিরূপে রক্তের চিহ্ন থাকিতে পারে। আরও বলা হয় যে রক্তের চিহ্ন কেবল যে ক্রসেই ছিল তাহা নয়, উহার পার্শ্ববর্তী স্থানেও ছিল। এ ছাড়া কাঠের উপর অঙ্কিত ছবি দেড় হাজার বছরের পরেও যে কি ভাবে মাটির নীচে ঠিক থাকিতে পারে, তাহাও সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

কথিত আছে যে St. Thomas Mount-এই টমাসকে কবরস্থ করা হয় এবং তাহার কিছুকাল পরে অধিকাংশ অস্থি মেসোপটেমিয়ার এডেসাতে (Edessa) স্থানান্তরিত করা হয়। এডেসা হইতে চিওসে (Chios) এবং তথা হইতে ওরটনা (Ortona)-তে উহা লইয়া যাওয়া হয় এবং উহা এখনও সেখানেই আছে।

এই প্রবন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, সেগুলি বিশেষভাবে চিন্তা করিলে ইহাই মনে হয় যে সেণ্ট টমাস যে ময়লাপুরের সন্নিকটস্থ পেরিয়া মালাই-এ নিহত হইয়াছিলেন, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। ঐ সম্বন্ধে কোন বিবরণীকেই সংশয়াতীতভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে গবেষকগণ এখনও আশা করিতেছেন, হয়তো এমন কোন ঘটনা আবিষ্কৃত হইবে, যাহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইবে যে সেণ্ট টমাস দক্ষিণ ভারতে প্রচারকালে নিহত হইয়াছিলেন। এখন পর্যন্ত ইহার

কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই বা কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। কেবল কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই এতবড় ঘটনা প্রচার করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কেহ কেহ বলেন কিংবদন্তীও ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কারের অন্যতম উপকরণ, কিন্তু উহাই যে একমাত্র ভিত্তি তাহা মানিয়া লওয়া মুস্কিল। ডিক্রুজ লিখিত St. Thomas, the Apostle in India পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে যাইয়া সিন্দার বিশপ ও সেণ্ট টমাস গির্জার বিশপের Co-Adjutor মহামান্য এ. এম টেক্সিরিয়া লিখিয়াছেন, 'রোম হইতে যে সব বণিক জাহাজে বাণিজ্যের জন্য ভারতের উপকূলে যাইত, তাহারাই হয়তো ফিরিয়া আসিয়া রোমে সেণ্ট টমাসের হত্যার সংবাদ দিয়াছে। ঐ জাহাজের নাবিকদের মধ্যে নিশ্চয়ই বহু ক্রীতদাস ছিল, তাহাদের পক্ষেও ঐ খবর দেওয়া স্বাভাবিক।' কিন্তু 'হয়তো' এবং 'নিশ্চয়ই' প্রভৃতি শব্দের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ গুরুতর ঘটনার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে কিনা চিন্তনীয়। ঐ বিশপ নিজেও উক্ত ভূমিকার শেষে স্বীকার করিয়াছেন, 'It will be a glorious day when the shadows of doubt that still hang in many minds over these hoary traditions at Mylapore—to us all so dear—are dissipated once and for all time'... অর্থাৎ ময়লাপুরের প্রাচীন কিংবদন্তী (যাহা আমাদের এত প্রিয়) সম্বন্ধে এখনও বহু লোকের মনে যে সন্দেহের ছায়া রহিয়াছে, সম্পূর্ণরূপে যেদিন তাহার নিরসন হইবে সেদিন একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন বলিয়া গণ্য হইবে।

সেণ্ট টমাস ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এবং সাফল্যের সহিত তাঁহার প্রভুর বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে আমাদের কোন বাধা নাই। তিনি ভগবানের লীলাসহচর, তাঁহাকে আমরা অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহাকে স্বাগত জানাই।

বিবেকানন্দও চিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশনের পর ডেট্রয়েটে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'আমরা খৃষ্টের প্রকৃত মিশনরীদের চাই। যাঁহারা খৃষ্টের জীবনী আমাদের মধ্যে আনয়ন করিবে, তাঁহারা হাজারে হাজারে ভারতবর্ষে আসুন!'

কিন্তু অখণ্ড যুক্তি ও প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কেবল কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করিয়া আমরা স্বীকার করিতে রাজী নই যে সেণ্ট টমাস দাক্ষিণাত্যের ময়লাপুরে বা ভারতের কোন স্থানে নিহত হইয়াছিলেন।

মাতৃ-স্তুতি

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

সর্বজীবের বুদ্ধি তুমি মা,
হৃদয়ের মাঝে রহ,
স্বর্গ ও অপবর্গদা তুমি,
স্নেহ-ঘন-বিগ্রহ!

তুমি দ্যুতিময়ী দেবী মহীয়সী,
তুমি মাগো সনাতনী,
নিখিল জীবের আশ্রয়ভূতা
নমি তোমা নারায়ণী!

সন্তান-গত-জীবনা তুমি মা,
সতত ব্যাকুল-হিয়া,
সন্তানে তুমি করিছ পালন
স্নেহ-স্তন্য দিয়া!

এ নিখিল ভরি নানা রূপ ধরি
অধরা দিয়েছ ধরা,
তোমারে প্রণমি, চাহি গো জননি,
চরণ করুণা-ভরা!

সর্ব-শুভের তুমি বিধাত্রী,
তুমি মাতা কল্যাণী,
সর্ব-সিদ্ধি-প্রদায়িনী তুমি,
বর- ও অভয়পাণি!

তুমি ত্রিনয়না, নিখিল-শরণা,
ত্রিভুবন-আশ্রয়া,
তোমারে প্রণমি ওগো নারায়ণি,
চির-মঙ্গলালয়া!

সৃষ্টি-স্থিতি-শক্তি-স্বরূপা,
তুমি মা ত্রিগুণাধারা,
তুমি গুণময়ী, তুমি মা নিত্যা,
তুমি মা সারাৎসারা।

দীন-আর্তের পরিত্রাত্রী
সকল-আর্তি-হরা,
তোমারে প্রণমি, ওগো নারায়ণি,
মমতা-মধুক্ষরা!

'মা, মা' বলে ডাকিস কেন?

সেখ সদর উদ্দীন

'মা, মা' ব'লে ডাকিস কেন
ব্যর্থ পূজায় শূন্য মনে?
কণ্ঠে যারে বার ক'রে দিস্
থাকবে সে তোর চিত্ত-কোণে?
মায়ের পূজা করতে বসে
হৃদয় দিয়ে ডাকতে হয়,
সার্থকতা সেথাই ওরে,
নয়ন যেথা দৃষ্টিময়!

সোনা-রূপার অলঙ্কারের
নেইক' যেথা আড়ম্বর,
ভক্তি যেথায় মুক্তাহারে
সাজ করেছে মনের 'পর!
অশ্রু-কুঁড়ি অর্ঘ্য হ'য়ে
ঝরছে সেথা চরণ 'পর,
সেথাই তো রে মৃন্ময়ী মা'র
চিন্ময়ীতে রূপান্তর!

বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন

[তৃতীয় প্রস্তাব]

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

(১)

বিভিন্ন স্থানে ঠিক ধারাবাহিক ভাবে না হলেও রীতিমতো ঐতিহাসিক আলোচনা ক'রে বিবেকানন্দ পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে 'Materialism and spirituality in turn prevail in society'।[১] সমাজ-বিকাশের এইটিই হ'ল চিরন্তন ধারা—জড়বাদ ও আধ্যাত্মিকতার ক্রমান্বয় প্রাদুর্ভাবের মাধ্যমে মানব-সমাজের উন্নতি সঙ্ঘটিত হয়। উন্নতিই হ'ল সমাজ-জীবনের লক্ষ্য—'Progress is its watchword'। কিন্তু সে উন্নতি একটি সরল-রেখায় সম্ভবপর নয়, কারণ 'All progress is in successive rise and fall'[২]। বিবেকানন্দের মতে সমস্ত উন্নতিই ঘটে ক্রমিক উত্থান-পতনের পদ্ধতিতে। ইতিহাসে এর যথেষ্ট সমর্থন আমরা পাই।

ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে জড়বাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তখন চার্বাক দর্শনের বস্তুবাদ বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেছিল। ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হ'য়ে অধ্যাত্মবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। আবার প্রায় সহস্র বৎসর পরে আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্বে দেহাত্মবাদ ভারতবর্ষকে প্রায় গ্রাস করে; অবনতির যুগে বৌদ্ধধর্মের পরিচয় গ্রহণ করলেই তার সত্যতা অনুধাবন করা যায়।[৩] শঙ্করাচার্য উপনিষৎ-নির্দিষ্ট বেদান্ত-ধর্মের বহুল প্রচার দ্বারা দেশকে সেই সঙ্কট হ'তে রক্ষা করেন। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য ভাব-প্রভাবের প্রথম পর্যায়ে জড়বাদ আমাদের দেশকে অধিকার ক'রে বসে। এই সঙ্কটে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় অধ্যাত্মশক্তির আবির্ভাব ভারতীয় মনকে বিশ্লেষ হ'তে রক্ষা করেছে। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব, সারা পৃথিবীই এখন এক ইন্দ্রিয়ানুগ (Sensate) সভ্যতার কবলিত। তারই অবসান-কল্পে ঘটেছে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

মোটের উপর আমরা দেখছি যে ঢেউয়ের আকারে উন্নতি-অবনতি বা অধ্যাত্মবাদ-জড়বাদ সমাজ-জীবনে প্রাধান্য অর্জন করে। এর থেকেই বিবেকানন্দ তাঁর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেছেন : আধ্যাত্মিকতাই প্রত্যেক জাতির প্রাণশক্তি, আধ্যাত্মিকতার সঙ্কোচে সমাজের পতন এবং তার বিকাশেই সমাজের উত্থান। শুধু তাই নয়, সভ্যতা আমরা তাকেই বলব যেখানে মানুষের মধ্যে দেব-ভাবের বিকাশ হয়—'Civilisation means manifestation of divinity in man'।[৪] 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থে এই সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে তিনি বলছেন :

> প্রত্যেক সমাজেই এমন এক দল ব্যক্তি থাকেন, যাঁহারা স্থূল বিষয় ভোগে আনন্দ পান না। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতেই তাঁহাদের প্রীতি। মাঝে মাঝে তাঁহারা জড় অপেক্ষা উচ্চতর এক সত্যের আভাস পান। ঐ সত্যের অনুভূতি লাভের জন্য তাঁহারা অবিরাম চেষ্টা করিয়া চলেন। আমরা যদি মানব-জাতির ইতিহাস পাঠ করি, তাহা হইলে দেখিব যে এইরূপ মানুষের সংখ্যা দেশে বৃদ্ধি পাইলে জাতির উন্নতি এবং যখনই তাঁহাদের সংখ্যা কমিয়া যায়, তখনই জাতির অধঃপতন ঘটে।

১ Paramkudi Lecture ২ Jnana-Yoga

৩ 'They (সহজিয়া) believe that *deha* or material human body is all that should be cared for.'—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

৪ Conversation & Dialogues—Vivekananda

যে কোন সাধক বা মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করলে এর সত্যতা আমরা বুঝতে পারি।

বাল্যাবধি কতপ্রকার সুখ-সম্পদের মধ্যে তিনি ছিলেন, ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুদের নিকট তা বর্ণনা করেছেন,[৫] কিন্তু এতে তিনি তৃপ্তি বোধ করেন-নি। তিনি চাইলেন দেহ-মনের অতীত জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর পারে সুখ-শান্তি-নির্বাণ।[৬]

এই সকল জীবন থেকে বোঝা যায়, মানুষের মন কোন কোন সময় কিভাবে ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের জ্ঞান অর্জনের জন্য পিপাসু হ'য়ে ওঠে। এই রকম পিপাসু মানবের অন্তরের আলো মানব-সমাজে যুগ-যুগান্তের অন্ধকার কিরূপে দূর করে, তা সমগ্র বৌদ্ধযুগে অসাধারণ ব্যাবহারিক উন্নতি দর্শনে বোঝা যায়। এই দেদীপ্যমান আলোক-স্পর্শে বহু চণ্ডাশোক ধর্মাশোক হন, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল মানুষের সুপ্ত আত্মশক্তির জাগরণ ঘটে—জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই ঘটে তাই উন্নতি।

অতি আধুনিক যুগেও আমরা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে নিদারুণ আধ্যাত্মিক অবনতি আমাদের দেশে দেখেছি। সাধারণের জীবনে স্থান পেয়েছিল একমাত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভোগ-সুখ। এর ভয়াবহ পরিণামের চিত্র সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা পাই।[৭] কিন্তু উনিশ শতকেই ঘটল এর অবসান—একদিকে ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুত্থান, অপরদিকে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান সমগ্র জাতিকে নববলে বলীয়ান্ ক'রে তুলল। সেই আধ্যাত্মিকতার প্রবল প্লাবনে সব গ্লানি ভেসে গেল এবং গৌরবময় নবীন যুগের আবির্ভাব হ'ল।

সুতরাং বিবেকানন্দের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ যে 'প্রত্যেক জাতির প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিহিত, আধ্যাত্মিকতা বিলীন হইয়া বস্তুবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে এই প্রাণশক্তি শুকাইতে থাকে।'

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সমাজ-বিকাশের ধারা সম্বন্ধে আমরা বিবেকানন্দের চারিটি সুস্পষ্ট অভিমত যা পেয়েছি তা হ'ল:

(১) সরল-রেখায় সমাজের বিকাশ ঘটে না,

(২) উত্থান-পতনের ধারা সমাজ-বিকাশের সুনির্দিষ্ট গতিপথ,

(৩) আধ্যাত্মিকতার আবির্ভাবই উন্নতি, জড়বাদের প্রাদুর্ভাবই অবনতি,

(৪) অতএব আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই সভ্যতার প্রাণশক্তি নিহিত।

সমাজ-জীবনের উন্নতি যে একটি সরল-রেখায় সম্ভব নয়—এ সিদ্ধান্ত শুধু বিবেকানন্দের নয়, এ মত পোষণ করেন বর্তমান কালের অনেক প্রখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী; যথা—সোরোকিনের মতে ঢেউয়ের আকারে সমাজের বিকাশ ঘটে থাকে।[৮] একে তিনি 'Theory of Rhythm' বলেছেন। মার্ক্স অবশ্য সরল-রেখায় উন্নতি-তত্ত্বে বিশ্বাসী। দেখা যায় যে উনিশ শতকের উন্নতি-তত্ত্বপ্রণেতাগণ অনেকেই এই সরল-রেখায় উন্নতি-তত্ত্বের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। তার কারণ তাঁরা অনেকেই ডারউইন-প্রণীত জীব-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন অতিমাত্রায়। সমাজকে তাঁরা জীবদেহের অনুরূপ মনে করেছেন। প্রাণি-জগতের ক্রমবিকাশ ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী সরল-রেখায় উন্নতির পথে পর্যায়ের পর পর্যায়ে এগিয়ে চলেছে। এইজন্য তাঁরা সরল-

৫, ৬ মহেশচন্দ্র ঘোষ—বুদ্ধপ্রসঙ্গ, গৌতমবুদ্ধের আত্ম-চরিত-অধ্যায়।

৭ বিমল মিত্র প্রণীত 'সাহেব-বিবি-গোলাম' নামক উপন্যাসে এর জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

৮ Sorokin—Social and Cultural Dynamics.
Cowell—History, Civilisation & Culture.

রেখায় সমাজ-বিকাশের ধারা দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

এঁরা যে এরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ করেন, তার আরও কারণ এই যে—কোন একটি বিশেষ সমাজ-সংস্কৃতির স্তরে (Ideational, Idealistic অথবা Sensate স্তরে) সমাজ-জীবনের বিভিন্ন শাখায় সরল-রেখায় বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু এ রেখা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঋজুভাবে বিস্তৃত নয়। পাশ্চাত্য সমাজ-জীবনের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে দীর্ঘকালব্যাপী পরিসংখ্যান সহায়ে অনুসন্ধান ক'রে সোরোকিন সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন :

> There is no slightest doubt that if the time period is not too long, there are millions of socio-cultural processes with a linear trend during such a period. Quite different is the situation, if the existence of a linear trend is asserted for an infinite time, or for a period that factually exceeds the duration of the given linear trend...... When they are considered in a longer time-perspective, these linear trends are discovered to be finite and are replaced by new trends either different or opposite to the previous ones.

—কিছুদূর পর্যন্ত যে প্রবণতা সরল-রেখায় অগ্রসর হ'তে দেখা যায়, কিছুকাল পরে তা হয় সম্পূর্ণ পৃথক্, হয়তো এর উল্টো প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। অতীন্দ্রিয় ভাবের যুগে (Ideational age) শিল্প-কলা-সাহিত্য সব কিছুর ওপর দেখা যায় অতীন্দ্রিয়তার ছাপ এবং তা বেশ কিছুকাল ধরে ক্রমবিকাশ-ধারায় ঋজু-রেখায় বিস্তৃত, কিন্তু তারপরেই দেখা যায় এসে পড়েছে উল্টো ভাবধারা। অতীন্দ্রিয়তার যুগে ধর্মই হয় সঙ্গীত-শিল্প-কলা-দর্শন-সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন, আর ইন্দ্রিয়ানুগতার যুগে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ-ভোগ এ সকলের আদর্শ।

বৈষ্ণব যুগের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যকে দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরে অনুশীলন করলে ধরা পড়ে এ সত্য। ভারতচন্দ্রের কালের আদিরসাত্মক সাহিত্য সেই যুগের জীবনযাত্রা, ভাবধারা, সমগ্র প্রবণতার অনুরূপ; মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভাবপ্রবাহ তার বিপরীত। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সে যুগ কবিগান, হাফআখড়াই প্রভৃতির; সে যুগ তার পূর্ববর্তী মরণশীল ইন্দ্রিয়ানুগ কৃষ্টিরই (sensate culture) সাক্ষ্য দেয়। তার পরবর্তী কালে সঙ্গীত-রচনায় এবং সঙ্গীত-সাধনায় প্রাধান্য করেছেন (শুধু বাংলা দেশের দৃষ্টান্ত ধরতে গেলে) রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মসঙ্গীতকারগণ—যখন সঙ্গীতের ভাবধারার পরিবর্তন হয়েছে যুগচেতনা অনুযায়ী।

এমনি ক'রে বিভিন্ন শতাব্দীতে ব্যাপক অনুসন্ধান করলে দেখা যায় অতীন্দ্রিয়তা ও ইন্দ্রিয়ানুগতার আবর্তন ও বিবর্তন। দার্শনিক চিন্তাধারায়ও এই আবর্তন-বিবর্তন দেখা যায়—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে তন্ত্র-মন্ত্র সহজিয়া সাধনা প্রভৃতির বিকৃত রূপের মধ্যে অনুসন্ধান করলে অবসানপ্রায় অতীন্দ্রিয়তা এবং স্থূল ইন্দ্রিয়ানুগতা পরিলক্ষিত হয়। আবার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরবর্তী এক শতাব্দীতে ত্যাগ-বৈরাগ্য অতীন্দ্রিয় চিন্ময়-সত্য-সাধন দর্শন-চিন্তার ক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে দেখা যায়।

এরূপ স্থলে মৌলিক দর্শন-চিন্তা শুধু বস্তু-বাদী এবং অধ্যাত্মবাদ শুধু আর্থনীতিক কারণে দুষ্ট মস্তিষ্কের কল্পনা—এ মনে করা ভুল। বৈদিক যুগে কোন এক সময়ে উপাসকেরা ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের তুষ্টি সাধন করবার প্রয়াস পেয়েছেন, ধনজন-সম্পদ অর্জনের জন্য ইন্দ্রজাল অলৌকিক শক্তি-প্রয়োগের প্রচেষ্টাও করেছেন, কিন্তু উপনিষদের যুগে রাজর্ষিবৃন্দ 'কেবলম্ অমৃতম্' লাভকে পরম সম্পদ লাভ ব'লে মনে করেছেন।

এখন 'Theory of Rhythm' (তরঙ্গাকারে অগ্রগতি-তত্ত্ব) মানলে অতীন্দ্রিয়বাদ ও ইন্দ্রিয়ানুগতার ক্রমিক আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু 'Linear Progress' (সরল-রেখায় অগ্রগতি)-তত্ত্ব মানলে ভ্রান্ত গবেষকের মনে করতে হয়—অধ্যাত্মবাদ প্রক্ষিপ্ত বস্তু মাত্র, বাস্তব সত্য নয়। এখন কিছু সময়ের ব্যবধানে নিয়মিতভাবে বস্তুবাদের পুনরাবির্ভাব লক্ষ্য করেই 'Linear Progress' (সরল-রেখায় অগ্রগতি)-তত্ত্বে বিশ্বাসী মার্ক্সবাদী বস্তুবাদকেই একমাত্র সত্য-তত্ত্ব ব'লে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। উপনিষদের যুগে এবং বৌদ্ধযুগে অধ্যাত্মবাদের যে প্রভাব, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই অধ্যাত্মবাদ—'অধ্যাত্মবাদ শুধু মাত্র শাসক-শ্রেণীর দর্শনই নয়, সেই শ্রেণীর কাছে শাসনের হাতিয়ারও।' তাঁরা আরও বলেন যে আগামী-কালের নিঃশ্রেণীক সমাজে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদই হবে একমাত্র গ্রাহ্য দর্শনতত্ত্ব।

এখন এই যুক্তি অনুসরণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌছাই যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই অধ্যাত্মবাদের স্থান, নিঃশ্রেণীক সমাজে তার স্থান নেই। ঠিক এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ ক'রে মার্ক্সবাদী গবেষক বলছেন যে প্রাগ্-বিভক্ত ভারতীয় সমাজে লোকায়তিক যে মতবাদ আবিষ্কার করা যায়, যা প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্য এবং আদিম অধিবাসীদের ধর্মানুষ্ঠান রীতি-নীতি অনুসরণ করে—তা বস্তুবাদী।[৯] তাহলে বস্তুবাদ শ্রেণী-সমাজে থাকতে পারে না, অথচ এই মত ইতিহাসের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। কারণ দেখা যায়, শ্রেণীবিভক্ত ভারতীয় সমাজের এক স্তরে সহজিয়া-সাধন তন্ত্র-মন্ত্রসাধন বৌদ্ধদের অধ্যাত্ম-দর্শন-প্রভাব কাটিয়ে বস্তুবাদী লোকায়তিক দর্শন-চিন্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষণ প্রকট করছে।[১০] 'Linear Progress' (সরল-রেখায় অগ্রগতি)-তত্ত্ব অনুসরণ ক'রে এই সকল পরস্পরবিরোধী যুক্তি ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এঁরা। অথচ অনুসন্ধান করলে সহজ-যান প্রভৃতি লোকায়ত দর্শন-চিন্তায়ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব দেখা যায়। অলৌকিক অতীন্দ্রিয় আনন্দপূর্ণ অবস্থাকেই এঁরা 'সহজ' অবস্থা বা 'সহজানন্দ' অবস্থা ব'লে মনে করেছেন।[১১] এ-কে পূর্বোক্ত মতবাদীরা শাসক-শ্রেণীর চাপানো চিন্তা ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন। এ মতের স্বপক্ষে যুক্তি কিছু নেই। লোকায়ত-দর্শন-চিন্তা যা প্রাগ্ বিভক্ত সাম্য-সমাজ-প্রসূত ব'লে এঁরা বস্তুবাদী ব'লে মনে করেছেন, তাদেরও মধ্যে অতীন্দ্রিয়তার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। সমাজ-বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মবশেই নাথযোগীরাও যোগসাধনার ফলে—যে অবস্থা লাভ হয় ব'লে মনে করেন, তা অতীন্দ্রিয়-নির্বাণানন্দ অবস্থা ব্যতীত কিছুই নয়।[১২]

অধ্যাত্মবাদী শাসকশ্রেণীর দর্শনও আবার এই নিয়মবশেই মাঝে মাঝে বস্তুবাদের প্রবণ-

৯ ডাঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় ২৭শে কার্তিক, ১৩৬৬ সনের 'দেশ' পত্রিকায় 'এশিয়ার ধর্মজীবন' সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তাতে প্রমাণিত যে সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং চেতন-অচেতন সব বস্তু প্রাণবস্ত—এ বিশ্বাস আদিম অধিবাসীদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, যা হ'ল অধ্যাত্মবাদের সূচনা।

১০ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লোকায়ত-দর্শনে সহজিয়া-মত, নাথ-পন্থ, তন্ত্র-মন্ত্র, যোগসাধন, কায়াসাধন—এ সকলকে মূলতঃ বস্তুবাদী ব'লে প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত সমাজেও সময়বিশেষে বস্তুবাদী দর্শনের উদ্ভব সম্ভব, অথচ মার্ক্সীয় নীতি অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দর্শন-চিন্তা ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী।

১১ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাংলার বাউল ও বাউল সম্প্রদায়।

১২ এ সম্পর্কে উদ্বোধনে 'ভারতের সমাজ-সংস্কৃতির রূপায়ণে অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে ইতিপূর্বে বিশদ আলোচনা করেছি। এ ছাড়া ডাঃ কল্যাণী মল্লিক লিখিত 'নাথপন্থ' এবং উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত 'বাংলার বাউল ও বাউল-ধর্ম' নামক গ্রন্থে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

তার কবলিত হয়েছে দেখা যায়, তখন ধর্ম-চর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়েছে ভোগের উপকরণ-সংগ্রহ। তখন সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত সবকিছুর অবলম্বন হয়েছে ইন্দ্রিয়ানুগতা এবং ধর্ম-দর্শন চিন্তা ও চর্চা এই ইন্দ্রিয়ানুগতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে—দেখা যায়। উড়িষ্যার মন্দির-গাত্রেও এর সাক্ষ্য সুস্পষ্ট মেলে। 'Linear Progress' (সরল-রেখায় অগ্রগতি)-তত্ত্ব অনুসরণের ফলে মার্ক্সবাদিগণ এ বিষয়ে ভ্রান্ত হয়েছেন।

মোটের উপর ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় বরাবর সরল-রেখায় অগ্রগতি সম্ভব নয়। সোরোকিন গ্রীক-রোমান সংস্কৃতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ যে আলোচনা করেছেন তার দ্বারাও এ তত্ত্ব প্রমাণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করছি, সোরোকিন দেখাচ্ছেন, 'Creto-Mycenean culture'-এর যুগে—খৃষ্টপূর্ব ১২শ থেকে ৯ম শতাব্দীতে চিত্রশিল্পে ইন্দ্রিয়ানুগতার (Sensate) প্রভাব, তার পরবর্তী গ্রীক সভ্যতার আমলে—খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অতীন্দ্রিয় ভাবের প্রভাব (Ideational), আবার খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে ইন্দ্রিয়ানুগতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। কোন সভ্যতার অধঃপতনের কালে এর ছাপ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সোরোকিন অনুরূপভাবে এই ছন্দের প্রবাহ দেখিয়েছেন। বাস্তব ইতিহাসই আমাদের 'সরল-রেখায় অগ্রগতি' তত্ত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

(২)

এখন প্রশ্ন হ'ল—এই যে 'সরল-রেখায় অগ্রগতি বা উন্নতি'-তত্ত্বের যুক্তিগত ত্রুটি কোথায়? এর পেছনে যুক্তির দৌর্বল্যও প্রমাণ করেছেন সোরোকিন। এ সম্পর্কে সোরোকিনের 'Theory of limit and theory of immanent change'—এই দুটি তত্ত্বের আলোচনা প্রয়োজন। সোরোকিন বলেন, কোন উন্নতি বা অবনতি অনির্দিষ্ট কালের জন্য হ'তে পারে না। সব কিছু বিকাশের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। কোন কিছু বিকাশের প্রবণতা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হ'তে পারে তখনই, যখন তার ওপর বহিঃস্থ অন্য শক্তির প্রভাব এসে পড়বার সম্ভাবনা আদৌ থাকে না। সুতরাং সোরোকিন বলছেন:

'A perpetual tendency in social processes is a mere complicated form of uniform and rectilinear motion in mechanics. Newton's law tells us under what conditions this is possible. In order for such to occur there must be absolute non-interference of any exterior forces, or absolute isolation from any environmental influence is essential. Otherwise definite movement in one direction is impossible, and friction and shocks of external forces would disturb the movement and eventually change its direction. Through gravitational forces, for instance, linear movement becomes circular and elliptical.'

এই যে বস্তু-জগতের তত্ত্ব—সমাজ-জীবনও এর অধীনে; বিভিন্ন প্রকার বহিঃশক্তি তার গতিপথ পরিবর্তিত ক'রে দেয়। কোন একটি সুনির্দিষ্ট কক্ষপথের সীমা এইরূপে সুনির্দিষ্ট হয়।

'Social processes individually or in their totality, are not absolutely isolated from the outside cosmical and biological worlds nor from the pressure of the 'social processes'. They permanently and ceaselessly interfere with each other. Unless we postulate a miracle or an active Providence, it is quite improbable that all these innumerable forces would be negligible or constant at every moment, thus maintaining the direction of the processes unchanged. Such an assumption of a perfect and eternal balance of numerous cosmic, biological and social processes is equivalent to a miracle and contrary to all probability.'

বহিঃশক্তি প্রক্ষেপের জন্য কোন একটি বিশেষ ধারার বিকাশ কিছুকাল পরেই বাধাপ্রাপ্ত

হয় এবং অন্য ধারার আবির্ভাব ঘটে। এই কারণেই সব বিকাশের ধারারই সীমা আছে, সব উন্নতিরই অবসান আছে, সব অধঃপতনেরই শেষ আছে। মহাভারত-কার উত্থানপতনের এই বিশ্ব-বিধানটি অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেন: 'সকল সঞ্চয়েরই পরিশেষে ক্ষয় হয়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়'।[১৩] এই সৃষ্টিতে বরাবর ঋজুরেখায় কোন গতিই সম্ভব নয়, একস্থানে না একস্থানে এসে রেখার শেষ প্রান্ত দেখা দেবে, পথ বক্রগতিতে ভিন্ন দিকে চলবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—সমাজ-বিকাশের পদ্ধতি সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা না করলেও বিবেকানন্দ ঐতিহাসিক জ্ঞান-বলে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, তার বৈজ্ঞানিকত্ব আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন। উত্থান-পতনের ভেতর দিয়েই সমাজ-বিকাশের ধারা প্রবাহিত,—এই ভাবেই আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদ ক্রমান্বয়ে আবর্তিত হ'য়ে চলেছে।

সোরোকিন আরও বলেন যে সমাজের পরিবর্তনের কারণ অন্তর্নিহিত, এই অন্তর্নিহিত কারণের ওপর বহিঃশক্তি প্রক্ষিপ্ত হ'য়ে পরিবর্তনের গতিপথ ঘুরিয়ে দেয়।

'In regard to any socio-cultural system, it changes by virtue of its own forces and properties. It cannot help changing, even if all its external conditions are constant. The change is thus immanent in any socio-cultural system, inherent in it and inalienable from it. It bears in itself the seeds of its change.'

কোন সচল ও সক্রিয় প্রতিষ্ঠান তার আপন ক্রিয়াশীলতার বলেই গতিবেগ প্রাপ্ত হয় এবং পরিবর্তিতও হয় এবং তা হতেই হবে। কারণ ক্রিয়াশীলতা প্রতিষ্ঠানটির যে রূপ দেবে, তা তার পূর্বাবস্থা হ'তে রূপান্তর এবং রূপান্তরিত প্রতিষ্ঠানটি যখন পুনর্বার চলতে থাকবে, তার নবরূপায়ণ ঘটবে। এই স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত শক্তি ছাড়া অন্য কোন (বহিঃ) শক্তি দ্বারা পরিবর্তন বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ 'যা নেই' তার থেকে 'যা আছে' তা কখনও উৎপন্ন হ'তে পারে না; পরিবর্তনের ফলে সে নব-রূপ শূন্য থেকে প্রসূত হ'তে পারে না, বস্তুটির অন্তর্নিহিত স্বভাবের বা স্বরূপের মধ্যে প্রসুপ্ত থাকতে হবে তাকে। নতুবা একটি অতি জটিল সমাধানহীন ধাঁধাঁর মধ্যে আমাদের পড়তে হয়।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাক—ভারতীয় পরিবার-প্রথার বর্তমান স্বরূপ (=ক) যে ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার কারণ শিল্পবিপ্লব (=খ), এবং শিল্পবিপ্লবের কারণ পাশ্চাত্য প্রভাব (=গ)। প্রশ্ন হবে: (গ)-এর কারণ কি? অর্থাৎ গ থেকে খ, খ থেকে ক, ক থেকে অন্য কিছু; এই একটি আদি-অন্ত-হীন কার্যকারণ-ধারা চলেছে, কোথাও এর শেষ পরিণাম বা প্রথম কারণ দেখা যায় না।

অর্থাৎ মানুষের এই সকল প্রশ্নের শেষ উত্তর কিছুই নেই, একটি প্রশ্নের উত্তরে আমরা শুধু আর একটি প্রশ্ন লাভ করছি। সেইজন্য সব সম্ভাবনা (Potentiality)-কে সেই পরিবর্তনশীল বস্তুটির মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকতে হবে। পরিবর্তন সেইজন্য অন্তর্নিহিত কারণবশতই ঘটবে। সোরোকিন সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন:

Any consistent theory of externalistic change does not solve the problem, but merely postpones the solution, and then comes either to a mystery in a bad sense of this term or to the logical absurdity of pulling the proverbial rabbit out of mere nothing.

বহু পূর্বে ভারতীয় দর্শনবেত্তাগণ এই কথা বলেছিলেন। অসৎ (non-existence) থেকে

১৩ মহাভারত—স্ত্রীপর্ব।

সৎ-এর (existence) উৎপত্তি হ'তে পারে না। তাঁরা বলেন যে এজন্য involution বা অব্যক্ত সত্তায় সঙ্কোচ স্বীকার করবার প্রয়োজন আছে। অব্যক্তসত্তার ব্যক্ত রূপই বিকাশ। সমাজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে এই তত্ত্বের গুরুত্ব সোরোকিন তাঁর Theory of immanent change (অন্তর্ব্যাপী পরিবর্তন-তত্ত্ব) দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত করেছেন। এ সম্পর্কে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ তাঁর 'ভারতের সাধনা'[১৪] গ্রন্থে যে কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য—

'Evolution (ক্রমবিকাশ)-এর সঙ্গে involution (ক্রমসংকোচ) স্বীকার না করিলে জীবতত্ত্ব ও ইতিহাসের প্রকৃত ব্যাখ্যা বা মীমাংসা পাওয়া সম্ভব নহে। ভারতীয় বিজ্ঞান- বা পরিণাম-বাদ উক্ত দুইটি তত্ত্বই স্বীকার করে, সেইজন্য কালতত্ত্ব ও মানবীয় উন্নতি সম্বন্ধে উহার সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত হইতে বিলক্ষণ'।

এই involution (সঙ্কোচ)-তত্ত্ব ও immanent change (অন্তর্ব্যাপী পরিবর্তন)-তত্ত্ব অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত। এই তত্ত্ব দুইটি স্বীকার করলে economic determinism (আর্থনীতিক নিশ্চয়তা) রূপ ভ্রান্ত তত্ত্বের হাত থেকে সমাজ-বিজ্ঞানের মুক্তি ঘটে এবং সমাজ-বিকাশের পূর্ণ সত্য স্বরূপ আমাদের দৃষ্টির সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়। এ সম্পর্কে সোরোকিনের শেষ সিদ্ধান্ত :

'The above is sufficient to answer the problem of Dynamics : Why a whole integrated culture as a constellation of many cultural subsystems changes and passes from one state to another. The answer is : it and its subsystems—be they painting, sculpture, architecture, music, science, philosophy, law, religion, *mores*, forms of social, political, and economic organisations—change because each of these is a going concern, and bears in itself the reason of its change.'

কিন্তু তাই ব'লে বহিঃশক্তির প্রভাবও অগ্রাহ্য নয় কারণ :

'The external circumstances may accelerate or retard, facilitate or hinder, reinforce or weaken a realisation of the immanent potentialities of the system and therefore its destiny'.

কিন্তু এর দ্বারা অন্তর্নিহিত পরিবর্তনের ধারা একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে যেতে পারে না, কারণ অন্তর্নিহিত শক্তি প্রবলবেগসম্পন্ন, কিছুতেই তা রুদ্ধ হবে না—এই হ'ল অন্তর্নিহিত শক্তির স্বভাব ধর্ম।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল : Ideational, Idealistic এবং Sensate মাত্র এই তিনটি আকারে অবধারিত পরিবর্তন কেন ঘটে? এর উত্তরে বলতে হয় সে পরিবর্তনের অনন্ত রূপ সম্ভব নয়, তার কারণ পরিবর্তনের উৎস হ'ল একটি বস্তুর বস্তুসত্তা বা নিজ স্বভাব—যার গুণ (properties) সীমাবদ্ধ। এইজন্য তার রূপান্তর বা পরিণাম-কেও সীমাবদ্ধ হতেই হবে। এই সকল কারণেই সমাজ-জীবনের অতীন্দ্রিয়তা বা ইন্দ্রিয়ানুগতা এবং উভয়ের সংমিশ্রণে মধ্যবর্তী অবস্থা—এই তিনটি ছাড়া আর সম্ভাব্য রূপ নেই। এ হ'ল বাস্তব সত্য (empirical reality)। অতএব এগুলির মধ্যে একের পর অন্যকে ফিরে আসতে হবেই। দিন-রাত্রির আবর্তনের মতো এই আধ্যাত্মিকতা-জড়বাদের আবর্তনও অবধারিত।

এর কারণ আরও একদিক থেকে ব্যাখ্যা করা যাক। একটি ধারা যখন অন্য একটি ধারার দ্বারা অপসারিত হয়, তখন প্রথমোক্ত ধারা অব্যক্ত সত্তায় বীজাকারে থাকে এবং

১৪ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত 'ভারতের সাধনা' পুস্তকখানি আজকের পাঠক-সমাজের কাছে অপরিচিত; কিন্তু বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তার উপর এই গ্রন্থখানি সর্বপ্রথম গবেষণা হিসাবে বিশেষ মূল্যবান্।

পুনর্বার তা প্রকটিত হয়, যখন অন্য ধারাটির পরিবর্তিত হবার সময় আসে। ভারতীয় সাংখ্য-দর্শনে এইরূপ বিকাশ ও অব্যক্তসত্তায় পুনরাবর্তনের কথা পাওয়া যায়। সমাজ-জীবনেও এর সত্যতা পরিলক্ষিত হয়। জড়বাদের যুগেও বীজাকারে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক প্রবণতা সুপ্ত থাকে, তার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে না, আর অতীন্দ্রিয়তার যুগে সব মানুষ সমান উচ্চস্তরে উঠতে পারে না, কিছুটা ইন্দ্রিয়ানুগতা লুক্কায়িত থাকে। তাই পরে প্রবল হ'য়ে উঠে অতীন্দ্রিয়তাকে হটিয়ে দেয়। কোন যুগই তার পূর্ণস্বরূপে বিকশিত হয় না। বস্তুতঃ ভারতীয় চিন্তাধারায় এই প্রকল্পটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে যে কোন বিকাশই পূর্ণ হ'তে পারে না।

এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলছেন, 'Perfection means infinity, and manifestation means limit'—পূর্ণ মানে অসীম, বিকাশ মানে সীমা। এই কথার মধ্যে হেগেলের সঙ্গে বিবেকানন্দের চিন্তার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হেগেল পূর্ণতাবাদী, তাঁর মতে সমাজ-সংস্কৃতি একদিন দোষশূন্য পূর্ণরূপে বিকশিত হবে। মার্ক্সও পূর্ণতাবাদী, তিনিও বলেন যে শ্রেণীবিহীন সমাজ আদর্শ সমাজ—দোষত্রুটিহীন পূর্ণ বিকশিত সমাজ। Theory of limit বা সীমাতত্ত্ব অনুযায়ী এ মত অবৈজ্ঞানিক। বিবেকানন্দের মতে ভাল মন্দ চিরদিন সব সমাজে থাকবে, শুধু তার রূপান্তর ঘটবে; কোন অবস্থায় অনেক মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটবে, কোন অবস্থায় ঘটবে না। প্রথমোক্ত অবস্থাকে Ideational (অতীন্দ্রিয়), পরবর্তীকে Sensate (ইন্দ্রিয়ানুগ), উভয়ের মধ্যবর্তীকে Idealistic (আদর্শবাদী) আখ্যা দেওয়া চলে। অতীন্দ্রিয়তার সমাজেও মন্দ কিছু থাকে বলেই পুনর্বার জড়বাদ প্রাধান্য লাভ করে।

অতএব দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত যে 'Materialism and spirituality in turn prevail in society' সম্পূর্ণ সত্য; আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদ এই দুইটি সুনির্দিষ্ট গতিপথে চক্রাকারে একে অপরকে অনুসরণ করে। সমাজ-সংস্কৃতির চলার এইটিই হ'ল সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ।

There come periods in history of the human race when, as it were, whole nations are seized with a sort of world-weariness, when they find that all their plans are slipping between their fingers, that old institutions are systems are crumbling into dust, that their hopes are all blighted. and everything seems to be out of joint.

Two attempts have been made in the world to found social life; the one was upon religion, and the other upon social necessity. The one was founded upon spirituality, the other upon materialism; the one upon transcendentalism, the other upon realism.

Curiously enough, it seems that at times the spiritual side prevails, and then the materialistic side, in wave-like motions following each other. In the same country there will be different tides.

(From 'Reply to address at Paramkudi'—*Swami Vivekananda.*)

গীতা-জ্ঞানেশ্বরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১

তুমি কি মনে কর, আমার ভক্ত মরণের পর আমার সমান হইবে? যে অমৃতের মধ্যে বাস করে, তাহার মরণ কিরূপে হইবে? যে সময় সূর্যের উদয় হয় না, তাহাকেই রাত্রি বলে; তেমনি আমাতে ভক্তি বিনা যে কর্ম করা হয়, তাহাই কি মহাপাপ নহে? এইজন্য হে পাণ্ডুসুত, তাহার চিত্ত যখন আমার সমীপস্থ হয়, তখনই সে তত্ত্বতঃ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; একটি দীপ হইতে অন্য একটি দীপ জ্বালাইলে যেমন কোন্‌টি প্রথম তাহা জানা যায় না, তেমনি যে সর্বস্ব দিয়া আমাকে ভজনা করে সে মদ্রূপই হইয়া যায়; আমারই স্থিতি, আমারই কান্তি পায়, আমাতে নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়; কিংবহুনা—সে আমার জীবনেই জীবিত থাকে; হে পার্থ, এ বিষয়ে বারংবার তোমাকে আর কত বলিব? যদি আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর, তবে ভক্তি ভুলিও না। (৪৩০)

কুলের বিশুদ্ধতার আবশ্যক নাই, আভিজাত্যের শ্লাঘা করিও না, বিদ্যার অভিমান কেন বহন করিবে? রূপ-যৌবনের মদে মত্ত হইও না, ধন-সম্পদের গর্ব করিও না—এক আমাতে ভক্তি না থাকিলে এ সমস্তই ব্যর্থ হয়; কণাবিহীন শস্যের ঘনমঞ্জরী বা জনশূন্য সুন্দর নগর—ইহাতে কি কাজ হয়? শুষ্ক সরোবর, জঙ্গলে দুঃখীর সহিত দুঃখীর মিলন, কিংবা বন্ধ্যা ফুলে শোভিত বৃক্ষ যেমন নিষ্ফল, সকল বৈভব কুল জাতি-গৌরবও তেমনি ভক্তিহীন হইলে নিষ্ফল হয়, সর্ব-অবয়বযুক্ত শরীরে যদি জীবন না থাকে—তবে যেমন হয়, আমাতে ভক্তিবিহীন জীবনও তদ্রূপ, এরূপ জীবনকে ধিক্! উহা পৃথ্বীর উপর পাষাণের তুল্য নয় কি? কণ্টকময় বৃক্ষের ঘন ছায়া যেমন সজ্জন লোক সযত্নে পরিহার করে, পুণ্যও তেমনি অভক্তকে এড়াইয়া যায়; নিজ ফলের ভারে নিম্ববৃক্ষ যদি ঝুঁকিয়া পড়ে, তবে কাকেরই সুসময় উপস্থিত হয়। তেমনি ভক্তিহীন ব্যক্তিও পাপ কর্ম করিবার জন্য বাড়িতে থাকে; মাটির খাপরায় (পাত্রে) ষড়রস পরিবেশন করিয়া চৌরাস্তার উপরে রাখিলে যেমন কুকুরদেরই সুবিধা হয়, তেমনি যে ভক্তিহীন ব্যক্তি স্বপ্নেও সুকৃতি জানে না, তাহার জীবনে শুধু (সংসার)-দুঃখরূপ ভোজ্যই থালায় পরিবেশিত হয়। (৪৪০)

সুতরাং উত্তম কুলের প্রয়োজন নাই, সে অন্ত্যজ জাতিই হউক বা পশুর শরীরই প্রাপ্ত হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; দেখ, হস্তীকে কুম্ভীরে ধরিলে সে যখন ব্যাকুল হইয়া আমাকে স্মরণ করিয়াছিল, আমাকে প্রাপ্ত হইয়া কি তখনই তাহার পশুত্ব ঘুচিয়া যায় নাই?

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২

হে কিরীটী, যাহার নাম লইলেও পাপ হয়, সর্বাপেক্ষা অধম পাপযোনিতে যাহার জন্ম, সেই পাপযোনি প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় মূঢ় হইলেও যদি সর্বভাবে আমাতে দৃঢ়চিত্ত হয়, তবে তাহার প্রতিটি বাক্যই আমার নামোচ্চারণ, তাহার দৃষ্টি আমারই রূপ ভোগ করে, তাহার মন আমারই সঙ্কল্প (চিন্তা) নিরন্তর বহন করে ; তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় আমার কীর্তি-শ্রবণ ভিন্ন কখনও শূন্য থাকে না (সে সর্বদাই আমার কীর্তি শ্রবণ করে), আমার সেবাই তাহার সর্বাঙ্গের ভূষণ ; তাহার জ্ঞান অন্য বিষয় জানে না, জ্ঞাতৃত্ব একান্তভাবে আমাকেই জানে, আমাকে এইভাবে লাভ করিয়াই সে জীবিত থাকে—অন্যথায় তাহার মরণ। হে পাণ্ডব, এইভাবে সমস্ত বিষয়ে, সর্বভাবে ভালবাসিয়া আমাকেই যে জীবনের সর্বস্ব করিয়াছে, সে পাপযোনি হউক, বেদাধ্যায়ী নাই হউক, পরন্তু আমার সহিত তুলনায় তাহার যোগ্যতা কম নহে ; দেখ, ভক্তির বলে দৈত্যও দেবতাকে হীন করিয়াছে, ভক্তের মহিমা দেখাইতেই আমাকে নৃসিংহরূপ ধারণ করিতে হইয়াছে। (৪৫০)

সেই ভক্ত প্রহ্লাদ আমার জন্য সর্বদা বহু সঙ্কটে পড়িয়াছে, সেইজন্য হে কিরীটী, আমি যাহা দিতে চাহিয়াছি, সে সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছে ; সে দৈত্যকুলজাত, পরন্তু শ্রেষ্ঠত্বে ইন্দ্রও তাহার সহিত তুলনার যোগ্য নহে, সুতরাং এখানে (অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্তির জন্য) ভক্তিই উপযোগী হয়, জাতি অপ্রমাণ। রাজাজ্ঞার অক্ষর (চিহ্ন) একটি চর্মখণ্ডের উপর পড়িলে সেই চর্মখণ্ডের দ্বারা সকল বস্তুই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; অন্যথায় (রাজমুদ্রাঙ্কিত না হইলে) স্বর্ণ বা রৌপ্যও প্রমাণ নহে, রাজাজ্ঞাই এখানে বলবতী, ঐ (রাজমুদ্রাঙ্কিত) চর্মখণ্ডের দ্বারা সমস্ত সামগ্রী কিনিতে পারা যায় ; তেমনি যখন আমার প্রেমে মন ও বুদ্ধি ভরিয়া যায়, তখনই উত্তমত্ব ও সর্বজ্ঞতা আসিয়া যায় ; অতএব কুল, জাতি, বর্ণ—এ সমস্তই অকারণ (বৃথা) ; হে অর্জুন, এ সংসারে একমাত্র আমাতে ভক্তিই সার্থক ; যে কোন ভাবেই হউক না কেন, আমাতে মন প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হইবে, আমাতে মন সমাবিষ্ট হইলে পূর্বের সমস্তই বৃথা হইয়া যাইবে ; ছোট ছোট নদী নালা গঙ্গায় গিয়া না পড়া পর্যন্তই নদী নালা থাকে, গঙ্গায় পড়িয়া গঙ্গাই হইয়া যায় ; অথবা কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে একত্র করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ না করা পর্যন্তই তাহাদের খদির চন্দন প্রভৃতি কাষ্ঠ বলা হয় ; তেমনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্র, অন্ত্যজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতি ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হয়। (৪৬০)

লবণকণা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন জলেই মিশিয়া যায়, তেমনি সর্বভাবে আমাতে মিলিয়া গেলে জাতি, ব্যক্তি ইত্যাদি ভেদ লোপ পায় ; পূর্ব ও পশ্চিমগামী নদনদীর অস্তিত্ব ততদিনই থাকে, যতদিন তাহারা সমুদ্রে আসিয়া মিলিত না হয় ; তেমনি কোন এক ছলে আমাতে প্রবেশ করিলেই ভক্তের চিত্ত আপনা-আপনিই মদ্রূপই হইয়া যায় ; পরশপাথরকে ভাঙিবার জন্য যদি লোহা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে, তবে স্পর্শ করা মাত্রই উহা সোনা হইয়া যায় ; দেখ, প্রেমভাবে আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়াই কি ব্রজাঙ্গনাগণ আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় নাই ? অথবা ভয়ের নিমিত্ত কংস, কিংবা নিরন্তর বৈরিতা করিয়াও কি শিশুপালাদি আমাকেই প্রাপ্ত হয় নাই ? হে পাণ্ডব, আত্মীয়তার জন্য যাদবগণ, মমত্বের জন্য বসুদেবাদি সকলে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন ; হে ধনুর্ধর ! নারদ, ধ্রুব, অক্রূর, শুক ও সনৎকুমার যেমন ভক্তি দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত

হইয়াছেন; তেমনি গোপিকাদের প্রেম, কংসের ভয়-ভ্রান্তি, শিশুপালাদির বিদ্বেষপূর্ণ মনোবৃত্তি আমাকেই প্রাপ্ত করাইয়াছে; আমিই জীবের একমাত্র (ভোজ্য) আশ্রয়; ভক্তি বৈরাগ্য বা বৈরভাব—যে কোন মার্গ অবলম্বন করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৪৭০)

অতএব হে পার্থ, দেখ, আমাতে প্রবেশ করিবার উপায়ের অভাব নাই; জীব যে কোন জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, আমাকে ভজনা করুক বা আমার বৈরিতা করুক—পরন্তু তাহাকে আমারই ভক্ত বা আমারই বৈরী হইতে হইবে; যে কোন প্রকারে আমার চিন্তা করিলে আমার স্বরূপ নিশ্চিতভাবে তাহার অধিগত হইবে; এইজন্য হে অর্জুন, পাপযোনিই হউক, কি বৈশ্য, শূদ্র বা অঙ্গনাই হউক, আমাকে ভজনা করিলে আমারই ধামে পৌছিবে।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥৩৩

যে ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে (ছত্রচামর) শ্রেষ্ঠ, স্বর্গ যাহার জায়গীর, যে মন্ত্রবিদ্যার গৃহস্বরূপ; যে পৃথিবীর দেবতা, তপের মূর্তিমান্ অবতার, যাহার জন্য সকল তীর্থের ভাগ্যোদয় হয়; যাহার মধ্যে যাগযজ্ঞ নিরন্তর বাস করে, যে বেদের বজ্রকবচ, যাহার দৃষ্টির সংস্পর্শে কল্যাণের বৃদ্ধি হয়; যাহার অবস্থার দৃঢ়তায় সৎকর্মের প্রসার হয়, যাহার সঙ্কল্পে সত্য জীবন প্রাপ্ত হয় (প্রতিষ্ঠিত হয়); যাহার অভয়বাণী অগ্নিকে আয়ু প্রাপ্ত করাইয়াছে এবং যাহার প্রীতির নিমিত্ত সমুদ্র তাহাকে আপন জল প্রদান করিয়াছে; যাহার চরণরজঃ বক্ষঃস্থলে পাইবার জন্য আমি লক্ষ্মীকেও দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি এবং কৌস্তভমণি নামাইয়া হস্তে ধারণ করিয়াছি, বক্ষের আবরণ তুলিয়া দিয়াছি, (৪৮০)

হে সুভদ্র, আপনার সৌভাগ্যের লক্ষণস্বরূপ অদ্যাবধি আমি যাহার পদচিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিতেছি; হে মহাবীর অর্জুন, যাহার কোপ কালাগ্নি রুদ্রের বসতিস্থল, যাহার প্রসাদে বিনা-মূল্যে (অনায়াসে) সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়; এইরূপ পুণ্যশীল পূজনীয় নিপুণ ভক্ত ব্রাহ্মণ যে আমাকে প্রাপ্ত হইবে, তাহা আর বলিতে হইবে কেন? দেখ, চন্দনের অঙ্গানিল (চন্দনবৃক্ষ-স্পৃষ্ট বায়ু) নিকটস্থ নিম্ববৃক্ষ স্পর্শ করিলে, তাহা (সুগন্ধিত হইয়া) অযোগ্য হইলেও দেবতার মস্তকে (তিলকরূপে) শোভা পায়; তবে স্বয়ং চন্দন যে সেই স্থান প্রাপ্ত হইবে না, তাহা কেন মনে করিবে? অথবা ইহার কোন সত্যতা কি কোন যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিতে হইবে? (শরীরের জ্বালা) শান্ত করিবার আশায় শঙ্কর নিরন্তর অর্ধচন্দ্র মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন; তবে শীতলতায় (তাপ-প্রশমনকারিতায়) এবং পূর্ণতায় ও সুগন্ধে চন্দ্র হইতেও শ্রেষ্ঠ যে চন্দন, তাহা কেন সর্বাঙ্গে ধারণ করিবে না? যাহাকে আশ্রয় করিয়া রাস্তার জল অনায়াসে সমুদ্রে গিয়া পড়ে, সেই গঙ্গার কি অন্য গতি হইতে পারে? সুতরাং রাজর্ষি বা ব্রাহ্মণ—আমিই যাহার গতি, মতি ও শরণ, সে নিশ্চিতই আমাতে নির্বাণ লাভ করে, আমাতেই তার স্থিতি; এইজন্য শত-জর্জর (শতছিদ্রযুক্ত) নৌকায় বাহির হইয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবে? শস্ত্রবর্ষণের মধ্যে অঙ্গাবরণ খুলিয়া নগ্নগাত্রে কিরূপে থাকিবে? (৪৯০)

শরীরের উপর প্রস্তরখণ্ড পড়িতে থাকিলে কি ঢাল তুলিয়া ধরিবে না? রোগ আক্রমণ করিলে ঔষধ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবে? হে পাণ্ডব, যেখানে চতুর্দিকে দাবানল জ্বলিতেছে

সেখান হইতে কি বাহির হওয়া উচিত নহে? তেমনি উপদ্রবপূর্ণ মর্ত্যলোকে আমাকে ভজনা করিবে না কেন? নিজের অঙ্গে এমনকি বল আছে, যাহার ভরসায় আমাকে ভজনা না করিয়া গৃহের ভোজ্য-সামগ্রী নিশ্চিন্ত হইয়া ভোগ করিবে? অথবা আমাকে ভজনা না করিয়া বিদ্যা বা যৌবন হইতে জীবের কি সুখের ভরসা আছে? যত কিছু ভোগ্য বস্তু সব তো এই দেহের সুখের জন্যই, আর সেই দেহ তো কালের মুখের মধ্যেই পড়িয়া আছে; হে বৎস, এই মর্ত্যলোকের হাটে দুঃখের পসরা ছড়ানো রহিয়াছে, আর মরণরূপ বোঝা ক্রমাগত নামানো হইতেছে—সেই মৃত্যুলোকের হাটের শেষ সময়ে প্রাণী আসিয়া পৌছিল; এখন হে পাণ্ডব, এই হাটে জীবনের সুখপ্রদ কোন্ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা যাইবে? ভস্মে ফুঁ দিয়া কি দীপ জ্বালানো যায়? বিষের কন্দ বাটিয়া যে রস বাহির করা হয়, তাহাই অমৃত বলিয়া পান করিলে যেরূপ অমর হওয়া যায়—বিষয়ের সুখও সেইরূপ, উহা কেবল চরমদুঃখ স্বরূপ, পরন্তু কি করা যায়? মূর্খ লোকে উহা সেবন না করিয়া পারে না; নিজের মস্তক ছেদন করিয়া পায়ের ক্ষত বাঁধিলে যেমন হয়, মর্ত্য-লোকের সমস্ত সুখও তেমনি। (৫০০)

এই মর্ত্যলোকে সুখের কথা কে শুনিয়াছে? জলন্ত অঙ্গারের শয্যায় কি সুখনিদ্রা হয়? যে (মৃত্যু)-লোকে চন্দ্র ক্ষয়রোগগ্রস্ত, যেখানে অস্ত যাইবার জন্যই সূর্যের উদয় হয়, যে জগতে সুখের রূপে দুঃখই যাতনা দেয়, যেখানে কল্যাণের অঙ্কুর ফুটিতেই তাহার উপর অমঙ্গলের আবরণ পড়ে, মৃত্যু উদরের মধ্যে গিয়া গর্ভস্থ সন্তানকেও খুঁজিয়া বাহির করে; যাহা অসৎ (মিথ্যা) তাহারই চিন্তাকালে যমদূত আসিয়া জীবকে লইয়া যায়, কোথায় যায়—তাহাও জানিতে পারা যায় না; হে কিরীটী, সকল পথ খুঁজিয়া দেখিলেও সে স্থান হইতে ফিরিবার পদচিহ্ন দেখা যায় না, মৃতগণের কথাই যেখানকার পুরাণ-কথা; যাহার অনিত্যতার কথা ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বর্ণনা করিলেও শেষ হয় না, এইরূপ যে লোকের স্থিতি—সেই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকাই এক কৌতুককর ব্যাপার! ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণের জন্য যে গাঁঠের একটি কড়িও খরচ করে না, সে সর্বস্ব হানি হইতে পারে—এমন কার্যে কোটী মুদ্রাও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বহু প্রকারের বিষয়বিলাসের পাশে যে বদ্ধ, তাহাকে মানুষ সুখী মনে করে, কামনার ভারে যে পিষ্ট হয় তাহাকেও সে জ্ঞানী বলে। যাহার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, বল ও প্রজ্ঞা লোপ পাইতেছে, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন বলিয়া মানুষ তাহারই পায়ে নমস্কার করে। (৫১০)*

বালক (সন্তান) বাড়িতে থাকিলে আনন্দে নাচিতে থাকে; ভিতরে যে তাহার আয়ু কমিতেছে, তাহাতে তাহার কোন দুঃখ হয় না; প্রত্যেক জন্মদিনে এইভাবে কালের অধীনতা স্মরণ হয়, তথাপি সকলে পতাকা উড়াইয়া উল্লাসে বার্ষিক জন্মদিবসের উৎসব পালন করে; 'মর' এই কথা বলিলে সহ্য করিতে পারে না, মরিয়া গেলে ক্রন্দন করে, পরন্তু প্রতি মুহূর্তে যে আয়ু চলিয়া যাইতেছে, মূর্খতার জন্য তাহা ভাবিয়াও দেখে না; সর্প যখন ভেককে গিলিতে যাইতেছে তখনও ভেক জিহ্বা বাহির করিয়া মক্ষিকাকে ধরে, তেমনি কিসের লোভ প্রাণিগণের তৃষ্ণা বাড়ায় কে জানে? অহো, কি ঘোর দুর্দৈব এই মর্ত্যলোকে সবই বিপরীত! হে অর্জুন, এখানে যখন দৈবাৎ জন্মগ্রহণ

* জয়াচেঁ আয়ুষ্য ধাকুটেঁ হোয়। বলপ্রজ্ঞা জিরোনি জায়।
তয়াচে নমস্কারিতী পায়। বডিল ম্হণুনি॥

করিয়াছ, তখন সত্বর এখান হইতে পৃথক্ হইয়া বাহির হও এবং ভক্তির সাধনায় লাগিয়া যাও, যাহাতে আমার নির্দোষ ধাম পাইতে পার।

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥৩৪

তুমি তোমার মন মদ্রূপ করিয়া প্রেমের সহিত আমার ভজনা কর, সর্বত্র আমাকেই একান্ত ভাবে নমস্কার কর; যে আমাকেই ধ্যান করিয়া নিঃশেষে সমস্ত সঙ্কল্প জ্বালাইয়া ফেলে, তাহাকেই আমার নির্মল যজনকারী কহে; এইভাবে যখন আমার ধ্যানে সমৃদ্ধ হইবে, তখনই আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, আমার অন্তরের কথা তোমাকে বলিতেছি; সকলের কাছে যাহা গোপন করিয়াছি—আমার সেই সর্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিলাম—ইহা প্রাপ্ত হইয়া তুমি সুখ-স্বরূপ হইয়া থাকিবে। (৫২০)

সঞ্জয় বলিলেন, 'এইভাবে ভক্তকামকল্পদ্রুম, আত্মারাম পরব্রহ্ম শ্যামল শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ করিলেন, শুনুন্।' বৃদ্ধ (ধৃতরাষ্ট্র) এই সব কথা শুনিয়া—মহিষ যেমন বন্যার জলে বসিয়া থাকে—তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন; সঞ্জয় মস্তক সঞ্চালন করিয়া একান্তে কহিলেন, 'অহো, অমৃতের বর্ষণ হইয়া গেল, অথচ (ইঁহার অবস্থা দেখ) ইনি এখানে থাকিয়াও নাই, যেন কোন প্রতিবেশীর গ্রামে গিয়াছেন; তথাপি ইনি আমাদের প্রভু, সুতরাং ইঁহাকে কিছু বলিলে বাণী কলঙ্কিত হইবে, কি করা যায়? ইঁহার স্বভাবই এইরূপ; পরন্তু আমার পরম ভাগ্য, এই কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ বলিবার জন্য ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীব্যাসদেব আমাকেই নিযুক্ত করিয়াছেন; বহু আয়াসে মন স্থির করিয়া এইভাবে বলিতে বলিতে সঞ্জয় সাত্ত্বিক ভাবে এমন আবিষ্ট হইলেন যে আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না; চিত্ত চমকিত হইয়া স্থির হইল, বাক্য স্বস্থানে রুদ্ধ হইল, আপাদ-মস্তক শরীরে রোমাঞ্চ জাগিল; অর্ধোন্মীলিত চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বর্ষিত হইল, অন্তরে সুখোর্মির জন্য বাহিরে কম্প হইতে লাগিল; সমস্ত রোমকূপে নির্মল স্বেদ-কণিকা উৎপন্ন হইল—মনে হইল যেন মুক্তার মালায় শরীর আবৃত হইয়াছে; এই প্রকার মহাসুখের নিবিড় রসে তাঁহার জীব-দশা ডুবিয়া গেলে ব্যাস-নিয়োজিত কর্মে ব্যাঘাত হইল। (৫৩০)

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলে তাঁহার দেহস্মৃতি ফিরিয়া আসিল; তখন নেত্রের অশ্রু ও সর্বাঙ্গের স্বেদ মুছিয়া সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 'শুনুন্'।

এখন শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যরূপ উত্তম বীজ এবং সঞ্জয় সাত্ত্বিক ভাবের সার, সুতরাং শ্রোতাগণের সিদ্ধান্তরূপ ফসল প্রাপ্তির সুসময়; অহো, কিঞ্চিৎ অবধান করুন, আনন্দের আর অবধি থাকিবে না (আক্ষরিক: আনন্দের রাশির উপর বসিবেন), কারণ দৈবযোগে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভাগ্য খুলিয়া গিয়াছে (আক্ষরিক: মালা লাভ হইয়াছে); তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিভূতির ঐশ্বর্য (স্থান) দেখাইবেন। নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতেছেন, 'আপনারা শুনুন্'। (৫৩৫)

ইতি শ্রীজ্ঞানদেব-বিরচিত 'ভাবার্থ-দীপিকা'র নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

বড়দিনের অনুচিন্তন

শ্রীচিন্তাহরণ সোম

বড়দিন। ২৫শে ডিসেম্বর। প্রচলিত মতে এটি প্রভু যীশুখৃষ্টের জন্মদিন। তার জন্যই আজ বড়দিন; কেবল দিনমানের সময়-বৃদ্ধির জন্য নয়।

আজ থেকে প্রায় দু হাজার বছর আগে,—ইহুদীদের দেশ প্যালেষ্টাইনের ক্ষুদ্র শহর বেথ্‌লহেমে, দীন পরিবেশের মধ্যে, একদা যে দেবমানবের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁরই স্মৃতিপূত এই দিনটি

যীশু ধনীর দুলাল ছিলেন না; অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত সূত্রধরের ঘরে তাঁর জীবন শুরু হয়; আর পরিসমাপ্তি নিদারুণ অবিচারের ক্রুশকাষ্ঠে, লৌহকীলকের আঘাতে।

কিন্তু তাতে কি? অনির্বাণ জীবন-দর্শনের যে আলো তিনি জ্বেলে দিয়ে গেলেন, আজও অর্ধজগৎ সেই আলোকে আলোকিত।

পরমেশ্বরের একটি বাণীরূপ এই যীশু। তাঁর কনিষ্ঠ এবং প্রিয় শিষ্য সন্ত যোহন্‌ বলছেন, 'আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে; বাণীই ছিলেন ঈশ্বর।' কথা কয়টির প্রকৃত তাৎপর্য ধ্যানগম্য।

তার কিছু পরই সন্ত যোহন্‌ বলছেন: সেই বাণী রক্তমাংসের দেহ ধারণ করলেন এবং আমাদের মধ্যেই বাস ক'রে গেলেন, (এবং আমরা তাঁর মহিমা প্রত্যক্ষ করেছি; সে মহিমা যেন একমাত্র ঈশ্বরাত্মজেরই) সত্যময় এবং করুণাময়।

যীশুর সেই বাণীরূপটি কি?

জাতিতে যীশু ছিলেন ইহুদী। সুপ্রাচীন কাল থেকে ইহুদীরা ধর্মপ্রাণ, আচারপরায়ণ এবং একেশ্বরবাদী।

ঐ ইহুদী-সমাজে কালে কালে মসি (Moses) প্রভৃতি বহু ঈশ্বরানুবিষ্ট ভাববাদী জন্মেছেন এবং সুষ্ঠু ধর্মানুগত জীবন যাপনের সহায়ক নানাবিধ নিয়ম-নীতির কথা বলেছেন এবং ইহুদী-সমাজকে তা গ্রহণ করিয়েছেন। ঐ নিয়মগুলির মধ্যে আছে সুবিখ্যাত Ten Commandments—বা দশটি আদেশ, যা প্রত্যেক ইহুদীর অবশ্যপালনীয় এবং খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদেরও মান্য।

নিয়ম-নীতি খুবই ভাল এবং সুপালিত হ'লে উপকারীও বটে। কারণ যেমন রাষ্ট্রনীতি, তেমনই ধর্মনীতি সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল হ'তে দেয় না; বিধি-বদ্ধ ক'রে তাকে সৌষ্ঠবযুক্ত ও শান্তিময় করে।

কিন্তু নিয়ম-পালনের মধ্যে একটি দোষ ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে পারে এবং দেখা দেয়ও। সেইটি হচ্ছে অতিমাত্রায় আচার-পরায়ণতা, যা বিচারের পথকে রোধ ক'রে অত্যুগ্র দৃঢ়তায় জীবনকে শক্ত, কঠিন, কঠোর, নীরস ক'রে দেয় এবং আত্ম- ও পরপীড়নের যন্ত্রবৎ হ'য়ে উঠে। অতি-আচারী লোক 'বাই' গ্রস্ত হ'য়ে নিজ ও অপরের প্রতি নিষ্ঠুর হতেও দ্বিধা বোধ করে না; পরন্তু ঐরূপ হওয়া ও করাকেই ধর্মাচরণ মনে ক'রে আত্মশ্লাঘায় উন্নাসিক হ'য়ে পড়ে। নীতি মান্‌বার ঐটি ঘোর বিপদ। যীশু যখন স্বয়ং প্রচার শুরু করেন, তখন ইহুদী-সমাজেও আচারপরায়ণতা ঐ প্রকার উগ্র রূপ ধ'রে যথার্থ ধার্মিকতার স্থান গ্রহণ করেছিল। ধর্মের নামে নিষ্ঠুর পীড়নের খেলা চলছিল সমাজে; এবং ইহুদী সমাজপতি ও পুরোহিতেরা তাকেই ধর্ম ব'লে বিনা বিচারে মেনে নিয়েছিলেন, অন্যকে দিয়েও মানাচ্ছিলেন।

যীশু-কথিত ধর্মনীতি ঐ অচলায়তনে হানল প্রথম আঘাত। যীশু কিন্তু নীতিগুলিকে আঘাত

করেননি। নীতিগুলিকে তিনি গ্রহণই করেছিলেন এবং সঞ্চার করেছিলেন তাতে নূতন প্রাণ, নূতন তেজ, নবীন অর্থবোধ ও অনুভূতি। আঘাত দিয়েছিলেন তিনি আচার-পরায়ণতার নিষ্প্রাণ নিশ্চেতন নির্বোধ যূপ-কাষ্ঠটাতে, যাতে সমাজ ও জীবনের প্রাণশক্তি নিত্য বলি যাচ্ছিল।

কবীর দুঃখ ক'রে বলেছেন, 'ক্ষেত রক্ষা করতে দিলাম বেড়া; এখন সেই বেড়া-ই যে ক্ষেতকে খায়।'

যীশু স্বীয় সমাজের আচার-নিষ্ঠার ঐ ক্ষেত-খেকো বেড়াটাতেই জোর আঘাত হেনেছিলেন।

যীশুর 'Sermon on the Mount' নামক বিখ্যাত শৈলোপদেশের মধ্যে তাই দেখি একস্থানে তিনি বলছেন :

ভেবো না যে, আমি এসেছি নীতি-নিয়ম বা ভাববাদীদের উপদেশ-বাণী ধ্বংস করতে; তা নয়, আমি ধ্বংস করতে আসিনি, এসেছি পরিপূর্ণ করতে।

কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যাবৎ আকাশ ও পৃথিবী শেষ না হ'য়ে যায়, তাবৎ নিয়মের একটি কণাও নষ্ট হবে না—পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত না হওয়া পর্যন্ত।

এখন ঐ যে পরিপূর্ণ রূপ নেওয়ার কথাটি, ভেবে দেখতে হয়। ঐ দিয়ে যীশু কি বুঝাতে চেয়েছেন? তাঁর নিজের কথার মধ্যেই তা স্পষ্ট হ'য়ে আছে। এর দু-একটি উদাহরণ দিই :

ঐ 'শৈলোপদেশে'ই পুরোনো নীতির কথা তুলে যীশু বলছেন :

তোমরা শুনেছ, প্রাচীনেরা ব'লে গেছেন, 'হত্যা করবে না; এবং হত্যাকারী অবশ্যই বিচারের বিপদে পড়বে।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কোন লোক বিনা কারণে তার ভ্রাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তাকেই বিচারের বিপদে পড়তে হবে; এবং যে কোন লোক তার ভাইকে 'রাকা' বলে গালি দেবে তাকেই বিচারের ও সাজার বিপদে পড়তে হবে; যে কেউ তাকে বলবে 'ওরে মূর্খ' নরকাগ্নিতে দগ্ধ হবার বিপদ ঘটবে তারই।

অর্থাৎ যীশুর মতে শুধু নরহত্যায় কোনক্রমে বিরত থাকলেই ধর্ম করা হবে না; কারু প্রতি বিনা কারণে ক্রোধ প্রকাশ করলে বা গালি দিলে এমনকি 'মূর্খ' ব'লে কাউকে সামান্য মাত্র অবজ্ঞা করলেও ধর্মহানি হবে।

কি করতে হবে তা হ'লে?

যীশু বলেন : যজ্ঞবেদীতে উৎসর্গ করার জন্য কোন বস্তু এনে হঠাৎ যদি মনে পড়ে যে তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন অভিযোগ আছে, তাহলে ঐ উৎসর্গের জিনিসটিকে বেদীর কাছে রেখে দিয়ে ফিরে যাও; আগে গিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে মিটমাট ক'রে ফেল; তারপর এসে তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।

সুতরাং যীশুর মতে হত্যা করবে না—এই নৈতিক আদেশটির পরিপূর্ণ রূপ হ'ল শুধু হত্যা-বিরতিতে নয়, যে কোন রকমে অন্যের মনে যাতে আঘাত লাগতে পারে, বা দুঃখ জন্মাতে পারে, এমন কোন কাজ একেবারেই না করাতে।

যীশু বলছেন : তোমরা শুনেছ, প্রাচীনেরা বলেছেন, 'ব্যাভিচার করবে না।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কোন ব্যক্তি সকাম দৃষ্টিতে কোন নারীর দিকে তাকায় ইতিমধ্যেই সে অন্তরে অন্তরে ব্যভিচার ক'রে ফেলেছে।

তখন তবে কি করতে হবে? অতি কঠোর যীশুর মন্তব্য : যদি তোমার ডান চক্ষু দোষ ক'রে থাকে, তাকে উপড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দাও; কারণ তোমার সমগ্র দেহ নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চাইতে তোমার একটি অঙ্গ ধ্বংস হ'য়ে যাক্; তাইই হবে তোমার পক্ষে লাভজনক।

অর্থাৎ দৈহিক ব্যভিচার থেকে কোনক্রমে বিরত থেকে বাহ্য ধার্মিকতার ভান দেখিয়ে,

মনে মনে পাপ করাতে ধর্মপালন হয় না। সবার আগে মনটাকেই শুদ্ধ রাখতে হবে; কেননা পাপকার্যের ঐটাই যে হ'ল সূতিকাগার।

এইভাবে এই প্রসিদ্ধ নৈতিক আদেশটি পরিপূর্ণ রূপ নেবে তখনই, যখন মনের কোণেও পাপ-সঙ্কল্প উঁকি দেবে না।

এইরূপ আরো উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায়, পরিপূর্ণতা বলতে যীশু প্রত্যেকটি ধর্মনীতির একটা সুপ্রসারিত এবং সুগভীর প্রয়োগের কথা কিভাবে নব-উদ্দীপনার প্রাণশক্তিতে সন্দীপিত ক'রে বলেছেন।

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে যারা পার্থক্য বোধ করতে পারে না, সে ধরনের লোকের মনে এখানে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, —এত আইনকানুন, নীতি-নিয়ম মান্‌বই বা কেন? এ-প্রশ্নের উত্তরও যীশুর উক্তিতে রয়েছে।

যীশু তখন পূর্ণোদ্যমে নিজের ধর্ম-নীতি প্রচার ক'রে যাচ্ছেন। বহু লোক, বিশেষ ক'রে সমাজের দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, নিম্নস্তরের লোকে, তাঁর সরল সোজা ধর্মোপদেশের মধ্যে একটা অনাস্বাদিত-পূর্ব মুক্তির—অথচ একটা সুগভীর সত্য ও নীতির সন্ধান পেয়ে দলে দলে তাঁর কাছে এসে ভিড়ছে। তাঁর বিরুদ্ধবাদী, আচারী সনাতনপন্থী গোঁড়া ধার্মিক ও পুরোহিতেরা কিন্তু নিশ্চিন্ত নেই। তাদের মধ্যে ভয় ঢুকেছে যে, এই-বার বুঝি-বা সমাজে তাদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি দূর হ'য়ে যায়। তারা পাকে-প্রকারে যখনই সুযোগ পাচ্ছে তখনই যীশুকে জব্দ করবার, লোকের সমক্ষে হেয় ক'রে দেবার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে।

একদিন তাদেরই একজন—এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, লোকের সামনে যীশুকে কিছু অপ্রতিভ করবার জন্যে নিতান্ত বিনীত ভঙ্গিতে প্রশ্ন ক'রে বসলো : আচ্ছা প্রভো, আমাদের নৈতিক আজ্ঞাগুলির মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে বড়?

উত্তরে যীশু তৎক্ষণাৎ বললেন : তুমি প্রভু পরমেশ্বরকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে, সমগ্র মন দিয়ে ভালবাসবে। এইটিই হচ্ছে প্রথম এবং সর্বপ্রধান আজ্ঞা।

আর দ্বিতীয় যে আজ্ঞাটি, তা-ও এরই মতো। সেটি হচ্ছে—তুমি নিজেকে যেমন ভালবাসো, তোমার প্রতিবেশীকে তেমনি ভালবাসবে

এর সঙ্গেই যীশু যে মন্তব্য করলেন, তার থেকে 'কেন নিয়মনীতি মান্‌ব?' এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বললেন: এই দুইটি আজ্ঞারই উপর নির্ভর করছে আর যত কিছু নৈতিক আজ্ঞা এবং ভাববাদিগণের উপদেশাবলী।

অর্থাৎ মনপ্রাণ দিয়ে পরমেশ্বরকে ভালবাসা এবং মানুষকে ভালবাসা—এই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য ও সার সাধনা। আর ঐ দুইটি সমধর্মী কাজকে সহজ সুগম করবার জন্যেই আর যত কিছু নিয়মনীতি, আইনকানুন। ঐ দুইটি কাজ জীবনে হাসিল করতে পারলেই পৃথিবীতে স্বর্গ-রাজ্য স্থাপিত হ'তে পারে, এবং মানুষ সহজ আনন্দে, অব্যাহত শান্তিতে বাস করতে পারে।

ঈশ্বরের বাণী-বিগ্রহ যীশুখৃষ্ট নিজের আচরণ দিয়ে আদর্শ জীবনের উদাহরণ দেখিয়েছেন এবং নিজের প্রাণ দিয়ে ঐরূপ জীবনের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন ক'রে গেছেন।

আজকের এই বড়দিন, সত্যই বড়দিন; বৎসরের বহুদিনের মধ্যে একটি মহান্‌ দিন; কারণ এদিন যীশুর স্মৃতি-সমৃদ্ধ।

আজ বড়দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'ঋষি-কৃষ্ণে'র অনুচিন্তনে তাঁকেও ভুলতে পারছি না; তাঁর প্রদর্শিত উদার সমন্বয়-ভাবের ভিতর দিয়ে 'ঋষিকৃষ্ণে'র কথা বুঝবার চেষ্টা সহজ হয়েছে, কারণ 'সব শেয়ালের এক রা'।

সমালোচনা

Atomic Weapons in World Politics by Sailendra Nath Dhar, Published by Das Gupta & Co., Private Limited, Calcutta. Pp. 234+10. Price Rs. 10.

মারণাস্ত্রের নৃশংসতায় এ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমার তুলনা নাই। কোন যুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করিলে শুধু যে যুদ্ধকামী দেশেরই ক্ষতি হইবে তাহা নয়, সর্বমানবের সর্বাত্মক ধ্বংসেরও সূচনা হইবে। এমন একটি সাংঘাতিক অস্ত্রকে লইয়া জাতিতে জাতিতে যে রেষারেষি চলিতেছে, তাহা যে মানব-সাধারণের সভ্যতার জয়যাত্রা ব্যাহত করিবে—এই ব্যাখ্যানই এই পুস্তকের উপজীব্য।

রাজনীতি ও সমাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ঐ হাইড্রোজেন বোমার ভবিষ্যৎ প্রয়োগনীতি মানবকে কিভাবে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সুধী লেখক নানান্ উদাহরণ ও উক্তি সংগ্রহ করিয়া তাহা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ঐ বোমাকে লইয়া জাতিতে জাতিতে ঠাণ্ডা লড়াই কিরূপ জঘন্য পরিণতির পথে আগাইয়া চলিতেছে, তাহারও ভয়াল চিত্র লেখক আমাদের সুমুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন—দেখিতে পাই। দশটি বিভিন্ন অধ্যায়ে এই সমস্যার বহুমুখী বিচার করিয়া শেষে ঐ দানবীয় শক্তিকে কিভাবে মানবের কল্যাণে লাগানো যায়, সেই বিষয়েও লেখকের সুচিন্তিত অভিমত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গ্রহণীয়।

ঐ দানবীয় শক্তির ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর কথা চিন্তা করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নেতা উহাকে সর্বতোভাবে সংবরণ করার কথা বলিয়াছেন, এমনকি কিছুদিন আগেই যখন ক্রুশ্চেভ আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তখনও তিনি ঐ প্রসঙ্গে শুধু ঐ মারণাস্ত্রকে নষ্ট করার কথাই নয়—প্রত্যেক দেশ হইতে হিংসার প্রতীক সৈন্যদল অপসারণ করিবার কথাও বলিয়াছেন। লেখক এই বিষয়টিকে যে এইভাবেই চিন্তা করিতে হইবে—এরূপ ইঙ্গিত যথেষ্ট দিয়াছেন। সেদিক দিয়া বিচার করিলে লেখকের এই পুস্তক সত্যই সময়োপযোগী হইয়াছিল (১৯৫৭ খৃঃ এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়)।

এই পুস্তকের লেখক অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াও এ্যাটম-শক্তির ধ্বংসাত্মক রূপের যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও তথ্য আহরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে বলিয়াছেন : 'Beating swords into ploughshares, however, has never before been felt to be a more urgent necessity than now, because never before have the alternatives signified a greater or more awe-striking difference for the fate of human civilization.' (p. 222 ; ll. 24-28)—তাহাতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। তবে একমাত্র ভবিষ্যৎই বলিতে পারে—এই মত গ্রহণ করিয়া মানুষ বাঁচিবে, না ইহার বিপরীত কিছু করিয়া পৃথিবী হইতে মানব তাহার অস্তিত্ব মুছিয়া দিবে।

পুস্তকটির ছাপা ও বাঁধাই রুচিসম্মত; প্রচ্ছদপটে সমুদ্রবক্ষে আণবিক বিস্ফোরণের চিত্রটি বাস্তববাদী। পরিশিষ্টে অণুসংক্রান্ত ঘটনাপঞ্জী বিশেষ প্রয়োজনীয়। সমাজের কল্যাণকামী সকল সুধীকেই আমরা পুস্তকটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। —মহানন্দ

মন ও মানুষ ঃ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ-৬। মূল্য—সাত টাকা। পৃঃ ৪৩৭।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ-প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই বইখানিও প্রথম দৃষ্টিতেই পাঠকের মনোহরণ করে। কন্যাকুমারীর 'বিবেকানন্দ-রকের' ফটো-সম্বলিত প্রচ্ছদপটটির নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার পর বইটি পড়তে পড়তে মন আরো তৃপ্তিতে ভরে যায়। স্বামী অভেদানন্দজীর কথোপকথন ও চিন্তাধারার সম্যক্ আলোচনার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মননশীলতার সার্থক পরিচয় ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের মধ্যে স্বামী অভেদানন্দজীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আজীবন জ্ঞানচর্চা। তাঁর সারা জীবনের অধ্যয়ন ও মননের পটভূমিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তাধারার আদানপ্রদানের ইতিহাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের একটি প্রধান দিক। এ গ্রন্থে সেই ইতিহাসের অনেক মূল্যবান্ উপকরণ রয়েছে। মূলতঃ শঙ্করাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের অনুগামী হলেও ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য অপরাপর চিন্তাধারার প্রতি অভেদানন্দজীর শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও অধিকারের পরিচয় লক্ষণীয়। তাছাড়া আমেরিকায় এবং ভারতবর্ষে স্বামী অভেদানন্দের জীবনের নানা ঘটনা, বিশেষতঃ আমেরিকার বিভিন্ন মনীষীর সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার বর্ণনা পাঠকের কাছে এই মনীষী মহাপুরুষের মানস পরিচয় তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। সবার উপরে ফুটে উঠেছে তাঁর দিব্য বক্তিত্ব।

এই বিরাট পুরুষের সংস্পর্শে এসে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ যে সম্পদ আহরণ করেছিলেন, তা 'মন ও মানুষ' গ্রন্থে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে সাজিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা সহচর অভেদানন্দ (কালী তপস্বী)-কে জানতে চান, অথবা যাঁরা উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণের এক ভারতীয় মনের অনুভবসিদ্ধ অধ্যাত্ম-আলোচনায় উৎসাহী—তাঁরা সকলেই এ গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন। গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্বামী অভেদানন্দজীর বাংলা ও ইংরেজী রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় সন্নিবিষ্ট। অভেদানন্দ-গ্রন্থ-সংগ্রহে বইটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান্ সংযোজন।

মাঝে মাঝে বানানভুলের আতিশয্য দেখা যায়। পরবর্তী সংস্করণের জন্য এ বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। **—প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

এষণা (কবিতার বই) **ঃ** শ্রীবিভা সরকার প্রণীত, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৩৯, মূল্য আড়াই টাকা।

অনেকগুলি সুন্দর ও মধুর কবিতায় পূর্ণ বইখানি কয়েক বছর আগেই প্রকাশিত, কিন্তু বাঙালী পাঠক-সমাজে অপরিচিতই থেকে গেছে। শোনা যায়, বাংলা কাব্য থেকে নাকি আদর্শবাদ ও লিরিকের যুগ চলে গেছে। বাইরের স্রোত পালটে গেলেও অন্তঃস্রোত থেকেই যায়। যাঁদের এখনও আদর্শবাদ ও লিরিক ভাল লাগে, এ বইখানি তাঁদের মনে এনে দেবে আনন্দ উৎসাহ—প্রেরণা।

প্রথমাংশ 'স্মরণে'—দশটি পাতায় আছে দেশের স্মরণীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। দ্বিতীয়াংশ 'মন-মর্মর'—প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা, এখানেই কবির মনের ব্যথা বেদনা আশা আকাঙ্ক্ষা আকুতি ভাষা খুঁজছে। শেষাংশে 'গাথায়' (৩০ পৃঃ) আছে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কয়েকটি কাহিনী কেন্দ্র ক'রে নারী-হৃদয়ের অভিব্যক্তি।

'মন-মর্মর' অংশটি বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এ অংশটুকুর নতুন দ্বিতীয় সংস্করণ সমাদর করবার লোক এখনও বাংলা দেশে আছে বলেই মনে হয়।

শিল্পপীঠ-পত্রিকা (১ম বর্ষ ১৯৫৯) : রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ, বেলঘরিয়া হইতে স্বামী সন্তোষানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত ; পৃষ্ঠা ৯৬।

আজকাল শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা প্রায় সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে দুইটি দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রথম : প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় : সাহিত্যিক মান। আলোচ্য (ইংরেজী ও বাংলা) দ্বিভাষিক পত্রিকাটিতে শিল্পবিজ্ঞানের ৮টি প্রবন্ধের সহিত কয়েকটি সাহিত্যিক প্রবন্ধ কবিতা ও রস-রচনা সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছে। প্রচ্ছদপটে যন্ত্রশিল্পের পটভূমিকায় তিনটি কীর্তনিয়াকে তিনটি বিদ্যার্থী মনে করা কঠিন।

সমাজ-শিক্ষা (পত্রিকা)—সম্পাদক শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী, লোকশিক্ষা পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা।

এই শারদীয়া সংখ্যাটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও কয়েকটি প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, যথা : নঈতালিম ও বয়স্কশিক্ষা, সমাজ-শিক্ষার একটি প্রস্তাবনা, উৎসবের রূপান্তর। নব-সাক্ষরদের রচনাগুলিও সুখপাঠ্য, তবে সেগুলিতে কি ধরনের টাইপ ব্যবহার করা উচিত—এ সম্বন্ধে গবেষণা প্রয়োজন। এ জাতীয় পত্রিকায় রেখাচিত্র, চিত্র-সাহায্যে গল্প একটি নতুন দিকের সূচনা করতে পারে। আলোক-চিত্রগুলি পরিষদের বিভিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দিচ্ছে। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

Srimad Viṣṇu-tattva-Vinirnaya of Sri Madhvacarya—English translation by S. S. Raghavachar, published (1959) by Sri Ramakrishna Ashrama, Mangalore, Pp 98+xxi. Price Rs 3·00. Foreword by Swami Adidevananda.

দ্বৈত-বেদান্তের দৃষ্টি হইতে বেদ ও উপনিষদের দর্শন কি—তাহা শ্রীমধ্বাচার্যের 'বিষ্ণু-তত্ত্ব-বিনির্ণয়' গ্রন্থে স্পষ্ট এবং শক্তিশালী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। তিনটি পরিচ্ছেদে ৪৬৪টি অনুচ্ছেদে 'দ্বৈতবাদ' প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে শাস্ত্রের প্রামাণ্য, শ্রুতির তাৎপর্য আলোচনার পর অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া জীব জগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে পঞ্চভেদ স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নারায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব (সমতীতক্ষরাক্ষরম্) এবং তৃতীয়ে নারায়ণ বা বিষ্ণু নির্দোষ এবং অশেষসদ্‌গুণভূষিত, ইহাই প্রমাণ করা হইয়াছে।

শ্রীমধ্বাচার্যের সংস্কৃত অনুচ্ছেদগুলির পর ব্যাখ্যামূলক অথচ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, বিশেষ শব্দের অর্থ বা টীকা—পাদটীকায় সংযোজিত। অনুবাদকের ভূমিকা (১০ পৃষ্ঠা) এবং স্বামী আদিদেবানন্দের মুখবন্ধ বিষয়প্রবেশের সহায়ক।

World Teachers on Education—edited by T. S. Avinasilingam and K. Swaminathan, published (1958) by Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya, Coimbatore Dist. Pp. 187+v. Price Rs. 4·00.

কোয়েম্বাতুর জেলায় অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে গত বৎসর প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধে পুস্তকখানির একটি স্থায়ী মূল্য আছে, কারণ দশটি অধ্যায়ে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাদর্শের একটি সমাবেশ এখানে পাওয়া যায়। শিক্ষা সম্বন্ধে উপনিষদ্ ও গীতার বাণী, বুদ্ধ ও খৃষ্টের উপদেশ, তিরুক্কুরল ও কোরানের নির্দেশ, সর্বশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি এবং গান্ধীজীর চিন্তাধারার নির্বাচিত অংশ বিভিন্ন অধ্যায়ে বিষয়ানুযায়ী অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত। গ্রন্থখানি শিক্ষাব্রতিগণের নিত্যসহচর হইবার দাবি রাখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

বেলুড় মঠঃ বাংলা দেশের বিভিন্ন শাখা-কেন্দ্রের মারফৎ রামকৃষ্ণ মিশন বর্তমানে বর্ধমান, ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং মেদিনীপুর জেলার মোট ১৩৪টি গ্রামে সেবাকার্য চালাইতেছেন।

গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে মিশন নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়াছেন :

দ্রব্য	পরিমাণ
চাউল ও আটা	৭০৩ মণ
ডাল	১৭৮ „
আলু	৭৩ „
গুঁড়া দুধ	১১,১৪৩ পাউণ্ড
পাউরুটি	৯৮০ „
নূতন ধুতি ও শাড়ী	৬,৮৪৯ খানি
„ কম্বল	৩,০৮১ „
„ জামাকাপড়	১,৬৪৩ „

আরও প্রায় ২৩,০০০ টাকা মূল্যের নূতন কম্বল ও কাপড় বিতরণের জন্য পাঠানো হইয়াছে।

(১) **আসানসোলঃ** গত বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যায় বিপন্ন নরনারীর মধ্যে সেবাকার্য করিবার জন্য আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গ্রহণ করিয়া অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতে আশ্রমের দুইজন কর্মীর তত্ত্বাবধানে সাটিনন্দী গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া সেবাকার্য আরম্ভ করেন। এই গ্রামে ৯টি গৃহ নির্মাণের জন্য বাঁশ-দড়ি-খড় এবং ধুতি-শাড়ী বিতরণ করা হয়। ক্রমে এই সেবাব্রত বর্ধমান জেলার সদর ও কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত বন্যাবিধ্বস্ত ভেদিয়া, চানক, গুস্‌করা, মাহাতা, লাখুড়িয়া, ভেরেণ্ডা, পালিগ্রাম ও গদিষ্ঠা প্রভৃতি ইউনিয়নের ৯৪টি গ্রামের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। উক্ত গ্রামগুলির ৩৫০০ পরিবারের মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয় :

চাউল, ডাল, লবণ, চিঁড়া, গুড়, আলু, সাবু, নূতন ধুতি, শাড়ী, কম্বল, চাদর, থান কাপড়, জামা প্যাণ্ট, পুরাতন কাপড়, মাল্‌টি-ভিটামিন ট্যাবলেট।

পূর্বোক্ত গ্রামগুলির কয়েকটি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পাইতেছিল, কিন্তু দুর্গম গ্রামগুলিতে কোন সাহায্যই পৌছায় নাই। বহু গ্রামে কর্মীদিগকে বুকজল ভাঙিয়া গিয়া সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ঐ সকল গ্রামে কোন নৌকা বা যাতায়াতের অন্য উপায় ছিল না। কোন কোন গ্রামে দরিদ্র জনগণ প্রায় ৩দিন অনাহারে থাকিবার পর মিশনের কর্মীদের মারফৎ প্রথম খাদ্য-সাহায্য পাইয়া অভিভূত হইয়া পড়ে। সেবাকার্যের সংবাদ পাইয়া দূরদূরান্তরের গ্রাম হইতে নিঃস্ব-দরিদ্র গ্রামবাসীরা একটুকরা গায়ের কাপড় ও একমুঠা চাউলের জন্য মিশনের সেবাকেন্দ্রে ছুটিয়া আসিতে থাকে। ইহাদের কাহারও কাহারও মাথা গুঁজিবার আশ্রয়টুকুও আজ নাই। রান্না করিবার পাত্রের অভাবে তাহারা শুধু চিঁড়াগুড়ই সাহায্য চায়; আর চায় একখানি গায়ের কাপড়, কোন রকমে যাহাতে লজ্জা নিবারণ করা যায়। শিশু ও নারীদের অবস্থা অবর্ণনীয়।

এই সেবাকার্য পরিচালনা করিবার জন্য ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত নগদে ও দ্রব্যাদিতে মোট ৪৫,০০১ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং ব্যয় হইয়াছে মোট ৩৭,২৭১ টাকা।

বর্তমানে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বাসভবন কোগ্রামের অনতিদূরে 'নূতন হাটের' সেবাকেন্দ্র হইতে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত—যে সকল

চাষীর কিছু জমি আছে, তাহাদের—গম, আলু, পেঁয়াজ ও রবিশস্যের বীজ দেওয়া হইতেছে। এই সেবাকার্য ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলিবে।

(২) **নরেন্দ্রপুর** (২৪ পরগনা) : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক বন্যার্ত-সেবাকার্যে ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর, ডায়মণ্ডহারবার ও বারাসত মহকুমায় এবং মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় ২,১৭৬টি পরিবারকে চাল ও আটা, দুধ, কম্বল ও জামাকাপড় দেওয়া হইতেছে।

ইউনিয়ন অনুযায়ী	গ্রামের নাম
বড়াল :	বনহুগলি, হোগলকুড়িয়া, ডিঙ্গলেপোতা, জয়ানপুর
পানাকো :	চিয়েরী, বাগেশ্বর
নালুয়া :	কৃষ্ণচন্দ্রপুর, ছত্রভোগ, সইদল
কুঁকড়াহাটি :	ঢেকুয়া, হরিণভাসা, বড়মোহনপুর
ফারতাবাদ :	মহামায়াপুর, আতাবাগান
রাজপুর মিউনিঃ :	এলাচি, রামচন্দ্রপুর,
বেড়গুম :	কৃষ্ণনগর, বেড়গুম লক্ষ্মীপুর, কুচলিয়া, নিমতলা
চখাল (সাগর) :	সুমতিনগর, মৃত্যুঞ্জয়নগর

(৩) **সারদাপীঠ** (বেলুড়) : রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ হইতে হাওড়া জেলার নিম্নলিখিত অঞ্চলে বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

বালি থানা : নিশ্চিন্তা বস্তি।

ডোমজুড় থানা : বাদামপুর, মহিষগোট, রাজাপুর, দক্ষিণবাড়ী, জাব্‌তাপোতা, চক্‌হরি, সাদাৎপুর।

উলুবেড়িয়া থানা : করাতবেড়িয়া, গোয়ালবেড়িয়া, রাজপুর, কমলাচক, কালীর চক্, ধরমতলা, বড়গ্রাম ও জগদীশপুর।

উপরি-উক্ত গ্রামসমূহে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি বিতরণ করা হইয়াছে :

চাল, ডাল, আলু, তেল, আটা, চিঁড়া, ছোলা, গুড়, বার্লি, পাঁউরুটি, দেশলাই, কম্বল, ছোটদের নূতন জামা, বীজ ধান।

এতদ্ব্যতীত ১৪০৪জনকে কলেরা ও টাইফয়েড প্রতিষেধক টীকা এবং ১১৯ জনকে ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হইয়াছে। সেবাকার্য এখনও চলিতেছে।

কার্যবিবরণী

রেঙ্গুন : রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি ব্রহ্মদেশে সুপরিচিত। ১৯০১ খৃঃ এদেশে রামকৃষ্ণ সেবাসমিতি স্থাপিত হয়। ১৯০৫ খৃঃ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ হইতে এখানে প্রচারোদ্দেশ্যে আসেন। ১৯২১ খৃঃ সমিতি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বোটাটোউঙ্গ প্যাগোডা রোডের পার্শ্বে সোসাইটির নিজস্ব ত্রিতল ভবন অবস্থিত, পার্শ্বে অতিথি-ভবন। ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সোসাইটি-পরিচালিত বিভিন্ন কর্মের বিস্তার ও তাহার পরিচিতি :

৭টি ভাষার বিভিন্ন বিষয়ের ২৩,১৭৭ গ্রন্থসমন্বিত ফ্রি লাইব্রেরি, আলোচ্য বর্ষে ৩০,৭৫৮ (পূর্ব বর্ষে ২৫,৮৮৪)-টি পুস্তক পঠনার্থে দেওয়া হইয়াছিল। পাঠাগারে ইংরেজী, বাংলা, বর্মী, হিন্দী, তামিল, তেলুগু ভাষায় ২৩টি দৈনিক এবং ১২৫টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ২২৫ ('৫৭ খৃঃ ২০০)।

গীতা, ভাগবত, উপনিষৎ ও মহাপুরুষ-বাণী অবলম্বনে ৯৬টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, শ্রোতৃসংখ্যা গড়ে ২২। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনাও উল্লেখযোগ্য। ১৬টি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হইয়াছিল। বুদ্ধ-জন্মতিথিতে বিশেষ উৎসবানুষ্ঠানে আশ্রমে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণের জন্মদিনগুলিও যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

বারাণসী : রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা-বর্ষ ১৯০০ খৃঃ হইতে জাতিধর্মনির্বিশেষে আর্ত মানবের সেবারত।

১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত সেবাশ্রমের **কর্মধারা :** (১) ১১৫টি শয্যা-সমন্বিত সাধারণ হাসপাতাল (অন্তর্বিভাগ): আলোচ্য বর্ষে ৩,৩০৯ রোগী ভরতি হয়। অস্ত্র-চিকিৎসা: ৬৩৬। গড়ে দৈনিক ১০২টি শয্যায় রোগী ছিল।

(২) বৃদ্ধ, অসমর্থ পুরুষ ও নারীর আশ্রয় ভবন: ভবন দুইটিতে যথাক্রমে ২৫ পুরুষ এবং ৫০ নারীর স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে, কিন্তু পুরুষ-বিভাগে ৯ জন এবং মহিলা-বিভাগে ২২ জন আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে অধিক ভরতি করা সম্ভব হয় নাই।

(৩) সাহায্য: ১০৮ জন দরিদ্র ও অসহায় নারীকে সাহায্য বাবদ টাকা ২,২৫৭৮৭ এবং ২৮জন স্কুলের বিদ্যার্থীদিগের বেতন, বইপত্র, খাদ্য ও পোষাকের জন্য ১,১৩১ টাকার উপর ব্যয় করা হয়। এতদ্ব্যতীত ৫৪৯ জনকে সহস্রাধিক টাকা সাময়িক সাহায্য প্রদত্ত হয়। মোট ২২৭ জনকে কম্বল, ধুতি ও জামার কাপড় দেওয়া হয়।

(৪) সাধারণ চিকিৎসালয় (বহির্বিভাগ): আলোচ্য বর্ষে শিবালা শাখাকেন্দ্রের রোগীসহ মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা: নূতন ৬৬,২৯৫, পুরাতন ২,২৮,০০৯। গড়ে দৈনিক রোগী ৮১০; অস্ত্র-চিকিৎসা (ইঞ্জেক্শন সহ) মোট ৪৬,১৪৬

(৫) দৈনিক ৭০০ (বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশু, রুগ্ণ) জনকে দুধ দেওয়া হয়

(৬) প্যাথলজি এবং এক্স্-রে ও ইলেক্ট্রো-থেরাপি বিভাগে যথাক্রমে ১১,৪১৩ ও ১,৪৬০টি পরীক্ষা করা হয়।

জলপাইগুড়ি : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৮ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই আশ্রমের সেবাকার্য প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রচার।

চিকিৎসা-বিভাগে দাতব্য ঔষধালয় (হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি) এবং মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গলকার্য পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষে দাতব্য ঔষধালয়ে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ২০,১৫৬ (নূতন ৬,২৫৫)। মাতৃসদনে ১৩৩ জন প্রসূতি ভরতি হইয়াছিলেন। ৫০,৩৩৫টি শিশু ও ১০,১২০ জননীকে দুগ্ধ বিতরণ করা হইয়াছিল।

আশ্রম-ছাত্রাবাসে ১৫জন ছাত্র ছিল, তাহাদের স্বাস্থ্য, পড়াশুনা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। সমাজের অনুন্নত নিরক্ষরদের জন্য হরিজন ও নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। পাঠাগার হইতে পাঠকগণকে বিনা চাঁদায় সদ্‌গ্রন্থ পড়িতে দেওয়া হয়। পাঠাগারে ২৮ খানি পত্র-পত্রিকা নিয়মিতভাবে আসে।

আশ্রমে প্রতি রবিবার ধর্মবিষয়ক পাঠ ও আলোচনা হয়। আলোচ্য বর্ষে ৩৬টি আলোচনা-সভা ও ৮টি বক্তৃতা হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্যান্য পুণ্য জন্মতিথিও পাঠ এবং আলোচনা দ্বারা উদ্‌যাপন করা হয়।

আশ্রমে যে মন্দিরটি নির্মিত হইতেছে, অর্থাভাবে তাহার কার্য এখনও শেষ হয় নাই। এতদর্থে আশ্রম-কর্তৃপক্ষ ধর্মপ্রাণ দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইতেছেন।

আলমোড়া : শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর

স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত ইচ্ছা ছিল—হিমালয়ের শান্ত মৌন পরিবেশে এমন একটি আশ্রম স্থাপিত হয়, যেখানে সাধুরা সাধন ভজন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবে। ১৯১৬খৃঃ স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের প্রচেষ্টায় আলমোড়ার উপকণ্ঠে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর' নামক আশ্রমটি গড়িয়া উঠে। শহরের কোলাহল হইতে দূরে তুষার-মণ্ডিত পর্বতশ্রেণীর পটভূমিকায় এই আশ্রমটির আকর্ষণে প্রতি বৎসর বহু সাধু ও ভক্ত এখানে আসেন এবং কিছুকাল বিশ্রামে ও তপস্যায়

কাটাইয়া যান। ২৫ জন সাধুর এবং ১০ জন (ভক্ত) অতিথির থাকিবার স্থান আছে। পূর্ব হইতে পত্রাদি লিখিয়া যাইতে হয়।

কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে ও চেষ্টায় আশ্রমে জলাভাব ও বৈদ্যুতিক আলোকের অভাব দূরীভূত হইয়াছে। গ্রন্থাগারে ৪,০০০ পুস্তক আছে। গ্রন্থাগার-ভবনের উপর প্রার্থনা, সভা, ক্লাস প্রভৃতির জন্য একটি হলঘর নির্মাণের চেষ্টা চলিতেছে। এতদুদ্দেশ্যে আশ্রম সহৃদয় দেশবাসীর নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছেন।

বেলঘরিয়া: (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা ষ্টুডেন্টস্ হোমের ১৯৫৮খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রতিষ্ঠানটির বিস্তৃতি ও উন্নতি পরিস্ফুট। কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে জীবন গঠনের সর্ববিধ স্থযোগ পাইতে পারে, তাহার জন্যই ইহার প্রতিষ্ঠা। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণের সমস্ত খরচ আশ্রম হইতেই দেওয়া হয়।

এই ছাত্রাবাস অনেক পরিবর্তন ও বিপর্যয়ের পর বর্তমানে রেললাইনের ধারে ৩৬একর-পরিমিত ভূমিতে স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের শেষে মোট ৮৬জন বিদ্যার্থীর ৫৪জন ছিল 'ফ্রি' এবং ৭জন আংশিক খরচ দিত। ১৯৫৮খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। এম-এ পরীক্ষায় গণিতে একটি ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়। বি-এ, বি-কম ও বি-এস-সিতে ৫জন অনার্স পায়, আই-এস-সিতে ২৩জনের সকলেই উত্তীর্ণ হয় এবং ২জন সরকারী বৃত্তি লাভ করে।

এখানে উপাসনা-মন্দিরে প্রার্থনা, নিয়মিত সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা, স্বাস্থ্যচর্চা, খেলাধুলা, ঝিলে সন্তরণ, বিদ্যার্থিগণের নৈতিক মানসিক ও শারীরিক উন্নতির বিশেষ সহায়ক।

১৯৫৮খৃঃ জুলাই মাসে শিল্পমন্দির বা ত্রৈবার্ষিক জুনিয়ার কোর্স ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগ খোলা হইয়াছে। এখানে ৫৪০ ছাত্র সিভিল (L.C.E.), মেকানিক্যাল (L.M.E.) ও ইলেক্ট্রিক্যাল (L.E.E.) ইঞ্জিনিয়রিং শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। বর্তমানে প্রথম বর্ষে ১৮৭জন ছাত্র ভরতি হইয়াছে।

স্মরণোৎসব

কোয়ালপাড়া: ১৩১৮, ৮ই অগ্রহায়ণ জয়রামবাটী হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত এই আশ্রমটিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর পার্শ্বে শ্রীশ্রীমা নিজের ফটো রাখিয়া স্বহস্তে পূজা করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন করেন। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া গত ৮ই অগ্রহায়ণ ঐ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিক ও ভজনের পর শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা কীর্তন করেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল। বহু ভক্তের সমাগমে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

নিউ ইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র

দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১১ই অক্টোবর কেন্দ্রের উপাসনাগৃহে পূজা করেন স্বামী নিখিলানন্দের নবাগত সহায়ক স্বামী বুধানন্দ, ঐদিনই তিনি তাঁহার প্রথম ভাষণ দেন, বিষয়বস্তু ছিল: শক্তিরূপে ঈশ্বরের উপাসনা। এতদুপলক্ষে ভারতীয় সঙ্গীত এবং স্তোত্রাদিপাঠের ব্যবস্থাও ছিল।

প্রতি রবিবারে বেলা ১১টায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়:

অক্টোবর: শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি; *শক্তিরূপে ঈশ্বরের উপাসনা; 'অহং'কে নিয়ে কি করতে হবে? পাশ্চাত্যের জন্য রামকৃষ্ণ ও বেদান্ত।

নভেম্বর: *সাধক রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ; বিজ্ঞান, ধর্ম ও মূল্যবোধ; ঈশ্বর নয়—আমিই ভাল; * আণবিক যুগে ধর্ম, আধ্যাত্মিক সাধনারূপে ভালবাসা (ভক্তিযোগ)।

প্রতি মঙ্গলবার রাত্রি ৮৷৷টায় ধ্যান ও রাজযোগের* এবং প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮৷৷টায় উপনিষদের অধ্যাপনা হয়।

[তারকা চিহ্নিতগুলির বক্তা স্বামী বুধানন্দ]

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র ঘোষ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ২২শে নভেম্বর ৮২ বৎসর বয়সে ভক্ত সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র ঘোষ মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা ঠনঠনিয়ার বিখ্যাত ঘোষ-বংশের শঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের প্রপৌত্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচর স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের ভ্রাতা ছিলেন। বেলুড় মঠের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ; তিনি পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

পরলোকে চারুবালা সান্যাল

গত ১৩ই নভেম্বর ভক্ত শ্রীললিতচন্দ্র সান্যালের পত্নী চারুবালা সান্যাল কিছুদিন রোগভোগের পর ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। এই ধর্মশীলা মহিলা পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। তাঁহার আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়পদে চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উদ্বাস্তু-সেবায় খৃষ্টীয় সম্প্রদায়

আমেরিকার প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী ডক্টর ট্রুপের নেতৃত্বে 'চার্চ ওআর্ল্ড সার্ভিস' নামক সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল গত ২৩শে অক্টোবর কলকাতায় এসে এই অঞ্চলের উদ্বাস্তু-সমস্যা পর্যবেক্ষণ করছেন, কতকগুলি উদ্বাস্তু-শিবির ও কলোনি তাঁরা এর মধ্যে দেখে এসেছেন, এ সম্পর্কে তথ্যাদি পাঠ করেছেন, এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের পুনর্বাসন মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন। এ সবের ওপর ভিত্তি ক'রে তাঁরা একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করবেন।

ইতিপূর্বে ডঃ ট্রুপ ইওরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় এরূপ কাজ করেছেন। এই অঞ্চলের তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে 'চার্চ ওআর্ল্ড সার্ভিসে'র কাছে তিনি দাখিল করবেন, এবং এই কাজ সমাপ্ত করবার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়কে প্রথমতঃ ৫০ হাজার ডলার পাঠিয়ে সাহায্য করবার অনুরোধ জানাবেন।

এই প্রতিষ্ঠান প্রথম থেকেই এই অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের অবস্থার ওপর নজর রেখে এসেছেন। অন্যান্য খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতা পাওয়া গেলে উদ্বাস্তুসমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সকল প্রচেষ্টার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ক'রে তাঁদের প্রচেষ্টাকেও এক সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

এই পরিকল্পনার আংশিক দায়িত্ব থাকবে ন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল অব্ ইণ্ডিয়া, বৃটিশ কাউন্সিল অব্ চার্চেস্, ডিভিশন অব্ ইণ্টার-চার্চ এইড অব্ দি ওআর্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস্—নামক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর।

যুক্তরাষ্ট্রের ৩০টি প্রোটেষ্টাণ্ট এবং দুর্গত-সহায়ক গোঁড়া খৃষ্টীয় প্রতিষ্ঠান এই 'চার্চ ওআর্ল্ড সার্ভিসে'র অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন ৬০টি দেশে এঁদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত। এই প্রতিষ্ঠান থেকে ভারতবর্ষে ১ কোটি ৯০ লক্ষ ডলারের খাদ্যদ্রব্যাদি পাঠানো হয়েছে।

[আমেরিকান রিপোর্টার থেকে সংকলিত]

বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ১০৭তম শুভ জন্মতিথি আগামী ৬ই পৌষ, ২২শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে, উদ্বোধনে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠান সহকারে উদ্‌যাপিত হইবে।

ফোন ৩৪-৪৯৮২
বিখ্যাত স্বর্ণশিল্পী ও
জহরতকার
অন্নপূর্ণা জুয়েলারী হাউস
৮৫, বড়বাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২
গ্যারান্টী যুক্ত গিনি সোনার গহনার
প্রতিষ্ঠান। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য
১৷৷৹ টাকার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন।

উৎসবে ও নিত্যপ্রয়োজনে
শতাব্দীর সুপরিচিত
লক্ষ্মীবিলাস
সর্ব্বঋতুর উপযোগী তৈল
এম, এল, বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস • কলিকাতা-৯

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সরল রাজযোগ—৪র্থ সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি বুলের বাড়ীতে কয়েক জন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্ত্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ০.৫০।

পত্রাবলী—১ম ভাগ। অভিনব পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। প্রায় ৫৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামিজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজান হইয়াছে। পরিচয় এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবিসম্বলিত। মূল্য ১ম ভাগ ৫৲; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪.৫০।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৩শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামীজির ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৬৪৬ পৃষ্ঠা মূল্য ৫৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৪.৬৫।

দেববাণী—৮ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান' নামক স্থানে কয়েক জন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন তাহার একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১.৯০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৩য় সংস্করণ। শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিক-ভাবে সন্নিবেশিত। ১৭০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১.৫০।

বিবেক-বাণী—১৬শ সংস্করণ। আচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজীর উপদেশাবলী। স্বামীজির বাষ্টসম্বলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। মূল্য ০.৪০।

কথোপকথন—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামীজির ছবি-যুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১.২৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১.১৫।

মদীয় আচার্য্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। ১০ম সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষাসম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামিজীর বিবৃতি। মূল্য ০.৭৫; উঃ-গ্রাঃ-পক্ষে ০.৭০।

ভারতীয় নারী—১২শ সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান আদর্শ, পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজির মনোরম ছবি-সম্বলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১২০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১.২৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১.১৫।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান—৭ম সংস্করণ, ১৩১ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থে সাংখ্য ও বেদান্ত-মত বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে—উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য উত্তমরূপে দেখান হইয়াছে আর বেদান্ত যে সাংখ্যেরই চরম পরিণতি, ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ—যে গুলি না বুঝিলে ধর্ম জিনিষটাকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ১.২৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১.১৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৪শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়ভরতের-উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্য গণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট ও ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। মূল্য ১.২৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১.১৫।

সন্ন্যাসীর গীতি—১৩শ সংস্করণ। স্বামীজি-রচিত 'Song of the Sannyasin' নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ০.১৫।

পওহারী বাবা—৯ম সংস্করণ। গাজীপুরের বিখ্যাত মহাত্মা পওহারী বাবার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। স্বামীজির হাফটোন ছবিযুক্ত। মূল্য ০.৫০।

হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ—৫ম সংস্করণ, ৮৮ পৃষ্ঠা। ইহাতে হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা, হিন্দুধর্মের ক্রমাভিব্যক্তি, ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর ও ডাঃ পল ডয়সেন সম্বন্ধে আলোচনা আছে। মূল্য ০.৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ০.৭০।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৪র্থ সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০.৪০, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ০.৩৫ আনা।

অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৪র্থ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্র-দয়াল ভট্টাচার্য্য-প্রণীত। এই পুস্তক পাঠে চরিত-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ১'২৫।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য প্রণীত ৪র্থ সংস্করণ; আচার্য্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲ মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা—৫ম সংস্করণ। স্বামী অরূপানন্দ প্রণীত। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা পুস্তক হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। মূল্য ০'৪০।

ধর্ম্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৬ষ্ঠ সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য ২৲ টাকা।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—২য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। প্রায় ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩'৫০।

শিবানন্দ-বাণী—১ম ভাগ—৪র্থ সংস্করণ, ২য় ভাগ—২য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ সঙ্কলিত মূল্য প্রতি ভাগ ২'৫০।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। প্রথম ভাগ—(ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর) ৫ম সংস্করণ। দ্বিতীয় ভাগ—(ছান্দোগ্য) ৪র্থ সংস্করণ। তৃতীয় ভাগ—(বৃহদারণ্যক) ৩য় সংস্করণ। ইহাতে উপনিষদের মূল, সংস্কৃত, অন্বয়মুখে বাংলা প্রতিশব্দ, সরল বঙ্গানুবাদ এবং আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যানুযায়ী দুরূহ বাক্যসমূহের টীকা প্রভৃতি আছে। সুদৃশ্য ছাপা, কাপড়ের মনোরম বাঁধাই, ডবল ক্রাউন—১৬ পেজি, প্রায় ৪৬৫ পৃষ্ঠা। মূল্য—প্রতি ভাগ ৫৲ টাকা।

সাধু নাগ মহাশয়—৯ম সংস্করণ। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ১'৫০ মাত্র।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ প্রণীত (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত) অতুলনীয় সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত 'গোপালের মা' এর আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ০'৫০।

নিবেদিতা—১৩শ সংস্করণ। শ্রীমতী সরলা বালা দাসী প্রণীত। স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা। মূল্য ০'৭৫।

সৎকথা—স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত—৩য় সংস্করণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী অদ্ভুতানন্দ (শ্রীলাটু) মহারাজের উপদেশাবলীর সংকলন। মূল্য ২৲ টাকা।

যোগচতুষ্টয়—স্বামী সুন্দরানন্দ প্রণীত। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগের সংক্ষিপ্ত সরল বিবরণ। মূল্য ২৲ টাকা।

বেদান্তদর্শন—১ম খণ্ড—চতুঃসূত্রী। শাঙ্কর ভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ, রত্নপ্রভা টীকা, ভাব-দীপিকা ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্বলিত। প্রায় ২৪৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ টাকা।

স্তবকুসুমাঞ্জলি—৫ম সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত—বৈদিক শান্তিবচন, সূক্ত, প্রার্থনা ইত্যাদি বিবিধ সংস্কৃত স্তোত্রাদির অপূর্ব্ব সঙ্কলন। সংবাদপত্রসমূহে উচ্চ প্রশংশিত। মূল সংস্কৃত, অন্বয়, অন্বয়মুখে সংস্কৃতের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং মূলের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। মূল্য ৩৲ টাকা।

শিব ও বুদ্ধ—৬ষ্ঠ সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ০১।

আগে চলো—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। কিশোরদের জন্য লেখা। তরুণমনে সুনীতি, দেশাত্মবোধ, সেবা, আদর্শনিষ্ঠা এবং ধর্মপ্রীতি উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক যৌবনোন্মুখ ছেলেমেয়েকে এই বইখানি পড়িতে দেওয়া উচিত। মূল্য ১'৫০।

হিন্দুধর্ম পরিচয়—১ম ও ২য় ভাগ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সরল কথায় হিন্দুধর্মের মুখ্য বিষয়গুলির সহিত পরিচিত চেষ্টা এই বই দুখানিতে করা হইয়াছে। মূল্য ১ম ভাগ ০'৫০, ২য় ভাগ ০'৭৫।

দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য ও পূজা-পদ্ধতি—স্বামী কৈবল্যানন্দ প্রণীত। মূল্য ১ম ভাগ (পরিবর্দ্ধিত ৪র্থ সংস্করণ ০'৮৮, ২য় ভাগ (৩য় সংস্করণ) ১'৫০।

ঠাকুর এবার এসেছেন

ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। এবার বাঁশ ও ঘাস ছাড়া যার ভেতরে একটু সার আছে সেই চন্দন হবে। তোমাদের ভাবনা কি ?···

সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ-মন ভাল থাকে।···কাজ করতেই হয়। কর্মেই কর্মপাশ কাটে। কাজ ছাড়া থাকা ঠিক নয়।········ ···

— শ্রীমা

● ● ●

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী অধ্যয়ানন্দ ; ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, এম. আই. প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

Udbodhan-Phone : 55-2447 : December 1959 : Regd. No. C. 295

সম্পাদক—স্বামী নিরাময়ানন্দ